নিবন্ধ বৈচিত্র্যের

তিন দশক



চর্চাপদ

১৩বি, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

Teen Dashak
Collected Essays from little Magazines

সম্পাদনা
অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০০

প্রকাশক
বিশ্বদীপ ঘোষ
চর্চাপদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড
১৩বি, রাধানাথ মল্লিক লেন কলকাতা ৭০০ ০১২

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের বিগত তিন দশক এক আশ্চর্য সময়। এই কালপর্বে কবিতা ও ফিকশন নিয়ে যথেষ্ট নিরীক্ষা ঘটেছে, ঘটেছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল। কিন্তু, যে কথা-টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তা হল এই সময়ের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি। এত সংক্ষিপ্ত কালপর্বের মধ্যে এত বৈচিত্রসম্পন্ন প্রবন্ধ, একটু বড়ো মুখ করেই বলা যায়, লিখিত হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল বিস্তার ঘটেছে এদেশে, সমাজ সংস্কারের এজেন্ডা চিন্তানায়কদের মনোজগৎকে আলোড়িত করছে। নতুন-পাওয়া জ্ঞানকে এদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠার তাগিদ অনুভব করছেন বৃহৎ সংখ্যক মানুষ। উনিশ শতকের সেই কাল ছিল এক স্পষ্ট পরিবর্তনের কাল, বিগত তিনটি দশক-ও নানাভাবে পরিবর্তন-চিহ্নিত। এক নিঃশব্দ অথচ দৃঢ়, গভীর এবং তীক্ষ্ণ সংবেদ ধরে রাখছে এই সময়ের লেখালেখি, সূচনা করছে এক যুগান্তের, এক নতুন সন্ধিক্ষণের।

গত তিরিশ বছরে বাংলা বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেও ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। বিদ্যাচর্চার অঙ্গনে প্রবেশ ঘটেছে নতুনতর চিন্তন কাঠামোর। সেই সঙ্গে এই সময় পর্বে ঘটে গেছে বেশ কিছু রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। গত তিরিশ বছরের মধ্যে সোভিয়েততন্ত্রের বিলয়, পূর্ব ইওরোপে লাল শাসনের অবসান একদিকে যেমন ব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্রকে জেরার মুখে ফেলেছে। অন্যদিকে, তেমনই চিন্তনতন্ত্র হিসেবে মার্কসবাদকেও অযুত প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে। গত মহাযুদ্ধের পরে পশ্চিম ইওরোপ প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে, আধুনিক সমাজকাঠামোকে, আধুনিক শিল্প সাহিত্যের বিধাকে এই প্রশ্নগুলি থেকেই জন্ম নেয় উত্তর সংস্থানবাদ ও উত্তরআধুনিক চিন্তন প্রক্রিয়া। এই দু-টি ভাবনাস্রোত, একটু দেরিতেই, গত তিরিশ বছরে আমাদের ভূমিতে প্রবেশ করতে থাকে। প্রবন্ধ রচনার পূর্বতন কাঠামোও ক্রমশ প্রশ্নের সামনে আসতে শুরু করে। মূলত বিষয়ভিত্তিক পরিচিত প্রবন্ধ, অথবা কোনও বিষয় বা ভাবনার প্রতি লেখকের ব্যক্তিগত সংবেদ-জাতীয় প্রবন্ধের স্রোত কমে আসতে শুরু করে, সুরু হয় সমস্যায়নমুখী প্রবন্ধ রচনা। তবে এও ঠিক যে এই কালপর্বে পূর্বতন ভাবনার প্রবন্ধও রচিত হয়। সেগুলিরও যথেষ্ট মূল্য রয়েছে! আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখের দাবি রাখে। সাতের দশকের বিপ্লব প্রচেষ্টা ও তার স্বপ্নভঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট শাসনের প্রতিষ্ঠা ও 'আপাতত শান্তিকল্যাণ' মূলক রাজনৈতিক বাতাবরণ—এই ভূমির মানুষদের সামনেও প্রতিষ্ঠিত 'সত্য'-সমূহের অর্থায়নকে নিয়ে আসে বিবিধ সন্দেহের সামনে। 'অতীত' চর্চার ক্ষেত্রে ঘটতে থাকে প্যারাডাইমগত বদল।

উনিশশো আশির দশকের মধ্যভাগ থেকেই প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসচর্চাকে প্রশ্নের সামনে ফেলে সাবলটার্নস্টাডিজ-এর উত্থান। অনতিবিলম্বে বহু বিচিত্র-অনুসন্ধানের সূত্রপাত ঘটে দেশীয় অতীত-বিষয়ে, এই সূত্র ধরেই উঠে আসে উত্তর উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিও, নৃতত্ত্ব, মনোবিদ্যা, বর্ণনাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের আঙিনা থেকে খোঁজ চলতে থাকে সেই সব ক্ষেত্রের, যা এতকাল 'বর্জিত' বা আলোচনা বহির্ভূত থেকেছে, তা রন্ধন প্রণালীর সামাজিক বিন্যাসকে যেমন ধরতে চায়, তেমনই ধরতে চায় নারী পৃথিবীর নিজস্ব চিন্তা ভঙ্গিমাকে। একদিকে যেমন সন্ধান শুরু হয় লুপ্ত কারিগরির, লুপ্ত জীবনপ্রবাহের, অন্যদিকে তেমনই প্রশ্ন তোলা হতে

থাকে এতদ্‌কালে লিখিত বিভিন্ন বয়ান সম্পর্কে। 'প্রতিষ্ঠিত সত্য' নামক বিষয়টিকে বিভিন্ন কোণ থেকে আক্রমণ শুরু হয়। সেই সঙ্গে আবার নতুন করে পশ্চাদ্‌ভূমির সন্ধানও চলতে থাকে। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন ধারা, যা একটা বড়ো সময় ধরে অ্যাকাডেমিক অথবা সাধনধারার চর্চার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তা এখন উঠে আসতে থাকে তথাকথিত 'সেকুলার' পরিসরে, বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের পাতায়।

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধগুলির সবকটিই যে এই নবলব্ধ চিন্তনপ্রসূত,তা নয়। এর মধ্যে অবশ্যই রয়েছে ক্লাসিক ধারার প্রবন্ধও, যে বিধার চর্চা বাংলা সাহিত্যে অবিরল থেকেছে। প্রবন্ধ বাছাই-এর ক্ষেত্রে 'তিনদশক'-এর কথা বলা হলেও, তা যে খুব আঁটোসাঁটো সময় খণ্ড— বলা যায় না, মোটামুটিভাবে বিংশ শতকের আটের দশকের মধ্যভাগ থেকে একুশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত সময়ে লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত নিবন্ধগুলিকেই এক্ষেত্রে বাছা হয়েছে। সুতরাং 'কম-বেশি তিন দশক'-এই কাল-অভিধাটিএক্ষেত্রে চলতে পারে। চেষ্টা করা হয়েছে সেই সব প্রবন্ধ সংগ্রহের, যা ইতিপূর্বে পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও গ্রন্থভুক্ত হয়নি (যদি এর মধ্যে কোনওটি তা হয়েও থাকে, তা সম্পাদকের অক্ষমতা, এর জন্য আগাম মার্জনা চেয়ে রাখছি)। প্রবন্ধগুলির মধ্যে যেমন সমস্যায়নমুখী রচনা রয়েছে, তেমনই রয়েছে কিছু পরিচিতি প্রবন্ধও। এইসব পরিচিতি প্রবন্ধগুলি প্রধানত বাংলা সাহিত্যের পাঠককে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল নতুন দার্শনিক সন্দর্ভ, নতুন সাহিত্যবিধা অথবা সমালোচনার নতুন ইডিয়মের সঙ্গে। সংগ্রহের সময় নজর দেওয়া হয়েছিল বিষয় বৈচিত্রের প্রতি। যত বেশি বিষয় ও সমস্যায়নকে দুই মলাটের মধ্যে ধরানো যায়, সে চেষ্টা এক্ষেত্রে করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে, দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন বিজ্ঞান, নাটক, চিত্রকলা-ভাস্কর্য সংক্রান্ত নিবন্ধ সংগ্রহ করা যায়নি। কারণ, আলোচ্য কালপর্বে এইসব বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে অজস্র গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, যার মধ্যে স্থান পেয়েছে সেই সব রচনা। ইতিপূর্বে গ্রন্থভুক্ত না হলে সেসব রচনার বেশ কয়েকটি অনায়াসে এই সংকলনভুক্ত হতে পারত।

প্রবন্ধ সংগ্রহের ক্ষেত্রে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও লিটারারি ক্লাবের কর্ণধার শ্রী সন্দীপ দত্ত-র কাছ থেকে। বহুক্ষেত্রে লেখকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে তাঁদের অনুমতি গ্রহণও ঘটেনি। এ বিষয়ে ক্ষমাপ্রার্থী। প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত ব্যক্তি নাম, টার্ম-এর লিপ্যন্তর, স্থান-নাম ইত্যাদিকে যথাযথ রাখা হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রবন্ধে ছবির ব্যবহার ছিল। গ্রন্থের নিয়ন্ত্রনাতীত পৃথুলতা সংবরণার্থে এবং কিছু প্রযুক্তিগত অসুবিধা হেতু সেগুলিকে বর্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও মার্জনা চাইছি।

এই গ্রন্থটিকে গত তিন দশকের বাংলার মননচর্চার দলিল বললে মনে হয় ভুল হবে না। যেহেতু কোনও 'দলিল'ই পূর্ণতার দাবিদার হতে পারে না, এ-গ্রন্থও সেই দাবি থেকে বিরত থাকছে। *তিন দশক* মূলত ধরে রাখতে চেয়েছে বাঙালি মননচর্চার এক সন্ধি পর্বকে, যেখানে ধারাবাহিক চিন্তার স্রোত যেমন বিদ্যমান, তেমনই রয়েছে ধারাবাহিকতার বিলোপ ও ব্যতিক্রম। এই প্রবন্ধসমূহ একদিকে যেমন অতীতযাত্রী, অন্যদিকে তেমনই সমকালীন ও ভবিষ্যৎমুখী। এই গ্রন্থ যা ধারণ করল, তা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, যা করতে পারল না তাও ঠিক ততোটাই— একথা সংবেদী পাঠক মাত্রেই বুঝবেন।

সূচি

'আধুনিক' বাঙালি কবির আত্মন—নিভৃত পেন্ডুলাম দর্শন

অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়

কবি? কে কবি? যে ধরে সহস্রধারা মন; সে কই? তার খোঁজে এই তো বেরিয়ে এসেছি পথে। সন্ধ্যায় জ্বলে ওঠে ঘোলাটে বাল্ব, কফিঘরে, চায়ের দোকানে। তার নীচে মুখের চামড়া টান, বসে-থাকা ওই—ওই কি কবি? কথা বলি একা...স্বগত কথন, কবি কখনও জবাব দেন, কখনও দেননা। কবির বাড়িতে গেলে দাড়িওয়ালা কাক, সোফা, ফড়িং বালক সবাই কবি, আমিও কবি সাজি। কবিতার অহং-এ ডগমগ করে উঠি, তারপর....সব কথা, সব ডুম আলো, সব কফি.... শেষ হয়। বাড়ি ফেরার পথে অহং নিভে আসে, নিজের ছোটো ঘরটিতে পাঁচবছরের পুরোনো ডায়ারির পাতা ওড়াতে ওড়াতে, শব্দ আর ছন্দের সঙ্গে খেলতে খেলতে আমাদের হাই ওঠে। মালাচন্দনের গন্ধে মুহুর্মুহু ঘুম পায়। অহং আর আত্ম একাকার হয়ে ডুবে যাই ঘুমের কালো জলে। আমাদের কবিজন্ম ঢেকে দেয় শালুক পদ্মের কিছু পাতা।

কবির 'আত্মন' কি আলাদা কোনো আত্মন? পাড়ার পাঁচুবাবু, নেপোদা, মিলিদি অথবা প্রোফেসর আচার্য-র থেকে কবির আত্মন ঠিক কত দূরে? কবি তাঁর নিজের আত্মনকে দেখেন কীভাবে? কবিও তো বাজার যান, নীলছবি দেখেন, অন্য লোককে লেঙ্গি মারেন, শনিবার কালীমন্দির যান। অথবা বাজার করেন না (কবির বউ করেন), নীলছবি দেখেন না (পাসোলিনি দেখেন), অন্য লোককে লেঙ্গি মারেন না (চামচা পোষেন), কালীমন্দিরে যান না, শনিবার দেদার পড়াশুনো করেন। এই বাইনারিতে কার কীই-বা এসে যায়? কবি সমাজের কোন উপকারে লাগেন অথবা কবির উপযোগ ঠিক কতটুকু—এসব নিয়ে প্রশ্ন উঠলে কবি হামলে পড়েন, বক্তৃতা দেন, বলতে চান সমাজ সচেতনতা নিয়ে, নন্দনতত্ত্ব নিয়ে, কলাকৈবল্য নিয়ে। দূর! এরও কি কোনো মানে হয়? এতেই বা লাভ কী? কার কীই-বা এসে যায়?

'আত্মন' বা 'self' একটা 'structured phenomenon', পরিপার্শ্ব ছাড়া 'আত্মন'-এর গঠন সম্ভব নয়, 'আত্মন'-এর বোধ এক সাপেক্ষ অনুভূতি, একে বুঝতে গেলে দরকার এক 'other'-এর। এসব তাত্ত্বিক কথা আমরা সকলেই বুঝি। তবু, প্রহেলিকা এখানেই যে, নাড়ু-হারু-পঞ্চারও একই সমস্যা, কিন্তু তারা কবি নয়। সুতরাং তার 'আত্মন' নিয়ে বিশেষ বাক্‌বিস্তার করা যাবে না। 'কবির আত্মন' নিশ্চয়ই আলাদা, যেখানে কবি 'Self' আর নাড়ু-হারু হল 'other'। হে প্রিয় পাঠক, বুঝতেই পারছেন,

এ লেখা এবার প্রবেশ করবে কবির 'self'-সংক্রান্ত এক সন্দর্ভে, যেখানে নিজে এক কবিতা মক্‌শোকারী হিসেবে 'কবির আত্মন' নিয়ে থান থান মাথালো মাথালো তত্ত্বকথা আওড়াব, নাঃ। এসব আর বলার কিছুই নেই। বাজারে সস্তায় রুটলেজ ক্ল্যাসিক্স লভ্য হওয়ার পর, অক্সফোর্ড রিডার সিরিজ সস্তা হওয়ার পর, আপনাদের 'self' ও তার রাজনীতি নিয়ে নতুন কোনো জ্ঞান অন্তত আমার দেওয়ার নেই। এ লেখায় শুধু খুঁজতে চাই 'কবির আত্মন' ঠিক কোথায় আলাদা অন্য সকলের চাইতে; নাকি এ এক গুপিযন্তর, যেখানে হাতড়ালে কেবলই রং-রঙা-রং-ঠনাৎকার ছাড়া আর কোনো আওয়াজ বেরোবে না? অর্থাৎ 'কবির আত্মন' এক বিশেষ নির্মিতি, যা এক প্রগাঢ় সমাজচালাকির কায়দা-কসরত, যাকে দেখিয়ে বাঙালি কবিকুল, সমাজ থেকে বিশেষ সুবিধে পান অথবা পাওয়ার চেষ্টা করেন!

ঈশ্বরচিন্তা করার জন্য মানুষি আধার প্রয়োজন। কিন্তু ঈশ্বরচিন্তার জন্য যে সন্ন্যাসী হওয়া অপরিহার্য—একথা মানা কঠিন। গেরুয়া পরলেই আমি যে কী করে পাবলিককে টপকে একধাপ আগে চলে গেলাম—এ ব্যবস্থা মাথায় ঢোকে না। একইভাবে ঢোকে না যে, কবি কোথায় পাবলিককে টপকান? এও কি একপ্রকার কসমোপলিটনিজম? এ বিষয়ে একটা ঝটিতি অনুসন্ধানই এ লেখার উদ্দেশ্যমাত্র। দয়া করে এর মধ্যে 'অভিসন্ধি' খুঁজবেন না।

রবীন্দ্রনাথকে এ আলোচনার বাইরে রাখছি। প্রথমত, তাঁর ওইসব সম-্যা ছিল বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, আমাদের আজকের কবিকৃতির সঙ্গে তাঁর লেনাদেনা সবিশেষ আছে বলেও মনে হয় না। 'আধুনিক কবির আত্মন'কে যদি খুঁজতে চাই তবে সেই উপনিবেশবাদের পুরোনো কিস্‌সাকেই ঘাঁটতে হবে। পশ্চিমি হাইমডার্নিজমকে যবে থেকে আমরা কবিতায় সেঁটেছি তবে থেকেই কবির এক 'গুরুঠাকুর' সুলভ ভাবকল্প আমাদের গায়ে সেঁটেছে। কবি চেয়েছেন খ্যাতি, খ্যাতির বিস্তার অনুসারী কবিকুল এবং অবশেষে অমরত্ব, কবি যে সর্বদাই দাম্ভিক, তা নয়। সময় সময় দীনাতিদীনের ছদ্মবেশে কবি চারিয়েছেন তাঁর অহংকে, যে 'অহং' পশ্চিমি 'আধুনিকতার' এক বিশিষ্ট নিষ্ঠীবন ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাংলা 'আধুনিক' কবিতায় কবির আত্মনকে অনুসন্ধান করতে হলে বস্তুতপক্ষে তা হয়ে দাঁড়ায় কবির অহংবোধের এক ইতিহাস রচনার প্রয়াসগ্রহণ। এক্ষেত্রে, একথাও বলা দরকার যে 'ইতিহাস' নামক এক নির্মিতির মধ্যে বিশ্বাস রাখাটাও 'অহং'এর আর এক নাম। কবির সময়ধারণা এবং ইতিহাসবোধ-ই তাঁর 'আত্মন'কে গঠন করছে বলে কবি মনে করেন। এ এমন এক জ্ঞানতাত্ত্বিক gaze যেখানে কবি বস্তুত 'আত্ম'বিস্মৃত, এক অহংসর্বস্ব জীব। তাঁর গতি পেন্ডুলাম-প্রতিম ইলিপ্সাকার। বালির উপর কেটে যাওয়া পেন্ডুলাম পিনের রৈখিক দাগগুলোকেই তিনি জীবনের পরমতম সত্য বলে জানেন। কখনোই ভাবেন না যে 'স্থির' ও 'অস্থির'—বাইনারি দর্শনেই এ লেখাও বুঝল। বস্তুতপক্ষে

ওই স্থির বিন্দুটিকে লিখনের প্রচেষ্টা কবিতাই করতে পারে। কিন্তু গত সত্তর বছরের বাংলা কাব্যরীতির মূলধারা সেদিকে হাঁটেনি।

'আত্মন'কে একটি আপাত ধ্রুবে অবস্থান করানোর কথা জীবনানন্দ বলেছিলেন। জীবনানন্দ জানতেন সমস্যার মূলটা কোথায়। সুধীন্দ্রনাথ 'নাস্তি'র কথা বলেছিলেন যা বস্তুতপক্ষে সেই আংটা, যাতে 'self' ঝুলে থাকে, দোল খায়, 'নাস্তি' কোনো 'আপাত' স্থির বস্তু নয়, তা অস্তিত্বেরই মুখপাত—একথা সুধীন্দ্রনাথের কাব্য/ প্রবন্ধ ব্যেপে অবস্থান করছে। জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথে যতই তাত্ত্বিক বিরোধ থাক, তা নিঃসন্দেহে এক আপাত বিরোধ, আসলে দুজনেই ছিলেন 'আত্ম-সন্ধানী'; কবিতা তাঁদের কাছে ছিল এমত জ্ঞানচর্চার বাহন। কিন্তু ওই অবধিই। এরপর থেকে বাংলা কবিতায় কবির আত্মন আর কোনও বিমূর্তির দিকে ফেরেনি। এর কারণ কি মার্কসবাদ? যে মতবাদ বস্তুতপক্ষে স্থানান্তরিত করেছিল জীবনার্থকে। 'জীবনার্থ' বলতে এখানে বলতে চাইছি, যে ব্যাখ্যাতত্ত্ব মানুষকে 'cosmos'-এর মধ্যে তার অবস্থানকে বোঝাতে সাহায্য করে। ভেবে দেখুন, ভারতচন্দ্র অথবা রামপ্রসাদের মধ্যে পেন্ডুলাম-বৃত্তি ছিল না। অথচ সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে জয় গোস্বামী—সকলেই দুলছেন। বাইনারিতে দুলছেন, অনেকান্তে দুলছেন, বিভ্রান্তিতে দুলছেন আর বাংলা কবিতার এই দোলাচলে পাঠকও দুলছেন, ঘূর্ণনে দুলছেন। সর্বোপরি, এই দোলন ও ঘূর্ণনকেই পাঠক 'নান্দনিকতা' বলে ধরে নিচ্ছেন এবং কবিতার এমনতরো পাঠকৃতি নির্মিত হচ্ছে যেখানে মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্কে দ্বান্দ্বিকতা আসছে। দোলাচলই সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 'জীবন' এর 'মানে' বদলাচ্ছে। 'আধুনিক জীবন কলের ঘড়ির মতো যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় 'স্থিত' হচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে অথবা 'স্থিত' হচ্ছে।

চল্লিশের দশকে বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ, স্বাধীনতা যতই পরিপার্শ্বকে 'অস্থির' করে তুলুক না কেন, বাংলা কবিতা সেগুলিকে গ্রহণ করেছে। নিতান্ত 'আধুনিক' বাচনে, গড়ে তুলেছে তার বিশ্বদর্শন। বিংশ শতাব্দী হয়ে উঠেছে 'Age of Extremes'। বাঙালি কবি তাঁর আত্মদর্শনকে রেখেছেন সংশ্লিষ্ট 'ইতিহাস'-অনুভবের মধ্যেই। 'ভঙ্গুর এই বিশ্বে' আত্মনের ক্ষণস্থায়িত্বকে উপলব্ধি করেই লেখা যায়—'অস্তিত্ব অতিথি তুমি' এর মতো পঙ্ক্তি। অস্তিত্বের পূর্বাপর বোধকে কেন কবি লিখতে পারেননি?—এর উত্তর বাংলা কবিতার 'ইতিহাস'-সম্মত পাঠে পাওয়া যাবে না। কবিতার পর কবিতা জুড়ে 'পাপ আর দুঃখের কথা', 'দুর্ভাবনাময় জটিল-সাম্প্রতিক'এর কথা বিশাল বাহিনী নিয়ে মিছিল করে আছে। কবি এখানে হয়ে উঠেছেন সেই ভঙ্গুর বিশ্বটির বর্ণনাকারী। কবিতার একমাত্রিকতা এভাবেই গেড়ে বসছে নন্দন হিসেবে। এর বাইরের আত্মন-বিবৃতিগুলিকেই 'কবিতা' হিসেবে ধরা হচ্ছে না, হলেও বর্জিত হচ্ছে 'আধুনিক' হিসেবে চিহ্নিত করে।

তাহলে কোথায় যাব? 'আত্ম'-বিস্মৃত 'অহং'-সর্বস্ব 'আধুনিক'এর কাছে? গত সত্তর বছর ধরে হে পাঠক, আপনি গিয়েছেন সেখানে। কোনো লাভ কি হয়েছে তাতে? দাঙ্গা

লুপ্ত হয়েছে? যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হয়েছে? রণ-রক্ত-সফলতার প্যারামিটারে জীবনকে মাপা থেমেছে? মোদ্দা কথায় 'শান্তি' পেয়েছেন? 'কাব্য' বলতে যে প্রশান্তির উদ্ভাস-কে বোঝানো যায়, তা আদৌ পেয়েছেন কি? ওই ইতিহাসবোধ, অর্থের স্থানান্তরণ আর খণ্ডদর্শনের মধ্যে আপনি বারংবার ক্ষতবিক্ষত হওয়াকেই 'নন্দন' বলে জেনেছেন। জেনেছেন লাস্ট সিনে লাল সূর্যের ভোরে হিন্দু-মুসলমানের জাপটাজাপটি দেখালেই ওস্তাদের মার। কদাচ প্রশ্ন করেননি যে অমনটা কোথায় হয়? কোন বাস্তবতায়? হ্যাঁ। 'বাস্তব' সম্পর্কে আপনার বোধ টনটনে হয়েছে বটে। মুদ্রণবিপ্লব-প্রসূত সমমাত্রিক শূন্যগর্ভ সময়ে আপনি কটমটে মকাইভাজা খেয়েছেন আর অন্তশূল-কেই আত্মযন্ত্রণা বলে জেনেছেন। আর ওদিকে কবি এসমস্ত লিখেটিখে খালাসিটোলা বা মন্টিকার্লোয় সস্তা/দামি মদ খেয়েছেন। অনুসারী কবিকুলকে রবিবার সকালে সমবেত করে ড্রয়িংরুমে ভজন গাইয়েছেন। কবি দিব্যি মস্তি মেরেছেন। আর আপনি ঠেকেছেন, ঠকেছেন। কবিতা উৎসবে যাবতীয় পাপ ও দুঃখ বর্ণনায় সাঁতরেছেন। দেশ আপনাকে মাতৃভাষা দেয়নি বলে অনুকম্পিত হয়েছেন, সেলাই দিদিমনি কালো মেয়ের দুঃখে এম্প্যাথি জানিয়েছেন। অথচ ব্যক্তিগতভাবে আপনি বড়ো কোনো 'পাপ' করে উঠতে পারেননি। হিন্দি বা তামিল শিখতে যাননি, আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দিয়ে মোটামুটি ফরসা মেয়েই বিয়ে করেছেন। আপনি এসব করে কিন্তু সুখেই আছেন। দোষের মধ্যে 'আধুনিক' কবিতা পড়ে ভূতের কিল খাওয়া ছাড়া আপনার আর কোনো অশান্তিই নেই। কিন্তু আপনার ওই ভূতের কিলের নেশাই কিন্তু কবিদের পোয়াবারো করেছে। আপনি তাঁদেরকে এক বিপুল জমি ছেড়ে দিয়েছেন। সমাজের দেখভাল, রূপমকে চাকরি দেওয়া। দাঁত উঁচু কালো বুড়িদির বিয়ে দেওয়া—সব—সমস্ত কবিরা করেছেন। আপনার বিবেক সন্তুষ্ট হয়েছে, কবি-সম্মেলন শেষে আপনিও দু-পেগ গিলে, প্রতিবর্তক্রিয়ার মতো রমণ সাঙ্গ করে বাকি রাত্তির ভোঁস ভোঁস করে ঘুমিয়েছেন।

কবির 'আত্মন' আর পাঠকের 'বিবেক'—এই দুই অ্যাসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ায় যে লবণ ও জল উৎপাদিত হয়েছে তা লবণ ও জলই। কখনোই 'সুধা' নয়— একথা নতুন করে আর বলতে চাই না। সময়ের আবর্ত অথবা রৈখিক গতিসূত্রকে মেনে নেয় যে 'আধুনিকতা' তার বাইরে বাঙালি কবির আত্মন (অন্তত মূলধারার) পা রাখতে পারেনি। সময়ের স্থির মাত্রাকে, সময়ের পড়ে থাকা মাত্রাকে বাঙালি কবি তাঁর আত্মনের আশা হিসেবে স্বীকার করেননি। উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিসরে এ ধরনের স্বীকৃতি তাঁর 'প্রতিষ্ঠা'-র পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে তিনি ভেবেছেন। বাংলা কবিতার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে যে আত্মবিবৃতির দলিল, তা 'দলিল'ই, 'দর্শন' কখনোই নয়। বাঙালি কবির 'আত্মদর্শন' তাই মূলত এক প্রবঞ্চিত আত্মনের অতিকথন, এক সুবিশাল নজরদারি কাঠামোয় নজর ও শাস্তির সাপেক্ষে গড়ে ওঠা এক একমাত্রিক self, যা কবির বোধ থেকে লিখিত পঙ্‌ক্তিতে, লিখিত পঙ্‌ক্তি থেকে পাঠকের মননে বিস্তৃত। বাংলা কবিতার

মূলধারা তাই এক ক্রমিক দর্শনহীনতায় পর্যবসিত অথবা খণ্ড ও ভণ্ড দার্শনিকতায় আক্রান্ত।

এ রচনায় খুব বেশি উদাহরণ দিতে চাই না। অন্যত্র এ নিয়ে বিস্তর মুখব্যাদান করেছি। এখন মুখবন্ধের প্রস্তুতিই নিতে চাই। তথাপি, এ বাচাল কলম (কলমি→কমলি) নেহি ছোড়তি। তাই, লাজশরমের মাথা খেয়ে উদ্ধার করি আমাদের সময়ের 'মহতী' কবিজনের একটা-দুটো পদ্য—

রসাত্মক চন্দ্র হয়ে সর্ব ওষধিকে পুষ্ট করি।
রৌদ্রময় কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে বলেন শ্রীহরি;
প্রতিটি শিকড়ে, ফলে, বৃক্ষছালে, শাঁসে ও শাখায়
সেকথা প্রবিষ্ট হয়, পুষ্টি জাগে নিশিজ্যোৎস্নায়
বিজয়ী যোদ্ধার জন্য। কিন্তু ক্ষুব্ধ, বিমর্ষ অর্জুন
একটি মৌলিক প্রশ্নে বিশ্বদ্রোহী : কেন যুদ্ধ
কেন নিজ আত্মীয়কে খুন?
কৃষ্ণের কুটিল হাসি, কূট কথা, কর্মের আদেশ
ধর্মের জেহাদ তুলে; দ্রৌপদীর নিগৃহীত কেশ
বাতাসে উড়ন্ত; তবু অর্জুনের নিরস্ত্র বিষাদ
মানুষের শেষ অস্ত্র—যুদ্ধের বিরুদ্ধে। যত 'অবিনাশী আত্মা'র প্রমাদ
মানুষই শনাক্ত করে। তার দগ্ধ বিশ্বরূপ দেখেন শ্রীহরি:
'রসাত্মক চন্দ্র হয়ে সর্ব ইন্দ্রিয়কে দুষ্ট করি।'—
একথা মানুষ বলে, পালটা উপহাসে। তার হৃদয়-বেদনা
শোক ও শীর্ণতা চায়, রক্ত নয়, অশ্রুপাত চায়।
এ অনন্ত কুরুক্ষেত্রে যুযুধান দুই পক্ষ।
বিষণ্ণ অর্জুন আর দৈবের ছলনা।

(রণজিৎ দাশ, 'অর্জুন বিষাদ'; *প্রতিবিম্ব*, নভেম্বর ২০০৫, পৃ. ৫৬)

'আধুনিক কবি গীতার context-কে ব্যবহার করেন এ অনন্ত কুরুক্ষেত্র-কে বোঝার জন্য। 'অর্জুন' বিষণ্ণ, শোকগ্রস্ত অর্জুন এখানে আধুনিক যুদ্ধের হুমকিতে ভীত এক আত্মবিস্মৃত মানুষ, যা কিনা কবিরই আত্মন, 'আধুনিক' কবিতার হাততালি মারা পাঠকেরও আত্মন। 'অবিনাশী আত্মা'র তত্ত্ব এই লেখক বা পাঠকের কাছে 'প্রমাদ' মাত্র। হ্যাঁ, প্রমাদ বটে। তবে তা একমাত্রিক এবং বস্তাপচা 'আধুনিক' যুক্তিবাদের কাছে প্রমাদ। দস্তানা ছুঁড়ে চ্যালেঞ্জ জানাতে ইচ্ছে করে এইসব খণ্ডদার্শনিক কবিকে—পারবেন আত্মার অবিনশ্বরতাকে অপ্রমাণ করতে? যাঁরা সৃষ্টি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা গড়ে তুলতে পারেননি আজীবনেও, তাঁরা বিনাশ সম্পর্কে তত্ত্বকথা আওড়ান কোন সংসাহসে? গীতায় উল্লিখিত মহাভারতীয় অর্জুনের বিষাদ যে আদৌ আধুনিক মানুষের যুদ্ধভীতি নয় তা এঁদের বোঝানো দুষ্কর। গীতায় উল্লিখিত ঘটনার আগে কি মহাভারতীয় অর্জুন অস্ত্র ধরেননি কখনও? বিরাটরাজার গোরু নিয়ে ঝামেলার সময় তো বৃহন্নলা অর্জুন

শমীবৃক্ষ থেকে অস্ত্র নামিয়ে কৌরবদের তাড়া করেছিলেন। তখন তাঁর স্বজননিধনের জন্য বিমর্ষতা দেখা দেয়নি? এইখানেই সমস্যা, গীতা যে মহাভারতের একটা extended text তা ভুলে গিয়ে সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস-আদি জ্ঞানধারণায় politicaised কবির আত্মনই গীতার এহেন context-বিচ্ছিন্ন পাঠ থেকে পণ্ডিতি কবিতা ওগরাতে পারে। ভারতীয় জ্ঞানধারণার সঙ্গে এই ধরনের কবির এবং এ ধরনের কবিতার রসগ্রাহী পাঠকের কোনো পরিচিতিই নেই, নেই গত অর্ধশতাব্দীতে পশ্চিমে ঘটে যাওয়া জ্ঞানতত্ত্বচর্চার সঙ্গেও। Modernity-র ঘোর ঘোলাজলে এ ধরনের কাব্য রসসিদ্ধতা পায়। 'রসাত্মক চন্দ্র হয়ে সর্ব ওষধিকে পুষ্ট করি'—বাক্যটি হয়ে দাঁড়ায় রণলিপ্সু হয়ে ওঠার আরক মাত্র। তা নেশার সামগ্রী। ডোপিং-এর অমোঘ সরঞ্জাম, কবি কখনও ভেবে দেখেন না 'ওষধি' শুধু কিছু গাছগাছড়া নয়, তা হতে পারে মানুষের আত্মনও। গীতার অন্যত্র যে ব্রহ্মবাদ শ্রীহরি ব্যক্ত করেছিলেন তাতে হত ও হত্যাকারীর মধ্যে যে অভেদ-এর কথা বলা হয়েছিল, তা কোনও ভুঁইফোঁড় ম্যাকিয়াভেলির বাতেলা নয়। তা কদাচ যুদ্ধের সাফাইগীতি নয়, তা মৃত্যুত্তীর্ণ, শোকোত্তীর্ণ, সচ্চিদানন্দের এক নিরবিচ্ছিন্ন বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ। যেখানে গ্লানি নেই, মারী নেই, হত্যা নেই, হত্যাকারীও নেই। 'কর্মের আদেশ' সেখানে আধুনিক রাষ্ট্রের সেনা চাপানোর রাজনীতি নয়, ধর্মও সেখানে 'জেহাদ' নয়। সমস্যা এখানেও যে একবিংশ শতকের সংবাদপত্র আর নিউজ চ্যানেল-ভোজী কবি তাঁর যুদ্ধভীতি আর বিবেককে চাপিয়ে দেন 'অর্জুন'এর কল্পে। যেখানে 'বিশ্বরূপ' প্রকৃতই 'দগ্ধ'। এই 'দগ্ধ' বিশ্বকে ছাড়া আর কিছুকে দেখেন না তাঁরা। 'রসাত্মক চন্দ্র হয়ে সর্ব ইন্দ্রিয়কে দুষ্ট করি'—পশ্চিমি আধুনিকতার lunatic তত্ত্বের হাস্যকর প্রয়োগ। রক্ত আর অশ্রুর মধ্যে ব্যবধান কি সত্যই আছে? হৃদয়বেদনা কি কর্তিত অঙ্গের যন্ত্রণার বাইনারি? তাহলে 'আত্মন' কোথায়? সেই 'আত্মন' যা কুরুক্ষেত্রের বাইরে অবস্থানরত! মিডিয়া-মোহে কবি বেমালুম 'বিষণ্ণতা' আর 'দৈব'কেও বাইনারিতে দেখেন। বিষণ্ণতাও যদি দৈবেরই সৃজন হয়ে থাকে তবে এ ধরনের কবিতা রচনার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মাত্র আঠারো দিন চলেছিল, তা কোনো বিশ্বরূপযুদ্ধ নয়। আর বিশ্বযুদ্ধও তো 'বিশ্ব' ব্যেপে হয়নি কখনও। তবে কেন আমাদের সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *অপরাজিত* নামক মহাকাব্যে তাকে এক টুসকিতে সরিয়ে ফেলতে পেরেছিলেন?

এ বিষয়ে আর বাক্‌বিস্তার ঘটাব না। সংশ্লিষ্ট কবিতাটি হাতের কাছে ছিল তাই এ নিয়ে একটু ঠোনাঠুনি করলাম। পাঠক, দয়া করে এর মধ্যে কোনো অভীষ্ট খুঁজবেন না। এ কাণ্ড আরও প্রকাণ্ডভাবে রয়েছে শঙ্খ ঘোষ-এর 'অন্ধ বিলাপ' কবিতায়। একটু খুঁজে নিয়ে আবার পড়ুন। একই ছবি ফুটে উঠবে। প্রাচীন text-এর 'আধুনিক' অতিনির্ণয় 'আধুনিক' কবিতার এক অনন্য দস্তুর। এতেই কবিতা আবৃত্তিসিদ্ধ হয়। কবি রাষ্ট্রিক পুরস্কার পান। কবিতায় সুর বসে, জীবনমুখী গান হয়, আপনি তার ক্যাসেট কেনেন।

বহুজাতিকের আড়ে করা খিস্তিতে বহুজাতিকেরই পকেট পুষ্ট হয়। আপনি প্রতারিত হন, হতে থাকেন। কারণ আপনার 'আত্মন' প্রতারিত হওয়াকেই 'নন্দন' বলে জানে।

তাহলে কি কবির 'আত্মন' এক আত্ম ও পাঠকপ্রবঞ্চনারই নামান্তর। না, তা নয়। রসাত্মক চন্দ্র জানে শতশরদ মানুষের আয়ু। এই ওষধিআয়ু, তার 'আত্ম'-বোধের জন্য প্রদত্ত। 'অহং' সেই আত্মবোধ থেকে মানুষকে দূরে রাখে। গীতায় শ্রীহরি এই 'অহং'-এর খণ্ডনের কটি পথ বলেছিলেন মাত্র। তাই গীতা আজও বজরংদলের পুচ্ছ আস্ফালনের কৈফিয়ত গ্রন্থ মাত্র নয়, তার অন্য বহুমাত্রিক contextual পাঠ সম্ভব। ভারতীয় দর্শনকে আত্মস্থ করে আজও মানুষ গীতা কিংবা মহাভারত পড়েন। তবে তাঁরা 'আধুনিক' বাংলা কবিতার পাঠক নন। 'আধুনিক' বাংলা কবিতা পাঠের অথবা 'আধুনিক' বাঙালি কবির অহংকে জানার কোনো বাসনা বা দায় তাঁদের নেই।

এইসব ঘোলাজল থেকে দূরেও কবিতা রচিত হয়। সময়ের প্রসরমান ও আবর্তগতির কল্পকে ঠোনা মেরে কবি অবশ্যই অনুভব করতে পারেন পেন্ডুলামের বহু ঊর্ধ্বে স্থিত সেই স্থির সত্তাকে, যেখানে আয়ুর 'ওষধি' স্তরকে অতিক্রম করে কবি স্পর্শ করেন সেই অনাদি অনন্ত স্থৈর্যকে, তারও নাম 'কাল'—'মহাকাল'। এ কথায় যাওয়ার আগে আর একটি পদ্য উদ্ধার করি (এটিও হাতের কাছেই ছিল)—

জ্যেষ্ঠী কয় ঠিকঠিক আড়ামধ্যমানে
ঘড়ির বয়স ঘড়ি গণনায় জানে।
সবিস্তার কহি শুন ঘড়ির প্রকার
বয়ঃক্রম ভেদে হয় সর্বমোট চার।

বালিঘড়ি রূপ ধরি পরার্ধ বছর
সত্যযুগে কাটে কাল গণিয়া প্রহর।
বালি হইতে বালিয়াড়ি, অপরার্ধ হতে
ত্রেতাযুগে বাড়ে জল পরতে পরতে।

অতঃপর জলঘড়ি গড়ে কারিগর
বৃষ্টি কয় টিপটিপ আসিল দ্বাপর
কালের সর্পিল সূত্রে গূঢ় ঘূর্ণিঝড়ে
চক্রগণ অগনন অনর্গল ঘোরে
দোলক পর্যায়বৃত্ত আদি-অন্ত যায়
কলিতে কলের ঘড়ি তদুপরি নাই।

জ্যেষ্ঠী কয় ঠিক্ ঠিক্...কান্দে নরয়োনি
বিকল ঘড়ির কর্ণে কহি হরিধ্বনি।

(বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়, 'বিকল', *কহে বিশ্বমুখ*, পৃ. ৩৭)

পাঠক বুরবক নন। তিনি নিশ্চয়ই বোঝেন যে, যে ক্রমিক ও চক্রাকার কালকল্পের যৌথ আক্রমণে কবির 'অহং'—'আত্মন' বলে প্রতিভাত হয়, এ কবিতা সেই কালধারণার মুখে ছাই ঢেলে দেয়। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি—এই চক্রকার বিন্যাসকে যদি ঘড়িযন্ত্র তার টেকনোলজির ক্রমিকতা দিয়ে ব্যাখ্যা করে তাহলে গোল খাপে চৌকো দণ্ড যথাযথ প্রবেশের প্রচেষ্টার মতো আহাম্মকি ছাড়া আর কিছুই ঘটে না। সমস্যা 'আত্মন'এর নেই, প্রকৃত আত্মনের। কারণ সে জানে মাথার উপর জ্যেষ্ঠী তার আঁকশিপ্রতিম ল্যাজ আছড়ায় নিরন্তর। তার কোনো বিরাম নেই। বিরাম আছে 'সময়'কে মাপার টেকনোলজির নির্মাণে, 'ঐতিহাসিকতা' আছে। কিন্তু কবি জানেন যে 'ঐতিহাসিকতা' কবির মিত্র নয়, কবিতার মিত্র নয়। এন্‌লাইটেন্‌ড্ 'ইতিহাস' পুঁথি মানুষকে আত্মবিভ্রান্তির পথেই নিয়ে যায়। সে পেন্ডুলামের নীচস্থ পিনের বালির উপর দাগ কাটার ক্রিয়ায় মুগ্ধ হয়। পেন্ডুলামের গোলগম্ভীর নীচস্থ পিনের বালির উপর দাগ কাটার ক্রিয়ায় মুগ্ধ হয়। পেণ্ডুলামের গোলগম্ভীর বলটিতে আবিষ্ট হয়। তার স্ট্রিং-এর দোলনকেই 'সত্য' বলে জানেন। কিন্তু এই 'ইতিহাস'এর ক্রমিক ও চক্রমানতার বাইরে যে স্থির মহাসময়-এর কথা, যে শাশ্বত মহাকালের কথা গীতায় শ্রীহরি, *On History*-তে ফেরনন্দ্ ব্রদেল, তাঁর একাধিক গ্রন্থে উমবের্তো একো এবং সর্বোপরি বারংবার মিশেল ফুকো বলে গেছেন, তাকে উদ্ধার করতে পারেন কবিই। কারণ কবিতা আর চিত্রকলাই সেই art, যা প্রাত্যহিকতার ঐতিহাসিক বাচনকে ভাঙতে পারে, নির্মাণ করতে পারে, তার নিজস্ব বাচন, ব্যক্ত করতে পারে সেই পরম অব্যক্তকে যা এককালে রামপ্রসাদ করেছিলেন, ভারতচন্দ্র করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, জীবনানন্দ করেছিলেন এবং আজও কেউ কেউ পারেন। প্রকৃতই পারেন আত্মতত্ত্বকে বিবৃত করতে। এখানেই কবির প্রকৃত 'আত্মন', যেখানে ঘড়ি—টেকনোলজিক্যাল ঘড়ি বিকল, কেবল মহাকাব্য সত্য, জ্যেষ্ঠী সত্য, সত্য সেই পরম আধার, যা এই বিশ্বের দোলাচলকে ধরে আছে। মানুষ সেই 'আধার'এরই প্রতিরূপ। তাই 'কবিতা' আজও ঐশ্বরিক, সন্ত যোহন বর্ণিত সেই অখণ্ড বাণীরূপই কবিতা, যার মধ্য দিয়ে মানুষ অতিক্রম করতে পারে তার আপাত স্থানিকতাকে, অতিক্রম করতে পারে কালের খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন বোধকে, উদ্ধার করতে পারে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে 'আত্ম' এর অবস্থানের অর্থকে। এখানেই কবির সার্থকতা। কবিতার সার্থকতা। পাঠকেরও।

মিশেল ফুকো বা 'মানুষ'-এর অন্তর্ধান

অমল বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমানে পাশ্চাত্যের সর্বাধিক প্রভাবশালী ভাবুক মিশেল ফুকো, যাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি ইতিমধ্যেই বিপুল ও ক্রমবর্ধমান। বস্তুত, আন্তর্জাতিক প্রভাবে, একমাত্র জাক দেরিদা ছাড়া ফুকোর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ফুকোর খ্যাতি অবশ্য দেরিদার আগেই এসেছে— যেহেতু তিনি দেরিদার চেয়ে বয়সেও কিছু বড়ো—যখন ষাটের দশকে স্ট্রাকচারালিস্ট আন্দোলনের প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন তিনি। অবশ্য এ-গোষ্ঠীর সঙ্গে ফুকো পরবর্তীকালে আর কোনো সম্পর্ক রাখেননি। যাই হোক, প্রথমে দার্শনিকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কয়েকটি খবর।

জন্ম ১৯২৬-এ পশ্চিম ফ্রান্সের পোয়াতিয়ে (Poitiers) শহরে। সেখানেই বাল্য ও মাধ্যমিক শিক্ষা। ১৯৪৫-এ, যুদ্ধ থামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, প্যারিসে আসেন ও ভর্তি হন বিখ্যাত স্কুল 'লিসে অঁরী কাত্র'এ তার পরের বছর 'একল নর্মালে' দর্শন ও মনস্তত্ত্বের ছাত্র। কিছুদিন ফ্রান্সে, তারপর সুইডেন ও পোল্যান্ডে অধ্যাপনা। ১৯৬১-তে প্রকাশিত হয় তাঁর বিশাল ডক্টরাল থিসিস 'ধ্রুপদী যুগে উন্মাদনার ইতিহাস'। প্রায় রাতারাতি বইটি তাঁকে বিখ্যাত করে। তারপর একটানা অধ্যাপনা দেশে ও বিদেশে (ব্রেজিল, টিউনিসিয়া ও পরে জাপানে)। ১৯৬৯-এ প্যারিসের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কলেজ দ ফ্রান্সে যোগদান করেন 'চিন্তা পদ্ধতির ইতিহাস'এর অধ্যাপক হিসাবে। কলেজ দ ফ্রান্সে কোনো পরীক্ষা নেই; কোনো ডিগ্রি নেই। শুধু শোনার আনন্দে শ্রোতারা জমায়েত হন। ১৯৮৪-র ২৫ জুলাই মিশেল ফুকোর মৃত্যু ঘটে।

এটা অবিশ্বাস্য তত্রাচ সত্য যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই প্রভাবশালী দার্শনিকের প্রথম প্রামাণিক রচনা 'ধ্রুপদী যুগে উন্মাদনার ইতিহাস' (*Histoire de la folie a' l'age classique*)-এর কোনো পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি অনুবাদ নেই। অনুবাদ অবশ্যই আছে, কিন্তু তা সংক্ষিপ্ত।*

সাড়ে পাঁচশো পাতার (মূল ফরাসি সংস্করণে) এই বিপুল চিন্তাস্রোতকে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। উপরন্তু এটি ফুকোর সর্বশ্রেষ্ঠ বা ফুকোশীয় চিন্তার সর্বাপেক্ষা নির্দেশক রচনাও নয়, যদিও এটিকে বাদ দিলে ফুকো সম্পর্কে যে কোনো আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে।

* Michel Foucault : *Madness and Civilization : A History of Insanity in the Age of Reason* (Trans. R. Howard; New York. Random House. 1965.

ধ্রুপদী যুগ কী বস্তু? এ যুগের কী বৈশিষ্ট্য? সমগ্র সপ্তদশ শতককে ফরাসি ঐতিহাসিক ও ভাবুকরা আখ্যা দিয়েছেন *l'age classique*; কোনো কোনো ব্যক্তি এ যুগকে বলেন 'মহাশতাব্দী' বা *le grand siecle* । রেনেশাঁস শেষ হবার পর ও তার কেন্দ্র ইটালির সাংস্কৃতিক প্রাধান্য লোপ পাবার পর, ফ্রান্সে জন্ম নিল আধুনিক ইয়োরোপীয় দর্শন— যার মূল কাঠামো হল যুক্তি বা যুক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতিবদ্ধ আলোচনা বা বিশ্লেষণ। এই নতুন দার্শনিক পদ্ধতিকে ভূমিষ্ঠ করায় যাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক তিনি রনে দেকার্ত (René Descartes, 1596-1650)। দেকার্তের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রচনা 'পদ্ধতি প্রসঙ্গে ভাষণ' (*Discours de la méthode)* শুরু হচ্ছে এই প্রত্যয় দিয়ে : 'পৃথিবীতে শুভবুদ্ধিই একমাত্র বস্তু যা সমানভাবে (মানুষের মধ্যে) ভাগ হয়েছে' (Le bou sens est la chose du monde la mieux partagée)[১]। তাঁর অন্য আর একটি বিখ্যাত রচনা 'অনুধ্যান' (*Meditations)*। এটি ল্যাটিনে লেখা। এতে দেকার্ত উন্মাদনাকে স্বপ্ন বা অন্য সর্বপ্রকার প্রমাদের সঙ্গে এক করেছেন। যেহেতু চিন্তা ও যুক্তি, দেকার্তের মতে, এক ও অভেদ, উন্মাদনায় চিন্তার অস্তিত্ব তথা যুক্তিনির্ভর সত্যের সন্ধান অসম্ভব। প্রথমত, এ প্রত্যয় ঠিক নয় যে শুভবুদ্ধি (যার অর্থ এখানে যুক্তি) সব মানুষের সমান। কারণ, সমাজে চিরকালই কিছু লোক ছিল, আছে বা থাকবে যারা যুক্তির এই বাঁটোয়ারা থেকে বাদ পড়েছে। এরা অবশ্য কেউই অন্ধ নয়, কিন্তু এরা রাত্রির মানুষ; এদের অনাবাদী চৈতন্যে কখনও সূর্যোদয় হয় না; এদের ভাষা কোনো সুনির্দিষ্ট চিন্তার বাহক নয়। এরা থাকে সীমান্তের ওদিকে এবং আমরা যারা এদিকে আছি বা আছি বলে মনে করি, আমরা তাদের আখ্যা দিই ব্যাক্ষিপ্ত উন্মাদ কিংবা পাগল।

ফুকোর এই বিশাল গ্রন্থ ওই উন্মাদদের বিষয়ে। কিন্তু এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে উন্মাদনা কী, বা তার প্রতিকার ইত্যাদি এ রচনার মূল সমস্যা নয়। সপ্তদশ শতক বা যুক্তির যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা কীভাবে এই উন্মাদদের সঙ্গে ব্যবহার করেছে এবং কীভাবে এই ব্যবহার ও প্রতিন্যাস (attitude)-এর আকৃতি ও কাঠামো বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থার চাপে সময়ে সময়ে বদলেছে এবং এই রূপান্তরের অন্তর্নিহিত অর্থই বা কী— এগুলোই ফুকোর মূল অন্বেষণের বিষয়। এ বই যখন লিখিত হয় তখনও পর্যন্ত ফুকো ঐতিহাসিক ঘটনার পশ্চাতে কোনো অন্তর্নিহিত অর্থের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। পরে অবশ্য তিনি এ বিশ্বাসে ছিন্নমূল হন। সে প্রসঙ্গ পরে আলোচ্য।

তাঁর মূল আলোচনার শুরুতেই— এবং মূল আলোচনা শুরু হচ্ছে ফরাসি সংস্করণের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে— দেকার্তের *Meditations*-এর কিছু পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করে এটা দেখিয়েছেন যে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক ও ধ্রুপদী যুগের মহাঋত্বিক এটা ধরে নিয়েছিলেন যে শুদ্ধ যুক্তি-নির্ভর চিন্তা ও সত্যোপলব্ধি থেকে উন্মাদনা সম্পূর্ণ পৃথক ও সরাসরিভাবে বিপরীত। অর্থাৎ যাকে দর্শনশাস্ত্রে বলা হয় 'অন্যত্ব' বা alterity, তা

যুক্তির পরিমণ্ডলে প্রথম প্রবিষ্ট হল। পাশ্চাত্য যুক্তি, জ্ঞান এগুলো ঠিক সেই যুগ থেকে এক ও অভেদ হয়ে দাঁড়াল; বা পাশ্চাত্য এমন এক সভ্যতা বা জ্ঞানচর্চায় লিপ্ত হল যার মধ্যে অযুক্তি বা অন্ধকারের আর কোনো স্থান রইল না। ওই ধারণারই প্রসার ও প্রভাব পাশ্চাত্য চিন্তায় এখনও প্রবল। বস্তুত, ব্যাপারটা আগে ঠিক এরকম ছিল না। মধ্যযুগে তো বটেই, এমনকি রেনেশাঁস আমলেও যুক্তি ও অযুক্তির, স্বাভাবিক ও উন্মাদদের সহবাস সম্ভব ছিল; ছিল অযুক্তি বা উন্মাদনার একটি নিজস্ব তাৎপর্য। যদিও ওই যুগেও উন্মাদনার সঙ্গে পাপ (le mal) ছিল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তথাপি উন্মাদনা আবির্ভূত হত কোনো গুহ্য জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে, কোনো লোকোত্তর আলোর অধিকারী হিসাবে; এঁদের মধ্যে অনেকে দেখতেন, যাকে ফুকো বলছেন, 'কাল্পনিক উত্তরণ' (des transcendances imaginaires)। এটা অবশ্য ইয়োরোপের বৈশিষ্ট্য নয়। কারণ আমাদের দেশেও এক তান্ত্রিক কবি গেয়েছিলেন 'আমি পাগল মায়ের পাগল ছেলে'। এখানে পাগলামি অসুস্থতা নয়; উত্তরিত হয়ে জননীর সঙ্গে একাত্মভূত হওয়ার এক মাধ্যম মাত্র।

ধ্রুপদী যুগ আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা আমূল বদলাতে শুরু করে। মধ্যযুগে ইয়োরোপের সর্বত্র ছিল কুষ্ঠাশ্রম (leprosium); ওই যুগ শেষ হবার পর থেকেই কুষ্ঠরোগ অদৃশ্য হতে শুরু করে। যে বাড়িগুলিতে কুষ্ঠরোগীদের পৃথক রাখা হত সেগুলি সপ্তদশ শতকে আর খালি পড়ে রইল না। পৃথকীকরণ বা অন্তরণের কাঠামো আবার ফিরে এল, যখন উন্মাদদের আলাদা করে রাখা হল নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে, পুরোনো কুষ্ঠাশ্রম বা নবনির্মিত কোনো বাড়িতে। কিন্তু যেটা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য সেটা এই যে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে—১৬৫৭-র রাজাজ্ঞায়— এই ধৃত ও অন্তরীণ ব্যক্তিদের মধ্যে সকলেই উন্মাদ ছিলেন না; এঁদের মধ্যে ছিলেন বহু দরিদ্র, ভিখারি, ভবঘুরে, নিষ্কর্মা, ছোটোখাটো অপরাধী, লম্পট, যাদের পানাসক্তি অনারোগ্য, এমনকি নাস্তিক ও ঈশ্বরবিরোধী বা blaspheme-বৃন্দ। এই বিচিত্র সংমিশ্রণ, ফুকোর মতে, বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। একাধারে বিদ্রোহী, বিপ্রলব্ধ মানুষের ঝাঁক ও অন্যধারে অযুক্তির প্রতিরূপ রাশি রাশি উন্মাদ বা মানুষী জঞ্জাল—এ দুই-ই ছিল যুক্তি তথা হিউম্যানিস্টদের চোখে এক নিদারুণ লজ্জা। অতএব তাকে চোখের আড়ালে রাখার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। কারণ, 'অন্তরণ গোপন রাখে অযুক্তিকে আর প্রকাশ করে লজ্জাকে, যা আসে অযুক্তি থেকে' (L'internement cache la déraison, et trahit la honte qu'elle suscite)[২]।

অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকেই এই মিশ্রিত মানুষদের ব্যবহৃত বাড়িগুলো এক প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে ওঠে। কারণ, নানাবিধ কলরব ও ঘুঁষোঘুঁষি তো আছেই এবং আরও আছে উন্মাদদের অহোরাত্র অরুন্তুদ হাহাকার। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল কোনো সংক্রামক ব্যাধির ভয়, যা যেকোনো মুহূর্তে সর্বগ্রাসী মড়কের আকার নিতে পারে। এতাদৃশ ব্যাধি ইতিমধ্যেই কিছু দেখা দিয়েছিল। ফলত, আবির্ভূত হল দুই

ধরনের মানুষ; সংস্কারক ও চিকিৎসক। একথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে রোগ বা তার চিকিৎসা, বিজ্ঞানের প্রগতি বা মানবপ্রেমের প্রসার, এগুলো একেবারেই ফুকোর আলোচ্য বিষয় নয়। বরং তার উলটোটাই, অর্থাৎ কীভাবে চিকিৎসা তথা উপচিকীর্ষার আড়ালে সামাজিক স্বার্থসিদ্ধি ও ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থাকে দৃঢ় করা হয়েছিল, সেটাই ফুকোর অন্যতম প্রতিপাদ্য। আগের যুগের কুষ্ঠের মতো, উন্মাদনা এমন এক রহস্যময় ভীতির সঞ্চার করেছিল যুক্তির সেই মহাশতাব্দীতে যে 'চিকিৎসক' নামে এক প্রাণীর আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি, ফরাসি বিপ্লবের কিছু আগেই, উন্মাদদের পৃথক করে ফেলার ব্যবস্থা নেওয়া হয় ওই মিশ্রিত ভিড় থেকে। ফুকো এটা মানতে রাজি নন যে কোনো হিউম্যানিটারিয়ান বা মানবপ্রেমের প্রেরণা থেকে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ফুকোর রচনায় মানবপ্রেমীরা— অর্থাৎ যাঁদের হৃদয় অন্যের দুঃখে আবেগের রসায়নে দ্রব হয়ে ওঠে— অদৃশ্য। ওই মিশ্রিত শৃঙ্খলিত মানুষদের পৃথক করে দেওয়ার দুটি কারণ ফুকো দিচ্ছেন। ওই মানুষদের মধ্যে ছিলেন বেশ কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দি, যাঁদের মধ্যে অনেকেই অভিজাত বাড়ির ছেলে এবং কিছু বুদ্ধিজীবী; এঁরা দাবি করেন উন্মাদদের থেকে এঁদের আলাদা করে দেবার জন্য। কিন্তু আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণও ছিল। দারিদ্র্য বা কর্মহীনতা, যা কিছুদিন আগেও ছিল নৈতিক পতন ও লজ্জার প্রতীক, এখন সেটা হয়ে দাঁড়াল অর্থনৈতিক লাভের একটি উপায়। দরিদ্রকে অল্প বা নামমাত্র বেতনের শ্রমিকে রূপান্তরিত করা রীতিমতো লাভজনক, সুতরাং আর প্রয়োজন নেই তাদের রুদ্ধ রাখার। পাগলরা কিন্তু স্বস্থানে রয়ে গেল। ইতিমধ্যে ১৭৮৯-র বিখ্যাত ফরাসি বিপ্লব এসে গেছে। মৈত্রী, স্বাধীনতা আর সাম্যের সমন্বিত নিনাদে নিখিল বিশ্ব তখন কম্পমান, আর সেই বিপ্লবকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে এসেছে 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' ও রক্তস্রোত। জল্লাদদের প্রাপ্য ছুটি বাতিল হয়েছে, কিন্তু তখনও চলছে শিকল ভাঙার মহোৎসব। উন্মাদরা ইতিমধ্যে পৃথক হয়েছে; এখন প্রয়োজন তাদের কোমরের শিকল ও পায়ের বেড়ি খুলে দেওয়ার। এরই ফলে জন্ম নিল এক নতুন সামাজিক সংস্থা। এর নাম উন্মাদ-আশ্রম। এই বিপুল গ্রন্থের শেষাংশে এক দীর্ঘ পরিচ্ছেদে— শিরোনাম 'উন্মাদ-আশ্রমের জন্ম' (Naissance de l'asile)—বিস্তারিত আলোচনা করে ফুকো দেখিয়েছেন যে এই মানবপ্রেমের ছদ্মবেশে সামাজিক স্বার্থসিদ্ধির কী ভূমিকা ছিল।

দুজন ব্যক্তি বা তাঁদের প্রয়াসের দীর্ঘ আলোচনা এই পরিচ্ছেদের মূল অংশ। এঁদের মধ্যে একজন সংস্কারক, ইংরেজ কোয়েকার (Quaker), স্যামুয়েল টিউক (Tuke) ও অন্যজন ফরাসি চিকিৎসক পিনেল (Pinel)। প্রথমে কোয়েকার টিউকের প্রসঙ্গে আসা যাক। এই ব্যক্তি ১৭৯৩ নাগাদ উত্তর ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারে 'দা রিট্রিট' নামে একটি উন্মাদ-আশ্রম স্থাপন করেন, উন্মাদদের সংস্কার ও আরোগ্যের জন্য। প্রথমে তাদের শিকলমুক্ত করে, তাদের প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশের মধ্যে রেখে মানবোচিত ব্যবহার ও হার্দ্যতার সাহায্যে কাজে নামলেন তিনি। কিন্তু ফুকোর মতে, এ প্রচেষ্টার পিছনে ছিল

একটি নবজাত রূপকথা, যার থেকে জন্ম নিল উনিশ শতকের মনোচিকিৎসার* পদ্ধতি। সে রূপকথাটি এই যে উন্মাদদের অন্তস্তলে কিছুটা যুক্তি ও শুভবুদ্ধির তলানি এখনও রয়ে গেছে, যাকে ফিরিয়ে এনে সক্রিয় করার জন্য প্রয়োজন একটি পারিবারিক পরিবেশের— যেখানে উন্মাদরা হবে 'আদিভূত আদর্শে গড়া পরিবারের শিশু' (ils seront les enfants de la famille dans son idealtié primitive. প্রাগুক্ত ফরাসি সংস্করণ, পৃ. ৪৯৪)। অর্থাৎ উন্মাদরা যুক্তির পুনরুজ্জীবনে স্বাধীন ও প্রাপ্তবয়স্ক হবে না; তারা শিশুই থাকবে বয়স্ক প্রহরী, শাসক ও সংস্কারকদের আজ্ঞাবহ হয়ে। ইয়র্কশায়ারের এই শান্ত শ্যামল ইউটোপিয়ার ভিত্তিতে ছিল, ফুকোর মতে, এক মনগড়া প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব বা ডায়ালেকটিক্স— কিন্তু ছিল না রোগের কোনো নিরপেক্ষ অন্বেষণ। এবং এই ইউটোপিয়া, যা গড়ে উঠেছিল সাধারণের চাঁদায় ও রোগীদের আত্মীয়দের খরচে, তার লাভের অংশটা নগণ্য ছিল না। ১৭৯৮ থেকে ১৮০৫ পর্যন্ত 'দা রিট্রিট'এর অংশীদারদের কতটা মুনাফা হয় তারও হিসেব ফুকো দিয়েছেন এ প্রসঙ্গে।

পিনেল ধর্মভীরু কোয়েকার ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক। বিসেত্র্ (Bicetre)-এ উন্মাদ-আশ্রমে তিনিও রোগীদের শিকলমুক্ত করেন। দুটি 'কেস' বা আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীর কথা এখানে আলোচিত হয়েছে। প্রথম জন এক ইংরেজ নৌ-ক্যাপ্টেন। এই বদ্ধ উন্মাদ এক এক সময় এমনই হিংস্র হয়ে উঠতেন যে একদিন তাঁর দুই হাতকড়াবদ্ধ হাতে একটি লোককে খুন করে ফেলেন। একটানা সদুপদেশ ও সখ্যতার সাহায্যে পিনেল এ ব্যক্তিকে নিরাময় করে তোলেন। ওই ক্যাপ্টেন আরোগ্যলাভের পর শিকলমুক্ত ও স্বাভাবিক তো হলেনই, এমনকি বিসেত্র্-এর পরিচালনায় সক্রিয় অংশ নিলেন অন্য উন্মাদদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। ফুকোর মতে এই ব্যক্তি আরোগ্যপ্রাপ্তির পর একজন সুস্থ, স্বাধীন মানুষ না হয়ে হলেন একটি সামাজিক টাইপ। 'শিকল পাগলকে যে-পশুত্বে বাধ্য করেছিল তা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের মধ্যে ফিরে এলেন শুধু একটি সামাজিক টাইপ হয়ে।' (পৃ.৪৯৮)।

আর একটি রোগমুক্ত উন্মাদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। শভ্যাঁজে নামে এক ফরাসি সৈনিক অতিরিক্ত মদ্যপানে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে আটক ছিলেন বিসেত্র্-এ। এঁকেও স্বাভাবিক করেন পিনেল। কিন্তু কী অর্থে স্বাভাবিক? নিরাময় হওয়ার পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যক্তি পিনেলের বশংবদ ভৃত্য হয়ে ওঠেন। এমনকি, প্রভুকে রক্ষা করার জন্য এ ব্যক্তি তার নিজের দেহকেও বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। 'শভ্যাঁজে যুক্তিশীল মানুষ হননি; হয়েছিলেন চাকর' ('Chevingé ne redevient pas homme raisonable, mais serviteur.' পৃ. ৪৯৯।) অর্থাৎ রোগী-চিকিৎসক সম্পর্ক এখানে স্বাভাবিক নয়। যদিও শভ্যাঁজে ও তাঁর চিকিৎসক উভয়েই শ্বেতাঙ্গ, ফুকো এই দুইয়ের সম্পর্ককে তুলনা

* শব্দটিকে সচেতনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্র. প্রবন্ধ 'মনোচিকিৎসা', ছন্দক সেনগুপ্ত; *এক্ষণ*, শারদীয় ১৩৯৪। স. এ.।

করেছেন নিঃসঙ্গ দ্বীপে বিচ্ছিন্ন শ্বেতাঙ্গ রবিনসন ক্রুশো ও তার কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্য ফ্রাইডের সম্পর্কের সঙ্গে। এখানে এটা উল্লেখ্য যে উত্তর আধুনিক (post-modern) চিন্তায় ডিফোর ওই বিখ্যাত ও পৃথিবীর প্রথম পুঁজিবাদী উপন্যাসটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। এর পুঁজিবাদী দিক বহু আলোচিত; এমনকি মাত্র কিছুদিন আগে ফরাসি টেলিভিশনের জন্য তোলা এর চিত্ররূপে এর অর্থনৈতিক বক্তব্যকে নির্মমভাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু উত্তর-আধুনিক চিন্তায় মূল উৎসাহের কেন্দ্র রবিনসন-ফ্রাইডের জটিল সম্পর্ক। এই কাহিনি নতুন করে লিখেছেন ফ্রান্সের জীবিত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত, মিশেল তুর্নিয়ে; একে নতুন করে লিখেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার শক্তিশালী শ্বেতাঙ্গ লেখক জে. এম. কোয়েটৎসে। 'রবিনসন ক্রুশো' নির্দোষ, শিশুভোজ্য আনন্দনাড়ু নয়। ক্ষমতার কাঠামো (power-structure) বা অন্যকে দমনেচ্ছা, যা মিশেল ফুকোর পরবর্তী চিন্তার প্রধান বক্তব্য, তা ওই আপাত-রোমাঞ্চকর উপাখ্যানের আড়ালে লুকিয়ে আছে এবং এটা ফুকো-ই প্রথম ধরেছিলেন।

টিউক কিংবা পিনেল কোনো বিজ্ঞানের জন্ম দেননি। ফুকোর মতে তাঁরা একটি নতুন পাত্র বা চরিত্রকে হাজির করেছিলেন— ডাক্তার বা মনোচিকিৎসক, যিনি তাঁর জ্ঞানলিপ্সা বা জ্ঞানের এষণা অর্থাৎ will to knowledge-এর মুখোশের আড়ালে সমাজের ক্ষমতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। কিন্তু কেন এই ক্ষমতা এবং এর প্রয়োগের কী প্রয়োজন? যুক্তির যুগে যখন যুক্তিই একমাত্র ধ্রুব, তখন যাঁরাই এই যুক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন সমাজের কিনারায় চলে গিয়ে এবং যুক্তির সার্বভৌম প্রাধান্যকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে— ঠিক যেমন কিছু লোক সামাজিক 'টাইপ' হতে রাজি না হয়ে আইনভঙ্গকারী, অসামাজিক প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত হন— তাঁদের শুধু সমাজের কিনারায় রাখলেই চলে না, তাঁদের দমনের জন্য ও যুক্তির স্বরাটত্ব প্রমাণের জন্য প্রয়োজন একটি আপাত-বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও চিকিৎসাপ্রণালীর। এবং এই প্রয়োজনের চাপে জন্ম নিয়েছিল মনোচিকিৎসা, অপরাধবিজ্ঞান ইত্যাদি। অযুক্তিকে ক্ষমতার সাহায্যে আয়ত্তে আনার জন্য প্রথমেই যেটা অতি আবশ্যকীয় তা হল অযুক্তিকে অসুস্থতা বা রোগ হিসাবে ঘোষণা করা।

এই সংকল্প চরম রূপ নিয়েছে ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতিতে। যদিও এক অর্থে ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি অংশত বৈজ্ঞানিক, কারণ তিনি প্রথম রোগীকে বিশ্লেষণকালে বাঙ্ময় করেন— কিন্তু ক্ষমতার কাঠামো এতে কিছুই বদলায়নি, বরং তা আরও বিস্তৃত হয়েছে। কারণ, 'মনঃসমীক্ষকের যাদুকরী গুণকে উনি আরও বর্ধিত করেন' (Il a amplifié ses vertus thaumaturges, ফরাসি সং; পৃ.৫২৯)। ফুকোর এই বই প্রকাশ হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক মনোবিশ্লেষক নিজেদের পেশা ও পদ্ধতির কার্যকরতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন। ঠিক কতজন নারীপুরুষ আজ পর্যন্ত ফ্রয়েডীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেছেন এবং যাঁরা সত্যই রোগমুক্ত হয়েছেন তাঁদের ওই মানসিক পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে— অর্থাৎ বিনা চিকিৎসায় হতে পারত কি না,

সে সম্পর্কে প্রশ্ন অবশ্য ফুকোর আগেই উঠতে শুরু হয়েছিল।

'ধ্রুপদী যুগে উন্মাদনার ইতিহাস' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যে রীতিমতো আলোড়ন হয়েছিল। বিশেষত সমাজতাত্ত্বিকরা বইটিকে দু-হাতে লুফে নেন। বোধহয় তাঁরা সুকুমার রায়ের 'গোষ্ঠমামা'র মতো 'বাগিয়ে ধামা' অপেক্ষায় ছিলেন কখন ওই পাখিটি পড়বে। 'পড়, পড়, পড়, পড়বি পাখী ধপ্', এবং পাখি পড়েও ছিল ওঁদের ধামায়। বহুদিনের গবেষণালব্ধ তথ্যে সমৃদ্ধ তথা বহুবিধ চিন্তার সঞ্চারে গর্ভিণী এইরূপ বিশাল একটি বই পেলে কোন সমাজতাত্ত্বিকই বা উল্লসিত না হবেন?

কিন্তু ওঁদের উল্লাস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ফুকোর পরবর্তী রচনাগুলি প্রকাশিত হলে এঁদের অনেকেরই মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে শুরু করে এবং রবাহূত যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের অনেকেই আস্তে আস্তে কেটে পড়তে শুরু করেন। প্রচলিত অর্থে ফুকো সমাজতাত্ত্বিক নন। ফুকোশীয় দর্শনে মূল সমস্যাটি অস্তিত্বের, যদিও 'অস্তিত্বকেন্দ্রিক' শব্দটি এখানে অপ্রযোজ্য, কারণ অস্তিত্বের কোনো কেন্দ্র আছে এ ধারণায় ফুকো অবিশ্বাসী। জাক দেরিদার মতো মিশেল ফুকো-ও এসেছিলেন যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের অস্তিবাদী পটভূমিকা থেকে। যদিও ফুকোর প্রথম হাতে খড়ি হয় নব্য-কান্টীয় (Neo-Kantian)-দের টোলে, সেই হেতু সমাজতত্ত্বের জনক ম্যাক্স ভেবার (Max Weber) প্রমুখ নব্য-কান্টীয়দের সঙ্গে তাঁর সামান্য সাদৃশ্য দেখা যেতে পারে— কিন্তু সেটা খুবই বাহ্যিক।

আমরা যাকে প্রাতিস্বিকতা বলতে অভ্যস্ত, যাকে আমরা ধরে নিই মানুষের অনড়, ধ্রুব চরিত্র বলে, সেটি মূলত কিছু সামাজিক ও নৈতিক বিধিনিষেধের প্রত্যাদেশে আমাদের উপর আরোপিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে, একজন সামাজিক প্রাণী তার নিজের কাছে বিদেশি ও বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ (alienation)-এর চিন্তা যা পাশ্চাত্যের আধুনিক, উত্তর-হাইদেগারীয় চিন্তাকে চরিত্রায়িত করেছে, তা থেকে ফুকোর এই প্রথম, গুরুত্বপূর্ণ, রচনাটি একেবারেই মুক্ত নয়। উন্মাদনা এমন এক মানসিক অবস্থা যা মানুষকে আক্ষরিক অর্থে সত্তার মুখোমুখি এনে দেয়। সত্তা যেখানে শূন্য, নিরালম্ব, কেন্দ্রহীন, সেখানে উন্মাদদের কোনো নিজস্ব চরিত্র নেই; তাদের ভাষায় নেই সমাজে ব্যবহৃত যুক্তির শৃঙ্খলা এবং তাদের ক্রিয়াকর্ম উদ্দেশ্যহীন। উন্মাদনার প্রতি ফুকোর এই আকর্ষণ সে ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ।

'উন্মাদনার ইতিহাস'এর (মূল ফরাসি সংস্করণে) তৃতীয় খণ্ডের শুরুতে ফুকো এই বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণ দার্শনিকভাবে আলোচনা করেছেন দিদেরো-র মৃত্যুহীন রচনা 'রামোর ভাইপো' (*Le Neveu de Rameau*) পাঠের মধ্য দিয়ে। দেনি দিদেরোর (Denis Diderot) ওই রচনাটির কোনো তুলনা নেই। বিশ্বসাহিত্যের বাজারে আমি সর্বত্রগামী এমন ভান অবশ্যই করতে পারি না, কিন্তু আমার জানা কোনো ভাষায় এমন কোনো রচনা নেই যার সঙ্গে 'রামোর ভাইপো'র ন্যূনতম সাদৃশ্য আছে। একাধারে ফরাসি মননশীলতার তীক্ষ্ণতা ও অন্যধারে দিদেরোর ভাস্বর প্রতিভা, এই দুইয়ের সন্নিপাতে এ এক আশ্চর্য রচনা। এবং এটাও এখানে বিশেষভাবে উচ্চার্য যে ফুকোর বিশিষ্ট ফরাসি

বা মার্কিন বা ইংরেজ টীকাকারেরা— অন্তত যে কয়জনের ভাষ্য আমি দেখেছি— সকলেই এই মূল্যবান আলোচনাটিকে অগ্রাহ্য করেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম মার্কিন বুদ্ধিজীবী ও ফরাসি সাহিত্যের অধ্যাপক কার্লিস রাসেভ্স্কিস যিনি খুবই সম্প্রতি, মাত্র গত বছরে প্রকাশিত, একটি প্রবন্ধে ফুকোর দিদেরো পাঠের উপর একটি আলোচনা করেছেন[৩]। আলোচনাটি খুবই মনোজ্ঞ, কিন্তু তিনিও ফুকো ও হেগেলের দিদেরো পাঠের মধ্যেকার পার্থক্য ও বৈপরীত্য সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেননি বা করার প্রয়োজন দেখেননি।

জাঁ-ফিলিপ রামো (Jean-Phillippe Rameau, 1683-1764) ছিলেন অষ্টাদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ফরাসি সংগীতজ্ঞ। ইনি ছিলেন একাধারে গায়ক ও বিভিন্ন গীতিনাট্যের লেখক, অন্যধারে সংগীতের তত্ত্বে সুপণ্ডিত। এঁর সংগীত-প্রতিভা উঠেছিল কিংবদন্তির পর্যায়ে। এঁর ভাইপো জাঁ-ফ্রাঁসোয়া (Jean-Francois) রামো ছিলেন সর্বতোভাবে বিপরীত চরিত্র। ইনি ভবঘুরে, নিষ্কর্মা, চরিত্র-ভ্রষ্ট, খিস্তি-ভাষী, পরান্নভোজী— যাঁর একমাত্র প্রাত্যহিক কাজ ছিল প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো এবং মধ্যাহ্ন বা সান্ধ্য ভোজের একটু আগে কোনো সম্পন্ন ব্যক্তির বাড়িতে হাজির হওয়া আহারের সন্ধানে এবং তার জন্য ইনি যেকোনো ভাঁড়ামি করতে প্রস্তুত ছিলেন। একটি উন্মাদ ব্যক্তি। এঁকে দিদেরো চিনতেন। এঁরই সঙ্গে দিদেরোর কোনো এক সন্ধ্যার কথোপকথন বর্ণনা—যে বর্ণনা হয়তো বহুলাংশে কাল্পনিক—হল 'রামোর ভাইপো'র সারাংশ। দিদোরা-র কাছে ভাইপো জাঁ ফ্রাঁসোয়ার প্রধান মূল্য এই যে এ-ব্যক্তি সমাজের সব প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এই অর্থে যে এঁর কোনো নিজস্ব চরিত্র, কোনো প্রাতিস্বিক সত্তা নেই। ইনি কখনো উন্মাদ, কখনো ভাঁড়, কখনো দার্শনিক, কখনো গায়ক কিংবা অভিনেতা, কখনো প্রগল্ভ, কখনো মৌন। এককথায়, কোনো সামাজিক বা নৈতিক ছাঁচে এঁর জীবন প্রবাহিত নয়। এবং সমাজে যাঁরা তথাকথিত সম্মানিত, শক্তিশালী ও প্রভাবশালী তাঁদের প্রতি এঁর গভীর অনুকম্পা; এঁর ধারণা আমরা যাকে ভালোমন্দ বা পাপপুণ্য বলতে অভ্যস্ত সেগুলো মূলত ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা লাভক্ষতির হিসাবের ফল। দিদেরোর এই রচনাটির মধ্য মিশেল ফুকো দেখেছেন 'অযুক্তির প্রচণ্ড শক্তি' (les profonds pouvoir la de déraison)। অবশ্য এই রচনার অন্য দার্শনিক-পাঠও সম্ভব।

১৮০৫-এ দিদেরোর এই রচনার জার্মান অনুবাদ করেন স্বয়ং গ্যোয়টে। ওই বছরেই ওই গ্যোয়টেরই সুপারিশে হেগেল সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন ইয়েনা (Jena) বিশ্ববিদ্যালয়ে। দিদেরোর এই লেখাটি অতিশয় যত্নসহকারে পড়ে হেগেল নিজস্ব পদ্ধতিতে তাঁর ব্যাখ্যা দেন তাঁর 'দা ফেনোমেনোলজি অফ মাইন্ড'এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, যেখানে আলোচ্যবস্তু নৈতিক জগৎ (The Ethical World), অভেদ (Identity) ও নির্ভেদ (Difference) এবং পরম সত্তা (Spirit) কীভাবে বিচ্ছিন্নতা (alienation)-র মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। হেগেলের দিদেরো-পাঠ বহু অর্থে মূল্যবান, এমনকি আমরা যারা হেগেলীয় হবার সম্মান দাবি করি না তাঁদের কাছেও। হেগেলীয় চিন্তায়, তথা দিদেরোর মূল রচনায়, ব্যাপারটা ঘটেছে প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সে, সেই 'পুরোনো আমল' (ancient

régime)-এ, যখন এক অনাচারী অবক্ষয়ী সমাজ, সংস্কৃতির চরমে উঠেও, তার নিজের অভ্যন্তরীণ পচনকে রোধ করতে পারেনি। এখানে হেগেলের পরম সত্তা অর্থ ও অর্থজাত শক্তির মধ্যে অন্যত্বে রূপান্তরিত (alienated) এবং যেখানে মহান-চৈতন্য নীচ-চৈতন্যের পার্থক্য লুপ্ত। এই পচনশীল সমাজে মহান-চৈতন্য অর্থের বলে উদ্ধত দাতা ও মহত্ত্ব-বর্জিত, কিন্তু নীচ-চৈতন্য যে প্রাপক সে ক্ষণিকের আত্মসচেতনতায় মহত্ত্বে উন্নীত।

বলা বাহুল্য, হেগেলীয় চিন্তায় পরম সত্তার এই বিকলন একেবারেই সাময়িক ব্যাপার; একটি বিশেষ যুগের বিশেষ অবক্ষয়ের চিহ্নমাত্র। ইতিহাসের অন্তর্নিহিত ডায়ালেকটিক্স বা দ্বন্দ্বের ক্রমিক অগ্রগতিতে যুক্তি টেনে নেয় অযুক্তিকে, তার 'আউফহেবুং'-এর মধ্য দিয়ে। এখানে আউফহেবুং (Aufhebung)-এর অর্থ বিপরীতকে গ্রাস করে আরও উন্নত অবস্থায় উত্তরণ (transcendence)। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত যুক্তি বা পরম সত্তারই জিৎ অযুক্তির অস্তিত্বকে ধ্বংস করে। এই চতুর, মিহি সুতোর মিস্টিসিজ্‌মের সঙ্গে ফুকোর চিন্তার কণামাত্র সাদৃশ্য নেই। ফুকো যেটা দেখাতে সচেষ্ট সেটা এই যে যুক্তি অযুক্তিকে রেখেছে সমাজের কিনারায়, শেষ সীমান্তে এবং তাকে প্রতি মুহূর্তে দমন করছে তার সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয়ের অছিলায়। অর্থাৎ অযুক্তি বা উন্মাদনা যা যুক্তি নয়, তাকে শাসিত করার সর্বাপেক্ষা কার্যকর পদ্ধতি তার চরিত্র নির্ণয় করা। এই পদ্ধতির একদিকে আছে বর্জনের রাজনীতি (politics of exclusion) আর অন্যদিকে আছে জ্ঞান ও শক্তির অভেদ।

ফুকোর ইতিহাস-চিন্তায় ডায়ালেকটিক্সের লীলা নেই। এই চিন্তায় জীবন ও সমাজের সব অভিজ্ঞতা বা সব উপাদান ঐতিহাসিক নিয়তির জাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট নয়। ফুকোর এই বৈশিষ্ট্য মনে রাখলে, পরে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে কেন তিনি মার্কসবাদের এত কাছে আসা সত্ত্বেও ওই মতবাদ ও চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পারেননি। এটা অবশ্যই সত্য যে হেগেলীয় মিস্টিসিজ্‌মের কণামাত্রও মার্কসবাদে নেই, কিন্তু ঐতিহাসিক নিয়তি ও ডায়ালেকটিক্সের ক্রমিক গতি সেখানেও মূল্যবান ভূমিকা নিয়েছে।

এ-ব্যাপারে ফুকো নিঃসন্দেহ যে যেখানে আছে দমন বা দমনেচ্ছা সেখানেই থাকবে প্রতিরোধ বা resistence। অষ্টাদশ শতকের যুক্তি-ভজনার প্রথম বিষক্রিয়া উনিশ ও বিশ শতকের যুক্তি-বিরোধিতায়। কবি হোয়েল্ডারলিন ও দার্শনিক ফ্রিডরিশ নীচএ থেকে শুরু করে এ যুগের আঁতোয়ান আর্তো কিংবা রেমঁ রুসেল পর্যন্ত—এঁরা অনেকেই আক্ষরিক অর্থে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন— একটানা এসেছে যুক্তি ও তার বৈধ সন্তান পজিটিভিজ্‌মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। 'উন্মাদনার ইতিহাস' হয়তো ফুকোর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা নয়, কিন্তু সাম্প্রতিক যুদ্ধোত্তর চিন্তার ইতিহাসে এটি একটি অবিস্মরণীয় রচনা হয়ে থাকবে।

এই রচনা প্রকাশের দু-বছর পরে ফুকো লেখেন 'হাসপাতালের জন্ম' (*La Naissance de clinique*)। কিন্তু প্রবন্ধের ক্ষেত্র সীমিত থাকার ফলে ওই গ্রন্থের আলোচনা আমরা পরিহার করছি; তাছাড়া, এর মধ্যেকার মূল্যবান বক্তব্যগুলির দু-একটি আরও

বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে ফুকোর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ রচনা 'নজর ও শাস্তি'র (*Surveiller et Punir*) মধ্যে, যা পরে আলোচ্য।

হেগেলের চিন্তার সঙ্গে ফুকোর ব্যবধান যে দুরতিক্রম্য তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে তাঁদের দুজনের দিদেরো-পাঠের বৈপরীত্যে। এই বৈপরীত্য আরও বেশি প্রকট হল ফুকোর আর একটি সাড়া তোলা রচনা 'শব্দরা আর বস্তুরা' (*Les Mots et les Choses*)-র মধ্যে। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে এবং এর ইংরেজি অনুবাদ ১৯৭১-এ।* এর সহ-শিরোনাম 'মানবীয়-বিজ্ঞানের একটি প্রত্নতত্ত্ব' (Une archéologié des sciences humaines)। এখানে এটা উল্লেখ্য যে এখানে sciences শব্দের অর্থ প্রচলিত অর্থে শুদ্ধ বিজ্ঞান নয়। এটা, আমরা যাকে বলি আর্টস, অর্থাৎ ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি।

'উন্মাদনার ইতিহাস'-এ গৃহীত পদ্ধতি ছিল উন্মাদ বা উন্মাদনার প্রতি সমাজের প্রতিক্রিয়া ও তার অন্তর্নিহিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য। এক কথায় বইটি ঐতিহ্যাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের কাছাকাছি। কিন্তু এ-পদ্ধতি ফুকো সর্বাংশে পরিত্যাগ করেন তাঁর এই নতুন বইটিতে। এখানে তাঁর আলোচ্য বস্তু গত চারশো বছরের ইউরোপীয় চিন্তার ইতিহাস, যে-ইতিহাস একাধিকভাবে ফুকোর কাছে ব্যর্থতার ইতিহাস। এই ইতিহাসের সামাজিক বা অর্থনৈতিক তাৎপর্য কী সে-প্রশ্নে ফুকো অনীহ। যে-জ্ঞানচর্চা গত চার শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য মননকে ব্যস্ত রেখেছিল তা কীভাবে মূল প্রশ্নকে এড়িয়ে গেছে সেটাই ফুকোর মূল সমস্যা। সমস্যাটা এখানে জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) তথা মানুষী অস্তিত্বেরও বটে।

যদি হেগেলীয় চিন্তায় ইতিহাসের অর্থ পরম সত্তা বা মহাযুক্তির, আদিযুগ থেকে ক্রমবিবর্তন ও তার চরম পরিণতি—যে-চিন্তা উত্তর-হেগেলীয় ইতিহাসবোধকে বহুলাংশে প্রভাবান্বিত করেছে—সে চিন্তাকে ফুকো শুধু বর্জন করেই ক্ষান্ত হননি, তাকে তিনি সরাসরিভাবে উলটো দিয়েছেন। তথাকথিত ইতিহাসের মধ্যে কোনো অন্তঃশীলা অর্থ বা যুক্তির স্রোত নেই, নেই কোনো ধাপে ধাপে, দ্বান্দ্বিক বা ডায়ালেক্‌টিকাল ক্রমোন্নতির উপন্যাস। ফুকোর মতে যা আছে তা এক ধরনের সভ্যতা ও চিন্তাশৈলীর শেষে আর এক ধরনের বিচ্ছিন্ন, খণ্ড খণ্ড চিন্তাশৈলী, যাকে ফুকো বলছেন জ্ঞানাংশ বা 'এপিস্টেমে' (epistemé)। একটা নির্দিষ্ট সময়ের শেষে এই এপিস্টেমে সরে গিয়ে পথ খালি করছে আর এক এপিস্টেমের এবং সেই সঙ্গে শব্দরা পর্যন্ত, বস্তু থেকে আরও দূরে সরে গিয়ে, তাদের অর্থ বদলাচ্ছে। প্রচলিত, অর্থাৎ হেগেলীয়, অর্থে আর ইতিহাস সম্ভব নয়; তাই

* Michel Foucault. *The Order of Things : An Archeology of Human Sciences* (Collective Translation) New York. Pantheon. 1971.

প্রয়োজন এক নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতির। এই প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতি ও এপিস্টেমে সম্পর্কে একটু পরে আলোচনা করব। এখানে শুধু এটাই বলা যেতে পারে যে যদিও এপিস্টেমে শব্দটি গ্রিক এবং ধ্রুপদী গ্রিকে ওই শব্দের অর্থ জ্ঞান, যার থেকে জ্ঞানতত্ত্ব বা epistemology শব্দের উদ্ভব, ফুকোর চিন্তায় এপিস্টেমের অর্থ প্রচলিত অর্থে জ্ঞান নয়— যদি জ্ঞানের অর্থ হয় কোনো বস্তু সম্পর্কে সর্বতোভাবে নিশ্চিত ও সত্য ধারণা। একটি বিশেষ যুগে বা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য শক্তির সম্পর্ক আমাদের ভাষণ—লিখিত, কথ্যভাষা— এর শৈলী বা তার গঠনের রীতিনীতিকে এক করে এবং যা ক্রমাগত আবির্ভূত হয় নানাবিধ শাস্ত্রের আলোচনা ও বিশ্লেষণ কালে— তাকেই ফুকো আখ্যা দিচ্ছেন 'এপিস্টেমে'। 'উন্মাদনার ইতিহাস'এর মতো এই বইটিতেও ফুকো সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন। ধ্রুপদী যুগ অর্থাৎ সমগ্র সপ্তদশ শতক—সেই সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের তিন চতুর্থাংশ— এবং আধুনিক যুগ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে আজ পর্যন্ত।

রেনেশাঁস আমলে যেকোনো শাস্ত্রচর্চার মূলে ছিল দুটো বিভিন্ন বস্তুর সাদৃশ্য নির্ণয় করার পদ্ধতি। ধ্রুপদী যুগে পদ্ধতি বদলাল। এল প্রদর্শন (representation)। চিন্তাকে পদ্ধতিবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন শৃঙ্খলা (order)-র; এবং এই শৃঙ্খলা ধীরে ধীরে গাণিতিক রূপ নিল এবং একে দাঁড় করানো হল দুটি প্রণালীতে, যাদের ফুকো বলছেন ম্যাথেসিস (Mathesis)ও তাক্সিনমিয়া (Taxinomia)—ইংরেজিতে taxinomy— এবং যে দুটি প্রণালীর উপস্থিতি ধ্রুপদী যুগের জ্ঞানচর্চায় প্রায় সর্বত্র লক্ষণীয়। ট্যাক্সিনমি, অর্থাৎ শ্রেণিবদ্ধ করা, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে এখনও বহু ব্যবহৃত। ম্যাথেসিস শব্দটি অবশ্যই গ্রিক mathematikos-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, কিন্তু গণিত এটি নয়; এটি একটি প্রণালী মাত্র, যার সাহায্যে গাণিতিক পদ্ধতিতে প্রদর্শনকে সাজিয়ে নেওয়া সম্ভব। ফুকোর মতে, 'যখন ব্যাপারটা সহজ সরল প্রকৃতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা তখন প্রয়োজন হয় ম্যাথেসিসের, যার সার্বভৌম পদ্ধতি হল বীজগণিত।'[৪]

বীজগণিতে ব্যবহৃত a বা b-র কোনো নিজস্ব মূল্য নেই। ওই অক্ষরদুটি মূল্যবান শুধু তখনই যখন তারা একটি সমীকরণের একটি রাশি অর্থাৎ অন্য এক মানের প্রদর্শক। অর্থাৎ, শব্দ ও বস্তুর পার্থক্য চিরস্থায়ী এবং শব্দরা— যার সাহায্যে বস্তুর প্রদর্শন সম্ভব তা— মূলত শূন্য। ব্যাপারটা প্রহেলিকা বলে মনে হবে না, যদি আমরা ফ্যার্দিনা সসুরের ভাষাতাত্ত্বিক বক্তব্যগুলো মনে রাখি। সহজ, সরল প্রদর্শন আর এক ধাপ এগোলে প্রয়োজন হয় বস্তুকে শ্রেণিবদ্ধ সারণিতে সাজিয়ে নেওয়ার—অর্থাৎ ট্যাক্সিনমির।

বেকন ও দেকার্ত থেকে এই পদ্ধতির শুরু। দেকার্তে এসে এই পদ্ধতি চরমে পৌঁছেছে; সত্যকে আয়ত্তে আনার জন্য চিন্তাকে প্রদর্শনের সাহায্যে, তুলনার সাহায্যে, একটি সারণি (table)-তে সাজিয়ে নির্দিষ্ট করা কোনগুলি এক ও অভেদ (identity)ও কোনগুলি পৃথক (different) ইত্যাদি। যেটা ফুকোর মতে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য সেটা এই যে যখন এই প্রদর্শন-নির্ভর জ্ঞানচর্চা চলছে তখন প্রদর্শনের ক্রিয়া কিন্তু প্রদর্শিত হচ্ছে

না। প্রদর্শনের ব্যক্তি (subject)— অর্থাৎ মানুষ—তখনও গৌণ ও অনুপস্থিত। তখনও ঈশ্বর জীবিত এবং মানুষ নামক ব্যক্তিটি তখনও মঞ্চে আবির্ভূত নয়। সে তখনো সাজঘরে। মানুষ তখনও এক সংহত, সুষম বিশ্বে অন্য প্রাণী ও বস্তুর একটি অংশ মাত্র। তার ভূমিকা শুধু মাধ্যমের। সত্যিকারের কোনো মানবশাস্ত্র বা বিজ্ঞান এই অবস্থায় সম্ভব নয়, কারণ মানুষ তখনও তার নিজের কাছে জ্ঞানের বস্তু (object) নয়, ব্যক্তি (subject)-ও নয়। অষ্টাদশ শতকের শেষে এই ভাবধারা বা চিন্তাশৈলীর আমূল পরিবর্তন হল ইমানুয়েল কান্টের আবির্ভাবের পর। কান্টই প্রথম ব্যক্তি যিনি বুঝলেন যে মানুষের জীবন ও অভিজ্ঞতা সর্বতোভাবে অনিশ্চয় ও আকস্মিক; এক তাণ্ডব (chaos), যেখানে অনিয়ম এমনই প্রবল যে কোনো মানুষই জানে না যে ঠিক পরের মুহূর্তে কী ঘটবে। এমতাবস্থায় কোনো জ্ঞান আহরণ আদৌ সম্ভব কিনা সেটাই প্রশ্ন। কিন্তু অন্বেষণকে এই অবস্থায় পরিত্যাগ করলে দর্শনের তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটবে, সুতরাং জ্ঞানের সম্ভাব্যতাকে জিইয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন অন্য এক পদ্ধতির। যা অনিশ্চয়ের তাণ্ডব, যা অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) তাকে মননের সাহায্যে উত্তরণ (transcend) করে জন্ম নিল এক সংশ্লিষ্ট অনুমান (synthetic *a priori*) পদ্ধতির যার সাহায্যে জ্ঞান আহরণ সম্ভব রইল।

বলাবাহুল্য, এই কান্টীয় পদ্ধতিতে মানুষী অভিজ্ঞতার বিশৃঙ্খল চরিত্রের কিছু মাত্র বদল হল না, কিন্তু চিন্তা বা কল্পনাকে জিইয়ে রাখার ফলে জন্ম নিল আর এক নতুন 'এপিস্টেমে' যার প্রভাব বৈপ্লবিক এই অর্থে যে এখন থেকে ঈশ্বরহীন বিশ্বে মানুষ আর রাশীকৃত প্রাণী ও বস্তুর মধ্যে একটি প্রাণী নয়। মানুষ এখন একাধারে ব্যক্তি (subject), কারণ তারই চৈতন্যের সাহায্যে ওই সংশ্লিষ্ট অনুমান সম্ভব এবং অন্যধারে সে তার নিজের জ্ঞানের অন্বিষ্ট বস্তু (object)। এই ব্যক্তি ও বস্তুর সন্নিপাতের আলোড়নকারী প্রতিক্রিয়া ঘটেছে সারা উনিশ শতক ধরে; জন্ম নিয়েছে এমন কিছু শাস্ত্র যা আক্ষরিক অর্থে মানবশাস্ত্র বা Sciences humaines, যথা মানুষের শরীরের বিজ্ঞান বা জীববিদ্যা; তার শ্রমের বিক্রয়যোগ্যতা বা অর্থনীতি; তার প্রতি মুহূর্তের ব্যবহৃত শব্দপুঞ্জের বিজ্ঞান বা ভাষাতত্ত্ব (linguistics)। এ শাস্ত্রগুলি সবই উত্তর-কান্টীয় উনিশ শতকের নরকেন্দ্রিক পাশ্চাত্য চিন্তার ফসল। চিন্তার ইতিহাসে কোনো ধাঁপে ধাপে ক্রমিক অনবচ্ছেদ অগ্রসরতা নেই, যেমন নেই মানুষের ইতিহাসে। যুগের পর যুগ শুধু চিন্তার কাঠামোটাই বদলাচ্ছে কোনো অদৃশ্য নিয়তি বা কোনো ধারাবাহিকতাকে স্বীকার না করে। মিশেল ফুকোর গভীর অবিশ্বাস মানবীয় বিজ্ঞান বা শাস্ত্রের বিজ্ঞানম্মন্যতায় (scientism)। যদিও আধুনিক মানুষ এটা জেনেছে যে সে আর বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থাপিত নয়, তথাপি এই নরকেন্দ্রিকতায় বিপজ্জনকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আধুনিক জ্ঞানচর্চা। তাঁর মতে এই 'নরত্বারোপণ' (anthropologisation) আমাদের কালে জ্ঞানের অভ্যন্তরে এক বিরাট বিপদ। 'এটা সহজে বিশ্বাস করা যায় যে মানুষ তার নিজের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছে এটা আবিষ্কার করামাত্র যে সৃষ্টির কেন্দ্র সে নয়, সে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যস্থলও নয়,

সম্ভবত সে সবকিছুর শীর্ষেও নয় এবং নয় জীবনের শেষ; কিন্তু যদি সে বিশ্বের প্রভু নাও হয়, যদি সে অস্তির কেন্দ্রস্থলে প্রভুত্ব নাও করে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানববিজ্ঞান সমূহের মধ্যস্থতা বিপজ্জনক'। [ফরাসি সংস্করণ, পৃ.৩৫৯]। আধুনিক পজিটিভিস্ট-হিউম্যানিস্ট ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে, ইদানীং কালে, এটাই বোধহয় সবচেয়ে বলিষ্ঠ আঘাত।

এটা ঠিকই যে আধুনিক চিন্তায় মানুষ তার সীমিতাবস্থা— যাকে ফুকো বলেছেন *la finitude*—সম্পর্কে যদিও অবহিত, এই জ্ঞান তার চিন্তাপদ্ধতিকে খুব বেশি বদলায় নি। অভিজ্ঞতার তাণ্ডব, আকস্মিকতা ও অনিশ্চয়তার থেকে রক্ষা পাবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে কিছু যুগ্মতার। একেই ফুকো তাঁর 'মানুষ ও তার যুগ্মতা' (L'homme et ses doubles) শিরোনামের পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিন শ্রেণির যুগ্মকে ফুকো আধুনিক (উনিশ ও বিশ শতকের) চিন্তায় নিরূপিত করেছেন এবং সেগুলি নিম্নরূপ :

(ক) অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) ও উত্তরণ (transcendence)।

(খ) ভাবুক ব্যক্তিসত্তা (cogito) ও অচিন্ত্য (impensé)।

(গ) আদির পশ্চাদ্ধাবন ও প্রত্যাবর্তন (La retraite et le retour de l'origine)।

ক. অভিজ্ঞতার উদ্দাম বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে উত্তরণ কান্টীয় দর্শনে ঘটানো হয়েছে তারই চরম পরিণতি হয়েছে কঁৎ (Comte)-এর পজিটিভিজ্‌মে এবং হেগেল ও মার্কসের ইতিহাস-চিন্তায়— যার মধ্যে স্বাক্ষরিত রয়েছে ইতিহাসের মধ্যে ধরে নেওয়া এক নিয়তি। একে ফুকো বলছেন এক ধরনের eschatology, খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বে দেহত্যাগের পর আত্মার উদ্‌গতি বা অধোগতি।

খ. বিশ শতকের গোড়ায় এলেন হুসের্‌ল, যিনি তাঁর ফেনোমেনোলজি-তে অভিজ্ঞতার তাণ্ডবকে সম্পূর্ণ অটুট রেখেও, ভাবুক সত্তা (cogito)-র অস্তিত্বকে কণামাত্র খর্ব না করে, জ্ঞানকে লঘুকরণ বা reduction-এর সাহায্যে সম্ভব করতে প্রচেষ্ট হলেন।

গ. তৃতীয় যুগ্ম এক অর্থে সর্বাপেক্ষা উদ্দীপক ও তার প্রভাবও সার্বভৌম। ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করার কালে এটা ধরে নেওয়া যে ইতিহাস কোনো এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছে শেষ হল— যেমন, হেগেলের মতে প্রাশিয়ান রাষ্ট্রে পরম সত্তার চরম পরিণতি, বা স্পেংলারের চিন্তায় পাশ্চাত্যের মহাসমাপ্তি, কিংবা এক ইতিহাস শেষ হয়ে আর এক আদর্শ ও ত্রুটিহীন ইতিহাস— মার্ক্সীয় চিন্তায় শ্রেণিবিহীন সমাজের—শুরু। এখানে আদি বা origin তার চরম পরিণতিতে শেষ হল বা আবার ফিরে গেল। অন্য দিকে, যার মূলে আছেন নীচএ, হোয়েল্ডারলিন, হাইদেগার প্রমুখ, এক কাল্পনিক আদি সভ্যতা— যথা, প্রাক্-সক্রেটিক গ্রিক সভ্যতাকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা, যেখানে এবং শুধুমাত্র যেখানে সর্বাপেক্ষা সফল ও সার্থক মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব।

অর্থাৎ মানুষের সীমিতাবস্থার যে বিশ্লেষণ গত দুশো বছরের পাশ্চাত্য চিন্তা করেছে তার মধ্যে আসল রক্তমাংসের মানুষেরা ও তাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার জটিলতা, যার অপনোদন অসাধ্য, তার কোনো প্রদর্শন নেই। আছে রাশি রাশি বিমূর্তন (abstraction)

কিংবা বিভিন্ন ধাঁচের ইউটোপীয় স্বপ্ন। এখন ফুকোর প্রশ্ন এই যে 'মানুষ নামে কোনো প্রাণী আদৌ আছে কি না' [তদেব, পৃ.৩৩২]। এই প্রশ্নে আমরা স্বভাবতই বিচলিত বোধ করতে পারি। তার কারণ, ফুকোর মতে, 'আমরা মানুষের সাম্প্রতিক প্রমাণে এমনই অন্ধ হয়ে গেছি যে আমরা এটা মনে পর্যন্ত রাখিনি যে সামান্য কিছুদিন আগে এমন একদিন ছিল যখন পৃথিবী ছিল, ছিল তার শৃঙ্খলা, ছিল মানুষেরা, কিন্তু ছিল না মানুষ' (তদেব, পৃ.৩৩৩)। এবং এই দীর্ঘ, চাঞ্চল্যকর বইয়ের শেষে উচ্চারিত হয়েছে ফুকো-র সেই উক্তি যার বহু ব্যাখ্যা ও বহুবিধ অপব্যাখ্যা হয়েছে। 'মানুষ একটি আবিষ্কার, যার জন্ম-তারিখ— যা আমাদের চিন্তার প্রত্নতত্ত্ব সহজেই দেখায়— সাম্প্রতিক। এবং সম্ভবত তার সম্ভাব্য সমাপ্তি আসন্ন' [তদেব, পৃ.৩৯৮]।

আর একজন বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক, জিল্ দলজ (Gilles Deleuze), যিনি উত্তর-আধুনিক চিন্তাকে বহুভাবে প্রভাবান্বিত করেছেন, বছর তিনেক আগে একটি বই প্রকাশ করেছেন মিশেল ফুকোর উপর। এই বই থেকে আমি জেনেছি যে যখন 'শব্দরা ও বস্তুরা' প্রথম প্রকাশিত হয়, জনৈক ফরাসি মনোবৈজ্ঞানিক বইটিকে অ্যাডলফ্ হিটলারের কুখ্যাত বই 'আমার সংগ্রাম' (*Mein Kampf*)-এর সঙ্গে তুলনা করেন[৫] সম্ভবত এই কারণে যে এখানে মানুষের শেষ সরবে উচ্চারিত হয়েছে। এই ধরনের হঠোক্তি আর কেউ করেছেন বলে শুনিনি। কিন্তু বইটি যে বহুলোকের আত্মসন্তোষকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যাঁরা 'উন্মাদনার ইতিহাস' পড়ে সশব্দে হাততালি দিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই এই বইটি প্রকাশিত হবার পর নিশ্চুপ হয়ে যান।

যাই হোক, রক্তমাংসের মানুষ বা মানুষদের কোনো সমাপ্তির কথা ফুকো বলেননি। এই উক্তির কদর্থ করা অযৌক্তিক। ফুকোর বন্ধু ও সমালোচক মিশেল দ স্যার্তো এ ব্যাপারে যা বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য। ফুকো 'মানুষের শেষ ঘোষণা করেননি। ঘোষণা করেছেন মানুষ সম্পর্কে একটি ধারণার শেষ, যে-ধারণা ভেবেছিল যে মানবীয় বিজ্ঞানের পজিটিভিজ্মের সাহায্যে মৃত্যুর সমস্যাকে সমাধান করা যাবে।'[৬]

আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তির মন্তব্যও এখানে উল্লেখ্য। বস্তুত, এ প্রবন্ধে জাঁ পোল সার্ত্রকে টেনে আনার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। কারণ, 'কানু বিনা গীত' হয়, কিন্তু এ-মুহূর্তে সেটা হচ্ছে না। [এ প্রসঙ্গে, অনেকদিন আগে শোনা একটি উক্তি আমার মনে পড়ছে, যার উল্লেখ আশা করি মার্জনীয় হবে। আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগেকার কথা; আমি তখন প্যারিসে ছাত্র। সরবোনের এক অধ্যাপক একটু বঙ্কিম হেসে আমায় বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে ছাত্রছাত্রীরা প্যারিসে পড়তে আসেন (অর্থাৎ তখন আসতেন) তাঁদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁরা যেনতেনপ্রকারেণ অন্তত একবার সার্ত্রকে তাঁদের থিসিসে আনবেনই; এমনকি যদি গবেষণার বিষয়বস্তু হয় কর্নেই-এর নাটক বা ভলতেয়ারের চিঠি বা ফেনেলঁ-র উপন্যাস 'তেলেমাক্', সে ক্ষেত্রেও সার্ত্র-এর উল্লেখ প্রায় পবিত্র কর্তব্য। অবশ্য এটা কুড়ি বছর আগেকার কথা যখন সার্ত্র-

এর প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।] যাই হোক, বর্তমান প্রবন্ধে সার্ত্র-এর উল্লেখ ঠিক বিধিনিহিত মন্ত্রপাঠ নয়। ফুকো সম্পর্কে সার্ত্রে-র এমন কিছু বক্তব্য আছে যেগুলি জানা না থাকলে ফুকোর পরবর্তী রচনার দু-একটি বক্তব্য সহজে বোধ্য হবে না। ১৯৬৬-তে ফুকোর 'শব্দরা ও বস্তুরা' প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সার্ত্র এর বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন 'ল' আর্ক' পত্রিকায় (*L'Arc*, Oct. 1966)। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে সে-মুহূর্তে বুর্জোয়ারা ঠিক যা খুঁজছিলেন— অর্থাৎ ঐতিহাসিক চিন্তার মূল্যহীনতা— ফুকো ঠিক সেটাই তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছেন। সার্ত্র-এর ধারণা, ইতিহাসকে আক্রমণের আড়ালে যে-ব্যক্তি ফুকোর মূল আক্রমণের লক্ষ্য তিনি মার্কস, কারণ বুর্জোয়াদের শেষ প্রতিরোধ মার্কসের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, ইত্যাদি। ভ্যাঁসাঁ দেকম্ব (Vincent Descombe) বা মিশেল দ স্যার্তো প্রমুখ ব্যক্তিরা, যাঁরা পরে ফুকোকে অন্য পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচনা করেন, তাঁরাও সার্ত্র-এর এই উক্তিতে মুগ্ধ হতে রাজি হননি। কারণ, সার্ত্র-এর ইতিহাসবোধ অবিমিশ্রভাবে উনিশ শতকী, অর্থাৎ ইতিহাস এখানে প্রায় রূপকথার সামিল।

যুদ্ধের পর, অস্তিত্ববাদের বহুলাংশ পরিত্যাগ করে সার্ত্র যখন মার্কসবাদী হলেন তখন প্রচলিত, ধ্রুপদী মার্কসবাদ তাঁর হাতে বদল হয়ে অন্য এক রূপ নিল। প্রথমে সার্ত্র এর সঙ্গে মেশালেন হিউম্যানিজ্‌ম, যে মিশ্রণ সে যুগের অনেক মার্কসবাদীকে স্তম্ভিত করেছিল। কিছুদিন পরে, ষাটের দশকে, তাঁর 'দ্বান্দ্বিক যুক্তির সমালোচনা'য় (*La Critique de la Raison Dialectique*) হিউম্যানিজ্‌মকে পরিত্যাগ করে সার্ত্র আঘাত হানলেন হেগেলীয়-মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে— কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ কবলেন মার্কসীয় শ্রেণি-চৈতন্য ও শ্রেণি-স্বার্থের ব্যাপারগুলোতে। উক্ত রচনায়, সার্ত্র-এর কয়েকটি আশ্চর্য উক্তি আছে, যথা শ্রেণি-চৈতন্য এমনই যে তার থেকে মুক্ত হওয়া বা নিজেকে শ্রেণি-চ্যুত (declass) করা কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়, তাই অষ্টাদশ শতকের অভিজাত বাড়ির বিখ্যাত ও কুখ্যাত লেখক মার্কি দ সাদ্‌ যিনি ফরাসি বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন বা উনিশ শতকের ফ্লোবেয়ার যিনি ১৮৪৮-এর বিপ্লবকে ব্যঙ্গ করেছিলেন, এঁরা কেউই নিজেকে শ্রেণি-চ্যুত করতে সমর্থ ছিলেন না, ইত্যাদি। এই অভিমতগুলো এমনকি অনেক মার্কসবাদীর কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়। সার্ত্রীয় চিন্তা যখন এই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে, তখনই প্রকাশিত হয় মিশেল ফুকোর 'শব্দরা ও বস্তুরা'।

১৯৬৯-৭০-এ ফুকো প্রকাশ করেন তাঁর পরবর্তী রচনা 'জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্ব' (*L'Archéologie du savoir*) । শীঘ্রই এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।* ফুকোর অন্যান্য রচনাগুলির তুলনায় বইটি কিঞ্চিৎ নীরস। এর কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যরস নেই, যা ফুকোর অন্যান্য রচনায় আছে এবং কোনো উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্যকে পরিষ্কার করার কোনো প্রয়াস নেই। মূলত, বইটি একটি ম্যানিফেস্টো বা

* Michel Foucault, *The Archeology of Knowledge* (Trans. M. Sheridan Smith); New York, Pantheon, 1972.

মতো। অর্থাৎ, উত্তর-আধুনিক চিন্তায়, কীভাবে ইতিহাসকে বিচার ও বিশ্লেষণ করা উচিত তারই একটি খসড়া। এখানেও ফুকোর আলোচ্য যুদ্ধ বা শান্তি, দুর্ভিক্ষ বা রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস ঠিক নয়, চিন্তার ইতিহাস।

এই রচনার নান্দীমুখে ফুকো আমাদের জানাচ্ছেন যে ইতিহাস বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝে থাকি তা শুধু ঘটনাস্রোতের বিবরণ নয়, তার ধারাবাহিকতা ও তার মধ্য থেকে একটা সুস্পষ্ট ক্রমোন্নতি, একাধিক মানুষের সংহত, সংঘবদ্ধ চিন্তার একত্ব, একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য বা পরিণতিকে আবিষ্কার করার চেষ্টা। এই ইতিহাস-চিন্তাই উনিশ শতকে চরমে উঠেছিল। সাম্প্রতিক, উত্তর-আধুনিক চিন্তায় সে ইতিহাসবোধের নাভিশ্বাস উঠেছে। যুদ্ধোত্তর ইতিহাসচিন্তা ঘটনার ক্রমান্বয়ে আস্থাহীন ও তার অন্তর্নিহিত কোনো সামূহিক তাৎপর্যে অবিশ্বাসী। যেখানে প্রাচীনরা দেখতেন ধারাবাহিকতা, আধুনিকরা সেখানে দেখছেন একটি ছেদ (interruption)-এর পর আর একটি ছেদ, যার মধ্যে নেই কোনো গূঢ় তাৎপর্য, নেই কোনো ক্রমিক প্রগতির ইঙ্গিত। এমনকি এক ছেদ থেকে আর এক ছেদে পৌঁছোনোর মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক (causality)-ও নেই। উত্তর-আধুনিক চিন্তার প্রধান প্রবক্তা ফুকো এই বক্তব্যকেই আরও বলিষ্ঠ করেছেন তাঁর 'জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্বে' যেখানে ধারাবাহিকতা সরিয়ে তিনি এনেছেন ধারাহীনতা বা dis-continuity-র ধারণাকে। তাঁর মতে 'ধারাহীনতা ছিল কালগত স্থানচ্যুতির কলঙ্ক (stigmate de l'éparpillement temporel) , যাকে চেপে দেওয়া ছিল ঐতিহাসিকের কর্তব্য। সেই ধারাহীনতা এখন ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রধান উপাদান।'[৭]

চিন্তার জগতে এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের জন্য ফুকো কোনো বিশেষ কৃতিত্ব অবশ্যই দাবি করছেন না, কারণ এ-পরিবর্তন ফুকোর আগেই ঘটতে শুরু করেছিল। দুজন ফরাসি ভাবুকের কথা ফুকো উল্লেখ করেছেন। গাস্তঁ বাশলার (Gaston Bachelard), যিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে কোনো ক্রমিক জ্ঞানার্জন আর সম্ভব নয়— এবং জর্জ কাঁগিলেম্ (Georges Canguilhem), যিনি প্রথম মহা-ইতিহাস (Macroscopic history) ও কণা-ইতিহাস (Microscopic history)-এর পার্থক্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। এই মহা-ইতিহাসই বিশ্বইতিহাসের রূপ নিয়েছিল, যার সূত্রপাত উনিশ শতকে এবং যা এই শতকে হেচ্ জি ওয়েলস্, টয়েনবি বা নেহেরু-তে এসে শেষ হয়েছে। ফুকো অবশ্য এঁদের কারো নাম উল্লেখ করেননি; এমনকি, এ-প্রসঙ্গে হেগেলেরও নয়। কিন্তু যারা অণু-ইতিহাস বা microscopic history-র অনুশীলক, যথা লরোয়া লাদুরি, ফ্যার্নাঁ ব্রোদেল, মার্ক ব্লখ প্রমুখদের কথা ফুকো অন্য প্রসঙ্গে সোৎসাহে উল্লেখ করেছেন। ইতিহাস-চিন্তার এই পরিবর্তন যদিও ঘটেছে, কিন্তু সেটা রাতারাতি হয়নি।

ফুকোর মতে আমরা অনেকেই পুরোনো বিশ্বাসে প্রোথিতমূল; আমরা উৎসের সন্ধানে এমনই অভ্যস্ত, বিবর্তনের গতি ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যরূপ (teleology) আবিষ্কারে এমনই উন্মুখ যে আমাদের এক বিশেষ বিরূপতা আছে ইতিহাসের ধারাহীনতা, পার্থক্য ও বিক্ষেপণ (dispersion) লক্ষ করার ব্যাপারে। ইতিহাস এতদিন একাধারে ছিল নৃতত্ত্ব

(anthropology) বা মানুষের বিজ্ঞান ও অন্য ধারে ব্যক্তির (subject) প্রাতিস্বিক স্বরাটত্ব। ফুকোর মতে নতুন ইতিহাস-চিন্তার ইঙ্গিত আছে কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিড্রীশ নীচএ-র রচনায়। যদিও মার্ক্সীয় চিন্তা হেগেলীয় অধিবিদ্যা (metaphysics) থেকে মুক্ত নয়— এবং সেটা ফুকো জানেন—কিন্তু প্রচলিত ইতিহাস-চিন্তাকে মার্ক্সই প্রথম কেন্দ্রচ্যুত (decenter) করেন উৎপাদনের সম্পর্ক, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, শ্রেণিসংগ্রাম প্রভৃতি বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে। এখানে ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছে, যেমন ব্যাহত হয়েছে নীচএ-র ইতিহাসকে সরিয়ে দিয়ে বংশানুচরিত (Genealogy)-এর প্রয়োগে। নীচএ তাঁর যৌবনে লিখিত 'ইতিহাসের শুভ ও অশুভ প্রয়োগ' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে হেগেলীয় ইতিহাস-চিন্তাকে সমালোচনা করে এর অন্তর্নিহিত বিপদকে পরিস্ফুট করেন। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'অসময়ের বিবেচনা' (*Unzeitgemasse Batrachtungen*) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ সংকলনে। কিন্তু প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ খুবই সহজপ্রাপ্য[৮] এবং উত্তর-আধুনিক চিন্তায় উৎসাহী ব্যক্তিদের অবশ্যপাঠ্য, কারণ এর সাম্প্রতিক প্রভাব প্রচণ্ড। মার্ক্স ও নীচএ-র চিন্তার মধ্যে বহুবিধ বৈসাদৃশ্যের ছড়াছড়ি, কিন্তু তাঁরা দুজনেই অষ্টাদশ শতকের বৈধ সন্তান যুক্তিশীল ব্যক্তির স্বরাটত্বকে ধূলিসাৎ করেছিলেন।

নীচএ-র চিন্তা যেমন তাঁর ভক্ত ও শত্রুদের হাতে পেয়েছে প্রচুর অপব্যাখ্যা, ঠিক তেমনই এখানে ফুকো আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, মার্ক্সকে সাজানো হয়েছে 'সামূহিকতার ঐতিহাসিক' (historien des totalités) হিসাবে ও তাঁকে হিউম্যানিস্ট-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। শেষ উক্তিটি বিশেষভাবে বিবেচ্য। এখানে সার্ত্র-এর কোনো উল্লেখ নেই, কিন্তু এ-ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে তিনবছর আগে, ১৯৬৬-তে, যে-আক্রমণ সার্ত্র করেছিলেন ফুকোর বিরুদ্ধে, তারই জবাব এখানে মিলছে। মার্ক্সবাদ ও হিউম্যানিজ্মের সম্মেলন যে প্রায় অসম্ভব তার আলোচনা এ-প্রবন্ধে অবান্তর হবে। এঙ্গেল্স তাঁর 'প্রকৃতির দ্বন্দ্বে' এটা পরিষ্কারভাবেই জানিয়েছেন যে যদিও মানুষ যেকোনো মানবেতর প্রাণীর চেয়ে বুদ্ধি ও চৈতন্যের গুণে শ্রেয় হতে পারে. কিন্তু মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয় ও তার ইতিহাস প্রকৃতির ইতিহাসেরই একটা অংশ মাত্র।[৯] এঙ্গেল্সের বিরুদ্ধে সার্ত্র-এর দীর্ঘস্থায়ী উষ্মার কারণ নির্ণয় করা শক্ত নয়।

যদি উত্তর-আধুনিক চিন্তায় পুরাতন ইতিহাস-চিন্তা তামাদি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে প্রয়োজন এক নতুন চিন্তার ও পদ্ধতির। এই নতুন পদ্ধতিকেই ফুকো তাঁর এই বইয়ে আখ্যা দিয়েছেন 'প্রত্নতত্ত্ব'। প্রত্নতাত্ত্বিক কারা? যাঁরা প্রাচীন, অবলুপ্ত সভ্যতার সামান্য কিছু প্রোথিত ভাস্কর্য, স্থাপত্য, তৈজস খুঁড়ে বার করে ওই সভ্যতার চরিত্র-নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু মহেঞ্জোদারো থেকে সুমেরীয় সভ্যতা কিংবা মিশর থেকে রোমক সভ্যতার মধ্যে কোনো অন্তঃশীলা ধারাবাহিকতা নেই। কিন্তু তাতে কিছুসংখ্যক প্রত্নতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিকদের তাৎপর্যের সন্ধান বা ধারাবাহিকতার অন্বেষণ কিছু লোপ পায়নি এবং এটা ফুকোর মতো পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে অজানা নয়। আমি এ-কথা পূর্বেই বলেছি যে

ফুকোর এই রচনায় কোনো উদাহরণ নেই। কিন্তু কীভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাকে দুমড়ে, তাকে উনিশ শতকী ইতিহাস-চিন্তার কাজে লাগানো হয়েছে তা পরিষ্কার করার জন্য নজির হিসাবে আমি এক বিখ্যাত ব্যক্তির একটি প্রসিদ্ধ বই থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি। এই বিশেষ বইটি বেছে নেওয়ার কারণ এই যে এককালে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এই বইটি খুব পড়তেন ও আমাদের ছাত্রাবস্থায় বইটি কলকাতার যত্রতত্র বিক্রি হতে দেখেছি। খুব সন্তর্পণে এটা বলা যেতে পারে যে সেযুগে এই বইটি না পড়া থাকলে বুদ্ধিজীবী আখ্যা পেতে বিলম্ব হত। বইটি গর্ডন চাইল্ডের *What Happened in History*; এবং এর প্রারম্ভেই চাইল্ড অতিশয় প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর বক্তব্য ও অভিপ্রায় আমাদের জানাচ্ছেন :

Aided by archeology, history with its prelude pre-history becomes a *continuation* of natural history...And archeology can trace *the same process* in historical times, with the additional aid of written records as well in regions where the dawn of written history has been retarded. *Without any change of method*, it can follow down to the present day the working out of trends discerned already in pre-history.[১০] [বাঁকা হরফ আমার]।

বক্তব্যগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্বের কোনো স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তা নেই। তার কাজ ইতিহাসকে সাহায্য করা; সে প্রাগেতিহাস ও ইতিহাসের মধ্যেকার একটা বিশেষ ধাপ মাত্র, যা সার্বিক ইতিহাসের অন্তর্নিহিত ধারাবাহিকতা বা ক্রমায়াতের (continuation) অংশ মাত্র। অর্থাৎ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের পদ্ধতি একই। গর্ডন চাইল্ড ছিলেন বিশ শতকের মানুষ, কিন্তু উপরোক্ত বক্তব্যগুলি উনিশ শতকী, উত্তর-হেগেলীয় চিন্তার তলানি। এবার দেখা যাক ফুকোর প্রত্নতাত্ত্বিক চিন্তা কীভাবে ও কতটা বিপরীত।

এই পর্যন্ত এসে সাময়িকভাবে আমার প্রযুক্তি বদল করছি। এযাবৎ আমি মিশেল ফুকোর মূল ফরাসি রচনাগুলির উপর নির্ভর করছি এবং তার কারণ পণ্ডিতম্মন্যতা ভাবলে ভুল হবে। অনুবাদ সর্বদা আস্থাযোগ্য ও নির্ভুল নয়। এমনকি, ফুকোর চলতি ইংরেজি অনুবাদে মারাত্মক ত্রুটি ধরা পড়েছে।[১১] কিন্তু যেহেতু আমার নিজের বঙ্গানুবাদ সর্বদা সুষম নয় এবং যেহেতু গর্ডন চাইল্ড লিখেছেন ইংরেজিতে, তাঁর সঙ্গে ফুকোর পার্থক্য ও বৈপরীত্যকে দেখানোর জন্য আমি শেরিডান স্মিথের ইংরেজি অনুবাদ থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি।

যে উনিশ শতকী পদ্ধতিকে চাইল্ড উপরোক্ত উক্তিগুলির মধ্যে হাজির করেছেন তাকে সরাসরি উলটে দিয়েছেন ফুকো। পরিত্যাগ করেছেন ঐতিহাসিক সময়ের অন্তর্নিহিত 'same process'-কে। ফুকো বলছেন : 'It might be said, to play on words a little, that in our time history aspires to the condition of archeology, to the intrinsic description of monuments.' [*The Archeology of Knowledge*', ব্রিটিশ সংস্করণ, পৃ.৭]। এই গ্রন্থের শেষার্ধে বক্তব্যটি আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। ফুকোর

মূল সমস্যা এখানে চিন্তার ইতিহাস এবং সেকথা ইতিমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। চিন্তা গড়ে ওঠে শব্দ, উচ্চারিত ও লিখিত উক্তি দিয়ে। খুঁড়ে পাওয়া ভাস্কর্যের মতো এই অতীত উক্তিগুলি গাঢ় ও অস্বচ্ছ। ফুকোর মতে : 'Archeology does not seek to rediscover the continuous, insensible transition that relates discourses on a gentle slope, to what precedes them...,'এবং এই প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতির পশ্চাতে কোনো সৃজনশীল ব্যক্তি (subject)-র ভূমিকা নেই; 'The authority of the creative subject, as the *raison d'etre* of an *oeuvre* and the principle of its unity, is quite alien to it.' [তদেব, পৃ. ১৩৮-১৩৯]।

পার্থক্যটা শুধু গর্ডন চাইল্ড ও মিশেল ফুকোর মধ্যেকার নয়, এটা গতকাল ও আজকের নতুন চিন্তার অসেতুসম্ভব পার্থক্য। আমরা যাকে জ্ঞান বলতে অভ্যস্ত তা সম্ভব হয়েছে ভাষণের (discourse) সাহায্যে। এখানে অবশ্যই 'ভাষণ' শব্দের অর্থ বক্তৃতা নয়। সুচারুভাবে লিখিত বা উচ্চারিত যুক্তিনির্ভর বক্তব্য। এই ভাষণ গড়ে ওঠে রাশি রাশি উক্তি (statements)-র সাহায্যে। এই গ্রন্থে মিশেল ফুকো উক্তি বলতে কী বোঝাতে চাইছেন তা খুব সহজবোধ্য নয়। ১৯৭০-এর ডিসেম্বর মাসে, কলেজ দ ফ্রাঁস-এ ফুকো যে উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন এবং যা পরে 'ভাষণের শৃঙ্খলা' (*L'ordre du discours*) নামে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে এই 'উক্তি'র ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হয়েছে।

যেকোনো সামাজিক মানুষকে নিয়ত রাশি রাশি বাক্য ব্যবহার করতে হয় জীবনধারণের জন্য। ধরা যাক এমন একটি বাক্য : 'আজ সন্ধ্যায় সিনেমা যাব'। এটি এমন এক বাক্য যা শোনা মাত্র যেকোনো সমভাষী ও একই সংস্কৃতির শ্রোতা এর অর্থ বুঝবেন। এর কোনো দ্বিতীয় অর্থ নেই এবং এই বাক্যটি উচ্চারিত হওয়ার পর, এর অর্থ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এটি চিরকালের মতো বিদায় নিচ্ছে। এই ধরনের বাক্যকে ব্রিটিশ বা মার্কিন দার্শনিকরা বলেন 'বাচনিক ক্রিয়া' (speech act)। প্রতিটি বাচনিক ক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়া ও উদ্দেশ্য আছে; এমনকি আর এক ধাপ উপরে উঠলে, অর্থাৎ পুরাকালের যাগযজ্ঞ, হোম, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, রাজন্যবর্গ বা শাসকদের বিধিনিষেধ, এ সবই ছিল কোনো বিশিষ্ট ক্রিয়া বা আজ্ঞার বাহক। প্রাচীন গ্রিসের উদাহরণ দিয়েছেন ফুকো তাঁর এই উদ্বোধনী বক্তৃতায়[১২]। সেই সময়ে উচ্চারিত বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থের কোনো দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হত না, কারণ তা ছিল পুরোহিত, রাজন্য, শাসকদের বাক্য। কিছুদিন— এক শতাব্দী— পরে ওই বাক্যগুলির শক্তি লুপ্ত হবার পর হয়ে দাঁড়াল উক্তি। যেটা এখানে ফুকো বোঝাবার চেষ্টা করছেন সেটা এই যে যাগযজ্ঞ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভাষা কীভাবে ধীরে ধীরে পরবর্তী কালে বিমূর্ত দার্শনিক বক্তব্যে রূপান্তরিত হয়ে অর্থহীন হয়ে ওঠে। হেসিয়োড থেকে প্লেটো পর্যন্ত ভাষার এই ক্রমিক চরিত্র-বদলের মধ্যে জন্ম নিয়েছে প্রথমে দর্শন ও পরে নানা জ্ঞান। এটা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাচীন ভারতে বৈদিক যজ্ঞের ঋত্বিক ও শাসকবর্গের ভাষাও পরে বেদান্তের বিমূর্ত উক্তিতে বদলেছিল।

এক এক যুগে এই উক্তি কীভাবে কাজ করে তা নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন সেই যুগের ভাষণের ক্রিয়া-পদ্ধতি যাকে ফুকো বলছেন la pratique discursive (বা the discursive practice)— সম্পর্কে ধারণা। 'জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্বের' এটা একটা প্রধান বক্তব্য। ইতিহাস সম্পর্কে কোনো সামূহিক জ্ঞান আর সম্ভব নয়, কিন্তু যা সম্ভব তা হল এক একটি বিচ্ছিন্ন যুগ বা কালের ব্যবহৃত ভাষণ সম্পর্কে এক বিচ্ছিন্ন জ্ঞান। এই ভাষণ পুরোপুরি নিরবলম্ব নয়; তা গড়ে ওঠে ওই সময় বা যুগের অন্যান্য শক্তির— যথা সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদির— সম্পর্কে। ভাষণের ক্রিয়া-পদ্ধতিও ওই শক্তিগুলির মিলনে প্রস্তুত হয়, যাকে ফুকো বলছেন 'এপিস্টেমে'। এক অর্থে, অন্তত আংশিকভাবে। ফুকোর এই প্রত্নতত্ত্ব ঐতিহাসিক। কিন্তু প্রচলিত, অর্থাৎ উনিশ শতকী, অর্থে ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। এর কারণ, এর থেকে যেকোনো ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা, কার্যকারণ সম্পর্ক বা কোনো নিশ্চয়তা বিচ্ছিন্ন। মিশেল ফুকো এই পদ্ধতিকে তাঁর পরবর্তী রচনায় সর্বাংশে প্রয়োগ করেছেন কি না সেটাই এখন আলোচ্য।

৩

মিশেল ফুকো যখন 'জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্ব' রচনার কাজে হাত দেন তখনই তাঁর এ-প্রত্যয় ছিল যে কোনো একটি নির্দিষ্ট যুগের 'এপিস্টেমে'কে বোঝবার জন্য শুধুই বাচনিক ক্রিয়াপদ্ধতির বিশ্লেষণ যথেষ্ট নয়। জীবনের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সমস্যাগুলির যথা সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদির— সঙ্গে এই ভাষণের যোগাযোগ আবিষ্কার অপরিহার্য। এই সামাজিক, অর্থনৈতিক দিকগুলোকে ফুকো ও তাঁর টীকাকাররা আখ্যা দিয়েছেন অ-ভাষণিক বা non-discursive উপাদান। বস্তুত, ভাষণিক ও অ-ভাষণিকের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টাই 'জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্বে' করা হয়নি— শুধু এর ইঙ্গিত আছে মাত্র। ফুকোর সমালোচকদের এই অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন নয়, কিন্তু এটাও সমানভাবে সত্য যে ফুকোর এ-বইটি মূলত তাত্ত্বিক বা theoretical, সুতরাং উপলব্ধ প্রত্যয়ের যদি কোনো প্রয়োগ এ-বইয়ে না হয়ে থাকে তার জন্য বইটির মূল্যের কোনো হ্রাস হয় না।

তাঁর পরবর্তী রচনায় ফুকো তাঁর রীতি ও প্রযুক্তি বহুলাংশে বদলেছেন। ১৯৭৫-এ প্রকাশিত হয় ফুকোর আর একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই 'নজর ও শাস্তি' (*Surveiller et Punir*)* যা অনেকের মতে এবং আমারও তাই ধারণা, ফুকোর সবচেয়ে সমৃদ্ধ রচনা। এই বইটি সম্পর্কে কোনো আলোচনা করার আগে বইটির রচনাকালে ও ষাটের দশকের শেষের ফরাসি মননশীলতা সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি।

* *Michel Foucault, Discipline and Punish : The Birth of Prison* (Trans. A. Sheridan), New york, Pantheon, 1977.

তিরিশের দশকের মাঝামাঝি ফরাসি লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন; এঁদের মধ্যে আঁদ্রে জিদ ও আঁদ্রে মাল্‌রোর নামে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। দ্বিতীয় যুদ্ধের গোড়ায় হিটলার-স্ট্যালিন চুক্তি ও স্ট্যালিন কর্তৃক কমিনটার্ন ভেঙে দেওয়ার পর এঁরা প্রায় সকলেই মার্কসবাদে আস্থাহীন হন। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর যখন স্ট্যালিনের বহুবিধ পাপাচার ও নৃশংসতার কাহিনি পাশ্চাত্যে আসতে শুরু করল— যেসকল কাহিনীর দলিল সোভিয়েট ঐতিহাসিকরা এখন খুঁড়ে বার করার চেষ্টা করছেন— ধ্রুপদী মার্কসবাদে নতুন করে আস্থা ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব হয়নি। কিন্তু যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের আর্থিক অনটন, মার্কিন মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা ও তজ্জাত আমেরিকান ঔদ্ধত্য ও এবম্বিধ নানা কারণে ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই মার্কসবাদের প্রতি অন্তত আংশিক আকর্ষণ বোধ করেছিলেন ও নিজেদের বামপন্থী হিসাবে ভাবতেন। তখন থেকেই অনেকেই মার্কসবাদকে পশ্চিম ইয়োরোপের অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে বদল করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন জাঁ পল সার্ত্র, মরিস মার্লো পন্তি প্রমুখেরা। যদিও ফুকোর কমিউনিস্ট বন্ধু ছিল একাধিক ও যদিও সার্ত্র-এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক কোনোদিনও খারাপ হয়নি, ফুকো কোনোদিনই এই নয়া-মার্কসবাদীদের দলভুক্ত ছিলেন না এবং তাঁর যেসকল রচনা আমি এ-প্রবন্ধে এযাবৎ আলোচনা করেছি তার থেকে এটা সহজেই প্রতীয়মান হবে যে মার্কসবাদের কয়েকটি মূল বা কেন্দ্রীয় বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান ছিল দুস্তর।

১৯৬৮-তে ফ্রান্সে ঘটে বিরাট ছাত্র-আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে ফরাসি বুর্জোয়া সমাজের কাঠামোর অভ্যন্তরে কণামাত্র পরিবর্তন ঘটেনি, দগলের পদত্যাগ সত্ত্বেও। যেসকল বিদেশি সে-সময় ফ্রান্সে ছিলেন বা যাঁরা ওই আন্দোলনের অব্যবহিত পরে সেখানে গিয়েছিলেন তাঁদের অনেকের কাছে ওই আন্দোলন একটা সাময়িক রাজনৈতিক প্রহসন ছাড়া আর কিছু ছিল না।

কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। ওই আন্দোলন তৎকালীন ফরাসি বামপন্থী চিন্তাকে, অন্তত কিছুদিনের জন্য, গভীরভাবে নাড়া দেয়। ওই আন্দোলনের ফলে একটা সত্য উদ্‌ঘাটিত হল যে সরকারি, বা রাষ্ট্রিক দমনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার শুধু সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণিরই নয়— একমাত্র যে-শ্রেণির কথা বারবার ধ্রুপদী মার্কসবাদে বলা হয়েছে— এ-বিদ্রোহের অধিকার ও দায়িত্ব সমাজের অন্যান্য শ্রেণিভুক্তদেরও আছে। যথা— ছাত্র, শিক্ষক, আমলাতান্ত্রিক কর্মচারী, এমনকি হাসপাতালের নার্স ইত্যাদিও, অর্থাৎ মার্কস-নির্ণীত ডায়ালেকটিক্স বা দ্বন্দ্বের বাইরেও এমন কোনো বিদ্রোহ বা বিপ্লব ঘটতে পারে যার কোনো তাৎক্ষণিক সামাজিক প্রভাব সহজে প্রতীয়মান না হলেও যা অন্তত কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে নতুন সামাজিক বা রাজনৈতিক চিন্তায় প্রবুদ্ধ করতে পারে। ব্যারি স্মার্ট, মার্ক পোস্টার প্রমুখ ব্রিটিশ ও মার্কিন বামপন্থীরা যাঁরা অন্তত সীমিত অর্থে এখনও মার্কসবাদী ও ফুকোর অনুরাগী, তাঁরা ওই '৬৮-র ছাত্র-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে

ও তাঁদের নয়া-মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণে ফুকোর শেষ রচনাগুলির ব্যাখ্যা করে তাঁকে দলে টানতে প্রচেষ্ট হয়েছেন। এ-ব্যাপারে কোনো বিস্তারিত আলোচনা অবান্তর[১৩]। তাঁদের নাম এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে উল্লিখিত হল শুধু এই কারণে যে এটা খুবই সম্ভব যে মিশেল ফুকো ১৯৬৮-র আন্দোলনে কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং যে নিস্পৃহ প্রত্নতাত্ত্বিকতা তাঁর পূর্ববর্তী রচনাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল তা থেকে তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে মুক্ত হন তাঁর পরবর্তী 'নজর ও শাস্তি'র মধ্যে। কিন্তু ফুকো প্রচলিত উদারপন্থী অর্থে বা মার্কসীয় অর্থে ইতিহাসে আর ফিরে যাননি। যে-পদ্ধতির সাহায্যে তিনি এই নতুন লেখার চেষ্টা করেন তাকেই তিনি বলেছেন বংশানুচরিত (genealogy)। এ-পদ্ধতির আবিষ্কারক ও প্রথম অনুশীলক ফ্রিডরিশ নীচএ, যাঁর বিখ্যাত দীর্ঘ প্রবন্ধ 'নৈতিকতার বংশানুচরিত'[১৪] ফুকোর শেষ দিকের লেখার পদ্ধতিকে গভীরভাবে অনুপ্রেরিত করে। এ-পদ্ধতি যেকোনো— হেগেলীয় বা মার্কসীয়— ডায়ালেকটিকাল বা দ্বান্দ্বিক চিন্তা থেকে একেবারেই বিভিন্ন। ডায়ালেকটিক্সে আকস্মিকতা, দুর্জ্ঞেয়তা বা সন্দেহ, অবিশ্বাস বা কোনো আশাতীত দুর্বিপাকের স্থান নেই। এই চিন্তা এক সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যবোধ (teleology)-এর মধ্যে প্রনিহিত।

প্রতি যুগে এক একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা তার নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দ্বের চাপে বহুলাংশে (কিন্তু সর্বাংশে নয়) ধ্বংস হয়ে আরও উন্নত কোনো অবস্থায় পৌঁছায়। ওই উন্নত অবস্থা পুনরায়, নির্দিষ্ট সময়ে, তার নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দ্বের গতিতে ভেঙে বদলায়। এই গতি নিরন্তর ও শাশ্বত, এর মধ্যে পার্থক্য বা বিভিন্নতার কোনো স্বকীয় অস্তিত্ব নেই, যেহেতু তা অবশ্যম্ভাবী সংশ্লেষে (synthesis) সামূহিক বাস্তবের সঙ্গে একীভূত হতে বাধ্য। বংশানুচরিত পদ্ধতিতে, কোনো উদ্দেশ্যবোধ নেই; নেই কোনো ক্রমিক অগ্রগতির ইঙ্গিত। এখানে পার্থক্য শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। নীচএ-র গৃহীত পদ্ধতিতে বিশ্লেষক বর্তমান পরিস্থিতির বিচার দিয়ে শুরু করে অতীতে ফিরে যান; পরীক্ষা করেন কীভাবে তথাকথিত অনগ্রসর, আদিম সমাজব্যবস্থায় একই ধরনের নৈতিকতা, বিধিনিষেধ, সামাজিক বা ধর্মীয় রীতিনীতির প্রয়োগপদ্ধতি ছিল; তিনি ফিরে আসেন আবার আধুনিক বা বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং চেষ্টা করেন এটা দেখাবার যে কীভাবে নৈতিকতা, আইন বা শাসনপদ্ধতি একই— যদিও অতীত ও বর্তমানের পার্থক্য রয়েছে অটুট। এই পদ্ধতি অনেকের— বিশেষত পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীদের— আত্মসন্তোষকে ভেঙে দিয়েছে এই কারণে যে যদিও যুগ ও সংস্কৃতির পার্থক্য অসীম, কিন্তু যাকে ফুকো বলছেন 'ক্ষমতার প্রয়োগপদ্ধতি' (technology of power) বহুলাংশে এক। এবার দেখা যাক, তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ, অস্বস্তিকর কিন্তু সুখপাঠ্য 'নজর ও শাস্তি'তে এ-পদ্ধতি কীভাবে প্রয়োগ করেছেন। তিনি এ-ব্যাপারে কতটা সফল হয়েছেন তা পরে আলোচ্য।

১৭৫৭-তে ফরাসি নাগরিক (বা প্রজা) রবেয়ার ফ্রাঁসোয়া দামিয়াঁস (Robert Francois Damiens) একটি শাণিত ছুরির সাহায্যে তৎকালীন ফরাসি রাজা পঞ্চদশ লুই (Louis

XV)-কে হত্যার চেষ্টা করেন। এচেষ্টা সফল হয়নি, কিন্তু সে যুগের আইনের চোখে রাজহত্যা ও তার প্রচেষ্টা এ-দুই-ই এক। অবিশ্বাস্য রকমের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার সঙ্গে দামিয়াঁসের দেহকে পরিক্লিষ্ট করে, তাকে জীবন্ত দাহ করা হয় প্যারিসে। এই দৈহিক উৎপীড়নের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে ফুকোর 'নজর ও শাস্তি'। বিবমিষার উদ্রেককারী এই বর্ণনা—যা ফুকো উদ্ধার করেছেন একটি পুরোনো দস্তাবেজ থেকে—অনেক আধুনিক ব্যক্তিকে হয়তো বিব্রত করবে। কিন্তু এই ঘটনা বা নিদারুণ শাস্তির মধ্যে আইনগত যুক্তির অভাব ছিল না। যদি রাজা হয় জাতির শৃঙ্খলা ও সংহতির প্রতীক ও সমাজ-কলেবরের রূপক, তাহলে সেই কলেবরের উপর আঘাতের শাস্তি হতে পারে অপরাধীর দেহকে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক ক্লেশ দিয়ে ধ্বংস করা। এ-যুগ অবশ্যই চিরস্থায়ী ছিল না। এল যুক্তির যুগ ও চোখ ধাঁধানো আলো ও ফরাসি বিপ্লব। আর সেই সঙ্গে অবলুপ্ত হল রাজতন্ত্র ও নৃপতির প্রতীক-মূল্য। দার্শনিক, ভাবুক, সমাজ-সংস্কারকরা ইতিমধ্যেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন অপরাধীদের সাধারণ্যে শাস্তি না দিয়ে, তাদের ধ্বংস না করে, ধীরে ধীরে আয়ত্তে এনে, সংস্কৃত করে, সমাজে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনায়। লক্ষ করুন যে আইন-চিন্তার এই বদলের ফলে, শরীর থেকে গুরুত্ব সরে যাচ্ছে মনে, আধ্যাত্মিকতায়, যুক্তিতে।

রাজতান্ত্রিক আইনে শাস্তি, এমনকি প্রাণদণ্ড, হতো সাধারণ্যে। সেটা ছিল কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা বা নৃপতির স্বরাটত্বের অনুষ্ঠান। কিন্তু বিপ্লবী ফ্রান্সে, যুক্তির প্রোজ্জ্বল আলোয়, সাধারণতন্ত্রের নতুন সংবিধানে কেন্দ্রচ্যুত ক্ষমতা তার প্রয়োগপদ্ধতি বদলাল। বলা বাহুল্য, মিশেল ফুকো এখানে, এই গ্রন্থে, সাড়ম্বরে আইনের ইতিহাস লিখতে বসেননি। তাঁর উদ্দেশ্য নয় আইনগত চিন্তায় কোনো বিবর্তন আবিষ্কার করা। বরং উলটোটাই; অর্থাৎ বিবর্তনের অনুপস্থিতি। কীভাবে এক এক যুগে জ্ঞান ও চিন্তা, যার প্রকাশ হয় উচ্চারিত কিংবা লিখিত ভাষণে, সেই যুগের আইন ও ক্ষমতাকে সমর্থন জানায় এবং গড়ে তোলে এক একটি ক্ষমতার যন্ত্রকে। বিপ্লবোত্তর ইয়োরোপে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত— সেই যুক্তি ও মানব-হিতৈষণার যুগে, ক্ষমতার এক নতুন তন্ত্র গড়া হল, যার নাম 'প্যানঅপটিকন' (Panopticon), যার আক্ষরিক বাংলা অর্থ 'সর্বদ্রষ্টা'। এই যন্ত্রের আবিষ্কারক ছিলেন মহাপ্রাণ জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham, 1748-1832) । এটা ধরে নেওয়া বোধ হয় অন্যায় হবে না যে পথভ্রষ্ট, আইনভঙ্গকারী, হতভাগ্যদের দুঃখ ও দুর্দশায় এঁর হৃদয় সতত বিগলিত থাকত; কীভাবে এই দুর্ভাগা অপরাধীদের ক্ষমতার আয়ত্তে এনে তাদের আবার সমাজে ফিরিয়ে এনে নতুন জীবন দেওয়া যায়, সম্ভবত এটাই ছিল ওই বরেণ্য পুরুষের শিরঃপীড়া। অষ্টাদশ শতকের শেষে, ইংরেজ বেন্থাম 'প্যানঅপটিকন' নামে একটি রচনা প্রকাশ করেন। সমগ্র রচনাটি একটি নতুন ধাঁচের কারাগারের পরিকল্পনা। ফুকোর রচনায়, বেন্থামের পরিকল্পনার যে-চিত্র পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে এই: একটি বিশাল গোলাকৃতি কারাগার; ঠিক

কেন্দ্রস্থলে একটি মিনার, যাতে থাকবে অনেক জানলা যা দিয়ে দেখা যাবে গোলাকৃতি অংশ বা বৃত্তের ভিতর দিকের সবকিছু। বৃত্তাকার বাড়িতে থাকবে রাশি রাশি শ্রেণিবদ্ধ ছোটো ছোটো ঘর বা 'সেল'। প্রতিটি সেল-এ দুটি জানলা— একটি মিনারের দিকে, অপরটি বাইরের দিকে—সূর্যালোকের জন্য। এই সেল বা ছোটো ঘরগুলিতে থাকবে অপরাধীরা, আর মিনারে থাকবে এক বা একাধিক লোক যে বা যারা নজর রাখতে পারবে প্রতিটি সেল-এ, জানতে পারবে কোথায় কী ঘটেছে, কিন্তু যাদের কেউ দেখতে পাবে না। এক বা কয়েক জোড়া চোখ, ক্ষমতার প্রতীক, অন্তহীনভাবে আয়ত্তে রাখবে সমাজবিরোধী, আইনভঙ্গকারীদের উপর। বেন্থামের রচনার একটি নক্‌শাও ছিল, যা ফুকো অন্য কিছু নকশার সঙ্গে দিয়েছেন তাঁর বইয়ে।

এই পরিকল্পনার প্রতীকত্ব গভীর এবং এর তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নজরদাতা ক্ষমতা এখানে অদৃশ্য ও আকারহীন। ফুকো বলেছেন যে 'ব্যবস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ ক্ষমতাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নৈর্ব্যক্তিক করে' (automatise et désindividualise) [১৫]। ক্ষমতা থেকে ব্যক্তির উপস্থিতিকে সরিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে ফুকো একটি ইন্টারভিউয়ে বেশ কিছু মূল্যবান কথা বলেছেন, যা আমরা কিছু পরে বিবেচনা করব; যেটা এক্ষেত্রে এখন লক্ষণীয় তা এই যে যুক্তির যুগ অষ্টাদশ শতকে যা মানবপ্রেমের প্রতীক হয়ে আবির্ভূত হয়েছিল তা মূলত একটা বিশাল দানবীয় যন্ত্র মাত্র। এবং বেন্থামের ওই পরিকল্পনা অনুযায়ী সারা উনিশ শতকব্যাপী ইয়োরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর কারাগার প্রস্তুত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, বেন্থামের আদি পরিকল্পনা ধীরে ধীরে আরও উন্নত, আরও কার্যকর শাসন ও নজরের যন্ত্রে পরিণত হয়।

১৮৪০-এ আরু রমঁ্যা (Harou Romain) কর্তৃক প্রকাশিত একটি বইয়ে ছাপা প্যানঅপটিকনের নক্‌শা দেখলেই বোঝা যায় কীভাবে বেন্থামীয় কল্পনার সারাংশ উনিশ শতকেও অটুট ছিল। কোন সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে রাজতন্ত্রের মৃত্যুর পর বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রে অপরাধীদের শাস্তির এই ভয়ানক ও সর্বদ্রষ্টা ব্যবস্থা নেওয়া হল তার কোনো বিশদ ব্যাখ্যা ফুকোর এই রচনায় নেই।

ফুকো সহজ ব্যাখ্যাকরণে অনীহ, এ-অভিযোগ বারবার ফুকোর বিরুদ্ধে এসেছে এবং সে অভিযোগ সর্বাংশে ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু যেকোনো ব্যাখ্যার কাজে অতি জটিল সমস্যা বিপজ্জনকভাবে সরল হয়ে উঠতে পারে, আর সেইসঙ্গে দেখা দিতে পারে সমূহকরণের (totalising) প্রলোভন। যদিও ফুকো সে-প্রলোভন পুরোপুরি এড়াতে পারেননি এবং অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যাখ্যার কোনো ইঙ্গিত যে তাঁর এই রচনায় নেই তাও নয়।

রাজতান্ত্রিক শাস্তির উন্মুক্ত অনুষ্ঠান থেকে বুর্জোয়া শাসনপদ্ধতির গোপন মনস্তাত্ত্বিক অত্যাচারে রূপান্তরকে ফুকো পুঁজিবাদী অর্থনীতির আরও উন্নত অবস্থার সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং ব্যাখ্যাতাত্ত্বিক সামূহিকতা দেখা দিয়েছে দু-এক বার। যেমন ধরুন ফুকোর নিম্নলিখিত মন্তব্য। বেন্থামের প্যানঅপটিকন বা সর্বদ্রষ্টা কীভাবে আমাদের আধুনিক

সমসাময়িক সমাজের মানুষদের ক্রমাগত শাসনে রাখছে এবং সমাজে সার্বিকভাবে গৃহীত তথাকথিত স্বাভাবিকতাকে মেনে নিতে বাধ্য করেছে সে সম্পর্কে ফুকোর মত : 'স্বাভাবিকতার বিচারক এখানে সর্বত্রবিরাজী। আমরা রয়েছি শিক্ষক-বিচারক, অধ্যাপক-বিচারক, সমাজসেবী-বিচারকের সমাজে। এদের সকলেরই কাজ স্বাভাবিকতার সার্বভৌম রাজত্ব চালিয়ে নিয়ে যাওয়া' (tous fontrégner l'universalité du normatif) [১৬]।

এইভাবে ফুকোর এই রচনায় প্রচলিত ব্যাখ্যার রীতি (hermeneutics) মাঝে মধ্যে ফিরে আসছে। ফুকোর কিছু ইন্টারভিউ ও খুচরো রচনার ইংরেজি অনুবাদের একটি সংকলন *Power / knowledge*— শিরোনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়েছে। ফুকোশীয় চিন্তায় উৎসাহী যেকোনো ব্যক্তির কাছে সংকলনটি অত্যন্ত মূল্যবান। 'নজর ও শাস্তি' প্রকাশিত হওয়ার দু-বছর পরে যখন বেন্থামের 'প্যানঅপটিকন'এর আর একটি আধুনিক ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তখন এর ভূমিকা স্বরূপ ফুকোর ইন্টারভিউও প্রকাশিত হয়। এটি *Power / knowledge*-এ মিলবে এবং এর মধ্যে ফুকো আরও কয়েকটি নতুন কথা যোগ করেছেন, যেগুলি এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

বেন্থাম জানতেন যে তিনি যা সৃষ্টি করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতার সহজ ও কার্যকর অনুশীলন। সে-যুগের অর্থনীতিবিদরা চিন্তা করেছিলেন সম্পদ সম্পর্কে। এবং মানুষ এক অর্থে সম্পদ, সে সম্পদের স্রষ্টা ও ভোগী। বেন্থাম কিন্তু প্রশ্নটিকে দেখেন ক্ষমতা ও দমনের পরিপ্রেক্ষিতে। সেই দৃষ্টিকোণে রুশো ও বেন্থাম ছিলেন পরস্পরের সম্পূরক। রুশোর প্রধান চিন্তা ছিল স্বচ্ছতা বা স্বচ্ছ সমাজ (transparent society), কারণ ভাবনা থেকে যেভাবেই হোক তমসাকে দূর করাই ছিল তাঁর ঐকান্তিক বাসনা। বেন্থামের চিন্তায় সবকিছুকে দৃশ্যমান করার উদ্দেশ্যই ছিল মূল, কিন্তু তার অন্তিম পরিণতি হল দমনকারী শক্তিকে সহায়তা করা—যার সঙ্গে রুশোর চিন্তার কোনো মিল নেই।

তাহলে কেন এই যন্ত্রের মধ্যে সে-যুগের লোকেরা খুঁজে পেয়েছিলেন মানবপ্রেম? এ-প্রশ্নের উত্তরে ফুকো বলছেন যে সেই যুগটাই ছিল আদ্যন্ত আঁধার-বিদ্বেষী। অন্ধকারের প্রতি জন্মেছিল এক গভীর আতঙ্ক। প্রচেষ্টা ছিল সমাজের সব তলা থেকে আঁধারকে সরিয়ে দেওয়া, ধ্বংস করা নিষ্প্রদীপ ঘরকে, যেখানে চলছে অহোরাত্র রাজতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র কিংবা কোনো নিষিদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কিংবা পুরোহিতশ্রেণির কোনো কুটিল চক্রান্ত। প্রাচীন তমসালিপ্ত ভেঙে পড়া দুর্গ, কনভেন্ট, বাস্তিল, এ সবই ছিল তীব্র ঘৃণা ও সেইসঙ্গে কুসংস্কারী ভয়ের প্রতীক।

ফরাসি বিপ্লবের সময়ে বা একটু আগে অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সে-যুগের ইংরেজি বা জার্মান গোথিক (Gothic) উপন্যাসগুলি। ফুকো অবশ্য একমাত্র শ্রীমতী অ্যান্ র‍্যাডক্লিকের নাম করেছেন। এই উপন্যাসগুলি সৃষ্টি করেছিল এক কাল্পনিক, রহস্যময় জগৎ, যার মূল উপাদান ছিল বিধ্বস্ত দুর্গ ও তার পাথরের দেওয়াল,

গুপ্তপথ, চোরা সিঁড়ি, অদৃশ্য ব্যক্তিদের চাপা কণ্ঠস্বর, অস্ফুট পদধ্বনি, বড়ো চৌকো কুলুঙ্গিতে শুইয়ে রাখা বাসি মৃতদেহ; অরণ্য, গুহা, মধ্যরাত্রে অরণ্যপথে পথভ্রষ্টা অসহায়া নায়িকা ইত্যাদি। সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে ফুকোর এই বক্তব্যগুলির একটি বিশেষ মূল্য থাকতে পারে। কিন্তু মূল বক্তব্য আসলে এখানে এই যে সেই তীব্র উজ্জ্বলতার দিনে, স্বচ্ছ যুক্তির মধ্যাহ্নে— যে যুগকে ইংরেজরা বলেন 'এন্‌লাইটেনমেন্ট', ফরাসিরা বলেন 'এক্ল্যারসিস্‌মাঁ', আর জার্মানরা আখ্যা দেন 'আউফ্‌ক্লেরুং'— সেই যুগে অন্ধকারের প্রতি এই শিউরে ওঠা আতঙ্ক, এর ফল পাশ্চাত্য চিন্তায় সর্বতোভাবে শুভংকর হয়নি। অন্তত ফুকোর তাই ধারণা।

প্যানঅপটিকন বা ক্ষমতার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। যা আপাতদৃষ্টিতে ছিল মানব-হিতৈষণা, তার মূলে ছিল আরও অনেক উন্নত ধরনের ক্ষমতার প্রয়োগপদ্ধতি বা technology of power। এ-ব্যাপারে ফুকোর চিন্তায় কোনো সন্দেহের অস্তিত্ব নেই : '...no doubt Bentham is one of the most exemplary inventors of technologies of power।' [১৭]

এখন প্রশ্ন এই যে ক্ষমতার এই অনুশীলনে লাভবান হচ্ছেন কে? কার এই ক্ষমতা? এ-প্রশ্নের জবাবে ফুকো যা বলেছেন সেটাই তাঁর শেষজীবনের মূল ও প্রধান বক্তব্য। বস্তুত, আধুনিক জগতে ক্ষমতা এমনভাবে কেন্দ্রচ্যুত হয়েছে যে তার আর কোনো বিশেষ স্বত্বাধিকারী নেই; সমাজের সকলেই এই যন্ত্রের মধ্যে এক একটি অংশ।

It is a machine in which everyone is caught, those who exercise power just as much as those over whom it is exercised, ...Power is no longer substantially identified with an individual who possesses or exercises it by right of birth; it becomes a machinery that no one owns. Certainly everyone does not occupy the same position; certain persons preponderate and permit an effect of supremacy to be produced. This is so much the case that class domination can't be exercised just to the extent that power is dissociated from individual might.[১৮]

যদিও শ্রেণিগত ক্ষমতার কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে, ফুকোর ক্ষমতাবিষয়ক চিন্তা যে একেবারেই মার্কসবাদী নয়, তা উপরের ওই উক্তি থেকে সহজেই বোধ্য হবে। কারণ, ক্ষমতা এখানে কোনোভাবেই কেন্দ্রীভূত নয়। যদি ক্ষমতার যন্ত্রের কোনো স্বত্বাধিকারী না থাকে, তাহলে কোনো বিশেষ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণিকে সরিয়ে দিয়ে এ-যন্ত্রের বিলুপ্তিসাধন অসম্ভব। এবং শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি সম্পর্কে ফুকোর ধারণাও অ-মার্কসবাদী।

The power of the bourgeoisie is self-amplifying in a mode not of conservation but of successive transformations. Hence the fact that its form is not given in a definitive historical figure as is that of feudalism. [তদেব, পৃ.১৬০]।

অর্থাৎ, হেগেলীয়-মার্কসিস্ট চিন্তা থেকে এই ফুকোশীয় চিন্তা একেবারেই আলাদা, বহুলাংশে সরাসরি বিপরীত।

তাঁর শেষ ও বিশাল রচনা 'যৌনতার ইতিহাস' (*Histoire de la sexulité*)-এ মিশেল ফুকো তাঁর ক্ষমতা বিষয়ক চিন্তাগুলিকে আরও গাঢ় করেছেন। এরই প্রথম খণ্ডের সহ-শিরোনাম 'জ্ঞানের এষণা' (La volonté de savoir)* সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি মন্তব্যের প্রয়োজন বোধ করি। পাশ্চাত্যের নরনারীর যৌনজীবনের বিশ্লেষক ব্যাখ্যা এ বই নয়— যে ধরনের বই ক্র্যাফ্‌ট-এবিং বা হ্যাভলক এলিস লিখে গেছেন। এই দীর্ঘ রচনার— বিশেষত প্রথম খণ্ডের— মূল বস্তু-বক্তব্য হল কীভাবে ক্ষমতার বহুবিধ প্রয়োগে মানুষের যৌনজীবনকে আয়ত্তে আনা হয়েছে।

যুদ্ধোত্তর একটি প্রচলিত ধারণাকে আঘাত হেনে ফুকো শুরু করেছেন তাঁর এই নিবন্ধ। ধারণাটি ফ্রয়েডীয়। যৌন অবদমনের (repression) ফলে মানবিকতার যে লোপ ও বিকৃতি হয়েছে বলে ফ্রয়েডের ধারণা হয়েছিল, সেই ধারণাকে মার্কসীয় বোতলে ঢালবার প্রচেষ্টা করেছিলেন ভিলহেল্‌ম রাইখ (Wilhelm Reich)। যদি রাইখ ও হার্বার্ট ম্যারকুস্যা প্রমুখদের প্রতীতি হয় যে পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তার যৌনব্যর্থতা, ফুকো সে-ধারণাকে পরিত্যাগ করেছেন, প্রায় উলটে দিয়েছেন। যৌনব্যর্থতার কোনো লক্ষণই আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে প্রতীয়মান নয় বরং প্রতিমুহূর্তে এই যৌনজীবন ক্ষমতা প্রয়োগের বহু বিচিত্র মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছে। ফুকোর মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই এখানে ওই ক্ষমতার রূপকে আলোচনার সাহায্যে বিশ্লেষণ করা। এই আলোচনার প্রাক্কালে বা উপক্রমণিকায় ফুকো যে-কয়েকটি উক্তি করেছেন সেগুলো ভেবে দেখবার মতো।

প্রাচীন গ্রিস, রোম, চীন, জাপান, হিন্দুভারত ও ইসলামীয় দেশগুলিতে 'কামশিল্প' (*Ars erotica*) নামে একটি বস্তু ছিল। এই শিল্প ইয়োরোপেও অবশ্য মাঝে মধ্যে দেখা দিয়েছে, কিন্তু কোনোদিনও গুরুত্ব পায়নি। কারণ, মধ্যযুগের পর থেকেই সেখানে এসেছে যৌনতা সম্পর্কে জ্ঞান (Scientia sexualis)। এর সূত্রপাত খ্রিস্টীয়দের স্বীকারোক্তি বা Confession থেকে। রিফরমেশন ও কাউন্টার-রিফরমেশনের পর এই স্বীকারোক্তির মধ্যে প্রবেশ করল আরও তীব্র এক পাপবোধ। যৌনক্রিয়া সম্পর্কিত স্বীকারোক্তিতে উঠল নানাবিধ মানসিক বিকৃতির প্রশ্ন। এই ঐতিহ্যেরই চরম পরিণতি ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণে, যা ইতিহাসেরই একটি অংশ মাত্র। এ-কথাটা অবশ্য কিছু নতুন নয়।

তাঁর 'উন্মাদনার ইতিহাস'এ ফ্রয়েডকে ইতিমধ্যেই আর একটি ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের মধ্যে প্রনিহিত করেছেন ফুকো। কিন্তু এই গ্রন্থে ফুকোর মূল অন্বেষণ কীভাবে সামাজিক ক্ষমতা মানুষের যৌনজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে তাকে নতুন খাতে প্রবাহিত

* Michel Foucault, *The History of Sexuality*, Vol. I. An Introduction (Trans. R. Hurley); New York, Pantheon, 1978.

করেছে। আবার বলছি, সমস্যাটা এখানে অবদমন বা repression-এর নয়। অষ্টাদশ শতক থেকেই জনসংখ্যা হয়ে দাঁড়াল রাষ্ট্রীয় দুশ্চিন্তা। এবং এখানেই উপস্থিত হচ্ছে যাকে ফুকো ক্রমাগত আখ্যা দিয়েছেন 'ক্ষমতার প্রয়োগপদ্ধতি' (les techniques de pouvoir)। কারণ, জনসংখ্যা শ্রম ও সম্পদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; জনসংখ্যার মারাত্মক হ্রাস ও বৃদ্ধি, এ দুই-ই সম্পদের সৃষ্টি ও ভোগকে প্রভাবিত করে। অর্থনৈতিক সমস্যা ও উৎপাদনের প্রশ্নের কেন্দ্রে পৌঁছানর জন্য চাই প্রত্যেকটি খবর, জন্মের হার, বিবাহের বয়স, বৈধ ও অবৈধ সন্তানদের সংখ্যা ইত্যাদি। অর্থাৎ জ্ঞান। ফুকোর মতে জ্ঞান ও ক্ষমতা এক ও অভেদ। এ-দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, অন্তত জ্ঞানচর্চার যে-পদ্ধতি এযাবৎ চলে এসেছে। তাঁর এই রচনার এই অংশে ফুকো অবশ্যই ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করেছেন রাষ্ট্রে।

অষ্টাদশ শতকের পর থেকেই যৌনতার উপর লিখিত রচনা বা ভাষণের প্লাবন শুরু হল এবং এ-ব্যাপারে ফুকোর মন্তব্য: 'যৌনতার উপর এই ভাষণ ক্ষমতার বাইরে কিংবা তার বিরুদ্ধে বৃদ্ধি পায়নি; বৃদ্ধি পেয়েছিল ঠিক যেখানে ক্ষমতার অনুশীলন চলছিল এবং তার মাধ্যম হিসাবে[১৯]।'

উনিশ শতকের পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া সমাজে শুরু হল এমন কিছু যৌনাচার যা প্রথাসিদ্ধ সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃত যৌনক্রিয়া নয়। এককথায় বিকার বা perversion, যার কয়েকটি উদাহরণ ফুকো দিয়েছেন। অর্থাৎ ক্ষমতার দ্বারা অবদমিত না হয়ে, কল্পনার সাহায্যে যৌনক্রিয়াকে আরও মুক্ত ও বহুমুখী করার চেষ্টা। এইখানে ফুকো ক্ষমতা সম্পর্কে এক নতুন ধারণা উপস্থিত করছেন। ক্ষমতার প্রয়োগমাত্রই দমন ও ক্ষয় নয়। তার একটি সদর্থক (positive) দিকও আছে ব্যাপারটা অনেকের কাছে হেঁয়ালি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বস্তুত তা নয়। যেখানেই আছে শক্তি বা ক্ষমতার ব্যবহার সেখানেই থাকবে প্রতিরোধের অদম্য স্পৃহা। যখন আদিষ্ট হচ্ছে যে এই যৌনাচার অন্যায়, গর্হিত, বিকার তখনই আদেশের বিরুদ্ধে অমান্যতার প্রেরণা।

বেন্থামের প্রসঙ্গে ফুকো ইতিমধ্যেই বলেছেন যে প্যানঅপটিকনের মূল উদ্দেশ্য সর্বতোভাবে সফল হয়নি, কারণ সর্বদ্রষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রয়াস এসেছে। এককথায় ক্ষমতা শুধু নঞর্থক (negative) নয়; তার একটি সৃজনশীল চরিত্র আছে। এটা মূলত ফ্রিডরিশ নীচএ-রই বক্তব্য। যদি ফুকো সর্বতোভাবে মৌলিক নাও হন, তিনি আমাদের ক্ষমতা-সম্পর্কিত কতকগুলো প্রচলিত ধারণাকে বদলাতে চেষ্টা করেছেন তাঁর 'যৌনতার ইতিহাস'-এ।

ক্ষমতার যে আইনগত ও নঞর্থক রূপ আমরা সহজে গ্রহণ করেছি, সেটা উলটে দিয়ে ফুকো এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ক্ষমতা মানেই শুধু নিষেধাজ্ঞা নয়, কারণ নিষেধাজ্ঞাকে প্রতিরোধ করার আকাঙ্ক্ষাও একধরনের ক্ষমতা। সাধারণত আমরা ক্ষমতা বলতে বুঝি একটা বিশেষ গুণ বা অধিকার যার অধিকারীর প্রয়োজন আর এক

ব্যক্তির যার উপর এই ক্ষমতা আরোপিত হতে পারে। 'ক' নামক ব্যক্তির ক্ষমতার কোনো মূল্য নেই, যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি 'খ' নামক ব্যক্তিকে আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা দিতে পারছেন। কিন্তু ফুকোশীয় চিন্তায় ক্ষমতার রূপ অন্য। ক্ষমতা এখানে রাজাহীন (le pouvoir sans le roi)। ওঁর মতে ক্ষমতা চারদিকে বিক্ষিপ্ত রয়েছে; এই উপস্থিতি ও প্রয়োগের রূপ সর্বত্রব্যাপী। এটা রাষ্ট্রের করায়ত্ত নয়; এটা কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণির হাতেও নেই। বস্তুত, ক্ষমতা রাজাহীন কেন্দ্রহীন এবং এই ক্ষমতাই জীবনকে সম্ভব করছে। ক্ষমতা গড়ে উঠছে শক্তির সম্পর্কের বৃদ্ধিতে, নিরন্তর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। ক্ষমতা নীচের তলা থেকে আসতে পারে, অর্থাৎ একমাত্র শাসক-শাসিতের যুগ্ম (binary) সংঘর্ষেই এর ব্যাখ্যা হয় না। উৎপাদনের যন্ত্র, পরিবার, ছোটো সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, নানাবিধ ছোটোবড়ো সংস্থার একটানা বহুরূপী সংঘাতে সমাজের মধ্যে অহোরাত্র সৃষ্টি হচ্ছে যাকে ফুকো বলেছেন clivage বা বিদারণ। ফাটা বা চিড়। অর্থাৎ ফুকো, তাঁর এই শেষ রচনায় ক্ষমতাকে শ্রেণি-সংঘর্ষ, মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষ বা অন্য কিছুতেই কেন্দ্রীভূত করতে নারাজ। ক্ষমতাকে কেন্দ্রচ্যুত করে বলেছেন: 'ক্ষমতাকে কোনো কেন্দ্রবিন্দুর প্রাথমিক অস্তিত্বের মধ্যে সন্ধান করা উচিত হবে না' (il ne fant pas la chercher dans l'existence premicre d'un point central)[২০]। ক্ষমতার ভিত সর্বদাই গতিশীল (le socle mouvant)।

ফুকো শুধু ক্ষমতাকে কেন্দ্রচ্যুতই করেননি, ডায়ালেকটিক্সের অপ্রমেয় উদ্দেশ্য-বোধ ও তার অনিবার্য প্রগতি থেকে ফুকোর চিন্তা একেবারেই মুক্ত। একাধারে ক্ষমতাকে বিক্ষিপ্তরূপে দেখেছেন তিনি, শুধু শ্রেণি-স্বার্থের লড়াইয়ের মধ্যে সীমিত না রেখে। অন্য ধারে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন সমাজের সংখ্যালঘুদের উপর। এক অর্থে এই চিন্তা খুবই নৈরাশ্যবাদী, কিন্তু আধুনিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ফুকোর দর্শনের ব্যাখ্যা সম্ভব, যেমন মার্ক পোস্টার দেখিয়েছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কীভাবে প্যানঅপটিকনের নব্যতম রূপ দেখা দিয়েছে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থায়, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিশদভাবে খবর রাখা সম্ভব[২১]। ক্ষমতার রূপকে বিক্ষিপ্ত করে ফুকো আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সমাজের প্রায় প্রত্যেক স্তরে ও সংস্থায়।

ধরা যাক, পরিবার বা family একটি সামাজিক সংস্থা। এই পরিবারের অভ্যন্তরে ক্ষমতার সংঘর্ষ ও দমনেচ্ছা চলছে নিয়ত। সারা উনিশ শতক ধরে যখন ইয়োরোপীয় সমাজ কতকগুলো গভীর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়েছিল, এক নতুন ধরনের— পরিবার-বিরোধী বা পিতাপুত্রের ক্ষমতার সংঘর্ষকে সম্বল করে— রচনা আবির্ভূত হতে শুরু করে। এর নাজির মিলবে, স্তাঁদালের 'অঁরী ব্রুলারের জীবন' (*La vie de Henri Brulard*) থেকে শুরু করে ওই শতকের শেষে লেখা স্যামুয়েল বাট্‌লারের মৃত্যুহীন ইংরেজি উপন্যাস 'দা ওয়ে অব অল ফ্রেশ' পর্যন্ত বহু সাহিত্যিক রচনায়। স্বামী-স্ত্রীর

মধ্যেকার ক্ষমতার লড়াই ও মারাত্মক পারস্পরিক ঘৃণাও চিত্রিত হয়েছে বহু উপন্যাসে। এ ব্যাপারে, জর্জ সিমেনঁ (Georges Simenon)-র 'বিড়াল' (*Le Chat*) উপন্যাসটিও উল্লেখ্য।

স্বামী-স্ত্রীর শক্তি প্রয়োগ ও তজ্জাত ঘৃণার কিছু নজির আছে ভারতীয় বাংলা সাহিত্যেও। পঞ্চাশের দশকে, যখন বাঙালি হিন্দু বুর্জোয়া এক ভাঙনের মুখোমুখি হন, যখন স্ত্রী-শিক্ষার প্রথম সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিণাম দেখা দিতে শুরু করে, বাড়ির মেয়েরা বা কুলবধূরা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চাকুরিজীবী হয়ে আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করতে শুরু করেন, তখনই হিন্দুবিবাহ বা বিবাহিত জীবনের সনাতন ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধারণার মধ্যে বা সাতপাকে বাঁধা রূপকথায় ফাট ধরে— যাকে ফুকো বলেছেন clivage। ওই পঞ্চাশের দশকেই একটি অতিশয় জনপ্রিয় সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল, নাম 'অগ্নিপরীক্ষা'; বহুবিধ নান্দনিক গুণ থাকা সত্ত্বেও এ-ছবিটির উদ্দেশ্য ছিল এটা কম্বুকণ্ঠে প্রচার করা যে হিন্দু বিয়ে কখনো ভাঙে না; তা শাশ্বত ও অভঙ্গুর। বস্তুত, ভাঙনের সামনে দাঁড়িয়ে ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরার এটা শেষ প্রচেষ্টা।

কিন্তু সমস্যাটা ছিল আরও জটিল। পশ্চিমবঙ্গে স্বামীর আর এক নাম 'ভাতার' অর্থাৎ যে ভাত দেয়। স্বামীর এই অন্নদাতা রূপ পঞ্চাশের দশকেই বিপদের সম্মুখীন হয়, যখন আর্থিক সমস্যায় পড়ে অনেক স্ত্রীই নিজের অন্নের সংস্থান করছেন। ওই দশকের এক বিশেষ শক্তিমান লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মীরার দুপুর'এ শয্যাশায়ী স্বামী — যার ভাতারত্ব বিনষ্ট হয়েছে— রোজগারি স্ত্রীর স্বচ্ছন্দ, আর্থিক স্বাধীনতায় বিব্রত হয়ে একটি ঝকঝকে ক্ষুরের সাহায্যে আত্মহত্যায় উন্মুখ। ওই একই লেখকের 'সমুদ্র' নামক ছোটোগল্পে, স্বামী অসময়ে বা অফ সিজনে স্ত্রীকে এনেছে পুরীর এক নির্জন হোটেলে তাকে হত্যা করার মানসে। পঞ্চাশের দশকেই লেখা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অবতরণিকা' গল্পের যে-চিত্ররূপ সত্যজিৎ রায় দিয়েছিলেন 'মহানগর' নামে তার মধ্যে এই পারিবারিক ক্ষমতার যুদ্ধ বেশ ভালোভাবেই চিত্রিত হয়েছে; চাকুরিজীবী পুত্রবধূর স্বাধীনতা সহ্য করতে না পেরে বৃদ্ধ শ্বশুরের পরিণামী প্রতিক্রিয়ায়।

কোনো সাংস্কৃতিক সামগ্রীই আকাশ থেকে পড়ে না; তার পিছনে থাকে, যাকে ফুকো বলেছেন বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক। 'অগ্নিপরীক্ষা'র মতো প্রতিক্রিয়াশীল ছবির প্রয়োজন আজ ফুরিয়েছে, কারণ হিন্দুবিবাহ যেকোনো ঝড়কে প্রতিরোধ করতে পারে এ-বিশ্বাসে আস্থাশীল ব্যক্তির সংখ্যা আজ খুব বেশি নয়। কিন্তু এ-ধরনের প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ বিবাহ ও পরিবারকে পবিত্র ঘোষণা করা আবার দেখা দিতে পারে যদি সামাজিক অবস্থার সম্পর্কে কোনো রদবদল হয়। হলিউডের আর্থিকভাবে সফল ছবি *The Fatal Attraction* যখন তিন বছর আগে প্যারিসে মুক্তি পেয়েছিল, ফ্রান্সের বিখ্যাত দৈনিক 'ল মঁদ' (*Le Monde*)-এর চলচ্চিত্র-সমালোচক লিখেছিলেন যে এই জাতীয় প্রতিক্রিয়াশীল ছবির জন্ম সম্ভব রোনাল্ড রীগানের আমেরিকায়।

মানুষের জীবনে ও সমাজের ছোটো ছোটো অংশে বা ইউনিটে যে ক্ষমতা ও দমনের লড়াই চলছে তার কোনো সুনির্দিষ্ট স্থান নেই ডায়ালেক্টিকাল চিন্তায়। মার্কসীয় ডায়ালেকটিক্‌সে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষই প্রধান; বাকি সবই গৌণ। ডায়ালেকটিক্‌সের এই সর্বগ্রাসী ঐতিহাসিক প্রবাহ থেকে মিশেল ফুকো আমাদের নজর সরিয়ে এনেছেন; গুরুত্ব দিয়েছেন প্রাত্যহিক জীবনের বহুরূপী দ্বন্দ্বের উপর, সমাজের কিনারায় নির্বাসিত জঞ্জাল, যথা উন্মাদ কিংবা অপরাধীদের উপর। এই দর্শন সামাজিক সমস্যার প্রতি উদাসীন নয় আদৌ। শুধুমাত্র দৃষ্টিকোণ বদলেছে। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে পাশ্চাত্যের অনেক বামপন্থীই ধীরে ধীরে ফুকোর রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন।

৪

মিশেল ফুকোর রচনা অবিশ্বাস্যভাবে সমৃদ্ধ। রাশি রাশি কাহিনি, উপাখ্যান, ঐতিহাসিক ঘটনার দলিল এবং ক্রমাগত বিখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনার উল্লেখ ফুকোর দার্শনিক চিন্তাকে অতিশয় সজীব ও সরস রেখেছে। এ সবই আমি বর্জন করে, শুধুমাত্র তাঁর মূল বক্তব্যগুলোকে উপরের অংশে যথাসম্ভব সহজ করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

ভাবুক হিসাবে ফুকো সহজ ও সরল নন। বড়ো দার্শনিকরা— যথা প্লেটো থেকে মার্কস— সকলেই একই বক্তব্য নানাভাবে ঘুরিয়ে পেশ করেছেন। কিন্তু ফুকোর চিন্তা ক্রমাগতই বদলেছে এবং এ-চিন্তার মধ্যে কোনো প্রাগতিক ঋজুতা বা linearity নেই। বলা যেতে পারে এ-চিন্তা বৃত্তাকারে এগিয়েছে। মিশেল ফুকোর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই, প্রচণ্ড সমাজসচেতনতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর চিন্তায় সামাজকে বদল করার কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নেই। এ-ছাড়াও আরও কিছু সমালোচনা ফুকো-র বিরুদ্ধে হয়েছে যার দু-একটির উল্লেখ এখানে আবশ্যকীয় বোধ করি।

বছর পাঁচেক আগে, ব্রিটেনের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপিকা শ্রীমতী জিলিয়ান রোজ 'বিনাশবাদের দ্বন্দ্ব' বা *Dilectic of Nihilism* নামে একটি ভারী বই বাজারে ছাড়েন। বইটিতে আধুনিক ইয়োরোপীয় (অর্থাৎ অ-ব্রিটিশ) ভাবুকদের প্রায় সকলকেই আক্রমণ করা হয়েছে; হাইদেগার, লেভি স্ত্রস্, জাক দেরিদা, জিল্ দলজ কেউই বাদ যাননি। যে কোনো বিদেশি চিন্তার প্রতি ব্রিটিশদের সনাতন ভীতি ও অবিশ্বাসের ভালো নজির এ-বইটি। এই বইয়ে ফুকোর বিরুদ্ধে যা বলা হয়েছে তার সব কিছুই এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। উত্তর-আধুনিক ফরাসি চিন্তা ইনি খুব ভালো বুঝেছেন বলে মনে হয় না। ধরা যাক তাঁর ফুকো সম্পর্কে এই উক্তিটি : To transcribe experience into terms of the body as Foucault does is to rob persons of experience altogether[২২]।

এখানে ইনি অভিজ্ঞতা বলতে কী বোঝাতে চাইছেন? যদি অভিজ্ঞতা হয় নিষ্ঠুরতা, সমাজের কিনারায় নির্বাসিত করা, বলপ্রয়োগ বা চাতুর্যের মাধ্যমে সামাজিক 'টাইপ' গড়ে তোলা, তাহলে সেই অভিজ্ঞতা ফুকোর রচনায় সর্বত্র আলোচিত হয়েছে। কিন্তু

যদি অভিজ্ঞতা হয় বিদেহী আধ্যাত্মিকতা, মনের কাল্পনিক স্বাধীনতা, ভাবুক মন বা cogito-র প্রাতিস্বিক স্বরাটত্ব ইত্যাদি, সেক্ষেত্রে মিশেল ফুকোর বা সমগ্র উত্তর-আধুনিক চিন্তার, কণামাত্র বিশ্বাস নেই সেই অভিজ্ঞতায়। এই রমণীর আর একটি উক্তি উল্লেখ্য :

The refusal to develop a theory which explicitly involves juridical concepts results in an insinuated set of unexamined juridical concepts.[তদেব, পৃ.১৭৯]

এই উক্তির মধ্যে কিছু সত্য হয়তো আছে; যেমন আছে এঁর আর একটি উক্তির মধ্যে :

Yet his (Foucault's) rules bid him present the 'mask' of this new power, its 'exorbitant singularity' as 'panopticism' and as 'medico-judical treatment' and to leave unexamined the bearer of the mask. [তদেব, পৃ.১৭৫]।

অভিযোগগুলোকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বুর্জোয়া বা শ্রেণিস্বার্থ কথাগুলো ফুকো বারবার ব্যবহার করেছেন, কিন্তু প্যানঅপটিকনের মুখোশধারী বুর্জোয়াদের চরিত্র ফুকোশীয় চিন্তায় অপরীক্ষিত রয়ে গেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফুকোকে বিচার করা উচিত হবে না। যদি ফুকো কোনো তত্ত্ব বা থিয়োরি খাড়া করতে গররাজি হন তার একমাত্র কারণ এই যে প্রথাসিদ্ধ ঐতিহাসিক চিন্তাকে বর্জন করে তিনি বংশানুচরিত পদ্ধতি নিয়েছেন, যার মধ্যে কোনো আদি ও ক্রমবিকাশের প্রশ্ন উঠতে পারে না। যেকোনো আধিবিদ্যক (metaphysical) নিশ্চয়তার হাত থেকে চিন্তাকে মুক্ত করাই ফুকোর মূল উদ্দেশ্য; এ-ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে অন্যান্য উত্তর-আধুনিক ফরাসি ভাবুকদের, বিশেষত জাক দেরিদার সাদৃশ্য সহজেই প্রতীয়মান। সমস্যার সহজ সুনিশ্চিত কোনো সমাধান না খুঁজে তাকে আরও বেশি সমস্যায়িত (problematize) করাই এঁদের উদ্দেশ্য।

দুই মার্কিন টীকাকার, ড্রেফুস ও র‍্যাবিনো, যাঁরা ফুকোর রচনা তথা সমগ্র উত্তর-আধুনিক চিন্তার অন্তস্তলে পৌঁছেছেন, তাঁরাও তাঁদের মূল্যবান বইয়ে দু-একটি প্রশ্ন রেখেছেন। যদি জ্ঞান ও ক্ষমতার অনুশীলন সর্বদা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে তাহলে কি নির্দোষ জ্ঞান— যথা গণিত, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি— বলতে কিছু নেই? মানবসমাজ মাত্রই এক অর্থে শাসক সমাজ (disciplinary society) এবং একে বোঝবার পদ্ধতি দিয়েছেন ফুকো; কিন্তু এর পরিবর্তনের কী উপায়? প্রতিরোধ, বিশেষত দমনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে সদর্থক বা positive করার কী পদ্ধতি?[২৩] এ প্রশ্নগুলো ফুকো তোলেননি; স্বভাবতই এদের কোনো উত্তর নেই তাঁর দার্শনিক চিন্তায়। ফুকোর ব্যবহৃত পদ্ধতির আর একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা এসেছে মিশেল দ স্যার্তোর একটি ফুকো-সম্পর্কিত প্রবন্ধে। স্যার্তো নিজেও একজন অসামান্য পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং ফুকোর বন্ধু। বেন্থাম-প্রবর্তিত প্যানঅপটিকন উনিশ শতকের একটা বিরাট অংশ জুড়ে কারাগারের স্থাপত্যশৈলীকে প্রভাবিত করেছিল এবং এ-ব্যাপারে স্যার্তোর কোনো সন্দেহ

নেই, কিন্তু ওটাই একমাত্র গঠনপদ্ধতি ছিল না। এ ছাড়াও অন্য পদ্ধতিতে কারাগার গঠিত হয়েছিল যার কোনো আলোচনা ফুকো করেননি। আধুনিক সমাজে প্রত্যেকটি কারাগারে প্যানঅপটিকন নেই। স্যার্তো লক্ষ করেছেন যে ফুকো এখানে জাতিতাত্ত্বিক (ethnologist)-দের পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপারটা একটু বেশি তাত্ত্বিক করেছেন। জাতিতাত্ত্বিকদের পদ্ধতি কী? কোনো দূর দেশের, বিভিন্ন সংস্কৃতির, কোনো জাতি বা উপজাতির কিছু বিশেষ রীতিনীতি এঁরা বেছে নেন গবেষণার বস্তু হিসাবে এবং এই রীতিনীতিগুলির মধ্যে এঁরা গড়ে তোলেন 'তত্ত্বের উজ্জ্বল কেন্দ্র' (Centre lumineux de la théorie); এটা এক ধরনের সমূহকরণ (totalization), যাকে ফুকো তত্ত্বগতভাবে আক্রমণ করেছেন, কিন্তু যা ফুকোর নিজের রচনায় ফিরে এসেছে। অবশ্য স্যার্তো এটা স্বীকার করেছেন, এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে অতীতের এই স্থাপত্যরীতির আলোচনার সাহায্যে ফুকো বর্তমান সমাজের 'ভঙ্গুর নিশ্চয়তাকে উপদ্রুত করেছেন' (déranger nos fragiles suretés) [২৪]। ফুকোর চিন্তার এই সমালোচনাগুলি মনে রাখা প্রয়োজন।

আমি এ কথা পূর্বেই বলেছি যে পাশ্চাত্য চিন্তায় ফুকোর প্রভাব ক্রমবর্ধমান। তার দু-একটি নজির এখানে দেওয়া যেতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদীয়মান দার্শনিকদের মধ্যে এখন রিচার্ড রর্টি (Richard Rorty) অগ্রণী। রর্টির সাম্প্রতিক রচনায় যে জ্ঞানতাত্ত্বিক সন্দেহবাদ (scepticism) ও সেই সঙ্গে সামাজিক প্রাণীদের পারস্পরিক সহানুভূতির প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার উৎস ধ্রুপদী কান্টীয় সন্দেহবাদে নয়; তার উপর ফুকোর প্রভাবই প্রধান। দুরূহ দার্শনিক চিন্তার বাইরেও, সমাজতাত্ত্বিক ভাবনার উপরেও ফুকোর প্রভাব সহজেই প্রত্যক্ষ। ১৯৭৯-তে প্যারিসের প্রকাশক Unio General d'Editions কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধের এক সংকলন প্রকাশ করেন এই শিরোনামে, *Les marginaux et les excluls dans l'histoire* অর্থাৎ 'ইতিহাসে যারা কিনারায় থাকে এবং যারা বর্জিত'। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে আলোচিত বস্তু যুক্তরাষ্ট্রের রেড ইন্ডিয়ানরা, সার্দিনিয়ার ডাকাত শ্রেণি, মধ্যযুগে ইয়োরোপে অপরাধী ও তাদের শাস্তিদান পদ্ধতি, প্রাচীন গ্রিসের ক্রীতদাস ও কারুশিল্পী (artisans)-রা ও প্লেটোর রচনায় তাদের স্থান ইত্যাদি এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি প্রবন্ধ যার বিষয় ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে বিহারের মাঘাইয়া ডোমদের অপরাধ-প্রবণতা; লেখক জাক্ পুস্পাদাস (Jacques Pouchepadass)। এরা সবাই কিনারার অধিবাসী। সমাজ এদের বর্জন করেছে। ডোমরা উপজাতি নয়। তারা হিন্দুসমাজের সবচেয়ে তলার বাসিন্দা; অস্পৃশ্য। এই সুলিখিত প্রবন্ধগুলি যিনি সম্পাদনা করেছেন তিনি তাঁর ভূমিকায় ফুকোর কোনো উল্লেখ করেননি, এবং তাতে অবশ্য ফুকোর আন্তর্জাতিক সম্মানে কোনো আঁচড় পড়ে না, কিন্তু ফুকোর প্রভাব এখানে সন্দেহাতীত। হঠাৎ ১৯৭৯-তে এই প্রবন্ধগুলি—যার অনেকগুলিই পুরোনো—পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন হল কী কারণে? ঠিক যখন পাশ্চাত্যের বৌদ্ধিক সমাজে ফুকোর প্রভাব গভীর ও

সর্বত্রব্যাপী হতে শুরু করেছে, এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশের পিছনে ফুকোর প্রভাব লক্ষ করা বোধ হয় অন্যায় হবে না। কারণ ফুকোই প্রথম ভাবুক যিনি সমাজের কিনারায় নির্বাসিত মানুষ বা মানুষরূপী জঞ্জালদের উপর পদ্ধতিবদ্ধভাবে চিন্তা করেন; এই মানুষেরা অবশ্যই ডায়ালেকটিক্সের মুখর ভোজসভায় অপাঙ্‌ক্তেয়, কিন্তু সে কারণে এদের অস্তিত্ব বা তার সমস্যা কিছু লোপ পায় না। মার্কসবাদীদের হাতে সোভিয়েট ইউনিয়নে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল এবং সে-বিপ্লবের ফলে ওই দেশের সমূহ পরিবর্তনও ঘটেছে। সে দেশ আজ দ্বিতীয় মহাশক্তি, ইত্যাদি। কিন্তু তথাকার কিনারার মানুষদের, অর্থাৎ ইহুদি, আর্মেনিয়ান বা ইউক্রেনীয় ক্যাথলিকদের সমস্যা আজও মেটেনি। ওই সমস্যাগুলি বারবার ঘুরেফিরে আসছে, ব্যাংকোর প্রেতের মতো ভোজসভা ভন্ডুল করে দেবার জন্য। এগুলো বুর্জোয়া প্রেসের প্রোপাগ্যান্ডা নয়। ওঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন ও ওঁদের টেলিভিশনে দেখাচ্ছেন, বিনা দ্বিধায়।

মিশেল ফুকোর চিন্তায় সমাজ পরিবর্তনের কোনো সরাসরি নির্দেশ নেই, যার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে বিনাশবাদের অভিযোগ এসেছে। কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে এমন কিছু নতুন চিন্তার সংকেত আছে যা আগামীকাল অর্থাৎ প্রায় আগত একবিংশ শতাব্দীর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তায় এক নতুন বিপ্লবের উপাদান হতে পারে। এটা ইতিমধ্যে অনেকেই বুঝেছেন। ধরা যাক, বামপন্থী মার্কিন বুদ্ধিজীবী টমাস ফ্লিন (Thomas Flynn)-এর কথা। ইনিও ফরাসি সাহিত্যের অধ্যাপক ও এককালে সার্ত্র-এর উপর অনেক লিখেছেন। বর্তমানে ফুকোর অনুরাগী। টম্ ফ্লিন-এর মুখেই শেষ কথা দেওয়া যাক:

The subtle questioning stance casts suspicion; it does not settle issues. But that is all Foucault intends. For in weakening our confidence in homogeneous reason and univocal truth, he has opened the door to new alternatives, other creativities, further 'revolution'.[২৫]।

প্রথাসিদ্ধ বিপ্লব-চিন্তার অন্য এক নতুন বিকল্প আছে বা থাকতে পারে, এটা যাঁরা মানতে রাজি এবং যাঁরা এ নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করতে প্রস্তুত, তাঁদের কাছে মিশেল ফুকোর রচনা এক নতুন অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে।

উল্লেখপঞ্জি

১. René Descartes, *Discours de la méthode*, Paris, Vrin, 1966, পৃ.৪৪

২. Michel Foucault, *Histoire de la folie a' l'age classique*, Paris, Gallimard, 1972, পৃ.১৬২।

৩. Karlis Racevskis, 'Michel Foucault, *Rameau's Nephew* and the question of identity' in James Bernauer and David Rasmussen (Ed.) *The Final Foucault*, Massachusetts, MIT Press, 1988, পৃ.২১-৩২।

৪. Michel Foucault, *Les Mots et les Choses*, Paris, Gallimard 1966. পৃ.৮৬।

৫. Gilles Deleuze. *Foucault*, Paris, Les Edition de Minuit. 1986. পৃ.১১, পাদটীকা।

৬. Michel de Certeau, *Histroire et psychanalyse entre science et fiction*, Paris, Folio/Essais, 1987, পৃ.৩৩।

৭. Michel Foucault, *L' Archéologie du Savoir*, Paris, Gallimard, 1969, পৃ.১৬।

৮. Friedrich Nietzsche, *The Use and Abuse of History* (Tr. Adrian Collins), Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1957.

৯. F. Engels, *Dialectics of Nature* (Trans C. Dutt), Mosow, Progress, পৃ.২৫।

১০. Gordon Childe, *What Happened in History*. Pelican Books, 1968, পৃ.১৩।

১১. দ্রষ্টব্য Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, *Michel Foucault, Beyond Structuralism and Hermeneutics*. Brighton. The Harvester Press,1986, পৃ ৫২, পাদটীকা।

১২. M. Foucault, *L'ordre du discours*, Paris, Gallimard, 1971. পৃ.১৭।

১৩. এ-ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য Mark Postei, *Foucault, Marxism and History*, Cambridge. Polity Press, 1984.

১৪. Friedrich Nietzsche, On the *Genealogy of Morals* (Trans. W. Kaufman), New York, Vintage, 1969.

১৫. Michel Foucault, *Surveiller et punir : Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975. পৃ.২০৩।

১৬. তদেব, পৃ.৩১১।

১৭. Michel Foucault. *Power/Knowledge*, Selected interviews and other writings. New York, Pantheon, 1980, পৃ.১৫৬।

১৮. তদেব, পৃ.১৫৬।

১৯. Michel Foucault, *Histc:re de la sexualité : La Volonté de savoir*, Paris, Gallimard, 1976. পৃ.৪৫

২০. তদেব, পৃ.১২২।

২১. Mark Poster, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৬-১৬৯।

২২. Gilian Rose, *Dialectic of Nihilism*, Oxford, Basil Blackwell. 1984, পৃ.১৮০।

২৩. Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৫-২০৭।

২৪. Michel de Certeau. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪-৪৭।

২৫. James Beiiiauer and David Rasmussen (Ed.) প্রাগুক্ত, পৃ.১১২।

গ্রন্থপঞ্জি

যাঁরা মিশেল ফুকো সম্পর্কে আরও বেশি জানতে চান তাঁদের জন্য নিম্নলিখিত বইগুলি বিশেষভাবে অনুমোদনীয়:

ফরাসি

Michel de Certeau. *Histoire et psychanalyse entre science et fiction*, Paris. folio/ Essais. 1987.

Gilles Deleuze. *Foucault*, Paris. Les Edition de Minuit, 1986.
Angele K. Marietti, *Michel Foucault. Archéologie et Généalogie*, Paris, Le Livre de Poche, 1985.

ইংরেজি

James Bernauer and David Rasmussen (Ed.) *The Final Foucault*, Massachusetts. The MIT Press, 1988.
Mark Cousins and Athar Hussain. *Michel Foucault*, London. Macmillan. 1984.
Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, *Michel Foucault*; *Beyond Structuralism and Hermeneutics*, Brighton, The Harvester Press, 1986.
J. G. Marquior, *Foucault*, London. Fontana Modern Master Series.
Mark Poster, *Foucault, Marxism and History*, Cambridge, Polity Press, 1984.
John Rajchman, *Michel Foucault, the Freedom of Philosophy*, Columbia, 1985.
Barry Smart, *Foucault, Marxism and Critique*, London, Routeledge, 1983.
Barry Smart, *Michel Foucault*, London, Tavistock, 1985.

এক্ষণ, শারদীয় ১৯৮৯

বাঙালির মননচর্চার ধারা

অলোক রায়

বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণচরিত্র* (১৮৯২) রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগবার কথা নয়। *কৃষ্ণচরিত্র* পড়বার সময়ে তাঁর মনে নানাধরনের আপত্তিবোধ দেখা দিয়েছে। তবে উনিশ শতকের শেষপাদে সেই 'উলটারথের দিনে' নিশ্চেষ্টতার পথে প্রত্যাবর্তনের দিকে সকলের ঝোঁক, 'যখন আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও আত্মবিস্মৃত হইয়া অন্ধভাবে শাস্ত্রের জয় ঘোষণা করিতেছিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বীরদর্পসহকারে কৃষ্ণচরিত্র-গ্রন্থে স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন।'' শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের মতে ''কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রধান অধিনায়ক স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি।''

১৮৯৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি' যখন আজকের দিনেও সুলভ নয়, উনিশ শতকে সেই উজান স্রোতের কালে তার অসামান্যতা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। *বঙ্গদর্শন* (১৮৭২) পত্রিকাকে আশ্রয় করে বঙ্কিমচন্দ্র যে-মননচর্চার উন্মেষ ঘটান, তা রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত *বঙ্গদর্শনে* (১৯০১) অব্যাহত ধারায় রক্ষিত হয়েছে। অবশ্য ১৮৭২-এর মননচর্চার সঙ্গে ১৮৮২ বা ১৮৯২-এর মননচর্চার প্রভেদ অনস্বীকার্য। 'জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত' (ফাল্গুন ১২৮১) প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন ''প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল—সকল প্রমাণের মূল।'' তখন তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের শিষ্য, কখনও কোম্‌তবাদী। পরে *বিবিধ প্রবন্ধ* (১৮৮৭) গ্রন্থে 'জ্ঞান' প্রবন্ধের পাদটীকায় তিনি লেখেন, ''এই সকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি।'' ১৮৯২ সালে *কৃষ্ণচরিত্র* গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য মনে পড়বে, ''বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্রে লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ।'' এই মত-পরিবর্তনের কারণ শুধু 'বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এক ভাবনার ফল' নয়, এর জন্য দায়ী অনেক পরিমাণে দেশকালের পরিবর্তন। বঙ্কিমচন্দ্র *সাম্য* (১৮৭৯) বইয়ের পুনর্মুদ্রণে আপত্তিবোধ করলেও *'বঙ্গদেশের কৃষক'* প্রবন্ধের প্রচার কাম্য বিবেচনা করেছেন। *বিবিধ প্রবন্ধ*-এর অধিকাংশ প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন-এর যুগে লেখা হলেও তার প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি ছিল না। আর *ধর্মতত্ত্ব-কৃষ্ণচরিত্র* ভিন্ন মানসিকতার নিদর্শন হলেও, সেখানে বঙ্কিম-মনীষার পরিচয় মেলে—সেই ক্ষুরধার বুদ্ধি, অধ্যয়ন ও প্রজ্ঞার সম্মিলন, একান্ত নিজস্ব স্বাধীন ভাব-ভাবনা, বাঙালির মননচর্চার ধারাকে উনিশ শতকের শেষ দশকেও পুষ্ট করেছে।

তবে উনিশ শতকের শেষের দিকে আমাদের সমাজে যে-পিছুটান দেখা দেয়, বঙ্কিমচন্দ্রও যার হাত থেকে মুক্তি পাননি, তার মধ্যে প্রাপ্তি যেটুকু হয়েছে তা একধরনের নবজাগ্রত স্বাজাত্যবোধ। 'হিন্দু কলেজ' থেকে 'হিন্দু মেলা— হিন্দু প্যাট্রিয়ট' নামের মধ্যে যে হিন্দুয়ানির ঘোষণা, তা থেকে নবপর্যায়-*বঙ্গদর্শন-এর* হিন্দুয়ানি কিছুটা স্বতন্ত্র। তবে রাজনারায়ণ বসুর *হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা* (১৮৭২) প্রতিপাদনের প্রয়াস আর রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুত্ব' (*বঙ্গদর্শন*, শ্রাবণ ১৩০৮) ব্যাখ্যার মধ্যে কোথাও যেন একটা যোগ লক্ষ করা যায়। ইংরেজের অনুকরণ নয়, নিজের নিজত্ব উপলব্ধির মধ্যেই জাতির প্রতিষ্ঠা— "পূর্বপুরুষদের সেই চিত্তকে আমাদের জড় সমাজের উপর জাগাইয়া তুলিলে, তবেই আমরা বড় হইব। আমাদের সমস্ত সমাজ যদি প্রাচীন মহৎ-স্মৃতি ও বৃহৎ ভাবের দ্বারা আদ্যোপান্ত সজীব সচেষ্ট হইয়া উঠে— নিজের সমস্ত অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বহুশতাব্দীর জীবনপ্রবাহ অনুভব করিয়া আপনাকে সবল ও সচল করিয়া তোলে, তবে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও অন্য সকল দুর্গতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে।" এইভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শের সঙ্গে বর্তমান ভারতবর্ষের দুর্গতির কারণ অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে বিশ শতকের মননচর্চার ধারা রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নতুন পথে অগ্রসর হয়েছে। নবপর্যায়-*বঙ্গদর্শন* (বৈশাখ ১৩০৮, বৈশাখ ১৩১৩) পত্রিকা হিন্দুধর্ম-প্রচারে বাহন না হলেও, বিশ শতকের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ ও সমসাময়িক ধর্মান্দোলনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ দেখা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর সূর্য যখন রক্তমেঘ-মাঝে অস্ত গেল, তখন 'পতিত ভারতে' জাগরণের স্বপ্ন দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীরা। *নৈবেদ্য*-র (১৯০১) একাধিক কবিতায় প্রাচীন ভারতবর্ষের উদাত্ত বাণী, ব্রাহ্মণ্য আদর্শ ধ্বনিত হয়েছে—"হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,/বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,/ দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার/তাহার ঐশ্বর্য যত।" এই সময়ে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় কবি 'ব্রাহ্মণ' (আষাঢ় ১৩০৯) প্রবন্ধে লিখছেন "যথার্থ ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, ধর্মনিষ্ঠ হইবেন। সর্বপ্রকার আশ্রমধর্মের আদর্শ ও আশ্রয়স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন।" মনে পড়বে, এই সময়ে শান্তিনিকেতনে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিকল্পিত ব্রহ্মবিদ্যালয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথের তখন মনে হয়েছিল, "শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহ-বাসের মতো সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নামগন্ধ থাকিবে না— ধনী দরিদ্র সকলেই কঠিন ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমরা *প্রকৃত হিন্দু* হইতে পারিব না।" (*চিঠিপত্র* ৬) অন্য একটি চিঠিতে লেখেন, "আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।" (দ্র. *প্রবাসী*, আশ্বিন ১৩৪৮)। রবীন্দ্রজীবনীকার জানিয়েছেন, "নববর্ষের দিনে (১৩০৯) আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রথম নববর্ষে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে যে ভাষণ দান করেন তাহা পাঠ করিলে আমরা দেখিব যে, কবির মন কী পরিমাণ প্রাচীনভারতঘেঁষা ও হিন্দুভাবাপন্ন।" (*রবীন্দ্রজীবনী*, ২, পৃ. ৪৪)। মাত্র

সাড়ে এগারো বছর বয়সে মেজ মেয়ে রেণুকার বিবাহ, বারো বছর বয়সে তার ফুলসজ্জার সঙ্গে ধর্মীয় নির্দেশের কোনো যোগ ছিল না, কিন্তু শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট লিখিত নির্দেশ ছিল—"যাহা হিন্দুসমাজবিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না; সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।" *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় বর্ণাশ্রমধর্মের সপক্ষে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রবন্ধ অকারণ ছিল না—ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ভোজনশালায় পঙ্ক্তিবিচার করে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদ মেনে সকলে আহারে বসতেন। আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামী রেবাচাঁদ অল্পদিনের জন্য হলেও যাবতীয় নীতিনিয়ম রচনার দায়িত্ব পান। এই পর্যায়ে ব্রহ্মবান্ধবের আদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের কোনো বিরোধ ছিল বলে মনে হয় না। ("উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে।"— *আশ্রমের রূপ ও বিকাশ*)।

নবপর্যায় *বঙ্গদর্শন*-এর প্রথম সংখ্যায় প্রথমে *নৈবেদ্য* কাব্যের বারোটি কবিতা 'প্রার্থনা' শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে (যার মধ্যে আছে 'পতিত ভারতে তুমি কোন্ জাগরণে/জাগাইবে, হে মহেশ, কোন্ মহাক্ষণে/সে মোর কল্পনাতীত!') তার পর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা'। লক্ষণীয়, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের কালে 'আমরা আর্য'; 'আমরা হিন্দু', 'আমরা শ্রেষ্ঠ'— এই ধরনের আস্ফালনের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের 'হিন্দুর হিন্দুত্ব' রক্ষার উপায়নির্দেশের মধ্যে পার্থক্য আছে। ব্রহ্মবান্ধবের প্রতিপাদ্য "হিন্দুত্বের ভিত্তি, হিন্দুত্বের সার, বর্ণাশ্রমধর্ম এবং তৎপ্রণোদিনী একনিষ্ঠতা।" এই সংখ্যার অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধটি আপাতদৃষ্টিতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর এই নামে লেখা একটি প্রবন্ধের প্রতিবাদ। রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন, ইংরেজিশিক্ষাকে আমরা প্রকৃতিগত করতে পারিনি বলে তার মূল মহত্ত্বকে আয়ত্ত করতে পারিনি। রবীন্দ্রন'থের মতে, শুধু ইংরেজি-সভ্যতা নয়, আমাদের দেশীয় সভ্যতা সম্বন্ধেও আমরা অস্বাভাবিক— "নিত্যানিত্য কালাকাল বিবেক ইহাই আমাদের হয় নাই।" প্রাচীন ভারতবর্ষের একটা অংশকে তিনি বলেন 'সাময়িক', উনিশ শতকের শেষে, এমনকি বিশ শতকের সূচনাতেও যা নিয়ে মাতামাতির অন্ত ছিল না।—"কিন্তু ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শটিকে যদি আমরা বরণ করিয়া লই তবে আমরা ভারতবর্ষীয় থাকিয়াও নিজেদের নানা কাল নানা অবস্থার উপযোগিতা করিতে পারিব।" সম্ভবত এই সিদ্ধান্তবাক্য শুধু ব্রহ্মবান্ধব নয়, রামেন্দ্রসুন্দরও মেনে নিতে রাজি ছিলেন।

বোঝা যায় এই সময়ে বাঙালির মননচর্চায় হিন্দুত্ব অথবা প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শ প্রসঙ্গটি বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। ব্রহ্মবান্ধবের 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা' প্রবন্ধের সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ *বঙ্গদর্শন*-এর পরবর্তী সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

সভ্যতার আদর্শ' বিশ্লেষণ করেছেন। ব্রহ্মবান্ধব ইউরোপীয় সভ্যতায় দেখেছেন 'বস্তুনিষ্ঠতা', রবীন্দ্রনাথ দেখছেন 'রাষ্ট্রনীতি'। ইউরোপীয় ছাঁদে 'নেশন' গড়ে তোলার কথা সে সময়ে অনেকে বলছেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা কাম্য বিবেচনা করেননি। তিনি জাতীয় আদর্শ বলতে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম বোঝেন। ব্রহ্মবান্ধবের 'তিন শত্রু' (শ্রাবণ ১৩০৮) প্রবন্ধে বৃথাভিমানী হিন্দু-হিন্দু-রব নির্ঘোষকারী গোঁড়ার দল, ইংরেজিনবিশ হিন্দুনামধারী রামপক্ষীভক্ষীর দল, আর সমন্বয়বাদীর দল— সকলকেই তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। আসলে বর্ণাশ্রমধর্ম নিয়ে সে সময়ে যে-বিতর্ক শুরু হয়েছে, তাতে 'একনিষ্ঠ উদারতা'র সমর্থনে প্রবন্ধকারকে অনেক বাক্যব্যয় করতে হয়েছে। 'ভারতের অধঃপতন' (মাঘ ১৩০৮) এবং 'বর্ণাশ্রমধর্ম' (ফাল্গুন ১৩০৮) প্রবন্ধে পিছুটান বোধহয় আরও প্রবল— "বর্ণধর্মভঙ্গেই জাতীয় হীনতা আসিয়াছে।" "একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-প্রধান আশ্রমধর্ম হিন্দুত্বের ভিত্তি। এই আশ্রমধর্ম হিন্দুজাতিকে ঘোর বিপ্লবসমূহ হইতে রক্ষা করিয়াছে, আর্যত্বকে স্থায়ী করিয়াছে।" এর পরিণাম কয়েক বছর পরে স্বদেশি আন্দোলন, যা অনেক পরিমাণে হিন্দু আন্দোলনও বটে।

'বর্ণাশ্রমধর্ম' (*বঙ্গদর্শন*, চৈত্র ১৩০৮) নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু তিনি ব্রহ্মবান্ধবের বর্ণাশ্রমধর্ম-ভাবনাকে সমর্থন করতে পারেননি। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রায় সব প্রবন্ধেই নৈয়ায়িক যুক্তিক্রম বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি যুগের হাওয়া অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন তা নয়, তবে রবীন্দ্রনাথ যেমন ক্রমশ হিন্দুধর্ম থেকে হিন্দুসমাজ, হিন্দুসমাজ থেকে মানুষের ধর্মে পৌঁছোতে সক্ষম হয়েছেন, রামেন্দ্রসুন্দরও তেমনি অনেক পরিমাণে সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায় গণ্ডিমুক্ত মানবচিন্তার দিকে অগ্রসর হয়েছেন। তবে বিশ শতকের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধবের মতো তিনি মনুসংহিতার নির্দেশ নিয়ে ততটা চিন্তিত নন, যতটা তাঁর চিন্তার বিষয় মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে। বর্ণাশ্রমধর্ম ভালো কি মন্দ, আমরা প্রব্রজ্যাগ্রহণ করব কি না— এ সব বিতর্ক মনে হয় তাঁর কাছে অপ্রাসঙ্গিক। তিনি জানেন, সমাজ যখন পরিবর্তনশীল তখন সমাজস্থিতির ব্যবস্থাও পরিবর্তনশীল হতে বাধ্য। অদ্ব্যর্থভাষায় রামেন্দ্রসুন্দর বলেন, "এ কালে যে মনুর সময়ের বর্ণাশ্রমধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা কেহ আশা করেন না। বোধ করি ইচ্ছাও করেন না। সে দিন নাই, হইবেও না।" পরিবর্তন কাম্য, "কিন্তু বিপ্লব কোনো কালেই বাঞ্ছনীয় নহে। পুরাতন আদর্শ পুরাতন ভিত্তির উপর বজায় থাকুক, ইহাই প্রার্থনীয়; সেই আদর্শ কালানুযায়ী মূর্তি গ্রহণ করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই।"

২

বিশ শতকে বাঙালির মননচর্চার ধারা অনুসরণ করার পক্ষে নবপর্যায়-*বঙ্গদর্শন* পত্রিকাটি আমাদের সহায় হতে পারে। উনিশ শতকের ধারাবাহিকতা একদিকে যেমন রক্ষিত হয়েছে, তেমনি বিশ শতকের নতুন চিন্তাভাবনার উন্মেষ দেখা গেছে সেখানে। বিশেষভাবে

হিন্দুয়ানি-প্রসঙ্গ অবতারণার কারণ, অল্প কয়েকবছর পরে স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে, বাঙালির স্বাজাত্যবোধের প্রকাশ যতটা আকস্মিক মনে হয় আসলে তা ছিল না।

অবশ্য *বঙ্গদর্শন* মানেই 'হিন্দুত্ব' বা 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা' নয়। *বঙ্গদর্শন*-এর প্রথম দু-বছরে প্রবন্ধকারের সংখ্যা অনেক (কবিতা, গল্প, উপন্যাস থাকত বটে, কিন্তু 'চোখের বালি' ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাড়া 'বর্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত' হতে দেখা যায় না। তুলনায় প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই অসামান্য কিছু প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে যার রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ নন)। প্রবন্ধের মান সাধারণভাবে অত্যন্ত সমুন্নত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক হিসেবে বঙ্কিমযুগের লেখক, গণিত এবং দর্শন উভয় শাস্ত্রে এমন অনায়াস দক্ষতা কদাচিৎ দেখা যায়। তিনি একদিকে লিখছেন 'নিউটনের দুইটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে একটি নূতন সিদ্ধান্তের ব্যবকলন' (শ্রাবণ ১৩০৮) অন্যদিকে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'সার সত্যের আলোচনা' (ভাদ্র ১৩০৮ থেকে)। নিউটনের প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত থেকে নতুন সিদ্ধান্ত অবশ্যই বিতর্কমূলক রচনা। অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায় পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় প্রতিবাদ করেছেন, যদিও 'মূল-প্রবন্ধ-লেখকের' বক্তব্য তাতে খণ্ডিত হয়নি। আমাদের মনে পড়বে দ্বিজেন্দ্রনাথকে তর্কযুদ্ধে হারানো সে-কালে সহজ ছিল না। অবশ্য তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, যার সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেই লেখেন, "কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক— he is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight, all things divine" তবে কৃষ্ণকমল এই সময়ে বঙ্গদর্শনে লেখেননি, লিখলে হয়তো সারসত্যের আলোচনার প্রতিবাদী বক্তব্যের সূচনা হতে পারত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ গভীর তত্ত্বালোচনায় যে সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করতেন, অভিজ্ঞতা জগৎ থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করতেন, তেমনটা খুব কম প্রবন্ধকারের পক্ষেই সম্ভব ছিল। দার্শনিক বিষয় নিয়ে লেখা হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'অমূর্ত ও মূর্ত' (অগ্রহায়ণ ১৩০৯) প্রবন্ধে গভীরতা আছে, কিন্তু প্রকাশে স্বচ্ছতা নেই। তুলনায় তরুণ লেখক সতীশচন্দ্র রায়ের সাহিত্যালোচনা একই সঙ্গে গভীর ও অন্তরস্পর্শী। সতীশচন্দ্র কবি বলে 'আরো একটি কথা' (বৈশাখ ১৩০৯), 'প্যারাসেলসাস' (কার্তিক ১৩০৯) বা 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (পৌষ ১৩০৯) প্রবন্ধগুলি কাব্যোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ নয়, সেখানে যুক্তিক্রম অনুসরণে তাঁর বিশেষ প্রবণতা দেখা গেছে। 'প্যারাসেলসাস' কাব্যের পঞ্চম অঙ্ক বিশ্লেষণে সতীশচন্দ্রের কবিপ্রাণের ব্যাকুলতা শুধু প্রকাশ পায়নি সেই সঙ্গে কাব্যতত্ত্বে তাঁর অভিনিবেশ ধরা পড়েছে—

> সমস্ত খণ্ডেই ব্রাউনিং মানুষটির গভীর হৃদয়গুহায় নামিয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু চতুর্থ খণ্ড পর্যন্ত প্যারাসেলসাসের যে জীবন, তাহা তাঁহার প্রাপ্ত ইতিহাস হইতে সহজেই নিষ্কাশিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু পঞ্চম খণ্ড অর্থাৎ 'প্যারাসেলসাসের অভয়লাভ' ইতিহাসে আছে কি? এটুকু ব্রাউনিং জুড়িয়া দিয়াছেন। এইখানেই ব্রাউনিং-এর ক্ষমতা।—খণ্ড ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত সম্পূর্ণতায় দৃষ্টিপ্রসারণেই কবির মাহাত্ম্য। মানবজীবন ক্ষণিক অন্ধকার সত্ত্বেও যে যুক্তি-শৃঙ্খলা-সৌন্দর্যে পূর্ণ, বিশৃঙ্খল বাহ্যঘটনা

বিদীর্ণ করিয়া কবি তাহাই দেখাইয়া দিতে পারেন। প্যারাসেলসাসের সেই দুর্লক্ষ্য অথচ নিতান্তই সত্য, জীবনের শেষ অঙ্কখানি, মানবহৃদয়ের মর্মচারী ব্রাউনিং স্বভাবতই জাগাইয়া তুলিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও যোগেশচন্দ্র রায়ের মতো প্রবন্ধকার যে-কোনো যুগেই বিরল। বিশেষত বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব এবং আমাদের অপরিচিত পরিভাষাবহুল তথ্যের উপস্থাপনা সে সময়ে সহজ কাজ ছিল না। যোগেশচন্দ্র যত বড়ো পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর প্রবন্ধে হয়তো তার পরিচয় মেলে না। তবে বোঝা যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র বা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো বহুবিচিত্রবিদ্যায় তাঁর অধিকার ছিল। তিনি লিখেছেন কম, কিন্তু যেটুকু লিখেছেন তা মহামূল্যবান। বাংলাসাহিত্যে একমাত্র যথার্থ প্রবন্ধকার, সম্ভবত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বিজ্ঞানের ছাত্র ও অধ্যাপক, সে বিষয়ে তাঁর অধিকার নিয়ে প্রশ্নই ওঠে না (জীবিতকালে আধুনিকতম গবেষণার খবর রাখতেন তিনি)। বিস্ময়কর মনে হয় দর্শনশাস্ত্রে তাঁর অধিকার দেখে— তাঁর 'জিজ্ঞাসা'র যেন কোনো শেষ নেই। বিজ্ঞান ও দর্শনকে তিনি মেলাতে পেরেছেন কি না, তা নিয়ে হয়তো তর্ক আছে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের যে-কোনো প্রবন্ধ পড়লে তাঁর মননশক্তির অসামান্যতার পরিচয় মেলে। বিষয়ের উপর অধিকার, সমস্যার গভীরে প্রবেশ, সমাধানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রয়োগ, 'সহজ সর্বজনবোধ্য ভাষায় বক্তব্যের উপস্থাপন— বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আর কারও মধ্যে দেখা যায়নি। বিজ্ঞান নিয়ে সহজ ভাষায় *বঙ্গদর্শন*-এ প্রবন্ধ আরও অনেকে লিখেছেন, যেমন জগদানন্দ রায়, কিন্তু সেখানে মৌলিক চিন্তাভাবনার পরিচয় মেলে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে, তবে 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার'এর মতো দু-একটি প্রবন্ধ বাদ দিলে অন্যগুলি 'কুলি-মজুরের কাজ'। নবপর্যায়-*বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় অক্ষয়কুমার মৈত্র রীতিমতো ঐতিহাসিক গবেষণা কর্মে নিয়োজিত হয়েছেন—'বাঙ্গালার ইতিহাস' (অগ্রহায়ণ ১৩০৮), 'মদন-মহোৎসব' (পৌষ ১৩০৮), 'গৌড়ের পূর্বকাহিনী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯)। ১৮৯৯ সালে '*ঐতিহাসিক* চিত্র'এর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"ঐতিহাসিক চিত্র" ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি স্বদেশী কারখানাস্বরূপ খোলা হইল। এখনো ইহার মূলধন বেশি জোগাড় হয় নাই, ইহার কল-বলও স্বল্প হইতে পারে, ইহার উৎপন্ন দ্রব্যও প্রথম প্রথম কিছু মোটা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা দেশের যে গভীর দৈন্য— যে মহৎ অভাব-মোচনের আশা করা যায় তাহা বিলাতের বস্তা বস্তা সূক্ষ্ম ও সুনির্মিত পণ্যের দ্বারা সম্ভবপর নহে।" বলাবাহুল্য বাঙালির ইতিহাসচর্চায় প্রথমাবধি 'স্বদেশি' ভাব প্রাধান্য পাওয়ায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রের পক্ষেও সর্বদা 'ইতিহাস-নীতি' রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, শুধু 'সিরাজদৌল্লা' প্রসঙ্গে নয়, অন্যত্র কখনো দেখা যাবে, "শান্তভাবে কেবল ইতিহাসের সাক্ষ্য-দ্বারা সকল কথা ব্যক্ত না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত কিঞ্চিৎ অধৈর্য ও

আবেগের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। সুদৃঢ় প্রতিকূল সংস্কারের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া এবং প্রচলিত বিশ্বাসের অন্ধ অন্যায়পরতার দ্বারা পদে পদে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি স্বভাবতই এইরূপ বিচলিত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।" এর কয়েকবছর পরে আমাদের স্বদেশি আন্দোলনের কালে বাঙালির মননচর্চায় এই অধৈর্য ও আবেগ প্রায়ই দেখা যাবে। সখারাম গণেশ দেউস্করকে ঠিক ঐতিহাসিক বলা যাবে না, তবে স্বদেশের ইতিহাস-অন্বেষণে তিনি প্রভূত সময় ব্যয় করেছেন, *বঙ্গদর্শন*-এর দ্বিতীয় বছরে তিনি লিখেছেন 'ভারতে আব্দালী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯)। কলকাতার জাতীয় বিদ্যালয়ে তিনি অল্পদিন 'ইতিহাসাধ্যাপক' ছিলেন, এর অনেক আগে থেকে তিনি মহারাষ্ট্র-ইতিহাসের চর্চা করছেন। তবে সখারাম গণেশ দেউস্করের সবচেয়ে বিখ্যাত বই *দেশের কথা* (১৯০৪, ১৯০৭) "জাতীয় মহাসমিতির আরব্ধ কার্যে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে' 'দেশের কথা' প্রচারিত" হয়। সরকারি অধ্যাদেশের ফলে বইটি অবশ্য অনতিপরে বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুযুগের ইতিহাস রচনায় নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিজয়চন্দ্র মজুমদার মুখ্যত পুরাণ-কাহিনি নিয়ে গবেষণামূলক কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন। ভাষাতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব-পুরাতত্ত্ব প্রায় সর্বক্ষেত্রে তাঁর অধিকারের পরিচয় মেলে এইসব প্রবন্ধে। *বঙ্গদর্শন*-এর শেষ পর্যায়ের সংযোজন নিখিলনাথ রায়।

৩

১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকারিভাবে বঙ্গবিচ্ছেদের প্রস্তাব বাঙালি প্রথম জানতে পারে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও জনসভায় প্রতিবাদ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ *বঙ্গদর্শন* (জ্যৈষ্ঠ ১৩১১) পত্রিকায় 'সাময়িক প্রসঙ্গ'এ 'বঙ্গবিভাগ' নিয়ে প্রথম যে-আলোচনা করেন, তার মধ্যে আবেগ ও উত্তেজনার প্রকাশ ঘটেনি—"বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, এ কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। বিচ্ছেদের চেষ্টাতে আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকারচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টায় আমাদের যথার্থ লাভ।" এর কয়েকমাস পরে তিনি লিখলেন 'স্বদেশী সমাজ' (*বঙ্গদর্শন*, ভাদ্র ১৩১১) প্রবন্ধ, যেখানে প্রেমের শক্তিতে শোনা গেল—"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!" কিন্তু হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের উল্লেখ সত্ত্বেও 'সমাজপতি' হিসেবে তাঁর নির্বাচন "তপোনিষ্ঠ ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়", যিনি "আচার ও নিষ্ঠাদ্বারা হিন্দুসমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।" ফলে এই বিখ্যাত ভাষণের শেষে এমন কথাও তাঁর কণ্ঠে শোনা গেল, "হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না—তাহা বিশেষভাবে হিন্দু।" একে যদি কেউ স্বদেশি-সমাজের স্ববিরোধ বলতে

চান বলতে পারেন। তবে এর সূচনা বিশ শতকের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায়, এমন কথা বললে হয়তো একটু অন্যায় বলা হবে। দেশকালের মধ্যেই ছিল তিক্ত দ্বিধা, যা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি।

তবে লক্ষণীয়, বঙ্গভঙ্গ তথা স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে যাঁরা মননচর্চায় নিয়োজিত, তাঁরা সকলেই 'রবীন্দ্রানুসারী' ছিলেন না। 'স্বদেশী সমাজ', প্রকাশের কাল থেকে 'ব্যাধি ও প্রতিকার', 'যজ্ঞভঙ্গ', 'পথ ও পাথেয়', 'সমস্যা', 'সদুপায়', 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য', 'দেশহিত'— প্রত্যেকটি প্রবন্ধ রচনার পর বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে তীব্র বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণকুমার মিত্র, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের প্রতিবাদের বিষয় সাহিত্য নয়। তাঁদের বক্তব্য ছিল, "রবীন্দ্রবাবুর ন্যায় একজন শিক্ষিত লোকও রাজশক্তি, সমাজশক্তি ও আমাদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারেন। এবং আকাশকুসুম রচনা করিয়া তাহারই পশ্চাতে ধাবিত হইবার জন্য আহ্বান করিতে পারেন, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়।" (দ্র. *রবিজীবনী* ৫, পৃ. ১৯৮)। আসলে, রবীন্দ্রনাথ কবি, তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা কম, তাই সমাজ-রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কাল্পনিকতা-দোষে দুষ্ট। স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে যাঁরা এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের পাশে ছিলেন, তাঁরাও পরে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণাও অপরিবর্তিত থাকেনি। তিনি একদা সম্মোহিত অবস্থায় যে-হিন্দু আদর্শের জয়গান করেছেন পরে সেই সম্মোহন কেটে যায়। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তিনি সমাজপতি হিসেবে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করেন। পরে বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেন, "ভুল করেছিলুম, অন্যায় করেছিলুম; কিন্তু তখন ভেবেছিলুম যে গুরুদাসবাবু হলেও চলে।" (*রবীন্দ্র-সঙ্গ-প্রসঙ্গ*, পৃ. ২৩)। 'দেশনায়ক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেশনায়কের মঙ্গল-মহাসনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্থাপন করতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি জানতেন সুরেন্দ্রনাথ এই সময়ের আগে ও পরে বারবার বলেছেন, "A section of our people have lost all confidence in the utility of constitutional agitation; they say that they decline to approach the government with memorials and petitions. They say, what is the good of them all. Here, in the matter of Partition we have begged and prayed and protested, and entreated, the arts of sycophancy have been put into the fullest requisition. But all in vain. They say, that self respect demands that they should have nothing whatever to do with the goverment, I may say, gentlemen, that I am not in sympathy with that view at all. I think that the political agitation must be continued and I further think that petitions should be submited. You may say 'no' to the end of your life and you will not convince me that in this matter I am in the wrong." ('The Partition of Bengal', December 1906, *Speaches of Rashtraguru Surendra Nath*

Banerjee. Vol. 1, 1970). সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তবে তিনি ছিলেন পেশাদার রাজনীতিক। প্রয়োজনে মত বদল করতে অভ্যস্ত, এবং আবেগে ভেসে যেতে সক্ষম।

মননচর্চার ক্ষেত্রে যুক্তিক্রম ও বাস্তবতাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ শতকের প্রথম পাদে এদিক থেকে একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী চিন্তার মৌলিকতায়, সংযত সংহত বাক্যনির্মাণে, স্বচ্ছ স্পষ্ট বক্তব্যে, নৈয়ায়িক যুক্তিক্রম অনুসরণে যথার্থ প্রবন্ধকারের গৌরব দাবি করতে পারেন। স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা-মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই, এমনকি রামেন্দ্রসুন্দরও কিছু পরিমাণে ভাবাপ্লুত অবস্থায় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'র (*বঙ্গদর্শন*, পৌষ ১৩১২) মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের রচনাকর্মে অগ্রসর হন। এই সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (*প্রবাসী*, শ্রাবণ ১৩১৪) প্রবন্ধের ঠিক প্রতিবাদ-উদ্দেশ্যে না হলেও স্বতন্ত্র ভাবনার প্রয়োজনে একই নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন (*প্রবাসী*, আশ্বিন ১৩১৪)। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধের সূচনা ও সমাপ্তি অংশ স্মরণ করলে মননচর্চার বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে ধরা পড়বে—

> প্রতিবাদ আমার উদ্দেশ্য নহে। দু-বৎসর ধরিয়া মাতামাতির পর কতকটা স্নায়বিক অবসাদে, কতকটা ইংরেজের ভ্রুকুটিদর্শনে আমরা এখন ঠাণ্ডা হইয়া পড়িতেছি। রবিবাবুও সময় বুঝিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, মাতামাতিতে বিশেষ কিছু হইবে না, এখন কাজ কর।
>
> আজ যিনি আমাদিগকে আস্ফালনে ক্ষান্ত হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন, বাংলার ইতিহাসে এই নূতন অধ্যায়ের আরম্ভে আমি তাঁহারই কৃতিত্ব দেখিতে পাইতেছি। ইংরেজের নিকট 'আবেদন নিবেদন' করিয়া তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিলে কিছুই স্থায়ী লাভ হইবে না, ইংরেজের মুখাপেক্ষা না করিয়া আপনার বলে ও আপনার চেষ্টায় যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাই স্থায়ী লাভ, বঙ্গবিভাগের কিছু পূর্ব হইতে রবিবাবু এই কথাটা ঘোষণা করিতেছিলেন; এবং বঙ্গ বিভাগের বহু পূর্ব হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উচ্চ ও অত্যন্ত তীব্র হইয়া মুহুর্মুহুঃ ঐ কথা আমাদের কানে প্রবেশ করাইতেছিল। অকস্মাৎ বঙ্গবিভাগের ধাক্কা পাইয়া বাংলার শিক্ষিতসমাজ প্রায় একবাক্যে কোলাহল করিয়া বলিয়া উঠিল— না, আমরা আর ইংরেজের কাছে ঘেঁষিব না, উহাদের ছায়া স্পর্শ করিব না, উহাদের ভিক্ষা গ্রহণ করিব না...
>
> স্বদেশীর আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহাতে বাতাস দিতে ত্রুটি করে নাই। বেশ মনে আছে, ৩০শে আশ্বিনের পূর্ব হইতে হপ্তায় হপ্তায় তাঁহার এক একটা নূতন গান বা কবিতা বাহির হইত, আর আমাদের স্নায়ুতন্ত্র কাঁপিয়া আর নাচিয়া উঠিত। নিষ্ফল ও অনাবশ্যক আস্ফালনে তিনি কখনোই উপদেশ দেন নাই। কিন্তু সে সময়টায় যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ কাজ করার আহ্বান জানালেন 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে। তবে কাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণার সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের ধারণার পার্থক্য আছে। প্রবন্ধের শেষে জাতীয়জীবনে পক্ষাঘাত দূর করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ কীভাবে 'ভাবের বৈদ্যুতী প্রয়োগে' সক্ষম, সে কথা জানিয়েছেন। হয়তো এখানে একটু শ্লেষ লুকিয়ে থাকতে পারে,

তবে রামেন্দ্রসুন্দর যে স্বতন্ত্র পথে ব্যাধির প্রতিকার সন্ধান করেছেন, তা স্পষ্ট বোঝা যায়—

> এই দুই বৎসরের আন্দোলনকে আমি নিষ্ফল আন্দোলন বলিতে প্রস্তুত নহি। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রবাবুও প্রস্তুত নহেন— কেন না, এই ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে যে কয় জন লোকে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি তন্মধ্যে অন্যতম অগ্রণী। জনসঙ্ঘমধ্যে ভাবের প্রবাহ পরিচালনার প্রধান অধিকার— সাহিত্যিকের। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী ভাষার সাহায্যে যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে সেই স্রোতে নূতন নূতন তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে, সময় সময় তুফানের সৃষ্টি হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তুফানে তরণী ছাড়িয়া দিয়া আজ যদি তিনি সামাল সামাল করিতে থাকেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ দোষ নিরপরাধ আরোহীদিগের উপর ষোল আনা না চাপাইয়া স্বয়ং কতকটা গ্রহণ করিবেন।

আমাদের মনে পড়বে অল্পদিন আগে (২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১২) রবীন্দ্রনাথ পত্রে রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখছেন, "উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎপরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।" এই প্রসঙ্গে *খেয়া*-র 'বিদায়' (১৪ চৈত্র ১৩১২) কবিতার কথা সকলে উল্লেখ করে থাকেন, "বিদায় দেহো, ক্ষম আমায় ভাই/ কাজের পথে আমি তো আর নাই।" মুশকিল হল, কাকে বলে 'কাজ' তা নিয়ে সে সময়ে যেমন, আজও তেমনি বিতর্কের অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথ তো 'কাজ' করার আমন্ত্রণই জানিয়েছিলেন বিভিন্ন প্রবন্ধে।

যাঁরা একসময়ে নবপর্যায়-*বঙ্গদর্শন* পত্রিকা প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথের পাশে ছিলেন, তাঁরা কয়েক বছরের মধ্যে দূরে সরে গেছেন। বাঙালির মননচর্চার ধারায় যে-দ্বিধার কথা আমরা বলেছি, তারই মধ্যে এই বিরোধের বীজ লুকিয়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী উৎসব'এর (*ভারতী*, আশ্বিন ১৩১১) মতো কবিতা কীভাবে লিখলেন, তা নিয়ে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, "দেউস্কর মহাশয়ের বৈদ্যুত তাড়নায় শিবাজী উৎসব সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইলাম।" *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা প্রকাশে অনেকদিন পর্যন্ত বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায়। 'বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা' (কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩১২) কিংবা 'স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজম্' (চৈত্র ১৩১২, আষাঢ় ১৩১৩) প্রবন্ধের মধ্যে বিপিনচন্দ্রের স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন "আমরা যে নেশন হইব, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।" রবীন্দ্রনাথের 'নেশন' সম্বন্ধে ধারণা ভিন্ন, তাই স্বদেশির সঙ্গে তিনি নেশনের ধারণাকে মেলাতে চাননি। তবে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার চরিত্র-বদল স্পষ্ট হয়েছে বিপিনচন্দ্র পালের 'শিবাজী-উৎসব' (ভাদ্র ১৩১৩) এবং 'শিবাজী-উৎসব ও ভবানীমূর্ত্তি' (আশ্বিন ১৩১৩) প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'শিবাজী-উৎসব' কবিতা লেখেন, তখন নিশ্চয় তিনি ভাবতে পারেননি, ভবানীকে বাদ দিয়ে শিবাজী-চরিত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ও জীবনের লক্ষ্য বোঝা যায় না। বিপিনচন্দ্র পাল তথ্য ও যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন—"প্রাকৃত জনে মূর্তি দেখিয়াছে,—দেবতাজ্ঞানে সে মূর্তিকে হয়ত শ্রদ্ধাবশতঃ অন্তরে প্রণাম করিয়াছে, কিন্তু এই মূর্তিত্রয়ের (ভবানী-রামদাস-শিবাজি) মধ্যে শিবাজী চরিত্রের মূলচিত্র—শিবাজীর জীবনের নিগূঢ় শক্তি ও শিক্ষার প্রতিকৃতি দেখিয়াছেন কেবল জ্ঞানী ও ভাবুকে। তাঁহাদের চক্ষে এ কেবল মৃন্ময়ী মূর্তিতে প্রতিভাত হয় নাই। তাঁহারা ভারতের চিন্ময়ী জাতীয়শক্তি ও ভারত-ইতিহাসের নিত্য অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে এই মূর্তিত্রয়ের সমাবেশে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিম্ন অধিকারীর জন্য নহে, প্রকৃতপক্ষে উচ্চ অধিকারীর জন্যই এই সকল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। বেদান্তের পরে পুরাণ একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না।'

বিপিনচন্দ্র পাল *নারায়ণ* (১৯১৪) পর্বে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার জন্য অনেক নিন্দামন্দ লাভ করেছেন। আসলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মননচর্চার সংকট বিপিনচন্দ্র পাল বা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও নবপর্যায়-*বঙ্গদর্শন-এ* লিখতেন। তাঁর পড়াশোনার ক্ষেত্র ছিল বিস্তীর্ণ, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। পরবর্তীকালে *অচলায়তন* (১৯১১) নাটক নিয়ে ললিতকুমারের আপত্তির উত্তর দিয়েছেন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ। তবে *বঙ্গদর্শন* পর্বেই ললিতকুমার মতানৈক্যের কথা জেনেই *সাহিত্য* (কার্তিক ১৩১২) পত্রিকায় লিখেছেন 'স্বদেশী আন্দোলন ও পলিটিক্‌স'।

অবশ্য মননচর্চার ক্ষেত্রে মতান্তর বড়ো কথা নয়। তা ছাড়া, কালের ব্যবধানে মতের পরিবর্তনও ঘটে। সবচেয়ে দরকারি কথা হল— স্বাধীনচিন্তা। বিনয়েন্দ্রনাথ সেন *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় অল্পই লিখেছেন, সম্ভবত বাংলাতে তিনি খুব বেশি লেখেননি। (তাঁর *Intellectual Ideal* বইটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন)। বিনয়েন্দ্রনাথ *বঙ্গদর্শন* (আষাঢ় ১৩১৩) পত্রিকায় 'বর্তমানযুগের স্বাধীনচিন্তা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—"এই স্বাধীনচিন্তা কোনো দেশ বা ভূভাগ, বা সম্প্রদায়বিশেষের সম্পত্তি নয়।" "এই স্বাধীনতার স্রোত দুইটি বিপরীত গতিতে চলিয়া আসিয়াছে,— একটি ভাঙিবার পথ, আর একটি গড়িবার পথ। অথচ দুইটিকে লইয়া একই পথ,—একটির ভিতর দিয়া না আসিলে আর একটি আসিবার উপায় ছিল না।" "আত্মজ্ঞান, আত্মসম্মান, আত্মনির্ভরের গভীর সুদৃঢ় ভিত্তির উপর এই স্বাধীনচিন্তা প্রতিষ্ঠিত; জগৎসংসার কেবল সেই এক, অখণ্ড অচিন্ত্য জ্ঞানেরই বিকাশ,

এই সত্যকে অবলম্বন করিয়া ইহার দিগন্তব্যাপী, অপ্রতিহত প্রসার। ইহা যথেচ্ছচারী বা অসংযত বুদ্ধি নয়; সহজ মানবপ্রকৃতিতে ইহার মূল থাকিলেও, ইহা কঠোর সাধন, শিক্ষা ও অনুশীলন সাপেক্ষ। নির্ভীকতা ইহার প্রকৃতি, বিশ্বরূপদর্শন ইহার আকাঙ্ক্ষা, বিভূতিযোগ ইহার সাধনের সামগ্রী।" এই কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর বলতে পারতেন। পরবর্তীকালে বাঙালি মনীষী যাঁরা সত্যসন্ধানী, এগুলি তাঁদের সকলেরই মর্মকথা। তবে বাঙালির মননচর্চার ধারা অব্যাহতগতিতে অগ্রসর হয়নি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে সেই মননচর্চার দৃষ্টান্ত অল্পপরিমাণে এখানে উপস্থিত করা হল।

হিংসের কথা
ঈর্ষা, অসূয়া, এবং ষষ্ঠ রিপুর অর্থনীতি

অরিন্দম চক্রবর্তী

"ধৃতরাষ্ট্র। ক্ষুদ্র ঈর্ষা! বিষময়ী
ভুজঙ্গিনী।
দুর্যোধন। ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী।
ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম; দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান—লক্ষ লক্ষ তৃণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন।
নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভ্রাত্র বন্ধনে—
একসূর্য, এক শশী। মলিন কিরণে
দূর বন অন্তরালে পাণ্ডু চন্দ্রলেখা
আজি অস্ত গেল—আজি কুরুসূর্য একা,
আজি আমি জয়ী।" —রবীন্দ্রনাথ

"Jealousy is all the fun you think they had" —Erica Jong

"...কি কথা তাহার সাথে? তার সাথে?"—জীবনানন্দ দাশ ('আকাশলীনা')

১. *হিংসা না হিংসে?*

হিংসা আর হিংসে এক জিনিস নয় মোটেই। প্রথমটিতে রয়েছে জিঘাংসা ও রক্তপাতের অভিপ্রায়। দ্বিতীয়টিতে আপাতত কোনো প্রাণহানির পরিকল্পনা নেই, বড়োজোর রয়েছে মানহানির ভয়। প্রথমটি বলবান করতে পারে এবং করে দুর্বলের ওপরে; দ্বিতীয়টি দুর্বলেরা করে বলবানদের বিষয়ে অথবা পরস্পরের বিষয়ে। প্রথমটির সংগঠিত রূপ হল যুদ্ধ। দ্বিতীয়টির সংগঠিত রূপ হল খোলাবাজারের বাণিজ্য। যদিও যুদ্ধের দ্বারাও একরকমের বাণিজ্য ভালো চলে, সাধারণত শান্তির সময়েই বাণিজ্যের রমরমা। শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্রপূজারি ব্যক্তিযুক্তিবাদী আধুনিক প্রগতিশীল মানুষরা তাই হিংসা পছন্দ করেন না একেবারেই। অথচ প্রতিবেশী ব্যক্তি, পরিবার, জনপদ, বা দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে উন্নয়ন ঘটে, সেই বাজারকেন্দ্রিক প্রগতির মূল প্রেরণা আসে প্রতিযোগিতা থেকে। আর প্রতিযোগিতার ভাব-উৎস হল হিংসে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একটি ছোটোগল্প (যার নাম 'হিংসা') শুরু হয় এমনই এক রক্তপাতবিরোধী অহিংস হিংসুটে মহিলাকে নিয়ে। সকাল

হতে না হতেই বাঁচতে গেলে হিংসা, হত্যা, রক্তপাত করতেই হয়—এই নিয়ে মাংসাশী স্বামী জগদীশের সঙ্গে ঝগড়া করল বিবেকবতী রেবা। আজ তার প্রিয় পরিচিত সুন্দর সতেজ পোষা মুরগিটিকে কেটে রান্না করতে হবে। স্বামী অফিসে। স্নেহময়ী কশাই-এর মতো ভীতসন্ত্রস্ত মুরগিটির পেছন পেছন ছুটে বিবেকদংশন সহ্য করতে করতে, ছ-মাস ধরে আদর করে খাইয়ে বড়ো করে তোলা মুরগিটিকে কেটে কুটে রান্না করে ফেলল বটে এই নিম্নমধ্যবিত্ত মহিলাটি, কিন্তু মনে মনে সংকল্প করল আজ থেকে আর প্রাণীহিংসা না করার চেষ্টা করবে। বাড়িতে মুরগি কাটবে না, নিজে হাতে জ্যান্ত মাছ কাটবে না, এমনকি মশাও মারবে না—জৈনরা তো পারে—মশারি খাটিয়ে সেও চেষ্টা করবে। এই হল রেবার অহিংসার সংকল্প।

দুপুরে প্রতিবেশিনী গৃহবধূ মীরা বিশ্রম্ভালাপ করতে এল। দুজনে মিলে মুরগির ঝোল চাখতে চাখতে জীবহত্যার অনৌচিত্য বিষয়ে রেবার কথার জবাবে, ইদানীং অন্তঃসত্ত্বা ছলবলে মীরা রেবাকে প্রিয় সখীর মতো বোঝায় : "হিংসাটা সাময়িক, বুঝলি—চট্ করে যেমন মানুষকে পেয়ে বসে আবার জুড়িয়ে যেতেও বেশিক্ষণ লাগে না। তা না হলে পৃথিবীটা হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে কবে ছাই হয়ে যেত না? এই যে আমরা পাকিস্তান থেকে চলে এলাম, কত গোলমাল মারামারি হল...সব কি চিরকাল মনে থাকছে?...হিংসা যত সকাল সকাল ভুলে যাওয়া যায়, তত ভাল—নে হাঁ কর দেকিনি?"

বোঝা গেল দুই মহিলাই উদ্‌বাস্তু কলোনির বাসিন্দা। রেবার একটি কন্যা। মীরার একটি পুত্র। মীরা সগর্বে জানায় এবারও তার গর্ভে পুত্রসন্তান এসেছে—রেবা পুত্রসন্তানের অভাবে হীনম্মন্যতায় ভোগে। ক্রমে ক্রমে মুরগি-কাটার জঘন্যতার আলোচনাকে চাপা দিয়ে স্বামীগর্বে গরবিনী মীরা তার স্বামীর সাম্প্রতিক পদোন্নতি, আর্থিক বাড়বাড়ন্ত, মীরাকে অপ্রত্যাশিতভাবে সোনার গয়না উপহার দেওয়ার ঘটনা ফলাও করে বলতে থাকে। পাশের বাড়ির বউটি আমার থেকে কত বেশি সুখে আছে এ চিন্তায় তুলনার গ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়ে রেবার মন থেকে মুরগিহত্যার পাপবোধ মুছে যায়। এবং শেষ পর্যন্ত—উদ্‌বাস্তু পূর্ববঙ্গীয় কলকাতাবাসী বাঙালির কাছে স্বর্গসম চরমকল্পনীয় সৌভাগ্য—দিল্লির হেড অফিস থেকে মীরার স্বামীকে বিলেতে পাঠানো হবে—এই খবর পর্যন্ত দিয়ে রেবার ভিতরে ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়ে তোলে প্রগল্‌ভা মীরা। হিংসা নয়, হিংসের দাবানল। ভবিষ্যতে বিলেতফেরত কোম্পানির গাড়ি-বাড়ি-আর্দালিওয়ালা সফল পুরুষের বউ হিসেবে মীরার অহংকারে মাটিতে পা পড়বে না, শুষ্ক ভদ্রতায় এইসব কথা বলতে বলতে রেবা "আর হাসে না, বা চোখ বড় করে না।...নিঃশ্বাসও ফেলছে না একবার—যেন যন্ত্রের মত ওর ঠোঁট জোড়া নড়ছিল।" কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ বা মদগর্বী নয়, রেবাকে চালনা করছে তখন কেবল মাৎসর্য। এই সময়ে সগর্ভা মীরার বাথরুমে যাবার দরকার হয়। সকালবেলায় সে পিছল বিপজ্জনক উঠোন পেরিয়ে কাঁটাঝোপের দিকে যেতে গিয়ে বড়ো মুরগিটিও আছাড় খেয়ে পড়েছিল সেই পিচ্ছিল মারাত্মক পথে

কলতলায় মীরাকে বাথরুম সারতে পাঠায় রেবা—নিজেদের পাকা বাথরুমটি ব্যবহারের অযোগ্য—এই অজুহাতে।

গল্পের শেষে, পরের দিন ভোরের আকাশ কাঁদতে থাকে। মীরার শিশুপুত্রটির আকাশফাটা কান্নায় মোরগের কান্না চাপা পড়ে।

> "পাশের বাড়ির শিশুটা কাঁদছে। মা আর কোনদিন আস্‌বেন না। সেই যে আগের দিন দুপুরবেলা এবাড়ির স্যাওলাধরা কলতলায় পা পিছলে পড়ে গিয়ে চোখ বুজেছিল মহিলা আর চোখ খোলেনি।"

জগদীশ রেবাকে জিগেস করে "আমাদের বাথরুমে না গিয়ে ওখানে গিয়েছিলেন কেন তিনি?" মীরা আর মুরগি দুজনেই রেবার জ্ঞাতসারেই আছাড় খেয়েছিল। তবু প্রতিবেশিনীর অপঘাতমৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ বিষয়ে অজ্ঞতার অভিনয় করে নিজের পৈশাচিক ঈর্ষাকে আরেকবার 'জীবে দয়া'র আবরণে ঢাকতে ঢাকতে রেবা বলে যে সে লক্ষ করেনি, কারণ গতকাল তার অত প্রিয় মুরগিটাকে হত্যা করা হল বলে তার মন খারাপ ছিল।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অন্যান্য অনেক গল্পের মতোই এই আখ্যানটি জটিল। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-র সপ্তম অধ্যায়ের ৩৬/৩৭ শ্লোকে রেবার মতন হিংসেকেই 'অসূয়া' বলা হয়েছে (যদিও এই নিবন্ধে আমি 'অসূয়া' শব্দটির দ্বারা এই জাতীয় Envy-কে বোঝাব না, অন্য ধরনের তিনকোণা Jealousy-কে বোঝাব। এই গল্পে যেহেতু মীরার উন্নতিশীল স্বামীর সঙ্গে রেবার কোনো প্রণয় বা ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত আদৌ নেই, সেহেতু রেবার মাৎসর্যকে আমি 'অসূয়া' নাম দিতে চাই না।)

> "পর-সৌভাগ্য-ঈশ্বরতা-মেধালীলা সমুচ্ছ্রয়ান্ দৃষ্ট্বা
> উৎপদ্যতে হি অসূয়া কৃতাপরাধো ভবেৎ যশ্চ"

অন্যের কপাল খুলে গেল (আমার খুলল না!) অন্যের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য বেশি, অন্য লোকটি আমার থেকে বেশি মেধাবী, অন্য মেয়েটা বা বউটি আমার থেকে বেশি "লীলা" খেলা উপভোগ করছে, ওদের সমুচ্ছ্রয় জীবনে উন্নতি, বাড়বাড়ন্ত, অভ্যুদয় হয়েই চলেছে (আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে!)—এইসব দেখে উৎপন্ন হয় অসূয়া। এ পর্যন্ত তো বোঝা গেল। তারপর হঠাৎ ভরত একথা কেন বলছেন—"কৃতাপরাধো ভবেৎ যশ্চ"? এই ঈর্ষার ভাবটি, "আমার কাছ থেকে সব সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি, সম্মান সরে সরে যাচ্ছে (মৎ+সর?) অন্যায়ভাবে ওর কাছে, এটা সইতে না পারাই "মৎসর" বা মাৎসর্য। এর থেকে "যেন একটা অপরাধ করে ফেলেছে"—এই চোর চোর ভাব কেন হবে ঈর্ষালু ব্যক্তির—যেমন রেবার হয়েছিল গল্পের শেষে? আমি কী জানি প্রতিবেশিনী বউটি কেন মারাত্মক পিচ্ছিল পথে দৌড়তে গেল? এই 'অসূয়া' (এক্ষেত্রে Envy)-র অভিনয়ও রেবা করেছে প্রায় হুবহু ভরতের কথিত নির্দেশ মেনে—যদিও নকল হাসি ও বিস্ফারিত চোখ দিয়ে তাকে "ভ্রুকুটিকুটিল উৎকট মুখ, সের্ষ্যা ক্রোধ পরিবৃত নেত্র", ঢাকতে হয়েছে। যে বিদ্বেষ তার ভেতরে জেগে উঠেছিল—যা শেষপর্যন্ত তার হিংসেকে হিংসায় পরিণত করেছে—তারও বর্ণনা দিয়েছেন ভরত

"গুণনাশন বিদ্বেষৈস্তত্র অভিনয়ো প্রযোক্তব্যঃ"। ঈর্ষা শুধু পরের গুণে দোষ আবিষ্কার করে তা নয়; গল্পের শুরুতে যে রেবার মধ্যে সর্বজীবের প্রাণ রক্ষা ও দয়ার গুণ দেখা গিয়েছিল ঈর্ষার বিষবাষ্পে সেইসব গুণের "নাশন" ঘটে গেছে। অহিংস রেবা জেনেশুনে একজন জিঘাংসু ঘাতকে পরিণত হয়েছে। এই "কৃতাপরাধঃ" অন্তর্দাহ, এই হিংসের জ্বলুনিকে, কিন্তু আর রক্তক্ষয়ী হিংসার থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না। ঈর্ষা, অসূয়া, মাৎসর্যের সঙ্গে একরকমের (নিজের কাছেও লুকোনো?) জিঘাংসা ও অপরাধ প্রবণতার যোগ থাকে কি থাকে না, ঈর্ষা আর অসূয়ার প্রকারভেদ, তথা ভাবাবেগ হিসেবে বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে এরা কেন এত গর্হনীয়, এত মানবিক-প্রাকৃতিক হয়েও এত নিন্দিত—এইসব নিয়েই এই প্রবন্ধ। কিন্তু ব্যক্তির মতোই সমূহ বা গোষ্ঠীও ঈর্ষায় ভোগে। সবক্ষেত্রেই ঈর্ষার মূলে থাকে 'তুলনা' ও 'প্রতিযোগিতা'। অ্যারিস্টট্ল, স্পিনোজা, *হিউম্, অ্যাডাম স্মিথ্, ফ্রয়েড—এঁরা সকলে এই ষষ্ঠরিপু মাৎসর্যকে নিয়ে ভেবেছেন।* তাঁদের চিন্তা এবং সমসাময়িক বিশ্লেষণী ইঙ্গমার্কিন দর্শনে 'হিংসে' নিয়ে যতরকম ভাবাভাবি চলছে তা আশ্রয় করে আমরা নিজেদের ভিতরকার এই অজেয়, অদম্য, 'প্রাগৈতিহাসিক' প্রবৃত্তিটিকে বুঝবার চেষ্টা করব।

২. ঈর্ষা বনাম অসূয়া

পরিভাষা নিয়ে একটা গোলমাল শুরুতেই দেখা গেছে। ইংরেজিতে যেরকম Envy আর Jealousy-র মানে আলাদা হলেও, চলতি ভাষায় দুটো গুলিয়ে ফেলা খুবই প্রচলিত, তেমনি সংস্কৃততেও 'ঈর্ষা', 'মাৎসর্য', 'অসূয়া' অনেক সময়েই পরস্পরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে শব্দপ্রয়োগের স্পষ্টতার খাতিরে আমাদের ঠিক করে নিতে হচ্ছে যে দুই ব্যক্তি (বা গোষ্ঠী)-র মধ্যে প্রতিযোগিতাকে ঘিরে একজন যখন মনে করে অপরজনের এমন কিছু আছে—ধনদৌলত, খ্যাতি, প্রতিভা, রূপ, গুণ, ক্ষমতা, যৌবন, জনপ্রিয়তা—যা তার নিজের নেই অথচ সে চায় যে তারও থাকুক—তখন এই হীনতরম্মন্য ব্যক্তির যে দুঃখ, ক্ষোভ, বা বঞ্চনাবোধ-যুক্ত মানসিক অবস্থা হয় তাকেই বলব 'ঈর্ষা'।

আর, প্রথম ব্যক্তি যখন তার প্রেমাস্পদ দ্বিতীয় ব্যক্তি বিষয়ে মনে করে যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি তাকে (দ্বিতীয় ব্যক্তিকে) আকৃষ্ট বা প্রভাবিত করে তাদের একনিষ্ঠ পারস্পরিক প্রেমে বাধা দিচ্ছে অথবা তৃতীয় ব্যক্তি (অযোগ্যতর হওয়া সত্ত্বেও) দ্বিতীয় তাকে প্রথমের সমান বা বেশি ভালোবাসছে—তখন প্রথম ব্যক্তির মনে যে শঙ্কাকুল বিদ্বেষভরা ক্ষোভ সৃষ্টি হয় তাকেই বলব 'অসূয়া'। অবশ্যই অসূয়া মুখ্যত প্রেমের (বাস্তবিক বা আশঙ্কিত) ত্রিকোণকে কেন্দ্র করে ঘটলেও অফিসের ওপরওয়ালার স্নেহ বা আস্থাভাজন হওয়া নিয়ে দুই কর্মচারীর মধ্যেও হতে পারে। কিন্তু সেখানেও ক, খ-কে নিয়ে গ-এর প্রতি অসূয়া-কাতর, অথবা ক, গ-কে ঈর্ষা করে এভাবেই কথা বলা সমীচীন। অর্থাৎ—আধুনিক পশ্চিমী মনস্তাত্ত্বিক, আবেগ-দার্শনিকদের ভাষায় : ঈর্ষা যদি হয় একটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, অসূয়া একটি ত্রি-পাক্ষিক সম্পর্ক। আরেকটু ভেঙে বললে

হয়তো ঈর্ষাকেও একটি ত্রি-পদী (ত্রিপাক্ষিক নয়) সম্পর্ক হিসেবে দেখানো যায়। যথা : সীমা (১) অসীমকে (২) তার গণিত পারদর্শিতার (৩) জন্য ঈর্ষা করে। তবু অসীম যদি সীমাকে সন্দেহ করে যে সে অসীমের থেকেও বোকা কিন্তু বলিষ্ঠতর আমি-কে বেশি পছন্দ করছে—তাহলে সীমার ওপর প্রেমের এক্তিয়ারবোধযুক্ত অসীমের যে অসূয়া হবে তা হবে ত্রিপাক্ষিক, শুধু ত্রিপদী নয়।

তবে কিনা ঈর্ষা ও অসূয়ার তফাত কেবল দু-পক্ষ বনাম তিন-পক্ষ দিয়ে টানা যায় না। এদের মধ্যে অন্তত আরও দুটি গভীরতর পার্থক্য করা সম্ভব।

প্রথমত : ঈর্ষালু ব্যক্তি শুরু করে এই দুঃখ থেকে যে, আমার যা নেই ওর কেন তা আছে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈর্ষার অভীষ্ট তাই ঈর্ষিত ব্যক্তির—কোনো অংশে—সমান হওয়া। অপরের সুখে দুঃখিত হওয়া এই ছিল স্টোয়িক দার্শনিকদের কাছে ঈর্ষার মুখ্য লক্ষণ। অসূয়াকাতর ব্যক্তির শঙ্কার শুরু একটা ভয় থেকে (দুঃখ থেকে নয়) যে আমার—আমার একার—দয়িতা/দয়িত পাছে অন্য আরেকজনের সঙ্গে আমারই মতন বা আমার থেকেও বেশি বন্ধুত্ব করে আমার হাতছাড়া হয়ে যায়। যা তার আছে এবং অন্যের নেই তা পাছে অন্যেরও হয়ে যায়—এই হল অসূয়ার আশঙ্কা। কাজেই—শুধু একটা দুঃখিত বঞ্চনাবোধ, অন্যটা গর্বের অনিশ্চয়তা নয়, ঈর্ষার তাড়নায় বর্তমান অবস্থা বা সম্পদ-স্বাস্থ্য-খ্যাতি-প্রতিপত্তির যে বর্তমান বণ্টন সেই পরিস্থিতিকে মানুষ পালটাবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। অসূয়ার তাড়নায় সে বর্তমানে যে নিজের একটা বিশেষ একক প্রেমাধিকার রয়েছে , সেটিকেই বজায় রাখতে ব্যগ্র থাকে—কোনো সামান্যও পরিবর্তন সহ্য করতে চায় না। অসূয়াশীল প্রেমিক তার প্রিয়তমার জীবনে তৃতীয় কোনো নতুন প্রিয়জন বা আকর্ষণ বা নতুন সখ বা পোষা পাখিকেও প্রবেশ করার অনুমতি দিতে চায় না—সে এমনই 'রক্ষণশীল'।

দ্বিতীয়ত : ঈর্ষায় পীড়িত হয়ে আমরা ঈর্ষিত অন্যের সঙ্গে বৈষম্য সহ্য না করে সাম্যের-অভিলাষী হই। অসূয়া নিজের অসম অনন্যতাকে আগলাতে গিয়ে অন্যের সঙ্গে সমান হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে ভোগে।

৩. সমবেদনা, বিপরীতবেদনা, প্রতিযোগিতা, স্পিনোজা, হিউম এবং কান্ট্

দেকার্তে ইত্যাদির এক-ব্যক্তি-কেন্দ্রিক চিন্তার উত্তরাধিকারী আধুনিক পশ্চিমী দর্শন ও মনোবিদ্যা 'পর-চিত্ত' নিয়ে আজও পর্যন্ত খুবই অসুবিধের মধ্যে রয়েছে। পরের আত্মা বা চিত্তে কী ঘটছে তা নিজে সাক্ষাৎভাবে না জানলেও 'অন্যরা কী ভাবছে বা অপরে কী ভাববে'—এই চিন্তাটা কিন্তু আমার নিজের কাছে নিজের ভাবমূর্তির পক্ষেই (নিজের অন্তর্নিরীক্ষণের থেকেও বেশি) জরুরি। আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষজ্ঞানের সময়ে যেরকম আমরা চোখের কোনা দিয়ে ক্রমাগত (অবচেতনভাবে) লক্ষ করার চেষ্টা করি চারিপাশের অন্য লোকেরা কোনদিকে তাকাচ্ছে (একে বলা হয় Eye-direction-detection)—তেমনি কোনো সামনে পড়া বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনার প্রতি সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, লোভ, বিরক্তি, হাস্য, ঘৃণা বোধ করতে করতে আমরা ভেতরে ভেতরে লক্ষ রাখি বা টের

পাই যে, কাছাকাছি অপর ব্যক্তিরা ওই একই বিষয়বস্তু বিষয়ে কী মনোভাব প্রকট করছে। সাধারণত আমরা আবেগগত সংক্রমণ বা প্রতিবিম্বনের মাধ্যমে অন্যের সুখে সুখ, অন্যের শোকে শোক, অন্যের বিস্ময়ে বিস্ময়, অন্যের হাস্যে হাস্য (অন্যের হাই তোলায় হাই তোলার মতোই) অনুভব করে থাকি। একে সাধারণভাবে বলা হয় 'সহবেদন' বা 'সমবেদনা'। বিমূর্ত দার্শনিক চিন্তার কাছে অন্যের সুখে সুখ, অন্যের দুঃখে দুঃখেরই মতন স্বাভাবিক। প্রথমটিকে বলে 'মুদিতা' দ্বিতীয়টিকে বলে 'করুণা'। ইংরেজিতে যেমন দ্বিতীয়টিকে Compassion sympathy (দুটি শব্দেই 'সহ'বাচক 'com' এবং 'sym' লক্ষণীয়) বলে, তেমনি প্রথমটির জন্য কিন্তু কোনো স্পষ্ট 'সহানুভূতি'বাচক শব্দ নেই। অন্য কেউ পরীক্ষায় বা চাকরিতে (আমার থেকেও বেশি) ভালো করলে আমি যা অনুভব করি বা প্রকাশ করি তাকে 'সমবেদনা' বা 'sympathy' বলা চলে না কোনোমতেই—যদিও 'অন্যের সুখে সুখ'কেও 'সহ+অনুভূতি', বলা যেতে পারা উচিত। তবে ইংরেজি একটি শব্দ 'Congratulation'—একই সঙ্গে (con) আনন্দিত হওয়া (gratification)-র দ্যোতনা বহন করে তাই আমরা ('সহ-নন্দন' না বলে) বলি 'অভিনন্দন'। পরিভাষার জটিলতা ছাড়াও মানবচরিত্রের মধ্যেই এই এক বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে হয়—যার ফলে অপরের দুঃখে দুঃখী হওয়া যতটা সহজ অপরের সুখে সুখী হওয়া ততটা সহজ হয় না। করুণার থেকে মুদিতা তাই অনেক বেশি দুর্লভ গুণ। সম্ভবত এর কারণ হল এই যে মানুষের নিজের সুখদুঃখের অনুভূতি কেবল নিজের দিকে তাকিয়ে হয় না, অন্যের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে হয়। ফলে, (যদি না অপর ব্যক্তিটি নিজের সন্তান বা নিতান্ত স্বার্থপরিধির অন্তর্ভুক্ত কেউ হয়) অপর ব্যক্তির সুখে সমানুভূত প্রতিবিম্বিত সুখ হতে না হতেই তার তুলনায় নিজের হীনতর, দীনতর, দুঃখতর অবস্থা অনুভব করে ঈর্ষাদুঃখের উদ্ভবে মুদিতার অভিনন্দন ম্লান হয়ে আসে। বড়োজোর বাকি পড়ে থাকে একরকমের ঔদাসীন্য বা সহনশীলতা। ওর অভ্যুত্থানে আমার কি?

জাঁ জাক্ রুশো তাঁর প্রখ্যাত নৈতিকশিক্ষা বিষয়ক *এমিল* নামক গ্রন্থে যেভাবে এই সমদুঃখী হওয়া সমসুখী হবার থেকে সহজতর—এই ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে বোঝা যায় যে তিনি অস্পষ্টভাবে করুণা ও ঈর্ষার ভেতরকার গভীর যোগসূত্রটি টের পেয়েছিলেন "অন্য আরেকজন সুখী মানুষকে দেখলে আমাদের ভেতরে যত না প্রীতি জাগে, তার থেকে বেশি জাগে ঈর্ষা। বিশেষত এককভাবে একটি উৎকৃষ্টতর সৌভাগ্য ভোগ করার যে অধিকার ওর নেই তা ও জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে এ জাতীয় অনুযোগই বরং আমাদের ভেতর থেকে স্বাভাবিকভাবে জেগে ওঠে।...অথচ অন্য আরেকজনকে কষ্ট পেতে দেখলে কার না মনে দয়া হয়? কল্পনা এইভাবে আমাদের দুঃখী মানুষের জায়গায় অনেক সহজে বসিয়ে দেয়, যেভাবে সুখী মানুষের জায়গায় কিছুতেই বসতে দেয় না।" একসঙ্গে ফুর্তি করলে বড়োজোর (যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকে) সমান অভীষ্টলাভের স্বার্থবন্ধন দৃঢ় হয়, কিন্তু একসঙ্গে কষ্ট পেলে বন্ধুত্ব ও প্রীতি দৃঢ়তর হয়। অতএব রুশোর উপদেশ, ঈর্ষাকে অতিক্রম করবার শিক্ষা দিতে গেলে কিশোরের মনকে

ঘুরিয়ে দিতে হবে দয়ার দিকে, অন্যের ভাগ্য বা সুখদুঃখের প্রতি ঔদাসীন্য বা কেবল নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার দিকে নয়।

অথচ ঈর্ষা এবং দয়া উভয়েরই মূল কিন্তু নিজের অবস্থার সঙ্গে অন্যের অবস্থার তুলনা করা। আর পূর্বে, পশ্চিমে, প্রাচীন ও আধুনিক সর্বকালে বাপ মা শিক্ষক শিক্ষিকারা বাচ্চাদের চারিত্রিক ও গুণগত 'উন্নতি'র শিক্ষা দিয়ে থাকেন তুলনারই মাধ্যমে। গোপালের মতো হও, রাখালের মতো হয়ো না। প্রতিবেশীর মেয়েটি কেমন রোজ সকালে গলা সাধে তাই তো তোমাকে হারিয়ে দিল গানের প্রতিযোগিতায়, তুমি ওর মতো হতে পারো না? রুশোর দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত (যদিও রুশোর হৃদয়াবেগ কেন্দ্রিক শিক্ষাদর্শের বিরোধী) ইমানুয়েল কান্ট্ তাঁর নৈতিকতার অধিতত্ত্ব (*Metaphysics of Morals*) গ্রন্থে এবং শিক্ষা বিষয়ক পৃথক্ পুস্তকে এই ধরনের ঈর্ষাজাগানো শিশুশিক্ষার সোচ্চার বিরোধিতা করেছেন।

অথচ অ্যারিস্টট্লের এথিক্স্ এবং রেটরিক্ দুই বইতেই আমরা দেখি যে একধরনের ঈর্ষাকে ভালো বা সদ্‌গুণ বলে প্রশংসা করা হয়েছে। যদিও নিজেকে অন্যের তুলনায় হীন জানা এবং অন্যের অধিকতর ঐশ্বর্য, বিদ্যা, রূপ, গুণ লক্ষ করা এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য দু-রকম ঈর্ষার মধ্যেই থাকে—ঈর্ষাকে অ্যারিস্টট্ল ভাগ করেছেন দুইভাগে—অনুকরণাত্মক সসম্ভ্রম ঈর্ষা আর আহত-আত্মশ্লাঘাজনিত বিদ্বেষপূর্ণ ঈর্ষা। প্রথমটিকে প্রাচীন গ্রিকরা বলতেন 'জিলস্' (Zelos) আর দ্বিতীয়টিকে বলতেন 'ফ্থোনস্' (Phthonos)। মহত্তর বা সফলতর কোনো অপর ব্যক্তিকে যখন আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে উৎকৃষ্টতর বলে স্বীকার করে নিজের ঘাটতিপূরণের জন্য তাঁর অনুকরণ, অনুসরণ, অনুগমন করি—যেমন ছাত্ররা করে শিক্ষকের—তখন যে ধরনের আত্মোন্নতির অনুপ্রেরণাদায়ী 'তুলনা' কাজ করে তাকেই সদ্‌গুণ বলে প্রশংসা করেছেন, অ্যারিস্টট্ল। অনুকরণ করি আর না-ই করি, এই রকম প্রশংসার্থেই আমরা আজ বলে থাকি ' অমুকের মেধা বা বাগ্মিতা ঈর্ষণীয়', 'আপনার গান শুনে, আপনার গলাকে আমার হিংসে হয়'। অবশ্যই প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন. মোটামুটি সমকক্ষ তুলনীয় ব্যক্তির বিষয়েই এধরনের ভক্তিপূর্ণ বা ঘৃণাপূর্ণ ঈর্ষা সম্ভব। আমি আমার সহপাঠীর অঙ্কের মস্তিষ্ককে হিংসে করতে পারি—ভালো বা খারাপ অর্থে, রামানুজম্‌কে বা তাঁর গণিত প্রতিভাকে হিংসে করি না। যেহেতু তিনি আমার তুলনাবৃত্তের বাইরে সেহেতু তাঁর বিষয়ে আমার জিল্স বা ফ্থোনস্-এর প্রশ্নই ওঠে না।

অনুকরণাত্মক ঈর্ষাতে অধিক সৌভাগ্য বা গুণশালী ব্যক্তির তুলনামূলক উৎকর্ষ আমার ক্ষোভের কারণ হয় না—সম্ভ্রমের ও অনুসরণীয়তার হেতু হয়। বিদ্বিষ্ট ঈর্ষার উৎকট অবস্থায় যা আমার নেই তা ওর কেন থাকবে এই দুর্ভাব তীব্র হতে হতে ওর প্রতিষ্ঠা, প্রতিভা, গুণগত উৎকর্ষ নষ্ট হোক এই বাসনাও জাগ্রত হয়। ফলে বিদ্বিষ্ট ঈর্ষায় কাতর ব্যক্তি নিজেকে উন্নততর অপরের স্তরে ওঠানোর বদলে অপরকেই নিজের হীনতর স্তরে নামিয়ে আনতে চেষ্টা করতে চায়। লোকপ্রচলিত 'বাঙালি কাঁকড়া'র গল্পে

এই ধরনের ফ্থোনস্-এরই ছবি দেখি। পুরোনো ইওরোপীয় প্রবাদে ঈর্ষালু লোকের মনোভাব বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে—'ঈর্ষান্বিত লোক ভাবে প্রতিবেশীর পা ভাঙলে পরে আমার হাঁটার সুবিধা হবে।" তুলনার মাধ্যমেই মানুষ সুখদুঃখ, ভালোমন্দ, গুণদোষের তারতম্য বোঝে। একথা কান্টও স্বীকার করতেন। কেবল অন্যমানুষের সঙ্গে তুলনা না করে নিজেরই বিচারবুদ্ধির কাছে যে পূর্ণশ্রেষ্ঠতার আদর্শ প্রতিভাত হয়, নিজেকে সেই পূর্ণশ্রেষ্ঠতার সঙ্গে তুলনা করে করেই গড়ে তোলা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। তা নইলে একবার যে ছেলেটি সসম্ভ্রম ঈর্ষার বশে আরেকটি বেশি নম্বর পাওয়া ছেলেকে নকল করেও তার মতো স্বীকৃতি বা প্রতিষ্ঠা পেতে বিফল হয় সে জীবনব্যাপী বিক্ষোভে তার 'আদর্শ'কেই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ঘৃণা করত। একবার যে মেয়েটি অন্য আরেকটি মেয়েকে ঈর্ষা করে সফল হয়ে তার থেকেও অধিক স্বীকৃতি পেয়ে যশোমতী হয়—গর্বে অহংকারে সে আবার অন্যের ঈর্ষার ও বিদ্বেষের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতার এই অমিত্রসুলভ ভাবপরিণতির কথা ভেবেই কান্ট এমনকি সদর্থক ঈর্ষাকেও শিক্ষার মধ্যে স্থান দিতে চাননি। এ বিষয়ে তিনি অ্যারিস্টট্লের মতের বিরোধী। অনুকরণাত্মক ঈর্ষাকে অ্যারিস্টট্ল মহদ্গুণ মনে করেন। অথচ, এর পরের অনুচ্ছেদে আমরা দেখব যে গণতন্ত্রে নাগরিকদের আত্মমর্যাদার বোধ সম্ভবত উপার্জন, সুযোগসুবিধা এবং উপভোগের প্রতিযোগিতায় না হেরে যাওয়ার ওপরেই নির্ভর করে। রাসেল্ তো স্পষ্টই লিখেছেন "Envy is the basis of democracy" (*Conquest of Happiness*, পৃ. ৬৭)। এমনকি অর্থনৈতিক সাম্যের দাবির পেছনেও নাকি কাজ করে বিত্তবানদের ওপরে সর্বহারা বা স্বল্পবিত্তদের আক্রোশভরা ঈর্ষারই ইন্ধন। কান্ট গণতন্ত্রের যত বড়ো সমর্থকই হোন না কেন চারিত্র-শিক্ষার মধ্যে শুধু ঈর্ষা নয়, এমনকি অন্যের দুঃখে দুঃখী হওয়ার যে হৃদয়াবেগ দয়া বা করুণা নামে প্রসিদ্ধ, তাকেও খুব বেশি প্রাধান্য দিতে চাননি। আসলে তিনি মানুষের হৃদয়গত ভাবাবেগ বিষয়ে তাঁর পূর্বসূরি স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউমের রচনাগুলি অত্যন্ত যত্ন করে পড়েছিলেন। হিউম অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছিলেন যে আমাদের সুখদুঃখের অনুভূতি কোনো একটি বস্তু, বা ব্যক্তিকে তার নিজস্ব স্বরূপ বা মূল্য দিয়ে বিচার করতেই পারে না, কেবল অন্য বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে তর-তম—তারতম্য—বিচার করে তুলনা করেই বুঝতে পারে। জল গরম না ঠান্ডা বুঝতে গেলেও আমাদের উষ্ণতর বা শীতলতর অন্য এক পাত্রের জলের সঙ্গে আপেক্ষিক উত্তাপের ভিত্তিতেই বুঝতে হয়। আশ্চর্যের কথা হল এই আপেক্ষিক বিচারের প্রভাবে তীব্র দুঃখের অনুভবের পরপরই বা পাশাপাশি স্বল্প দুঃখ শুধু গায়ে লাগে না তা নয়—প্রায় সুখ বলেই প্রতীয়মান হয়। বিপরীতক্রমে, মাঝারি রকমের পরিতৃপ্তির বিষয়ও পাশাপাশি (সমকালে অন্যের অথবা ভিন্ন কালে নিজের) কোনো অধিকতর সুখের তুলনায়—শুধু ম্লান নয়—প্রায় নিরানন্দ দুঃখের সমতুল্য বলে অনুভূত হয়। এই তুলনাত্মক মূল্যায়নের সূত্রটি থেকেই হিউম সিদ্ধান্ত টানেন যে ঈর্ষা হল সমবেদনা তথা দয়ারই বিপরীত চেহারা ("Here then is a kind of pity

reversed") আমি চর্বচোষ্য অন্নব্যঞ্জন খেয়ে রেস্তরাঁ থেকে বেরোচ্ছি—তেমন কিছু বেশি হর্ষিত হয়ে নয়, মোটামুটি খুশি হয়ে। পথের ধারে তিনদিন অভুক্ত ভিক্ষুক পরিবারের বুভুক্ষার কষ্টের সহবেদন—যতই উপেক্ষার কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে আসুক—আমার ভেতরে যে দুঃখের তরঙ্গ তোলে—তার পাশে আমার অতি সাধারণ ভোজনসুখও অনেক বেশি—প্রায় অন্যায়রকমের অতিতৃপ্তির মতো বোধ হয়। এই অতিতৃপ্তিই (সুখজনক) করুণা হিসেবে ঝরে পড়তে চায়, দুঃখীর ওপরে। আমাদের মধ্যেকার এই সুখের ফারাক তার দুঃখকেও তুলনায় তীব্রতর করে দেখায়।

বিপরীত ক্রমে, আমার মোটামুটি সচ্ছল, দু-বেলা দু-মুঠো খেয়ে পরে বেঁচে থাকা সন্তুষ্ট জীবনের পাশে যদি হঠাৎ উৎসবমুখর উপকরণবহুল ঐশ্বর্য ও বিলাসের অট্টালিকা উঠে যায়, তাহলে কল্পনায় ও সহবেদনায় সেই সুখাতিশয্যের অনুভবের তুলনায় আমার শাকান্নভোজী স্বল্পে-সন্তুষ্ট জীবন হঠাৎ দুঃখীর জীবনের মতন ছোটো হয়ে দেখা দেয়। আমার আত্মমর্যাদা যদি আবার এই বাইরের সঙ্গে তুলনার ওপরেই পুরোপুরি নির্ভরশীল হয় তাহলে—বস্তুত আমি একটুও হীন বা দরিদ্র না হয়েও—কেবল প্রথমত এই তুলনামূলক লোকচক্ষুর কাছে, দ্বিতীয়ত নিজেরও এই আপেক্ষিক বিপরীত বেদনার বশবর্তী হয়ে, নিজেকে আমি হীনতর দীনতর ভেবে দুঃখিত হই। এই দুঃখের উৎপাদক ওই বেশি সুখী, বেশি বিত্তবান, বেশি নর্ম-ধর্ম-কর্ম-উপভোক্তা প্রতিবেশীর ওপর বিদ্বেষভরা ঈর্ষার আগুনে জ্বলি। এই অর্থেই তাহলে দয়া এবং ঈর্ষা একই রকমের সহ-বেদনাজনিত বিপরীত বেদনা, কেবল প্রথমটিতে আমি উচ্চতর দ্বিতীয়টিতে আমি নিম্নতর বোধ করি বলে প্রথমটিকে আমি সদ্‌গুণ বলে বরণ করে নিই দ্বিতীয়টির প্রকোপে হীনম্মন্যতায় ভুগি।

এ না হয় হল ঈর্ষার মনোবিজ্ঞান। কিন্তু হিংসের যে আরেক রূপ অসূয়া—দ্বিতীয়ের ওপর প্রেমাধিকারে বাধা দিচ্ছে এই সন্দেহে তৃতীয়ের ওপর (প্রথমের) বিদ্বেষ—তার পেছনে মানুষের কোন্ মনস্তত্ত্ব কাজ করে? এমনিতে আমি যদি কারুকে ভালোবাসি (অথবা কারুর বন্ধুত্ব প্রার্থী হই) তাহলে তার সুখেই তো আমার সুখ, তার বন্ধুর প্রতি তো আমার বন্ধুত্ববোধই আসবার কথা। অথচ পতিপত্নীর অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুযুগলের একজনের যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ওপর আকর্ষণ জন্মায় তাহলে—অনেকসময়েই (ভাগ্যক্রমে সব সময়ে নয়) প্রিয়জনের প্রিয়জন আমার অপ্রিয় কেন হয়ে ওঠে, আমাকে ছাড়া প্রিয়জন অন্যত্র যে সুখ পায় সেই সুখ কেন আমার দু-চোখের বিষ হয়ে ওঠে? বিবাহিত পুত্রের নবোঢ়া বধূর ওপর শাশুড়ির কেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দৃষ্টি জেগে ওঠে? দাম্পত্য প্রেম পুরোনো হয়ে এলে বধূ কেন সন্দেহ করে বর এখনও তার মায়ের আঁচলের আশ্রয়েই গভীরতর ভালোবাসা পাচ্ছে? এই অসূয়ার লক্ষণ-প্রমাণ সব থেকে গুছিয়ে লিখেছেন স্পিনোজা তাঁর কালজয়ী *Ethics* গ্রন্থে। জ্যামিতিক সুসংবদ্ধতা নিয়ে তিনি বর্ণনা করেছেন—"যদি কেউ কল্পনা করে যে তার নিজের প্রিয় কোনো বস্তু তার নিজের একার সঙ্গে যতটা নিকট ভালোবাসার ও স্বত্বাধিকারের বন্ধনে বদ্ধ ততটাই

অথবা তার থেকেও বেশি নিকটতর বন্ধুত্ববন্ধনে অন্য কারুর সঙ্গে জড়িত তাহলে সে নিজের সেই ভালোবাসার বস্তুটির প্রতি অনুভব করবে এক রকমের ঘৃণা আর ওই অন্য ব্যক্তিটির ওপর সে অনুভব করবে ঈর্ষা। প্রিয় বস্তুর প্রতি এই (প্রীতি সত্ত্বেও) বিদ্বেষ আর তারই সঙ্গে অনুভূত ঈর্ষা একসঙ্গে মিলেই তৈরি হয় অসূয়া। অতএব অসূয়া আর কিছু নয়—একজনের প্রতি প্রেম আর বিদ্বেষের মধ্যে চিত্তের একটা দোলায়মানতা থেকে সঞ্জাত এক ভাব যার সঙ্গে যুক্ত থাকে আরেকজনের প্রতি ঈর্ষা।" (*এথিক্‌স্*, তৃতীয় ভাগ XXXV-তম সূত্র)

এখানে আগেই বলে রাখা দরকার যে স্পিনোজা হিউমের আগেই একথা উপপাদ্যের মতো প্রমাণ করে গিয়েছিলেন যে :

> মানবপ্রকৃতির ঠিক যে বৈশিষ্ট্য থেকে এটা নিঃসৃত হয় যে মানুষ দয়ালু, সেই একই ধর্ম থেকে এটাও নিঃসৃত হয় যে সে ঈর্ষাপ্রবণ এবং উচ্চাশী। (ওই, সূত্র XXXII, Notes)

যদি কোনো জিনিস এমন হয় যে তা কেবল একজনের পক্ষেই উপভোগ করা সম্ভব—অর্থাৎ তার জোগান অত্যন্ত সীমিত অন্য সবার কাছ থেকে না কেড়ে নিয়ে একজনের পক্ষে ভোগ করা অসম্ভব—তাহলে যত ভাবব যে কোনো এক ব্যক্তি এই দুর্লভ বাঞ্ছনীয় পদার্থের স্বামিত্বসুখ উপভোগ করছে ততই সেই ব্যক্তির ওপর বিদ্বেষে, যেন সেই পদার্থ তার হাতছাড়া হয়ে যায় এই কামনা করব। আর এই কামনারই নাম হিংসে বা ঈর্ষা।

কিন্তু অসূয়ার মধ্যে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ঈর্ষা নয়, প্রিয়জনের ওপর মালিকানাবোধ, অহংকৃত একক ভালোবাসার যোগ্যতার অভিমান, এবং সেই প্রিয়জনেরই ওপর ঘৃণার বিচিত্র মিশ্রণ থাকে। অসূয়ার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্পিনোজা মানুষের প্রণয়-অহংকারের এক দুর্বলতম ও কুৎসিততম দিক তুলে ধরেছেন। ইংরেজিতে 'Jealous' শব্দটি নিয়ে একটি গভীর প্রয়োগগত অস্পষ্টতা আর অসুবিধে আছে। 'ওথেলো অসূয়াতে ভুগছে' একথা তো বলতেই পারি। এমনকি 'ওথেলো ডেস্‌ডিমোনাকে অসূয়ার সঙ্গে ভালোবাসে' (Othello loves Desdemona jealously) তাও বলতে পারি। কিন্তু ওথেলোর অসূয়ার লক্ষ্য কে—ডেস্‌ডিমোনা না ক্যাসিও—তা আমরা বলতে পারি না। যদি Jealousy এক রকমের Envy হয় তাহলে "Othello is jealous of Cassio" বলাই সংগত—কারণ ডেস্‌ডিমোনাকে তো সে গভীরভাবে ভালোবাসে তাহলে তাকে সে হিংসে বা ঈর্ষা করবে কী করে? অথচ অসূয়ার স্বভাবই হচ্ছে যে তার প্রধান ও সাক্ষাৎ আক্রমণটা হয় প্রিয়জনেরই ওপর। অন্তত ওথেলো তো ক্যাসিওকে ঘৃণা বা সন্দেহ করার থেকেও বেশি ডেস্‌ডিমোনাকেই ঘৃণা ও সন্দেহের বিষয়বস্তু করে তুলেছে। তার মন্ত্রণাদাতা ইয়াগো তো ঈর্ষাবশত ডেস্‌ডিমোনার বিরুদ্ধে ওথেলোর হৃদয়কে বিষিয়ে দেবারই চেষ্টা করে সফল হয়েছে। তাহলে "Othello is jealous of Desdemona" বলতে এরকম বাধো বাধো ঠেকছে কেন? স্পিনোজা এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন অসূয়ার দ্বিমুখী

স্বভাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ডেস্‌ডিমোনার প্রতি প্রেম যত গাঢ়তর, অতীতে তার সঙ্গে রতি সাহচর্যের সুখস্মৃতি যত মধুর—অসূয়ার আক্রমণ কালে ডেস্‌ডিমোনারই প্রতি ওথেলোর ঘৃণা ও তিক্ততা ততটাই প্রবল। এর পেছনে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে ডেস্‌ডিমোনা ক্যাসিওকে বেশি ভালোবাসে বা বেশি আকর্ষণীয় বা রূপগুণবান বলে মনে করে। আছে শুধু পুরুষের আহত অহংকার। যে ক্যাসিওকে সে ইদানীং প্রতিদ্বন্দ্বী ঠাউরে এত নীচ ও জঘন্য মনে করে সেই ক্যাসিওরই সপ্রেম নৈকট্যের দ্বারা উপভুক্তা ডেসডিমোনা এখন তার কাছে ঘৃণিত ব্যক্তির ভুক্তাবশিষ্ট, চর্বিত, এমনকি ত্যক্ত পুরীষের মতোই ঘৃণিত—স্পিনোজা (এই দৃষ্টান্ত নিয়ে নয়) এমন কথা পর্যন্ত লিখেছেন। পূর্বোল্লিখিত অসূয়া বিষয়ক পঁয়ত্রিশতম সূত্রের টিপ্পনিতে তিনি লিখছেন—"The condition generally comes into play in the case of love for a woman : for he who thinks that a woman whom he loves prostitutes herself to another, will feel pain, not only because his own desire is restrained, but also because, being compelled to associate the image of her he loves with the parts of shame and the excreta of another, he therefore shrinks from her."

শেষ পর্যন্ত সহানুভূতি, বিপরীত অনুভূতি, প্রতিযোগিতা ও তুলনায় ছোটো দেখানোর ভয়—এসব ছাপিয়ে অসূয়ার অন্তঃস্থলে সব থেকে প্রধান হয়ে দাঁড়ায় প্রিয়জনের ওপর একটা স্পর্শকাতর-অহংকারপূর্ণ একিয়ার বোধ। তুমি আমারই সুরঞ্জনা—বোলো না কো কথা ওই যুবকের সাথে। অথচ সুরঞ্জনার আকর্ষণীয়তা এ জন্যই যে সে আকাশের মেঘের মতো মুক্ত, স্বতন্ত্র, স্বৈরচারিণী। সেই আকাশলীনার হৃদয়কে মাটি করে "ওই যুবকের" প্রেম ঘাস হয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে--ওথেলোর মতো অগ্নিময় জিঘাংসু সন্দেহে না হলেও—জীবনানন্দের অসূয়াকাতর প্রেমিকও ওই অন্য যুবকটিকে অবজ্ঞা করতে করতে ঈর্ষা করছে। সাধুভাষার ভদ্র "কি কথা তাহার সাথে" তাই দ্রুত নেমে এসেছে অবজ্ঞাসূচক "তার সাথে?" এই তিক্ত বিস্ময়ে 'কী করে পারলে? শেষ পর্যন্ত তার সাথে"? আবার ফিরে আসছে তুলনা—অধৈর্য, বিরক্ত, তাচ্ছিল্যপূর্ণ অ-"শুদ্ধ" ভাষায় একদিকে যেন "তার" ওপর অসূয়া বেরিয়ে পড়ছে। অন্য দিকে, অতীতে যে সুরঞ্জনা আকাশ ছিল আজ তার হৃদয় ঘাস হয়ে গেছে—"মৃত্তিকার মত তুমি আজ"—জমির মতো নীচে নেমে এসেছ, আমার আর যুবকের মধ্যে এই মাটির স্বত্ব নিয়ে রেষারেষি। আহত অভিমানী পুরুষ প্রেমিক তাই হয়তো অন্যতর আকাশের সন্ধানে যাবে, সুরঞ্জনা না ফিরে এলে। রোমান্টিক হুমকি তাই কি বলছে "আকাশের ওপারে আকাশ"? অপরের প্রেমের ঘাসে আচ্ছন্ন সুরঞ্জনাকে "ফিরে এসো হৃদয়ে আমার" বলে শেষ আর্ত ডাক দিতে দিতেও স্পিনোজার ভাষায় "a wavering of the disposition' অধিকারবোধে কাছে ডাকা আর সন্দেহে দূরে সরিয়ে দেওয়া। হারানোর ভয়ে আর শঙ্কিত ব্যভিচারের প্রতি ধিক্কারে বিদীর্ণ হওয়া এই ঈর্ষাপূর্ণ অতিপ্রীতির আত্মদহনেরই নাম অসূয়া।

স্পিনোজা এবং পরবর্তীকালে ফরাসি সাহিত্যিক প্রুস্ত এবং দার্শনিক সার্ত্র পুরুষের

মধ্যেই নারীর ওপর স্বত্বাধিকারবোধ থেকে জন্মানো এধরনের অসূয়াপ্রবণতার আলোচনা করেছেন। কিন্তু জীবনে ও সাহিত্যে নারীর মধ্যেও এই অসূয়ার জ্বলন সমানভাবেই দেখা যায়। এর পরের অনুচ্ছেদে জগদীশ গুপ্তের সাহসী ছোটো গল্প 'শঙ্কিতা অভয়া''-কে অবলম্বন করে সেই রমণীসুলভ বিচিত্র অসূয়ার গহনে প্রবেশ করার চেষ্টা করছি।

৪. "শঙ্কিতা অভয়া" : অসূয়ার সংশয়নিশ্চয়মধ্যবর্তী দ্বান্দ্বিকতা

সতেরো বছরের মেয়ে শান্তিকে নিয়ে অ-সার্থকনাম্নী অভয়ার ভয়ের ও অশান্তির অন্ত নেই। গল্পের শুরুতে আমরা বিশ্বাস করি যে অভয়া অতুলের পত্নী। শান্তি তাদের একমাত্র আদরের কন্যাসন্তান। সপ্তদশী, সাহিত্য-সঙ্গীতপ্রিয়া, নৃত্যপটীয়সী শান্তি তার অভিজাতরুচিবান, সুশিক্ষিত এবং এসরাজ বাজনায় পারদর্শী পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক স্বাস্থ্যবান পিতার সঙ্গেই বেশি গল্প, আড্ডা, বেড়ানো ইত্যাদি করে থাকে। সারা গল্প জুড়ে গল্পের ভিতর ও নানান প্রকার প্রেম ও যৌনসম্পর্কের গল্পের আলোচনা চলে বাপ ও মেয়ের মধ্যে। উদ্ভিন্ন যৌবনা শান্তির প্রায় সারাক্ষণের চিন্তা, প্রেম ও যৌবন ও যৌন আকর্ষণের গতিপ্রকৃতি বিষয়েই। দেশি-বিদেশি উপন্যাস, নাটক-সিনেমার আখ্যানের মধ্যে দিয়ে বিরংসার কুটিল কল্পনাজাল শান্তির বয়ঃসন্ধির শরীরে ঢেউ তোলে, বাবার বাজনার সঙ্গে সেজেগুজে নাচতে গিয়ে শান্তির ঘন ঘন শ্বাস ফেলা, ঘর্মাক্ত মুখের রক্তাভা, "সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী"—তার রোমাঞ্চিত আত্মরূপমুগ্ধতা "শান্তি তখন নিজেকেই অধ্যয়ন করিয়া মুখভরে মৃদু মৃদু হাসিতেছে—জিজ্ঞাসা করিল 'কেমন নাচলাম বাবা?' "—এই সমস্তই পাশ থেকে দাঁড়িয়ে অভয়া দেখে দেখে প্রথমে শঙ্কাকুল, ক্রমে আতঙ্কিত, শেষে স্বামী অতুলের প্রতি ঘৃণায় ও অসূয়ায় অস্থির হয়ে পড়ে।

এদের জীবনে বৃহত্তর পরিবারে বা সমাজে মেলামেশার একটা অভাব শান্তির চোখ এড়ায় না। সে বোঝে কোথাও একটা কোনো গুপ্ত কথা আছে যা মা বাবা তার কাছে প্রকাশ করেননি। অতুলকে অভয়া মেয়ের আড়ালে সাক্ষাৎ অভিযোগ করে যে সে "মেয়েটাকে নষ্ট করে দিতে চায়"। এ শুধু প্রশ্রয় দিয়ে তার চরিত্রে শৈথিল্য বা বহির্মুখীনতা এনে দেওয়ার দোষারোপ নয়—আরও স্পষ্ট করে পিতাকন্যার অবৈধ সম্পর্কেরই ইঙ্গিত। অতুল যেরকম শান্ত ও দৃঢ়ভাবে এইসব ক্রমবর্ধমান অশ্লীল অভিযোগকে উপেক্ষা করে তাতে পাঠককে বুঝতে হয় যে অভয়ার এই শঙ্কার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। গল্পের শেষে অভয়া শান্তিকে সোজাসুজি প্রশ্ন করে অতুল বিষয়ে "ও তোকে নষ্ট করেনি তো?" বজ্রাহত শান্তি মাকে বলে "মা, একেবারে উন্মাদ হয়েছো। নইলে এমন অশ্রাব্য কথা তোমার মুখে বেরলো কী করে?" অভয়া গোপন তথ্য প্রকাশ করে জানায় যে অতুলকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিকে গর্ভে ধারণ করে সে কুলত্যাগ করেছিল কিন্তু অতুল শান্তির "বাবা নয়, কেউ নয়।" তারপরই মা ও কন্যার নিঃশব্দতার বর্ণনা দিয়ে কাহিনির সমাপ্তি।

এখানে অভয়ার বিষাক্ত আশঙ্কা তার দু-রকম অসূয়ার কারণ হয়েছে—অথবা দুটি হিংসে থেকে তার দ্বিগুণ আশঙ্কার উৎপত্তি হয়েছে—এক সর্বনাশা সন্দেহ-রোগের

মতো। বিবাহিত পতি না হলেও অতুল যখন এম.এ. পড়তে পড়তে বিত্তবান পিতৃগৃহ ছেড়ে হঠাৎ অভয়ার হাত ধরে বেরিয়ে এসেছে—এবং দীর্ঘদিন যাবৎ নিজের সন্তানের মতো সমস্ত স্নেহ দিয়ে অভয়ার (পিতৃপরিচয়হীন) কন্যাকে মানুষ করেছে তখন অভয়া ও অতুলের মধ্যে গভীর প্রণয় ছিল তা ধরেই নেওয়া যায়। কিন্তু যত যত নিজেরই মতন সুন্দরী মেয়ে শান্তি বড়ো হয়েছে তত তত অতুলের প্রেম বা আকর্ষণ বা মনোযোগ অভয়ার কাছ থেকে সরে শান্তির দিকে গেছে এই অনুযোগে আশঙ্কায় অভয়ার প্রথম অসূয়ার পাত্রী তার নিজের কন্যা যে অতুলের প্রীতিবন্ধনের মাঝখানে অভয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী। অন্যদিকে অভয়ার একার অধিকারবোধ যে শান্তির ওপর, যে শান্তি তার হিংসুটে স্নেহের ধন—সেই শান্তিই অভয়ার থেকেও পালকপিতা অতুলের ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর লেখাপড়া, নাচগান, গল্পআড্ডার বন্ধু অভয়া নয় অতুলই। সেখানে মা ও মেয়ের নাড়ির সম্পর্কের মাঝখানে অতুল এক প্রতিদ্বন্দ্বী কাঁটার মতো। তাহলে অভয়ার দু-রকম অসূয়াতে অতুল একবার প্রেমাস্পদ দ্বিতীয় ব্যক্তি, একবার ঘৃণাস্পদ প্রতিদ্বন্দ্বী তৃতীয় ব্যক্তি। পক্ষান্তরে শান্তি একবার অভয়া ও অতুলের প্রেমপথে বাধা তৃতীয় ব্যক্তি, আবার শান্তিই সেই স্নেহাস্পদ দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে উপলক্ষ করে অতুলের সঙ্গে অভয়ার শত্রুতা। এই জটিল অসূয়ার কাহিনিকে যদি আমরা ওথেলোর দ্বিমুখী অসূয়ার সঙ্গে তুলনা করি তাহলে বেশ কয়েকটি পার্থক্য চোখে পড়ে। নিতান্ত ফ্রয়েডীয় অবদমিত সমকামিতার প্রসঙ্গ না আন্‌লে ওথেলো আসলে ক্যাসিওকেই চায় সেজন্যই তার কথাতে প্রিয় পত্নীর চরিত্রে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সন্দেহস্থাপন করেছে, এ জাতীয় কথা ভাবা যায় না। কাজেই ওথেলোর প্রেমের দাবি কেবল ডেস্‌ডিমোনার ওপরেই—কিন্তু অভয়ার প্রেমের দাবি শান্তি ও অতুল উভয়েরই ওপরে। কাজেই যখন শান্তি ও তার 'বাবা' অতুল অনেক রাত করে সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরে অথবা একসঙ্গে লাস্যে নৃত্যে গীতে মগ্ন হয় তখন অভয়া দুজনের কাছেই প্রেমে প্রত্যাখ্যাতা অথবা প্রেমের একনিষ্ঠতায় ব্যাহতা হয়। ফলে দুজনের ওপরেই তার ঈর্ষা এবং অসূয়া হতে থাকে। নিজেকে সে দু-বার রিক্ত বোধ করে। যদি ওথেলোর সন্দেহ সত্যও হত ক্যাসিও আর ডেস্‌ডিমোনার মধ্যে কোনো Incest-এর মতো জঘন্য নিষিদ্ধ সম্পর্কের কোনো দোষারোপ অকল্পনীয় ছিল। অভয়া শান্তিকে অতুলের কাছ থেকে সরিয়ে আনবার জন্য পিতৃতুল্য পুরুষের যৌন আকর্ষণকে Incest না হলেও Abuse বা যৌন অত্যাচারের মতন করে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছে। এজাতীয় বিকৃত চিন্তা ওথেলোর যেমন নেই—তেমন জগদীশ গুপ্তের গল্পে কোনো হত্যা বা আত্মহত্যা নেই যা কিনা ওথেলোর অসূয়াকে সব রকমের অর্থে ট্র্যাজিক করে তুলেছে। তবে দুজায়গাতেই প্রেম বা স্নেহের উৎকট অধিকারবোধ থেকেই অশুভ আশঙ্কা ও প্রতিযোগিতার সূত্রপাত। এবং দু-জায়গাতেই অসূয়ার পরিণতি প্রেম অথবা প্রেমিকের আত্মহত্যায়।

৫. ঈর্ষা ও ন্যায্য ক্ষোভ, অসূয়া ও আত্মসম্মান

নিজের সঙ্গে অন্যের তুলনা না করে আমরা পারি না। আমাদের আত্মসচেতনতা আসলে

পরনির্ভর। অন্য কেউ আমাকে কি চোখে দেখছে, অন্যের তুলনায় আমি নীচু না উঁচু দেখাচ্ছি এজাতীয় কল্পনা ও ধারণার দ্বারাই আমার অহংকার তৈরি—একথা বুঝবার জন্য হেগেল বা সার্ত্র পড়বার দরকার হয় না এমনকি *কঠোপনিষদ*-এ (প্রথম বল্লী, শ্লোক ৫) নচিকেতার বাবা যখন "তোমায় দেব যমকে" বলে ধমক লাগালেন তখন আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার জন্য নচিকেতা বলে উঠেছিলেন, "অনেকের মধ্যে আমি প্রথম, অনেকের মধ্যে আমি মধ্যম।" এ-হেন পরদৃষ্টিকাতর প্রাণীদের পক্ষে ঈর্ষা না করে বাঁচা সম্ভব নয়। অ্যারিস্টট্‌ল তাই ঈর্ষা বর্জন করবার উপদেশ না দিয়ে দু-রকম অতিশয়—খুব বেশি হিংসে আর খুব কম হিংসে—বর্জন করে মাঝামাঝি ঠিক জায়গায় যথাযোগ্য পরিমিত হিংসে করাটাকে একধরনের সদ্‌গুণ বলেই বর্ণনা করেছেন। গীতা-য় যেমন বলা আছে যে অতিরিক্ত খাওয়াটা দোষ, একেবারে অনশন করাটাও দোষ, খুব বেশি ঘুমোলেও যোগ হয় না, একদম সর্বদা জেগে থাকলেও যোগ হয় না—যথাযোগ্য ঠিকঠাক খাওয়া ঘুমোনো ইত্যাদি প্রাকৃতিক ধর্মগুলি বাড়াবাড়ি বর্জন করে পালন করতে পারলেই "যোগো ভবতি দুঃখহা"। তেমনি অ্যারিস্টট্‌ল (প্লেটোরই মতকে অনুসরণ করে) কাপুরুষতা, অতিভয় আর থেকে থেকে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া এই অতিসাহস-এর মাঝখানে সোনালি সুমধ্যম হিসেবে প্রশংসা করেছেন বীরত্বের। কৃপণতা ও অপচয়শীল অতিদানের মাঝখানে বসিয়েছেন যথাযোগ্য দানশীলতার সদ্ধর্মটিতে। হীনম্মন্যতা আর অতিদম্ভ—এর মধ্যখানে খুঁজে পেয়েছেন সত্যনিষ্ঠ আত্মমর্যাদাবোধকে। কলহপ্রিয় শত্রুতা আর সর্বতোষণকারী স্তাবকতার মাঝামাঝি স্থান দিয়েছেন সদ্ভাব মৈত্রী বা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণকে। নিজের থেকে অন্যের সম্পদ, সম্মান, সৌন্দর্য, সৌভাগ্য, পাণ্ডিত্য, পদমর্যাদা, বেশি (তুলনীয় কিন্তু অধিক) হলে পরে তাতে একেবারেই যদি কিছু না এসে যায় অথবা দুঃখের বদলে একরকমের তৃপ্তিই হয় কারুর, তাহলে সেটা একরকমের ঘাটতি। (অপরের উৎকর্ষ দেখে যে অসন্তোষ হয় তার নীচের দিককার অতিশয় বাড়াবাড়ি ভাবটা কী এ বিষয়ে অ্যারিস্টটলের এথিক্‌স্ ও রেটরিক্ এ দু-জায়গায় দু-রকম কথা পাওয়া যায়।) অন্যের আছে আমার নেই এরকম বাঞ্ছনীয় গুণের কথা ভেবে যদি কারো দুঃখের বদলে সুখ হয় তাহলে বুঝতে হবে যে সে সেই ভালো জিনিসটার মূল্যই বোঝে না অথবা নিজের অধম, বঞ্চিত, হীন অবস্থাতে এক রকমের পরিতৃপ্তি বোধ করে। এই ত্রুটি বা ঘাটতিকে নাকি অ্যারিস্টট্‌ল শাডেন ফ্রয়েডে (Schaden freude) বলে সাব্যস্ত করেছেন—অথচ এমনিতে শাডেন ফ্রয়েডে হল অন্য কারুর দুরবস্থায় বা দুর্ভাগ্যে খুশি হয়ে 'বেশ হয়েছে। কেমন জব্দ' এই চাপা উল্লাস বোধ করা। এমন হতে পারে যে যারা নিজেকে অন্যের তুলনায় নীচু বা দুঃখী দেখে খুশি হয় তারা নিজেকেই কষ্ট পেতে দেখে (যেন অন্য কেউ কষ্ট পাচ্ছে তেমন) 'বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম তেমনি ফল' বলে অন্যায় পরিতৃপ্তি বোধ করে এটাই তাঁর অভিপ্রায় ছিল।) পক্ষান্তরে আমার থেকে অন্য যে কেউ শ্রেষ্ঠতর হিসেবে স্বীকৃতি পেলে, আনন্দে থাকলে, অধিকতর স্বাস্থ্য, বিত্ত, বিদ্যা, যশের অধিকারী হলেই যদি আমি বিক্ষোভে ফেটে পড়ি এবং বিদ্বেষপূর্ণ ঈর্ষায় জ্বলে উঠি সেটা

একটা নিন্দনীয় বাড়াবাড়ি যাকে বলে মাৎসর্য। এর মাঝখানে, হিরণ্ময় মধ্য-ধর্ম হিসেবে অ্যারিস্টট্‌ল বসিয়েছেন 'ন্যায্য ঈর্ষা' অথবা 'উচিত ক্ষোভ' (Indignaton) নামক এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে। অযোগ্য অনধিকারী আমার থেকে অধম ব্যক্তি যখন অনর্হিত সুখসম্পদসুনামসৌভাগ্য পেয়ে যায় সেই অনর্হিত প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট রুষ্ট এবং বিক্ষুব্ধ হওয়াটা ভালো। যা অনুচিত বা গর্হিত তাকে সহ্য করা বা নিন্দা না করাটাই দূষণীয়। তাই এই ধরনের ন্যায়সঙ্গত পরশ্রীকাতরতাকে অ্যারিস্টট্‌ল উচিত ক্ষোভের স্থানে বসিয়েছেন।

দুর্যোধনের কাছে "ঈর্ষা বৃহত্তের ধর্ম' তার কারণ হয়তো এই যে তিনিও ঈর্ষা বলতে এইধরনের Righteous indignation-কে বোঝেন। দুর্যোধনকে ছোটোবেলা থেকে পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে তুলনা করে খাটো করা হয়েছে। দ্রোণ থেকে আরম্ভ করে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী, ভীষ্ম সব প্রবীণরা স্নেহের বদলে তাঁকে দিয়েছেন তুলনামূলক টিটকিরি। দেখো তো যুধিষ্ঠির কেমন ধার্মিক, সহিষ্ণু, স্থিতধী, নির্লোভ—তুমি এত পাপাসক্ত, অসহিষ্ণু, চঞ্চল, লোভী হলে কেন? অর্জুন যেরকম তীরন্দাজ, যেরকম রূপবান ও বীর্যবান সেরকম হতে পারলে না বলেই তো তোমার 'সুযোধন' নাম কেউ মনে রাখল না। এমনকি যার সঙ্গে একসাথে গদাযুদ্ধ শিখেছিলে সেই ক্রোধী ঔদরিক ভীমের সঙ্গেও তুলনা করে দুর্যোধনকে অধমতর বলা হয়েছিল হয়তো। তাই সব রকম তুলনাই তাঁর কাছে অন্যায় মনে হত। পাণ্ডব গৌরবে তিনি শুধু ঈর্ষান্বিত হননি, পাণ্ডবদের বনবাসে, অপমানে, দুর্বিপাকে তিনি নির্লজ্জ, "শাডেন ফ্রয়েডে" উপভোগ করেছেন। যে পাণ্ডবরা এবং দ্রৌপদী তাঁকে "অন্ধবাপের অন্ধ ছেলে" বলে চরম অপমান করেছে তাদের ওপর ঈর্ষা না করাটার দুর্বলতা ও নিন্দা হত। পাণ্ডবদের প্রতি এই ন্যায্য ন্যক্কারবোধই দুর্যোধনকে দিয়েছে সেই জিগীষা, সেই ক্ষাত্রতেজ যার দ্বারা তিনি—সুখী হন আর না হন—শেষ পর্যন্ত জয়ী হবার চেষ্টা করেছেন। স্বর্গারোহণ পর্বেও তো তিনি সর্বাগ্রে স্বর্গলাভ করেছেন, অতএব তাঁর ঈর্ষা 'সুমহতী' হতেই পারে। ২০০২ সালে আইস্‌ল্যান্ডের একজন দার্শনিক যাঁর নাম ক্রিস্টিয়ান ক্রিস্টিয়ান্‌সন্‌—তিনি অহংকার ও অসূয়ার সমর্থনে *Justifying Emotions : Pride and Jealousy* (Routledge, London 2002) নামে একটি বই লেখেন। অধিকাংশ আধুনিক ও প্রাচীন পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে, খানিকটা অ্যারিস্টট্‌ল অথবা দুর্যোধনের এই মত অনুসরণ করে, তিনি ঈর্ষা এবং অসূয়ার একটা নৈতিকভাবে সমর্থনীয়, ঔচিত্যপূর্ণ, ভালো দিক দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

প্রথমত : তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে অসূয়া এক রকমের ঈর্ষাই। অর্থাৎ মূলত অসূয়া, ঈর্ষা, দুই স্থলেই আমরা যা ন্যায্য প্রাপ্য তা আমার হাত ছাড়া হয়ে অন্য আরেকজনের কাছে থাকছে বা চলে যাচ্ছে এতে আমার ন্যায্যকারণেই গাত্রদাহ হচ্ছে। তাঁর নিজের উদাহরণটি প্রেমঘটিত নয় বা নিছক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকও নয়। বোধ হয় ওল্ড টেস্টামেন্টের আদিমানব আদমের দুইপুত্র কেইন্‌ এবং অ্যাবেল্‌কে মাথায় রেখেই

তিনি কল্পনা করেছেন যে কোনো দেশে যখন সোনার খনি আবিষ্কারের হিড়িক চলছে সে-সময়ে এক ভূস্বামী, ধরা যাক তার নাম গ, আপাতত সমান সমান দুই ভাগে তার ধাতুসমৃদ্ধ খনি-জমি ভাগ করে দুই পুত্র ক আর খ-কে লেখাপড়া করে দিল। ক এর ধারণা এবং এই ধারণার স্বপক্ষে ক-এর কাছে অনেক প্রমাণ, যুক্তি, সাবুদ আছে—যে পিতা গ জানতেন যে খ-এর ভাগের জমিতে সোনা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং ক-এর নিজের অংশের জমিতে কেবল বালি ও পাথর ছাড়া কিছু নেই। যেহেতু ক এবং খ দুজনেই সমানভাবে গ-এর সন্তান, সমান পরিশ্রমী, বরং খ একটু প্রশ্রয়প্রাপ্ত এবং ধূর্ত সেহেতু অযোগ্যতর—সেহেতু বিষমবন্টন দেখে শুধু খ-কে হিংসে করা নয়, পিতা গ-এর পক্ষপাতিত্বের ন্যায্যসন্দেহে ক অসূয়াতে পীড়িত হয়। ক্রিস্টিয়ান্‌সনের মতে এক্ষেত্রে অসূয়া না হওয়াটাই হবে নিজের ন্যায্য অধিকার বিষয়ে অসচেতনতা, আত্মমর্যাদার অভাব, পিতৃস্নেহের ওপর সমান দাবি জানাবার সৎসাহসের অভাব। অবশ্যই আগবাড়িয়ে গিয়ে অতিসৌভাগ্যে প্রশ্রয়পুষ্ট ঈর্ষণীয় ভাই খ-কে খুন করে আসাটা বাড়াবাড়ি অযৌক্তিক ঈর্ষার উদাহরণ হবে। কিন্তু কোনোরকম প্রতিবাদহীনভাবে গ-এর এই অন্যায় পক্ষপাতিত্ব বা ক-কে বঞ্চনা করাকে মেনে নেওয়াটা ক্রিস্টিয়ান্‌সনের মতে ক-এর আত্মমর্যাদা (Self-esteem)-র পক্ষে ক্ষতিকর হবে। অসূয়া এক্ষেত্রে মোটেই একটা অন্ধ অনুচিত যুক্তিহীন ভাবাবেগ বা পাশবিক লোভ বা নীচমনা পরশ্রীকাতরতা নয়। অসূয়া হল ন্যায্য প্রাপ্য সম্মানের অপ্রাপ্তিতে যথাযোগ্য অপমানবোধ ও স্বার্থক্ষতি বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান এবং পরিমিত—কম নয়, বেশি নয়—যথোচিত অসন্তোষ।

যদিও শেষ পর্যন্ত আমরা ক্রিস্টিয়ান্‌সনের এই মত মেনে নিতে পারি না, কিন্তু প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি, রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে এমনকি বেদেও এই রকমের ন্যায্য আক্রোশকে 'মনুষ্য' নাম দিয়ে প্রশংসা করা হয়েছে। ধনসম্পদের 'ধনত্ব' এইখানেই যে সব মানুষের সমানভাবে তার বিষয়ে কামনা, প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। ধন তাই যা সকলেরই সাধারণ লোভের বস্তু। *বৃহদারণ্যক* উপনিষদ ভাষ্যে শংকরাচার্য বলেছেন যে অন্নের প্রথম গ্রাসটি মুখে তোলার সময়ে আমাদের মনে রাখা উচিত যে ক্ষুধিত অন্য মানুষ থেকে পিপীলিকা পর্যন্ত অন্য সমস্ত জীবের এই খাবারটুকুর ওপরে দাবি বা লিপ্সার নজর ছিল। শান্তিপর্বে *মহাভারত*-এ (অধ্যায় ১৩০, শ্লোক ৪৬) পাই—

"যদিদং দৃশ্যতে বিত্তং পৃথিব্যামিহ কিঞ্চন।
মমেদং স্যাৎ মমেদং স্যাৎ ইত্যেবং কাংক্ষতে জনঃ।।"

পৃথিবীতে যেখানে যত বিত্ত ভোগ করবার মতো সম্পদ আছে তাদের প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রতিটি লোক 'এটা আমার হোক' 'এটা আমার হোক' এই আকাঙ্ক্ষা করে থাকে। শুধু তাই নয়—মানুষকে যে স্বত্বত্যাগ ও দানের মাধ্যমে বাঁচতে উপদেশ করা হয়েছে তার কারণই হল মানুষ নৈসর্গিকভাবে ত্যাগের ঠিক উলটো—স্বত্ব জারি করা 'আরও

আরও আরও ধন আমার হোক' এই অজস্র বিত্তৈষণার মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকে। ত্যাগ করা বা অলোভী হওয়া তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তার অহংতা (selfhood) নির্ভর করে তার মমতার (আমার-ত্ব ছাড়া আমি-ত্ব হয় না) ওপরে। তাই মহাভারত ওই একই অধ্যায়ে বলেছেন—"যথা নাস্তি অধনস্তথা যার ধন নেই সে নিজেই যেন নেই বলে মনে হয়। 'আমার বলে কিছু ধন জন গৃহ বস্ত্রকে না নির্দিষ্ট করতে পারলে আমি নিজে আছি বলে টের পাই না—কারণ কেউ আমাকে মানুষ বলে গণ্য করে না।' ('আমি সর্বহারা, তাই আমি আছি' একথা দেকার্তে বলতে হয়তো লজ্জা পেতেন।) এখন নীতিশাস্ত্রের বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে অনেকেই ঈর্ষা অসূয়ার নিন্দে করে বলেন—"মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্" লোভ কোরো না অন্য কারুর উন্নতিতে, তোমার নেই ওর আছে এতে এত রাগ কেন? তোমার নোংরা অসূয়ার পেছনে আছে অন্য এক পুরুষ বা মহিলাকে তোমার নিজের একার সম্পত্তি বানিয়ে রাখার হীন প্রবৃত্তি ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু একথা কে অস্বীকার করতে পারবে যে নিজের যদি মানুষ হিসেবে, পুত্র হিসেবে, স্বামী হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, সমাজ-শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত সমাজ-পরিশ্রমী কর্মী অথবা ছাত্রী হিসেবে কোনো সম্পদ, কোনো ভোগ, কোনো সম্মান, কোনো স্বীকৃতি, কোনো প্রেমমর্যাদা, কোনো শ্রেষ্ঠতার যশ বা পুরস্কার প্রাপ্য হয়ে থাকে—আর সেটা নিজে না পেয়ে যদি দেখি অন্য সমান বা অল্প যোগ্যতার লোক সেটা পাচ্ছে তাহলে আমি ভেতর থেকে বিক্ষুব্ধ, দুঃখিত, এবং অন্যায়বোধে উদ্‌বিগ্ন হবই। যদি না হই তাহলে "অন্যায় যে সহে"—সেই দলে পড়ে আমি ভর্ৎসনীয় হব। চারিপাশের বর্ধিষ্ণু প্রতিবেশী সহকর্মী সমকক্ষদের তুলনায় আমার হ্রাসমান আমি-বোধকে পূর্ণ করবার জন্য এই ঈর্ষা ও অসূয়াই আমাকে প্রণোদিত করবে। (Kristjanson, 2002, p-140-163) । যদি-বা বলা হয়, আমার সরলরেখার পাশে আরেকটি দীর্ঘতর রেখা কেউ আঁকলে তো বস্তুত আমার রেখাটি হ্রস্বতর হয়ে যায় না। হ্রস্বতর দেখায় মাত্র। সে অর্থে তো আমার পুত্রের পুত্র হলে আমার কোনোও পরিবর্তনই হয় না তবু আমরা তো দাদু হতে চাই! নীচ্চে যেরকম 'Homer's Contest' লেখাতে লিখেছেন যে মানুষের সব প্রতিভার বিকাশ হয় সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সেরকমই ক্রিস্টিয়ান্‌সন্, আত্মসম্মান উদ্ধারের লড়াইতে অতিস্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজতন্ত্রবিরোধী, সমাজ-দার্শনিক রবার্ট নোজিকের মত উল্লেখ করে বলেছেন যে "self-esteem is competitively based...it is on these grounds that the possible rationality of jealousy can be explained A's Jealousy may well be based on true or warranted beliefs about C's undeservingly favouring B and disfavouring A, together with normal concern for A's own self-worth as compared to others." (ওই, পৃ. ১৬১) আমার আত্মমূল্যায়ন যুক্তিসংগতভাবেই ঈর্ষাভিত্তিক।

৬. ঈর্ষার আত্মজিঘাংসা, অসূয়ার অন্তর্বিরোধ, মাৎসর্যের মারক গরল

হিংসে এভাবে ন্যায় অন্যায়ের দোহাই দিয়ে নিজেকে যতই যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করুক

না কেন, গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের দার্শনিক তর্কের তির ছোঁড়াছুঁড়ি যতই প্রতিযোগিতার প্রেরণায় প্রতিভাকে শাণিততর করুক না কেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার অগ্রগতির পশ্চাতে যতই ঔপনিবেশিক অসূয়ার পারমাণবিক জ্বালানি থাকুক না কেন—হিংসে একটা মহৎ গুণ একথা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

আমাদেরই তেল শোষণ করে, আমাদেরই দেশে নিজেদের উদ্‌বাস্তুদেরকে বসিয়ে দিয়ে আমাদেরকেই হত্যা করে, আমাদের নিয়ন্ত্রিত যৌনতায় বন্দী গোঁড়া নারী-যুব-সমাজের সামনে অতিবিলাসী ধনমদমত্ত উচ্ছৃঙ্খল ভোগ্যপণ্যপসরার প্রলোভন সাজিয়ে যারা 'স্বাধীন বিশ্ব' তৈরি করেছে তাদের ওপর জমে থাকা হিংসে সেপ্টেম্বরের এক ঝলমলে শারদ প্রভাতে দুটি আত্মঘাতী বিমানের আকার নিয়ে পৃথিবীর বাণিজ্য ও আর্থিক উন্নতির দুটি সর্বোচ্চ বিজয়স্তম্ভকে নিমেষের মধ্যে রক্তাক্ত ভস্মস্তূপে পরিণত করে চলে গেল এই সেদিন। এই সন্ত্রাসের মোকাবিলার মিথ্যা অজুহাত নিয়ে ইরাকের কাছে মহামারাত্মক গণবিধ্বংসী অস্ত্রের আগ্নেয়গিরি আছে এই অপ্রমাণিত আশঙ্কায়—আসলে আবার সেই খনিজ তেলেরই ঈর্ষায়—ইউফ্রেটিস্ টাইগ্রিসের তটভূমিতে সভ্যতার মহাশ্মশানে আরেকবার অনির্বাণ চিতা জ্বালানো হল। এহেন ঈর্ষা কিছুতেই মানুষের সামূহিক শান্তি বা নৈতিক কল্যাণের অনুকূল হতে পারে না। অসূয়া আপাতত বৈষ্ণব পালাকীর্তনে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে যতই অভিমান-বিধুর প্রেমযুদ্ধের রস সৃষ্টি করুক না কেন, পশ্চিমে এবং পশ্চিম প্রভাবিত সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের শিক্ষিতসমাজে বিবাহ ভেঙে যাওয়ার, সম্পর্ক বিষিয়ে যাবার এবং অন্যান্য অনেক রকম মানসিক বাতিক ও বৈকল্যের প্রধান কারণ। বাল্যকাল থেকে ভ্রাতৃপ্রেমিকা ক্রিস্টিয়ানে হেগেল তাঁর দার্শনিক ভ্রাতাকে চল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে করতে দেখে নিছক অসূয়াতে উন্মাদিনী হয়ে যান। হেগেলপত্নী মারি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে নিশ্চিন্ত করতে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। হেগেলের বিবাহিত জীবনের পুরোটা সময় উন্মাদ-আশ্রমে স্নায়বিক বিকারে ভুগতেন ক্রিস্টিয়ানে লুইসা। হেগেলের মৃত্যুর তিনমাস পরে তিনি জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন। যদি তীব্র ভালোবাসার চিহ্ন হয় এই ধরনের অসূয়া তাহলে সেই ভালোবাসাকে একটা ব্যাধি বলা ছাড়া কোনো উপায় নেই।[৮]

প্রেমের প্রধান ও প্রথম শর্ত হল বিশ্বাস ও নিঃশর্ত নির্ভরতা। অবিশ্বাস আর প্রেম একসঙ্গে থাকতে পারে না। অথচ অসূয়ার অন্তঃসার অবিশ্বাস দিয়ে তৈরি। ওথেলো যত বেশি ডেস্‌ডিমোনাকে ভালোবাসে ততই অনিশ্চয়তায় ভোগে—ইয়াগোর খলনায়কসুলভ কুমন্ত্রণাকে সে আপাতত অগ্রাহ্য করতে চায়, কিন্তু 'ডেসডিমোনা আমাকেই একনিষ্ঠ ভাবে কামনা করে'—এই প্রিয়বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যত ঠুনকো বিপরীত প্রমাণ আসুক তাকে সে অবিশ্বাস করতে পারে না। এই ভাবে 'নিশ্চয়ই সে বিশ্বাসঘাতিনী'—এই আশঙ্কা (আশঙ্কার মনস্তত্ত্ব এটাই—সে হল নিশ্চয়তার মুখোশধারী সন্দেহ) তাকে তার প্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে 'আগলে রাখা' 'নিয়ন্ত্রণ করা'র ছুতোতে অবিশ্বাসের বীজ বপন করায়। একনিষ্ঠ প্রেমের দাবি থাকলে অসূয়া থাকবেই—"I love him/her jeal-

ously" অস্পষ্ট বিষয়ক অসূয়াকে ক্রিয়াবিশেষণ বানিয়ে এই অহংকারী স্বীকারোক্তি আজও বিবাহিত অবিবাহিত প্রেমিকযুগলের মধ্যে শোনা যায়। তাহলে যথার্থ প্রেম থাকলে অসূয়া থাকবেই, অসূয়া থাকলে থাকবেই অবিশ্বাস, অথচ যথার্থ প্রেম আর অবিশ্বাস কখনও একসঙ্গে থাকতে পারে না—এই অন্তর্বিরোধ থেকে মুক্তি কোথায়?

আসলে ইওরোপে, বিশেষত রেনেশাঁসের সময়ে ইংরেজি নাটক-সাহিত্যে প্রতিফলিত সমাজে, মানমর্যাদাসচেতন সম্ভ্রান্ত পুরুষদের অনেক রকম অহংকার (= উৎকণ্ঠা ও অনিরাপত্তাবোধ)-এর মধ্যে প্রধান ছিল অন্য পুরুষের সাথে তার বউ পালিয়ে যাওয়ার ভীতি। যার বউ এভাবে পালিয়ে যায় তাকে বলে Cuckold, কুলটাপত্নীক। বোকাচিওর *ডেকামেরন*-এ এইরকম এক কুলটাপত্নীক হবার আতঙ্কে ভীত ধনবান স্বামীকে সদর দরজায় পাহারা রেখে তাঁর রূপসী স্ত্রী স্থানীয় পাদরিসাহেবের সঙ্গে পিছনের দরজা দিয়ে রাতের পর রাত গুপ্ত রতিতে লিপ্তা থাকতেন। তাঁর স্বামীর মিথ্যা অসূয়ার সংশয়পীড়া শেষ পর্যন্ত তাঁকে বস্তুতঃই ব্যভিচারিণী করে তুলেছিল।

তৎকালীন পুরুষেরা বিপত্নীক হওয়া আত্মহত্যা করাটাকেও কুলটাপত্নীক হওয়ার থেকে শ্রেয় মনে করতেন। অথচ কী ওথেলোর ক্ষেত্রে, কী রামচন্দ্রের ক্ষেত্রে লোকলজ্জা মিথ্যা জনপ্রবাদ, ঈর্ষালু অন্য লোকেদের মিথ্যা রটনার বশবর্তী হয়ে নিজেরই প্রিয়তমাকে অব্যভিচারিণী প্রমাণ করবার জন্য যে অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করেন আত্মমর্যাদাহানির ভয়ে ভীত পত্নীস্বত্বস্বামী স্বমানশঙ্কিত পুরুষ—তাতে শুধু প্রিয়তমা নন, তাঁদের একনিষ্ঠ প্রেমই এই অতিরিক্ত অধিকারবোধের অত্যাচারের বলি হয়।

পশ্চিমের জ্ঞানতত্ত্বেও (এপিস্টিমোলজিতে) এই আত্মঘাতী অসূয়ার শিকার হন্ নিয়তসংশয়বাদি স্কেপ্টিক্‌রা। সর্বসংশয়সম্ভাবনারহিত নিষ্কম্প নিশ্চয়তার সন্ধানে বেরিয়ে ক্রমাগত নিজের অভ্যস্ত প্রিয় প্রয়োজনীয় বিশ্বাসগুলির বিরুদ্ধে জোর করে অনাস্থার কৃত্রিম যুক্তি সাজিয়ে আমার প্রমা-প্রেম কত উচ্চাশী, কত বিশুদ্ধতাপিপাসু তা নিয়ে অহংকার করতে গিয়ে স্কেপ্টিক্ ওথেলোর মতো নিজের প্রিয় আত্মবিশ্বাসটিরই কণ্ঠরোধ করে। নিয়তসংশয়বাদীর প্রমাণ রিরংসা এমনি এক প্রিয়াকে হারানোর অতিশঙ্কায় প্রিয়ারই প্রাণঘাতী হয় (Naomi Scheman নাম্নী এক নারীবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক ইদানীং 'Othello's Doubt, Desdemona's Death' প্রবন্ধে এ জাতীয় তুলনা করে সংশয়বাদ ও পুরুষের সশঙ্ক মর্যাদারক্ষার মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন (Blackwells প্রকাশিত *Epistemology : The Big Questions*, পৃ. ৩৬৫-৩৮১ দ্রষ্টব্য)।

শেক্সপিয়র তাঁর ওথেলো নাটকের ঈর্ষাকষায়িত হরিৎ নেত্র চরিত্রদের মুখ দিয়েই বলিয়েছেন অসূয়ার এই অন্তর্বিরোধের কথা। যাকে প্রাণপণ ভালোবাসে (dotes) তাকেই সন্দেহ করে (doubts)—যাকে একা ভোগ করতে চায় আর কারুকে না দিয়ে—পাছে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী তাতে একটুও ভাগ বসায়—সেই ভয়ে তাকেই চুরমার করে ভেঙে ফেলে (সুকুমার রায় হিংসুটি বলে একটি অতি সংক্ষিপ্ত ছোটো গল্পে, একটি ঈর্ষালু ভগ্নী কেমন করে তারই জন্য আনা সুন্দর ডলপুতুল তার দিদির জন্য আনা সন্দেহ করে

ভেঙে নষ্ট করল—তা সরল সত্যতার সঙ্গে দেখিয়েছেন)।

এই অসূয়ারোগের কোনো 'যুক্তি' খোঁজা নিষ্ফল। শেক্সপিয়রের ভাষায়

"অসূয়া রুগ্‌ণ হৃদয় কিন্তু কোনো কথা শুনবে না;
সংগত কোনো কারণে হিংসে হিংসুক করে না তো।
অসূয়াকাতর এই জন্যই অসূয়াকাতর তারা
স্বয়ম্ভু এক পিশাচ হিংসে নিজেরই গর্ভে জাত।"
"But jealous souls will not be answered so;
They are not ever jealous for the cause,
But jealous for they are jealous : 'tis a monster
Begot upon itself, born on itself."

(*Othello*, Act III Scene IV)

হয়তো মেলানি ক্লাইনের (জীবৎকাল ১৮৮২-১৯৬০, অস্ট্রিয়ান মনোবিশ্লেষক) কথা মনে রেখে আমাদের বোঝা উচিত যে হিংসে—অর্থাৎ ঈর্ষা, অসূয়া, মাৎসর্য—হল মানুষের সবথেকে কুৎসিত জীবনবিরোধী আত্মনাশা দুষ্প্রবৃত্তি। প্রথম শৈশবে মাতৃস্তন্য তথা মাতার প্রতি একক দাবিমূলক আকর্ষণে আমাদের ভালোবাসার দীক্ষা হয়। সেই সময় থেকেই ভাই বোন অথবা পিতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেই ভালোবাসার সঙ্গে জড়িয়ে যায় হারানোর ভয়। আমার কাছে যখন সে থাকে না, আমার আয়ত্তের বাইরে, আমার প্রিয় বস্তুটি কী করে, কার হাতে থাকে, আমি ছাড়া অন্য কেউ তাকে কেন দেখে, কেউ উপভোগ করে, কেন ভালোবাসে—এই শঙ্কা ও আক্রোশ তখন থেকেই বিষিয়ে দেয় আমার ভালোবাসাকে। 'তুমি আমার একার' এই দাবি, আর 'পাছে হারাই' এই আগলে রাখার ব্যগ্রতা থেকে প্রেমের পুষ্পবৃন্তে গজিয়ে ওঠে অসূয়ার কণ্টক। ফুল ঝরে গেলেও এই কাঁটাগুলি জেগেই থাকে। পরফিরিয়ার প্রেমিক (ব্রাউনিং-এর কবিতায়) তাই নিজের দয়িতার অনন্য প্রেম হারাবার ভয়ে তারই সোনালিচুলের বেণীর ফাঁসে তার কণ্ঠরোধ করে তাকে হত্যা করে। অথচ ভালোবাসা সার্থক হয় যখন স্বতন্ত্র ইচ্ছায় আমি-নিরপেক্ষ প্রেয়সী আমার কাছে নিজেকে মেলে ধরেন—রসবতী বাক্‌প্রতিভা যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে কবির কাছে কখনো কখনো নিজে থেকে ধরা দেন। যদি আমি ছাড়া আমার প্রেয়সী অন্য কারুর দৃষ্টিগোচরই না হন, আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো সত্তাই না থাকে আমার প্রেমাস্পদের তাহলে তো আমারই সন্দেহ হয় সে হয়তো বাস্তব নয়, আমার স্বপ্নসুন্দরী মাত্র!

তিনি বাস্তবও হবেন অর্থাৎ অব্‌জেক্টিভ হয়ে আমি ছাড়া অন্যেরও জ্ঞানগোচর হবেন, আবার আমার 'বিশেষ' জ্ঞান ও বন্ধুত্বের বিষয় হবেন, অন্য কারো নন, স্বতন্ত্রা হয়েও স্বৈরিনি হবেন না—এই চাহিদা যেমন স্বাভাবিক তেমনি অসম্ভব দ্বন্দ্বদীর্ণ। অন্যের স্বাতন্ত্র্যের কাছে আমার নিয়ন্ত্রণ-পিপাসু শঙ্কাকুল অভিমানী মনের নিঃশর্ত বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অনসূয়া ভালোবাসা সম্ভবই হয় না। মেলানি ক্লাইন হয়তো তাই

ভেবেছিলেন কৃতজ্ঞতার প্রতিষেধক দিয়ে ঈর্ষা অসূয়ার প্রেম-সহজাত মারক ব্যাধিকে চিকিৎসা করতে হবে।

কোনোদিন কারুর পক্ষেই কোনো কালে বা দেশে একনিষ্ঠ গাঢ় প্রেমকে বাঁচিয়ে রেখে এই পরদৃষ্টি-শঙ্কিত অসূয়াকে নিরাময় করা সম্ভব হবে কি না তা বলা যায় না।

কিন্তু সামগ্রিক সমাজনীতি, অর্থনীতি ও ন্যায়বিচারের রাজ্যে (জন রল্‌স্‌ও স্বীকার করেছেন *A Theory of Justice*, ৮০ তম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ঈর্ষার সমস্যা একটি মুখ্যতম সমস্যা হিসেবে থেকেই যাবে। তার কারণ এখনও পর্যন্ত অন্যের সঙ্গে তুলনা না করে আমরা পরস্পরের ও নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 'জীবনযাত্রার মান'—হিত বা কল্যাণের কথা বুঝতেই পারি না। আর তুলনা থেকেই আসে দরদ, দয়া, ঈর্ষা, আক্রোশ। পুঁজিবাদের উৎকর্ষ ও উন্নতির লড়াই, সাম্যবাদের বৈষম্যবিরোধী বিপ্লব—সব কিছুর পেছনেই রয়েছে এমনই এক ঈর্ষার প্রেরণা যে ঈর্ষা নিজের ইষ্টবস্তুকেই নষ্ট করে। আত্মনির্মাণে পরাভিমতমুখপ্রেক্ষী মানুষ যাকে স্বাধীনতা দিতে চায় তাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, যার ওপর নির্ভর করতে চায় না সেই পরেরই অজানা মনের প্রীতি-অপ্রীতির ওপর ছেড়ে দেয় তার আত্মমূর্তির নির্মাণকার্য।

এই ঈর্ষাই তাকে অন্ধের মতো নিজের আক্রমণকারীকেও অনুকরণ করতে শেখায়। সেই অনুকরণকে সে নাম দেয় 'প্রতিহিংসা'। এই ঈর্ষাই তার সমস্ত কামনাকে প্রথম থেকেই অন্যের কামনাপূর্তি ও প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সঙ্গে ন্যূনাধিক্য বিচারের পঙ্কে আবিল করে রাখে।

ঈর্ষাপ্রণোদিত একজন আধুনিক উচ্চাশী মানুষের (অথবা গোষ্ঠীর) জীবনে তাই, অস্কার ওয়াইল্ডের ভাষায় দুটিই ট্র্যাজেডি : এক হল যা চেয়েছিলাম তা না পাওয়া, আর দ্বিতীয় হল তা পাওয়া।

যাকে ঈর্ষা করে তার সমান হবে, না অসমানতার গর্ব বা খেদ নিয়ে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে, পরকে আপনার স্তরে নামিয়ে আনবে, না আপনারে পর করবে—তার অতি-ইচ্ছার সংকটের মধ্যে থেকে কিছুতেই এই পরস্পরবিরোধী বাসনাগুলিকে সে গুছিয়ে সামলাতে পারে না। কেবল নিরুপায় হিংসেতে অস্থির হয়ে সুখহীন পরাধীন দীন প্রাণে বেঁচে থাকে। এহেন মারক মাৎসর্যের দ্বারা পরিচালিত মানুষকে শত বৎসরের জিজীবিষাসহ, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করে, বাঁচতে শেখাবে কে?

পাঠপঞ্জি

Aristotle : *Rhetoric* (1378 â – 1388α)
Ben-Ze'ev : *The Subtlety of Emotions* (
Beecher, M & W : *The Mark of Cain : An Anatomy of Jealousy* (Harper & Row. 1971)
Elster, Jon : *Alchemies of the Mind* (Cambridge Univ. Press, 1999)
Freud, Sigmund : 'Some Neurotic Machanisms in Jealousy, Paranoia, and

Homosexuality' quoted in Hildegard Baumgart's book : Jealosy.
Goldie, Peter : *The Emotions : A Philosophical Exploration* (Oxford, 2000)
Hume, David : *Treatise of Human Nature Book 2, Of the Passions.*
Kant, Immanuel : *Lectures on Ethics,* Translated by L. Infield, Hackett 1999 (Methuen 1979)
Neu, Jerome : *A Tear Is an Intellectual Thing* (Oxford, 2000)
Nozick, Robert : *Anarchy State and Utopia* (Basic Books, 1974)
Russell, Bertrand : *The Conquest of Happiness* (Liveright. N.Y. 1958)
Spinoza, Benedict De : *Ethics* (1677). Trans. by R.H.M. Elwes (1883)
Taylor, Gabriele : "Envy and Jealousy : Emotions & Vices" in *Midwest Studies* (1998)
Wreen, Michael : "Jealousy" in *Nous* 23 (1989)

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও রাজনীতির মৃত্যু

কল্যাণ সান্যাল

প্রায় এক শতাব্দীলালিত রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সমাজতন্ত্রের ধারণাটি সম্প্রতি জোর মার খেয়েছে। ঘটনা মূলত পূর্ব ইয়োরোপে ঘটলেও, তার অভিঘাতে সর্বত্রই মতাদর্শের জগতটি আলোড়িত। সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে কোনো আলোচন'ই আর চিরাচরিত চিন্তাকাঠামোয় সম্ভব হচ্ছে না। অবশ্য কেউ কেউ আছেন— এঁদের সংখ্যাও খুব কম নয়— যাঁরা প্রচলিত ধারণায় আজও বিশ্বাস হারানোর কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। এঁরা বিশ্বাস করেন যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র অচিরেই আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এঁদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা; জীবনানন্দের ভাষায়, এঁরা তর্কাতীত।

একদিকে এই উটপাখি সদৃশ মনোভাব (এঁদের সারল্য মর্মস্পর্শী), অন্যদিকে দুনিয়া জুড়ে পুঁজির অনুজীবীদের বিজয়োল্লাস, ইতিহাসের অপব্যাখ্যা ও অনৃতভাষণ। এই মিডিয়া-শাসিত জীবনে মানুষ উদ্‌গ্রীব অপেক্ষা করে থাকে কখন ঘটনার বিবরণ, তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা— এসবই সে পেয়ে যাবে সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে অথবা একটি দ্বিমাত্রিক আয়তক্ষেত্রে উদ্ভাসিত কোনো বিশেষজ্ঞের মুখনিঃসৃত 'বিশ্লেষণে'। 'রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ লোকসানে চলে অতএব প্রমাণিত হল যে মার্কসের সমাজদর্শন ভ্রান্ত'— এ ধরনের মণিমুক্তা প্রায়শই ছড়ানো থাকে জনপ্রিয় দৈনিকের সম্পাদকীয়তে। উত্থিতনাসা, শহুরে আপস্টার্টরা সপ্তাহান্তের বিশ্বরূপদর্শনে তাঁদের সমস্ত সমাজজিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে যান।

পণ্য, মজুরি-দাসত্ব ও মাথাপিছু একটি ভোট ছাড়া আমাদের আর কিছু চাইবার নেই— একথা যখন প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, তখন কিছু মানুষের কথা মনে পড়ে যাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে আমরা, মানুষেরা, এর চেয়ে বেশি কিছু পাওয়ার যোগ্য। শৃঙ্খল ও স্বাধীনতা— এই শব্দদুটির অভ্যন্তরে তাঁদের বিপজ্জনক ভ্রমণ ইতিহাস তার অগ্নিকারুকার্যের ভিতরে খচিত রেখেছে। তাঁদের মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের সাক্ষী হিসাবে থেকে গেছে কিছু মুদ্রিত অক্ষর। তাই আজ ফিরে যেতে প্ররোচিত হই এই অক্ষররাশির কাছে, যা মিডিয়ার নাগালের বাইরে।

২

প্রায় এক শতাব্দী আগে মার্কসের সঙ্গে বাকুনিনের রাষ্ট্র বিষয়ে মতবিরোধ ঘটেছিল। সেই মতবিরোধপ্রসূত বিতর্কটি গত এক শতাব্দী ধরে মার্কসবাদের আলোচনায় কখনও গুরুত্ব পায়নি। বাকুনিন অ্যানার্কিস্ট ছিলেন, আর অ্যানাকিস্টদের মার্কসবাদীরা সুনজরে দেখতে অভ্যস্ত নন। কিন্তু আজ এতদিন পরে সন্দেহ হয় যে বাকুনিনের বক্তব্যে কিছু সার পদার্থ

ছিল। বরং যে-যুক্তিতে মার্কস তাঁকে খারিজ করেছিলেন, তার দুর্বলতাই আজ অস্বীকার করা শক্ত।

কী ছিল বাকুনিনের বক্তব্য? এককথায় বলতে গেলে বাকুনিন প্রশ্ন তুলেছিলেন শ্রমিকশ্রেণির শাসনের রাষ্ট্রীয় রূপটি সম্পর্কে। মার্কসের কাছে তাঁর জিজ্ঞাস্য ছিল: শ্রমিকশ্রেণির শাসন বলতে কী বোঝায়? সেখানে শাসিত কে? উত্তরে মার্কস বলেছিলেন: রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের অর্থ এই নয় যে বুর্জোয়াশ্রেণিটি রাতারাতি লুপ্ত হয়ে যাবে। তাই শ্রমিকশ্রেণির শাসনে শাসিত হবে অ-শ্রমিক বুর্জোয়ারা। কিন্তু এরপরই বাকুনিন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি তুলেছিলেন: শ্রমিকশ্রেণির শাসনকে কেন রাষ্ট্রকেন্দ্রিক হতে হবে? বুর্জোয়াদের সঙ্গে শ্রমিকের ক্ষমতার লড়াই তো উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, কারখানায়, পাড়ায়, মহল্লায়— এককথায় সমাজের সর্বস্তরে। শ্রমিকশ্রেণি যদি তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাহলে সেটা তো করার কথা অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার স্তরে— কেন তার ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে রাষ্ট্র নামক একটি প্রতিষ্ঠানে? কেননা রাষ্ট্র যদি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে ক্ষমতার ওই কেন্দ্রটি জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে।

রাষ্ট্রের যে এই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার প্রবণতা আছে বাকুনিন তা বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেছিলেন যে শ্রমিকশ্রেণির প্রতিনিধি হিসাবে যারা রাষ্ট্রক্ষমতাকে ব্যবহার করবে, রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্কটাই এমন যে তারাই ক্রমশ একটি ক্ষমতাবান গোষ্ঠী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে; রাষ্ট্রকে ঘিরে তৈরি হবে একটি সুবিধাভোগী, ক্ষমতালোভী আমলাতন্ত্র যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াবে ওই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার উপর, অবশ্যই জনগণের নামে, নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখা। ফলত তারাই শাসন করবে জনগণকে, যেমন করে অন্যান্য শাসকশ্রেণি:

"A scientific body to which had been confided the government of society would soon end by devoting itself no longer to science at all, but to quite another affair; and that affair, as in the case of all established powers, would be its own eternal perpetuation by rendering the society confided to its care ever more stupid and consequently more in need of its government and direction."

—Bakunin, *God and the State*; p. 31-32.

প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে মার্কসের যুক্তি ছিল এই যে ট্রেডইউনিয়নের নেতৃত্বে যেমন সমস্ত শ্রমিক থাকে না, থাকে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই বা সেটা হবে না কেন? যে সময় মার্কস এটা বলেছিলেন, ট্রেডইউনিয়ন নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারানোর কোনো কারণ তখনও পর্যন্ত ঘটেনি— তাই তুলনা হিসাবে এটাকে ব্যবহার করতে তিনি দ্বিধা করেননি। কিন্তু তার পরবর্তী ইতিহাস ওই আস্থার স্বপক্ষে কথা বলে না। সাধারণ শ্রমিক থেকে বিচ্ছিন্ন ট্রেডইউনিয়ন নেতৃত্বের বুর্জোয়াদের কাছে বিকিয়ে যাওয়া বা ওই শ্রমিকদের উপর খবরদারি করার যন্ত্রে পরিণত হওয়ার উদাহরণ কিছু কম নেই। পারী কমিউন প্রসঙ্গে অ-কেন্দ্রীভূত জনগণের ক্ষমতা সম্পর্কে মার্কস গভীর উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। অথচ বাকুনিনের সঙ্গে বিতর্কে সেই ক্ষমতার রাষ্ট্রিক রূপকে তিনি কেন অত

গুরুত্ব দিলেন সেটা খুব পরিষ্কার নয়। জনগণের ক্ষমতার প্রশ্নটিকে তিনি খারিজ করে দিয়েছিলেন— একথা ভাবলে অবশ্য ভুল হবে। তাঁর বক্তব্য ছিল : বিপ্লবের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণির ক্ষমতার যে রূপটি প্রতিষ্ঠিত হবে তার কোনো পূর্বনির্দিষ্ট, একমাত্র রূপ থাকবে— এমন কোনো কথা নেই। সেটা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রিক রূপ নিতে পারে, অথবা অ-কেন্দ্রীভূত জনগণের ক্ষমতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কোনটা হবে তা নির্ভর করবে পরিবর্তনের বিশেষ ঐতিহাসিক-সামাজিক পটভূমিকার উপর। কিন্তু যে রূপই নিক-না-কেন, তাকে শ্রমিকশ্রেণির ক্ষমতা হিসাবেই স্বীকার করতে হবে।

কিন্তু রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটি নিজেই যে একটি ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াতে পারে, আর সেই ক্ষমতা প্রয়োগ হতে পারে জনগণের বিরুদ্ধে— এই আশঙ্কাটি মার্কসের কাছে গুরুত্ব পায়নি। আর সেটাই ছিল বাকুনিনের সঙ্গে তাঁর বিরোধের মূল বিষয়। অবশ্য মার্কসের চিন্তাকাঠামোর মধ্যেই এমন কয়েকটা ঝোঁক ছিল যে বাকুনিনের রাষ্ট্র সম্পর্কে অবিশ্বাসকে তাঁর পক্ষে গুরুত্ব দেওয়া সম্ভবও ছিল না। মার্কসের কাছে ক্ষমতার মূলটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে প্রোথিত; তার বাইরে যে রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষমতা, তা ওই অর্থনৈতিক ক্ষমতারই প্রকাশ। তাই উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর থেকে বুর্জোয়াশ্রেণির নিয়ন্ত্রণ চলে গেলে, শ্রমিকশ্রেণির উপর প্রয়োগ হতে পারে এমন ক্ষমতার আর অস্তিত্ব থাকবে না— এটা তিনি প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হিসাবেই ধরে নিয়েছিলেন। উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় এমন রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষমতার অস্তিত্বের কথা অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করলেও, ক্ষমতা সম্পর্কে মার্কসের ধারণার এই মূল ঝোঁকটিই পববর্তীকালে মার্কসবাদের একটি যান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রসব করে। কিন্তু রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে নতুন কোনো ক্ষমতার জন্ম হতে পারে— বাকুনিনের এই আশঙ্কাটিকে নাকচ করে দিয়ে রাশিয়ায় বিপ্লবপরবর্তী রাষ্ট্রের চরিত্র ও তার পরিণতিকে যে মার্কস খানিকটা নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন— একথা আজ মনে হলে সেটা খুব অস্বাভাবিক হবে না। বস্তুত, লেনিনের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ধারণাটি আকাশ থেকে পড়েনি। মার্কস-বাকুনিন বিতর্ক কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা সম্পর্কে লেনিনের বিশ্বাসের ভিত্তিটি তৈরি করার ক্ষেত্রে একটা বড়ো ভূমিকা পালন করেছিল। 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'এ লেনিন রাষ্ট্রকে লিবার্টারিয়ান দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত করেছিলেন। রাষ্ট্রযন্ত্র সেখানে শাসকশ্রেণির শ্রেণিক্ষমতার সংগঠিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং শ্রমিকশ্রেণির ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা একমাত্র ওই রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসের মধ্য দিয়েই সম্ভব। মার্কসের পারী কমিউন সংক্রান্ত লেখা— যেখানে অ-কেন্দ্রীভূত জনগণের ক্ষমতাকে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন—'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'এর উপস্থাপনাকে প্রভাবিত করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মাত্র তিন বছর পরেই লেনিন লিখলেন :

"....the art of politics (and the Communist's correct understanding of his tasks) lies in correctly gauging the moment when the vanguard of the proletariat can successfully seize power... and when it is able thereafter to maintain, consolidate and extend its rule by educating, training and

attracting ever broader masses of the working people."

—*Left wing Communism, an Infantile Disorder*, p. 42.

শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বের এই রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রূপ আর যাই হোক 'উইদ্যারিং অ্যাওয়ে অফ দ্য স্টেট'এর প্রতিশ্রুতি বহন করে না। জনগণের উপর ভ্যানগার্ডদের এই একমুখী রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'এর লিবার্টারিয়ান দৃষ্টিকোণ থেকেও অনেক দূরে।

৩

মার্ক্স বাকুনিনকে সরাসরি নাকচ করে দিলেও, রাষ্ট্র সম্পর্কে অ্যানার্কিস্টদের সমালোচনার ধারাটি কিন্তু বরাবরই সমাজদর্শনের আলোচনায় টিকে থেকেছে। রাষ্ট্র যে একটি ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াতে পারে— বাকুনিনের এই আশঙ্কাটির স্বপক্ষে পরবর্তী কালের সমমর্মী তাত্ত্বিকরা আরও পরিশীলিত, জোরালো যুক্তি ও বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। অ্যানার্কিস্ট সমাজদর্শনের মহিমা প্রচার করা আদৌ আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সেখানে এমন কিছু প্রশ্নের উপস্থাপন করা হয়েছে, আধুনিক সমাজের এমন কতগুলি বিরোধাভাসের ইঙ্গিত সেখানে আছে, যার সম্পর্কে সচেতন হলে, যাকে আলোচনার কেন্দ্রে জায়গা দিলে, মার্ক্সবাদের আলোচনায় নতুন মাত্রা যুক্ত হতে পারে; তা হয়ে উঠতে পারে আরও সমৃদ্ধ ও আধুনিক। নতুন দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে অন্ধ বিদ্বেষ সততচলিষ্ণু সমাজের ধারাবাহিকতাকে বুঝতে কোনো সাহায্য করে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে কমিউনিস্ট পার্টির অপসারণ ও সমাজের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত সংকোচনের পর অবশ্য অনেক মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবী, দেশে ও বিদেশে, বলতে শুরু করেছেন যে সমাজতন্ত্রের রূপায়ণ প্রক্রিয়ায় নিশ্চয়ই কোনো ত্রুটি ঘটেছিল— সবকিছুরই নতুন করে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। সবিনয়ে এঁদের মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে বাস্তবায়িত সমাজতন্ত্রের (really existing socialism) সমালোচনা দীর্ঘদিন থেকেই হয়ে আসছে— সেই সমালোচকদের একটা বিরাট অংশই মার্ক্সবাদী, ছদ্মবেশী বুর্জোয়াদের দালাল নন। তাঁরা মার্ক্সবাদের ভিন্ন ব্যাখ্যার কথা বলে এসেছেন। পার্টির ছত্রছায়ায় পুষ্ট বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু সেই সমালোচনাকে এতদিন গলার জোরে দুরমুশ করে এসেছেন। বৌদ্ধিক সংকীর্ণতা, মানসিক আলস্য বা চিন্তার জগতে কায়েমি স্বার্থ— কারণ যাই হোক-না-কেন, মার্ক্সবাদের একটি যান্ত্রিক, অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যাকে কণ্ঠশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁরা চিন্তার জগতে একটি অচলায়তন সৃষ্টি করেছেন। আজ মতাদর্শের লড়াইতে বুর্জোয়াদের কাছে গোহারান হেরে তাঁরা পুনর্মূল্যায়ন করতে চাইছেন। অবশ্য বস্তাপচা কিছু কথার চর্বিতচর্বণে যাঁদের এতদিন কেটেছে, নব্য মার্ক্সবাদের বাজারে তাঁদের প্রবেশ খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না।

আধুনিক অ্যানার্কিস্টদের চিন্তায় রাষ্ট্র, সমাজ ও ক্ষমতার প্রশ্নটি একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়। সমাজজীবনের দুটি পরিমণ্ডলের কথা মার্ক্স উল্লেখ করেছিলেন: প্রয়োজনের (Sphere of necessity) ও স্বাধীনতার (Sphere of freedom)। বেঁচে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, তার উৎপাদন ও বণ্টনের

প্রক্রিয়াটি হল প্রয়োজনের পরিমণ্ডল। অন্যদিকে স্বাধীনতার পরিমণ্ডলটি হল সমাজজীবনের সেই পরিমণ্ডল যেখানে মানুষের জীবনধারণের প্রাথমিক শর্তগুলি পূরণ হয়ে যাওয়ার পর সে মানুষি অস্তিত্বের অন্যতর চরিতার্থতার কথা ভাবতে পারে। মানুষের মুক্তির ধারণাটি মার্কসের কাছে ছিল এই প্রয়োজনের পরিমণ্ডল থেকে স্বাধীনতার পরিমণ্ডলে উত্তরণ।

কিন্তু শ্রেণিবিভক্ত বুর্জোয়া সমাজে এই দুটি পরিমণ্ডলের উপরই থাকে বুর্জোয়াশ্রেণির আধিপত্য, কেননা তারাই উৎপাদনের উপকরণের মালিক। উন্নত বুর্জোয়া ব্যবস্থায় উৎপাদন শক্তির বিকাশ সমগ্র সমাজের বিচারে মানুষকে প্রয়োজন থেকে স্বাধীনতার পরিমণ্ডলে নিয়ে যেতে সক্ষম। কিন্তু যেহেতু উৎপাদন প্রক্রিয়াটি বুর্জোয়াশ্রেণির নিয়ন্ত্রণে, স্বাধীনতার পরিমণ্ডলটি কখনোই শ্রমিকের নাগালের মধ্যে আসে না। কেননা পুঁজি তার নিজস্ব মুনাফার যুক্তিতে এক অন্তহীন পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াকে জিইয়ে রাখতে চায়। অন্যদিকে শ্রমিক পুঁজির এই নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করতে পারে না, কারণ প্রয়োজনের পরিমণ্ডলটিও ওই পুঁজির নিয়ন্ত্রণে। উৎপাদনের উপকরণের উপর যাদের অধিকার নেই, পুঁজির বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ জীবনধারণের প্রাথমিক শর্তগুলি পূরণ না হওয়ার আশঙ্কা। তাই স্বাধীনতার পরিমণ্ডলটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রয়োজনের পরিমণ্ডলের উপর পুঁজির নিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা ধ্বংস করা প্রয়োজন। উৎপাদন প্রক্রিয়া ও বণ্টনের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পক্ষে এটাই মূল যুক্তি।

সমস্যা হল এই যে বুর্জোয়াশ্রেণিকে অপসারিত করে উপকরণের রাষ্ট্রীয় মালিকানা কায়েম হলে শুধু প্রয়োজন নয়, স্বাধীনতার পরিমণ্ডলটিও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। আর সেখান থেকেই সংঘাতের শুরু। মার্কসবাদীরা বলবেন : তাতে আপত্তি কীসের? উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর পুঁজির নিয়ন্ত্রণ না থাকার অর্থই তো শ্রমিকের স্বাধীনতা। কিন্তু ব্যাপারটা অত সরল নয়। কারণ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের উপর পুঁজির যে আধিপত্য, সেটার মূল উৎস কিন্তু শুধুমাত্র উপকরণের মালিকানা নয়। আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের বিশাল কর্মযজ্ঞে ব্যক্তিশ্রমিককে নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদন প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তির নৈর্ব্যক্তিক নিয়ম, যে উৎপাদনের সামাজিক বা ব্যবহারিক তাৎপর্য ওই শ্রমিকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক। উপকরণের মালিকানার জোরে বুর্জোয়া সেই ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। এবং উদ্‌বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণিকে সরিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম হলে ওই উদ্‌বৃত্ত আহরণ করে রাষ্ট্র, কিন্তু ব্যক্তিশ্রমিকের উপর নিয়ন্ত্রণের কোনো হেরফের হয় না। ক্ষমতার উৎস নিছক উপকরণের মালিকানার নয়। তা ওই উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিন্যাসে, যান্ত্রিকতায়, নিয়মের নৈর্ব্যক্তিকতায়— যেখানে শৃঙ্খলাই শৃঙ্খল। পুঁজির নিয়ন্ত্রণ ওই ক্ষমতায় একটি বিশেষ প্রকাশ মাত্র। বুর্জোয়াশ্রেণি ওই 'ক্ষমতা যন্ত্রের' যন্ত্রী, তবে একমাত্র সম্ভাব্য যন্ত্রী নয়।

ব্যক্তি ও নৈর্ব্যক্তিক যৌথতার মধ্যকার এই যে বিরোধের কথা অ্যানার্কিস্টরা বলেন এর উত্তরে মার্কসের যুক্তিটাও জোরালো। তাঁর বক্তব্য হল: রাষ্ট্রক্ষমতায় যেখানে শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব কায়েম হয়েছে, সেখানে যৌথতার নৈর্ব্যক্তিক নিয়মে পিষ্ট ব্যক্তিশ্রমিকের

উত্তরণ ঘটবে শ্রেণিচেতনার মাধ্যমে। কেননা সে একদিকে যেমন এক বিশাল কর্মযজ্ঞে নিযুক্ত ব্যক্তিশ্রমিক, অন্যদিকে আবার সেই যৌথ শ্রেণিচেতনার অংশীদার। ব্যক্তি হিসাবে সে বিযুক্ত, কিন্তু শ্রেণিচেতনার আলোয় সে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সেখানে সে এক সর্বজনীনের অংশ।

অ্যানার্কিস্ট চিন্তা ও মার্কসবাদী ধারণার এটাই মূল বিরোধের জায়গা। মার্কসবাদীরা শ্রেণিগত অস্তিত্বের বাইরে, সর্বজনীনের অংশ হিসাবে ছাড়া, ব্যক্তির যে কোনো মুক্তিপ্রয়াস থাকতে পারে একথা মানেন না। অন্যদিকে অ্যানার্কিস্টরা ব্যক্তির স্বায়ত্বে বিশ্বাসী, তার স্বাধীন চর্যার উপর যে কোনো নিয়ন্ত্রণ, তা পুঁজিরই হোক বা শ্রেণি নামক কোনো যৌথ অস্তিত্বেরই হোক, তাঁরা শৃঙ্খল বলে মনে করেন। পুঁজির বিকল্প সর্বজনীন হিসাবে মার্কস যে প্রলেতারিয়েতকে খাড়া করেছিলেন, তাঁদের মতে সেটা নিছকই একটি তাত্ত্বিক ধারণা। সেই 'কাল্পনিক' শ্রেণিচেতনায় প্রতিটি মানুষকে জোর করে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করার কোনো যুক্তি নেই। শ্রেণিচেতনার বাইরে ব্যক্তির নিজস্ব কোনো চেতনার জগৎ বা মুক্তির এষণাকে নাকচ করার অর্থ ওই স্বাধীনতার পরিমণ্ডলকে অস্বীকার করা। বাস্তবায়িত সমাজতন্ত্রে (really existing socialism) শ্রমিকশ্রেণির নামে রাষ্ট্র তার ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে ব্যক্তির উপর। পুঁজির নিয়ন্ত্রণ আর শ্রমিকশ্রেণি ও তার প্রতিভূ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ—তাঁদের কাছে এ-দুটি একই মুদ্রার দু-পিঠ মাত্র।

আগেই বলেছি অ্যানার্কিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে সওয়াল করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মার্কসের স্বপ্নের প্রলেতারিয়েত ও তার সংগ্রামী চেতনা এবং শ্রমিকজনতার মধ্যকার সম্ভাব্য বিরোধকে অস্বীকার করলে মারাত্মক ভুল করা হবে। সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস অন্তত তাই বলে। পশ্চিমের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে সমান্তরালভাবে শ্রমিকজনতার একটা বিকল্প আন্দোলনের ধারা দীর্ঘদিন ধরেই বয়ে চলেছে। সেই আন্দোলনের লক্ষ্য, ভঙ্গি ও কায়দা প্রথাগত শ্রমিক আন্দোলনের থেকে আলাদা। অনেক ক্ষেত্রেই তা এমনকি পার্টির নেতৃত্বকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। ষাটের দশকের শেষে সারা পশ্চিম ইয়োরোপে, বিশেষ করে ফ্রান্সে, ছাত্র-শ্রমিকের সম্মিলিত অভ্যুত্থানের চেষ্টা প্রলেতারিয়েতের প্রতিভূ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে শ্রমিকজনতার দূরত্বকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল।

ব্যক্তি বা জনতার আচরণ প্রলেতারিয়েতের প্রথাগত চেতনার সঙ্গে না মিললে মার্কসবাদীরা চিরকাল তাকে স্বতঃস্ফূর্ত, অসচেতন—এই অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। যা কিছুই ভ্যানগার্ড নির্ধারিত সচেতনতার সঙ্গে মেলে না, তাই হল false consciousness.— এটা তাঁদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ; জনতার নিজস্ব আশাআকাঙ্ক্ষা বা মুক্তিপ্রয়াসের সেখানে কোনো স্থান নেই। আর তাই পুঁজিবাদী সমাজে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মূল স্রোতের উপর কমিউনিস্ট পার্টি গত দু-তিন দশকে তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ CPGB-কেও তাই নাম পালটে আজ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল হওয়ার চেষ্টা করতে হচ্ছে।

ইতিহাসের মঞ্চে প্রগতির নাটকে মার্কস প্রলেতারিয়েতের একটি বিশেষ ভূমিকা কল্পনা করেছিলেন। আজ কোনো প্রলেতারিয়ান বলতে পারে যে সে ওই ভূমিকায় অভিনয় করতে ইচ্ছুক নয়। তার নিজস্ব স্বাধীনতা ও মুক্তির জগতটি ভিন্ন। কিন্তু সেক্ষেত্রে তার সমস্ত অস্তিত্বের উপর ওই ভূমিকাটি জোর করে চাপিয়ে দিয়ে, তার নিজস্ব চেতনার উপর শ্রেণিচেতনার স্টিমরোলার চালানোর কোনো যুক্তি নেই। বিশেষ করে যখন প্রমাণ হয়ে গেল যে এত করেও শ্রমিককে ওই 'শ্রমিকশ্রেণির' অংশ করে তোলা সম্ভব হয়নি, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্বজনীনতায় তার ব্যক্তি অস্তিত্বটি লীন হয়ে যায়নি। আজ তাই 'শ্রেণিচেতনার' নিয়ন্ত্রণটি শিথিল হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নির্দ্বিধায় কবুল করছে একটি রঙিন টেলিভিশন বা স্বয়ংক্রিয় কাপড় কাচার কলের জন্য তার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা।

৪

অতএব বুর্জোয়া রাষ্ট্র—যা গোটা সমাজকেই পুঁজির নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেয়—বা প্রথাগত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—যা গোটা সমাজের উপরই শ্রমিকশ্রেণির নামে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে—এর কোনোটির ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার পরিমণ্ডলটি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাহলে অ্যানার্কিস্টরা আদর্শ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে কীভাবে দেখেন? সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরোধটির মীমাংসাই বা সেখানে কীভাবে ঘটে?

যে আদর্শ সমাজের ছবি আধুনিক অ্যানার্কিস্টরা আঁকেন সেখানে রাষ্ট্র ও সমাজের বিরোধের কোনো স্থায়ী মীমাংসা অসম্ভব—তাদের মধ্যে সতত এক টানাপোড়েন চলে। যেহেতু স্বাধীনতার প্রথম শর্ত হল প্রয়োজনের পরিমণ্ডলটিকে শ্রেণির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ভার নিতে হবে প্রতিটি নাগরিকের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় শর্তগুলিকে পূরণ করার। অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়াটি থাকবে সরাসরি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। সেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়াটি হবে শৃঙ্খলাভিত্তিক, নৈর্ব্যক্তিক নিয়মচালিত—এককথায় heteronomous, ব্যক্তির স্বায়ত্তের (autonomy) প্রশ্নটি সেখানে অবান্তর। কিন্তু ওই পরিমণ্ডলের বাইরে সমাজের বাকি অংশটি হবে স্বাধীন জীবনচর্যার ক্ষেত্র—sphere of freedom—যেখানে রাষ্ট্রের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। সেখানে মানুষ স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গোষ্ঠীভিত্তিক উৎপাদন ও অন্যান্য সামাজিক প্রক্রিয়ার শরিক হবে। সেটা কোনো বিশাল, মনোলিথিক কর্মযজ্ঞ নয়, তা অ-নৈর্ব্যক্তিক, আঞ্চলিক ও পারস্পরিকতার যুক্তিতে বিধৃত। স্বাধীনতার এই পরিমণ্ডলটিকে প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই প্রয়োজনের পরিমণ্ডলে নৈর্ব্যক্তিক শৃঙ্খলার কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতার আত্মসমর্পণ জরুরি।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে ওই স্বাধীনতার পরিমণ্ডলটি, যেখানে রাষ্ট্রিক বিধিনিষেধ নেই, যে উপকরণের মালিকানাভিত্তিক শ্রেণিক্ষমতার অধীনে চলে যাবে না তার নিশ্চয়তা কী? তাহলে তো সেটা আর স্বাধীনতার পরিমণ্ডল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। উত্তরে বলা যেতে পারে যে যেহেতু মানুষ তার প্রয়োজনের পরিমণ্ডলে পুঁজির দাস নয়, স্বাধীনতার পরিমণ্ডলে সে পুঁজির প্রভুত্বকে সহজেই অস্বীকার করতে পারে। কেননা

পুঁজির উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ না করার পূর্ণ স্বাধীনতা ও সামর্থ্য তার রয়েছে, যা সে পেয়েছে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পরিমণ্ডলটি থেকে। এখানে রাষ্ট্রই স্বাধীনতার উৎস।

কিন্তু সমস্যা হল রাষ্ট্র ওই প্রয়োজনের পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না। তার নৈর্ব্যক্তিক প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা দিয়ে সে নিয়তই স্বাধীনতার পরিমণ্ডলটিতে প্রবেশ করতে চায়। তাকে তার নিজস্ব পরিমণ্ডলের মধ্যে সংকুচিত করে রাখার দায়িত্বটি বর্তায় রাজনীতির উপর। সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী অংশে তাই রাজনীতির অবস্থান, যা একদিকে স্বাধীনতার পরিমণ্ডলটিকে রাষ্ট্রিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা করে, অন্যদিকে ওই পরিমণ্ডলটির অস্তিত্বের শর্ত হিসাবে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনের পরিমণ্ডলটির দায়িত্ব নিতে বাধ্য করে।

রাজনীতি সম্পর্কে অ্যানার্কিস্টদের এই ধারণাটির মধ্যে নতুনত্ব আছে। রাজনীতি বলতে আমরা সচরাচর রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাজনীতিকেই বুঝি। বহুদলীয় গণতন্ত্রে রজনৈতিক দলগুলির একমাত্র লক্ষ্য হল রাষ্ট্রযন্ত্রটির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা। সমাজের নানান বিরোধ ও অসন্তোষের রাষ্ট্রিক সমাধানের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তারা দাবি করে যে ক্ষমতাসীন দল রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ। রাষ্ট্রযন্ত্রটির উপর তাদের অধিকার কায়েম হলে সমস্যাগুলির প্রতিবিধান সম্ভব। কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর রাষ্ট্রের নিজস্ব নিয়মেই তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরোধে, রাষ্ট্রযন্ত্রের যন্ত্রী হিসাবে, রাষ্ট্রের পক্ষ নিতে বাধ্য হয়। ফলে সমাজের উপর রাষ্ট্রের একমুখী নিয়ন্ত্রণপ্রবণতাকে কার্যকর করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। যাঁরা মনে করেন একদলীয় শাসন নয়, বহুদলীয় গণতন্ত্রই প্রকৃত গণতন্ত্র, তাঁরা রাষ্ট্র-ক্ষমতার রাজনীতিকেই প্রকৃত রাজনীতি বলে ভাবেন। অ্যানার্কিস্টদের কছে, যদি রাজনীতি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক হয়, তাহলে একদলীয় শাসন ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের মধ্যে কোনো মূলগত তফাত নেই।

রাজনীতির রাষ্ট্রক্ষমতাকেন্দ্রিক হয়ে ওঠার অর্থ, অ্যানার্কিস্টদের ধারণায় 'রাজনীতির মৃত্যু'। কেননা রাজনীতির উদ্দেশ্য সমাজের তরফ থেকে রাষ্ট্রকে শাসন করা, রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে সমাজকে শাসন করা নয়। প্রকৃত রাজনৈতিক দল তাই সেই সংগঠন যা কখনো রাষ্ট্রক্ষমতায় অংশভাক হতে চায় না, যা শুধুমাত্র স্বাধীনতার পরিমণ্ডলটির স্বার্থে রাষ্ট্রকে কাজ করতে বাধ্য করে।

যেখানে রাষ্ট্রের উপর কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ কর্তৃত্ব, অর্থাৎ যেখানে বহুদলীয় গণতন্ত্র নেই, সেখানে সমাজের তরফ থেকে রাষ্ট্রকে শাসন করার মতো কোনো স্বাধীন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই নেই। এবং অ্যানার্কিস্টদের অর্থে রাজনীতিরও কোনো অস্তিত্ব নেই। বস্তুত পূর্ব-ইয়োরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে শাসনযন্ত্রটি ভেঙে পড়ার আকস্মিকতা প্রমাণ করে যে সমাজে জমে ওঠা অসন্তোষ ও বিপ্রলব্ধ আশাআকাঙ্ক্ষার কোনো ধারণাই রাষ্ট্রপরিচালকদের ছিল না। যে স্বাধীন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতায় সমাজের হৃৎস্পন্দনের শব্দটি রাষ্ট্রের কানে পৌঁছায়, সেগুলিকে প্রথম থেকেই উৎপাটিত করে দেওয়া হয়েছিল। রাজনীতির মৃত্যুই রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যকার এই শূন্যতার কারণ। যে-শূন্যতার

সুযোগে রাষ্ট্র গ্রাস করেছিল স্বাধীনতার পরিমণ্ডলটিকে। আজ উলটোরথের টানে তাই প্রয়োজনের পরিমণ্ডলটিও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। সেখানে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সংস্থানের উপরেও অচিরেই পুঁজির নিয়ন্ত্রণ কায়েম হতে চলেছে।

৫

রাজনীতির মৃত্যু সম্পর্কে অ্যানার্কিস্টদের ধারণাটি তৃতীয় বিশ্বের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে আদৌ প্রাসঙ্গিক কি না সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কেউ একথা বলতে পারেন যে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই উৎপাদন ও বণ্টনের প্রক্রিয়ার পুরোটাই শ্রেণিক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে। স্বাধীনতার পরিমণ্ডলটিকে সংকুচিত করার অভিযোগে রাষ্ট্রকে শাসন করার প্রশ্ন সেখানে ওঠে না। বরং প্রয়োজনের পরিমণ্ডলের উপরে রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করাটাই সেখানে মুখ্য দাবি। যেখানে সমাজে সব মানুষের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারটুকুও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সমাজে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি, সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে প্রয়োজনের পরিমণ্ডলটিকে শ্রেণির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা সম্ভব। আর সে কারণেই রাষ্ট্রক্ষমতায় অংশগ্রহণ করা একটি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে জরুরি।

যুক্তিটা আপাতদৃষ্টিতে জোরালো সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে ফাঁকও আছে। পার্টি সেক্ষেত্রে একাধারে রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালক, অন্যদিকে সে-ই আবার গণসংগঠনের নেতৃত্বে। যেহেতু পার্টি একটি সর্বজনীনের প্রতিনিধি, নিজের আওতার বাইরে কোনো স্বাধীন সংগঠনের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। সমাজের প্রতিটি স্তরে যে-কোনো সংগঠনকেই সে নিজের নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসতে সতত সচেষ্ট। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরোধী সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সমাজের হয়ে রাষ্ট্রকে শাসন করার বদলে, রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে এক আপাত-দ্বন্দ্বহীন আদান-প্রদানের সম্পর্ক গড়ে তুলতে সে প্রয়াসী হয়। যা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের পারা-না-পারার যুক্তিটিকে রাষ্ট্রের কাছে সমাজের সমস্ত দাবির যৌক্তিকতার মানদণ্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। যে-দাবি রাষ্ট্রশক্তিকে বিব্রত করতে পারে—তার যতই যৌক্তিকতা থাক-না-কেন—তাকে মদত দেওয়া পার্টির পক্ষে সম্ভব হয় না। বরং যদি কোনো সংগঠন তা করতে চায়, প্রয়োজনে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে তার শিরদাঁড়া ভেঙে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এভাবেই রাষ্ট্রের স্বার্থে জনগণের ক্ষমতাকে খর্ব করা হয় প্রতিদিন।

যেমন ভূমিসংস্কার। যার যৌক্তিকতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। যেখানে ভূমি সমস্যার রাষ্ট্রিক সমাধান সম্ভব নয়, সেখানে জনগণের নিজস্ব ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে অ-রাষ্ট্রিক পন্থায় ভূমি সংস্কার করতে গেলে, তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের পীড়নযন্ত্রটি ব্যবহার করা ছাড়া উপায় থাকে না। এটাই রাষ্ট্রক্ষমতার অংশভাক হওয়ার মূল্য।

যদি জনসমর্থন একটি কমিউনিস্ট পার্টিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে, তাহলে ক্ষমতায় না গিয়েও, রাষ্ট্রের পক্ষে একটি বিশেষ আর্থ-সামাজিক অবস্থায় যা যা করা সম্ভব, গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রকে সেগুলি করতে বাধ্য করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়,

ওই বিশেষ পটভূমিকায় যা রাষ্ট্রের পক্ষে করণীয় অথচ করা অসম্ভব, সেই ক্ষেত্রগুলিকেও চিনে নেওয়া যায়। রাষ্ট্রকে বিব্রত করার মধ্য দিয়েই একমাত্র তার সীমানাটিকে দৃশ্যমান করা সম্ভব। কিন্তু ক্ষমতায় কমিউনিস্ট পার্টি আসীন হলে, রাষ্ট্রকে বিব্রত না করার যুক্তিটি গণ-আন্দোলনের উপর সবচেয়ে বড়ো বাধা হিসাবে দেখা দেয় যা মূলত শাসকশ্রেণির প্রতিনিধি রাষ্ট্রের অক্ষমতা, আপাতদৃষ্টিতে তাকে মনে হয় কমিউনিস্ট পার্টিরই অক্ষমতা। অন্যদিকে রাষ্ট্রিক রাজনীতির যে দৈনন্দিন প্রক্রিয়া, সেই রিয়েলপলিটিক-এর খেলায় এক সময় যে-কোনো মূল্যে রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে থাকাই হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র বিবেচ্য।

তাই মনে হয় বাকুনিনের আশঙ্কাটিকে সরাসরি নাকচ করাটা বোধ হয় মার্কসের ভুলই হয়েছিল।

উল্লেখপঞ্জি

১. Bakunin, M. *God and the State*, New York, Dover, 1970.

২. Lenin, V. I. *Left Wing Communism, an Infantile Disorder*. Peking, Foreign Language Press, 1975.

৩. রাষ্ট্র সম্পর্কে আধুনিক অ্যানার্কিস্টদের আলোচনায় আগ্রহী পাঠক Andre Gorz-এর *Farewell to the Working Class* (Plutc Press, Buston, 1987) বইটি দেখতে পারেন।

অনুষ্টুপ, ২৭ : ১ম সংখ্যা, ১৯৯২

দেরিদা-দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

কল্যাণ সেনগুপ্ত

দেরিদা-দর্শনের বৈচিত্র্য, ব্যাপকতা ও জটিলতার যথার্থ রূপায়ণ খুব সহজসাধ্য নয়। তবু এই প্রবন্ধে আমি অন্তত একটি রূপরেখা দিতে চেয়েছি। এই আশা নিয়ে—দেরিদার গভীর মননের কিছুটা ইঙ্গিত হয়তো এর মধ্যে পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, দেরিদার অনুপ্রবেশ সাহিত্যে যতটা দর্শনে ততটা নয়। বরং বলা যেতে পারে বিদগ্ধ সাহিত্যিক মহলই তাঁকে আবিষ্কার করেছে, নিয়ে এসেছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এই মহলের হাতেই তাঁর উজ্জ্বল উদ্ধার—এই মহলই বিনির্মাণ কৌশলের মধ্যে দেখতে পেয়েছে এক নবতর সাহিত্যতত্ত্বের উজ্জ্বল দিগন্ত। সে হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মহলে তাঁর আবেদন তেমন নাড়া দিতে পারেনি। কেন এই বৈষম্য? কেন দার্শনিক যেখানে বিমুখ, সাহিত্যিক সেখানে তাঁর প্রসন্ন মুখ ফেরান দেরিদার দিকে? অথচ দেরিদা তো দর্শন বিষয়েই কথা বলেছেন। বস্তুত তাঁর বিনির্মাণ শুরুই হয়েছে পাশ্চাত্য দার্শনিক হুসার্ল-এর বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। তাঁর রচিত *স্পিচ অ্যান্ড ফেনোমেনা, অফ গ্রামাটোলজি, মার্জিনস্ অফ ফিলোসফি*—সবই দর্শন বিষয়ক। তবে সাহিত্য অনুরাগীর মনোযোগ তিনি আকর্ষণ করেন কোন গুণে?

হয়তো এর একটি কারণ—দেরিদার ঝোঁক যত না বক্তব্য বিষয়ের দিকে তার চেয়েও বেশি প্রকাশভঙ্গির উপর। কী বলব তার চেয়েও তাঁর কাছে বেশি গুরুত্ব পায় কেমনভাবে বলব। বিষয়ের চেয়েও শৈলীর প্রতি তাঁর অধিকতর মনোযোগ। বলা বাহুল্য, দেরিদা তাঁর টেক্সটে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা প্রচলিত অর্থে সাধারণ ভাষা নয়। কিন্তু কোনো একটি টেক্সটের শব্দচয়ন স্থায়ী বা আবদ্ধ লৌকিক ভাষার অনুগামী কি না সেটাই বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হচ্ছে সেই লৌকিক ভাষার মধ্যে এমন কোনো পথ তৈরি করা যায় কি না যেখান দিয়ে নতুন ও অপরিচিত ভাষার অর্থও আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বস্তুত কবিরা এই কাজই করে থাকেন। তাঁদের বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগের মধ্যে আমরা পরিচিত অর্থকেই নতুনভাবে পাই। এ কথা দেরিদা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তাঁর শব্দ প্রয়োগের চাতুর্য, প্রকাশের বিশেষ কৌশল আমাদের কাছে অপরিচিত মনে হলেও তার সুরটি আমাদের পরিচিত সাধারণ ভাষার আবহের মধ্যেই বাঁধা আছে। সিম্বলিস্টদের মতো তাঁর কাছেও ভাষা তার নিজস্ব দীপ্তিতেই আলোকিত। হয়তো এই কারণেই প্রচলিত দার্শনিক ভাবনা থেকে তিনি দূরে সরে গিয়েছেন। দার্শনিকরা

সাধারণত শব্দ-যোজনাকে অর্থ প্রকাশের সঙ্গে অন্বিত করেন। কিন্তু দেরিদা এই শব্দার্থ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বিশেষভাবে যা তুলে ধরতে চেয়েছেন তা হচ্ছে ভাষার নিজস্ব সংগীত ও ধ্বনি, নিজস্ব শক্তি ও বিন্যাস। ভাষা তাই তাঁর কাছে দি প্লে অফ সিগনিফায়ার্স—যেখানে শব্দের বিন্যাস ধ্বনি বা সংগীতনির্ভর। কবিরা এইভাবেই তাঁদের শব্দ নির্বাচন করেন। ভাষার এই অন্তর্লীন সংগীতময়তাকে দেরিদা প্রাধান্য দিয়েছেন বলেই হয়তো সাহিত্যমহল তাঁকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু ভাষাকে তার নিজস্ব শক্তিতে দেখার এই প্রবণতা, শৈলী, অচেনা আলোয় ভাস্বর শব্দ দিয়ে ইস্‌থেটিক ম্যাজিক তৈরি করার এইসব ঝোঁক কি আমাদের সত্য থেকে সরিয়ে দেয় না, যে সত্য দার্শনিকের অন্বিষ্ট বস্তু, যে সত্যকে প্রকাশ করার মধ্যেই তিনি ভাষার বিশেষ উদ্দেশ্যটি খুঁজে পান? এ কি রেটোরিকাল এফেক্টের কাছে সত্যকে বিসর্জন দেওয়া নয়? প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যায়, ভিটগেনস্টাইনও কখনো কখনো ভাষা ব্যবহারে এই সূক্ষ্ম চাতুর্য, এই নাটকীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কখনো কখনো বক্তব্য থেকে বচন-কুশলতা, বিমূর্ত দার্শনিক ভাবনা বা বিষয় থেকে প্রকাশ- নৈপুণ্যের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেছেন : "What I'm doing is also persuasion. If someone says : 'There is not a difference' and I say : 'There is a difference' I am persuading. I am saying 'I don't want you to look at it like that." (*লেকচার্স অ্যান্ড কনভারসেশনস্ অফ ইসথেটিক্স, সাইকোলজি অ্যান্ড রিলিজিয়াস বিলিফ*) ভিটগেনস্টাইনের এই বক্তব্যের মর্মার্থ এই : কোনো দার্শনিক ভাবনা যথার্থ বা সত্য কি না সেটি তেমন বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হচ্ছে বাগ্‌ভঙ্গির কারুকাজ, চাতুর্য ও নাটকীয়তাকে আশ্রয় করে সেই ভাবনাটি পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায় কি না; এমন করে পরিবেশন করা যায় কি না যাতে সেই ভাবনা পাঠককে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করে। সত্য বড়ো নয়, বড়ো হচ্ছে ভাষার জাদু। বলা বাহুল্য, এই ধরনের কথা দার্শনিককে মুগ্ধ করতে পারে না। এবং তারই প্রতিফলন দেখেছি প্লেটোর এই বিশিষ্ট বয়ানে :

"The poetic-workman dabs on certain colours by using the words and phrases of the various arts......so that others, as ignorant as himself, taking their view from words, think he is speaking magnificiently...so great is the natural charm in this manner of speaking." (*রিপাবলিক*, বুক ১০)।

কিন্তু দার্শনিকদের এই ধরনের আপত্তির বিরুদ্ধে দেরিদার স্বপক্ষে দু-একটা কথা যে বলার নেই তা নয়। দার্শনিক তত্ত্ব বা সত্য নিতান্তই অসার, বা দর্শনের কোনো গুরুত্ব নেই এমন দাবি তিনি করেননি। কিন্তু সব কিছুর আগে প্রয়োজন যে ভাষায় দার্শনিক কথা বলেন সেই ভাষার গভীরে প্রবেশ করা, খুঁজে দেখা তার শক্তি কোথায় নিহিত আছে। দেরিদা শুধু এইটুকুই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। দেরিদার বিনির্মাণের আর একটি বৈশিষ্ট্য মুখের ভাষার (spech) চেয়ে লিখিত ভাষাকে (writing) বেশি গুরুত্ব দেওয়া। আমরা জানি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য ঘরানায় কথাকে লেখার চেয়ে বেশি মূল্য

দেওয়া হয়েছে। এর কারণ কথা বলার সময় বক্তা ও শ্রোতা দুজনেই উপস্থিত থাকে। বক্তা, শ্রোতা ও কথার মধ্যে কোনো স্থান বা কালের দূরত্ব নেই। বক্তা জানে সে কথা বলছে এবং একই সঙ্গে শ্রোতা জানে বক্তা তার সঙ্গে কথা বলছে। বক্তা কী বলতে চায়, প্রকাশ করতে চায় কোন্ অর্থ, শ্রোতার কাছে তা পরিস্ফুট করবার জন্য সে নিজেই উপস্থিত থাকে। শ্রোতার বুঝতে অসুবিধে হলে বক্তা নিজেই সে অসুবিধা দূর করে দিতে পারে। কিন্তু কোনো লেখা যখন আমরা পড়ি তখন লেখক অনুপস্থিত থাকেন। সুতরাং অনেক সময় তাঁর অভিপ্রায় ধরতে না পারলে সেটি ধরিয়ে দেবার জন্য তাঁকে পাওয়া যায় না। এইজন্য প্লেটো তার *ফিড্রাস* গ্রন্থে বলেছেন, লেখা কথার চেয়ে নিকৃষ্ট। কেননা লেখক তাঁর অভীষ্ট অর্থটি পৌঁছে দেবার জন্য পাঠকের কাছে থাকেন না। প্লেটো বা পাশ্চাত্য দার্শনিকদের এই বিশ্বাসের অনুরণন আমাদের দেশেও দেখতে পেয়েছি। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী বা ব্যাকরণ কথ্য সংস্কৃত ভাষার ধ্বনির উপর নির্ভর করেই রূপায়িত হয়েছে। বেদে, আত্রেয় আরণ্যকে বলা আছে, যদি কেউ মাংস খায়, বা মৃতদেহ দেখে, অথবা লেখায় ব্যাপৃত থাকে তবে সে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করার অধিকারী নয়। মুখের ভাষার প্রতি এই অবিচলিত আস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেরিদার বিপরীত ঝোঁক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কথা ও লেখার এই দুটি বিপরীত প্রান্তের শেষেরটি দেরিদার বেছে নেওয়ার এই বিনির্মাণ নিছক এক চমক সৃষ্টি করার জন্য নয়। এর পিছনে আছে এক গভীরতর যুক্তি। কোনো একটি শব্দের যে অর্থ সেটি সর্বক্ষেত্রেই এক হবে। সুতরাং কোনো বক্তা সেই কথাটি বলার জন্য যদি উপস্থিত নাও থাকেন, যদি তাঁর অভিপ্রায় আমরা না জানতে পারি তবু সেই কথাটির অর্থহানি ঘটবে না। অর্থাৎ শব্দের অর্থ বুঝতে বক্তার সান্নিধ্যের কোনো প্রয়োজন নেই। একটি ভাষাকে আয়ত্ত করতে পারলেই তার শব্দের অর্থও আমাদের আয়ত্তে আসবে। লিখিত ভাষা (writing) এই সত্যটিকে তুলে ধরে বলেই দেরিদা একে প্রাধান্য দিয়েছেন।

২

উপরের আলোচনা থেকে হয়তো এ কথা উঠে আসে যে দেরিদা তাঁর বিনির্মাণে সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করতে চান। কিন্তু কেমনভাবে তৈরি হবে সেই সেতু? এর অর্থ কি এই—সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে বিভাজন রেখা তিনি একেবারে তুলে দিতে চান? প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক জোনাথন কুলার অবশ্য তা মনে করেন না। তাঁর মতে, বিনির্মাণের উদ্দেশ্য সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য একেবারে তুলে দেওয়া নয়, বরং তাদের সাযুজ্যকে নতুনভাবে দেখা। হাইডেগারের মতো কুলারও দার্শনিক (thinkers) ও কবির (poets) মধ্যে একটি তফাত রাখতে চান। এবং তারপর বলতে চান, এই স্বতন্ত্রতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যে এক গভীরতর পারস্পরিক নির্ভরতা আছে সে কথা উপস্থাপিত করাই বিনির্মাণের উদ্দেশ্য। এই মেলবন্ধন তুলে ধরতে গিয়ে কুলার বলেছেন, যেকোনো দার্শনিক রচনাই 'fictive rhetorical construct' : সেখানে

প্রাণ পায় চিন্তনের এক বিশেষ রীতি, এক বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গি, কল্পনার এক বিশেষ অবয়ব। অপরদিকে কোনো সাহিত্যরচনা পাপ (evil), পুণ্য (good), নিত্য (eternity), অনিত্য (temporal) ইত্যাদি দার্শনিক অনুধ্যানকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। অবশ্য সংরক্ষণশীল দার্শনিক বা কবির কাছে এ ধরনের কথা অত্যন্ত গোলমেলে হয়ে ওঠে। সংরক্ষণশীল দার্শনিক মনে করেন তাঁর ভাষা বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ, কবিতার ভাষার ধারে-কাছেও তা আসে না। তিনি মনে করেন, তাঁর রচনা কোনো অর্থেই 'fictive rhetorical construct' নয়। অন্যদিকে সংরক্ষণশীল কবি মনে করেন, তাঁর কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত সংগীত কোনো দার্শনিক তত্ত্বের ভারে নিপীড়িত নয়। সুতরাং তাঁরা যখন শোনেন যে তাঁরা পরস্পরের কাছে ঋণী তখন স্বভাবতই তাঁরা শিহরিত হয়ে ওঠেন।

তবে দার্শনিক রিচার্ড রোর্টির মতো আমারও মনে হয়, কুলারের ব্যাখ্যা তেমন সংগত নয়। আমার মনে হয়, দেরিদা দর্শন ও সাহিত্যের মধ্যে সীমারেখাটিই তুলে দিতে চান। তাঁর কাছে দর্শনও সাহিত্য। সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জিওফ্রি হার্টম্যান বলেছেন :

"Is not literary language the name we give to a diction whose frame of reference is such that the words stand out as words (even as sounds) rather than being at once, assimilable meanings?"

অর্থাৎ হার্টম্যানের মতে, ভাষাকে নিছক প্রচলিত অর্থের বাহন হিসেবে না দেখে সাহিত্যিক ভাষার নিজস্ব শক্তি উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। এই সাহিত্যিক মুহূর্ত দর্শনেও আসে যখন দার্শনিকের ভাষা বা প্রত্যয় ব্যবহারের বিরুদ্ধে সংশয় ঘনিয়ে আসে। তখন আবার ভাষার দিকেই তাকাতে হয়—পুরোনো শব্দের মধ্যে খুঁজতে হয় নতুন অর্থ, অথবা ব্যবহার করতে হয় নতুন শব্দ। এই সময়ে শব্দ নিছক শব্দ হিসেবেই দাঁড়িয়ে থাকে—কেননা তার সর্বজনগ্রাহ্য সুনির্দিষ্ট ব্যঞ্জনা তখনও তৈরি হয়নি। সুতরাং দর্শনে এই নতুন ভাষা ব্যবহারের অবকাশ সব সময়ই থাকে—এমন ভাষা যা নতুন বলেই তা দিয়ে প্রচলিত দার্শনিক প্রত্যয়গুলি তেমন ধরা যায় না, এমন ভাষা যার মধ্য দিয়ে ক্রমশই ধরা দিতে থাকে এক নতুন দার্শনিক বিকল্প।

অবশ্য দর্শন বলতে যদি দার্শনিকরা যা বুঝে এসেছেন তাকেই বোঝায় তবে এই সাহিত্যিক মুহূর্ত একেবারেই নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দেরিদা তাঁর *মার্জিনস অফ ফিলোসফি*-তে বলেছেন, দার্শনিকের স্বপ্ন এক সম্পূর্ণ ও শাশ্বত ভাষার, যার প্রত্যয়গুলি অপরিবর্তনীয়। আর এই প্রত্যয়গুলি অপরিবর্তনীয় বলেই এর বিরুদ্ধে সংশয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বলা বাহুল্য, দেরিদা কিন্তু দার্শনিকদের ব্যবহৃত তথাকথিত নিত্য প্রত্যয়ের বিরুদ্ধেই কথা বলেছেন। তাঁর মতে অনৈতিহাসিকের প্রতি দার্শনিকের এই অবিচলিত বিশ্বাস তেমন দৃঢ়ভিত্তিক নয়। দর্শনের কোনো কোনো বই যখন আমরা পড়ি তখন এক বিশেষ দার্শনিক সংস্কারের প্রভাবে আমরা একটি বক্তব্যকেই মূল বা স্থায়ী বলে মনে করি। কিন্তু বইটি পড়তে গিয়ে ফাঁকে ফাঁকে এমন কথাও পাই যা সেই মূল

বক্তব্যের বাতাবরণ ক্ষুণ্ন করে। দেরিদা এই মার্জিন বা ভিন্ন সুর অথবা রোর্টির ভাষায়, 'literary openness'-এর দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই মার্জিন বা ভিন্ন সুর আবার নতুন করে, নতুন ভাষায় সাজানো যায়। তখন বইটির পট পালটে যায়—ফুটে ওঠে নতুন ছবি। এবং এর অর্থ দার্শনিকের কোনো কিছুকে অপরিবর্তনীয় বলে মনে করার বিশেষ প্রবণতার বাইরে চলে আসা। দেরিদা এইভাবে নতুন করে লেখারই পক্ষপাতী। কিন্তু এর একটি সংকট আছে। মার্জিনের উপর জোর দিয়ে রূপান্তরহীনতার ঘেরাটোপে বন্দী দর্শনের কথা তিনি ভুলে যেতে পারেন যেমন করে নির্যাতন-মুক্ত দাস তার অত্যাচারী প্রভুকে ভুলে যায়। যদি তাঁর মনোভাব এই হয় তবে বলতে হয় দর্শনের সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটেছে। কিন্তু তাহলে দেরিদার লেখার প্রধান ভরটিই আর থাকে না। কারণ যদি কেউ দর্শন সম্বন্ধেই কথা বলে থাকেন, যদি কেউ থাকেন দর্শনই যার মুখ্য উপজীব্য—তবে দেরিদার নামই মনে আসবে। আবার অন্য দিকে দেরিদা যদি অপরিবর্তনের প্রতি দার্শনিক ঝোঁককে আঘাত দিতে চান তবে তিনি যখন বলেন 'total, closed vocabulary' সম্ভব নয়, তখন সেটিকেও এক পরিবর্তনহীন, প্রশ্নাতীত সত্য বলে গণ্য করতে হবে। তাহলে মার্জিনের আর কোনো গুরুত্ব থাকবে না। দেরিদা যে এই সংকট সম্পর্কে অবহিত নন তা নয়। তাই এই সংকট সমাধানে তিনি *মার্জিনস্ অফ ফিলোসফি*-তে বলেছেন :

"...a new writing must weave and interlace these two motifs of deconstruction which amounts to saying that one must speak several languages and produce several texts at once."

অর্থাৎ তিনি বলতে চান আমরা একই সঙ্গে দর্শনের ভিতরে থাকতে পারি এবং বাইরে আসতে পারি। দর্শনের ভিতরে থাকার অর্থ—তার ব্যবহৃত প্রত্যয়কে বোঝার চেষ্টা এবং তার অসংগতিকে তুলে ধরা। এবং এ কথা বলার বোধহয় প্রয়োজন নেই যে এই বাদ-প্রতিবাদ, যুক্তি ও বিরুদ্ধ যুক্তি তখনই সম্ভব হয় যখন দার্শনিক যে স্ট্যান্ডার্ড ভাষা ব্যবহার করেন তার অংশীদার হই আমরা। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা এই দার্শনিক আবহাওয়ার বাইরে এসে নতুন ভাষা ও রীতিতে তুলে ধরতে পারি জগৎ ও জীবন বিষয়ে অন্য বিকল্প, অন্য দিগন্ত—প্রচলিত ভাষা ও যুক্তি দিয়ে যাকে বোঝা যায় না, কিন্তু যার অমোঘ স্বভাব ও আকর্ষণে প্রাণিত হয়ে উঠি আমরা। এই কথাটি আরও একভাবে বলা যায়। যেকোনো দার্শনিক যুক্তি ভাষা দিয়েই প্রকাশিত হয়। এবং সেই ভাষার অংশীদার না হলে দার্শনিক যুক্তিটিকে বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সুতরাং দর্শনের ঐতিহ্য যে ভোক্যাবিউলারি লালন করে তাকে বুঝতে গেলে সেই ভোক্যাবিউলারির বাইরে আসা চলে না। কেননা, বাইরে এলেই দর্শনে প্রত্যয়ের যে যুক্তির কাঠামোটি তৈরি হয়েছে তাকে ধরা আর সম্ভব হয় না। কথাটির অর্থ এই যে দার্শনিক যে প্রত্যয় বা যুক্তি ব্যবহার করেন তাকে বোঝা বা তাকে খণ্ডন করা—এসব তখনই অর্থবহ হয় যখন দার্শনিক যে ভাষা ব্যবহার করেন তার সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গ

সংযোগ থাকে। কিন্তু তা হলে দর্শনের ট্র্যাডিশনের বাইরে আসা কী করে সম্ভব হয়—যা দেরিদার অন্যতম অভিপ্রায়? এই সংশয়ের উত্তরে দেরিদার নিম্নলিখিত মন্তব্যটি বিশেষ ইঙ্গিতবহ :

"To make enigmatic what one thinks one understands by the words 'proximity' 'immediacy'......is my final invention in this book." (*অফ গ্রামাটোলজি*)

অর্থাৎ দেরিদা বলতে চান যুক্তি দেওয়াই ভাষার একমাত্র কাজ নয়। ভাষা দিয়ে আরও অনেক কিছু করা যায়—যেমন আদেশ দেওয়া, অনুরোধ করা এমনকি কৌতুক করাও। যদি তাই হয়, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই। দর্শনে ব্যবহৃত প্রত্যয়ের কাঠামোটি যে যুক্তি-শৃঙ্খলে গড়ে ওঠে তাকে খণ্ডন করতে গেলেও সেই দর্শনের ট্র্যাডিশনের মধ্যেই থাকতে হয়। দেরিদা কখনো কখনো এই কাজ করেছেন। আবার এই ট্র্যাডিশনের বাইরেও তিনি আসতে পেরেছেন যখন তিনি যে প্রত্যয়ের আবহে দার্শনিক পরিমণ্ডলটি গড়ে উঠেছে তার অসারতা তুলে ধরেছেন বিরুদ্ধ যুক্তি দিয়ে নয়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও তীক্ষ্ণ কৌতুকে। যার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এই কথাই যে দর্শনের অপরিবর্তনীয় প্রত্যয় কাঠামোটি একটি বিশুদ্ধ প্রহেলিকা।

যোগসূত্র, জানু.—মার্চ ১৯৯৪

প্রাক্-রামমোহন যুগে কোম্পানির শাসনের প্রতি কয়েকজন বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মনোভাব

গৌতম ভদ্র

শুন সভে এক মজা বাঙ্গালার যতেক রাজা
ছিল সুভেদারীতে প্রধান।
ইতিমধ্যে কোন ধাতা সৃষ্টি কৈল কৈলকাতা
সাহেবরূপে দেবতা অধিষ্ঠান।
শিরে টুপি মুজা পায় হাতে বেত কুরশি গায়
এক বর্ণ দেখ সভাকার
বুঝিলাম অনুভাবে অবতার দেবতা সভে
ভূতলে করিলা অধিকার।
ইন্দ্রসম পদ পায়া সঙ্গে পরিষদ লইয়া
বড়সাহেব বসিলা কইলকাতা।[১]

এখানে কোম্পানি যেন দেবলোকের অধিবাসী। নানা গোত্রের দেবতার মধ্যে আর একটি দেবতা সংযোজিত হতে বাধাই বা কী? ধর্মঠাকুরের পালায় যেরকম মুসলমান শাসনকে দেবতার রূপান্তরের মাধ্যমে স্বীকার করা হয়, পাবনার দেশজ কবি রামপ্রসাদ উনিশ শতকের রাজনৈতিক পালাবদলকে একই ধাঁচের মধ্যে বোঝার চেষ্টা করেছেন। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, টুপি মোজা পরা বেত্রধারী সওদাগর শাসক ইন্দ্রের মতোই জবরদস্ত, নূতন শহর তৈরি করছেন, দৈব ক্ষমতা না থাকলে কেউ কি এত তাড়াতাড়ি জাঁকিয়ে বসতে পারে? এঁরাই নূতন বিধাতা, নয়া পোস্টা, এঁদের কাছেই আসতে হবে, তা আপনি দিকপাল পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননই হন বা নাম-না-জানা বৈদ্যনাথ দেবশর্মাই হন। তারই এক অকপট স্বীকৃতি শোনা যাক,

সেই গ্রাম করি ধাম থাকিলাম পরে
নাহি ধন নয় ঋণ পরিজন তরে।
নাহি ভাগ্য দিনযোগ্য উপভোগ্য নাই
তেকারণে ভাবি মনে কোন স্থানে যাই।
কলিকাতা ধনমাতা লোকে খ্যাতা শুনি
গিয়া তথা দেখি যথা তথা বৃথা গুণী।
ভাগাবন্ত নাহি অন্ত নাহি সন্ত পুণ্য

দানপাত্র যাইমাত্র কিবা চিত্র অন্য।
যতো ধীর কোম্পানির চাকুরির আশা
তাহা দেখি উর্ধ্ব আঁখি নাহি মুখি ভাষা।
... ...
অনুপায় দেখি তায় কেহ কয় বাণী
কোন স্মৃতি পাঁচালিতি কর পুতি শুনি।
লোকে জানে এ কারণে কালগুণে ভাষা
আশা পূর্ণ হবে তূর্ণ যাবে শীর্ণ দশা॥[২]

এইভাবে কোম্পানির ক্ষমতার স্বীকৃতি কীভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতকের গোড়ায় ইংরেজি শিক্ষায় অনভিজ্ঞ বাংলাভাষী দেশজ বুদ্ধিজীবী সমাজ তাঁদের চেতনায় আত্মস্থ করেছেন, তার কয়েকটা দিক দেখানোই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গক্রমে প্রকীর্ণ কবিতা গাথা ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে লেখা কয়েকটা বইকে আর একবার খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। খ্রিস্টাব্দ ১৮১৫-১৬ সনের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ। কারণ, এই সময় নাগাদ রামমোহন রায় কলকাতায় এসে তাঁর কাজকর্ম শুরু করেছিলেন। তাঁর সেই সময়কার চেতনায় কোম্পানির শাসনের মূল্যায়নে এক রূপান্তর ঘটে গেছে। সেই রূপান্তরের প্রতিবিন্দুরূপেই প্রাক্-রামমোহন যুগে লিখিত বাংলা রচনায় কোম্পানির শাসনের প্রতি মনোভাবের ছবিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিশেষে, কোম্পানির শাসনের মনোভাবকে কেন্দ্র করে প্রাক্-রামমোহন যুগে বাংলাভাষী দেশজ বুদ্ধিজীবী সমাজের ইতিহাস-চেতনা প্রসঙ্গে কয়েকটা সাধারণ মন্তব্য করা হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের গাথায় কোম্পানির শাসনের অবয়ব স্পষ্ট নয়, তার অস্তিত্ব অনেকটাই ধূসর। কোম্পানি দূরলোকের বাসিন্দা। রঙ্গপুরের 'ঢিং'এর উপর রাজবংশী কবি রতিরাম দাসের বহু আলোচিত কবিতা শেষ হয়েছে এই ছত্র কয়টিতে,

ইংরাজের হাতে রাজ্য দিলেন চক্রপাণি।
সুবিচার করি গেল আপনি কোম্পানি॥
ইংরাজ বিচার করে এজলাস করি।
একে একে ফাটকেতে রাখে ঢিং-এ ধরি॥[৩]

ইজারাদার দেবী সিংহের জুলুম, ইটাকুমারীর রাজা শিবচন্দ্রের নেতৃত্বে রায়তের বিদ্রোহ একটা 'ঘটনা'। কোম্পানি যেন তার সঙ্গে যুক্ত নয়, কোম্পানি দূরতর কর্তৃত্ব মাত্র। রঙ্গপুরের প্রজাবিক্ষোভে দেবী সিংহ পালিয়ে যায় এবং দেবতার আশীর্বাদে দেবী সিংহকে শাস্তি দিয়ে কোম্পানি ন্যায়ধর্ম পালন করে। প্রজার প্রত্যাশায় কোম্পানির শাসন ন্যায়ানুগত, তার এজলাসে প্রজাবিক্ষোভে সাড়া মেলে।

অবশ্য নিত্যদিনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার নিরিখে এই জাতীয় প্রত্যাশায় ভাটার টানও দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের বর্ধনকুঠি জমিদারির ঘোড়াঘাট মৌজার মহীপুর গ্রামের প্রজা কৃষ্ণহরি দাস ও লেখন্দার তাহের মামুদ ১১৯০ সনে গুডল্যাড সাহেবের কীর্তিকলাপ

বর্ণনা করেছেন।[৪] গুডল্যাড সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় কুচক্রী দেওয়ান রামবল্লভ রায় রাজার মহাল নিলামে তুলে নিজে কিনতে চাইলে, প্রজাবিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এবং গুডল্যাড সাহেব প্রজাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। কবিতার মোদ্দা কাহিনি হল এই। এই কবিতায় গুডল্যাড সাহেব এক অর্থলোলুপ আমলা মাত্র। মালগুজারি যেন-তেন প্রকারে আদায় করাই গুডল্যাডের লক্ষ্য। রামবল্লভ রায়কে তাই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়,

সাহেব বলে শুন তুমি সুবুদ্ধি দেওয়ান,
তুমি যা বলিবে তাহা না করিব আন।
বন্দোবস্ত করি দিব যে হয় হাসিল
আপনি করিয়ে দেব টাকার শিজিল।

তার তরফ থেকে দেওয়ান জানায়,

দেওয়ান বলে সাহেব তুমি কিসের দিবে কমি,
চল্লিশ হাজার টাকা বেশী দিব আমি।
তাউৎ বেশী দিল নেকি, সাহেবের হুজুর;
উকিল রাখিয়া দিল মুখুর্জি ঠাকুর।
সাহেব বলে নৃপতি ফিরিয়া যাও ঘরে;
দেওয়ানের বন্দোবস্ত কভু নাহি নড়ে।[৫]

প্রজারা 'ইনছাফের' দোহাই দেয়, ঘুষ নেবার অভিযোগ তোলে। সাহেবের সাফসুতরা জবাব,

সাহেব বলে যা করেছি, আর কি তাহা নড়ে;
একটা লোক যোগ্য নাই, ন আনা সংসারে।
যত দেখ সব জাসুরে, গোলাম টিঙের পালা
সবে ভরে আপন ছালা, রাজার হাতে দেয় খোলা।
তবে তোরা সেই দেওয়ানে খারিজ করিতে চাও,
অমনি এক করিৎকর্মা দেওয়ান দেখি দাও।

করিৎকর্মা দেওয়ান বলতে কোম্পানির কালেক্টর গুডল্যাড কী বোঝেন, তাও খুব চাঁছা-ছোলা-ভাষায় বলা হয়েছে :

সাহেব বলে যদি দেওয়ানকে খারিজ করি,
তবে আর ন আনার নাহি পাব কড়ি।[৬]

এই সাহেব কিন্তু ভীতুর ডিম, জোটবদ্ধ রায়তের সামনে গুটিয়ে যায়।

সাহেব রহিল একা কার নাহি পায় দেখা,
যত দেখে রায়ত মণ্ডলী;
ভয়ে শুকাইল মুখ, থর থর কাঁপে বুক,
কহে সাহেব দুই হস্ত তুলি।
যা তোরা বলিবা ভাই, সেই ইনছাপ করে দেই,
দাও পথ কাছারী যাই।

তবে যদি তোরা বল, রামবল্লভ নহে ভাল,
ক্ষতি কি খারিজ করে দেই।

বিবির কাছে ফেরত গিয়ে সাহেবের আর এক মূর্তি। বিবির পরামর্শ অগ্রাহ্য করে সাহেব ভাবে যে, প্রজা বিক্ষোভের পেছনে আছে রাজার উসকানি। পালের গোদাকে টিট করলেই সব ঠান্ডা হয়ে যাবে।

খাপ্পা হয়ে বৈসে সাহেব, জ্বলন্ত আগুনি
রাজার বলে প্রজা কোন্দে বুঝি অনুভবে,
রাজাকে উঠায়া দিলে প্রজা কি করিবে।

সাহেব রাতারাতি জমিদারকে বরখাস্ত করলেন। ফলে এক বিশাল জমায়েত করে প্রজারা কাছারি ঘিরে ফেলেছিল। ভয়ে জড়সড় সাহেব দেখল,

একটি দুইটি করিয়া রায়ত ধরিল সারি,
কাচারি বেড়িয়া রায়ত হল হাজার চারি।
হেন কালে সাহেবের দৃষ্টি প'ল পাছে
দেখে কেবল রায়ত যত, অন্য কেহ নাই কাছে,
পূর্বদিনের ধমক্ চমক্ সব আছে মনে
চাবিদিকে চাহে সাহেব চঞ্চল নয়নে।[৭]

রায়তের শক্তির কাছে সাহেব মাথা নোয়াল কারণ 'রায়ত লইয়া সবার ঠাকুরাণী'। তাই,

সাহেব বলে আজ হতে দেওয়ান খারিজ হইল.
শুনিয়া সকল প্রজা স্বগ্‌গ হাতে পাইল।
মহাশব্দ করি সবে, ঝাকি দিয়া কয়
জীয়া যাক সাহেব তোমার বিবির হউক জয়।

লক্ষ করার বিষয় যে, গোটা কবিতায় গুডল্যাড বাইরের লোক। তার ধনকাঙালপনায় কতকগুলি পুরানো সম্পর্কে টান পড়েছিল, কতকগুলি প্রথা বিপর্যস্ত হয়েছিল। তার রকমসকম প্রজার বোধ ও ন্যায়নীতির বিরুদ্ধে। তাই তারা নতুন শাসককে বার বার প্রশ্ন করে,

কেতাপ দেকি কর ইনছাপ, তবে কৈন এমন;
রিশপৎ খুরি কাম কর, সাহেব তুমি কেমন।

বাইরের লোক গুডল্যাড অবশেষে সমষ্টির কাছে নতি স্বীকার করল, দেশজ সমাজ তার ভারসাম্য খুঁজে পেল। সাহেবের জয়ধ্বনিতে, আল্লার 'জোকারে' কাহিনি শেষ হল।

সাহেবের ব্যবহার আলাদা, ন্যায়বোধ আলাদা; এর স্বীকৃতি থাকলেও কবিতায় কোথাও কোম্পানির সামগ্রিক ক্ষমতার অবয়বকে ধরার চেষ্টা নেই। কবির চোখে, গুডল্যাড স্থানীয় শাসক ও আমলা, তার অর্থগৃধ্নুতার সঙ্গে ডিহিদার মামুদ শরীফের মৌলিক পার্থক্য নেই। প্রজারা সাহেবকে নিজেদের মতো করে কব্জা করেছে। সাহেবকে মনুষ্যপদবাচ্য করে দেখাবার জন্য, প্রজাদের বোধের মধ্যে আনার জন্য বিবিকেও আনা হয়েছে, সাহেব

ও বিবির কথোপকথনও সাজানো হয়েছে। ফলে এই কবিতায় সাহেব দেবগুণে ভূষিত নয়, বরং প্রজার বোধের সঙ্গে মানানসই করেই তার লৌকিক অবয়ব তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এখানে গুডল্যাড স্বয়ং কোম্পানি নন, বরং এক আমলা মাত্র। কবির ইঙ্গিত এক্ষেত্রে স্পষ্ট। কলকাতা ও রঙ্গপুরের মধ্যে বার বার ফারাক দেখানো হয়েছে।

গেল সীতারাম রায় কলিকাতা সহরে;
রাজায় আরজী দিল, সাহেব হুজুরে।
সাহেব বলে, এখানে আসুক গৌরীনাথ,
নয় আনার বন্দোবস্ত করিবে সাক্ষাৎ,
গুডল্যাড সাহেব হেথা রঙ্গপুরে থাকিয়া,
ইনজিল পরওয়ানা পত্র পাঠালে লিখিয়া;

আবার,

তবে রাজা ফিরিয়া চলিল নিজ ঘরে;
শুভ দিনে যাত্রা করে কলিকাতা সহরে।
রামবল্লভ বায় হেথা ভাবা গোণা করে।
কি কারণে গেল রাজা কলিকাতা সহরে।[৮]

কলিকাতায় আছে সাহেব হুজুর, রাজা এবং রঙ্গপুরে তারই সাক্ষাৎ আমলা গুডল্যাড। বজ্জাতিটা গুডল্যাডের, কলকাতার হুজুরের নয়। এক্ষেত্রে থাকবন্দি ক্ষমতা বিন্যাসের বর্গেই প্রজা-কোম্পানির জমানাকে বুঝেছে; দূর কর্তৃত্বের আমলা প্রতিনিধি হিসাবে আমলা নিজের মনোমতো কর নেয়, বাড়াবাড়ি করে। চাপ দিয়ে তাকে শায়েস্তাও করা হয়। কিন্তু সামগ্রিক কাঠামোর রদবদল করার প্রয়োজন হয় না।

কোম্পানি শাসনের একেবারে আনকোরা নতুন অভিজ্ঞতাকেও পুরানো ক্ষমতা বিন্যাসের উপমায় ও রূপকল্পে বোঝবার চেষ্টা করেছেন ১২২০ সনে পাবনা জেলার নাকালিয়া নিবাসী গ্রাম্য কবি রামপ্রসাদ মৈত্রেয়। তাঁর লেখা দুটি কবিতারই বিষয় ফৌজদারি আইন, পিনাল কোড।[৯]

দিল্লী হৈল কৈলকাতা বাদশা বসিলা তথা
বড় সাহেব খিতাব যাহার
বাঙ্গলায় কৈরা দিলা পাঁচ আফিল ছাব্বিশ জিলা
কেলেক্টর জজ ফৌজদার।
কেলেক্টর তহশীলেতে জজ কর্ত্তা আদালতে
ফৌজদারী আইনমতে লিখে।
চুরি ডাকাতি ফেলশানি মাইরপীট লুট খুনি
এ সব ফৌজদার মোতালকে।[১০]

এবং উদ্দেশ্য মহৎ, সন্দেহ নেই। কারণ ইংরেজ শাসনের মূল গর্বই হল আইনের শাসন।

লোকের প্রসন্ন দশা বিধাতা পূরাইলা আশা
জজ আইলা ধর্ম্মাবতার।

হেন কর্ম্ম করি সাধ্য বাঙ্গালীর সুখে রাজ্য
খোসনামীতে হৈল দীপ্তকার।
বুঝিলাম হক বটে জজ সাহেব ধর্ম্ম বটে
চিত্রগুপ্ত (?) সঙ্গেতে দেওান।[১১]

কিন্তু বিধি বাম। শাপ লেগেছে।

প্রজাক ভরতের সাঁপ কলিতে প্রধান তাঁপ।[১]
তাহে ভালমন্দ সব ঘটে।

কারণ এক নতুন পেশার উদ্ভব, উকিল বা আইনজীবীর দল। তাদের মোক্ষম নাম দেওয়া হয়েছে, বাকরণ্ড বা বাক্‌বেশ্যা। এরাই বিচারক ও প্রজার মধ্যস্থ, এদের চক্রান্তেই নয়ছয় হয়। তারা সাহেবের কাছে জুজু, এবং মক্কেলের কাছে যম।

আসামীর কর্ম্মমতে যে হয় জজের হাতে
বাকরণ্ডের নাহি কিছু ফল।
জোড়হাতে থাকে হয়া ধন্দ।
তবে যদি খাড়া হয় ডরে কিছু নাহি
সাহেব যদি পুছে তাখে না বুঝিয়ে মাথা ঝাঁকে
সেলাম করে বল্যা খোদাবন্দ।
যদি সাহেব হয় খোস কিবা কারো প্রতিরোধ
বুঝিতে না পারে থাকি তথা
বাককণ্ড বাহির হৈল আসামীকে ডাক্যা কৈল
আজি হৈল তোমাদিগের কথা।
সে কথার নাহিক তত্ত্ব যাহা বোলে তাহই সত্য
অন্ধলোকে যেমতে দেখায়
সর্ব্বলোকে থাকে পাছে কেহ নাহি যায় কাছে
উকিল আসি যে কিছু বুঝায়।[১২]

কিন্তু বাকরণ্ড আদালতেরই সৃষ্ট জীব। তাদের ভণ্ডামিটা খেদের একমাত্র কারণ নয়। সবচেয়ে বড়ো আক্ষেপ হল যে রাজা ও প্রজার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কোনো স্থান নেই, সব সময় পরের মুখে ঝাল খেতে ও খাওয়াতে হয়।

কোন বিধি হয়া ভণ্ড নির্ম্মাইল বাকরণ্ড
আমরা সভে গরদিশ পাই।
বাকরণ্ড যদি নইত তবে কি এমন হৈত
যার কথা কৈত যায়া সেই।
দারুণ বিধি আদালতে আরজি দিলা পরের হাতে
যশ শুনে উকিলের মুখে।
সাহেব যদি পুছে তারে তা না বুঝি সওাল করে
বাহিরে থাকিয়া মরি শোকে।[১৩]

এই আদালতি ব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের বিচ্ছিন্নতার উপলব্ধি গ্রাম্য কবি ধরার চেষ্টা

করেছেন, বিধির দোহাই দিয়েও সরাসরি আক্রমণ করেছেন আইনজীবীদের। আইনব্যবসাই তো নতুন যুগের অন্যতম প্রধান পেশা হয়ে জাঁকিয়ে বসেছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় কবিতায় রামপ্রসাদ মৈত্রেয় নিছক উকিলদের পেশার সমালোচনায় আবদ্ধ না থেকে সমগ্র আদালত ব্যবস্থার আবহাওয়াকে বর্ণনা করেছেন। নতুন ক্ষমতার দাপট, সন্ত্রাস ও প্রজার অসহায়ত্ব ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে। সমস্ত পটভূমি পূজার ও বলিদানের সাদৃশ্যে বর্ণিত হয়েছে। সাহেব জজ ও বাঙালি প্রজার মধ্যে এসেছে আমলারা।

সিরস্থার আমলা যারা মিছিল শিখিয়া তারা
সাহেব দিছেন প্রবোধ।
কেহ বা ফাটকে যায় কেহ বা খালাস পায়
কেহ বা দ্বারসায়রে সোঁপরদ॥

একেবারে সাজানো পাট।

শুন মিছিলের খণ্ড যবে বেলা চাইর দণ্ড
বৈসেন সাহেব কাজী সাথে।
মুন্সী রহিমুদ্দীসবে হৈতে বাড়ে বুদ্ধি
মিছিল শুনান লৈয়া হাতে॥
দক্ষিণে রামবাবু ডালী বাঞে মোল্লা গঙ্গাজলী
সমুখেতে বক্সী নাজির।
সঙ্গিনি সন্তরি পা(হা)রা আসামী ঘিরিয়া তারা
বাহিরেতে রাখয়ে হাজির॥[১৪]

এহেন দরবারে হৃৎকম্প হবেই। সবকিছুই উচ্চতর কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা; তার রীতি-নীতি প্রজার বোধগম্য নয়।

'তামাসিক যত লোকে বাহিরে থাকিয়া দেখে
দরবারে বৈসেছেন যমরায়।
যার ভাগ্যে যেবা হয় সে কথা প্রকাশ নয়
স্পষ্ট হয় সাহেব চৈলা গেলে॥
সমুখে কয়াদি আনি গোড়াগুড়ি নথি শুনি
যে লিখেন যাহার কপালে।[১৫]

রূপক ও উপমার মাধ্যমে দেবতা, উপাসনা আর বলির কথা এসেছে।

তবে শুন তার মজা যেমত হইল পূজা
প্রতিমা হইলা সাহেব আসি।
কাদিরা আসন করি সমুখেতে মেজ ধরি
পূজা লন পূর্ব্বদিকে বসি॥

'রহিমুদ্দী সুপণ্ডিত', তাই তিনি পুরোহিত। সবাই তটস্থ কারণ চুক ধরা পড়লে মুশকিল, যেন 'কার্যখানি শুদ্ধমতে হয়'। এই বিধিবদ্ধতায় আসামি বা রায়তের অবস্থাই কাহিল—

বাহিরে কাতলা গাড়া তাহ্যতে বান্ধিছে দড়া
বলি হৈল যতেক বৈষ্ণান

কবির চৈতন্যে বিচারের সব বিধি, সব কাজ এক অন্য উপমায়, অন্য অর্থে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তুলনার মাধ্যমে আপাতকে বদলানো হয় অন্য এক নিহিতার্থে।

খড়্গ হইল কোড়া বানাতে বান্ধ্যাছে গোড়া
খাঁড়াইত্ তার জাফর খালাসী॥
চন্দন হইল কালি পুষ্প হৈল কাগজগুলি
মেজের উপরে রাখে আনি।
নাশি কোশা টাট ছিপ শঙ্খ ঘণ্টা ধূপ দীপ
সবে বাদ্য বেড়ির ঝনঝনি॥
ক্রমাগত আগে পাছে আনিয়া মেজের কাছে
পুরোহিত পড়েন বচন।
শুন বচনের মর্ম্ম কৈরাছিলা এই কর্ম্ম
হৈয়াছিলা দ্বারে সমর্পণ॥[১৬]

উপমার সাহায্যে এক থেকে অপরটায় অন্তর অহরহ এই গাথায় চলেছে। আসামি বলি, ক্ষমতার কাছে তাদের ভাগ্য নির্ধারিত। আসামি হাজির যখন হয়, তখন

তেবাড়াতে ছিল বলি আনিয়া যে সবগুলি
বাহিরে রাখয়ে নিঘামান।

ত্রাসিত ও শাসিত বলির পাঁঠা মাত্র।

এই মতে মন্ত্র পৈড়া তবে বলি দেয় ছেড়ে
ভেটে নিয়া নাজির সমুখ।
চিটসহ্ বলি আনে একজনে দড়ী টানে
কোপ দেয় জাফর খালাসী॥

* * *

কোপের উপরে কোপ পড়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে
মৈলাম মৈলাম বাফ্কৈ বাফ্কৈ।।
ভারি কোপ উনচল্লিশ কার কোপ দশবিশ
পাঁঠা পাঁঠী নাহিক বিচার॥[১৭]

তবে এই তুলনার মধ্যেও কবি জানেন যে তিনি অন্য এক অভিজ্ঞতাকে নিজের চেনা জগতের বর্গে ধরবার চেষ্টা করছেন। তাই পাঁঠা-পাঁঠীর অবস্থার সরাসরি বর্ণনার পরেই মনে করিয়ে দেন,

পূজার বিধান আছে বলিদান হৈলে পাছে
খাপরেতে রুধির যোগায়।
এ পূজায় খাপরহীন পৃষ্ঠেতে রুধির চিন
সাহেব দৃষ্টি করিলে বিদায়॥

* * *

ভৈরা দিন পাঁচ ছয় এহি মতে পূজা হয়
যতেক থাকয়ে বন্ধু আন।
দ্বারের হুকুম গ্রন্থ যাহা বোল তাই অন্ত
তবে হয় পূজা সমাধান।

তাই 'ধন্য সাহেব অবনীতে চোর ডাকাত বিনাশিতে' কার্যবিধি চালু করেছেন। সাহেবের পোষকতায় নানা দেশজ আমলার ক্ষমতার রবরবা গ্রামস্থ প্রজা অনুভব করছেন। তাঁর চোখে ক্ষমতার দুটি বিন্দু পরিষ্কার। একদিকে সাহেব বিচার, দেশজ আমলাগোষ্ঠী ও অন্যদিকে বলির পাঁঠার মতো আসামি। কিন্তু বিধির গতি ও চরিত্র বিচিত্র, দেবতার মতোই সাহেব অগম্য, খামখেয়ালি, যেন তাকে তুষ্ট করার জন্য যেসব কাজ করা হয় সেসবই হল শাক্ত পূজাবিধিমাফিক। একদিকে কোম্পানির আদালত এখানে দৈবী মহিমায় ভূষিত, তার ক্ষমতার উপরে অন্য গুণ আরোপিত হয়েছে। অন্যদিকে রাজক্ষমতার স্বৈরাচারিতা ও খামখেয়ালিপনা এবং প্রজার অসহায়ত্বও ধরা হয়েছে।

নিদান আইন দেখি জিলায় পাঠান হুকুম লিখি
ফৈজদারীতে জারি হয় আসি।
সাহেবের হুকুম পায় বাজারে লুটিয়া খায়
বধ করেন দিয়া গুলি ফাঁসি।[১৮]

নিদান বা আইন এখানে ভয়ংকর, প্রজার চোখে সেটা প্রাণনাশক। নতুন শাসনের সঙ্গে শাসিতের বিচ্ছিন্নতা স্পষ্টই স্বীকৃত। কিন্তু নতুন শাসনই তো থাকবে, নতুন দেবতারাই রাজত্ব করবে। তাই চৈতন্যে সেই শাসনকে সহনীয় করে তুলতে হবে, সাহেবের সকল খামখেয়ালিপনাকে কোনো-না-কোনো চেনাজানা বর্গের মধ্যে বুঝতে হবে। এই দ্বৈত প্রচেষ্টার টানাপোড়েনই রামপ্রসাদ মৈত্রেয়র রচনাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

কলকাতার জবরদস্ত বানিয়া পরিবারের সদস্য ভূকৈলাশের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল স্বভাবত এতটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেননি। কোম্পানির আমলেই তাঁদের পরিবারের বোলবোলাও এবং সামাজিক প্রতিপত্তি। তাই কোম্পানির শাসন বাঙালির ভবিতব্য, পুরাণেই যেন সে-কথা বলা আছে। যুগের ফেরেই বাঙালির চেনা দেবতারাই কোম্পানির আমলে ফিরে এসেছে। তাই রাসলীলার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে জয়নারায়ণ ফুকরে ওঠেন—

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারেতেঃ একদিন আসিতেঃ হইবেক ধর্ম্ম আদালত।
সদাগুরু সাধুজনঃ সঙ্গে করি আগমনঃ বিচার করিব হিতাহিত॥
গৌরাঙ্গ আসিয়া গোরাঃ আনিবে জাহাজে ভরাঃ সেই গোরা করিবে শাসন।
ব্যক্ত হইবে সার কথাঃ ঘুচিবে জীবের ব্যথাঃ শুদ্ধ আজ্ঞা করি আচরণ।[১৯]

পুরাণই জয়নারায়ণের রচনার আদর্শ। তাই কোনো অসুবিধা নেই। গোরা নামকে

ব্যবহার করে তিনি সাহেব ও চৈতন্যদেবকে মেলাতে পারেন। ঠিক তেমনই তিনি স্বচ্ছন্দে দেশজ কাঠামোয় বিদেশী দেবতাকে বসিয়ে দেন, কারণ দেশজ ক্ষমতার থাকভিত্তিক কাঠামোয় যে-কোনো ক্ষমতাকেই একটা জায়গা দেওয়া যায়, থাক বাড়িয়ে দিলেই হল। একটা কায়দা দরকার। বর্তমানকে ভবিষ্যতের আকারে উপস্থিত করতে হয়, এবং দেশজ লীলার ছকে ধরতে হয় বিদেশী ঠাকুরকে। গোপীদের কাছে কৃষ্ণ অবলীলায় বলেন—

করিতে জীবের ত্রাণ কিছুকাল পরে
সত্যনাম অবনীতে আসিবে সত্বরে॥
চারিদেশে সত্যনাম হইবে প্রকাশ।
কাটিবেক দুষ্টজনে নাম চন্দ্রহাস।

উত্তরে লামা গুরু নানক পশ্চিমে।
রামশরণ নামে এক হবে পূর্ব্বধামে॥
পুত্ররূপী অবতার হইবে দক্ষিণে।
ইষু ক্রাইষ্ট নাম তার রাখিবেক জনে।

ভিনদেশী ভিন পন্থ করিয়া মিলন।
ইষুকে সকলে তারা করিবে প্রধান॥
এই কালে মম নাম হইবে ঘোষণা
ইষু বিনা গতি নাই হইবে মন্ত্রণা॥
দুষ্ট নাশি সুখরাশি হইবে উদয়।
সব জাতি একাকার হইবে ধর্ম্মময়॥[২০]

কৃষ্ণ, নানক, কর্তাভজা ও খ্রিস্ট সবাই এক, যদিও তাদের ক্ষমতার এলাকা ও কালে ফারাক আছে। আবার গুরু-মাহাত্ম্যেও বিদেশী খ্রিস্ট ও নাথপন্থীরা আসেন।

গোরণ্ড দেশে গুরু বহু নাম ধরি।
বিশেষ করিল কীর্ত্তি যাই বলিহারি।
ক্রাইষ্ট বলিয়া তথা সদা করি গান।
গুরু মোর সর্বদেশে করিবেন ত্রাণ॥[২১]

কর্তাভজা ও গুরুভজা জয়নারায়ণ তাই বারবার যে ধুয়া দেন তা গুরু ও শিষ্য, রাজা ও প্রজা, দেবতা ও ভক্তকে একই সূত্রে বাঁধে। ক্ষেত্র আলাদা কিন্তু সম্পর্ক এক,

লইনু শরণ আমি পতিতপাবন।
বা, দেহিমে শরণ প্রভু ত্রিতাপভঞ্জন।
বা, কাতর হইয়া প্রভু লইনু শরণ।।[২২]

শরণের এই রাস্তা ধরে পতিতপাবন থেকে কোম্পানিরাজে পৌঁছতে বেশি সময় লাগে না। রামরাম বা আরও ভালো করে, রাজীবলোচনই তার প্রমাণ।

২

রামরাম বসুর খ্যাতি ও অখ্যাতি প্রচুর।[২২ক] খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য বিস্তারে তিনি মিশনারিদের দক্ষিণহস্ত প্রায়শই এমন ভাব করে থাকতেন যে তিনি ওই ধর্মে নিজেই দীক্ষিত হবেন। অন্যদিকে তাঁর অর্থলিপ্সা এবং বারদোষও তাঁর পোষ্টাদের কম বেকায়দায় ফেলেনি। ক্ষমতার খেলা যে তিনি ভালো বুঝতেন, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ১৮০২ সালের লিপিমালার ভূমিকাতে তার স্বীকার আছে—

> এইস্থানে এখন এস্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এদেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলনভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্যক্ষমতাম্পন্ন হয়েন।[২২খ]

রামরাম এখানে যোজক, রাজক্ষমতাকে পরিচয় করাচ্ছেন দেশজ ভাষার সঙ্গে, সেই ভাষাও থাকবন্দি সমাজে বিধৃত। প্রথম ধারায় ১৫টা চিঠি, রাজবৃত্তের কোটিতে তাদের স্থান। এক রাজা অন্য রাজাকে, রাজা চাকরকে বা সচিবকে অনুজ্ঞাপত্র লিখছেন, অন্য পঁচিশটা 'সমান সমানীকে গুরু লঘুকে এবং লঘু গুরুকে ইত্যাদি'। লেখার ছাঁচ নিশ্চয় আকর্ষক কিন্তু চিঠির বিষয়ও কম আকর্ষক নয়।[২২গ]

শরণের ধূয়া প্রথম চিঠিতেই আছে—

> আমার শরণাগতের কোনো বিপদ হইতে পারে না।

কিন্তু প্রাসঙ্গিক হল খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাব। একটি লিপিতে,

> এই বেদ ও শাস্ত্র বেদোক্ত সমস্তই ধর্ম্ম তদ্ভিন্ন অধর্ম্ম।....কিছুকাল গত হইল পশ্চিম সমুদ্রতীরে একজন পাপিষ্ঠ মাহামদ নামে উদ্ভব হইয়া তাহার নিজকৃত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া কএক জন বলবান নষ্ট লোক এক মন্ত্রণা হইয়া অনেক২ লোকের জাতি ধ্বংস করিল। এবং তাহারদিগাকে হিন্দু ধর্ম্মপথের বিপর্যয় গতি করাইয়া মোছলমান করিল।

মুসলিম ধর্মের আবির্ভাব হিন্দুপথের বিপর্যয়। কিন্তু এইরকম আক্রমণ ব্যতিক্রম। *সনাতনী* সমাজ ও ধর্মই বহাল ছিল। তার আদর্শের বয়ান এইরকম:

> হিন্দু ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ উপনয়ন হইলে ত্রি সন্ধ্যা কালেতে করিবেক ভজন যাজন ইত্যাদি করিয়া সমস্ত অন্যোন্য লোককে সত পথে গতি করাইবেক এবং যাগযজ্ঞ দানাদি করিবেক এবং নীত শাস্ত্রানুসারে প্রজালোকের প্রতিপালন করিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ রাজা হইয়া বিপ্র সেবা ও দেবার্চ্চনা প্রতিমা ইত্যাদি করিবেক। বৈশ্য কৃষিকর্ম্ম শূদ্র দ্বিজসেবা তাহারদের প্রধান ক্রিয়া এবং আর২ ভজন দ্বিজ বাক্যানুসারে করিবেক। ব্রাহ্মণ ভোজন যথাশক্তিতে করাইবেক ইহার বিপর্য্যয় না হয় তাহা হইলেই পাপ।

এটাই ভারতীয় সমাজের চাল ও চলন। কিন্তু 'উত্তরদেশের প্রাণীরা' সদ্য এসেছে ও বলতে আরম্ভ করেছে যে খ্রিস্টই সমস্ত। তাই,

> একি ইহার তদন্ত যদিও অঞ্চলে কিছু প্রকাশমান থাকে লিখিবেন নতুবা অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত করিবেন যদি এ শাস্ত্র নিতান্ত তবে আর সমস্তই অযথার্থ তাহার বিশেষ

জানিতে হইবেক যে লোকেরা আসিয়াছে তাহারদিগকে দেখিলে বুঝা যায় ইহারা মহাজন তাহার সন্দেহ নাই। ইহারা শান্তশীল দয়াশীল ক্ষমাবন্ত কমল অন্তঃকরণ পরদুঃখে কাতর জেতেন্দ্রিয় অহিংসক এমন লোক কোনকালে আমার এ প্রদেশে দেখি নাই এবং তাহারদের এই সামান্য কথা অনেক লোক শ্রবণ করে।[২২ঘ]

উত্তরও তড়িঘড়ি আসে। যেমন,

....খ্রীষ্ট বিবরণ যথাশাস্ত্র ওদেশে প্রকাশ হইতেছে এই কথা শ্রবণে আমার সভাস্থ যাবদীয় লোক মহানন্দে প্রমোদিত।....এ দেশএও হিন্দুস্থানের এক অঞ্চল ইহার নাম মালওয়া রাজ্য এখানেও পূর্ব্বে প্রতিমা পূজা এবং যাগযজ্ঞ দানধ্যান ইত্যাদি একই মত ছিল পরে খ্রীষ্ট বিবরণ মঙ্গল সমাচার আগমনে সমস্ত অনিত্য প্রপঞ্চ শাস্ত্র লোপাপত্য হইয়া এখন এদেশে য়েশু বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে এখন সমস্ত বর্ণ একত্র কাহার সহিত কাহার ভিন্ন ভাবের লেশ নাই সে শাস্ত্র বিবরণ আমি আজ্ঞানুরূপ নিবেদন করিতেছি।।[২২ঙ]

মুহম্মদী ধর্মে বিপর্যয় হয়। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম সবাইকে একাকার করে, অনিত্য ও মিথ্যা শাস্ত্র ধ্বংস করে। মিশনারিদের হয়ে প্রচারকের ভাষা রামরাম হুবহু লিপিবদ্ধ করেছেন।

কিন্তু এরই পাশাপাশি রামরাম পরীক্ষিত কাহিনি, দক্ষযজ্ঞ, বৈদ্যনাথ ধাম মাহাত্ম্য, কালযবন কাহিনি ও মুচকুন্দ কথা, গঙ্গাবতরণ কাহিনি সবই বর্ণনা করেছেন। চৈতন্য ধর্মে ব্রাহ্মণ যে নীচু বর্ণের সেবা করে, এও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। (হরিভক্তিতে বর্ণের ভেদাভেদ করিবে না)। আবার কালযবন কাহিনিতে বলেন,

তবে বিধর্ম্ম আচরণ করহ আচার ব্যবহারের বিপর্যয়....তাহারদের বুদ্ধিমান লোক সেই ব্যবহারমত এক শাস্ত্রও প্রকাশ করিল সেই হইল জবন শাস্ত্র।

হিন্দুশাস্ত্রের বিপরীতে যবনশাস্ত্র কিন্তু খ্রিস্টধর্ম সর্বোচ্চে, এই যুগের উপযোগী শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র।[২২চ]

লক্ষণীয় যে, রাজশাসনে বা দৈনন্দিন কাজের চিত্রায়ণে রামরাম কিন্তু গতানুগতিকতার হেরফের করেননি। সাহেবরা বরাবরই পোষ্টা, আপদবিপদে সাহায্য করে, ধরে পড়লে চাকরি পাওয়া যায়। শরণাপন্নের গতি তারাই। আর রাজধর্ম অটুট থাকে প্রথাগত নীতিশাস্ত্রমাফিক,

রাজত্বের সিংহাসন ও স্তম্ভ নিরোপণ
যাহে রাজ্য হয়তো স্থাপন
প্রভুভক্ত মহাবল দম্ভে যেন কালানল
বিগ্রহেতে অন্তক যেমন।
ধর্ম্মেতে তৎপর মতি দয়ার্থ হৃদয় অতি
দানে মানে কর্ণ দুর্যোধন
ধৈর্য্যবান ক্ষিতি সম ক্রোধেতে বিপক্ষে যম
মহাবীর রায় জনার্দ্দন।[২২ছ]

খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের গুণাবলীও প্রথানুগত। রামরাম সরাসরি খ্রিস্টধর্মকে উচ্চতর

মর্যাদায় বসিয়েছেন। রাজীব বা মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে এখানেই তার প্রভেদ। অথচ নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষেত্রে খ্রিস্টরাজ বা তাঁর প্রতিনিধির ব্যবহার আর কোনো পোষ্টার ব্যবহারের মতো; তাঁর শরণের ও শাসনের ভাষায় প্রথাগত ধর্মরাজ্যেরই অনুরণন শোনা যায়।

৩

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ধরণীর মাজ
যাহার অধিকারে নবদ্বীপ সমাজ।
পূর্ববৃত্তান্ত যত করিয়া প্রচার
কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র পরে কহিব বিস্তার।

এইভাবে ১৮০৪ সাল নাগাদ ফোর্ট উইলিয়ামে ৪০ টাকার মাসিক বেতনভুক সহকারী পণ্ডিত রাজীবলোচন তার বংশের কীর্তি রচনা করেন এবং কেরির আনুকূল্যে তা ১৮০৫-এ ছাপা হয়।[২৩] সমাজপতি কৃষ্ণচন্দ্র, নায়ক, সমাজের চোখেই রাজীব রাষ্ট্রবিপ্লব ধরার চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনির ঐতিহাসিকত্ব নিয়ে সাহেব পণ্ডিতরা তুড়ে গালাগাল দিয়েছেন, ইংরেজদের কাছ থেকে কিছু আদায় করাই নাকি রাজীবলোচনের গল্প বানানোর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই গ্রন্থকে গুরুত্ব দিতেই তাঁরা অস্বীকার করেছেন। সুশীল দে মহাশয় অপেক্ষাকৃত সহানুভূতিশীল। কিন্তু তিনিও তথ্য ও গল্পের বুনটে জেরবার হয়েছেন, কুঁড়ো আর চাল আলাদা করার চেষ্টা করেননি।[২৪] কিন্তু রাজীবলোচন জমাটি গল্প ফাঁদতে পারতেন, তা প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। সেই খাতিরেই আমরা আরেকবার আখ্যান কাঠামোটা দেখতে পারি, চেনা জমিটা আরেকবার অন্যভাবে জরিপ করতে পারি। শুরু হল ধন্যরাজার পুণ্যদেশের বর্ণনা:

> তখন নবাব আলাবৃদ্দি খাঁ অতিবড় ধর্ম্মাত্মা সকলের প্রতি দয়ালু পুণ্যশীল সকল রাজারা রাজকর নবাবকে দিয়া সুখেতে কালক্ষেপণ করিতেছেন রাজ্যোৎপাত কাহারু নাই যে যেমন মনুষ্য তাহাকে সেইরূপ নবাবের কৃপা।[২৫]

শাসক নবাব ও ভূস্বামীদের সম্পর্ক অটুট, ব্যবহারবিধি অক্ষুণ্ণ, তাই যবন ও পুণ্যশীল কিন্তু দৌহিত্র *স্রাজেরদৌলা* বড়ো উৎপাত করে, নবাব শাসন করেন কিন্তু তাকে বাগ মানায় কার সাধ্য? সুখের রাজ্যে চিড় ধরল—

> হাহাকার শব্দ উঠিল সকল লোকেই ঈশ্বরের স্থানে আরাধনা করিতে প্রবর্ত্ত হইল যেন এদেশে জবন অধিকারী না থাকে।[২৬]

যবনের কাল পূর্ণ হয়েছে, রাজীবলোচনের রচনায় অন্যতম মুখ্য বক্তব্য হল এটাই। নবাব হয়েও সিরাজের মতিগতি পালটায়নি। দেশীয় রাজারা একজোট হয়ে অমাত্য মহেন্দ্রের শরণ নিলেন, জগৎশেঠের বাড়িতে প্রথম সভা হল। নবাব, অমাত্য ও ভূস্বামীদের সম্পর্ক ভেঙে পড়েছে: প্রধান অমাত্য ফাঁপড়ে পড়েছেন, তিনি বংশানুক্রমে নুন খেয়েছেন কিন্তু তাঁর পরামর্শ নবাব নেন না, তাঁর নিজের মান বজায় রাখাই ভার। তাই আনুগত্যের সব রীতি তিনি দায়ে পড়ে ভাঙলেন। মহেন্দ্র যেন নিরুপায়, তাঁর উক্তিতে সেই সুর স্পষ্ট।

> আমি যাহা কহি তাহা তোমরা শ্রবণ করহ আমরা এদেশে অনেক কালাবধি আছি এবং নবাব সাহেবেরদিগের অনুজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া প্রাধান্যরূপে পুরুষানুক্রমে কালক্ষেপণ করিতেছি এখন যিনি নবাব হইলেন ইহার নিকট মানের লঘুতা দিন২ হইতে লাগিল আর সকল লোকের উপর অতিশয় দৌরাত্ম্য কতরূপে নিষেধ করিলাম এবং বুঝাইলাম তাহা কদাচ শুনে না আর দৌরাত্ম্য করে অতএব ইহার উপায় কি সকলে বিবেচনা করহ।

মানীরা বিবেচনায় বসলেন। সিরাজ নিজে বদ নবাব, কিন্তু সবাই তখন ধরে নিয়েছে যে যবনের জমানাই খারাপ। ব্যক্তি নবাব সিরাজের বজ্জাতি থেকে যবন শাসনের প্রতি সামগ্রিক অনীহা প্রকাশ বড়ো রকমের প্রতিসরণ। রাজীবলোচনের বিবরণ হল,

> রাজা রামনারায়ণ কহিলেন ইহার উপায় হস্তিনাপুরে জনেক গমন করিয়া এ নবাবকে তগির করিয়া অন্য এক নবাব না আনিলে এ রাজ্যের কল্যাণ নাই। রাজা রাজবল্লভ কহিলেন এ পরামর্শ কিছু নয় হস্তিনাপুরের বাদসা জবন তিনি আর একজন নবাব দিবেন সেও জবন অতএব জবন অধিকারী থাকিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে না।[২৭]

দুষ্ট নবাব/ত্রাসিত প্রজা আর অতিষ্ঠ সামন্তের স্বার্থরক্ষা এবং যবন অধিকারী/হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষার ইচ্ছা, দুইয়ের ফারাক অনেক। বুদ্ধিমান কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবেশ ও হস্তক্ষেপ এই সূত্র ধরেই হয়েছে। যবন বিতাড়নের উপায় বাতলাতে তাঁকে দ্বিতীয় একটা সভায় বিশেষ আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল।

সেই সভায় দেশাধিকারীর দৌরাত্ম্য স্বীকার করে অনুতপ্ত রাজা মহেন্দ্র গাঁইগুঁই করলেন। আবার আনুগত্যের প্রশ্ন, নিমকহারামির ভয় তাঁকে বিচলিত করেছিল।

> আমরা পুরুষানুক্রমে নবাবের চাকর যদি আমাদিগের হইতে কোন ক্ষতি নবাব সাহেবের হয় তবে অধর্ম্ম এবং অখ্যাতি অতএব আমি কোন মন্দ কর্ম্মের মধ্যে থাকিব না তবে যে পূর্ব্বে এক আধ বাক্য কহিয়াছিলাম সে বড় উম্মাপ্রযুক্ত এইক্ষণে বিবেচনা করিলাম এসব কার্য্য ভাল নয়।[২৮]

অধর্ম হবে নিমকহারামির জন্য। কিন্তু ধর্মের তো নানা ক্ষেত্র আছে, দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ধর্মের দায়ও বদলে যায়। তাই মীরজাফরও জগৎশেঠ মহেন্দ্রকে মনে করালেন,

> কিন্তু দেশরক্ষা পায় না এবং ভদ্রলোকেব জাতি প্রাণ থাকা ভার হইল।

এই সূত্র ধরেই ব্যক্তি নবাব সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ থেকে যবনের দেশাধিকারের বিরোধিতায় উত্তরণের পর্যায়কে রাজীবলোচন বিশ্বাসযোগ্য করার চেষ্টা করলেন। যবন হিসাবে কারুর ব্যক্তিগত জুলুম বা ইমানদারি ততটা বিবেচ্য নয়। তাই মীরজাফরের উপস্থিতিতে কৃষ্ণচন্দ্রের বিস্ময় প্রকাশে সবাই তাকে আশ্বস্ত করে বলেন,

> হাঁ ইনি জবন বটে কিন্তু ইহার প্রকৃতি অতি উত্তম।[২৯]

যবন অধিকারের কাল ফুরিয়েছে। তাদের পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে, লোকস্থিতি বিপর্যস্ত। এই বিষয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের উপলব্ধি স্পষ্ট। তাঁর দীর্ঘ জবানি উদ্ধৃতির যোগ্য,

> এদেশের উপর বুঝি ঈশ্বরের নিগ্রহ হইয়াছে নতুবা এককালীন এত হয় না প্রথম

> যিনি দেশাধিকারী ইহার সর্ব্বদা পরানিষ্ট চিন্তা এবং যেখানে শুনেন সুন্দরী স্ত্রী আছে তাহা বলক্রমে গ্রহণ করেন ও কিঞ্চিৎ অপরাধে জাতি প্রাণ নষ্ট করেন দ্বিতীয় বর্গী আসিয়া দেশ লুট করে তাহাতে মনোযোগ নাই তৃতীয় সন্ন্যাসী আসিয়া যাহার উত্তম ঘর দেখে তাহাই ভাঙ্গিয়া কাষ্ঠ করে তাহা কেহ নিবারণ করে না অশেষ এ প্রকার দেশে উৎপাত হইয়াছে অতএব দেশের কর্ত্তা জবন থাকিলে কাহারু ধর্ম্ম থাকিবে না এবং জাতিও থাকিবে না অতএব ঈশ্বরের নিগ্রহ না হইলে এত উৎপাত হয় না আমি এ কারণ অনেক বিশিষ্ট লোককে কহিয়াছি তোমরা সকলে ঈশ্বরের আরাধনা বিশিষ্টরূপে কর যেন আর উৎপাত না হয় এবং জবন অধিকারী না থাকে আত্ম২ জাতি ধর্ম্ম রক্ষা পায়।[৩০]

শান্তি স্থাপন ও ধর্মরক্ষায় যবন ব্যর্থ। অত্যাচারী নবাব, বর্গীর হাঙ্গামা, শান্তি স্থাপনে ও ধর্মরক্ষায় সন্ন্যাসীর বিদ্রোহ সবই বোঝায় যে ঈশ্বর বিমুখ, শাসকের খোল-নলচে পালটানো দরকার। জাতি ও ধর্ম বজায় রাখাই মুশকিল, সমাজ যায় যায়। লোকস্থিতি রক্ষায় যবন শাসন অক্ষম, এক নবাবের পরিবর্তে অন্য নবাব এলে ফলোদয় হবে না। দরকার অন্য রকমের শাসক, এই রোগ সারানো গেঁয়ো যোগীর কর্ম নয়।

> এদেশের অধিকারী সর্ব্বপ্রকারে উত্তম হন ও অন্য জাতি ও এদেশীয় না হন তবেই মঙ্গল হয়।

বিস্তারিত বলতে গিয়ে রাজা কোনো হিন্দু শাসকের কথা বলেন না; বরং তাঁর মনোমত শাসক হল,

> বিলাতে নিবাস জাতে ঈঙ্গরাজ কলিকাতায় কোঠি করিয়া আছেন যদি তাহারা এ রাজ্যের রাজা হন তবে সকল মঙ্গল হবেক। ইহা শুনিয়া সকলেই কহিলেন তাঁহারদিগের কি২ গুণ আছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন সকল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরহিংসা করেন না যোদ্ধা অতিবড় প্রজাপতি যথেষ্ট দয়া বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় ধনেতে কুবের তুল্য ধার্মিক এবং অর্জ্জুনের ন্যায় পরাক্রম প্রজাপালনে সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির এবং সকলে ঐক্যতাপন্ন শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন রাজার সকল গুণ তাঁহারদিগের আছে অতএব যদি তাঁহারা এ দেশাধিকারী হন তবে সকলের নিস্তার নতুবা জবনে সকলে নষ্ট করিবেক।

রাজা ইংরেজ, কিন্তু সে রাজধর্মের দেশজ ধারণার মূর্ত প্রতীক। পৌরাণিক ও মহাকাব্যের সকল আদর্শায়িত চরিত্রের সমাবেশ তার মধ্যেই হয়েছে। যবন যে ধর্মরাজ্য রাখতে পারবে না, ইংরেজ সেই ধর্মরাজ্যই ফিরিয়ে আনবে।

কিন্তু এক ধরনের রাজা থেকে আরেক ধরনের শাসকের রদবদলে একেবারেই ঝামেলা নেই, সেরকম কিন্তু নয়। রাজীবলোচন সবচেয়ে বড় এক অসুবিধার কথা বলেছেন। জগৎশেঠের জবানিতে,

> কিন্তু তাঁহারদিগের বাক্য আমরাও বুঝিতে পারি না ও আমাদিগের বাক্য তাঁহারাও বুঝিতে পারেন না।

হাজির জবাব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই আপত্তির কাটান দেন। কলকাতার কুঠিতে বড়ো সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তিনি সহজেই বাতচিৎ করতে পারেন কারণ,

> কলিকাতায় অনেক বিশিষ্ট লোকের বসতি আছে তাঁহারা সকলে ইঙ্গরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন এবং সেই সকল বিশিষ্ট মনুষ্য সাহেবের চাকর আছেন তাঁহারাই বুঝিয়া দেন।

প্রজা ও রাজার মধ্যে দোভাষী, উকিল, আমলার স্তর গড়ে উঠেছে, শাসক ও শাসিত একভাষায় কথা বলে না, ধর্মরাজের শাসনের এই নয়া বৈশিষ্ট্য কিন্তু রাজীবলোচন গোড়াতেই মেনে নিলেন। কোম্পানির রাজপাটে বসাও নিঃশর্ত নয়। দেশজ রাজারা কৃষ্ণচন্দ্রকে দূত হিসাবে পাঠিয়ে *কোঠির* বড়ো সাহেবকে জানাতে অনুরোধ করলেন,

> তিনি প্রতিজ্ঞা করিবেন তাঁহারা দেশাধিকার হইলে আমারদিগের এ রাজ্যের প্রতুল করিবেন আর এখন যে কার্য্য আমারদিগের ইহাতেই রাখিবেন।

চুক্তিমাফিক কারুর কোনো কায়েমী স্বার্থে আঘাত করা চলবে না, বিন্যাস অক্ষত রাখতে হবে, তবেই সমৃদ্ধি বজায় থাকবে। ধর্মরাজের মানানসই ধারণায় কোম্পানিকে কাটছাঁট করে রাজশাসনে বসানো হবে।[৩১]

আলোচ্য বইটির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বুকানন সাহেব একজাতীয় *চিঠিপত্র* (*correspondence*) চালাচালির কথা উল্লেখ করেছেন। রাজা রাজবল্লভ ও তাঁর সন্তান কৃষ্ণদাস কলকাতায় আশ্রয়প্রার্থী হন। এই নিয়ে নবাব ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর অর্থগৃধ্নুতারও সীমা-পরিসীমা ছিল না। কোম্পানির সঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত হল।[৩২]

> ইঙ্গরাজ সাহেবরা বিদেশী মহাজন এদেশে অনেক কালাবধি ব্যাপার বাণিজ্য করেন নিয়মিত রাজকর বরাবর দেন কখন অধিক দেন নাই এখন আপনি অধিক লইবেন এ উত্তম পরামর্শ হয় না।

কিন্তু চিঠিপত্র অনেক বড়ো জায়গা জুড়ে আছে শরণের ধারণা, শরণাগতকে রক্ষা করার দায়। রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেবার যুক্তি হিসাবে নানা চিঠিতে কোঠির বড়ো সাহেব বলেন,

> আত্মশাস্ত্রমতে এই হয় যে শরণাগতজনের কারণ প্রাণ দিবেক তথাপি তাহাকে ত্যাগ করিবে না...যদ্যপি প্রাণ যায় তথাপি ধর্ম্ম এবং যে নিয়ম আছে তাহাও রক্ষা হবে অতএব আপনকার উত্তম পণ্ডিত আছে তাহারদিগকে জিজ্ঞেস করিবেন যদি তাহারদিগের ব্যবস্থাতে শরণাগতকে ত্যাগ করা যায় তবে আমি ত্যাগ করিব।

এই সাহেব হিন্দুশাস্ত্রে ঘুণ। দণ্ডী রাজার উপাখ্যানকে সাবুদ হিসাবে হাজির করলেন, দেখালেন যে পাণ্ডবরা শরণাগতকে রক্ষা করার জন্য পোষ্টা কৃষ্ণের সঙ্গে লড়াই করতেও দ্বিধা করেননি। সেই যুক্তিতেই কোম্পানির সাহেবও নবাবের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিলেন।

পক্ষান্তরে সিরাজ রাজার ক্ষমতা জাহির করেছেন। প্রজার কাছে পালন করাই ধর্ম। এক চিঠিতে তিনি বলেন,

রাজা পরিত্যাগ করিলেও অধর্ম্ম আছে।

আরেক চিঠিতে তাঁর যুক্তি এইরকম,

আপনি অনেক২ শাস্ত্রমত লিখিয়াছেন এবং পূর্ব যেমন২ হইয়াছে তাহাও লিখিয়াছেন এ সকলি প্রমাণ বটে। কিন্তু সর্ব্বত্রেই রাজারদিগের এই পণ যে শরণাগত ত্যাগ করেন না তাহার কারণ এই রাজা যদি শরণাগত ত্যাগ করেন তবে তার রাজ্যের বাহুল্য হয় না এবং পরাক্রমেরও ত্রুটি হয়। আপনি রাজা নন মহাজন কেবল ব্যাপার বাণিজ্য করিবেন ইহাতে রাজার ন্যায় ব্যবহার কেন।

ধর্ম সব ক্ষেত্রে এক নয়, রাজধর্ম ও মহাজনী ধর্ম পৃথক। শাস্ত্রের দোহাই তুলে মহাজন রাজার ক্ষমতা খর্ব করছে, এ যুক্তি প্রসঙ্গে রাজীবলোচন অবহিত ছিলেন। ধর্ম ক্ষমতার বাইরে নয় বরং তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্পৃক্ত।

তবে অমাত্য মহেন্দ্রের ভূমিকা এখানে বিবেকের মতো। তিনি সর্বদা অমাত্যের মতো সৎ পরামর্শ দেন আর নবাবের ধমক খান। সিরাজ স্বেচ্ছাচারী, মানীর মান রাখে না, তাই দেশাধিকারীর অনুপযুক্ত। মহেন্দ্র তাই বলেন,

সকলেরি শাস্ত্রে মত আছে শরণাগতকে রক্ষা করিলে ধর্ম্ম আর শরণাগতকে ত্যাগ করিলে অধর্ম্ম।

আবার নিবেদন করেন,

আপনি দেশাধিকারী কিন্তু শাস্ত্রমত বিচার করিলে ভাল হয়। তাহাতে নবাব কহিলেন আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে আমি শাস্ত্র বিচার করি নাই।

অধর্মচারিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলই হল কলকাতা আক্রমণ এবং পলাশীর যুদ্ধ। কলকাতার যুদ্ধে সিরাজের সাময়িক জয়ের পর সাধারণ লোকের আক্ষেপের অবধি ছিল না।

ভাই হে ইঙ্গরাজের তুল্য সত্যবাদী নাই এবং দয়া যথেষ্ট যে লোক অন্য স্থানে যে বেতন পাইত সেই লোক সাহেবের চাকর হইলে দ্বিগুণ বেতন মিলিত।[৩৩]

ধর্মরাজের প্রশংসা খালিপেটে করা যায় না, শুকানো কথায় চিঁড়ে ভেজে না। তাই রাজীবলোচনের রচনায় প্রজারাও ট্যাঁকের কথা ভাবে।

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফরও রেহাই পান না। কারণ তিনি ও নবাবজাদা মীর মীরন কাউকে না জানিয়ে অসহায় সিরাজকে হত্যা করেছিলেন পাছে বড়ো সাহেব আপত্তি করে ও পাত্রমিত্ররা নবাব *স্রাজেরদৌলাকে নবাবি দেওনের চেষ্টা* পাইবেক। ফলে মীরজাফরের রাজ্যপাটও টিকল না, কৃষ্ণচন্দ্রের বাণীই সত্য হল—

জবন অধিকারী থাকিলে সকল দেশ নষ্ট হয়।

কারণ,

বড় সাহেব বিবেচনা করিলেন জবনকে প্রত্যয় নাই অতএব পূর্ব্বের যেমত নবাবি ভার ছিল সেমত না রাখিয়া রাজ্য করতল করিতে লাগিলেন স্থানে২ সাহেব লোক কর্তা নবাবের লোকে কার্য্য করে।

আর এই ব্যবস্থার পরেই

> প্রজালোকের যথেষ্ট সুখ... রামরাজার ন্যায় মনুষ্য সকল হইল এইরূপে কালক্ষেপণ করেন।[৩৪]

পরবশ্যতার সব চিহ্নই রাজীবলোচনের রচনায় আছে। কোম্পানির তিনি ভক্ত, কোম্পানির রাজ্যাধিকারের গ্রহ্যতার বিবরণ তিনি নিজের মতো করে লিখেছেন। কিন্তু এই আনুগত্যের বিন্যাস নজর কাড়ে। ভাষার পার্থক্য ব্যতীত কোম্পানি কিন্তু ধর্মরাজ, তার শাসনের রকমফের *সনাতনী* রাজধর্মের অনুগত। বিধি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও শরণাগতকে রক্ষার দায় নিয়েই কোম্পানি এসেছে। প্রথানুগত নৈতিক জগৎ ও সমাজ যবনের হাতে বিপর্যস্ত, ঈশ্বরের আদেশে তার কাল ফুরিয়েছে। সমাজের মানীদের সমাজে কৃষ্ণচন্দ্র এই কথা বুঝিয়েছেন, তাই রাজপাট বদলে তাঁর এত উদ্যোগ এবং উৎসাহ। কোম্পানির বড়ো সাহেবের ভূমিকা খুবই সীমিত, রাজা হবার উদ্যোগ এসেছে দেশজ সমাজের কেষ্টবিষ্টুদের কাছ থেকেই। উদ্দেশ্য একটাই : *যাতে আত্ম জাতি ধর্ম্ম রক্ষা পায়*। সাহেবের কাছে প্রতিশ্রুতি চাওয়া হয় যে কোনো রইসের যেন স্থানচ্যুতি না হয়। যে কায়েমি স্বার্থের ছক যবন আর রাখতে পারবে না বা পারছে না, সেই কাঠামোকেই কোম্পানি তুলে ধরবে। তাই মীরজাফরকেও চলে যেতে হয়, কোম্পানির আওতাতেই রামরাজ্য ফিরে আসে।

লক্ষ করার বিষয় হল যে রাজকর বৃদ্ধি করার ও নিছক শক্তি জাহির করার দোহাই সিরাজ দেন। আর ইংরেজের চিঠিপত্রে শুনি হিন্দু পুরাণের কথা, শাস্ত্রের নজির, শরণের জিগির। সিরাজই জানান যে, বণিকদের লাভ বেশি হচ্ছে। অতএব বেশি কর চাই। ইংরেজরা ও নীতিজ্ঞ অমাত্য বলে যে এই দাবি ন্যায়বিরুদ্ধ। ফলে কোম্পানিরাজ সহজেই সমর্থনীয় কারণ দেশজ সমাজের উচ্চবর্গের চেতনার সব শর্তই *কোঠির* বড়ো সাহেব পূরণ করছে, সামন্তদের মনমাফিক সব কাজ করছেন, তাদেরই অভিলষিত ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। বোঝাই যায় পরবর্তী জমানায় কেন সাহেব সেটন-কার (Setton-Carr) বা ইয়েটস রাজীবলোচনের কল্পিত চিঠির বয়ান পড়ে চটে কাঁই হয়েছিলেন, যার পর নাই গালমন্দ করেছিলেন। আনুগত্যের এই ছকের সঙ্গে হেমচন্দ্র বা দীনবন্ধুর রাজভক্তির ছকের ব্যবধান দুস্তর।

৪

> রাজাবলী অর্থাৎ কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরাজের অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষেপ ইতিহাস।

১৮৮০ সালে আখ্যানপত্র খোলাখুলিভাবেই বলছে যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কী লিখতে চলেছেন। তারপরেও বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ভরাকোটালে, একাশি বছর বাদে, বইয়ের পঞ্চম সংস্করণে পৌত্র বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় এই আশা প্রকাশ করেছেন,

> পাশ্চাত্য রচনার অনুকরণ ইহাতে বিন্দুমাত্র নেই, কেহ কেহ ইহা দোষ বলিতে পারেন, কিন্তু সারগ্রাহী ব্যক্তি মাত্রেই আদর করিবেন সন্দেহ নাই।[৩৫]

উইলিয়াম কেরি সাহেব অবশ্যই এইভাবে বইয়ের মর্যাদা বোঝেননি। বড়ো আশা করেই তিনি তাঁর সেরা পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়কে একটি উচ্চমানসম্পন্ন বই লিখতে ফরমায়েশ করেছিলেন, কিন্তু রাজাবলী তাঁকে হতাশ করেছিল, কারণ একটা নীরস ঘটনাপঞ্জি (dry chronicle) মাত্র, ইতিহাস লেখার সব উদ্দেশ্যই এতে বরবাদ হয়েছে। বহু বছর বাদে প্রাজ্ঞ শিশিরকুমার দাশ এই মূল্যায়নকে যথার্থই a very fair criticism বলেছেন এবং ডেভিড কফও শেষপর্যন্ত কেরির কথারই পুনরুক্তি করেছেন, Matter of factly recorded।[৩৬] ভাষাচর্চায় মৃত্যুঞ্জয়কে সবাই যত কনশাস আর্টিস্ট বলুন না কেন, তাঁর ইতিহাসবিদ্যার দৌড় নিয়ে সওয়াল করার লোক খুব কম কারণ অতিকথা এবং প্রমাণিত তথ্যের ফারাক তিনি জানেন না, ইতিহাস তাঁর কাছে গল্প বা আখ্যান মাত্র।[৩৭]

আর আমাদের কাছে এই কারণেই মৃত্যুঞ্জয়ের রাজাবলীর গুরুত্বের শেষ নেই। কেরি সাহেবের চোখ দিয়ে রাজাবলী না পড়লে রাজাবলীকে আদৌ ওইরকম বোঁদা বা নীরস বলে মনে হবে না। বিহারীলাল বোধহয় এইটাই বলতে চেয়েছিলেন।

একটা গল্প দিয়েই পড়া শুরু হোক। আকবর বাদশাকে নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। মুকুন্দ নামে এক ব্রহ্মচারী ভাগ্যবিপাকে স্খলিত হয়ে প্রয়াগের বাঞ্ছাবটে আত্মত্যাগ করেন এবং আকবর বাদশা নামে জন্ম নেন। তাই,

> শ্রীবিক্রমাদিত্যের পর এই কারণেই হিন্দুস্থানে এখন পর্য্যন্ত গুণেতে আকবরশাহের সমান সম্রাট আর কেহ হন নাই। পরে ইহার বিষয়ে অতি প্রামাণিক লোকেদের প্রমুখাৎ আর আর অনেক কথা শ্রুত আছে।[৩৮]

শ্রুতিই প্রামাণিক ইতিহাস। মৃত্যুঞ্জয় সেইগুলির 'সংগ্রহ ভাষাতে' করেছেন। তা মনোমত না-ও হতে পারে। কারণ তারই ভিত্তিতে মৃত্যুঞ্জয় ফেরেফারে জানিয়ে দেন আকবরি শাসনের তুল্য মানে কোম্পানিবাহাদুরও পৌঁছতে পারেনি। যবন শাসনের প্রতি কোনো দ্বিধান্বিত মনোভাব পণ্ডিত মহাশয়ের নেই। গল্পের মাধ্যমেই তিনি জানিয়ে দেন তাঁর আদর্শের কথা,

> জাহাঙ্গীর বাদশাহ সতীর্থ ন্যায় করিতেন তাহাতে কাহারও উপরোধ করিতেন না।...আর ইহার তক্তের উভয় পার্শ্বে সোহনা ও মোহনা নামে দুই শূকর থাকিত, যদি কোনহ মুসলমান কহিত যে, এরূপ মহমদি দীনের ধর্ম্ম নহে, আপনি একি করেন, বাদশাহ আজ্ঞা করিতেন যে যে বস্তুত বটে, আমি তাহা জানি কিন্তু মাতৃকুলের ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থে এই দুই শূকরকে কেবল আপনি নিকটে রাখি ও পিতৃকুলধর্ম্ম রক্ষার্থে ভক্ষণ করি না।[৩৯]

দীন বা ধর্ম কুলমাফিক নিয়ন্ত্রিত, দুই বিপরীত কুলের কাছে জাহাঙ্গীর নিষ্ঠ, তিনি

নিরঙ্কুশ ন্যায়পরায়ণ, সব সমাজকেই তিনি মর্যাদা দেন আবার কারুরও অসম্মান করেন না। আদর্শ খুঁজতে বা তাকে হাজির করতে মৃত্যুঞ্জয়ের পক্ষপাত স্পষ্ট।

শাহজাঁহার *মহম্মদী* মতে কিছু *তাৎপর্য* ছিল। কিন্তু তাতে অসুবিধা হয়নি কারণ তিনি *দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী* ও *অনেক অনেক দেশ সুশাসিত করিয়াছিলেন*। তিনি আবার *অতিবড় দাতা* ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে আওরঙ্গজেব বাদশাহ কিন্তু তাপস ভোগে কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। আলমগিরের বোলবোলাওয়ের তুলনা মেলা ভার।

> আলমগীর বাদসাহের অতিবড় প্রতাপ ও ঐশ্বর্য হইল, প্রায় রাজা বিক্রমাদিত্যের পর এমন ঐশ্বর্য আর প্রতাপ কোনহ দিল্লীর রাজার হয় নি।

আলমগির অবশ্যই *মহম্মদীমতে অতিবড় তৎপর* ছিলেন, তাতে ক্ষতিও হয়েছিল। কিন্তু তিনি শুধরেও ছিলেন।

> ইনি প্রধান প্রধান অনেক দেবস্থানের ব্যাঘাত করিয়াছিলেন, কিন্তু জ্বালামুখী ও লচমনবালাতে বিলক্ষণ প্রতিফল পাইয়া তাহাকে মানিয়া সেবার্থে অনেক টাকার ভূমি নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।[৪০]

গল্পকার মৃত্যুঞ্জয় জানতেন যে হিন্দু দেবস্থানে আওরঙ্গজেবের ভূমিদান আছে, তার রাজত্ব শুধু মন্দির ধ্বংসের ইতিহাস নয়। কিন্তু কোনো এক ব্রাহ্মণের কোপেই তার মৃত্যু হয়। সব বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও মুসলিম শাসনের প্রতি মৃত্যুঞ্জয় পক্ষপাতিত্ব গোপন করেননি। যবন শাসনাধিকারের এই মূল্যায়নের সঙ্গে ঊনবিংশ শতকের পরবর্তী কালের ইতিহাস চর্চার মুসলমান শাসনের মূল্যায়নের তফাত নজর এড়াবার নয়।[৪১]

রাজশাসনের আদর্শায়িত রূপ তাই মৃত্যুঞ্জয়ের অজানা নয়। অতিকথা/ইতিকথাতেই তিনি সেইরূপ খুঁজে পেয়েছেন। সেই কাঠামোতেই তিনি পেশ করেছেন কোম্পানিরাজের ইতিবৃত্ত। রাজীবলোচনের উত্তরাধিকার তিনি অস্বীকার করেননি। শরণ আর ধর্মের কথা তো আছে। কিন্তু রাজীবলোচনের রচনায় যে ধারণা প্রায় অনুচ্চারিত, যে শব্দ প্রায় অপ্রযুক্ত (রাজা মহেন্দ্রের দ্বিধা ছাড়া) মৃত্যুঞ্জয় বারবার সেই ধারণাকে ব্যবহার করেছে, তা হল নিমকহারামি।

স্ত্রীদের উপর অত্যাচার ইত্যাদি তো অধর্মচারী সিরাজ করতেনই। কিন্তু

> নতুন লোকদিগকে মর্যাদাপন্ন করাতে মহাবৎ জঙ্গের সময়ের প্রত্যয়িত মোক্তিয়ার মহারাজ দুর্লভরাম ও জগৎশেট মহতাবরায় ও মহারাজ স্বরূপচন্দ্র প্রভৃতির সহিত দিনে দিনে আন্তরিক অপ্রীতি বাড়িতে লাগিল।[৪২]

পুরোনো কর্মচারীদের মনে থাকে না, নতুন কর্মচারীরা জাঁকিয়ে বসে, সিরাজ আবার আদর্শায়িত ধ্যান-ধারণার বিপরীত কাজ করেছিলেন।

রাজীবলোচনে ইংরেজদের উপর রাজকর বৃদ্ধির কথাও আছে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়

শরণাপন্নকে রক্ষা করার যুক্তিকেই সিরাজের সঙ্গে কোম্পানির মতান্তরের ও যুদ্ধের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

> মহারাজা দুর্লভরামের দ্বারা [কোম্পানি] নবাবকে কহিলেন যে, এমন ধর্ম্ম নহে যে শরণাগত লোককে পরিত্যাগ করে, আপনি দেশের কর্ত্তা আপনাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা অবশ্য করিতে হয়, অতএব ধর্ম্ম বিবেচনাতে যে কর্ত্তব্য হয়, তাহাই আমরা করিব, আপনাকে তাহাই আজ্ঞা করিতে হয়।

আবার,

> কথক প্রধান লোকেদের সহিত সাহিত্য করিয়া অর্থ ও কিঞ্চিৎ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শরণাগত প্রতিপালনরূপ ধর্ম্ম পতাকা উঠাইয়া যুদ্ধার্থে পলাশীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।[৪৩]

কিন্তু ইংরেজশাসন প্রতিষ্ঠার পৃষ্ঠভূমিতে কাজ করেছে নিমকহারামি। প্রকৃতপক্ষে নবাবী বংশ বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বামীদ্রোহিতার পাপে নষ্ট হয়েছে, ঈশ্বরের বিধানে প্রত্যেকের ভাগ্যেই সেই পাপ ক্রিয়াশীল ছিল। যেমন সিরাজ :

> [মীরন] আপন হস্তে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ ছিন্ন শরীর হাতির উপর চড়াইয়া শহর ভ্রমণ করাইয়া ঈশ্বরেচ্ছামতে নবাব মহাবৎ জঙ্গের আপন মুনিবের পুত্র অথচ আপন মুনিব নবাব সরাফরাজ খাঁকে কপটে মারিয়া নবাব হওয়ার অলীভাস্কর প্রভৃতি মহারাষ্ট্রদের সরদার লোকদিগকে কপটে কাটাইবার ও স্বয়ং সিরাজদ্দৌলাকে বলাৎকারে পরস্ত্রীদিগকে আনয়ন প্রভৃতির দৌরাত্ম্যের প্রতিফল লোকতঃ প্রকাশ করিল।[৪৪]

মনে রাখা দরকার যে মৃত্যুঞ্জয় মারাঠাদের আদৌ পছন্দ করতেন না। তারা *দেশ লুট ও দাহ করিয়া* লোকেদের কষ্ট দিয়েছেন, সেটা তিনি স্পষ্ট করেই লিখেছেন। মীরজাফরের বংশ বিশ্বাসঘাতকতার পাপে পাপী। তাই সিরাজের সঙ্গে *নিমখারামির* ফলস্বরূপ মীরন বজ্রাঘাতে মরেন এবং মীরজাফর *গল্য কুষ্ঠরোগে* প্রাণ হারান। সিরাজবিরোধী আমীর-ওমরাহদের দশাও তথৈবচ। তাদের বংশ লোপ পায়। যেমন,

> এইরূপে সুবে বাঙ্গালাতে কোম্পানী বাহাদুরের অধিকার সুস্থির হইল। মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর বাঙ্গালা ১২০৪ সন পর্য্যন্ত বরাবর কোম্পানী বাহাদুরের খেদমত-গুজারি করিয়া এই কলকাতাতে মরিলেন।...এইরূপে ঐ মহারাজ দুর্ল্লভরাম নিঃসন্তান হইলেন ও আপন মুনিব নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে নিমখারামি বৃক্ষের ফল পাইলেন, অতএব স্বতঃ নিমখারাম অথচ এক ক্ষুদ্রের ঔরষেতে মহারাজ দুর্ল্লভরামের জন্ম, অতএব বিপরীত খচরস্বরূপ ঐ মহারাজ রাজবল্লভের ভাগিনেয়রা পৃতি পুরুষের ক্রমাগত যে কিছু ধন তাহা অধিকার করিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভের পুত্রবধূ ঐ মহারাজ মুকুন্দবল্লভের স্ত্রীকে একবস্ত্রে কএক দাসী সমেত কৌশলক্রমে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়া নীলবর্ণ শৃগালের ন্যায় আপনাকে মহারাজ করিয়া মানিয়া ঐ

মহারাজ রাজবল্লভদের ঐহিক সম্ভ্রম ও পারমার্থিক সকল ধর্ম্ম লোপ করিলেন।[৪৫]

নিমকহারামির পাপ বংশানুক্রমিক। খানদান বা বংশ তাতে লোপ পায়। ব্যক্তির ধ্বংসের চাইতেও খানদানের অবলুপ্তি মারাত্মক। খানদান ও বংশ থেকে সেই পাপ ছড়িয়ে পড়তে পারে রাজ্যে ও শাসনে। রাজাবলীর সুর এই এবং মৃত্যুঞ্জয় সচেতনভাবেই সেই নসিহৎ বা উপদেশের কথা শেষ অনুচ্ছেদে ব্যক্ত করেছেন।

> এইরূপে নন্দবংশজাত বিশারদ অবধি শাহ আলম বাদশাহ পর্য্যন্ত মুনইল খাঁ নবাব অবধি নবাব কাসমালী খাঁ পর্য্যন্ত কোন কোন সম্রাট রাজাদের ও নবাবদের এবং তাঁহাদের চাকর লোকদের স্বামীদ্রোহাদি নানা পাপেতে এই হিন্দুস্থানের রক্ষার্থ আরোপিত কোম্পানী বাহাদুরদের অধিকার রূপ পুষ্পিতত্ব ও ফলিতত্বের সমবধায়ক যে বড় সাহেব তৎকর্ত্তৃক ঐ কোম্পানী বাহাদুরের অধিকাররূপ বৃক্ষের আলবালাত্ব নিরুপিত পাঠশালার পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত রাজতরঙ্গ নামে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।[৪৬]

মৃত্যুঞ্জয় পাঠশালার পণ্ডিত, এটাই তাঁর পরিচয়। হিন্দুস্থানের ইতিহাস থেকে তাঁর শিক্ষা হল যে *স্বামীদ্রোহাদি* নানা পাপে কী করে রাজ্যের ভরাডুবি হয়। কোম্পানির অধিকার সেই পাপের ফলেই, সংগত আচরণবিধির রক্ষক কোম্পানি। ফলে মৃত্যুঞ্জয়ের বন্দনাও সেই উদ্দেশ্যে।

কেরি, কফ বা শিশিরকুমার দাশ মহাশয়েরা যতই বলুন না কেন, মৃত্যুঞ্জয় আদৌ নীরস কালপঞ্জি লেখেননি। রাজাবলীতে পন্দনামার ধাঁচে রচিত গল্প ও কাহিনির মধ্যে দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় কতকগুলি *চিরন্তন* নীতির কথা বলেছেন; সেইসব নীতির কাছে তিনি দায়বদ্ধ। নন্দবংশ থেকে কোম্পানির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সেই অমোঘ নীতিগুলির বাস্তব প্রকাশ। রাজাবলী ইতিহাসের কালপঞ্জি নয়, বরং একজাতীয় ইতিহাসের এক বিশেষ ব্যাখ্যা, তার ইতিহাস কতকগুলি ন্যায়নীতি তুলে ধরে।

৫

প্রকীর্ণ কবিতা, গাথা এবং পণ্ডিত ও মুনসিদের লেখাগুলো একেবারে অজানা নয়। বিশেষত রাজীবলোচন ও মৃত্যুঞ্জয়ের লেখাগুলো বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে বার বার আলোচিত হয়েছে। অথচ এই রচনাগুলির উদ্দেশ্যে বা সামাজিক তাৎপর্য প্রসঙ্গে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের শেষ নেই। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর লেখা থেকে অধুনা প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের প্রবন্ধেও সেই একই ধরনের মন্তব্য দেখা যায়।[৪৭] অন্যলোকের আর কী কথা। বাঙালির ইতিহাসচিন্তার উপরে বহু আলোচিত গ্রন্থে, প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় এইসব রচনার উল্লেখই করেননি কারণ এটাও 'অরুণোদয়ের' যুগ নয়, এই সময়টা 'অন্ধতামসী যামিনী' (উদ্ধৃতিচিহ্ন মূল অনুযায়ী)। ১৮১৪ থেকে ১৯০৫ সালই বাংলার যথার্থ ইতিহাস রচনার উদ্‌যোগ পর্ব। ১৮১৪ সাল দারুণ গুরুত্বপূর্ণ, তখন থেকেই উদ্‌যোগ পর্ব আরম্ভ হচ্ছে, কারণ সেই বছরই নাকি

রামমোহন রায় স্থায়িভাবে কলকাতায় বাস স্থাপন করলেন।

প্রবোধ সেন মহাশয়ের এই বক্তব্য একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবাহী এবং পরবর্তীকালের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সেই দৃষ্টিভঙ্গিই প্রশ্নাতীতভাবে গৃহীত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই বিষয়ের ওপর অন্যতম প্রধান গবেষণা-নিবন্ধেও বিনা দ্বিধায় মত প্রকাশ করা হয়েছে—

> এই পর্বের ঐতিহাসিক রচনাগুলি থেকে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় না।[৪৮]

প্রকৃতপক্ষে কথাগুলি *ভীষণরকম ঠিক* এবং সেইজন্যই অস্বস্তিকর। ইতিহাস বলতে এঁরা একটি বিশেষ প্রকৃতির ইতিহাস বুঝেছিলেন। সেই ইতিহাস-এর দ্বারা জাতীয় রাষ্ট্র তৈরি করা যায়, যার তথ্য ও সাবুদ একেবারে হাতে ছোঁয়া যায়, যাকে বলে পাথুরে প্রমাণ। এই দাবির ভয়েই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নাকি পুরাতত্ত্ব ছেড়ে উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন। পুরাণ থেকে এইরকম ইতিহাস তার স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করেছে, এইরকম ইতিহাসই প্রগতির চাবিকাঠি, ইংরেজি হুইগ শিক্ষার ধারায় আমাদের দেশে জাঁকিয়ে বসেছে। এরই মানদণ্ডে আরমা হরদম স্কুলের পাঠ্যবইতে পড়ি বিলহন আদৌ *ইতিহাস* লিখতেই জানতেন না এবং কলহনই হলেন পাশ্চাত্যের মানে পাতে দেবার মতো একমাত্র আগমার্কা ঐতিহাসিক। উনিশ শতকে জাতীয় ইতিহাস রচনার তাগিদ উঠে এসেছে এক বিশেষ আদিকল্প থেকে, সেই আদিকল্পের উৎস দ্বিবিধ : একদিকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের গ্রাহ্যতা ও দায় এবং অন্যদিকে উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদের ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা ও *স্বপ্নলব্ধ* রাষ্ট্র গঠনের তাগিদ।[৪৯] ফলে এই প্রকল্প থেকে সহজেই এলেবেলে বলে বাতিল হয়ে যান কৃষ্ণহরি দাস, রামপ্রসাদ মৈত্রেয়, রাজীবলোচন এমনকি মৃত্যুঞ্জয়ের মতো *পাঠশালার পণ্ডিত*।

অথচ এইসব গেঁয়ো কবি বা পাঠশালার পণ্ডিতদের চোখে কোম্পানির শাসনের ছবি আলাদা। গাথা ও কবিতাগুলিতে একটা বিষয় স্পষ্ট। মার্কস বলেছিলেন, যে-কোনো নূতন অভিজ্ঞতাই প্রাথমিক পর্যায়ে স্বীকৃত হয় পুরাতন অভিজ্ঞতার বর্গে, যেভাবে প্রথম বিদেশী ভাষা-শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষাতেই তাদের নূতন শেখা ভাষার ভাবকে অনুবাদ করে।[৫০] কৃষ্ণহরি, রামপ্রসাদ মৈত্রেয় বা জয়নারায়ণ সেন কোনো-না-কোনোভাবে নূতন শাসকদের তাদের চেনা পুরাতন জগতের মধ্যে বসাবার চেষ্টা করেছেন, তাদের উপর নিজেদের মনপসন্দ দোষ, গুণ বা মাহাত্ম্য আরোপ করেছে। বাংলার গ্রামাঞ্চলে এই প্রক্রিয়া অনেকদিন ধরে চলেছিল। ফলে অভিজ্ঞতাকে বোঝার প্রক্রিয়ায় ও তার অর্থবোধের ভিন্নতায় নানা সংঘাত দেখা যায়, নানা মাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণহরির লেখা কবিতায় সাহেবের হিসাব একরকম এবং প্রজাদের হিসাব আরেকরকম; দুই ধরনের *ইনসাফ* মুখোমুখি হয়। কিন্তু কবি বিভেদকে স্থায়ী করেন না, সাহেব সব মেনে নেয় এবং স্বাভাবিক স্থিতি ফিরে আসে। সাহেবি ক্ষমতা তখনও গ্রামসমাজের অভ্যন্তরে

গেড়ে বসেনি, বাইরের শক্তি মাত্র, তাকে প্রশমিত করাও যায়, আবার পুরোনো সময়টা ফিরিয়ে আনাও যায়। পাবনার কবি ততটা নিঃসংশয় নন। তাঁর জগতে পুরোনো পোশাক পরা নূতন শাসকরা অবশ্যই শান্তি ও শাসনের প্রতিভূ, ক্ষমতার মূর্ত প্রতীক, তাদের নড়চড় হবার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু তাদের সদিচ্ছা ও সদ্ব্যবস্থা জন্ম দেয় ত্রিশঙ্কুর জগতের, পয়দা হয় *বাকরগুের*, পেনাল কোডের সামনে রায়তরা হয় বলির পাঁঠা। এই জগতেই অধিষ্ঠান করতে হবে সবাইকে। জয়নারায়ণ তাই তাঁর ধর্মজগতে অতীত ও ভবিষ্যৎকে একাকার করে দেন, গোরা হয় গৌরাঙ্গের অবতার, ন্যায়ধর্মের প্রচারক খ্রিস্টের শরণই কালের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এঁদের রচনায় কোম্পানি কোনো উচ্চতর সভ্যতা, দর্শন ও জ্ঞানদীপ্ততার বাহক নয়। লক, হিউম বা যুক্তিবাদী দর্শনের আশীর্বাদ কোম্পানির শাসনের দান হিসাবে স্বীকৃতি হয়নি। যে রাষ্ট্র কোম্পানি স্থাপন করেছে তার ভিত্তি ধর্ম, তার গ্রাহ্যতা শরণে, মানীর মান রক্ষায়। কোম্পানিরাজ্যের *ধর্মিক* রূপের কথা রাজীবলোচন নির্মাণ করেছেন। যে-কোনো দেশজ নৃপতির প্রশস্তি বা রাজধর্মের সাধারণ আলোচনা সেই নির্মিতের সঙ্গে খাপে-খাপে মিলে যাবে। যবনরাজ অধার্মিক নীতি ভঙ্গ করেছে, তার কাল পূর্ণ। এককালের অবসানান্তে যেন কোম্পানি আবার সত্যযুগ ফিরিয়ে আনছে। কালের অগ্রগতি নয়, কালের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। কোম্পানির গ্রাহ্যতা নির্ভর করছে এই নীতিধর্ম পালনে। মৃত্যুঞ্জয়তে এই মনোভাব আরও স্পষ্ট। সবকিছু বিচার করা হয়েছে ঈশ্বরভক্ত প্রজার চোখে। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য, যবনরাজ্য অদৃষ্ট প্রেরিত, হিন্দুরাজত্বের দুর্বলতা ও পাপের ফল। সেইরকম কোম্পানিরাজ কায়েম হল যবনরাজ্যের ছিদ্রপথে। বিক্রমাদিত্য, আকবর ও জাহাঙ্গির শাসনের মান স্থির করে গেছেন, আদর্শ সেই কালে। শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবও নেহাত ফেলনা নয়। এই ধরনের ঐতিহ্যের হিন্দুস্থানে কোম্পানির বোলবোলাও। তাই প্রাক্-কোম্পানি যুগ মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নয়। ন্যায় ও নীতিনিষ্ঠ শাসনের ব্যত্যয় এবং নিমকহারামি বারবার সুখের রাজ্যে আগুন লাগিয়েছে, দেশের কাপাল ভেঙেছে। ইতিহাসের এই ছকে কোম্পানির শাসনও পড়ে। ফলে সেই শাসনের ভাগ্যে যে অনুরূপ ব্যতিক্রম হবে না, পাপের স্পর্শ লাগবে না, এইরকম কোনো নিশ্চয়তা কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় নেই। এখন কোম্পানির শাসন মাননীয়, যেহেতু এই শাসনেই অমোঘ ন্যায়নীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা আছে। কোনোদিন তা টাল খাবে কি না, কে জানে, সেই প্রসঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় নীরব। রাজনীতির ক্ষেত্রগুলির ভিত্তিও অন্যরকম, ন্যায়নীতিকে সংগঠিত করা হচ্ছে অন্য ছকে। *আত্ম, জাতি, ধর্ম* হচ্ছে পরিচয়ের প্রধান ভিত্তি, রাষ্ট্র বা রাজা এই আদর্শগুলিকেই রক্ষা করে। তাই রাজনীতি ও শাস্ত্রানুগত, পুরাণও কাব্যের নির্দেশ ও উদাহরণমাফিক নবাব বা শাসকের চলা উচিত। ব্যতিক্রম হলে পতন অনিবার্য। বিদেশী সাহেবও হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দেন,

নিজেদের শাস্ত্রের কথা বলেন। এই রাজ্যের ক্ষেত্র ধর্মে বিধৃত, জাত ও কুলের সমাজে বিন্যস্ত। রামরাম বসুও প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস লেখার আগে বলেন যে, *আমি তাহাদের শ্রেণী একই জাতি*। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য স্থাপন, ধুমঘাট গড়ের বর্ণন আসলে যশোর কায়স্থ সমাজ গড়ে ওঠার ইতিহাস। যবনীয় অত্যাচারের ন্যায় প্রতাপাদিত্যের (*এই দুরন্ত অসুর*) পাপকার্যের তার রাজ্য লোপ পেল। তাঁর ভাষা লক্ষণীয় :

> পিতার শির ছেদন হইল এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের সন্তানেন প্রধানের প্রায় জাতি গেল। অতএব এ দুষ্ট জগত। ইহার রাজ্য দুষ্ট। ইহার প্রেম অধম। যে করে সে অজ্ঞান।[৫১]

এই রাজক্ষমতা জাত বা সমাজ বা ধর্মের ঊর্ধ্বে নয়। এই সমাজ আবার কুল ও বংশে আবদ্ধ। এই থাকবন্দি সমাজকে ধরে রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, তাকে বিপর্যস্ত করা এর উদ্দেশ্য নয়। ধর্মরাজই এই চৈতন্যে রাজা, শাসক। আদর্শায়িত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দাবি সমাজ, গোষ্ঠী ও কুলের দায়কে আত্মসাৎ করেনি। পাপও এখানে কেবলমাত্র ব্যক্তির ভোগানুগত নয় বরং বংশানুগত। নিমকহারামির পাপে বংশকে বংশ, রাজ্যকে রাজ্য উজাড় হয়ে গেছে। কোম্পানিরাজের প্রতি আনুগত্য এইসব দায়বদ্ধতা মেনেই প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রাহ্যতার জন্য স্বতন্ত্র কোনো এক মাত্রা বা যুক্তি রাজীবলোচন বা মৃত্যুঞ্জয় হাজির করেননি। এই ছকে ন্যায়নীতির চ্যুতি, *স্বামীদ্রোহিতার* সম্ভাবনা কোম্পানির শাসনেও থাকতে পারে। ধর্মের কল যে বাতাসে নড়ে, এই বিষয়ে রাজীবলোচন ও মৃত্যুঞ্জয় নিশ্চিত। তাঁদের ধারণামত ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষেই (শাসক) কোম্পানির অবস্থান; কোনো জ্ঞানদীপ্ত সভ্যতার ধারণা কোম্পানির শাসনে আরোপিত হয়নি।

আর এখানেই তো রামমোহন বা বিদ্যাসাগরদের সঙ্গে এঁদের ফারাকটা হয় আকাশ-পাতাল। *রেনেসাঁসের* নায়কদের কাছে কোম্পানির শাসন শুধু শরণের ক্ষেত্রে নয় বরং নূতন সভ্যতা ও যুক্তিবাদের অগ্রদূত। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে ভারত আধুনিক যুগে *জ্ঞানালোকদীপ্ত* ভূমিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। সকল আনুগত্যের ভাষা এবং মনের প্রত্যাশাই বদলে গেল। দেশজ সংস্কৃতির নানা ধারা থেকে রামমোহন তাঁর জীবন অভিব্যক্তির রসদ নিয়েছিলেন। পণ্ডিতসমাজের সঙ্গে বা শাস্ত্রবিচারের পদ্ধতির সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র অপরিচিত ছিলেন না। কিন্তু একই সঙ্গে কোম্পানির শাসন বা তার আমলাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বক্তব্য লেখা এবং ইংরেজ শাসনকে প্রতীচ্য যুক্তি ও জ্ঞানের উৎস বলে স্বীকার করে তার প্রতি মানসিক দায়বদ্ধ থাকার টানাপোড়েন রাজীবলোচন, মৃত্যুঞ্জয়, তাহের মামুদ বা রামপ্রসাদ মৈত্রেয়ের মানসজগতে ছিল না। যে মুহূর্তেই উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীরা শাসন ও শরণের জগত থেকে উচ্চতর সভ্যতাকে স্বাগত জানালেন, মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে আলোর পথের যাত্রী হিসাবে ইংরেজ শাসনকে পথপ্রদর্শক

বলে স্বীকার করে নিলেন, তখনই তাঁদের স্বপ্নের সার্বভৌম রাষ্ট্রও গড়ে উঠল পশ্চিমি ছাঁচে। বাঙালিরা মুখ্যত সেই রাষ্ট্র গড়ার তাগিদেই ইতিহাস লিখল। সেই প্রক্রিয়ায় কোম্পানির শাসনের নির্মিতেই বদলে গেল।[৫২]

মজার ব্যাপার হল, মৃত্যুঞ্জয়দের ধারণাটি আবার নূতন প্রসঙ্গে ফিরে এসেছিল। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়দের রচনায় বিশ্বাসঘাতকতা বা নিমকহারামির জিগির আবার শোনা যায়, মীরজাফর বা জয়চাঁদরা শয়তানের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়ান। ইংরেজবিরোধী দেশজ নাটক বা জনপ্রিয় ইতিহাস অন্তত এই ধারণা বা চরিত্রের জন্যে রাজাবলীর কাছে ঋণী। অবশ্য কোনো সময় কেউ সেই ঋণ স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেননি।[৫৩]

অবশ্যই পরবর্তীকালে এই ধারণা ব্যবহৃত হয়েছিল অন্য প্রেক্ষাপটে। নিমকহারামি হয়েছিল *জাতীয় চরিত্রের* দুর্বলতা। ফলে, সেইজন্য ভারত বা বঙ্গবাসীর স্বাভাবিক ন্যূনতা, সেইজন্যই ইংরেজ চরিত্র শিক্ষণীয়। জাতীয় চরিত্র গঠনে কুদৃষ্টান্ত দেখিয়ে দোষ সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার কথা কে-ই বা অস্বীকার করবে? নিমকহারামির তুল্যমূল্য বিচারও তাই অন্য এক ছকে করা হয়, নিছক ধর্ম বা অধর্মের নিরিখে নয়।

কিছু ঋণ স্বীকারের অপেক্ষাও বড়ো প্রশ্ন থেকে গেছে। আধুনিককালে সাইদ থেকে রোনাল্ড ইনডেন পর্যন্ত দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে প্রতীচ্য কীভাবে প্রাচ্যকে গড়ে তুলল, প্রাচ্যবিদ্যার নানা চর্চার জ্ঞানাঙ্গন কীভাবে প্রমা/ক্ষমতার সংযোগে বাধল সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের পারস্পরিক বোধকে।[৫৪] পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত দেশজ বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের দায় ও উপলব্ধির ভিত্তিভূমি, তাদের পরবোধ ও আত্মবোধের নানা ক্ষেত্র নিয়েও জরিপের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু এই জ্ঞানাঙ্গনের বিন্যাসের অনেকটা উনিশ শতকীয় যুক্তিবাদ থেকে আহৃত, সবরকমের রদবদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন সত্ত্বেও জ্ঞানদীপ্ততা, নিঃসংশয়ী প্রগতিতে আস্থা ও সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র তৈরি করার প্রস্তুতি এই জ্ঞানাঙ্গনের কেন্দ্রে অবস্থিত। ক্ষমতার বিচারে এই প্রতীচ্যাভিমুখী জ্ঞানাঙ্গনই ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আদর্শ নির্মাণে জয়ী, অন্তত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীসমাজে তো বটেই। কিন্তু তার বিপরীতে যে জ্ঞানাঙ্গন ছিল বা আজও নানাস্তরে নানাভাবে সক্রিয়, তার খোঁজ কে রাখে? *প্রগতিবাদী, যুক্তিবাদী* জ্ঞানাঙ্গন গড়ে ওঠার ইতিহাস বা তার বিন্যাসের নানা ছক বোঝবার জন্যই আমাদের বিপরীত *সনাতনী* জ্ঞানাঙ্গনের নানা অভিব্যক্তিকে খুঁটিয়ে দেখা দরকার, বোঝা দরকার প্রতীচ্যের বোধ বা প্রাচ্যবিদ্যার কেতাবী চর্চার বাইরেও এই জ্ঞানাঙ্গন কোনো কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক দায় বহন করে, তার চিন্তা বা চেতনার নিজস্ব জোর কোথায়, কোথায় তার ছক প্রতীচ্যের ছককে নাকচ করে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে, আবার কোথায় বা মোকাবিলা করতে গিয়ে নিজেরই অবস্থান বদলায়। তা না হলে কোনোদিনই নিরাকারত্ব ও নিরবয়বতার বজ্জাতি, দ্বিচারিতা এবং

অসম্পূর্ণতার দায় ও অভিযোগ থেকে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তিবাদ মুক্ত হতে পারবে না। আমাদের কাছে, কৃষক বিদ্রোহ ও সাম্প্রদায়িকতা দুইটিই শুধু কিছু লোকের *উসকানি আর দুষ্টু অভিসন্ধির* ফল বলে মনে হবে; কিছুতেই আমরা বুঝব না মসজিদ ও মন্দিরের ক্ষেত্র এবং আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্র জনমানসে সত্তার নানাস্তরে কী সম্পর্কেই বা বিধৃত থাকে, চৈতন্য কীভাবেই বা ইতিহাস ও অতিকথা আনুগত্য ও ন্যায়বোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, কীভাবেই বা শাসকশ্রেণি সেই প্রক্রিয়াকে আত্মসাৎ করে। অন্য এক সময়ে অন্য এক কালে রামপ্রসাদ মৈত্রেয় বা মৃত্যুঞ্জয়রা এই অন্যজগতেরই চিত্র তুলে ধরেছিলেন। ভাষাতত্ত্বের চর্চার সীমানা ছাড়িয়ে তাদের রচনার সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য আজকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

উল্লেখপঞ্জি

১. কবিতাটির রচনাকার রামপ্রসাদ মৈত্রেয়, ১২২০ সাল কার্তিক, নিবাস নাকালিয়া, জেলা পাবনা। দ্র., হরগোপাল দাসকুণ্ডু, *প্রাচীন গ্রাম্য কবিতা সংগ্রহ : নাটোরের কবিতা,* রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৪।

২. বৈদ্যনাথ দেবশর্মা, অশৌচ পাঁচালী, উদ্ধৃত সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৫৭৩

৩. রতিরাম দাসের রঙ্গপুরের জাগের গান, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, ৪র্থ সংখ্যা। কবিতাটির সংগ্রাহক যাদবেশ্বর তর্করত্ন। আংশিক পুনর্মুদ্রিত, Narahari Kaviraj. *A Peasant Uprising in Bengal,* 1783. Calcutta, 1972. p. 102। গাথায় রাজবংশী গোষ্ঠীর চৈতন্য প্রকাশিত হয়েছে। 'ভঙ্গক্ষত্রি রাজবংশী এই নামে আছি', এই বলে কবি রাজবংশীদের পরিচয় গাথাটি গোড়ায় বর্ণনা করেছেন। নরহরি কবিরাজ বা দীনেশচন্দ্র সেন *(বঙ্গসাহিত্য পরিচয়,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়*)* উপর্যুক্ত প্রসঙ্গটি বাদ দিয়ে পুনর্মুদ্রণ করেছেন।

৪. কালীপদ বাগছীর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সমেত কবিতাটি *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা-য়* ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মৎকৃত নাতিদীর্ঘ আলোচনা সমেত কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয় : *বারোমাস,* শারদীয় ১৯৮৭, পৃ. ১৬৬-৭৬। বর্তমানে আলোচিত অংশটি উপর্যুক্ত প্রবন্ধের উপর নির্ভরশীল।

৫. ঐ, পৃ. ১৬৭-৬৮।

৬. ঐ, পৃ. ১৬৯।

৭. ঐ, পৃ. ১৭০।

৮. ঐ, পৃ. ১৬৭।

৯. রামপ্রসাদ মৈত্রেয়ের লেখা দুটি কবিতা আছে। আগেই বলা হয়েছে যে একটি *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*-য় প্রকাশিত হয়েছে। অপর কবিতা প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। *ঐতিহাসিক চিত্র*, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৮৯৯। বর্তমান প্রবন্ধে প্রথমোক্ত কবিতাটি মৈত্রেয় (১) ও দ্বিতীয়টি মৈত্রেয় (২) বলে নির্দেশিত হল।

১০. মৈত্রেয় (২), ঐ, পৃ. ৯৭।

১১. মৈত্রেয় (১), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

১২. ঐ, পৃ. ১৮২।

১৩. ঐ, পৃ. ১৮৩।

১৪. মৈত্রেয় (২), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯।

১৫. ঐ, পৃ. ৯৯।

১৬. ঐ, পৃ. ১০০।

১৭. ঐ, পৃ. ১০১।

১৮. ঐ, পৃ. ১০২।

১৯. জয়নারায়ণ ঘোষাল, করুণানিধান বিলাস, খিদিরপুর ১৮১৪, পৃ. ২৯৪। বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

২০. ঐ, পৃ. ৩৫০।

২১. ঐ, পৃ. ৬।

২২. ঐ, পৃ. ২৯৬-৯৭।

২২ক. জীবনী ও কার্যাবলীর জন্য দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামরাম বসু, *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, প্রথম খণ্ড, নং ৬। কলিকাতা, ১৩৮৩।

২২খ. *লিপিমালা*, মিশনপ্রেস, শ্রীরামপুর, ১৮২০, পৃ. ৩-৪।

২২গ. তুলনায় S. k. De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century*, Calcutta, 1962, p. 156

২২ঘ. *লিপিমালা*, পৃ. ৫১-৫৩।

২২ঙ. ঐ, পৃ. ৬৫-৬৬।

২২চ. ঐ, পৃ. ১৩২, ১৮১, ৪১-৪৭, ১০৬-১৬, ১২০-৩২, ১৭৯-৮৪, ২০৭-০৯ ইত্যাদি।

২২ছ. ঐ, পৃ. ৮৮, ১৪৭, ১৪৯, ১৫১ ইত্যাদি।

২৩. রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং* (১৮০৫), পুনর্মুদ্রিত, কলিকাতা ১৩৪৭। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ভূমিকা লিখিত। বর্তমান প্রবন্ধে এই সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছে। তথ্যাদির জন্য দ্রষ্টব্য, *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮৩, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, নং ১৪।

২৪. Sushil Kumar De, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৭৭-৭৮।

২৫. রাজীবলোচন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

২৬. ঐ, পৃ. ২৫।

২৭. ঐ, পৃ. ২৬-২৭।

২৮. ঐ, পৃ. ৩৩।

২৯. ঐ, পৃ. ৩৪।

৩০. ঐ, পৃ. ৩৪-৩৫।

৩১. ঐ, পৃ. ৩৫-৩৬।

৩২. ঐ, পৃ. ৩৮।

৩৩. উদ্ধৃতিগুলির জন্য দ্রষ্টব্য ঐ, পৃ. ৩৯-৫০।

৩৪. ঐ, পৃ. ৩৮, ৫৮।

৩৫. মৃত্যুঞ্জয় শর্মণ কৃত রাজাবলী ইত্যাদি, পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৮৯ সাল। প্রবন্ধে এই সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের রাজাবলী যে ভুঁইফোঁড় রচনা নয়, তার পক্ষে গৌণ প্রমাণ দাখিল করা যেতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ময়মনসিংহের আচার্য বংশ দত্ত একটি ছয় পৃষ্ঠার সংস্কৃত পুথি আছে। ওই পুথিটারও নাম রাজাবলী। সেই পুথিতে বর্ণিত বংশপঞ্জিকার সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় প্রদত্ত বঙ্গের আদি তালিকার প্রায় হুবহু সাদৃশ্য দেখা যায়। রাজাদের রাজ্যকালের সময়বিন্যাসের মিলও লক্ষণীয়। পুথিতে ব্যবহৃত শ্লোকগুলি অন্যান্য কুলজি গ্রন্থেও সহজলভ্য। বৈদ্য বংশ প্রসঙ্গে পুথিতে উল্লেখ আছে। রাজাবলীর শ্লোক মুক্তাগাছার কবিরাজ ছেলেবেলায় কণ্ঠস্থ করে রাখতেন, সেইগুলি নাকি বংশে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের অনুমান, এই খুদে *রাজাবলী*, হয়ত প্রচলিত বৃহত্তর রাজাবলীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কুলজি গ্রন্থের নানা প্রচলিত শ্লোক থেকে অনুমান করা অসংগত নয় যে এইরকম পুথির তথাকথিত *ঐতিহাসিক মূল্য* যাই হোক-না-কেন, এই জাতীয় জনশ্রুতিই তখন *ইতিহাস* বলে পরিগণিত হয়। মুঘল বা ইংরেজ শাসন প্রসঙ্গে অবশ্য পুথিতে কিছু লেখা নেই। দ্র. রমেশচন্দ্র মজুমদার, সংস্কৃত *রাজাবলী গ্রন্থ*, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৬ : ৪, ১৩৪৬ ব., পৃ. ২৩২-৩৯। সংক্ষিপ্ত ইংরেজী প্রবন্ধ, *An Indigenous History of Bengal*, Proceedings. Indian Historical Record Commission, Vol. XVI, Calcutta, 1939. Simla, 1940.

৩৬. কেরি সাহেবের চিঠি দ্রষ্টব্য, Sisir Kumar Das, *Sahibs and Munshis, An account of the College of Fort William*, New Delhi, 1978, pp. 105-06; David Kopf, British Orientalism and Bengal Renaissance. Calcutta. 1969. p. 125.

৩৭. তুলনীয় Sushil Kumar De, প্রাগুক্ত pp. 192-94; এই আদি রচনাগুলির পৌরাণিক সময় ও ঐতিহাসিক সময়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে চিত্তাকর্ষক আলোচনা, Ranajit

Guha. *An Indian Historiography of India : A Nineteenth-Century Agenda & its implications*, Calcutta, 1988 pp. 31-36.

৩৮. মৃত্যুঞ্জয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

৩৯. ঐ, পৃ. ১১৬-১৯।

৪০. ঐ, পৃ. ১২১-২৯।

৪১. পরবর্তীকালে মুসলিম শাসনের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের মনোভাব প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Sumit Sarkar, *Rammohun Roy and the Break with the Path* in V. C. Joshi ed. Rammohun Roy and the process of modernization in India, New Delhi, 1975, p. 58-59।

৪২. রাজাবলী, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৫৬।

৪৩. ঐ, পৃ. ১৫৭-৫৮।

৪৪. ঐ, পৃ. ১৬০।

৪৫. ঐ, পৃ. ১৭০।

৪৬. ঐ, পৃ. ১৭১। মুসলমান আগমনের পূর্বে মৃত্যুঞ্জয়ের মন্তব্য হইল,

এ হিন্দুস্তানে যবনের সঞ্চার হইল, কেননা শত্রু সঞ্চারের ও রাষ্ট্র বিভ্রাটের প্রধান কারণ পরস্পর অনৈক্য ও স্ব স্ব প্রাধান্য। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্যের কথাও তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন। (পৃ. ৬৮-৬৯) আবার সংযুক্তাতে আসক্ত হয়ে পৃথ্বিরাজ রাজকর্ম্মে অবহেলা করেছিলেন। 'রাজার অনীত্যাচরণে রাজলক্ষ্মী কখনও থাকেন না।' (পৃ. ৬০) হিন্দু রাজত্বের পতনের যুগে ও যবনদের আগমনে যবন রাজারাই নীতিনিষ্ঠ, মৃত্যুঞ্জয় এই ধারণা নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন।

৪৭. প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, *রামমোহন রায় ও বাংলা গদ্য*, *বারোমাস*, এপ্রিল, ১৯৯০, পৃ. ৬।

৪৮. প্রবোধচন্দ্র সেন, *বাংলার ইতিহাস সাধনা*, কলিকাতা, ১৩৬০, পৃ ১৭-১৮। শ্যামলী সুর, 'বাঙালীর ইতিহাসচর্চার কয়েকটি দিক, ১৮৩৫-৭৪' *ঐতিহাসিক* (প্রবন্ধ সংকলন), প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৮৩, পৃ. ১৮।

৪৯. তুলনীয় Ranajit Guha, পূর্বোল্লিখিত, pp. 48-55।

৫০. Karl Marx. *The Eighteenth Brumaire of Luis Bonaparte*, Moscow, 1965. p. 10.

৫১. রামরাম বসু, *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র*। যিনি বাস করিলেন যশহরের ধূমঘাটে ইত্যাদি। শ্রীরামপুর, ১৮০১। পৃ ৩, ৪৩-৪৮, ৯৪ ও ১৪৯-৫০।

৫২. বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে আলোচনা, Ashok Sen, Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestones, p. 145-57; রামমোহন প্রসঙ্গে, Sumit Sarkar, পূর্বোল্লিখিত। Ashok Sen, The Bengal Economy and Rammohan Roy,দ্র. V.C Joshi, সম্পাদিত গ্রন্থ, p.p103-35.। রামমোহনের সেক্রেটারি আর্নটের কাছে পাওয়া এক আত্মজৈবনিক

চিঠি থেকে জানা যায় যে, যৌবনের প্রারম্ভে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠার প্রতি রামমোহন বিশেষ বিরূপ ছিলেন। চিঠিটার প্রামাণিকতার পক্ষে যুক্তির জন্য দ্রষ্টব্য দিলীপকুমার বিশ্বাস, *রামমোহন-সমীক্ষা*, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৪০০-০১। রামমোহনের মানসজগতে বিভিন্ন ঐতিহ্যের প্রভাব প্রসঙ্গে এতাবৎকাল শ্রেষ্ঠ আলোচনা এই গ্রন্থেই করা হয়েছে।

৫৩. দ্র. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *সিরাজদ্দৌলা* (১৮৯৭), কলিকাতা, ১৯০৮, তৃতীয় সংস্করণ। যেমন,

আমাদিগের মীরজাফর আমাদিগের রায়দুর্লভ, আমাদিগের জগৎশেঠ, আমাদিগের স্বদেশীয় রাজকর্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতাই সিরাজদ্দৌলার সর্বনাশের মূল। (পৃ. ৩৫৬)

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সিরাজকে বাঙালি জাতির অঙ্গ করে নিয়েছিলেন, সেইজন্যই ইতিহাস রচনা।

মুসলমান নবাব আপনাকে বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। বাঙ্গালাদেশই তাঁহার স্বদেশ, এবং বাঙ্গালী জাতিই তাঁহার স্বজাতি হইয়া উঠিয়াছিল। (পৃ. ৪)

কিন্তু এই জাতীয় সত্তার ইতিহাস রচনায় পাশ্চাত্য জ্ঞানদীপ্ততার প্রতি, ইংরেজ শাসনের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাতে অক্ষয়কুমার দ্বিধা বোধ করেননি। স্পষ্টই বলেছেন,

চরিত্রহীনতায় রোমক সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইয়াছিল, চরিত্রহীনতায় ভারতের অভ্যুদয় হইয়াছে। ভগবানের ইচ্ছায় হলাহল হইলেও অমৃতের উৎপত্তি হয় বলিয়া যাহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা আমাদের ইতিহাসে সে বিশ্বাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। (পৃ.৩৫৭)

এবং ভারতের ভবিষ্যৎ যৌথ শাসনে, ইংরেজ ও ভারতীয়ের পারস্পরিক সহযোগিতায়।

আর ভারতবর্ষের বর্ত্তমান নবজীবনের কথা স্মরণ করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের পথ যতই নিন্দার্হ হউক, গরলে অমৃত হইয়াছে, নব্যভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইংরাজ বণিক সহায়তা না করিলে, এই শুভফল সমুৎপন্ন হইত কিনা তাহাতে কিন্তু সমূহ সন্দেহ।....আমাদের কল্যাণের জন্য ইংল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ডের গৌরবর্দ্ধনের জন্য আমরা, এই দুই মহাজাতি এক অখণ্ড রাজতন্ত্রের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া, পরস্পরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া, বাহুতে বাহুবন্ধন করিয়া গৌরবোজ্জ্বল নবযুগে পদার্পণ করিয়াছি। (পৃ.৪১৩-১৪)

এই যৌথ প্রচেষ্টার ছক ও যৌথ শাসনের আশা মৃত্যুঞ্জয় করতেই পারতেন না। তাই তাঁর আনুগত্যের ভাষায় এবং অক্ষয়কুমারের আনুগত্যের ভাষায় ফারাক আকাশ পাতাল।

নিখিলনাথ রায় অবশ্যই ব্যতিক্রম। দ্র. প্রতাপাদিত্য, ১৩১৩/১৯০৬। তিনি রামরাম বসুর রচনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, প্রতাপাদিত্য চরিত্র 'বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ' কারণ 'পাশ্চাত্য ভাষা সমূহে যে প্রণালীতে ইতিহাস বা চরিতগ্রন্থ লিখিত হয়, রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র সেইরূপভাবেই লিখিত হইয়াছিল' মডেল

পাশ্চাত্যের। তার সঙ্গে *প্রতাপাদিত্য চরিত্র*-কে মেলাতে গিয়ে নিখিলনাথকে প্রাণান্তকর প্রয়াস করতে হয়। প্রতাপাদিত্যের গালগল্পের আধিক্যকে সমর্থন করার জন্য তাঁর যুক্তি হল যে, যেহেতু প্রকৃত ইতিহাস নাই, সেই হেতু প্রবাদনির্ভরতাই ইতিহাসের অবলম্বন। পৃ. ১৯৮-৯৯।

৫৪. Edward Said, *Orientalism*, Peregrine Books, 1985. Ronald Inden, *Imagining India*, Cambridge 1990.

লোকায়ত বিশ্বাসের উজানযাত্রা
'আরণ্যক' থেকে 'কেদার রাজা'

চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল

তাঁর অতীতপ্রীতির মধ্যে দিয়ে বিভূতিভূষণ কি একটি সরল, আদর্শ সমাজের কথা ভাবতেন? পিছু হাঁটতে চেয়েছিলেন কোনো ইউটোপিয়ার সন্ধানে? বর্তমানকে ঘিরে তাঁর অসন্তোষের বিপরীতে, ইতিহাসের উল্টোরথে কোন আদর্শায়িত অতীত, যার সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ে তিনি ছিলেন মানসিকভাবে উৎপীড়িত? সেই প্রশ্নের মীমাংসার সূত্র হতে পারে তাঁর জীবনের প্রায় শেষ পর্বে প্রকাশিত দুটি উপন্যাস—'আরণ্যক' এবং 'কেদার রাজা'। 'আরণ্যক' তাঁর ইউটোপিয়ার যে ভাষ্য নির্মাণ করতে চায়, 'কেদার রাজা'য় তা আকার পেয়েছে। 'কেদার রাজা' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অনাদৃত উপন্যাস। 'অপরাজিত' এবং 'আরণ্যক'-এর যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যবাহী হওয়া সত্ত্বেও 'কেদার রাজা' তাঁর সৃষ্টিশীলতার যথার্থ পরিচায়ক হয়ে উঠতে পারেনি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই মহৎ সৃষ্টি হিসেবে গণ্য করা হয়নি। বৃহৎ সৃষ্টির রঙ-তুলি দিয়ে অমনোযোগে ও অবহেলায় যেন কেদার রাজার সৃষ্টি—সমালোচকের এই মন্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য বটে, কিন্তু বিষয়গতভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক উপন্যাস হয়ে ওঠার নিশ্চিত দাবিদার। তাই পাঠকও যদি সেই অমনোযোগ ও অবহেলা ঔপন্যাসিককে ফিরিয়ে দেন, তাহলে অগোচরে থেকে যায় বিস্তর বিষয়-আশয়। একমাত্রিক উপন্যাস হলেও 'কেদার রাজা' বিভূতিভূষণের দৃষ্টি এবং মানসিকতার আদলটিকে সম্পূর্ণতা দেয়। এর অন্যতম কারণ, এই উপন্যাসটিতে রয়েছে এমন কিছু বিষয়ের বিস্তার যার সূচনা এর স্বল্পকাল আগে লেখা আরণ্যক-এ। তাছাড়া বিভূতিভূষণের পুরো সাহিত্যজীবন জুড়েই এই ভাবনার বিস্তৃতি।

চকমকিটোলার অনার্য রাজকন্যা ভানুমতীর পৃথিবীর চৌহদ্দি জানতে ব্যগ্র শহুরে ম্যানেজারবাবু তার কাছে কলকাতার নাম উল্লেখ করেন। ভারতবর্ষের অবস্থান অজানা হলেও কলকাতা ভানুমতীর কাছে অচেনা শব্দ নয়। সেই বনবালিকার জন্য ব্যাকুলতা নিয়েও সত্যচরণ না পারলেন তার সঙ্গে অরণ্যপ্রদেশে ঘর বাঁধতে, না চেষ্টা করলেন তাকে নাগরিক জগতে নিয়ে আসতে। ভানুমতীদের কাছে নগর জীবন যে স্বাগত নয় তার আভাষ 'আরণ্যক'-এ যথেষ্ট। কিন্তু পূর্ণ বিস্তারের অবকাশ সেখানে হয়নি। সেই জন্যই নগরজীবনের সঙ্গে সম্যক পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন অন্য এক ভানুমতীর। সে উপাখ্যান 'আরণ্যক'-এ নেই, আছে 'কেদার রাজা'য়। প্রত্যন্ত পল্লীর হৃতবৈভব রাজকন্যা

শরৎসুন্দরীকে তিনি হাজির করেছেন আর্যসভ্যতাদৃপ্ত নগরের নির্মমভাবে বেমানান অসহায়তায়, যা লবটুলিয়া প্রত্যাগত সত্যচরণ অনুভব করেছিলেন কলকাতার বড়বাজারে দুটি দুর্বল পশুকে নির্যাতিত হতে দেখে।

আরণ্যক-এর পাশে যত ম্লানই হোক, এই সাযুজ্যের মধ্য দিয়ে ভাবনা পারম্পর্যে সামগ্রিকতার নির্মাণ এবং উন্মোচনের ক্ষেত্রে 'কেদার রাজা'র ভূমিকা বিচারের পর্যাপ্ত পরিসর রয়েছে। সেই সামগ্রিকতা নিছক প্রকৃতিবিলাসিতায় গড়া নয়, বিভূতিভূষণের নিজেরই ভাষায় 'চৈতন্যের ব্যাপকতা'য় প্রসারিত। এই ব্যাপ্তিতে দৃষ্টিভঙ্গী বিস্তৃত করার প্রয়াস বস্তুত এক সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া যার আনুপূর্বিক গতিপ্রকৃতি লক্ষণীয় তাঁর সৃষ্টির সমগ্র পর্ব জুড়েই। বিভূতিভূষণের অরণ্য ও গ্রাম্য সমাজের প্রাচীন জীবনচর্যা সম্পর্কে অনুরাগের মূলে যে গভীর অতীতপ্রীতি, তার সঙ্গে আধুনিক নগরজীবনের সতত বিরোধ। পল্লীর জীবনযাত্রার গহীনে তিনি অনুভব করেন এক বিরল জীবনবোধ। এই ধারণা তাঁর যতই শেকড় ছড়িয়েছে, আধুনিক পৃথিবী সম্পর্কে নিস্পৃহতা বেড়েছে ততই। 'আরণ্যক'-এর সত্যচরণের চোখে লবটুলিয়ার বন্য প্রকৃতি যে মায়াকাজল পরিয়ে দিয়েছিল, তা ধুয়ে যায়নি কখনো। তাই গ্রাম্যজীবনের ধমনীতে যে 'মধ্যযুগীয় রক্তস্রোত' তিনি অনুভব করেছিলেন, তাও অনভিপ্রেত মনে হয়নি তাঁর। তথাকথিত সভ্যতা বিবর্জিত জগতে অনাদিকাল থেকে সঞ্চরণশীল বিশ্বাস ও সংস্কারকে নাগরিক সভ্যতার কুপ্রভাবের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। শহরকে তিনি জেনেছেন অপাপবিদ্ধ, সরল মানবিক অস্তিত্বের বধ্যভূমি হিসেবে। নগর থেকে দূরে যে জনজীবন, তা যত যুক্তিহীনতার আধারই হোক সেখানেই তাঁর আলোকযাত্রা। যেসব তথাকথিত কুসংস্কার, দৈবী ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, মিথের কাছে আশ্রিত সেই জীবন, তার কাছেই আমানত বিভূতিভূষণের নিজস্ব পৃথিবী। সেই ট্র্যাডিশন অটুট রাখতে সচেতনভাবেই প্রয়াসী তিনি। আগুয়ান আধুনিকতার প্রতিকূলে এ এক নিশ্চিত উজানযাত্রা। লবটুলিয়া পেছনে ফেলে আসা সত্যচরণ ক্ষমাপ্রার্থী সেই লৌকিক বিশ্বাস ও ধারণার উৎস আদিম দেবদেবীদের কাছে। তাঁর নতি ও অনুশোচনা সেই কারণেই। 'আরণ্যক'-এ লোকায়ত বিশ্বাসের আধারে দৈবীশক্তির যে অনুভব ও উপলব্ধি, তা উন্মোচিত 'কেদার রাজা'য়। আদিম দৈবীশক্তির জাগরণ ঘটে উপন্যাসের অন্তিম পর্বে। আদিম দেবতাদের জগতে উপদ্রব ঘটানোর জন্য সত্যচরণের যে অনুশোচনা ও ক্ষমাভিক্ষা দিয়ে 'আরণ্যক'-এর সমাপ্তি, তার প্রায়শ্চিত্তের দায় স্বীকার করে চিরায়ত লোকবিশ্বাসের জগতে প্রত্যাবর্তন করে 'কেদার রাজা'। গঠনগত দুর্বলতা সত্ত্বেও 'কেদার রাজা' সেই বিশ্বাসেরই ভণিতাহীন ঘোষণা। লোকজীবন থেকে নির্বাসিত আদিম বিশ্বাস ও মিথের পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাগিদে 'আরণ্যক' ও 'কেদার রাজা' আঙ্গিকগতভাবে হয়ে ওঠে এক অভিন্ন ন্যারেটিভ। এই যুগ্ম-আখ্যানের ভেতর দিয়ে বিভূতিভূষণের বাস্তব থেকে সেই মানসলোকে যাত্রা, যা তাঁর নিজের ভাষায় 'অন্য জগৎ'। আবার সেই জগৎকে তিনি উপস্থাপিত করেন 'প্রত্যক্ষদৃষ্ট বাস্তব'—এর মূর্ত পটভূমিতে।

২

'আরণ্যক' এবং 'কেদার রাজা'র আত্মপ্রকাশ যথাক্রমে ১৯৩৭ ও ১৯৪০ সালে। কাঠামোগত বৈপরীত্য ও আঙ্গিকগত অভিন্নতা নিয়ে প্রায় পিঠোপিঠি প্রকাশিত উপন্যাস দু-টি ভাবনার পারম্পর্যে নিশ্চিতভাবেই বাঁধা। প্রথমটি ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার উপর আধারিত হবার সুবাদে রিয়্যালিটি থেকে ফিকশনে উত্তীর্ণ, দ্বিতীয়টিতে ফিকশন থেকে রিয়্যালিটি-র রূপারোপিত। 'আরণ্যক'-এর যাত্রা শহর থেকে অরণ্য অধ্যুষিত পল্লী, অবশেষে আবার শহর। কিন্তু 'কেদার রাজার' যাত্রা বিপ্রতীপ—পল্লী থেকে শহর, আবার পল্লী। 'আরণ্যক'-এর অনুশোচনাগ্রস্ত নায়ক সত্যচরণ শহরে প্রত্যাবর্তন করে। কাহিনির দাবি মেনে ঘটনাপ্রবাহে এখানে ছেদ ঘটলেও শেষ বিচারে সত্যচরণের যাত্রা কিন্তু সেখানেই শেষ হতে অস্বীকার করে। নগরজীবনের ক্লেদ ও নির্মমতার অবসাদ তাকে নিতান্ত অনিবার্যভাবেই যুগিয়ে দেয় সেই মানসিক নির্জনতা যার প্রশ্রয়ে জেগে থাকে ফেলে আসা পল্লীর নাছোড় স্মৃতি আর স্বহস্তে, সচেতনভাবে বিধ্বস্ত অরণ্যের জন্য অনর্গল অনুতাপ। আর এই অনুশোচনার দায়বশতই 'আরণ্যকের' অন্তিম পর্ব জুড়ে থাকে পেছনে ফেলে আসা অরণ্যজীবনে তার মানস ভ্রমণ। 'কেদার রাজা' সেই ভ্রমণ বাস্তবে সম্পূর্ণ করে। সেই সম্পূর্ণতা আসলে নগর জীবনের আধুনিকতার মুখোমুখি সনাতন জীবনধারার মরিয়া চ্যালেঞ্জ। পরিণামে বিভূতিভূষণ প্রত্যাশিতভাবেই জিতিয়ে দেন ট্র্যাডিশনকে।

ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সে সিভিলাইজিং মিশন-এর প্রতীক রেলগাড়ি এবং জাদুঘর। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিতে যার মাধ্যমে স্থান-কাল জয়ের সুবাদে আধুনিক যুগের সূচনা। ট্রেনযাত্রার মাধ্যমেই নিকট পেয়েছে দূরের সান্নিধ্য, জানা পেয়েছে অজানার, প্রতিবেশী পেয়েছে আগন্তুকের। এই যাত্রার সুযোগেই ঘটে স্থানান্তর, অচেনা সমাজের সঙ্গে পরিচিতি। এই যাত্রা যেমন স্থানগত, তেমনি কালের যাত্রার প্রতীক জাদুঘর।[১] সমসময়কে পেরিয়ে ইতিহাস ও অতীতসমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়। ঔপনিবেশিক যুগের প্রায় শেষ প্রহরে লেখা এই উপন্যাস দু-টি সেই সরণি বেয়ে পৌঁছে যায় সেই জাদুঘরে যা বিভূতিভূষণের নিজের ভাষায় 'অলিখিত ভারতবর্ষের ট্র্যাজিক অধ্যায়'। 'ভিন্ন যুগের আবহাওয়ায়, ভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে বিপর্য্যস্ত' সেই ট্র্যাডিশন কিন্তু এখানে কোনো আধুনিক মিউজিয়ামের প্রদর্শ ফসিল নয়, বরং উজ্জীবনসন্ধানী এক প্রাচীন লোকজীবন, যা ঔপনিবেশিক সভ্যতার আলোকরশ্মির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর। স্থান-কালকে জয় করার ঔপনিবেশিক প্রকল্পের সামূহিক লক্ষ্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে নতুন পাওয়ার-স্ট্রাকচার প্রতিষ্ঠা করে প্রাচীন লোকজীবন, পরিবেশ ও সংস্কৃতির সমূলে বিনাশ ঘটিয়ে আধুনিকতার গোড়াপত্তন। সনাতন জীবনের অঙ্গ যে অরণ্যভূমি ও পল্লীজীবন, তাকে বিধ্বস্ত করে গড়ে ওঠে নতুন অর্থনৈতিক কাঠামোর বিন্যাস। এরই পরিণতিতে যথারীতি হারিয়ে যায় প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শহরগুলির গুরুত্বও। উনিশ শতকের গোড়ায় উপনিবেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির কেন্দ্র হিসেবে নতুন শহরের

আবির্ভাব, যার প্রতিভূ কলকাতা। 'পরিবর্তন-বিরোধী', 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' পল্লীজীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে এই নতুন শহরের উত্থান।

'আরণ্যক' প্রত্যন্ত অঞ্চলের অরণ্যবাসী উপজাতি সমাজের গল্প। 'কেদার রাজা' তা নয়। সেখানে উচ্চবর্ণের হিন্দু চরিত্রেরাই কুশীলব। প্রথমটির পটভূমি অরণ্য অধ্যুষিত বিহার, দ্বিতীয়টির পল্লীবাংলা। অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, বিভূতিভূষণের যুগলমেরু অরণ্য ও পল্লী। ভৌগোলিক পটভূমি বিহার হোক অথবা বাংলা, প্রাচীন জীবনধারা যে ঔপনিবেশিক নব্য সভ্যতার সঙ্গে সংঘাতে মুমূর্ষু সেই সত্যটিকেই সামনে রেখে অতীতজীবনের উজানযাত্রী বিভূতিভূষণ।

ভাগ্যসন্ধানী যুবক সত্যচরণ জীবিকার তাগিদে নগরজীবনে সাময়িক ইতি টেনে বি এন ডব্লু রেলওয়ের একটি ছোট্ট স্টেশনে পৌঁছোয়। তার দায়িত্ব ছিল জমিদারের এলাকাভুক্ত ত্রিশ হাজার বিঘায় বিস্তৃত জঙ্গলের জমির প্রজাবিলি। সেই দায়িত্ব পালন যে বস্তুত অরণ্যবিনাশ, সেই উপলব্ধি হবার পর ম্যানেজার সত্যচরণের স্বগত আক্ষেপ : "আমার জমিদাররা ল্যান্ডস্কেপ বুঝিবে না, বুঝিবে সেলামির টাকা, খাজনার টাকা, আদায় ইরসাল, হস্তবুদ।" জমিদার যেমন ল্যান্ডস্কেপ বোঝে না, সত্যচরণও তেমনি স্পষ্টভাবে বুঝে ওঠেনি যে, এই ধ্বংসলীলা প্রকৃত প্রস্তাবে জমিদারি নির্দেশ নয়, ঔপনিবেশিক সরকারেরই ফরমান। সত্যচরণ এও বোঝেনি যে 'ল্যান্ডস্কেপ' ধারণাটি বস্তুত ঔপনিবেশিক নির্মাণ এবং সে নিজে অবচেতনে সেই আধুনিকতায় সংক্রমিত। স্যার সিসিল বীডন লেফটেন্যান্ট গভর্নর হয়ে আসার পর থেকে বাংলা বিভাগে আর্থিক পুনর্গঠনের কাজ জোরদার হয়ে ওঠে। সরকারের আয় বাড়ানো এবং দেশীয় ভূস্বামীদের সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়তা করাই ছিল তাঁর নীতি। ১৮৬২ সালে তিনি সরকারি অনুমতিক্রমে এক আদেশ জারি করেন, যার ফলে সমস্ত পতিত জমি, অরণ্য, গিরিপর্বত সমেত, বিক্রি হতে থাকে। তখন নীলচাষের কেন্দ্রও বিহারে স্থানান্তরিত। পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা, চম্পারণ ইত্যাদি অঞ্চলে ব্যবসায়ী ও ভূস্বামীদের দৃষ্টি পড়ে। তারা হাজার হাজার বিঘা জমি কিনতে শুরু করে। চালু হয় জঙ্গল মহাল প্রথা।[২] এই নতুন ভূমি ব্যবস্থার শিকার হয় ভূস্বামীরা আর প্রতিপত্তি ঘটতে থাকে নব্য ধনিক সম্প্রদায়ের, যারা সামাজিক কৌলিন্য অর্জনের কৌশল হিসেবে পুরোনো প্রথাগত সামাজিক সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিয়ে ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতাকেই আঁকড়ে ধরে। একদিকে আগুয়ান আধুনিকতার কাছে সমর্পিত মানবসভ্যতা, অপরদিকে ক্রমবিলীয়মান ঐতিহ্য। এ দুয়ের অনিবার্য দ্বন্দ্বে বুঝি ইতিহাসই বেপথু। পুরোনোকে দুমড়ে যে যুগের অর্বাচীন উত্থান, তা অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। মোটরগাড়িতে বুদ্ধগয়া প্রত্যাগত নাগরিক দম্পতিকে দেখে 'অপরাজিত' উপন্যাসের অপু ভাবে : 'শতাব্দীর ঘন অরণ্য পার হইয়া এমন একদিন নামিয়াছে পৃথিবীতে, পুরাতনের সবই চূর্ণ করিয়া, উলটাইয়া-পালটাইয়া নবযুগের পত্তন করিয়াছে। রাজা শুদ্ধোধনের কপিলাবাস্তুও মহাকালের স্রোতের মুখে ফেনার ফুলের মতো কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, কোনো চিহ্নও রাখিয়া যায় নাই— কিন্তু তাঁহার দিগ্বিজয়ী পুত্র দিকে

দিকে যে বৃহত্তর কপিলাবাস্তুর অদৃশ্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন— তাঁহার প্রভুত্বের নিকট এই আড়াই হাজার বৎসর পরও কে না মাথা নত করিবে?' নতুন ভূমিব্যবস্থার শিকার যে প্রাচীন ভূস্বামীরা, তাদের প্রতিনিধি হৃতগৌরব দোবরু পান্না আর কেদার রাজার হৃতশ্রী রাজপরিবার। প্রকৃতির বিরাটত্বের সঙ্গে সেই ট্র্যাডিশন স্থান-কালের গণ্ডি পেরিয়ে এক রেখায় এসে মিলিত : 'নীল ধনঝরি শৈলমালা ভানুমতীদের দেশকে রাজ্যহীন রাজা দোবরু পান্নার রাজ্যকে মেখলাকারে ঘেরিয়া আছে।' গর্বোদ্ধত বর্তমানে দাঁড়িয়ে এক বিধ্বস্ত অতীতের দীপ্তি স্পর্শ করে স্পন্দ্যমান ইতিহাসকে। সে ইতিহাস এক বীরবংশের, যারা তীর ধনুক নিয়ে লড়েছে সাম্রাজ্যবাদী মুঘল আর কোম্পানির বিরুদ্ধে। দারিদ্র্য সত্ত্বেও বীরবর্দী রাজবংশের মর্যাদাবোধ অটুট। সেই মর্যাদাবোধের আঁচ লাগে বলেই আদিম অথচ অভিজাত রাজবংশের বীরের অনুরোধ সত্যচরণের কাছে আদেশের সামিল।

এক প্রতাপশালী, অভিজাত অতীতের প্রেক্ষাপটে যেভাবে বিভূতিভূষণ শ্রীহীন, বিধ্বস্ত বর্তমানকে আবিষ্কার করেন দোবরু পান্নার অরণ্যসাম্রাজ্যে, সেই অনুষঙ্গ আরও ব্যাপ্তি পায় 'কেদার রাজা'য়। 'আরণ্যক'-এ যা ছিল বৃহত্তর ন্যারেটিভের অন্যতম অংশ বিশেষ, এখানে সেটাই মূল ন্যারেটিভের সারকথা। তাকে ঘিরেই কাহিনির আদ্যোপান্ত। কেদার রাজার পরিচয়ের গৌরব বাদুরনখীর জঙ্গলে ঢাকা ধ্বংসস্তূপের শ্যাওলায় মাখামাখি। অনার্য না হলেও কেদার একই রকম হৃতগৌরব, হতদরিদ্র রাজা যার নিতান্ত নগণ্য অধিবাস গড়শিবপুর পল্লীর উপান্তে। লোকালয় থেকে অনেকটাই দূরত্বে। কিন্তু রাজগৌরব, দারিদ্র্য, প্রাচীনত্ব, পরিবেশ, লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য, বিশ্বাস ও সংস্কারের নিরিখে 'আরণ্যক'-এর চকমকিটোলা ও কেদার রাজা-র গড়শিবপুরের ভূগোল-ইতিহাস, মিথ, জনশ্রুতি একান্তভাবেই ঘনিষ্ঠ। বীরবর্দী পরিবারের মতো কেদার রাজার পূর্বপুরুষদের ইতিহাস বীরত্ব ও মুসলমান শক্তির বিরোধিতার উপাখ্যান। দোবরু পান্নার লুপ্ত অতীত জেগে থাকে শুধু স্মৃতিতে নয়, ধনঝরি পাহাড়ের প্রান্তর আর জঙ্গলের মধ্যে উঁচু স্তম্ভের ভগ্নাংশে। জঙ্গলের নির্জনতায় আদিম সাম্রাজ্যের সীমানার নিশানা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই স্তম্ভ দোবরুর উত্তেজক স্মৃতি : 'এই পাহাড়, জঙ্গল, সারা পৃথিবী আমাদের রাজ্য ছিল।' গভীর অরণ্যে পাহাড়ের মাথায় সুড়ঙ্গের ভেতর পূর্বপুরুষদের দুর্গপ্রাসাদ আর বিরাট বটের ছায়ায়, পাথর চাপা প্রাচীন রাজবংশের সমাধিস্থল। তাদের গাম্ভীর্য, রহস্যময়তা ও প্রাচীনত্বের আবহে সত্যচরণ 'যেন সর্ব্বব্যাপী শাশ্বতকালের পিছন দিকে বহু দূরে অন্য এক অভিজ্ঞতার জগৎ আবিষ্কার করেন'। পৌরাণিক ও বৈদিক যুগ তার তুলনায় বর্তমানে এসে পড়ে। কেদার রাজার জগৎও সেই প্রাচীনেরই দোসর। তারও অনুষঙ্গে ছাতিম গাছের বন আর বিকট আকৃতির ভাঙা পাথরের মূর্তি। পোড়োবাড়ির ধ্বংসস্তূপ, সদর দেউড়ির ভগ্নাবশেষ, কাছারিবাড়ি, লুপ্ত নহবৎখানার উঁচু থাম আর উত্তরের দেউল-এ বেতের দুর্ভেদ্য ঝোপের আড়ালে ছড়িয়ে থাকা ভাঙা থামের মাথা গড়শিবপুরের সুপ্রাচীন রাজঐতিহ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

রাজঐতিহ্য দোবরু পান্নার অস্তিত্ব, আভিজাত্য আর আত্মমর্যাদার শেকড়। অপরদিকে কেদার তাঁর প্রতাপশালী পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে আপাত-উদাসীন, কিন্তু বিলক্ষণ সচেতন। তাঁর রাজঅভিমান তীব্রতা পায় আচম্বিতে, ক্ষেত্রবিশেষে। ভিন্ন যুগের মহিমায় চকমকিটোলার অনার্য নৃপতির গোচারণ, আর গড়শিবপুরের রাজা কৃষ্ণযাত্রার আখড়ায় সখের বেহালাবাদক। জীবিকার তাড়না যত তীব্র হোক, পরিবর্তিত সময়ও তাদের পেশাগতভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। কেদার আগত অতিথিকে অবলীলায় নিজ পরিচয় দেন : 'আমিই রাজবাড়ির রাজা, আমারই নাম কেদার রাজা।' ঠিক যেমনভাবে দোবরু পান্নার পরিচয় সত্যচরণের সঙ্গে। দুই হতদরিদ্র রাজার পাশাপাশি অনিবার্যভাবে এসে দাঁড়ায় তাদের পরবর্তী প্রজন্মও, দুই রাজকন্যা—ভানুমতী আর শরৎসুন্দরী। যে পরিবারের অস্তিত্ব দেনার দায়ে মহাজনের কৃপাপ্রার্থী, সেই বংশের মেয়ে হাত উঁচিয়ে চারদিকে ঘুরিয়ে দাবি করে—'এই সমস্ত দেশ আমাদের রাজ্য ছিল! সারা পৃথিবীটা। বনে যে গোঁড় দেখেন, সাঁওতাল দেখেন ওরা আমাদের জাত নয়। আমরা রাজগোঁড়। আমাদের প্রজা ওরা, আমাদের রাজা বলে মানে।' ভানুমতীকে যদি 'ইতিহাসের ট্র্যাজিক অধ্যায়ের' নায়িকা বলে ধরে নেওয়া যায়, তবে শরৎসুন্দরীও তার চেয়ে কোনো অর্থেই আলাদা নয়। ভানুমতী অবিবাহিতা, কিশোরী আর শরৎ যুবতী, বিধবা। ভানুমতীর মতোই বেলা-অবেলায় রাজপরম্পরার গর্ব উথলে ওঠে শরতেরও। মলিন জীবনের নির্জনে প্রাচীন আভিজাত্য আর রাণীর আত্মবিসর্জনের মিথ স্বপ্নবিলাস হয়ে নিত্য ভাসে তার ঘুম চোখে। নগর সভ্যতার হদিশ তার কাছে নেই!

৩

চকমকিটোলার 'রাজগোঁড়' ভানুমতীর জাত্যাভিমানের সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যাবে ভেরিয়ার এলুইনের জগতে। এলুইন দেখেছেন তথাকথিত সভ্যতা সম্পর্কে কত অজ্ঞ ও উদাসীন বাইগা উপজাতির জীবনযাপন। অথচ এলুইন নিজে সভ্য জগৎ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রাজ্ঞ হয়েও একই ঔদাসীন্যের ভাগিদার। এই অর্থে, রামচন্দ্র গুহ তাঁকে কালচারাল প্রিমিটিভিজম-এর দৃষ্টান্তস্থাপনকারী[৩] বলতে চেয়েছেন। সভ্যতা সম্পর্কে অসন্তোষ সভ্যব্যক্তিকে প্রাচীন জীবনযাত্রার আদর্শে উদ্দীপ্ত করে। ইয়োরোপীয় চিন্তার জগতে প্রিমিটিভিজম-এর পর্যাপ্ত পশার। আমাদের দেশে বাইগা, গোঁড়, আগারিয়া এই সমস্ত উপজাতিই বিশ্বাস করতো যে অতীতের জীবনচর্যা বর্তমানের চাইতে অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত। সেই বিশ্বাসের ভিত্তি এই যে জীবন যখন ছিল তাদের রাজার কাছে আমানত, তখন জাদুবিদ্যা, তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্রের লোকায়ত অভিজ্ঞান প্রতিদিনের জীবনে অপ্রতিহত ছিল। সে ছিল এক স্বর্ণযুগ তাদের জীবনে। যে অতীত জীবনের প্রতি তাদের চিরায়ত আস্থা, সেটাই তাদের ইউটোপিয়া। এই প্রসঙ্গে এলুইনের ব্যক্তিগত জীবনের একটি তথ্যের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এলুইনের প্রথম স্ত্রী গোঁড় উপজাতির

মেয়ে কুশি। তাকে এলুইনের মা বুনো বলে অবজ্ঞা করতে চাইলে কুশি নিজের বংশপরিচয় জানিয়েছিল। সে রাজগোঁড়, এক অভিজাত উপজাতীয় পরিবারের মেয়ে এবং মধ্যযুগের ছত্তিশগড়ের গোঁড় রাজবংশের উত্তরসূরি। এলুইনের বয়ান অনুযায়ী, তার আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল প্রখর। সভ্যতার তথাকথিত অগ্রগতিকে এলুইন আক্রমণ করেছিলেন এক মোক্ষম সময়ে, যখন যুযুধান ইয়োরোপীয় দেশগুলির ওপর নাৎসিশক্তির দীর্ঘ ছায়া নেমে আসছে। আদিমতাবাদীরা খুব সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলেছিলেন সেই আধুনিকতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, যা ইয়োরোপীয় সমাজকে সর্বোচ্চ আসনে বসিয়ে বনবাসীদের সামাজিক কাঠামোর একেবারে নীচুতলায় স্থান দিয়েছিল।

বাইগা সম্প্রদায় তাদের ডাকিনীবিদ্যা বিনষ্ট হয়ে যাবার জন্য দায়ী করেছিল তাদের সনাতন জীবনচর্যা থেকে সরে গিয়ে কৃষিকাজকে মেনে নিতে বাধ্য হওয়ার ঘটনাকে। মাণ্ডালা গোঁড় উপজাতি বিশ্বাস করত, রেলপথ তৈরি হবার ফলেই তাদের খাদ্যের দেবতা 'অন্নদেও' জঙ্গল থেকে পালিয়ে যায়।[৪] 'আরণ্যক'-এ দোবরু পান্নার কুলদেবতা টাঁড়বারো বুনো মোষদেরও রক্ষাকর্তা। এই আদিম দেবতা বা 'অপরাজিত'-র নিশ্চিন্দিপুরের বিশালাক্ষী দেবীর মিথ প্রত্যন্ত পল্লীজীবনের যতটা নিয়ন্ত্রক, আধুনিক নগর জীবনে ততটাই উপেক্ষিত। তাই বড়বাজারে দু-টি নির্যাতিত মোষকে রক্ষায়, কিংবা কলকাতায় ভাগ্যান্বেষী অপুকে সহায়তায় একেবারেই অপারগ। গড়শিবপুরে বাদুরনখীর জঙ্গলে উত্তর দেউলের বারাহী দেবীর মিথও গোটা গ্রাম জুড়ে ভেসে থাকে জনশ্রুতিতে আর লোকবিশ্বাসে। পল্লীর প্রাচীন মিথ, বারাহী দেবীর ভগ্ন পাষাণমূর্তি ত্রয়োদশী থেকে পূর্ণিমা তিথি অবধি গভীর রাতে নিজের আসন ছেড়ে ঘুরে বেড়ায় গড়বাড়ির নির্জন জঙ্গলের মধ্যে। সেই সময় যে হতভাগ্য তার সামনে পড়ে, তার বড় অশুভ দিন। প্রাচীন জীবনযাত্রার সঙ্গে অতিপ্রাকৃতের যে সহাবস্থান তা একদিকে যেমন লোকজীবনে সাহস ও শক্তির আধার, একই সঙ্গে অজস্র আধিদৈবিক রহস্যের উৎস। শরৎসুন্দরীর অকাল বৈধব্য, অতিপ্রাকৃত পরিবেশে প্রায় নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব একদিকে যেমন তার অসহায়তাকে প্রকট করে, অপর দিকে তেমনি তার যাবতীয় সাহস আর শক্তিরও উৎস হয়ে থাকে। ঢোলবাজ্যার জঙ্গলে দীর্ঘাকৃতি কালোমতো পুরুষের চেহারায় নিঃশব্দে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকা টাঁড়বারো যতটা জাগ্রত আদিবাসী জীবনে, তেমনি জাগ্রত উত্তর দেউলের বারাহী দেবীর ভগ্ন মূর্তির সচল হয়ে ওঠার মিথ। আধুনিকতার সংস্পর্শে যে জীবন লাঞ্ছিত, তার আশ্রয় সেই অতিপ্রাকৃতের কাছে যার নাম কোথাও টাঁড়বারো, কোথাও বারাহী দেবী অথবা বিশালাক্ষী। 'আরণ্যক'-এ সত্যচরণের জবানিতে রয়েছে : 'গনুর মুখে কত অদ্ভুত কথা শুনিতাম। উড়ুক্কু সাপের কথা, জীবন্ত পাথর ও আঁতুরে ছেলের হাঁটিয়া বেড়াইবার কথা। এখানে বলিয়া রাখি, গনু আমাকে যেসব গল্প বলিত—তাহা রূপকথা নহে, তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়। গনু জীবনকে দেখিয়াছে তবে অন্যভাবে। অরণ্য প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আজীবন কাটাইয়া সে অরণ্য প্রকৃতির সম্বন্ধে একজন রীতিমত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। তাহার কথা হঠাৎ উড়াইয়া দেওয়া চলেনা। মিথ্যা বানাইয়া

বলিবার মতো কল্পনাশক্তিও গনুর আছে বলিয়া আমার মনে হয় নাই।' অরণ্যচারী আদিম সমাজের দেবতাকে সভ্য জগতে কেউ মানে না, জানেও না—কিন্তু এই দেবতা যে কল্পনা নয়, লোকজীবনের সঙ্গে জড়ানো সুপ্রাচীন লোকপৌরাণিক ট্র্যাডিশন, তা দ্বিধাহীন বিশ্বাসে উচ্চারণ করেছেন সত্যচরণ। তাঁর ক্ষমাভিক্ষার তাৎপর্য ও প্রিমিটিভিজম-এর সবচেয়ে সোচ্চার প্রকাশ এখানেই। এখানেই আধুনিকতার সঙ্গে তাঁর সংঘাত।

আধুনিকতার উৎস পশ্চিমী চিন্তায়। তার প্রভাবেই আমাদের দেশে আধুনিক হয়ে ওঠার প্রবণতা শুরু। কিন্তু এই প্রশ্ন তো রয়েই গেছে আধুনিকতাকে চিহ্নিত করা যাবে কী ভাবে। প্রাচীন জীবনযাত্রার অজস্র উপাদান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে আজকের সমাজ-বাস্তবের সঙ্গে। জনসংস্কৃতির জগতে পাঁজির অপরিহার্যতাই তার স্পষ্ট প্রমাণ। প্রাচীনত্বের দায় চাপিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন জাতি-উপজাতি সমাজের উপর। অথচ উচ্চবর্ণ অধ্যুষিত যুক্তিবাদী সমাজে নানান চেহারায় প্রাচীন ধারা প্রচলিত রয়েছে। র‍্যাশনাল ও ইর‍্যাশনালের অভ্যাসগত সহাবস্থান। তবে রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা কাঠামোয় র‍্যাশনাল নলেজ সিস্টেমেরই সর্বময় স্বীকৃতি। এই জ্ঞান-শৃঙ্খলার সঙ্গে বিভূতিভূষণের দর্শনের দুস্তর দূরত্ব। এই বিরোধ যে মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করে তা হল, যা কিছু প্রাচীন তা-ই কি সামগ্রিকভাবে পরিত্যাজ্য কিংবা গ্রহণযোগ্য। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোয় ঔপনিবেশিক আমলে যেমন, তেমনি দেশীয় আধুনিকতার ক্ষেত্রেও র‍্যাশনাল নলেজ সিস্টেমের পরিসরে লোকায়ত বিশ্বাস পথ খুঁজে নিয়েছে। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রসঙ্গ আসতেই পারে। যে সেনাবাহিনী অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেশের সুরক্ষায় নিয়োজিত, সেই বাহিনীই সিকিম রাজ্যের চীন সীমান্তে এক প্রয়াত সেনানীর নামে মন্দির গড়েছে এই বিশ্বাসে যে সেই মৃত সেনানী হরভজন সিং-এর আত্মা যাবতীয় পার্বত্য বিপদ থেকে সেনাবাহিনীকে রক্ষা করে। এই বিশ্বাস রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পায় লোকজীবনের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বলেই। প্রাচীন বিশ্বাস নতুন চেহারায় এভাবেই আধুনিকতার পিছু টেনে ধরে। অতীতের সঙ্গে একই গ্রন্থিতে বাঁধা পড়ে বর্তমান। দুর্গম পাহাড়ি পথে বাবা হরভজন সিং দু-হাত বাড়িয়ে খাদের কিনারা থেকে সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করেন। এই আধুনিক মিথের সঙ্গে প্রাচীন দেবতা টাঁড়বারোর মিথের কোথাও ফারাক আছে কি? দামোদর কোশাম্বী যথার্থভাবেই বলেছেন, সবকিছুই ভারতবর্ষে টিকে থাকে। এখানে তাম্র, প্রস্তর ও আণবিক যুগ পাশাপাশি চলে।

পশ্চিমী বস্তুবাদ ও যুক্তিবাদ নিয়ে উপনিবেশে আধুনিকতা বিকাশের অভিযান যখন শুরু হল, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এই দাবি ছিল যে সনাতন কারিগরি, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে চিরন্তন সম্পর্ক তা যেন লুপ্ত হয়ে যায়। এক কথায়, সনাতন মানুষের জায়গা নেবে নতুন, আধুনিক মানুষ। তাহলে অতীতের সঙ্গে, ট্র্যাডিশনের সঙ্গে আধুনিকতার সম্পর্কটা কেমন? ট্র্যাডিশন কি অতীতের সামগ্রিক আধার? প্রাচীন

যা কিছু আধুনিকমনস্কতার পক্ষে অস্বস্তিকর, তাই কি অনাধুনিক এবং পরিত্যাজ্য?[৫] আধুনিক মনস্কতা কি কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তির কাছে নতি স্বীকার? লেভি স্ট্রস বলেন, বিজ্ঞান ও লোকপুরাণের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই। তাঁর মতে আধুনিক বিজ্ঞানচিন্তা মিথের গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে সাহায্য করে।[৬] মিথের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ যেমন স্ট্রস স্বীকার করেননি, তেমনি ইতিহাসকে অনেক ক্ষেত্রে তিনি মিথের ধারাবাহিকতা হিসেবে পাঠের পরামর্শ দিয়েছেন। এই ভাবনার শরিক ছিলেন বঙ্গীয় লেখক গিরীন্দ্রশেখর বসুও।

আধুনিকতার ধ্বজাধারী ঔপনিবেশিক সরকারের যে প্রতিনিধিরা তাদের আমোদের জন্য শিকার ক্রীড়ায় নিয়মিত লিপ্ত হতেন, সেই স্পোর্টসম্যান-রা কিন্তু সর্বতোভাবে নির্ভর করতেন তাদের দু-চক্ষের বালাই অ-সভ্য অরণ্যবাসী উপজাতি সম্প্রদায়ের উপর। যে বনবাসী উপজাতিদের তারা মেয়েলি, ভীতু বলে বিদ্রূপ করতে অভ্যস্ত ছিলেন, তারা বহুক্ষেত্রেই এমন অতিপৌরুষের স্বাক্ষর রাখতো যে প্রতিতুলনায় ঔপনিবেশিক রাজপুরুষদের পৌরুষ নিদারুণভাবেই ম্লান দেখাতো। উত্তরভারতের অরণ্য অঞ্চলে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে জিম করবেটের অভিজ্ঞতায়, আর দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি অঞ্চলে কেনেথ অ্যান্ডারসনের নির্ভেজাল স্বীকারোক্তিতে। এই বনবাসী মানুষদের হাতিয়ার ছিল শুধু শিকার দক্ষতা নয়, তাদের অরণ্য অভিজ্ঞান, অর্থাৎ ফরেস্ট নলেজও। সেই ফরেস্ট নলেজ আধুনিক নলেজ সিস্টেমে গ্রাহ্য নয়। কারণ মিথ, লোকায়ত বিশ্বাস আর লৌকিক দেবদেবীর অতিপ্রাকৃত ক্রিয়াকলাপের প্রতি এর অবিচল আস্থা। হান্টার সাহেব তাঁর বিখ্যাত বইটিতে লিখে গেছেন, সাহেব শিকারিরা সুন্দরবনের গভীরে ঢোকার সাহস পেত না বলে ডাকিনী মন্ত্রে বিশ্বাসী বাউলে ফকিরদের সঙ্গে নিত। অথচ তাদের মন্ত্রশক্তি ও অভিপ্রায় নিয়ে ব্যঙ্গ-তামাসাও করতে ছাড়েননি হান্টার সাহেব।

র‍্যাশনাল নলেজ সিস্টেমের কাছে লোকায়ত জীবনযাত্রার ট্র্যাডিশন মূল্যহীন। তাদের লোকপুরাণ, অভিজ্ঞতাপ্রসূত অভিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকৃত। অথচ নানা মিথ, ধর্মীয় ভাবনা ও সংস্কার অরণ্য ও তার অধিবাসীদের মধ্যে যে সামঞ্জস্য বিধান করে তা আধুনিক র‍্যাশানালিটির ধার ধারে না। সংরক্ষণ ভাবনায় আধুনিক সমাজের আন্দোলিত হবার ইতিহাস তো অতি সাম্প্রতিক। অরণ্যবাসীর জীবনচর্যায় সংরক্ষণ ভাবনার ইতিহাস যে হাজার বছর প্রাচীন, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বুনোমোষের দেবতা টাঁড়বারোর মিথ। আধুনিক নলেজ সিস্টেম শুধুই বাস্তবকে, যুক্তিকে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে আশ্রয় করে থাকে। স্বজ্ঞা, প্রবৃত্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা—যা এর পরিপূরক তাকে মেনে নিতে অসমর্থ। আমরা কোনো বস্তুকে বস্তুগতভাবে জানতে পারিনা যতক্ষণ না তার সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে উপলব্ধি করতে পারছি। এই আত্মগত জ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে বস্তুগত জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না।[৭]

আঠেরো শতকের শেষাশেষি ও উনিশ শতকের প্রথম দিকে সতীদাহ প্রথার হিড়িক

বেড়ে যাবার মূলে ছিল রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ।[৮] সিভিলাইজিং মিশনের কোপ নির্বিচারে পড়েছিল লোকপুরাণ ও লোকায়ত বিশ্বাসের উপর আধারিত বহু যুগ ধরে চলে আসা ট্র্যাডিশনগুলির ওপর। তা সতীদাহের উপর যেমন তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও। দেশজ ট্র্যাডিশনগুলিকে বাছবিচারশূন্যভাবে নঞর্থক, কুপ্রথা হিসেবে তুলে ধরার রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিলই। বিপন্ন, আতঙ্কিত লোকসমাজ ধর্মের উপর খাঁড়া নেমে আসার আতঙ্কে, ঐতিহ্যের অবলুপ্তির আশঙ্কায়, আরও বেশি করে অতীতমুখী হবার চেষ্টা করেছে। সতীদাহ প্রথার সামাজিক চরিত্র ও পরিণাম যাই হোক, আগ্রাসী ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির রেসিস্ট্যান্স হিসেবে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ এই ট্র্যাডিশনকে প্রাণপণ আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করেছে। সামাজিকভাবে একটি অতি কুৎসিত প্রাচীন প্রথা, আবার স্থান-কালের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক প্রতিবাদও। শহরজীবনের প্রতি বিদ্বেষ, অরণ্য জীবনের প্রতি প্রবল আর্তি সত্ত্বেও, বিভূতিভূষণের নাগরিক অভিব্যক্তি, বিশেষ করে 'আরণ্যক' উপন্যাসে, অনেক সময়ই প্রকট। নাগরিক দৃষ্টি ও অনুভব অনেক সময়ই তাঁর অতীত-যাত্রার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সীমাবদ্ধতা প্রিমিটিভিস্টদের চিরকালই। সেই ঘাটতির কথা মাথায় রেখেই বোধহয় টডরভ সাহেবের মন্তব্য : It is less the description of a reality than the formulation of an ideal। এই নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস 'আরণ্যক'-এ ধরা পড়ে। কিন্তু 'কেদার রাজার' ন্যারেটিভ কথককে আড়ালে রেখে তার নিরসন ঘটায়।

প্রত্যন্ত পল্লীর সনাতন জীবনচর্যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জিম করবেট 'মাই ইন্ডিয়া'-য় লিখেছেন : Hardworking people are always cheerful, for they have no time to manufacture imaginary troubles। একই বক্তব্য বিভূতিভূষণের অল্টার ইগো অপুর জবানিতে, 'অপরাজিত'-র পাতায় : 'শহরে বা লোকালয়ে যে মন আত্মসমস্যা লইয়া ব্যাপৃত থাকে, অ্যামবিশন লইয়া ব্যস্ত থাকে, এখানকার উদার নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় সে-সব আশাআকাঙ্ক্ষা, সমস্যা অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। মন আরও ব্যাপক হয়, উদার হয়, দ্রষ্টা হয়, অ্যাঙ্গল অব ভিশন একদম বদলাইয়া যায়।' সনাতন জীবনযাত্রার সদর্থক দিকটিকে আলোকিত করার অর্থ পরিবর্তন বা অগ্রগতির বিরোধিতা নয়, বা তার নেতিবাচক দিকগুলিকে আড়াল করাও নয়। বরং প্রাচীন ট্র্যাডিশনের অস্তিত্বকে বা তার গুণগত মূল্যকে আধুনিক নলেজ সিস্টেমের মানদণ্ডে উপেক্ষা করার সুসংবদ্ধ প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবেই বিচার্য।

৪

এলুইনের প্রিমিটিভিজম্-এর প্রেক্ষাপট যেমন নাৎসি শক্তির দাপট, বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন। যদিও বিভূতিভূষণ কোথাও সরাসরি সোচ্চার নন ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতায়, কিন্তু যে আগুয়ান সভ্যতার বিরুদ্ধে অসন্তোষ তাঁর সাহিত্যের অনর্গল উপজীব্য তা যে ব্রিটিশ সিভিলাইজিং মিশনের অবদান তা নিয়ে প্রশ্ন

নেই। জমিদারকুল তো ঔপনিবেশিক শাসকেরই বিশ্বস্ত এজেন্ট। উপজাতির জীবনে সভ্যতার নিপীড়ন নিয়ে মধ্যপ্রদেশের মাইকাল পাহাড় অঞ্চলের অজস্র লোকসঙ্গীত রয়েছে। একটি গানের ভাব ইংরেজিতে এরকম :

In this kingdom of the English, how hard it is to live
To pay the cattle-tax we have to sell a cow
To pay the forest-tax we have to sell a bullock
To pay the land-tax we have to sell a buffalo
How are we to get our food?[9]

এই গানের বক্তব্যের সঙ্গে কোনও তফাত খুঁজে পাওয়া যাবে না নাঢ়া বইহারের অরণ্য অধ্যুষিত এলাকার জমি প্রজাবিলি করার পর নিজের কৃতকর্মের জন্য বিষণ্ণ সত্যচরণের সেই পরিতাপ : 'আমার জমিদাররা ল্যান্ডস্কেপ বুঝিবে না, বুঝিবে সেলামির টাকা, খাজনার টাকা, আদায় ইরসাল, হস্তবুদ।' ঔপনিবেশিক নীতি আদিবাসীদের জীবনযাত্রায় চরম আঘাত হেনেছিল। খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কেন্দার রাজার উদাসীনতায়, শত দারিদ্র্য সত্ত্বেও, আঁচড় পড়ে না। বিভূতিভূষণের বিবেচনায়, কেদারের উদার চরিত্র প্রাচীন রাজবংশেরই ঐতিহ্যের অঙ্গ বিশেষ। অভাবের চাপও সে জয় করতে সক্ষম।

ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিভূতিভূষণের পরোক্ষ জেহাদ নজর এড়িয়ে যাবার নয়। অনার্য নৃপতি দোবরু পান্নার গৌরবের মুকুটে অন্যতম পালক সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা হিসেবে কোম্পানির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই। 'বোতাম' গল্পটি একটি প্রেমের কাহিনী হলেও তার পটভূমি কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী একটি রাজ্য। ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলনের সময় লোহারদাগা থেকে যশপুর স্টেটের সীমান্ত অবধি পালামৌ জেলার অরণ্য অঞ্চলে মাসদুয়েক এক স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে ব্রিটিশ সরকারের কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। এই সরকারের নেত্রী ছিলেন এলিশাবা কুই, যিনি আসলে চম্পু নামের এক আদিবাসী কামিন। প্রেমের গল্প হলেও দেশের উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে যে আদিবাসীদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল, তার স্বীকৃতিই ব্যক্ত এই গল্পে। তেমনি, 'চাউল' গল্পটিতে রয়েছে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের জীবিকা হারানোর যন্ত্রণার কথা। থুপীর বাবা উপার্জনের তাগিদে পাহাড় ব্লাস্টিং-এর প্রজেক্টে কুলির কাজ পায়। কিন্তু ব্লাস্টিং এর সময় আচমকা একটি পাথর ছিটকে এসে তার মেরুদণ্ড একেবারে গুঁড়িয়ে দেয়। আধুনিকতার সঙ্গে পেশাগত সমঝোতাই সর্বনাশ ডেকে এনেছে আদিবাসী জীবনযাত্রায়। দু-টি গল্পই ১৯৪০-এর দশকে লেখা।

বিশ শতকের তিনের দশক পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস ঘটনাপ্রবাহে উথালপাথাল। অথচ তার প্রভাব বিভূতিভূষণের লেখায় পড়েনি বললেই চলে। কিন্তু চারের দশকের বিভূতিভূষণ ভিন্ন মানুষ। 'সমাজ ও সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : 'সমাজ সচেতনতা লেখকের মস্তবড় গুণ। যিনি দেশের অভাব অভিযোগের প্রতি উদাসীন থেকে সাহিত্য রচনা করেন, তিনি নিজের প্রতি, মানুষের প্রতি অবিচার করেন।

জীবনবোধের দায়িত্ব তিনি কিছুতেই এড়াতে পারেন না। জনসাধারণের প্রতিঘাতমুখর জীবনধারা হইতে বহুদূরে কল্পলোক সৃষ্টি করে তিনি কল্পনাবিলাস চরিতার্থ করতে পারেন, কিন্তু জীবনের উপর তার কোনো স্থায়ী ফল ফলে না।'

নয়া ঔপনিবেশিক ভূমি বন্দোবস্তে পুরোনো ভূস্বামীদের উৎখাত করে নব্য ধনিক শ্রেণী নতুন মেট্রোপলিসে বাণিজ্য থেকে অর্জিত মুনাফা জমিতে বিনিয়োগ করতে উদ্যোগী হয়। তাদের কাছে প্রথাগত সামাজিক সম্পর্ক নয়, ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতা অনেক বেশি মর্যাদাব্যঞ্জক ও ফলদায়ী। বিভূতিভূষণের সোচ্চার সহানুভূতি স্পষ্টতই বিপর্যস্ত ভূস্বামীদের পক্ষে। 'কেদার রাজা'র প্রভাস এই নব্য ধনিক শ্রেণিরই প্রতিভূ। ভানুমতীর পৃথিবীতে বাইরের জগৎ এসে পৌঁছেছিল জমিদারের অরণ্যভূমি প্রজাবিলি করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজারবাবুর হাত ধরে। আর শরৎসুন্দরীর জগতে এসে পড়ে প্রভাস। সে আদতে গড়শিবপুরেরই বাসিন্দা। নতুন ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে সে কলকাতাবাসী। গড়শিবপুরে সে ফিরে আসে তার আর্থিক প্রতিপত্তি ব্যবহার করে সেখানকার প্রাচীন জীবনযাত্রা, পল্লীসমাজের যাবতীয় ট্র্যাডিশনকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিতে। আর সেখানেই জঙ্গলের মধ্যে পোড়ো বাড়িতে সাক্ষাৎ শরৎসুন্দরীর সঙ্গে। শরৎ-কে সে নগরজীবনে প্রলুব্ধ করে। 'আরণ্যক'-এর কলকাতা ভানুমতীর আকর্ষণের চোরাস্রোত হয়ে থেকে যায়। তাতে ভেসে যাবার অবকাশ সেই বনবালিকার ছিল না। তাকে আধুনিক জীবনের পটভূমিতে সত্যচরণ কল্পনায় উপস্থাপিত করেন মাত্র। রাজকন্যাকে দিয়ে কয়লা ফিরি করানোর কাল্পনিক দৃশ্য প্রকৃতপক্ষে এক ইচ্ছাকৃত নির্মিতি, যা ট্র্যাডিশনকে উপড়ে ফেলা নব্য সমাজ-সভ্যতার প্রতি লেখকের এক তীব্র কটাক্ষপাত। ভূমি-নির্ভর সমাজব্যবস্থার সঙ্গে শিল্প বাণিজ্য-নির্ভর সভ্যতার বিরোধ দর্শানোর অভিপ্রায়েই এই দৃশ্যের অবতারণা। লবটুলিয়ায় রাজু পাঁড়েকে সত্যচরণ কলকাতায় আসার প্রস্তাব দিলে সে সভয়ে পিছিয়ে যায় এই বিশ্বাসবশত যে : 'শহর বড় খারাপ জায়গা, চোর, গুণ্ডা, জুয়াচোরের আড্ডা শুনেছি। সেখানে গেলে শুনেছি জাত থাকে না। সব লোক সেখানকার বদমাইশ।' কিশোর লোকনৃত্যশিল্পী ধাতুরিয়া যে 'ননীচোর নাটুয়া' নাচ দেখিয়ে গ্রামের মানুষকে মুগ্ধ করত, সে অনেক সাধ করে ম্যানেজারবাবুর কাছে আবদার করেছিল, তাকে কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্য। শহরের মানুষকে সে নাচ দেখিয়ে আরও একটু বেশি পয়সা আয় করবে। কয়েক দিন বাদে রেল লাইনের ধারে তার লাশ পাওয়া যায়। এই মর্মান্তিক মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন হয়নি। ধরে নিতে অসুবিধে নেই, কলকাতা শহরে আশাভঙ্গের বেদনা থেকে বাঁচাতে লোকশিল্পের মৃত্যুর চেয়ে শিল্পীর অকালমৃত্যু দেখানোই শ্রেয় জ্ঞান করেছেন লেখক।

কিন্তু 'কেদার রাজা'য় এসে কলকাতা একটি চরিত্র হয়ে ওঠে। নব্য নাগরিক জীবনের যাবতীয় অভিঘাত নিয়ে এ শহরের উপস্থিতি। শরৎসুন্দরীর আক্ষেপ ছিল, 'গড়ের খালের জঙ্গলে কাটালাম সারা জীবনটা'। প্রভাসের সঙ্গে পরিচিতির সূত্রে কলকাতা দেখার অভিলাষ দুর্বার হয়ে ওঠে তার। নাগরিক কলুষতা বামিয়াবুরু-র হো

উপজাতি কিংবা রাজু পাঁড়ে-র কাছে ভীতিপ্রদ, কিন্তু তাতে আদ্যোপান্ত সংক্রমিত প্রভাস সেই কলুষতারই শিকার, পরে শিকারিও। তার লোভের থাবা নিজের ফেলে আসা গ্রামের দিকেই উদ্যত। শহরজীবনের ক্লেদ ভানুমতীর জীবনকে কীভাবে সংক্রমিত করতে পারে সেই ধারণাটুকু দিয়েই 'আরণ্যক'-এর সমাপ্তি। শহরজীবনের এই ছবিটিকে শুধু ধারণায় আবদ্ধ না রেখে তার পরিণাম দেখানোর তাগিদেই 'আরণ্যক' পেরিয়ে বিভূতিভূষণের 'কেদার রাজা'য় যাত্রা। 'আজব শহর কলকেতা/রাঁঢ়িবাড়ি জুড়িগাড়ি মিছে কথার কি কেতা'—এই হুতোমি কলকাতাই মর্মান্তিক সত্যি হয়ে ওঠে কেদার ও শরৎসুন্দরীর তিক্ত অভিজ্ঞতায়। ক্লেদাক্ত নগরী থেকে অঘটনবহুল অভিজ্ঞতার পথ ধরে স্বভূমে পুনর্যাত্রা পিতা-পুত্রীর। ফিরে এসে আবার অভ্যস্ত জীবনের প্রাচীন সংস্কার ও চিরায়ত বিশ্বাসের কোটরে ঠাঁই নেয় শরৎ। নগরের অভিজ্ঞতা তাদের পুরোনো ধ্যান-জ্ঞানকে আরও দৃঢ় করে তোলে। নাগরিক পাপ-পুণ্য, আধুনিকতার কুটিল আবর্তের বিরুদ্ধে সেটাই তাদের রক্ষাকবচ, তাদের চিরন্তন রেসিস্ট্যান্স। তার বিশ্বাসের ভিত পরীক্ষিত হয়ে আরও পোক্ত হয়ে ওঠে। বাদুর নখীর জঙ্গলের ভেতরে উত্তর দেউলে রাজবংশের অতি প্রাচীন দেবী বারাহীর ভাঙা মূর্তির পদতলে প্রতিদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালবার যে প্রথা তার রাজপরিবারের ট্র্যাডিশন, সেই আশ্রয়েই ঘটে অমোঘ প্রত্যাবর্তন। গড়বাড়ির ধ্বংসাবশেষের পরিবেশেই অতি-প্রাকৃতের আবহ, যা অতি প্রাচীন জনশ্রুতি। ধনঝরি পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে সত্যচরণের দেখা বিকট, ভীতিপ্রদ পাথরের স্তম্ভের মতো এখানেও রহস্যময়তার বিস্তার বনের ভেতরে পাথরের থামের হাত-পা ভাঙা মুণ্ডু ছড়িয়ে থাকায়। শরৎসুন্দরী সেখানে নিয়মিত প্রতিসন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালে। নিষ্প্রভ হয়ে আসা রাজা ঐতিহ্যকে অন্তত লোকাচার পালনের মধ্যে দিয়ে জিইয়ে রাখার দায় তার ওপরেই। সুপ্রাচীন রাজপরিবারের প্রদীপ আপাতত এই প্রজন্মের হাতেই। রাজপরম্পরার নবীনতম ধারক সে। দু-শো বছরের পুরোনো হাত-পা ভাঙা দেবীর পাষাণ মূর্তি ছাতিম বনের আড়ালে ঢাকা। তাঁর উপর অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস নানা দুর্দৈবের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সাহস ও শক্তি যোগায় শরৎ-এর মতো যুবতীকে।

টাঁড়বারোর লোকবিশ্বাস থেকে যে জনশ্রুতির উৎপত্তি, তেমনিভাবেই গড়শিবপুরের খালও অজস্র আধিদৈবিক রহস্যের উৎস। গভীর রাতে কালো পায়রা দিঘির জঙ্গলে একা বেরিয়ে অতিথি গোপেশ্বর যে ভারী পায়ের শব্দ শুনে পালিয়ে আসেন, তা প্রচলিত জনশ্রুতির ভিতটিকে পোক্ত করে। লোকসমাজে অলৌকিকের ভূমিকা উপেক্ষিত হবে, এটা বিভূতিভূষণের অভিপ্রেত ছিল না। 'আরণ্যক'-এর প্রস্তাবনায় বিভূতিভূষণ লিখেছেন : 'বন্য শিকারির মুখে অদ্ভুত গল্প শুনিতাম, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে গভীর রাত্রিতে বন্য মহিষ শিকার করিতে গিয়া ডালপালা ঢাকা গর্তের ধারে বিরাটকায় বন্য মহিষের দেবতাকে তারা দেখিয়াছিল।' আরণ্যক-এ সত্যচরণের যা কিছু আধিদৈবিক, অতিপ্রাকৃত ঘটনার বিবরণ সবই পরোক্ষ অভিজ্ঞতা, জনশ্রুতি। কিন্তু 'কেদার রাজা'য় লেখকের দায় ছিল অতিপ্রাকৃতকে বিশ্বাসের বায়বীয়তা থেকে বস্তুগত ভিত্তি দেওয়া,

কারণ, প্রভাসের মতো তথাকথিত, সভ্য, শহুরে জনতা 'অন্য ধাতের মানুষ, প্রত্যক্ষদৃষ্ট বাস্তব ছাড়া অন্য কোনো জগতের সঙ্গে এদের বিশেষ পরিচয় নেই।' সেই 'অন্য জগৎ' মূর্ত হয়ে ওঠে, যখন অমাবস্যার রাতে বাদুরনখীর জঙ্গলে প্রভাসের শহুরে শাকরেদ গিরীনের মৃতদেহের পাশে ভারী ভারী গোল গোল হাতির পায়ের মতো চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। নির্জন জঙ্গল পথে অন্ধকার রাতে বাড়ি ফেরার সময় শরৎসুন্দরী জানতো না শহুরে শিকারীরা জঙ্গলের মধ্যে ওত পেতে রয়েছে তার প্রত্যাশায়। দেবী বারাহী কলকাতা শহরে শরতের হেনস্থার প্রতিকার করতে পারেননি, কিন্তু গড়শিবপুরের জঙ্গলে তাঁকে তিনি আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করে প্রাচীন লৌকিক বিশ্বাসকে বাস্তব প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন প্রত্যক্ষদৃষ্ট বাস্তবের বিশ্বাসযোগ্যতা। দোবরু পান্নার চকমকিটোলা থেকে কেদার রাজার গড়শিবপুর বস্তুত একটি ধারাবাহিকতার ক্রমবিস্তার। চিরনাস্তিক কেদার অবশেষে সত্যচরণের মতোই অনুশোচনাগ্রস্ত। তিক্ত, করুণ নাগরিক অভিজ্ঞতা তাকে ফিরিয়ে এনেছে আদি ভিটেয়, যেখানকার ইঁট-কাঠ-সবুজে জড়িয়ে আদিম ট্র্যাডিশন, লোকায়ত মিথ ও সংস্কার। সে নিজেকে সাষ্টাঙ্গে সমর্পণ করে বারাহী দেবীর কাছে। মার্জনাপ্রার্থী সত্যচরণের বিপরীতে আত্মসমর্পিত কেদার উপস্থাপিত হয় বিনষ্ট মিথ ও লোকায়ত বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাগিদে। তাই মহৎ সৃষ্টি হিসেবে গণ্য না হলেও বিভূতিভূষণের জগতে একটি বৃত্তকে সে সম্পূর্ণতা দেয়। বিভূতিভূষণের ইউটোপিয়ার পথনির্দেশ করে।

স্মৃতিযাত্রায় রবীন্দ্রনাথ

তপোব্রত ঘোষ

Great is this force of memory, excessive great. O my God: a large and boundless chamber! who ever sounded the bottom thereof? Yet is this a power of mine, and belongs unto my nature: nor do I myself comprehend all that I am. —*The Confessions of St Augustine*, Book X, Section VIII, Paragraph 15.

তারায় ভরা রাত্রির আকাশের সঙ্গে সেই কতকাল আগে মিলেছিল এই পৃথিবী। আকাশ-দেবতা ইউরানুস (Uranus), আর পৃথিবী-দেবী গাইয়া (Gaia)। গ্রিকপুরাণের সৃষ্টি-প্রকরণে দ্যাবাপৃথিবীর এই মিলনই স্ত্রী-পুরুষের প্রথম মিলন। এই মিলনের ফলে যে-সব সন্ততির জন্ম হল তাদের মধ্যে আছে একটি কন্যা, নাম তার নিমোজিনি (Mnemosyne)। গ্রিক ভাষায় 'নিমি' (mneme) মানে 'স্মৃতি'— নিমোজিনি স্মৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবরাজ জেউসের (Zeus) ঔরসে এই নিমোজিনির গর্ভে জন্ম নিল নয়জন মেয়ে, নয়টি মিউজ (Muse)। এরা সকলেই সমান কলাবতী! কিন্তু তা সত্ত্বেও খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে গ্রিক দেবচরিতকথার আদিকবি হেসিওড (Hesiod) এই নয়জনের মধ্যে বিশেষ একজনকেই বলেছেন প্রধানা, নাম তার ক্যালিওপি (Calliope)।[১] ক্যালিওপি মহাকাব্যের দেবী।

নিমোজিনি নিজে মিউজ নয় বটে, তবে কেউ কেউ বলেন যে, নিমোজিনিই আদি মিউজ। গ্রিসের যে-পার্বত্য ভূখণ্ডে হেসিওড জন্মেছিলেন সেই অঞ্চলে স্মৃতিদেবীকেই লোকে কবিতার দেবী রূপে পুজো করত।[২] মায়ের মধ্যে যেমন মেয়েদের গুণ আভাসিত হয়েছে, তেমনই মেয়েরাও পেয়েছে মায়ের স্মৃতিভাণ্ডারের উত্তরাধিকার। হেসিওড তাই বলেছেন যে, মিউজদের সমস্তই মনে আছে— যা হয়েছিল, যা হয়ে চলেছে, আর যা হবে— কিছুই তারা ভোলেনি।[৩] সমগ্র অতীত যে স্মৃতিদেবীর অধিকৃত হবে তাতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই; কিন্তু বর্তমান, বিশেষত ভবিষ্যৎ যে কী করে স্মৃতিদেবীর ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে থাকে সে এক রহস্যময় ব্যাপার। ভবিষ্যতের স্মৃতি! অপরূপ এই রহস্যকে আপাতত অনুদ্‌ঘাটিত রেখে মিউজদের বৃত্তান্তেই নজর দেওয়া যাক।

জন্মসূত্রে মিউজরা স্মৃতির অধিশ্বরী। তাই হেসিওড তাঁর কাব্য 'থিওগনি' (Theogony)-র গোড়ায় মিউজদেরই প্রশ্ন করেন : কী করে জন্মেছিল দেবতারা, আর

ওই দেবলোক?[৪] মিউজরা তখন কবির হাতে দিল জাদুদণ্ড, আর কণ্ঠে দিল দৈববাণী[৫]— হেসিওড প্রবেশ করলেন স্মৃতিদেবীর ভাণ্ডারে।

গ্রিকপুরাণে এই স্মৃতি দু-রকম : ঐতিহাসিক স্মৃতি, আর দিব্যস্মৃতি। ঐতিহাসিক স্মৃতি হল মানুষের জগতের স্মৃতি— এই জন্ম মানুষের বর্তমান, পূর্বজন্মগুলি তার ইতিহাস। ঐতিহাসিক স্মৃতির চেয়ে দিব্যস্মৃতি আরও অনেক বেশি উৎসমুখী। মানুষের পূর্বজন্মজন্মান্তর পেরিয়ে তা চলে যায় দেবতার জন্ম, আর দেবলোকের জন্মের ইতিহাসে।[৬] সৃষ্টিপ্রবাহের উৎসমুখে স্মৃতির সেই সূচিপত্র— আরম্ভেরও যেখানে আরম্ভ।

দেবতা আর দেবলোকের জন্মপরিচয় দিতে গিয়ে হেসিওড অবশ্য দিব্যস্মৃতির উপরেই ভর করেছেন, ঐতিহাসিক স্মৃতির উপর নয়। আর হেসিওডের কয়েক শতাব্দী পরে প্লেটো যখন 'জ্ঞান'কে বলবেন 'বিস্মৃতির পুনঃস্মরণ',[৭] তখন গ্রিসের ওই দিব্যস্মৃতির পৌরাণিক ঐতিহ্যকেই তিনি নিজের দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে সুসংগত করে নেবেন। বলা বাহুল্য, প্লেটো-কথিত 'জ্ঞান' হচ্ছে পরাজ্ঞান। কিন্তু ওই পরাজ্ঞান, যা একদিন মানুষের স্মৃতিধার্য ছিল, কীভাবে তা বিস্মৃতি-কবলিত হল, আর কেমন করেই-বা সম্ভব হল তার পুনঃস্মরণ?

প্লেটো বলেছেন, ইন্দ্রিয়বেদ্য ও দৃশ্যমান এই মর্ত্যজগৎ এক অতীন্দ্রিয় ও অপরিদৃশ্যমান ভাবময় দিব্যজগতের আদলে গঠিত। ওই দিব্যজগৎটি অজ-নিত্য-শাশ্বত, ওইখানে সত্য-শিব-সুন্দরের নির্বিশেষ 'আইডিয়া' বা 'ফর্ম'গুলি প্রতিষ্ঠিত। ওই 'ফর্ম' বা প্রকৃত রূপের অনুরূপ এই মর্ত্যজগৎ নিত্যও নয়, শাশ্বতও নয়—এখানে সবই পরিবর্তমান, সবই খণ্ডিত ও নশ্বর। একদিন মানুষের পবিত্র 'পক্ষবান' আত্মা ওই দিব্যজগতে বসবাস করত, সে-ও ছিল দেবতাত্মা। পরাজ্ঞানে দেবতাদেরই সমতুল্য ছিল তার অধিকার। তারপর একদিন পাখা হারিয়ে সে নেমে এল এই মর্ত্যজগতে। কী করে সে তার পাখা হারাল? *ফিড্রাস*-এ প্লেটো বলেছেন, দুর্ভাগ্যময় বিস্মরণে পূর্ণ হয়ে ওঠায় নষ্ট হয়ে গেল তার ওই নির্ভার ঊর্ধ্ববিহারের প্রতিভা। দিব্যজগতের সমস্ত স্মৃতি সে ভুলে গেল।[৮]

এই বিস্মরণ প্রসঙ্গে— প্লেটোতে নয়— গ্রিকপুরাণে বর্ণিত লিথি (Lethe) নদীকে মনে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। লিথি হচ্ছে বিস্মৃতিনদী— এই নদীর জল যে পান করে সে সমস্তই ভুলে যায়। অবশ্য গ্রিকপুরাণে লিথি-র একটি প্রতিষেধকের ব্যবস্থাও আছে। নিমোজিনির স্মৃতি-সরোবর। জন্মগ্রহণের প্রাক্কালে বেশির ভাগ মানবাত্মাই লিথি-র জল পান করে তাদের ঐতিহাসিক স্মৃতি, অর্থাৎ পূর্বজন্মজন্মান্তরের বৃত্তান্ত ভুলে যায়; দৈবাৎ দু-একটি সৌভাগ্যবান মানবাত্মা লিথি-কে এড়িয়ে পান করে নেয় ওই স্মৃতি-সরোবরের জল— জন্মগ্রহণের পরেও তাদের ঐতিহাসিক স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকে। যেমন নাকি পিথাগোরাস, কিংবা নাকি তাইরেসিয়াস।[৯] আমাদের বোধিসত্ত্বও কি এঁদেরই মতো জাতিস্মর নন? 'জাতক'-এর গল্পে তাই তো তাঁর বারেবারেই ফিরে যাওয়া ঐতিহাসিক স্মৃতিতে— বৌদ্ধ পরিভাষায় 'প্রত্যুৎপন্নবস্তু' থেকে 'অতীতবস্তু'র অভিমুখে। এইখানে

বলে রাখা ভালো যে, নিমোজিনির স্মৃতি-সরোবর অর্ফিয়ুস-প্রবর্তিত অর্ফিক সম্প্রদায়ের নিজস্ব কল্পনা।[১০] মতভেদ থাকলেও কারোর কারোর মতে, এই অর্ফিক সম্প্রদায় প্রাচ্যের কোনো দেশ থেকে, সম্ভবত ভারতবর্ষ থেকেই, গ্রিসে প্রবেশ করেছিল।[১১] 'বরাহপুরাণ'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেদমাতা সাবিত্রী নারদকে বলেছেন, 'এতস্মিন্ বেদসরসি স্নানং কুরু মহাব্রত।/ কৃতে স্নানেহন্যজন্মীয়ং যেন স্মরসি সত্তম।।'[১২] —হে মহাব্রত! এই বেদ-সরোবরে স্নান কর। হে সত্তম! এই বেদ-সরোবরে স্নান করলে অন্যজন্মের কথা স্মরণ করতে পারবে।

প্লেটোর কথায় ফেরা যাক। দিব্যজগতের স্মৃতি তো মানুষ ভুলেই গেল, কিন্তু সে কি ভুলেই থাকল? *ফিড্রাস*-এ প্লেটো বলছেন যে, এই মর্ত্যজগতে যখনই মানুষ সুন্দরকে ভালোবাসে, তখনই সেই সৌন্দর্য তার মনের মধ্যে চকিত দীপ্তিতে জাগিয়ে দিয়ে যায় ভুলে-যাওয়া দিব্যজগতের আদর্শ সৌন্দর্যের স্মৃতি। এর ফলে আবার জেগে ওঠে তার হারানো পাখার অঙ্কুর, দিব্যজগতের উদ্দেশে আবার শুরু হয় তার নভোবিহার।[১৩] সক্রেটিসের অন্তিম সংলাপ *ফায়েডো*-য় অবশ্য এই প্রসঙ্গে প্লেটোর বক্তব্য একটু অন্যরকম। সেখানে মর্ত্যজগৎকে অবলম্বন করে দিব্যজগতের স্মৃতি জেগে ওঠেনি; বরং আসন্নমৃত্যু নির্লিপ্ত মানবাত্মা মর্ত্যজগতের স্মৃতিলেশ নিঃশেষে পরিত্যাগ করেছে। রাজহংসের কণ্ঠস্বর কর্কশ, কিন্তু প্রবাদ আছে, মৃত্যুর মুহূর্তে তার গলায় সুর জাগে। নিশ্চয় দিব্যজগতের স্মৃতি ফিরে পেয়ে সেইখানেই ফিরে যাবার সম্ভাবনায় সে গান গেয়ে ওঠে উৎসুক আনন্দে। সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর বাহন রাজহংস, আজীবনের আলোকসন্ধানী সক্রেটিসও কি অ্যাপোলোর বাহনই নন? তাহলে রাজহংসের যদি মৃত্যুভয় না থাকে, সক্রেটিসই-বা কেন মৃত্যুকে ভয় পাবেন?[১৪] '*ফিড্রাস*'-এর তুলনায় *ফায়েডো*-য় প্লেটোর স্মরণতত্ত্বের এই স্বাতন্ত্র্য কিন্তু আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ ফিড্রাস-এ লুপ্ত দিব্যস্মৃতি প্রস্ফুরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 'পক্ষহীন' মানুষের পাখা-ফিরে-পাওয়ার 'সাধারণ' অভিজ্ঞতার কথাই বলা হয়েছে; কিন্তু *ফায়েডো*-য় বলা হয়েছে, মানুষের পাখা-হারানোর স্মৃতি যিনি মনে রেখেছেন সেই স্বরূপত 'পক্ষবান' মৃত্যুদণ্ডিত দার্শনিকের 'বিশেষ' অভিজ্ঞতার কথা। গ্রিক পুরাণের ভাষায় বলা যেতেও পারে যে, লিথি এখানে আদৌ তাঁর দিব্যস্মৃতি মুছে ফেলতে পারেনি, বরং উলটো রাস্তায় ক্রমশ তাঁর সত্তা থেকে মুছে নিয়েছে মর্ত্যস্মৃতির সমস্ত পিছুটান।

এই মর্ত্যজগৎ আর ওই দিব্যজগতের সংযোগরক্ষাকারী মধ্যবর্তী একটি সত্তার কল্পনা প্লেটো করেছিলেন— গ্রিক ভাষায় যার নাম দাইমন (daimon), ইংরিজিতে ডিমন (daemon)। এই ডিমন নিজে দেবতা নয়, কিন্তু দেবতার সান্নিধ্যে থাকার ফলে দিব্যস্মৃতির সংস্কার তার মধ্যে ভাস্বর হয়ে থাকে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই ডিমনের যেমন এক-একটি 'বিশেষ' আবির্ভাব ঘটে, তেমনি তার নির্বিশেষ একটি আবির্ভাবও ঘটে সমস্ত মর্ত্যজগতে। প্রত্যেক মানুষের স্ব-ভাবের বিশেষত্ব অনুযায়ী তার মধ্যে ডিমনের যে-বিশেষ আবির্ভাব

ঘটে সেখানে সে তার পথের দিশারী, তার কর্ণধার। মর্ত্যকারায় বন্দী মানুষের মনে সে যেমন বিচিত্রভাবে সঞ্চার করে দেয় দিব্যজগতের স্মৃতি, তেমনি পথের দিশারী হয়ে মৃত্যুত্তীর্ণ মানবাত্মাকে বিচার ও শুদ্ধির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়ে সে নিয়ে যায় তার নির্ধারিত গন্তব্যে। অন্যদিকে সমগ্র মর্ত্যজগতের ডিমন পৌরাণিক স্বর্ণযুগের আদর্শ স্মৃতিকে বারবার বহন করে আনে বিচ্যুতিময় এই ভ্রষ্টাচারী পৃথিবীতে। আমরা বলতে পারি, ওই মর্ত্যজগতের ডিমনই সক্রেটিসের চিত্তে রিপাবলিক বা গণরাষ্ট্রের আদর্শকে সঞ্চার করে দিয়েছিল।

প্লেটোর মতে, ডিমন দেবতা নয়। কিন্তু 'থিওগনি' কাব্যে মিউজরা যেমন কবি হেসিওডকে নিমোজিনির স্মৃতিভাণ্ডারে এগিয়ে দিয়ে ডিমনের মতোই মধ্যস্থতাকারিণীর ভূমিকা পালন করেছিল, তেমনি *সিম্পোসিয়াম*-এ সক্রেটিসের মুখে বর্ণিত দিওতিমার প্রেমতত্ত্বে এরস্ (Eros) বা গ্রিক কামদেবের দেবযোনিত্ব অস্বীকার করে প্লেটো তাকেই বললেন ডিমন।[১৫] অবশ্য প্লেটোর এই সিদ্ধান্ত *সিম্পোসিয়াম*-এ একেবারে অভাবিতপূর্ব নয়; কারণ প্রেম সম্পর্কিত আলোচনায় *সিম্পোসিয়াম*-এর প্রথম বক্তা ফাইড্রস হেসিওডকে অনুসরণ করেই এরস্‌কে বলেছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ দেবতা[১৬]; এরপর অন্য বক্তা আগাথন হেসিওডকে সম্পূর্ণ উল্‌টে দিয়ে এরস্‌কে বললেন সর্বকনিষ্ঠ দেবতা।[১৭] একই এরস্‌কে দিব্যজগতের একেবারে গোড়ায় স্থাপন করে প্লেটো যেমন এরসের মধ্যে দিব্যস্মৃতিকে সুদূরতম করে তুললেন, তেমনি এরস্‌কে দিব্যজগতের একেবারে শেষে সরিয়ে এনে মর্ত্যজগতের সঙ্গে তার সম্পর্ককেও ঘনিষ্ঠতম করে তুললেন। এই দুই বিপরীতধর্ম একই সঙ্গে আত্মসাৎ করার ফলে *সিম্পোসিয়াম*-এ সক্রেটিসের আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই প্লেটোর এরসের মধ্যে ডিমনের আভাস দেখা দিয়েছিল। সক্রেটিস এরস্‌কে আরও সংনমিত করে মর্ত আর অ-মর্তের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করে সেই আভাসকেই পূর্ণপ্রস্ফুটিত করে তুললেন। ডিমন বলেই এই এরস্ আর সরাসরি দিব্যজগতের বাসিন্দা নয়, কিন্তু দিব্যজগতের আদিতে ও অন্তে দ্বিজত্বের সংস্কার তার মধ্যে রয়ে গিয়েছে বলেই মানুষের মনে যে-দিব্যস্মৃতির বার্তা সে বহন করে আনে তা মানুষকে এত আনমনা করে দেয়।

এই ডিমনের একটি প্রতীকী রূপকল্প নব্য-প্লেটোনিস্টদের কল্পনায় তৈরি হয়ে উঠেছিল। ট্রোফোনিওসের গুহায় টিমার্কোস দৈববাণী শুনেছিলেন যে, ডিমন হচ্ছে অন্ধকারের ঊর্ধ্বদেশে ভাসমান তারা।[১৮] যেহেতু এই তারা 'পক্ষবান' মানবাত্মার পথপ্রদর্শক, তাই এই তারাও পক্ষবান। এই winged star পরবর্তী খ্রিস্টীয় কল্পনায় guardian angel-এর রূপধারণ করেছে। উনিশ শতকের রোমান্টিকদের মধ্যে যিনি স্বভাবধর্মে সর্বাধিক প্লেটোনিস্ট, সেই শেলির পরীরানি 'Queen Mab', কবিতাটির রূপান্তরিত পাঠে হয়ে উঠেছে 'Daimon of the World' — এই ডিমনকেই শেলি বলেছেন, 'Bright as that fibrous woof when stars indue / Its transitory robe.'[১৯]

গ্রিক পুরাণকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম নিয়ে এসেছিলেন মধুসূদন। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় স্বদেশের কাছে কবির অন্তিম প্রার্থনা ছিল, 'ফুটি যেন স্মৃতিজলে,/ মানসে, মা, যথা ফলে/মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে!' 'স্মৃতিজল' যে আসলে স্মৃতি-সরোবরেরই জল সেটা ওই মানস [সরোবর]-এর উপমানটি থেকেই সুনিশ্চিত হচ্ছে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গ্রিক পুরাণকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন হেকেটি। এই হেকেটিকেই হেসিওড বলেছিলেন, 'দেবতাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিতা দেবী'।[২০] দেবরাজ জেউস হেকেটিকে জল-স্থল-আকাশের অংশীদারিত্ব দিয়েছিলেন। তিন প্রজন্মের তিনটি প্রতিভা— বিহারীলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ছিল ঠাকুরবাড়ির হেকেটির প্রভাব। হেসিওড বলেছিলেন, জিউসের নির্দেশে হেকেটি শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।[২২] মাতৃহীন বালকদের ভার নিয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির হেকেটি। হেসিওড জানিয়েছেন, উত্তাল সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে যায় তাদের প্রার্থনায় প্রসন্ন হলে হেকেটি তাদের প্রচুর মাছ দেন।[২৩] ঠাকুরবাড়ির হেকেটির মনঃসরোবরে রবীন্দ্রনাথ ভাবের মাছ ধরেন। হেসিওডের মতে, হেকেটি অশ্বারোহীর শুভঙ্করী দেবী।[২৪] গড়ের-মাঠে-ঘোড়া-ছোটানো ঠাকুরবাড়ির হেকেটি 'পউষ প্রখর শীতে জর্জর ঝিল্লিমুখর' রাতে কালো ঘোড়ায় চড়ে কবির কাছে আসেন, আর তারপর ধূম্রবরণ আর-একটি ঘোড়ায় কবিকে চড়িয়ে নিয়ে চলে যান সিন্ধুপারের কৃষ্ণশৈলগুহার অভিমুখে।[২৫]

হেকেটি আসলে কিন্তু গ্রিক চন্দ্রদেবী।[২৬] চাঁদের আলোর রহস্য আর কুহক ছেয়ে আছে তাঁকে। সূর্য যদি সংজ্ঞানকে উদ্ভাসিত করে, চন্দ্রে উদ্দীপিত হয় নির্জ্ঞান। হেকেটি সেই নির্জ্ঞানের কেন্দ্রগত নারীবিগ্রহ।[২৭] কবির হৃদয়ে 'নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী-সম' তিনি নীরব হয়ে থাকেন। যে-কবিতা জ্ঞানের বিষয় নয়, ভাবের বিষয়— তাকে পণ্ডিতের লেখা সমালোচনার তত্ত্বে যখন কবি খুঁজে পান না, তখন সেই সুন্দরী প্রেয়সী পূর্ণপূর্ণিমা এসে যাকে বোঝা যায় না তাকে বাজিয়ে দিয়ে যান।[২৮]

রবীন্দ্র-রচনায় গ্রিক পুরাণ বিস্তীর্ণ হয়ে আছে। *ছিন্নপত্রাবলী*-র একটি চিঠিতে 'অ্যাপোলোদেবের স্বর্ণবীণাধ্বনি',[২৯] 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে বিমলার আত্মকথায় পিগম্যালিয়ন,[৩০] Religion of Man-এ ওরিয়ন্[৩১]— এর সামান্য দু-একটি প্রত্যক্ষ নিদর্শন। হিন্দুপুরাণকে গ্রিক পুরাণে রূপান্তরিত করবার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় তাঁর স্বকৃত অনুবাদে। '*চিত্রাঙ্গদা*'-র মদন *Chitra*-য় হয়েছে *এরস*,[৩২] কামসখা বসন্ত হয়েছে অ্যাপোলোর পুত্র লাইকোরিস,[৩৩] 'বিদায়-অভিশাপ'-এর দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য 'The Fugitive'-এর অন্তর্ভুক্ত 'Kacha and Devayani' অনুবাদে হয়ে উঠেছেন 'a sage who taught the Titans'[৩৪]। গ্রিক পুরাণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রোমান পুরাণের দৃষ্টান্ত 'দুই বোন' উপন্যাসে মিনার্ভার আউল[৩৫]; গ্রিক পুরাণ বনাম রোমান পুরাণ হচ্ছে, 'সাহিত্যের পথে' বইতে সংযোজিত অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'একখানি চিঠি'তে অ্যাপোলো বনাম

ভাল্‌কান;[৩৬] গ্রিক পুরাণ আর রোমান পুরাণের সমীকরণ ঘটছে, যখন 'Chitra'-য় এরসের পুষ্পধনু অনায়াসে হয়ে যাচ্ছে 'Cupid's archery'।[৩৭]

নিমোজিনিকে কি রবীন্দ্রনাথ জানতেন? রবীন্দ্রনাথের পড়াশুনোর জগৎ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। ১৩৯৮ সনের ২৫ বৈশাখ শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন থেকে প্রকাশিত *রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-পরিচয়* বইয়ের ৬৬ থেকে ১০২ পৃষ্ঠায় কানাই সামন্ত *শিশু* কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি অনুমান করেছেন, *শিশু*-র কবিতাগুলির রচনাকাল ১৩১০ সনের ৪-৫ শ্রাবণ থেকে ৫-৬ ভাদ্র, অর্থাৎ ১৯০৩ সালের ২০-২১ জুলাই থেকে ২২-২৩ অগস্ট। এই পাণ্ডুলিপির ৬৩ পৃষ্ঠায় 'অস্তসখী' কবিতাটির (রচনা : আনুমানিক ১ ভাদ্র) উপর দিকে তিনটি বইয়ের নাম লেখা আছে— তৃতীয় বইটি হল : 'Ideas of Good & Evil / by W.B. Yeats'। এর ন'বছর পরে, ১৯১২ সালের সেপ্টেম্বরে (১৯ ভাদ্র ১৩১৯) লেখা 'কবি য়েটস্' প্রবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তিনি [য়েট্‌স্] যে কবি, তাহা তাঁহার কবিতা পড়িয়া জানিবার সুযোগ এখনও আমার সম্পূর্ণরূপে ঘটে নাই।'[৩৮] য়েট্‌সের নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আরও মাস চারেক পরে— ১৩১৯ সনের ২০ পৌষ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'পর্শুদিন Yeats-এর গোটা দুয়েক ছোট নাটক' পড়ার অভিজ্ঞতা।[৩৯] চিঠির ভাষা থেকে মনে হয় যে, এর আগে য়েট্‌সের কোনো নাটক তাঁর পড়া ছিল না। কিন্তু কবিতা বা নাটকের অনেক আগেই যে য়েট্‌সের গদ্যগ্রন্থের নাম রবীন্দ্রনাথ জানতেন— তাঁদের দুজনের সম্পর্কের ইতিবৃত্তে এটা খুব একটা বড়ো খবর। য়েট্‌সের এই বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯০৩ সালে— ১৮৯৬ থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে লেখা তাঁর কিছু গদ্যরচনা এই বইতে সংকলিত হয়েছে। শুধু নাম জানাই নয়, এই বইটি যে রবীন্দ্রনাথ পড়েওছিলেন তার পরোক্ষ একটি প্রমাণ সেই সময়কার একটি রবীন্দ্র-রচনায় লুকিয়ে রয়েছে। *সাহিত্য* বইয়ে সংকলিত 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধটি ১৩১০ সনের কার্তিক, অর্থাৎ ১৯০৩ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'সমুদ্রপারের ... ক্ষুদ্র দ্বীপের' অরণ্যচারী 'দ্রুয়িদ' গণের কথা বললেন, যারা 'আপনাদের পূজার আবেগ ভাষাহীন প্রস্তরস্তূপে স্তম্ভিত' করে তুলেছিল।'[৪০] রবীন্দ্রসাহিত্যে এই প্রথম দেখা দিল কেল্‌টিক পুরাণ। দ্রুয়িদের উল্লেখ যে Ideas of Good and Evil বইটিতেই বিকীর্ণ হয়ে আছে তা নয়, য়েট্‌সের সমগ্র সাহিত্যেই 'দ্রুয়িদ' একটি পুনরাবৃত্ত মোটিফ। পরবর্তীকালে, ১৯১২ সালে লেখা 'কবি য়েট্‌স্' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আবার দ্রুয়িদের উল্লেখ করবেন।

য়েট্‌সের এই বইয়ের বিভিন্ন গদ্যে বারবার স্মৃতির প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন, ১৯০০ সালে লেখা 'The Philosophy of Shelley's Poetry' আর 'The Symbolism of Poetry'; ১৯০১ সালে লেখা তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'Magic'; ১৯০২ সালে লেখা 'The Celtic Element in Literature'। প্রথম প্রবন্ধে য়েট্‌স লিখেছেন, '...our little memories are but a part of some great memory that renews the world and men's thoughts age after age, and that our thoughts are not, as we suppose, the

deep but a little foam upon the deep.'।[৪১] লক্ষণীয়, little memory : ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্মৃতি; কিন্তু great memory : বিশ্বগত বৃহৎ স্মৃতি, মহাস্মৃতি। এই বৃহৎ স্মৃতি, এই মহাস্মৃতি যে আধুনিক অবিশ্বাসের যুগেও মিউজদের জননী— সেই কথাটাও এই প্রবন্ধে য়েট্‌স্‌ ঘোষণা করলেন : '...that great memory, which is still the mother of the Muses, though men no longer believe in it.'।[৪২]

'Magic' প্রবন্ধের গোড়াতেই য়েট্‌স্‌ তিনটি মতবাদের কথা জানালেন : 'That the borders of our mind are ever shifting and that many minds can flow into one another, as it were, and create or reveal a single mind, a single energy.' 'That the borders of our memories are as shifting, and that our memories are a part of one great memory, the memory of Nature herself.' 'That this great mind and great memory can be evoked by symbols.'।[৪৩]

১৯০৩ সালে রবীন্দ্রনাথের পড়া য়েট্‌সের এই বইটির প্রসঙ্গে *কথা* ও *কাহিনীর* প্রবেশক-কবিতা দুটি মনে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। ১৯০০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত 'কথা', আর মার্চ মাসে প্রথম প্রকাশিত কাহিনী-র গোড়ায় এই দুটি কবিতা ছিল না। মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত *কাব্যগ্রন্থ*-র পঞ্চম ভাগে সংকলিত *কথা* ও *কাহিনী*-র জন্য রবীন্দ্রনাথ নতুন করে এই দু-টি প্রবেশক কবিতা লিখে দেন। *কাব্যগ্রন্থ*-র এই পঞ্চম ভাগ কবে প্রকাশিত হয়েছিল? রবীন্দ্রনাথকে লেখা মোহিতচন্দ্রের একটি চিঠিতে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯০৩ সালে আগস্টের শেষভাগে ওই খণ্ডটি প্রকাশের আশা আছে।[৪৪] সম্ভবত আরও একটু দেরি হয়েছিল। 'কাব্যগ্রন্থ'র চতুর্থভাগ প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালের ২০ ডিসেম্বর।[৪৫] *রবিজীবনী*-কারের মতে, বর্ষশেষের আগেই কাব্যগ্রন্থ-র পঞ্চম ভাগ বেরিয়ে গিয়েছিল।[৪৬]

কথা-র প্রবেশক-কবিতায় 'অনাদি অতীত'কে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই বলেছেন, 'যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা/ তোমার সাগরতলে,/ কত জীবনের কত ধারা এসে/ মিশায় তোমার জলে।/ সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,/ কলকল ভাষ নীরব তাহার—/তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন,/ তুমি তারে কোথা লও।/ হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার/কথা কও, কথা কও।' স্মৃতি-সরোবর নয়, স্মৃতি-সমুদ্র। অতীতের উদ্দেশে এই কবিতায় কবির সবচেয়ে স্মরণীয় উক্তি হল : 'তুমি জীবনের পাতায় পাতায়/ অদৃশ্য লিপি দিয়া/ পিতামহদের কাহিনী লিখিছ/মজ্জায় মিশাইয়া।'

কাহিনী-র প্রবেশক-কবিতায় অতীতের এই মূর্তিটি সুনিশ্চিত নারীমূর্তি : 'ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী'। তাকেই সম্বোধন করে কবি বলেছেন, 'তব ঘরে কিছু ফেলা নাহি যায়/ওগো হৃদয়ের গেহিনী!/কত সুখ দুখ আসে প্রতিদিন,/কত ভুলি, কত হয়ে আসে ক্ষীণ—/তুমি তাই লয়ে বিরাম বিহীন/রচিছ জীবনকাহিনী।' হৃদয়ের গেহিনী যে-স্মৃতিদেবী বিরামবিহীনভাবে কবির জীবনকাহিনি রচনা করে চলেন, তাঁর লীলা কবির ব্যক্তিসীমার

মধ্যেই বিলসিত। কিন্তু এই কবিতাটিতেই এরপর কবি বলেছেন, 'গভীর নিভৃতে মোর মাঝখানে,/কী যে আছে কী যে নাই/ কে বা জানে,/কী জানি রচিলে আমার পরানে/কত না যুগের কাহিনী—/কত জনমের কত বিস্মৃতি/ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী।' কবির ব্যক্তিসীমাকে অতিক্রম করে স্মৃতিদেবী এখানে কত-না-যুগের কত-জনমের বিস্মৃত কাহিনিকে কবির 'গভীর নিভৃতে' রচনা করে চলেছেন।

মিউজদের রবীন্দ্রনাথ জানতেন। *ছিন্নপত্রাবলী*-র একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাইনে'— মাধুর্যময় কৌতুকে স্নিগ্ধ হয়েছিল তাঁর এই উপমা— 'মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায়না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে।'[৪৭] এই উপমাটির মধ্যে মাধুর্য আছে, কৌতুকও আছে, সেইসঙ্গে আরও একটু অপূর্বত্ব রয়েছে যা হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ে না। কবি নিজেকে তুলনা করেছেন 'মদগর্বিতা যুবতী'র সঙ্গে. আর মিউজরা হচ্ছে তাঁর অনেকগুলি 'প্রণয়ী'। অর্থাৎ পুরুষের উপমান নারী, আর নারীদের উপমান পুরুষ। যেন আর-একটি প্রেম-বিলাস-বিবর্ত। লৌকিক প্রেমের আদল থাকলেও মিউজদের সঙ্গে কবির প্রেম যে আসলে লোকোত্তর— উপমার এই চমৎকার বিপর্যাসে সেই ভিতরের কথাটা বেরিয়ে এল।

গ্রিক পুরাণে মিউজ নয়টি হলেও আমরা জেনে গিয়েছি যে, তাদের মধ্যে একজনই প্রধানা। নয়জনের কোনোটিকেই রবীন্দ্রনাথ হাতছাড়া করতে চাননি বটে, কিন্তু ওদের মধ্যে বিশেষ একজনই যে তাঁর শ্রেষ্ঠা সেকথাও কি লুকোনো রইল? উদ্ধৃত করা যাক চিত্রার 'জ্যোৎস্নারাত্রে'। 'তোমাদের বাসরকুঞ্জের বহির্‌দ্বারে/বসে আছি—'। 'কোথায় গাহিছ গান। /তোমরা কাহারা মিলি করিতেছ পান/ কিরণকনকপাত্রে সুগন্ধি অমৃত, /মাথায় জড়ায়ে মালা পূর্ণবিকশিত /পারিজাত— গন্ধ তারি আসিছে ভাসিয়া/মন্দ সমীরণে— উন্মাদ করিছে হিয়া/অপূর্ব বিরহে। খোলো দ্বার, খোলো দ্বার। /তোমাদের মাঝে মোরে লহ একবার/ সৌন্দর্যসভায়।' এর পরেই কিন্তু কবির এই 'অপূর্ব বিরহ' অনেকান্ত থেকে সংহত হয়ে এল একান্তের 'নন্দনবনের মাঝে/নির্জন মন্দিরখানি— সেথায় বিরাজে/একটি কুসুমশয্যা, রত্নদীপালোকে/ একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে/বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা—/আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা।' তফাতের মধ্যে শুধু হেসিওডের বর্ণিত প্রধানা মিউজ ক্যালিওপি মহাকাব্যের দেবী, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রধানা মিউজ 'জ্যোতির্ময়ী' বালা কবির মহাকাব্যিক কল্পনাকে 'হাজার গীতে'র 'কণায় কণায়' চূর্ণবিচূর্ণ করে দেন। অর্থাৎ তিনি গীতিকাব্যের দেবী।[৪৮]

রবীন্দ্রনাথ কি প্লেটো পড়েছিলেন? মানসী-র 'মরণস্বপ্ন' কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, "প্লেটোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় শেলির মাধ্যমেই ঘটেছিল এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্লেটোর ডায়ালগগুলি যে পড়েছিলেন তারও প্রমাণ রয়েছে। এর প্রথম সাক্ষী 'পারিবারিক স্মৃতি'

খাতা, দ্বিতীয় সাক্ষী 'পঞ্চভূত'। ...একই বিষয় নিয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে বহুজনের বহুমুখী মন্তব্য 'পারিবারিক স্মৃতি' খাতায় লিপিবদ্ধ করার এই রীতি প্লেটোর ডায়ালগের রীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ একটি আলোচনার শিরোনাম হিসাবে 'ডায়ালগ' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন।''[৪৯]

'প্লেটোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়' যে 'শেলির মাধ্যমেই ঘটেছিল' সেকথা অধ্যাপক ভট্টাচার্য অনেক আগেই তাঁর 'এপিসাইকিডিয়ন ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন। প্লেটোর 'সিম্পোসিয়াম'-এ প্রেমতত্ত্বের আলোচনায় অ্যারিস্টোফেনিস একটি অর্ধনারীশ্বর যুগ্মসত্তার কল্পনা করেছিলেন। শেলি 'সিম্পোসিয়াম' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এবং অ্যারিস্টোফেনিসের অর্ধনারীশ্বর যুগ্মসত্তার কল্পনায় অনুপ্রাণিত হয়ে লেখেন, 'এপিসাইকিডিয়ন' কবিতা। ওই যুগ্মসত্তার একটি হল শেলির ভাষায় 'সাইকি' বা আত্মা, অন্যটি হল 'এপিসাইকি' বা প্রতিআত্মা। 'এপিসাইকিডিয়ন' হচ্ছে প্রতি-আত্মার গান। রবীন্দ্রনাথ 'সম্মিলন' শিরোনামে শেলির 'এপিসাইকিডিয়ন'-এর শেষাংশ অনুবাদ করেন এবং শেলির সাইকি-এপিসাইকির কল্পনায় অনুপ্রাণিত হয়ে লেখেন 'যথার্থ দোসর' প্রবন্ধ। তাঁর কুড়ি-পেরিয়ে-লেখা এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও একটি যুগলসত্তার কথা বলেছেন, যে-যুগলের দুটি অংশ তাঁর ভাষায় পরস্পরের যথার্থ দোসর। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের সূচনাও হয়েছে শেলির একটি কবিতার অনুবাদ দিয়ে। 'The World's Wanderers' নামে ওই কবিতাটির গোড়াতেই রয়েছে পক্ষবান তারার প্লেটোনিক রূপকল্প : 'Tell me, thou star, whose wings of light/Speed thee in thy fiery flight,/ In what cavern of the night/ Will thy pinions close now?'— রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে : 'হে তারকা ছুটিতেছ আলোকের পাখা ধ'রে, / তোমারে শুধাই আমি, বল গো বল গো মোরে, /তুমি তারা, রজনীর কোন গুহা মাঝে যাবে,/ আলোকের ডানাগুলি মুদিয়া রাখিতে পাবে?'

বিশেষভাবে প্লেটোর স্মরণতত্ত্বের দিকে লক্ষ রেখে প্লেটো, শেলি ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আরও দু-একটি তথ্য অধ্যাপক ভট্টাচার্যের আলোচনার অনুবৃত্তি হিসেবে আমরা উল্লেখ করতে চাই। ১৯২২ সালের ৮ জুলাই শেলির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'যখন শেলির কাব্য ভালো করে আলোচনা করা যায় তখন দেখি, এই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরাত্মার সঙ্গে তিনি যেন কারবার করতে চেয়েছিলেন। ...বিশ্বে বাইরের যে রূপ, যেটা স্থূল রূপ, সেটা যেন তাঁর কাছে ছিল না বললেই হয়।' এই বক্তৃতাতেই রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ বলেছিলেন, 'বিচিত্র সুখদুঃখময় মানুষের জীবনটাকেও শেলি যেন একটা পর্দার মতো করে দেখেছিলেন। এর খণ্ডতা এর স্থূলতা যেন সত্যকে আবৃত করে রেখেছে। এই কুহেলিকার পর্দাখানা ছিঁড়ে ফেলে সত্যের অখণ্ড নির্মল মূর্তি দেখবার জন্যে কবির ভারী একটা ব্যাকুলতা ছিল। কতবার সেইজন্য তিনি মৃত্যুর মধ্যে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করেছেন।'[৫০] এই বক্তৃতার প্রায় দশ বছর পরে 'আধুনিক

কাব্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন শেলির 'প্লেটোনিক ভাবুকতা'।[৫১] শেলির প্লেটোনিজম্ সংক্রান্ত আলোচনায় নটোপুলস দেখিয়েছেন যে, শেলির এই প্লেটোনিক ভাবুকতার প্রথম পর্যায়ে তাঁকে সবচেয়ে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে *ফায়েডো*।[৫২] 'কুহেলিকার পর্দা'র মতো এই জীবনটাকে 'ছিঁড়ে ফেলে' 'সত্যের অখণ্ড নির্মল মূর্তি' দেখবার জন্য তরুণ শেলি সত্যিই 'কতবার' 'মৃত্যুর মধ্যে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা' করেছেন! আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনেও প্লেটোর অন্যান্য সংলাপের তুলনায় 'ফায়েডো'ই তাঁকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে। এমনকি *ফায়েডো*-য় মৃত্যুপথযাত্রী সক্রেটিসের প্রদত্ত শিক্ষা 'living is learning how to die'[৫৩]-এর প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ পাওয়া যাবে চিত্রার 'নববর্ষে' কবিতায় : 'কেমনে মরিতে হয় তবে/ শেখো তাই করি প্রাণপণ'। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুশোকের মাস থেকে শুরু করে তাঁর রচনার নির্বাচিত কয়েকটি অংশ নিচে সাজিয়ে দেওয়া গেল :

ক. 'সত্য যাহা তাহা অদৃশ্য, তাহা কখনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহা একটা ভাব মাত্র। কিন্তু ভাব আমাদের নিকট নানারূপে প্রকাশ পায়, ভাষা আকারে, অক্ষর আকারে, বিবিধ বস্তুর বিচিত্র বিন্যাস আকারে। তেমনি প্রকৃত জগৎ যাহা তাহা অদৃশ্য, তাহা কেবল একটি ভাব মাত্র, সেই ভাবটি আমাদের চোখে বহির্জগৎ রূপে প্রকাশিত হইতেছে।'[৫৪]

'জগৎ সত্য', *ভারতী*, বৈশাখ ১২৯১

খ. 'আত্মবিসর্জনের মধ্যেই আত্মার অমরতার লক্ষণ দেখা যায়। ...পৃথিবীর মাটি হইতে উদ্ভূত হইয়া পৃথিবীতেই মিলাইয়া যাইব, এ সন্দেহ কখন দূর হয়? যখন দেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে যে ঐহিকের সকল নিয়ম মানে না।... কোথাও ইহার 'কেন' খুঁজিয়া পাই না। কেবল হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারি যে, নিজের-ক্ষুধায়-কাতর সংগ্রামপরায়ণ এই জগৎ অতিক্রম করিয়া আর এক জগৎ আছে, ইহা সেইখানকার নিয়ম। সুতরাং এইখানেই পরিণাম দেখিতেছি না। চারিদিকে এই-যে বস্তুজগতের ঘোর কারাগারভিত্তি উঠিয়াছে, ইহাই আমাদের অনন্ত কবরভূমি নহে। অতএব যখনি আমরা আত্মবিসর্জন করিতে শিখিলাম তখনি আমাদের গুরুভার ঐহিক দেহের উপরে দুটি পাখা উঠিল। পৃথিবীর মাটিতে চলিবার সময় সে পাখা দুটির কোন অর্থ বুঝা গেল না। কিন্তু ইহা বুঝা গেল যে ঐ পাখা দুটি কেবলমাত্র তাহার শোভা নহে, উহার কার্য আছে।'[৫৫]

'আত্মার অমরতা', *তত্ত্ববোধিনী*, শ্রাবণ ১২৯১

গ. 'আমি সেই বিস্মৃতদের মধ্যে যাইতে চাই— তাহাদের জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে!'...বিস্মৃতিই যদি আমাদের অনন্তকালের বাসা হয় আর স্মৃতি যদি

কেবলমাত্র দুদিনের হয় তবে সেই আমাদের স্বদেশেই যাই-না কেন!'[৫৬]

'পুষ্পাঞ্জলি', *ভারতী*, বৈশাখ ১২৯২

ঘ. 'বস্তুজগৎটা হচ্ছে অটল reality— তার মধ্যে আমাদের কল্পনা এবং আমাদের ধর্মবুদ্ধির পরিতৃপ্তি হয় না। তার পরিতৃপ্তি সাধন করতে হলে একটা ideal জগতের সৃজন করতে হয়, সেই ideal জগৎ স্থাপন করব কোথায়? মৃত্যু যেখানে এই বস্তুজগতের মধ্যে ফাঁক করে দিয়েছে। সেই মৃত্যুর পারেই আমাদের স্বর্গ, আমাদের দেবতাসম্মিলন, আমাদের সম্পূর্ণতা, আমাদের অমরতা। ...যদি মৃত্যু না থাকত তাহলে আপনার সীমাহীন অস্তিত্বের মধ্যেই সুকঠিনভাবে বদ্ধ হয়ে থাকতুম; মানবাত্মার সর্বাপেক্ষা মহৎ কবিত্বের স্থান পরলোক এবং দেবলোক, যা আমাদের ধর্মবুদ্ধি এবং সৌন্দর্যবোধের প্রধান পরিতৃপ্তির স্থান তার আমরা আভাস বা উদ্দেশ পেতুম না।'

ছিন্নপত্রাবলী, ২২২, ২০ জুলাই, ১৮৯৫

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে 'ফায়েডো'র প্রভাব আরও সুনিশ্চিতভাবে ধরা পড়েছে 'মানসী'র 'মরণস্বপ্ন' কবিতায়। এই কবিতাটির অসামান্য বিশ্লেষণে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তা প্রমাণও করেছেন। শুধু এইটুকু আরও লক্ষ করবার বিষয় যে, 'ফিড্রাস'-এর তুলনায় 'ফায়েডো'য় প্লেটোর স্মরণতত্ত্বের স্বাতন্ত্র্যটুকুও 'মরণস্বপ্ন' কবিতায় কিছুটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মুমূর্ষু রাজহংসের পিঠে শায়িত কবি যখন মৃত্যুলোকে এসে পৌঁছোলেন, তখন 'নিখিল নির্জন, স্তব্ধ, / শুধু শুনি জলশব্দ / কলকল-কল্লোল-লহরী— / নিদ্রাপারাবার যেন স্বপ্ন-চঞ্চলিত।' 'অপার আকাশে' ওই 'নিদ্রাপারাবার' যেন নিমোজিনির স্বর্গীয় স্মৃতিসরোবরের কথা মনে করিয়ে দেয়। দিব্যস্মৃতি জেগে উঠছে বলেই ওর ঘুমিয়ে-থাকা জলে কলশব্দে চঞ্চল হয়েছে স্বপ্নের কল্লোল-লহরী। আর দিব্যস্মৃতির এই আলোড়নের পর ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে কবির সমস্ত মর্ত্যস্মৃতি : 'সহসা এ জীবনের সমুদয় স্মৃতি/ক্ষণেক জাগ্রত হয়ে নিমেষে চকিতে / আমারে ছাড়িয়া দূরে / পড়ে গেল ভেঙেচুরে, / পিছে পিছে আমি ধাই নিতি—/একটি কণাও আর পাই না লখিতে।'

'ফিড্রাস'-এর স্মরণতত্ত্বও অবশ্য রবীন্দ্ররচনায় দুষ্প্রাপ্য নয়। 'ফিড্রাস'-এ প্লেটোর বক্তব্য ছিল, বিস্মরণে পূর্ণ হয়ে ওঠায় লুপ্তপক্ষ মানবাত্মা তার নির্ভার ঊর্ধ্ববিহারের ক্ষমতা হারিয়ে দিব্যজগৎ থেকে স্খলিত হয় মর্ত্যে, আর তারপর এই মর্ত্যের সৌন্দর্যকে ভালোবেসেই তার মধ্যে পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে দিব্যজগতের আদর্শ সৌন্দর্যের স্মৃতি। চিত্রার 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় এমনই এক মানবাত্মা বলেছে, 'বর্ষ লক্ষশত/যাপন করেছি হর্ষে দেবতার মতো/দেবলোকে'; কিন্তু আজ 'নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টিকা/মলিন ললাটে', 'পুণ্যবল হল ক্ষীণ, /আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন'। মানবাত্মার মর্ত্যাবতরণের দৃশ্যটি এই কবিতায় আশ্চর্যভাবে প্লেটোনিক : '...মোরা শত শত /

গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মতো / মুহূর্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হতে / ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যুস্রোতে।' আর তারপর যেন ফিড্রাসকে অনুসরণ করেই '...মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ / দূরস্বপ্নসম, যবে কোনো অর্ধরাতে / সহসা হেরিব জাগি নির্মল শয্যাতে / পড়েছে চন্দ্রের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী / লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি / গ্রন্থি শরমের— মৃদু সোহাগচুম্বনে / সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে / লতাইবে বক্ষে মোর— দক্ষিণ অনিল / আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল / গাহিবে সুদূর শাখে।'

প্লেটোর ডিমনও রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৫৫ সনের আশ্বিন সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত পরিভাষাগুলি সংকলন করেছিলেন; বছর দশেক পরে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার চতুর্দশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮০ শক) এই পরিভাষাগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়। পরিভাষার এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ 'daemon'-এর বাংলা করেছেন 'জীবনদেবতা'[৫৭]। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, 'তার মানে এই যে জীবনদেবতার যে-ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ নিজে দিয়েছেন তা য়োরোপীয় daemon-এর ধারণার সঙ্গে মিলে যায়।[৫৮] এই প্রসঙ্গে ১৯০৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি মোহিতচন্দ্র সেনকে জীবনদেবতার ব্যাখ্যা করে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য : '...যাহার মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের সহিত আমার যোগ,— ঈশ্বরের বার্তা আদেশ ও আনন্দ যে আমার মধ্যে আনয়ন ও সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতেছে...তাহার সহিত প্রেমের আনন্দে যুক্ত হইয়া পরস্পরকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই অতিজগতের সহিত জগতের নিত্য প্রেমের সম্বন্ধ আপনার মধ্যেই বুঝিতে পারিব...। আমার জীবনের দেবতা আমার অতিজগতের সহচর একটি অপূর্ব নিত্য প্রেমের সূত্রে ঈশ্বরের সহিত আমার একটি পরম রহস্যময় আধ্যাত্মিক মিলনের সেতু রচনা করিতেছে।'[৫৯] বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের নিজের-করা জীবনদেবতার এই ব্যাখ্যায় প্লেটোনিক ডিমনের 'interpreter and mediator between God and man'-এর ভূমিকাটি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই ডিমন, তাঁর জীবনদেবতা, একইসঙ্গে তাঁর মিউজ এবং এরস্। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সে আমাকে কেবল যে প্রকাশ করায় তা নয়, অনুভব করায়, ভালোবাসায়।'[৬০] মিউজ হিসেবেও বটে, এরস্ হিসেবেও বটে, রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা, তাঁর 'অতিজগতের সহচর' নিজের মধ্যেই বহন করছে ওই অতিজগতের দিব্যস্মৃতির এক ভাণ্ডার।

অন্যদিকে ১৯০৪ সালে, *বঙ্গভাষার লেখক* বইয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে-আত্মপরিচয় রচনা করলেন, সেখানে জীবনদেবতা সম্বন্ধে তিনি বললেন, 'আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন— সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি

তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি, সেইজন্য এতবড়ো রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।'[৬১] 'বিশ্বের মধ্য' দিয়ে প্রবাহিত কবির অস্তিত্বধারার এই 'বৃহৎ স্মৃতি'কে বলা যায় কবির ঐতিহাসিক স্মৃতি বা জননান্তর স্মৃতি। জীবনদেবতাকে অবলম্বন করেই এই ঐতিহাসিক বা জননান্তর স্মৃতি কবির সংজ্ঞান মনের অগোচরে কবির মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়েছে।

জীবনদেবতার এই যেমন একটি বিশেষ আবির্ভাব কবির আত্মগত হয়ে আছে, তেমনি জীবনদেবতার আর একটি নির্বিশেষ আবির্ভাবও আছে যাকে বলা যায় সর্বজনগত : সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতামালায় রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন 'সর্বমানুষের জীবনদেবতা'[৬২]—প্লেটোনিক পরিভাষায় daemon of the world। এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার আকর্ষণে মানববিশ্ব ক্রমাগত একটি আদর্শ মহামানববিশ্ব রূপে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। এই মানববিশ্বের মধ্যেই অনুবিষ্ট (immanent) হয়ে রয়েছে 'সমস্ত মানুষের স্মৃতিলোক'। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন 'কালের নীড়' : 'অতীতকাল থেকে পূর্বপুরুষদের কাহিনী নিয়ে কালের নীড় সে তৈরি করেছে। এই কালের নীড় স্মৃতির দ্বারা রচিত, গ্রথিত। এ শুধু এক-একটা বিশেষ জাতির কথা নয়, সমস্ত মানুষ জাতির কথা।'[৬৩] সমস্ত মানুষের এই স্মৃতিকে অনায়াসে বলা চলে সমস্ত মানুষের ঐতিহাসিক স্মৃতি বা জননান্তর স্মৃতি। আসলে এ হচ্ছে সমস্ত মানুষের অতীত ঐতিহ্য। যেহেতু এই অতীত ঐতিহ্য 'সমস্ত মানুষজাতির', কাজেই এই ঐতিহাসিক বা জননান্তর স্মৃতি আন্তর্জাতিক। আবার, 'এ শুধু এক-একটা বিশেষ জাতির কথা নয়' বলার ফলে বিশেষ জাতিকেও অস্বীকার করা হচ্ছে না; অতএব ঐতিহ্য যেখানে বিশেষ একটি জাতির, সেখানে এই ঐতিহাসিক বা জননান্তর স্মৃতি জাতিক স্মৃতিই বটে।

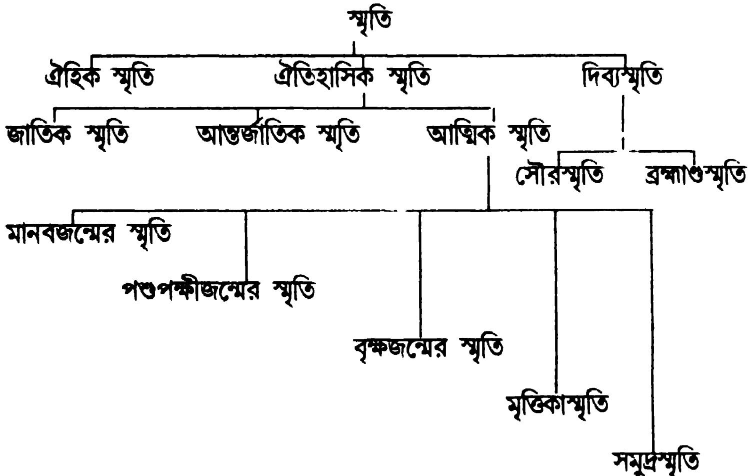
স্মৃতি বাস্তবে সর্বদাই ইহজীবনের অতীত অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভরশীল। কিন্তু জীবনদেবতাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের এই দিব্যস্মৃতি আর ঐতিহাসিক স্মৃতি কখনোই তাঁর ইহজীবনের অতীত অভিজ্ঞতার ফল হতে পারে না। তাই এ দুটিকে একত্রে তাঁর কবিমনের দুর্জ্ঞেয় একটি রহস্যময় উপলব্ধি হিসেবে গ্রহণ না করে উপায় নেই। অবশ্য যে-স্মৃতি নেহাতই ইহজীবনের অতীত অভিজ্ঞতার উপরে দাঁড়ায়, সেই স্মৃতিও যে রবীন্দ্রনাথের নিত্য-স্মরণের বিষয়ীভূত হয়নি এমন কথাও তো বলা যাবে না। আর এইখানেই গ্রিক স্মৃতিতত্ত্ব আর রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতত্ত্বের মৌলিক পার্থক্যটি চিনে নিতে হবে। গ্রিক স্মৃতিতত্ত্বে শুধু দিব্যস্মৃতিই daemonic; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতত্ত্বে কেবল দিব্যস্মৃতি আর ঐতিহাসিক স্মৃতিই নয়, এমনকি ঐহিক স্মৃতিও জীবনদেবতার দ্বারাই সংগৃহীত, সুবিন্যস্ত ও সবশেষে কবির শিল্পশালায় সঞ্চারিত হয়ে ভাষাশরীরকে পায়। ঐহিক স্মৃতিও? কেন নয়? *জীবনস্মৃতি*-র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ স্মৃতির-পটে-আঁকা জীবনের ছবি দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এই স্মৃতি তো তাঁর ঐহিক স্মৃতিই বটে! লক্ষ

করবার বিষয়, ছবির ঘরে সংগৃহীত ও সুবিন্যস্ত এই স্মৃতিপটগুলির কোনো কর্তৃত্ব কিংবা কৃতিত্ব কিছুই তিনি দাবি করেননি; বরং এগুলিকে বলেছেন, 'কোন্-এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা'।

Daemonic Star-এর রূপকল্প যে শুধু রবীন্দ্রনাথের অনূদিত শেলির কবিতাতেই পাওয়া যাবে তা নয়, রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত কবিতাতেও এর চকিত আবির্ভাব বিস্ময়কর। যেমন, 'কল্পনা'র 'অশেষ' কবিতায় কবি তাঁর জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, প্রাসাদবাসিনী 'কঠোর স্বামিনী'কে জিজ্ঞাসা করছেন যে, সন্ধ্যাবেলায় 'তারাগুলি হর্ম্যশিরে উঠে না কি ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পাখায়?' শুধু পক্ষবান নয়, এই তারা পথপ্রদর্শকও বটে। আর তাই 'Stray Birds'-এর স্বল্পাক্ষর একটি কবিতায় কবি বলেন, 'Let me think that there is one among those stars that guides my life through the dark unknown.'।[৩৪]

৩

রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে রোমাঞ্চকর এক স্মৃতিযাত্রায় আমরা এবার বেরিয়ে পড়তে পারি। যাত্রার প্রাক্কালে এই যাত্রাপথের একটি চিত্ররূপ এঁকে নেওয়া যাক :



যেহেতু 'স্মৃতি' শব্দটিই আমাদের মনে অনিবার্য একটি কালক্রমের সংবেদন এনে দেয়, তাই ইচ্ছে করেই স্মৃতিকে এই চিত্ররূপের বাঁদিক থেকে ডানদিকে ক্রমশ সূক্ষ্মতর ও সুদূরতর করে তোলা হয়েছে। হুবহু এই পারম্পর্যকে মান্য করেই-যে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি সর্বদা সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে— এমন অসম্ভব দাবি করব না। আসল কথা, আমাদের আলোচনার সুবিধের জন্যই এই ছকটুকু আমরা বানিয়ে নিয়েছি।

প্রথমে ঐহিক স্মৃতি। অর্থাৎ ইহজন্মের স্মৃতি। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন একুশও পূর্ণ হয়নি, *বিবিধ প্রসঙ্গ*-র একটি গদ্যে তিনি এই ঐহিক স্মৃতির অনির্বচনীয়তাকে আশ্চর্য ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন : 'যেমন, এমন শব্দ আছে যাহা আমাদের কাছে নিস্তব্ধতা

তেমনি এমন স্মৃতি আছে যাহা আমাদের কাছে বিস্মৃতি। আমরা যাহা একবার দেখিয়াছি, যাহা একবার শুনিয়াছি, তাহা আমাদের হৃদয়ে চিরকালের মতো চিহ্ন দিয়া গিয়াছে। কোনটা বা স্পষ্ট, কোনটা বা অস্পষ্ট, কোনটা বা এত অস্পষ্ট যে আমাদের দর্শন শ্রবণের অতীত। কিন্তু আছে।'[৬৫] বছর দুয়েক পরে, রবীন্দ্রনাথ যখন প্রায় তেইশ, 'আলোচনা'র একটি গদ্যে তিনি আবার বললেন, 'আমাদের স্মরণশক্তি অতি ক্ষুদ্র, বিস্মৃতি অতিশয় বৃহৎ। কিন্তু বিস্মৃতি অর্থে তা বিনাশ বুঝায় না। স্মৃতিবিস্মৃতি একই জাতি। একই স্থানে বাস করে। বিস্মৃতির বিকাশকেই বলে স্মৃতি, কিন্তু স্মৃতির অভাবকেই যে বিস্মৃতি বলে তাহা নহে। এই অতিবিপুল বিস্মৃতি আমাদের মনের মধ্যে বাস করিতেছে। ...অবিশ্রাম কাজ করিতেছে, এবং কোন কোনটা স্মৃতি রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।'[৬৬] রবীন্দ্রনাথ এখানে নতুন একটা কথা বললেন : 'বিস্মৃতির বিকাশকেই বলে স্মৃতি'। আরও কয়েকবছর পর, 'পারিবারিক খাতা'য় একেই তিনি বলবেন, 'ভাবাত্মক বিস্মৃতি'।[৬৭]

পঞ্চাশে পৌঁছিয়ে প্রথম পঁচিশ বছরের *জীবনস্মৃতি* লেখার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শুরু হয়ে গেল মায়ার্সের পরিভাষায় automnesia—'spontaneous revival of memories of an earlier condition of life'।[৬৮] ওই প্রথম পঁচিশ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের 'জীবনের পূর্ণ নির্ভর',[৬৯] ছিলেন যিনি, একাধারে মিউজ আর এরস্‌কে মিলিয়ে যিনি তাঁর ডিমন, তিপ্পান্ন পেরিয়ে 'ছবি' কবিতা লেখার পর থেকে রবীন্দ্রনাথের automnesia ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে পুনরাবর্তিত হতে লাগল সবচেয়ে বেশি তাঁকে ঘিরেই। 'ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা,/বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা'। আরও বছর পাঁচেক পর 'পুষ্পাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপি কিংবা পুরোনো 'ভারতী'তে মুদ্রিত 'পুষ্পাঞ্জলি' পড়তে পড়তে এবং সেইগুলিকে অবলম্বন করে *লিপিকার* প্রথম পর্যায়ের গীতিগদ্যগুলি লিখতে লিখতে আটান্নবর্ষীয় রবীন্দ্রনাথের এই ভাবাত্মক বিস্মৃতি তাঁর অস্তাচলকে বারবার তাঁর পূর্বাচলের মুখোমুখি করে দিল। সেই পূর্বাচলে কি আর ফেরা যায়? 'নেবুতলা উজিয়ে সেই পুকুরপাড়, দ্বাদশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোয়ালবাড়ি, ধানের গোলা পেরিয়ে— সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মুখের মহলে আর একটিবারও ফিরে গিয়ে বলা হবে না, "এই যে!"'[৭০] জীবনের পথে যে আর অতীতে ফেরা যায় না : 'কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়।'[৭১] কিন্তু জীবনের পথে আর ফেরা না গেলেও স্মৃতির পথে তো যায়!—'এ পথে আমি-যে গেছি বারবার ভুলিনি তো একদিনও'। আর বনের ছায়ায়, বিস্মৃতির-ঘাসে-ঢাকা ওই স্মৃতির পথে, যে তাঁকে 'পিছন থেকে' ডাকে, সে তাঁর 'সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক'।[৭২] *লিপিকা*-র এই লেখাগুলির পর আরও যে-কুড়িবাইশ বছর রবীন্দ্রনাথ বেঁচেছিলেন, সেইসময়কার কবিতা আর গানের বিরাট একটা অংশই এই স্মৃতির আকার দিয়ে আঁকা : 'হে অতীত, /শান্ত তুমি নির্বাণ-বাতির/অন্ধকারে,

/সুখদুঃখনিষ্কৃতির পারে। /শিল্পী তুমি, আঁধারের ভূমিকায়/নিভৃতে রচিছ সৃষ্টি নিরাসক্ত নির্মম কলায়, /স্মরণে ও বিস্মরণে বিগলিত বর্ণ দিয়া লিখা/বর্ণিতেছ আখ্যায়িকা; .../আজ আমি তোমার দোসর, /আশ্রয় নিতেছি সেথা যেথা আছে মহা-অগোচর।/ তব অধিকার আজি দিনে দিনে ব্যাপ্ত হয়ে আসে/আমার আয়ুর ইতিহাসে।/ সেথা তব সৃষ্টির মন্দিরদ্বারে/আমার রচনাশালা স্থাপন করেছি একধারে'।[৭৩]

এইবার ঐতিহাসিক স্মৃতি। জীবনদেবতাকে কবি যখন দেখেন 'ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে/বিধাতার বামপাশে',[৭৪] তখন সেই ইতিহাস মানবজাতির ইতিহাসই বটে। এই মানবজাতি প্রথমত হতে পারে বিশেষ কোনো একটি মানবজাতি। *য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি*-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আমরা পুরাতন ভারতবর্ষীয়; বড়ো প্রাচীন, বড়ো শ্রান্ত। আমি অনেক সময়ে নিজের মধ্যে আমাদের সেই জাতিগত প্রকাণ্ড প্রাচীনত্ব অনুভব করি।' এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের জাতিক স্মৃতি। জাতি এখানে ভারতীয় জাতি। তবে আরও বিশিষ্টভাবে এই জাতি হতেও পারে বাঙালি জাতি। এই প্রসঙ্গে ১৯৩৪ সালের ২৫ এপ্রিল অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির কথা মনে পড়ছে। অমিয় চক্রবর্তী য়ুরোপে বরাবরকার মতো স্থিতিলাভ করতে ইচ্ছে করেন জেনে রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে তাঁকে জানান যে, তিনি 'নিজেও এই সংকল্প অনেকবার মনে' এনেছেন। কিন্তু দেশের সঙ্গে 'অন্তরতম সম্বন্ধ' তাঁর এই সংকল্পকে সিদ্ধ করবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেমন সেই 'অন্তরতর সম্বন্ধ'? রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'অসংখ্য সূক্ষ্ম স্নায়ুর সমাবেশে তার বহুধা বেদনা আমার সমস্ত মনকে জড়িয়ে রেখেছে—জন্মপূর্বের স্মৃতি আছে তার মধ্যে, আমার দৃষ্টিতে আমার শ্রুতিতে, আমার চিন্তায় আমার আকাঙ্ক্ষায় জীবনের বহুতন্ত্রবিশিষ্ট বীণায় সে আপন সুর বেঁধে দিয়েছে। তার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হলে আমার ভোজে খাদ্য থাকে, এমনকি খাদ্য বেশিও থাকে কিন্তু তার স্বাদ থাকে না। এই কারণে যতবার আমি দেশের বাইরে গেছি এখানকার রূপে রসে ভরা আকাশ আমাকে ডাক দিয়ে পাঠায়। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকে সমস্ত মন দিয়ে আমি ভালোবেসেছি বাঙালীর মেয়েকে, ...যখন দূরে যাই এখানকার শ্যামশ্রীর স্মৃতিপটে তারি ছবিটি ফুটে ওঠে আমার মনে'।

কিন্তু বিশেষ কোনো একটি মানবজাতি না হয়ে এই জাতি হতেই পারে সমস্ত মানবজাতি। অর্থাৎ বাঙালি ও ভারতীয় হিসেবে রবীন্দ্রনাথের যেমন একটি জাতিক স্মৃতি থাকতে পারে, তেমনি মানবজাতির উত্তরাধিকারী হিসেবে একটি আন্তর্জাতিক স্মৃতিও তাঁর মনে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। হিবার্ট বক্তৃতায় নিজের মধ্যে মানুষের এই আন্তর্জাতিক স্মৃতিকে অনুভব করেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম পুরুষীয় বাচনে বললেন, 'His kingdom is also continually extending in time through a great surplus in his power of memory, to which is linked his immense facility of borrowing the treasure of the past from all quarters of the world. He dwells in a universe of history, in an environment of continuous remembrance. ... The stupendousness of his knowledge and wisdom is due to their roots

spreading into and drawing sap from the far-reaching area of history.'[৭৫]

রবীন্দ্রনাথের একেবারে নিজেকে নিয়ে নিজের ঐতিহাসিক স্মৃতি ওরফে জন্মান্তর স্মৃতিকেই বলা হচ্ছে তাঁর আত্মিক স্মৃতি। এ হচ্ছে বিশ্বের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তাঁরই 'অস্তিত্বধারা'র স্মৃতি। ১৯১২ সালে ইংলন্ডে স্টপফোর্ড ব্রুক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন কিনা। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমাদের বর্তমান জন্মের বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট কল্পনা আমার মনে নাই এবং সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করা আবশ্যক মনে করি না।' অথচ এর পরমুহূর্তেই তিনি বললেন, 'ইহা কখনো হইতেই পারে না যে, আমার জীবনধারার মাঝখানে এই মানবজন্মটা একেবারেই খাপছাড়া জিনিস— ইহার আগেও এমন কখনও ছিল না, ইহার পরেও এমন কখনও হইবে না, যে কারণবশত জীবনটা বিশেষ দেহ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে সে কারণটা এই জন্মের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ হইয়া এই জন্মের মধ্যেই সম্পূর্ণ শেষ হইয়া গেল। শরীরী জন্ম পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে হইতে আপনাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিতেছে, এইটেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়'।[৭৬] রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের প্রথমাংশ ও শেষাংশের মাঝখানে যেন একটু দ্বিধা আছে। আসলে জন্মান্তর সম্বন্ধে 'কোনো সুনির্দিষ্ট কল্পনা' বলতে রবীন্দ্রনাথ জন্মান্তরের ধর্মীয় কল্পনাকেই বুঝিয়েছেন। 'করমবিপাকে গতাগতি পুন পুন'—এই কল্পনা তাঁর নেই। কিন্তু যা তাঁর আছে তাকে এককথায় বলা চলে দার্শনিক প্রজ্ঞাপ্রসূত কল্পনা। আর এ যে তাঁর অন্তরতম কবিকল্পনাও বটে, কে আর তাই নিয়ে সন্দেহ করবে! কেননা জীবনদেবতাকে অবলম্বন করেই তো তাঁর বিস্মৃতিময় জন্মান্তরস্মৃতি তাঁর আত্মায় অনুস্যূত হয়ে রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই *জন্মান্তরস্মৃতির প্রথম স্তরে* ধরা যাক তাঁর প্রাক্তন মানবজন্মের স্মৃতি। শুধু কবিতার জগৎ থেকেই আপাতত কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে নিলাম। '*কড়ি ও কোমল*' এর 'স্মৃতি' কবিতায় 'ওই দেহ পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে/ যেন কত শত পূর্বজনমের স্মৃতি। /সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে, /জন্মজন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।' *মানসী*-র 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় 'তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি/শত রূপে শত বার/জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।' 'কল্পনা'র 'স্বপ্ন' কবিতায় 'দূরে বহুদূরে/স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে/খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে/ মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।' *বলাকা*-র ৪০-সংখ্যক ['চেয়ে দেখা'] কবিতায় 'কত নব নব অবগুণ্ঠনের তলে/ দেখিয়াছ কত ছলে/চুপে চুপে /এক প্রেয়সীর মুখ কত রূপে /জন্মে জন্মে, নামহারা নক্ষত্রের গোধূলিলগনে।' *পূরবী*-র 'স্বপ্ন' কবিতায় 'তোমায় আমি দেখি নাকো, শুধু তোমার স্বপ্ন দেখি, /তুমি আমায় বারে বারে শুধাও, "ওগো সত্য সে কি?" /কী জানিগো, হয়তো বুঝি/ তোমার মাঝে কেবল খুঁজি/ এই জনমের রূপের তলে আর-জনমের ভাবের স্মৃতি।'

রবীন্দ্রনাথের এই প্রাক্তন মানবজন্মের স্মৃতি প্রসঙ্গে *ছিন্নপত্রাবলীর* ৪০ সংখ্যক পত্রটি

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'সেদিন একটা কাগজে কালিদাসের একটা শ্লোক তুলে দিয়েছে, পড়ে একটু আশ্চর্য বোধ হল— রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্ /পর্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোহপি জন্তুঃ। /তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং/ ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি।।' —এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ শুধু কালিদাসের শ্লোকই উদ্ধার করেননি, এই শ্লোকের অর্থও করেছেন, ভাষ্যও করেছেন। রবীন্দ্রনাথের করা অর্থ হল, 'রম্য বস্তু দেখে এবং মধুর শব্দ শুনে সুখী লোকের প্রাণও এমন পর্যুৎসুক হয় কেন? নিশ্চয়ই মনের অজ্ঞাতসারে পূর্বজন্মের কোনো বন্ধুর কথা মনে পড়ে।' আর রবীন্দ্রনাথের করা ভাষ্য হল, 'সৌন্দর্য...মনের মধ্যে একটা নিগূঢ় রহস্যময় অসীম আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, যা মনকে জন্ম থেকে জন্মান্তর পর্যন্ত আকর্ষণ করে নিয়ে যায়।' রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'কালিদাসের কবিতার মধ্যে এই ভাবটা পড়ে আমার ভারী আনন্দ হল'।

এখানে মনে রাখতে হবে, *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্*-এর পঞ্চম অঙ্কে হংসপদিকার মধুর সংগীত শুনে দুষ্যন্ত এই স্বগতোক্তিটি করেছিলেন। শকুন্তলা তাঁর পূর্বজন্মের নয়, ইহজন্মেরই প্রিয়া। তাকে তিনি ভুলে যান নি, কিন্তু ভুলে আছেন মাত্র। মধুর সংগীত যখন তাঁর সেই বিস্মৃতিকে স্পন্দিত করে তুলল, তখন তাঁর জননান্তর সংস্কারে পরিস্রুত হয়ে সেই ইহজন্মের বিরহই তাঁর মনে পূর্বজন্মের বিবহের বিভ্রম সৃষ্টি করল।

লক্ষ করতে হবে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার যে-গুটিপাঁচেক টুকরো উদ্ধৃত করেছি সেগুলির প্রতিটিতেই রবীন্দ্রনাথের প্রাক্তন মানবজন্মের স্মৃতি আসলে তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকজন্মের স্মৃতি। কেউ বলতেই পারেন যে, প্রেমের-চোখে-দেখা সৌন্দর্য অনেক সময়েই প্রেমিকের মনে একটা déjàvu-এর অনুভূতি উদ্রিক্ত করে যাকে জন্মান্তরীণ বলে তার মনে হলেও এর সঙ্গে জন্মান্তরের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁকে সামান্য সংশোধন করে আমার বক্তব্য হল এই যে, সদ্য অভিজ্ঞতাকে পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে বিভ্রমের অনুভূতিটুকুই déjàvu-এর অনুভূতি, মনোবিজ্ঞানে যাকে বলে Paramnesia; কিন্তু ওই পূর্ব অভিজ্ঞতা যে এইজন্মের নয়, একেবারে সেই পূর্বজন্মেরই অভিজ্ঞতা—বিশেষ এই বিভ্রম জন্মান্তরের সংস্কার বিনা মনের মধ্যে জন্মাতে পারে না। এই জন্মান্তর-সংস্কার রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার একটি চিরস্থায়ী সংস্কার। তাঁর জননান্তর স্মৃতি এই সংস্কারের ভিত্তিতেই সম্প্রসারিত হয়েছে।

মানবজন্মের স্মৃতির পর পশুপক্ষীজন্মের স্মৃতি। *জাভাযাত্রীর* পত্র-র একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'মনে আছে, ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, দড়িতে বাঁধা ধোপার বাড়ির গাধার কাছে এসে একটি গাভী স্নিগ্ধ চক্ষে তার গা চেটে দিচ্ছে; দেখে আমার বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। বুদ্ধই যে তাঁর কোনো এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন একথা বলতে জাতক-কথা-লেখকের একটুও বাধত না।'[৭৭] বোধিসত্ত্বের এই স্বভাবকেই রবীন্দ্রনাথ *ছিন্নপত্রাবলী*-তে বলেছেন, 'ভারতবর্ষীয় স্বভাব' : 'ভারতবর্ষীয়েরা জন্মক্রমে মানুষ থেকে জন্তু এবং জন্তু থেকে মানুষ হওয়া কিছুই মনে করে না—কীটপতঙ্গ পর্যন্ত

প্রাণীমাত্রেরই একটা সমশ্রেণিতা আছে, সেটা তারা খুব অনুভব করে...। মফস্বলে উদার প্রকৃতির মাঝখানে এলে, তার সঙ্গে দেহে দেহে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হলে, আমার সেই ভারতবর্ষীয় স্বভাবটি জাগ্রত হয়ে ওঠে— আমি জীবজন্তুর সুখদুঃখের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি।'[৭৮] এই প্রসঙ্গে *চৈতালির* 'দুই বন্ধু' নামে চতুর্দশীটি পুরোটাই উদ্ধৃত করা যাক :

'মূঢ় পশু ভাষাহীন নির্বাকহৃদয়, /তার সাথে মানবের কোথা পরিচয়! / কোন্ আদি স্বর্গলোকে সৃষ্টির প্রভাতে / হৃদয়ে হৃদয়ে যেন নিত্য যাতায়াতে /পথচিহ্ন পড়ে গেছে, আজো চিরদিনে / লুপ্ত হয় নাই তাহা, তাই দোঁহে চিনে। /সেদিনের আত্মীয়তা গেছে বহুদূরে; /তবুও সহসা কোন্ কথাহীন সুরে / পরানে জাগিয়া উঠে ক্ষীণ পূর্বস্মৃতি /অন্তরে উচ্ছলি উঠে সুধাময়ী প্রীতি, / মুগ্ধ মূঢ় স্নিগ্ধ চোখে পশু চাহে মুখে—/ মানুষ তাহারে হেরে স্নেহের কৌতুকে। /যেন দুই ছদ্মবেশে দুবন্ধুর মেলা— / তাব পরে দুই জীবে অপরূপ খেলা।'

এখানে অবশ্য একই প্রাণিবিশ্বে মানুষ আর জীবজন্তু সহযাত্রী। কিন্তু জননান্তর স্মৃতি পিছিয়ে যেতে যেতে অবশেষে এমন একটা পর্যায় আসে, যখন প্রথম মানবজন্মের মুহূর্তটিকেও পেরিয়ে কবি চলে যান আরও পিছনে। তখনও প্রাণিবিশ্ব থাকে বটে, কিন্তু মানববিশ্ব আর থাকে না। আইনস্টাইনের সঙ্গে তর্কে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে, মানববিশ্বকে পেরিয়ে গিয়ে যা আছে তার অস্তিত্ব আর অনস্তিত্ব দুইই মানুষের পক্ষে সমান, কারণ 'মানুষের অহংকার-পটে' কোনো বিশ্বকর্মা তো আর একে শিল্প করে তোলেনি; কিন্তু তর্কে রবীন্দ্রনাথ যাই বলুন, তাঁর জননান্তরস্মৃতি যে সেই অ-মানব প্রাণিবিশ্বকে শুধু স্মরণ করতে পারে তাই নয়, সেই প্রাণিবিশ্বই হয়ে উঠতে পারে তাঁর অন্তর্গত হৃদয়-অরণ্যের একটি উপমান। *সন্ধ্যাসংগীত*-পর্বের আত্মসমীক্ষায় কবি বলেছেন, 'যে যুগে পৃথিবীতে জলস্থলের বিভাগ ভালো করিয়া হইয়া যায় নাই, তখনকার সেই প্রথম পঙ্কস্তরের উপর বৃহদায়তন অদ্ভুত-আকার উভচর জন্তুসকল আদিকালের শাখাসম্পদহীন অরণ্যের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা সেইরূপ পরিমাণ-বহির্ভূত অদ্ভুত মূর্তি ধারণ করিয়া একটি নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত'।[৮০]

রবীন্দ্রনাথের এই আদিম প্রাণিস্মৃতির মধ্যে আছে ডাইনোসর কিংবা ম্যামথ কিংবা ম্যাস্টডনের মতো 'পৃথিবীর প্রথম যুগের দানব-জন্তু'রা— যাদের 'খানিকটা সরীসৃপের মতো, খানিকটা বাদুরের মতো, খানিকটা গণ্ডারের মতো'।[৮১] যত ভয়ংকরই হোক, এরা একদিন ছিল, আজ আর নেই। কিন্তু এমন প্রাণীর স্মৃতিও তাঁর উপর বর্তেছে জীববিজ্ঞানে যাদের খোঁজ মেলে না। আক্ষরিক অর্থেই তারা azoological। অর্থাৎ কিনা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিলোকে জীববিজ্ঞান আর জীবপুরাণ একাকার হয়ে গিয়েছে। যেমন তাঁর 'বিকটমূর্তি ড্রাগন'[৮২], 'পায়ে শিকলিবাঁধা প্রকাণ্ড জটায়ু'[৮৩], 'নীলপাখা'য় ভেসে যাওয়া 'শৈলমালা'[৮৪],

'ডানা মেলা গরুড়'[৮৫], 'রসাতলবাসিনী নাগিনী'[৮৬], কিংবা 'শ্যাম কল্পধেনু'[৮৭]।

এই প্রাণীস্মৃতির উৎসমুখে রয়েছে— রবীন্দ্রনাথ একদিন যাকে বলেছিলেন 'আদিপ্রাণ'[৮৮]— রবীন্দ্রনাথের সেই প্রথম গাছ। অনেকবার পড়া তাঁর এই চিঠি এইখানে আর-একবার পড়ে নেওয়া : 'আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যের বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম'[৮৯] *লিপিকা*-য় 'প্রাণমন' নামে গাছের-সঙ্গে-কবির একটি দীর্ঘ আলাপ রয়েছে। গাছের উদ্দেশে কবি বলেছেন, 'ওগো বনস্পতি, জন্মমাত্রই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ যে আনন্দধ্বনি করে উঠেছিল সেই ধ্বনি তোমার শাখায় শাখায়'; বলেছেন, 'আমি তোমারই খেলার সাথি, লক্ষ হাজার বছর ধরে এই মাটির খেলাঘরে আমিও গণ্ডুষে গণ্ডুষে তোমারই মতো সূর্যালোক পান করেছি, ধরণীর স্তন্যরসে আমিও তোমার অংশী ছিলেম।' আরও পরে, তেজেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ গাছের ভাষাকেই বলবেন, 'জীবজগতের আদিভাষা'—'তার ইসারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ওই গাছের ভাষায়—তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুন্‌গুনিয়ে ওঠে।'[৯০] আমি গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম, আর আমিও গাছের মতো গণ্ডুষে গণ্ডুষে সূর্যালোক পান করেছি—রবীন্দ্রনাথের এই দুটি আদি-স্মৃতি একাকার হয়েই তৈরি হয়ে উঠল তাঁর *পত্রপুট* : 'হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট /গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে/ আমার চারদিকে চিরকাল ধরে, /আমি-বনস্পতির এরা কিরণপিপাসু পল্লবস্তবক, /এরা মাধুকরীব্রতীর দল। /প্রতিদিন আকাশ থেকে এরা ভরে নিয়েছে / আলোকের তেজোরস, /নিহিত করেছে সেই অলক্ষ্য অপ্রজ্বলিত অগ্নিসঞ্চয় /এই জীবনের গূঢ়তম মজ্জার মধ্যে'।

বৃক্ষ আদিপ্রাণ বলেই তো প্রাচীন মানুষ বৃক্ষপূজা করে রহস্যময় সেই প্রাণশক্তির উদ্দেশে ভয়ে আর সম্ভ্রমে আত্মনিবেদন করেছে। *বীথিকার* 'ভীষণ' কবিতায় বনস্পতিকে কবি বলছেন, 'যেথা তব আদিবাস/ সে অরণ্যে একদিন মানুষ পশিল যবে / দেখা দিয়েছিলে তুমি ভীতিরূপে তার অনুভবে। / হে তুমি অমিত-আয়ু, / তোমার উদ্দেশে / স্তবগান করেছে সে।' হিবার্ট বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ 'spirit of life' কে বলেছেন একটি গাছ : 'This was the tree which has its inner harmony and inner movement of life in its beauty, its strength, its sublime dignity of endurance, its pilgrimage to the unknown through the tiniest gates of reincarnation.'।[৯১] হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বেও কি কল্পান্তের প্রলয়জলে শায়িত পুরুষের নাভিবিন্দু থেকে জেগে ওঠেনি শীর্ষস্থ পদ্মকে নিয়ে সুদীর্ঘ এক মৃণাল—যার উপরে সৃষ্টিকর্তার আসন? হিবার্ট বক্তৃতায় একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'the spirit of the young, the Brahma Kamala, the

infinite lotus'[৯২]। Spirit of the young— রবীন্দ্রনাথের কবিভাষায় 'নবীন'। 'নবীন' আর 'নূতন' রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগে সমার্থক নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'নূতনত্ব কালের ধর্ম, নবীনত্ব কালের অতীত'[৯৩] তাঁর কবিতার ভাষায়, 'নূতন সে পলে পলে অতীতে বিলীন, /যুগে যুগে বর্তমান সেই তো নবীন।'[৯৪] প্রলয়ের শেষে সৃষ্টির উষালগ্নে বারবার ফুটে ওঠে ব্রহ্মকমল-- সেইজন্যই সেই আদিপ্রাণ সনাতন হয়েও সদ্যতন : spirit of the young। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন, 'এই জ্যোতিঃসমুদ্র মাঝে/ যে শতদল পদ্ম রাজে/ তারি মধু পান করেছি,/ ধন্য আমি তাই'।[৯৫] ব্রহ্মকমল ছাড়াও বৃক্ষস্মৃতির এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ এমন সব গাছ, ফুল, লতা, আর বৃক্ষ-সম্পর্কিত আচারের কথা বলেন যা সুপ্রাচীনের স্মারক। আছে মন্দার, আছে অরুণ-বরণ পারিজাত, আছে রহস্যময় সোমলতা; আবার প্রিয়ার-পদাঘাতে-ফুটে ওঠা অশোককুঞ্জের কল্পনায় ছায়ার মতো লেগে থাকে দোহদের মতো ভুলে-যাওয়া উর্বরতা-সম্পাদনের আচার।

কিন্তু গাছ-হয়ে-অঙ্কুরিত-হয়ে-ওঠারও আগে এই 'আদিপ্রাণ' ছিল কোথায়? মর্তের মাটিতে। Anima mundi. World-Soul. জীবনদেবতায় আশ্রিত কবির জননান্তর স্মৃতি এইবার যেন নেমে গেল মৃত্তিকার সেই অন্তর্গূঢ় গর্ভাশয়ে : 'এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে কত যুগ মোরা যেপেছি'[৯৬]। এই মৃত্তিকাস্মৃতির টানকেই তিনি *ছিন্নপত্রাবলী*তে বলেছেন, 'বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান'।[৯৭] গাছের আর তৃণশস্যের আয়ু ফুরিয়ে গেলে তারা বুঝি চলে যায় মাটির নীচে, ওইখান থেকে প্রাণের শূন্য ভাঁড়ার পূর্ণ করে অনুকূল ঋতুতে মাটির উপরে তাদের পুনরুত্থান। রবীন্দ্রনাথের অহল্যা, ক্লিন্ন এবং ক্লান্ত, সে'ও তো ওইখানেই গিয়েছিল, আর তারপর 'নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন'[৯৮] নিয়ে আবার উঠে এসেছিল উপরে।

তাহলে জন্মের শুভক্ষণটি আরবার দেখা দিক। কী করে তা সম্ভব? যদি মাতৃগর্ভে আর একবার ফিরে যাওয়া যায়। তবে তাই ফিরে চল— regressus ad uterum। যার উপনয়ন হয় সে দিন-তিনেক বন্ধ থাকে অন্ধকার ঘরে, আর তারপর দ্বিজ হয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। মহৎ কোনো সাধনায় সিদ্ধ হতে গেলে গুহায় চল— গুহার গহ্বরেই ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব নিহিত। অ্যালকেমিস্টরা অনেক সময়ে জরাগ্রস্ত মানুষকে জরায়ুর-আকারে-গড়া ভূগর্ভস্থ কক্ষে সাময়িকভাবে সমাহিত করতেন; তাঁদের বিশ্বাস ছিল, এই পদ্ধতিতেই নাকি যযাতি একদিন যুবক হয়ে বেরিয়ে আসবে বাইরে।

রবীন্দ্রনাথও জীবনের এক-একটি বাঁকে, ঋতুবদলের এক-একটি সন্ধিলগ্নে এই কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবেন। যেমন শিলাইদহ পর্বে, *সোনার তরী*-র এই কবিতা : 'আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে / কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে / বিপুল অঞ্চলতলে।' 'আমারে ফিরায়ে লহ / সেই সর্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ / অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ / শতেক সহস্ররূপে'। *চিত্রা*-য় তাঁর জীবনদেবতা এক জীবনের শেষে তাঁকে নিয়ে চলেছেন পরবর্তী জীবনে— মাঝখানে যাত্রাবিরতি ঘটেছে 'সিন্ধুপারে'র

সেই কৃষ্ণশৈলগুহার অভ্যন্তরে। আবার আসন্ন-বলাকা পর্বে *গীতিমাল্য*-র এই গান : 'সন্ধ্যা হল গো—/ ওমা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো।' ফিরে যেতে চাওয়া মাতৃগর্ভে : 'আর আমারে বাইরে তোমার/ কোথাও যেন না যায় দেখা। / তোমার রাতে মিলাক আমার জীবন-সাঁঝের রশ্মিরেখা।'[৯৯] এরপরেই তো *বলাকা*-য় যৌবনের কবিতা লেখা হবে, আর *ফাল্গুনীর* গুহা থেকে শীতবুড়োটা বেরিয়ে আসবে বসন্তের বেশে।

জীবনের অন্ত্যপর্বে রবীন্দ্রনাথ এলেন তাঁর 'শেষবেলাকার ঘরখানি' শ্যামলীতে। তাঁর কালো মাটির বাসায়। ভাগবতে 'শ্যামলাং ভূমিম্' : ভূমি শ্যামলা। মৃত্তিকাময়ী এই পৃথিবীই শ্যামলী। ১৩৪২ সনের নববর্ষের দিন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের চুয়াত্তর বছরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হল, আর সেইদিনই রবীন্দ্রনাথ শ্যামলীতে প্রবেশ করলেন। শ্যামলীকে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আজ আমি তোমার ডাকে/ ধরা দিয়েছি শেষবেলায়। /এসেছি তোমার ক্ষমাস্নিগ্ধ বুকের কাছে; / যেখানে একদিন রেখেছিলে অহল্যাকে, / নবদুর্বাশ্যামলের / করুণা পাদস্পর্শে / চরম মুক্তি-জাগরণের প্রতীক্ষায়, /নবজীবনের বিস্মিত প্রভাতে'।[১০০]

এই 'মা আমার এই শ্যামল মাটি'কে ঘিরেই রবীন্দ্রনাথের মৃত্তিকাস্মৃতি। কিন্তু এই মায়েরও কি মা নেই? 'হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার, /একমাত্র কন্যা তব কোলে।'[১০১] একদিন তিনি ছিলেন মাটির মধ্যে, আর মাটি ছিল সমুদ্রের মধ্যে : 'মনে হয়, যেন মনে পড়ে / যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে / অজাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে / ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে / মুদ্রিত হইয়া গেছে'[১০২]। রবীন্দ্রনাথের এই সমুদ্রস্মৃতি হয়তো-বা মানুষের aquatic ancestry-কেই স্মরণ করিয়ে দেবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষের সঙ্গে সামুদ্রিক প্রাণীর বহু প্রাচীন সম্পর্কের একটা স্মারক মানুষের শরীরেই রয়ে গিয়েছে—জলের নীচে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালানোর জন্য eustachian tube; তাছাড়া সমুদ্রের জলে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, আর ক্যালসিয়ামের মতো রাসায়নিক উপাদানের সবগুলি প্রায়-অভিন্ন সমবায়ে রয়ে গিয়েছে মানুষের রক্তের কোষে : 'নাড়ীতে যে-রক্ত বহে, সেও যেন ওই ভাষা জানে'[১০৩]। স্মৃতিযাত্রার একটা পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ গাছকেই বলেছিলেন স্থলভূমির 'আদিপ্রাণ'; আরও সুদূরে পৌঁছিয়ে এইবার 'জীবলোকে' 'প্রাণের নীহারিকা'কে দেখতে পেলেন সমুদ্রে ভাসমান প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে। *বিশ্বপরিচয়* বইতে বললেন, 'সে একরকম অপরিস্ফুট ছড়িয়ে-পড়া প্রাণপদার্থ ঘন লালার মতো অঙ্গবিভাগহীন— তখনকার ঈষৎ গরম সমুদ্রজলে ভেসে বেড়াত'[১০৪]। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ কবিতার বই 'জন্মদিনে'র একটি কবিতায় সমুদ্রের সেই আদিপ্রাণের মধ্যেও তিনি নিজেকে স্মরণ করলেন: 'এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি/ প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি / জড়ের বিরাট অঙ্কতলে / উদ্‌ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয় / শাখায়িত রূপে রূপান্তরে'[১০৫]। সমুদ্রের সেই আদিপ্রাণ তাঁর স্মৃতিতে এখনও সজীব বলেই 'জন্মদিনে'র অন্য একটি

কবিতায় তিনি বললেন, 'মোর চেতনায়/আদি সমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায়'[১০৬]। ওঙ্কার সৃষ্টির আদিধ্বনি।

সমুদ্রের প্রাণীজগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় তাঁর বাল্যকালে। 'বিবিধার্থসংগ্রহ' কাগজে পড়েছিলেন 'নর্হাল তিমিমৎস্যের বিবরণ।'[১০৭] সতেরো বছর বয়সে 'ভারতী'তে বেরিয়েছিল 'সামুদ্রিক জীব' বিষয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধ—'অ্যামিবি কীট'দের তিনি বলেছিলেন 'জীবন্ত পরমাণু'।[১০৮] 'চোখের বালি'তে ক্ষুধার্ত প্রেমের প্রতীক 'পুরুভুজ'কে[১০৯] অক্ষয়কুমার দত্তের গড়া প্রতিশব্দের গুণে যতই অচেনা ঠেকুক, আসলে ও তো সামুদ্রিক অক্টোপাস। হিবার্ট বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রের প্রাণীদের অপূর্ব বর্ণসৌন্দর্যের কথা বলেছিলেন : 'The colouring and decorative pattern on the bodies of some of the deep-sea creatures makes us silent with amazement.'[১১০]। সমুদ্রপথে বহুবার বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতাও এর মধ্যে থাকতে পারে। এইসব ব্যুৎপত্তি আর অভিজ্ঞতার সঙ্গেই কিন্তু রয়ে গিয়েছে পুরাণ। প্রথমেই মনে পড়ছে তাঁর লেখা সমুদ্রমন্থন : 'একদিন, বহুপূর্বে, আছে ইতিহাস / নিকষে সোনার রেখা / সবে যেন দিল দেখা—/আকাশে প্রথম সৃষ্টি পাইল প্রকাশ।/ মিলি যত সুরাসুর / কৌতূহলে ভরপুর / এসেছিল পা টিপিয়া এই সিন্ধুতীরে। / অতলের পানে চাহি / নয়নে নিমেষ নাহি / নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল স্থির নতশিরে। / বহুকাল স্তব্ধ থাকি/ শুনেছিল মুদে আঁখি / এই মহাসমুদ্রের গীতি চিরন্তন; /তার পরে কৌতূহলে / ঝাঁপায়ে সাগর জলে / করেছিল এ অনন্ত রহস্য মন্থন।'[১১১] জগৎকে শতপাকে-জড়িয়ে-থাকা 'যামিনীনাগিনী' উষা-সমাগমে তার পাক খুলে চলে যাচ্ছে : 'পশ্চিম সাগরতলে আছে বুঝি বিরাট গহ্বর, / সেথায় ঘুমাবে বলে ডুবিতেছে বাসুকিভগিনী / মাথায় বহিয়া তার শত লক্ষ রতনের কণা।'[১১২]

সমুদ্রমন্থনজাতা অনন্তযৌবনা উর্বশীর মুকুলিকা বালিকা-বয়সটিকেও কবি প্রশ্নচিহ্নে উদ্‌যাপন করিয়ে দেন সমুদ্রের তলায় : 'আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা / মানিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা, / মণিদীপদীপ্ত কক্ষে সমুদ্রের কল্লোসংগীতে / অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল-পালঙ্কে ঘুমাইতে/ কার অঙ্কটিতে।'[১১৩] জাপানযাত্রী রবীন্দ্রনাথ ঝড়ের সমুদ্রে একটা দৈত্যপুরীকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, 'সমুদ্রের নীল ঢাকনাটা কে খুলে ফেলেছে, আর ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো লাখো লাখো দৈত্য পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে আকাশে উঠে পড়ছে।'[১১৪] জলাশ্ব কিংবা জলকরী তিনি চাক্ষুষ করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু সমুদ্রমন্থনে-উঠে-আসা উচ্চৈঃশ্রবা কিংবা ঐরাবতের স্মৃতি তাঁর রচনায় রয়ে যায়। গ্রিক পুরাণের সমুদ্র-দেবতা প্রোটিয়ুস্ কিংবা ট্রাইটনের[১১৫] কথাও রবীন্দ্রনাথ জানতেন। নানা ছদ্মবেশধারী প্রোটিয়ুস্‌কে ঘিরে থাকে সিন্ধুঘোটকের দল, আর ট্রাইটন হচ্ছে অর্ধেক মাছ-অর্ধেক মানুষ অদ্ভুত এক শিঙওয়ালা প্রাণী। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের সেই জলের রাণী মারমেইডকে

এইবার আমাদের মনে পড়ে যাবে। মৎসকন্যার উৎসে রয়েছে সমুদ্রের স্তন্যপায়ী প্রাণী ডুগং। আধুনিক সমুদ্র-জীববিজ্ঞানে বলা হচ্ছে, 'the sight of dugongs in a semi-upright position in the water, holding a calf with one flipper and suckling it much in the manner of a human mother, was the foundation of the mermaid-myth started by early Greek sailors.'[১১৬]

রবীন্দ্রনাথের মারমেইড কল্পনার মূলে অ্যান্ডারসেনের রূপকথা থাকলেও মারমেইড শুধু প্রতীচ্য পুরাণ নয়। ডুগংকে দক্ষিণ এশিয়া আর পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্রতটরেখা বরাবর ভারত মহাসাগরেও দেখতে পাওয়া যায়। নটরাজের জটাবিহারিণী জাহ্নবীকে দেখতে মারমেইডেরই মতো।[১১৭] ধীবরের জালে সমুদ্র-থেকে-উঠে-আসা আমিনাকে 'দালিয়া' গল্পের মৎসজীবীরা 'জলদেবী' বলেই পুজো করত। সরল সেই মানুষগুলি যখন শুনল যে তাদের জলদেবী আবার ফিরে যাবে সমুদ্রে, তখন তারা বিদায়-অর্ঘ্য সাজালো ঝিনুকে আর প্রবালে।[১১৮]

এই সমুদ্রস্মৃতি পর্যন্ত গিয়েই 'বিশ্বের মধ্য' দিয়ে প্রবাহিত রবীন্দ্রনাথের 'অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি' শেষ হল। কিন্তু এই সমুদ্রমেখলা পৃথিবীও যখন ছিল না, তখন? মিউজ কি তার মা-কে পেরিয়ে এবার ফিরে তাকাবে মায়ের জন্ম-উৎসে? গোড়াতেই বলেছিলাম, নিমোজিনির পিতা তারায় ভরা রাত্রির আকাশ—গ্রিক পুরাণে তার নাম ইউরানুস। এবার কি তবে বিশ্বকে পেরিয়ে কবির দিব্যস্মৃতি প্রসৃত হয়ে যাবে ওই আকাশে? গ্রিক পুরাণে ন'জন মিউজের মধ্যে বিশেষ একজন, যার নাম ইউরেনিয়া, তাকেই বলা হয়েছিল জ্যোতির্বিদ্যার দেবী। কিন্তু *ফিড্রাস*-এ প্লেটো সাধারণভাবে সমস্ত মিউজদেরই বলেছিলেন, 'most concerned with heaven'[১১৯]। হিবার্ট বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, যে-আকাশে সৃষ্টির প্রথম রহস্য আলোকের প্রকাশ, সেই আকাশ থেকেই মানুষের ধর্ম শুরু হয়েছে : 'His religion which is in his realization of the infinite, began its journey from the impersonal dyaus, 'the sky', wherein light had its manifestation'.[১২০]।

আধুনিক বিবর্তনবাদে প্রাণের উৎস সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে সেগুলির একটি হচ্ছে cosmozoan theory, যার মোট কথাটা হচ্ছে 'the origin of life had an extraterrestrial origin'.। 'বিশ্বপরিচয়'-এর উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে।' বিশেষ এই দুটি বিজ্ঞানের দিকে তাঁর এই ঝোঁক কি শুধু তাঁর পরিণত বয়সেই? হিমালয়শিখরে বাল্যকালের সন্ধ্যায় পিতার কাছে তাঁর বিজ্ঞানশিক্ষার প্রথম ফসলই তো 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'— এই গদ্য। প্রথম যৌবনে যখন সদর স্ট্রিটে থাকতেন, তখনও যে 'জীবতত্ত্ব ও জ্যোতিষ্কতত্ত্ব' তাঁর কাছে 'অত্যন্ত উপাদেয়' বোধ হত সেকথাও তো *জীবনস্মৃতি*-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যাচ্ছে।[১২১] আরো পরে শিলাইদহ থেকে *ছিন্নপত্রাবলী*-র একটি চিঠিতে লিখছেন, 'আকাশের সমস্ত জ্যোতির্জগৎ

সমস্ত লোকলোকান্তর' যখন 'অনন্ত রহস্যের অন্তঃপুরবাসিনী মেয়ের দলের মতো উপরের তলার খড়খড়ি থেকে' তাঁকে দেখছিল, তাঁর মনে হচ্ছিল, 'ঐ জ্যোতির্মণ্ডলীর মধ্যে বিচিত্র জীবনের অনন্ত ইতিহাস প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে।'[১২২] *বিশ্বপরিচয়*-এর উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ 'জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য' কল্পনা করেছিলেন 'সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃপদার্থের মধ্যে'; বলেছিলেন, 'এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরো সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্যে ও মনে'। নিশ্চয়ই 'আরো সূক্ষ্মতর' আর্ষপ্রয়োগ, যার তাৎপর্য হচ্ছে অতিসূক্ষ্ম, অনির্বচনীয় সূক্ষ্ম। যাই হোক, এখন প্রশ্ন এটাই যে, মানুষের চৈতন্যে, তার মনোবিশ্বে, সেই উৎসগত মহাজ্যোতির স্মৃতি কি অতিসূক্ষ্ম পরিমাণে থাকতে পারে? যদি এই সৌরজগতের মধ্যেই আপাতত চিন্তাকে সীমাবদ্ধ রাখি তাহলে সূর্যই সেই মহাজ্যোতি। সূর্য হচ্ছে 'সবিতা'। সবিতা মানে প্রসবিতা। সূর্য পৃথিবীকে প্রসব করেছেন, তাই তিনি সবিতা। এই অর্থেই *ছিন্নপত্রাবলী*-তে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে বলেছিলেন 'দেবতার মেয়ে'।[১২৩] এই দেবতার মেয়ের সন্তানদের মানসলোকে তাই সৌরস্মৃতি বজায় থাকা খুবই স্বাভাবিক। 'সৌরস্মৃতি' মানে, বলা বাহুল্য, সূর্যসম্বন্ধীয় স্মৃতি। কিন্তু সূর্যকে তো প্রত্যহ আকাশে দেখছি, তার আবার স্মৃতি কী? আসলে সূর্যের মধ্যে মানুষের আত্মবোধের সংস্কারকেই বোঝাতে চাইছি 'সৌরস্মৃতি' শব্দে। 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'তে আশ্চর্য ভাষার সূর্যবন্দনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়ে ছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে', 'আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ওই আলোই তো প্রবহমান', 'এখনই আমার চিত্ত হতে এই-যে চিন্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চঞ্চল চিন্ময়-স্বরূপ নয়, যে-জ্যোতি বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওঙ্কারধ্বনির মতো সংহত হয়ে আছে?'[১২৪] এই সূর্যবন্দনার শেষে সূর্যের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমার হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিঃস্বরূপ দেখে নিই।'[১২৫] হঠাৎ কি মনে পড়ে 'জন্মকথা'? খোকাকে মা বলেছিল, 'নিত্যকালের তুই পুরাতন / তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী।'

আর সৌরজগতের সীমা ছাড়িয়ে যদি ব্রহ্মাণ্ডের কথাই চিন্তা করা যায়, তাহলে মানুষের মনোবিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী দাঁড়ায়? এর একটা উত্তর মিলতে পারে রবীন্দ্রনাথের কুড়ি পেরিয়ে লেখা 'ডি প্রোফণ্ডিস' প্রবন্ধে। শিশুপুত্রের জন্ম উপলক্ষে লেখা টেনিসনের কবিতার আলোচনা। তবে একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, টেনিসনের কবিতাকে উপলক্ষ করে এ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের আত্মমানসের আলোচনা। শিশু জন্মাতেই কবি ভাবলেন, এ কোথা থেকে এল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'তিনি তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, 'বৎস আমার, সেই মহাসমুদ্র, যেখানে যাহা-কিছু-ছিল'র মধ্যে যাহা-কিছু-হইবে— অর্থাৎ অতীতের মধ্যে ভবিষ্যৎ— কোটি-কোটি যুগ যুগান্তর ধরিয়া অগণ্য আবর্তমান জ্যোতিঃপুঞ্জের মহামরুর মধ্যে ঘূর্ণমান হইতেছিল,

তুমি সেইখান হইতে আসিতেছ।' সেইখান হইতে সূর্য আসিয়াছে, পৃথিবী ও চন্দ্র আসিয়াছে, এবং তাহার অন্যান্য গ্রহ-সহোদরগণ আসিয়াছে। অতীতের সেই ঊষাগর্ভে কবি প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অপরিস্ফুট পৃথিবীর কারণপুঞ্জ যেখানে আবর্তিত হইতেছে আজিকার সদ্যোজাত শিশুটির কারণপুঞ্জ সেইখানে ঘুরিতেছে। উভয়ের বয়স এক; কেবল একজন ত্বরায় আমাদের চক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে, আর-একজন প্রকাশিত হইতে বিলম্ব করিয়াছে।'[১২৬]

ওই জ্যোতিঃপুঞ্জের স্মৃতি আজও কবির মনে আছে। তাই 'নিদ্রাবিহীন গগনতলে' যখন 'তারায় তারায়' জ্বলে ওঠে 'দীপ্ত শিখা'র আগুন, কবির মধ্যে জেগে ওঠে এক জাতিস্মর : 'ওই আলোকমাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন / হোথায় ছিল কোন্ যুগে মোর নিমন্ত্রণ'।[১২৭]

মৃত্যু মানে তাহলে বিনাশ নয়, মর্ত থেকে ওই জ্যোতির্ময় ব্রহ্মাণ্ডে, অস্তিত্বধারার আদি উৎসে প্রত্যাবর্তন। তাই সমস্ত যখন খুলে গেল রাজকবিরাজের আদেশে, তখন অমল বলে উঠল, 'সব তারাগুলি দেখতে পাচ্ছি—অন্ধকারের ওপারকার সব তারা'। রাজার চিঠি তাই শেষ পর্যন্ত হয়ে যায় তারার-হরফে-লেখা আকাশ-জোড়া মহাচিঠি। মানুষের উদ্দেশে পৃথিবীর ডাকঘরে কেবলই সেই চিঠির ডাক আসে—খুব মন-কেমন করা ডাক।

তারার-হরফে-লেখা এই চিঠি কি শুধু অমলই পেয়েছিল, অমলের অনেক আগেই অমলের সৃষ্টিকর্তা পাননি? *মানসী*-র 'পত্রের প্রত্যাশা'য় কবি লিখেছিলেন, 'আকাশে অসংখ্য তারা/ চিন্তাহারা ক্লান্তিহারা /হৃদয়ে বিস্ময়ে সারা হেরি একদিঠি—আর যে আসে না আসে/ মুক্ত এই মহাকাশে/ প্রতি সন্ধ্যা পরকাশে/ অসীমের চিঠি।/ অনন্ত বারতা বহে, / অন্ধকার হতে কহে, /"যে রহে যে নাহি রহে কেহ নহে একা—/সীমাপরপারে থাকি/ সেথা হতে সবে ডাকি / প্রতি রাত্রে লিখে রাখি জ্যোতিপত্রলেখা।" 'যে রহে যে নাহি রহে কেহ নহে একা'— প্লেটোর সেই যুগ্মসত্তা, শেলির সাইকি-এপিসাইকি, রবীন্দ্রনাথের দুই যথার্থ দোসর। একজন জগতে জীবিত : 'যে রহে', অন্যজন অতিজগতে লোকান্তরিত : 'যে নাহি রহে', কিন্তু জগতের সঙ্গে অতিজগতের নিত্যপ্রেমের সম্বন্ধে 'কেহ নহে একা'। যিনি অতিজগতে আছেন তিনিই জগৎবাসীটির জন্য প্রতি রাত্রে 'জ্যোতি'পত্রলেখা লিখে রাখছেন আকাশের অসংখ্য তারায়।

কিন্তু আরও পিছনে, যেদিন কবিও ছিলেন অতিজগতে, তাঁর জীবনদেবতা যেদিন ছিলেন তাঁর 'অতিজগতের সহচর' সেদিন তো এই চিঠি-লেখা আর চিঠি-পড়ার ব্যবধানটুকুও ছিল না! 'কত যুগ এই আকাশে যাপিনু / সে কথা অনেক ভুলেছি। / তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে / সে আলোকে দোঁহে দুলেছি।'[১২৮]

তারার আলোকে দুজনের এই দোলার ছবিটি বুঝিয়ে দেয় যে তারা থেকে দুজনের সত্তা পৃথক হয়ে আছে এখনও। তবে শেষপর্যন্ত এই পার্থক্য আর থাকবে না। একদিক

দিয়ে অবশ্য জীবনদেবতার নক্ষত্রমূর্তি কিছু অভিনব নয়। প্লেটোনিক ঐতিহ্য থেকে পাওয়া এই daemonic star-কে যখন কবি সৌরজগতের মধ্যে দেখেন, তখন উদয়াচলের শুকতারা অস্তাচলের সন্ধ্যাতারা রূপে কবিজীবনের আদাবন্তে পুনরাবৃত্ত হন—'এই বুঝি মোর ভোরের তারা এল সাঁঝের তারার বেশে। / অবাক্-চোখে ওই চেয়ে রয় চিরদিনের হাসি হেসে।।'[১২৯] আর যখন কবি তাঁকে সৌরজগতের বাইরে দেখেন, তখন তিনিই হয়ে ওঠেন ধ্রুবতারা—'অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে / দেখা দেয় অবশেষে / কালের তিমিররজনী ভেদিয়া / তোমারি মুরতি এসে, / চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে'।[১৩০] কিন্তু জীবনদেবতাকেই শুধু নক্ষত্ররূপে কবি দেখেননি, নিজেকেও নক্ষত্ররূপে উপলব্ধি করেছেন: 'ভাসিতেছে সত্তার প্রবাহে / সৃষ্টির আদি তারাসম / এ চৈতন্য মম।'[১৩১] আর এরপর যেন অনিবার্যভাবেই জীবনদেবতার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের সত্যকে বোঝাতে গিয়ে জীবনদেবতা বিষয়ে তাঁর সর্বশেষ ভাষ্যে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্মনক্ষত্রের মতো', 'এ যেন অর্ধনারীশ্বরের মতো ভাবখানা'[১৩২]। স্মৃতিযাত্রার অন্তিম উদ্‌যাপনে অতিজগতের মহাকাশে দুজনে মিলে হয়ে উঠলেন দুটি তারার একটি মিথুন।

কিন্তু এই অতিজগৎ আর এই অতিজগতে স্থিত নিমোজিনির স্মৃতিভাণ্ডার—এসব কথাবার্তার মানে কী? এ যে দেখতে দেখতে প্রায় obscurantism-এ গিয়ে পৌঁছোল। যদি সত্যিই তেমন ঘটে থাকে তাহলে সে-দোষ পুরোটাই আমার, কদাপি রবীন্দ্রনাথের নয়। কারণ আপনারা সকলেই জানেন যে, কোনোরকম obscurantism রবীন্দ্রনাথ বরদাস্ত করেন না। কল্পনার উত্তুঙ্গতার সঙ্গে স্বচ্ছ যুক্তিকাঠামোর সহাবস্থান রবীন্দ্রনাথের মতো আর ক'জনেরই-বা আছে বলুন তো! বস্তুত এই অতিজগৎ কোনো তুরীয় অতিপ্রাকৃত জগৎ নয়, এ নেহাতই মনস্তাত্ত্বিক। আর এই কথাটাই ছাব্বিশে পড়বার আগেই রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন : 'যাঁহারা মনোবৃত্তির সম্যক অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, যেমন জগৎ আছে তেমনি অতিজগৎ আছে। সেই অতিজগৎ জানা এবং না-জানার মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মাঝখানে বিরাজ করিতেছে। মানব এই জগৎ এবং জগদতীত রাজ্যে বাস করে। তাই তাহার সকল কথা জগতের সঙ্গে মেলে না। এইজন্য মানবের মুখ হইতে এমন অনেক কথা বাহির হয় যাহা আলোকে অন্ধকারে মিশ্রিত। তাহা বুঝা যায় না, অথচ বুঝা যায়।'[১৩৩]

রবীন্দ্রনাথ যখন এই কথাগুলি লিখেছিলেন তখন ইয়ুং সবে বারোয় পড়েছেন। ভবিষ্যতে ইয়ুং-ই তো প্লেটোনিক অতিজগৎকে অনেক উঁচু থেকে 'নামিয়ে' আনবেন অনেক নীচে, মানুষের মনোজগতের গভীরতম স্তরে, তার যৌথ নির্জ্ঞানে তাকে পুনঃস্থাপন করবেন। নিমোজিনির যে-স্মৃতিভাণ্ডারকে প্লেটোনিক পরিভাষায় বলা যেত সর্বকালের সর্বজনের সমস্ত স্মৃতির মূলীভূত আইডিয়া, তাকেই এবার ইয়ুং-এর পরিভাষায় বলা যাবে সর্বকালের সর্বজনের সমস্ত স্মৃতির মূলীভূত আর্কেটাইপ। ইয়ুং-এর পক্ষে বলা

অসম্ভব নয় যে, জীবনদেবতার কাজ হচ্ছে এই নিরাকার আর্কেটাইপগুলিকে কবির ওয়ার্কশপে চালান করে দিয়ে সেগুলিকে আকৃতিময় আর্কেটাইপাল ইমেজে ইন্দ্রিয়বেদ্য করে তোলা। ইয়ুং কি জীবনদেবতাকেও জানতেন না কি! জানতেন বইকি! ইয়ুং-এরও যে একজন জীবনদেবতা ছিল! ইয়ুং-এর এই জীবনদেবতার নাম 'ফিলেমন্'।

কিন্তু এসব কথা আপাতত থাক। শুধু এইটুকু পুনরুক্তি করি যে, আমার এই প্রবন্ধে বিগতকালীন ও বাতিল কোনো গুহ্যতত্ত্বকে ঝাড়ফুঁক করে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়নি, গুণগত মানে যেমনই হোক, এর সমস্তটাই নেহাত মানবিক ও মনস্তাত্ত্বিক।

৪

আলোচনার গোড়ায় একটি রহস্য অনুদ্‌ঘাটিত রেখেছিলাম— স্মৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী সমস্ত ভবিষ্যৎকেও কী করে নিজের স্মৃতিলগ্ন করে রাখে? আসলে সময়কে দেখার ভঙ্গির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সেই রহস্যের চাবিকাঠি। সময়কে যদি সীমার কোটিতে দেখি তাহলে সময় রৈখিক, যদি অসীমের কোটিতে দেখি তাহলে সময় বৃত্তাকার। আধুনিকের সময় রৈখিক, প্রাচীনের সময় বৃত্তাকার। গ্রিকদের সময় ছিল গোল, প্লেটো ওই গোল সময়েই বাস করতেন। তাই তাঁর বিশ্বাস ছিল, নব-আবিষ্কৃত সমস্ত তত্ত্বই আসলে পুনরাবিষ্কৃত তত্ত্ব। প্রাচীন ভারতেও পৌরাণিক সময় ছিল গোল—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, পুনঃসৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আধুনিক অঙ্কশাস্ত্র যে-পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলে থাকে, তা আগেই বলা হয়েছে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে। ঈষৎ-দীর্ঘ হলেও হিবার্ট বক্তৃতা থেকে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সমগ্রভাবেই উদ্ধৃত করছি :

I am told that mathematics has come to the conclusion that our world belongs to a space which is limited. It does not make us feel disconsolate. We do not miss very much and need not have a low opinion of space even if a straight line cannot remain straight and has an eternal tendency to come back to the point from which it started. In the Hindu Scripture the universe is described as an egg; that is to say, for the human mind it has its circular shell of limitation. The Hindu Scripture goes still further and says that time also is not continuous and our world repeatedly comes to an end to begin its cycle once again. In other words, in the region of time and space infinity consists of ever-revolving finitude.'[১৩৪]

শেষ পঙ্‌ক্তিতে রবীন্দ্রনাথ যা বললেন তার মর্মার্থ হল, সীমার মধ্যেই শুধু অসীমের প্রকাশ নয়, নিত্য-আবর্তিত সীমার মধ্যেই অসীমের প্রকাশ।

মানুষের ধর্ম বইতেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষ ভাবতে ভালোবাসে, কোনো-এব কালে তার শ্রেষ্ঠতার আদর্শ পূর্বেই বিষয়ীকৃত। তাই প্রায় সকল জাতীয় পুরাণে দেখা যায় সত্যযুগের কল্পনা অতীতকালে। সে মনে করে যে-আদর্শের উপলব্ধি অসম্পূর্ণ, কোনো-এক দূরকালে তা পরিপূর্ণ অখণ্ড বিশুদ্ধ আকারে। সেই পুরাণের বৃত্তান্তে মানুষের

এই আকাঙ্ক্ষাটি প্রকাশ পায় যে, অনাদিতে যা প্রতিষ্ঠিত অসীমে তাই প্রমাণিত হতে থাকবে।'[১৩৫]

এরই পরিপূরক বক্তব্য পাওয়া যাবে *তিন সঙ্গী*-র 'শেষকথা' গল্পে। অধ্যাপক বলেছেন, 'পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে, কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে'।[১৩৬] বোঝাই যাচ্ছে, মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে যার প্রকাশ, মানুষের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ে তার কল্পনা 'পূর্বেই বিষয়ীকৃত'; আর এই অর্থেই 'অনাদিতে যা প্রতিষ্ঠিত অসীমে তাই প্রমাণিত।' সময় গোল না হলে এ সম্ভব নয়, আর 'মানুষের ইতিহাস'কে এই গোল সময়ে রেখে রবীন্দ্রনাথ এর নিহিত পৌরাণিকতাকেই স্বীকার করে নিলেন।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, *বিশ্বপরিচয়* বইতে বিজ্ঞান-আলোচনার উপসংহারে পৌঁছিয়েও রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমার মনে এই প্রশ্ন ওঠে, সূর্য নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের আরম্ভকালের কথাও তো দেখি অঙ্ক পেতে পণ্ডিতেরা নির্দিষ্ট করে থাকেন। অসীমের মধ্যে একান্ত আদি ও একান্ত অন্তের অবিশ্বাস্য তর্ক চুকে যায় যদি মেনে নিই আমাদের শাস্ত্রে যা বলে, অর্থাৎ কল্পে কল্পান্তরে সৃষ্টি হচ্ছে আর বিলীন হচ্ছে, ঘুম আর ঘুম-ভাঙার মতো'।[১৩৭]

এটা মানতেই হবে যে, সময়ের গোলত্ব নিয়ে এসবই হল রবীন্দ্রনাথের 'জ্ঞানের বিষয়', কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও না মেনে কোনো উপায় নেই যে, সময়ের গোলত্ব এসবের অনেক আগে রবীন্দ্রনাথের 'ভাবের বিষয়' হয়ে গিয়েছে। তাঁর জীবনদেবতাই আছেন ওই গোল সময়ের মধ্যে। তিনিই তো সেই 'রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী' যাঁর সামনে কবির কাব্যের 'ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান।'[১৩৮] এই তাৎপর্য 'ভাবী' বলেই কবির কাছে অনাগত, কিন্তু কবির জীবনদেবতার মধ্যে তা 'পূর্বেই বিষয়ীকৃত'।

কিন্তু কবি নিজেও কি তাঁর নিগূঢ় কবিসত্তায় ওই গোল সময়েরই বাসিন্দা নন? *কবি-কাহিনী*-র কবি ভালোবেসেছিলেন নলিনীকে— মৃত্যুর পর সেই নলিনী 'রক্ষক-দেবতা'[১৩৯] রূপে কবির চিরসঙ্গিনী হয়ে রইল। 'দৃষ্টির সম্মুখে তার দিগন্তও যেন/খুলিয়া দিত গো নিজ অভেদ্য দুয়ার।/ যেন কোনো দেববালা কবিরে লইয়া / অনন্ত নক্ষত্রলোকে কোরেছে স্থাপিত'।[১৪০] গার্ডিয়ান এঞ্জেলের দেওয়া এই 'সর্বোপরি'[১৪১] দৃষ্টির প্রসাদে সতেরোবর্ষীয় রবীন্দ্রনাথ আশিবর্ষীয় রবীন্দ্রনাথকে যেন আগাম দেখে নিলেন : 'ক্রমে কবি যৌবনের ছাড়াইয়া সীমা, /গম্ভীর বার্ধক্যে আসি হোলো উপনীত।/ সুগম্ভীর বৃদ্ধ কবি, স্কন্ধে আসি তাঁর/পড়েছে ধবল জটা অযত্নে লুটায়ে।/ মনে হোত দেখিলে সে গম্ভীর মুখশ্রী/ হিমাদ্রি হোতেও বুঝি সমুচ্চ মহান্!'[১৪২]

নন্দিনী কি জীবনদেবতারই প্রতিমূর্তি? কিশোর, বিশু, রঞ্জন, এমনকী রাজা, প্রত্যেকের স্ব-ভাবের বিশেষত্ব অনুযায়ী নন্দিনী এদের প্রত্যেককে বিশেষভাবে উদ্‌বোধিত ও পরিচালিত করেছে, আবার একইসঙ্গে নন্দিনীর একটি সাধারণ প্রভাব সমগ্র যক্ষপুরীর উদ্‌বোধনে ও পরিচালনে অলক্ষ্যভাবে কার্যকর হয়েছে। গোটা *রক্তকরবী* নাটকটাই কি ওই গোল

সময়ের মধ্যে স্থাপিত নয়? তাই তো রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, 'আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের;'[১৪৩] বলেন, 'রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গে এর যে-একটা মিল দেখছি, তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ করা। আসল কারণ, কবিগুরুই আমার গল্পটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকতে হরণ করেছেন।'[১৪৪]

ভবিষ্যতের স্মৃতি ছাড়া এ কি সম্ভব?

উল্লেখপঞ্জি

সংস্করণের উল্লেখ না থাকলে *রবীন্দ্র রচনাবলি* সর্বত্রই পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ।

১. Hesiod, *Theogony and Works and days*, trans by M. L. West, Oxford University Press, 1990. pp. 4-5

২. Ibid., p. 63

৩. Ibid.. p. 4

৪. Ibid., p. 6

৫. Ibid.. p. 4

৬. Mircea Eliade. *Myth and Reality*. London : George Allen & Unwin. 1964. p. 123

৭. *Phaedo* in *Great Dialogues of Plato*, trans. W. H. D Rouse. The New American Library. 1956. p. 476

৮. *Pheadrus, Plato with an English Translation*. trans. Harold North Fowler. London : William Heinemann. 1953. p. 479.

৯. Eliade, *Myth and Reality*, pp. 120-2

১০. Ibid., p. 121-2

১১. S. Radhakrishnan—*Eastern Religions and Western Thought*, Oxford University Press, 1975, p. 149

১২. *শ্রীবরাহপুরাণম্*—১, শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রবর্তিত আর্যশাস্ত্র, দ্বিতীয় সংখ্যা, মহামিলনমঠ, শ্রাবণ ১৪০০, পৃ. ২৮

নিমোজিনির স্মৃতি-সরোবরের সঙ্গে বরাহপুরাণের এই বেদ-সরোবরের আশ্চর্য সাদৃশ্য সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষক অনিন্দ্যবন্ধু গুহ। এই বিষয়ে তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করছি।

অবশ্য সম্ভাব্য হিন্দু উৎসের পাশাপাশি স্মৃতি-সরোবরের বৌদ্ধ উৎস থাকাও সম্ভব। ১৯৮৯ সালে বেসিল ব্ল্যাকওয়েল লিমিটেড প্রকাশিত ও টমাস বাটলার সম্পাদিত *Memory : History, Culture and the Mind* বইয়ের ১৩ নম্বর পৃষ্ঠায় স্মৃতি সম্বন্ধে বৌদ্ধ একটি ভাবনার পরিচয় দিয়ে সম্পাদক লিখেছেন, '...all the material of past memory still

exists somewhere out there. in a great receptacle in the sky, the bin of memory, the Akasic record from which we all draw our karmic life plans.'

১৩. *Phaedrus, Plato with an English Translation, I,* tr by Harold North Fowler, William Heinemann Ltd.. 1953. p. 483

১৪. *Phaedo* in *Great Dialogues of Plato.* tr. by W. H. D. Rouse. The New American Library, 1956 p. 476

১৫. *Symposium* in *Great Dialogues of Plato.* tr. by W. H. D. Rouse. The New American Library, 1956, p. 97-98

১৬. Ibid., p. 76

১৭. Ibid., p. 90

১৮. Paul Friedlander—*Plato/An Introduction*, tr, by Hans Meyerhoff. Harper & Row, 1958, p. 37
এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় 'Demon and Eros' সমস্তটাই কৌতূহলী পাঠকের অবশ্যপাঠ্য।

১৯. *The Daemon of the World in Shelley / Poetical Works.* ed. by Thomas Hutchinson. OUP, 1978. p. 2

২০. Hesiod—*Theogony and Works and Days.* tr. by M. L. West, OUP, 1990, p. 15

২১. Ibid.

২২. Ibid.. p. 16

২৩. Ibid.

২৪. Ibid.

২৫. *'সিন্ধুপারে', 'চিত্রা', রবীন্দ্ররচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৩৪-৩৫

২৬. *New Larousse Encyclopedia of Mythology.* Hamlyn. 1987. p. 165

২৭. M. Esther Harding — *Woman's Mysteries / Ancient and Modern / A Psychological Interpretation of Feminine Principle as portrayed in Myth, Story and Dreams.* Rider & Company. 1971. p. 26. 35

২৮. *পূর্ণিমা, চিত্রা, রবীন্দ্ররচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫০৬-০৭

২৯. *ছিন্নপত্রাবলী,* ২১৭-সংখ্যক পত্র, *রবীন্দ্ররচনাবলী,* একাদশ খণ্ড, পৃ. ২৩২

৩০. *ঘরে-বাইরে, রবীন্দ্ররচনাবলী,* নবম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯

৩১. *The Religion of Man,* George Allen & Unwin. 1988. p. 29

৩২. *The English Writings of Rabindranath Tagore,* ed. by Sisir Kumar Das. Vol. Two, Sahitya Akademi, 1996. p.37

৩৩. Ibid.

৩৪. *The English Writings of Rabindranath Tagore.* ed. by Sisir Kumar Das, Vol. one. Sahitya Akademi, 1996. p. 253

৩৫. *'দুই বোন', রবীন্দ্ররচনাবলী,* নবম খণ্ড, পৃ. ৮০৬

৩৬. *'একখানি চিঠি', সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্ররচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৪৩৩

৩৭. *The English Writings of Rabindranath Tagore,* ed. by Sisir Kumar Das, Vol. Two, Sahitya Akademi, 1996. p. 37

৩৮. *'কবি য়েট্‌স্‌', 'পথের সঞ্চয়', রবীন্দ্ররচনাবলী,* দশম খণ্ড, পৃ. ৯১৪

৩৯. *'পত্রাবলী',* দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৭, পৃ. ১৩৮

৪০. *'সাহিত্যের সামগ্রী', সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ.৭৪১

৪১. W.B. Yeats-*'The Philosophy of Shelley's Poetry', Ideas of Good and Evil,* A. H. Bullen, 1903. Reprinted 1914. p. 80

৪২. Ibid.. p. 93

এখানে জানিয়ে রাখা যেতে পারে যে, ৪১ এবং ৪২ সংখ্যাচিহ্নিত দুটি উদ্ধৃতিরই অন্তর্ভুক্ত 'great memory'-র memory শব্দের আদ্যাক্ষর m-কে পরবর্তীকালে ইয়েট্‌স্‌ M করে দিয়েছিলেন। দ্র. W. B. Yeats—*Ideas of Good and Evil,* in *Essays and Introductions,* Macmillan & Co. Ltd., 1961. p. 79, 91

৪৩. W. B. Yeats— *'Magic', Ideas of Good and Evil,* A. H. Bullen, 1903. Reprinted 1914. P. 21

৪৪. প্রশান্তকুমার পাল—*রবিজীবনী,* পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ, বৈশাখ ১৩৯৭, পৃ. ১৪৮

৪৫. তত্রৈব, পৃ. ১৫৯

৪৬. তত্রৈব, পৃ. ১৫৮

৪৭. *ছিন্নপত্রাবলী,* ১০৭-সংখ্যক পত্র, *রবীন্দ্ররচনাবলী,* একাদশ খণ্ড, পৃ. ১১৮

৪৮. *'ক্ষতিপূরণ', ক্ষণিকা, রবীন্দ্ররচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৮৬

৪৯. জগদীশ ভট্টাচার্য—*'মরণস্বপ্ন', রবীন্দ্রকবিতাশতক,* তৃতীয় দশক, কবি ও কবিতা প্রকাশন, ১৯৮৩, পৃ. ৪৫

৫০. *'শেলি', রবীন্দ্রবীক্ষা,* সংখ্যা ৪, রবীন্দ্রভবন কর্তৃক প্রকাশিত, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৮৪—শ্রাবণ ১৩৮৫, পৃ. ৯৬-৯৭

৫১. *'আধুনিক কাব্য', সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্ররচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৩৪২

৫২. James A. Notopoulos — *The Platonism of Shelley,* Octagon Books. 1969. p. 35

৫৩. Paul Friedlander—*Plato / An Introduction,* tr. by Hans Meyerhoff, Harper & Row. 1958, p. 89

৫৪. *'জগৎ সত্য', আলোচনা, রবীন্দ্ররচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৫৯৪-৯৫

৫৫. *'আত্মার অমরতা', আলোচনা, রবীন্দ্ররচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৬১৯

৫৬. *'পুষ্পাঞ্জলি', রবীন্দ্ররচনাবলী,* বিশ্বভারতী, ত্রিংশ খণ্ড, ফাল্গুন ১৪০৪, পৃ. ৪৩২

৫৭. বুদ্ধদেব বসু—*'সমালোচনার পরিভাষা', বিশ্বভারতী পত্রিকা,* চতুর্দশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮০ শক, পৃ. ৩০৯

৫৮. তত্রৈব

৫৯. *'সম্পাদক ও কবি / মোহিতচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী-যোগে রচিত বিবরণ'*, পুলিনবিহারী সেন সংকলিত, *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৮, পৃ. ৩৮-৩৯
৬০. *ছিন্নপত্রাবলী*, ১৪৪-সংখ্যক পত্র, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, পৃ. ১৬১
৬১. *আত্মপরিচয়*, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, দশম খণ্ড, পৃ. ১৭০
৬২. 'মানবসত্য', মানুষের ধর্ম, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৬১২
৬৩. তত্রৈব, পৃ. ৬০৫
৬৪. *The English Writings of Rabindranath Tagore*. ed. by Sisir Kumar Das. Vol. One, Sahitya Akademi, 1994, p. 413
৬৫. *'বধিরতার সুখ'*, *বিবিধ প্রসঙ্গ*, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৫৬০-৬১
৬৬. *'বিস্মৃতি'*, *আলোচনা*, *রবীন্দ্ররচনাবলী*. চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৫৯৮
৬৭. পশুপতি শাসমল—*পারিবারিক খাতায় রবীন্দ্ররচনা ও রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ*, আনন্দ, ২০০২, পৃ. ৩১
৬৮. Frederic W. H. Myers— *Human Personality and Its Survival of Bodily Death*, Longmans. Green and Co., 1903. p. XV
এই বইটির প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র রায়কে ১৯০৩ সালের ১৭ মে তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃতিযোগ্য : 'আজকাল Myers-এর Human Personality and its survival after death [sic] নামক বই লইয়া পড়িতে বসিয়াছি। মনস্তত্ত্বের অপরূপ রহস্যের মধ্যে তলাইয়া গেছি। আশ্চর্য্য এই যে, আমার কাব্যের মধ্যে কবিতার ভাষায় আভাসে ইঙ্গিতে নানাস্থানেই আমি এই সকল কথা বলিয়াছি। আমাদের গোচরাতীত চেতনাকে ও ইন্দ্রিয়াতীত জগৎকে আমি নানাভাবে স্পর্শ করিয়াছি এবং তাহাদের বার্ত্তা নানা ছন্দে দিবার চেষ্টা করিয়াছি।'
দ্র. *'একখানি চিঠি / সতীশচন্দ্র রায়কে লিখিত'*, *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪, পৃ. ২০৩
৬৯. অমিয় চক্রবর্তীকে ১৯১৭ সালের ২২ জুন তারিখে লেখা ২-সংখ্যক চিঠি। দ্র. *চিঠিপত্র*, একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৭৪, পৃ. ৮
৭০. *'পায়ে চলার পথ'*, *লিপিকা*, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৭৮১
৭১. তত্রৈব
৭২. *'প্রথম শোক'*, *লিপিকা*, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৭৯২
৭৩. *'অতীতের ছায়া'*, *বীথিকা*, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪৩-৪৪
৭৪. *'ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত'*, *পত্রপুট* ১৫-সংখ্যক কবিতা, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, পৃ. ৩৮১
৭৫. *'The Religion of Man'*. George Allen & Unwin. 1988. p.56
৭৬. *'স্টপফোর্ড ব্রুক'*, *পথের সঞ্চয়*, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, দশম খণ্ড, পৃ. ৯১৫-১৬
৭৭. *জাভা-যাত্রীর পত্র*, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, দশম খণ্ড, পৃ. ৬৬২
৭৮. *ছিন্নপত্রাবলী*, ১৪১-সংখ্যক পত্র, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, পৃ. ১৫৮
৭৯. *'Einstein and Tagore'*. *The English Writings of Rabindranath Tagore*. vol. Three, ed. by Sisir Kumar Das. Sahitya Akademi. 1996. p. 911-13
৮০. *জীবনস্মৃতি*, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, দশম খণ্ড, পৃ. ৮৩

৮১. *জাপান যাত্রী, রবীন্দ্ররচনাবলী,* দশম খণ্ড, পৃ. ৫০৪
৮২. তত্রৈব, পৃ. ৫১১
৮৩. *ছিন্নপত্রাবলী,* ৪৮-সংখ্যক পত্র, *রবীন্দ্ররচনাবলী,* একাদশ খণ্ড, পৃ. ৫৭
৮৪. *[মেঘোদয়ে] উৎসর্গ,* ৩৩-সংখ্যক কবিতা, *রবীন্দ্ররচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৭
৮৫. *'কোন খেপা শ্রাবণ ছুটে এল', রবীন্দ্ররচনাবলী,* চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৭
৮৬. *চণ্ডালিকা, রবীন্দ্ররচনাবলী,* চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫৬৭
৮৭. *'বসুন্ধরা', সোনার তরী, রবীন্দ্ররচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৩৯
৮৮ *'বৃক্ষবন্দনা', বনবাণী, রবীন্দ্ররচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৩৯
৮৯. *'ছিন্নপত্রাবলী',* ৭৪-সংখ্যক পত্র, *রবীন্দ্ররচনাবলী,* একাদশ খণ্ড, পৃ. ৮৩
৯০. তেজেশচন্দ্রকে ১৯২৬ সালের ২৩ অক্টোবর তারিখে লেখা চিঠি। দ্র. *'গাছপালার প্রতি ভালোবাসা', প্রবাসী* বৈশাখ ১৩৩৪, পৃ. ২-৩
৯১. *The Religion of Man,* George Allen & Unwin. 1988, p. 16-17
৯২. Ibid., p. 70
৯৩. *'কবির অভিভাষণ', 'সাহিত্যের পথে', রবীন্দ্ররচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৩৯৪
৯৪. তত্রৈব
৯৫. *'যাবার দিনে এই কথাটি', গীতাঞ্জলি,* ১৪২-সংখ্যক কবিতা, *রবীন্দ্ররচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ৩০৪
৯৬. *[জীবনদেবতা] উৎসর্গ,* ১৩-সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৮
৯৭. *ছিন্নপত্রাবলী,* ৭০-সংখ্যক পত্র, *রবীন্দ্ররচনাবলী,* একাদশ খণ্ড, পৃ.৭৯
৯৮. *'অহল্যার প্রতি', মানসী, রবীন্দ্ররচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩২৭
৯৯. *গীতিমাল্য,* ১০৭-সংখ্যক গান, *রবীন্দ্ররচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫
১০০. *শেষ সপ্তক,* ৪৪-সংখ্যক কবিতা, *রবীন্দ্ররচনাবলী,* তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২২০
১০১. *'সমুদ্রের প্রতি', সোনার তরী, রবীন্দ্ররচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮
১০২. তত্রৈব, পৃ. ৩৭৯।
১০৩. তত্রৈব।
১০৪. *বিশ্বপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৮৬৯
১০৫. *জন্মদিনে,* ৫-সংখ্যক কবিতা, *রবীন্দ্ররচনাবলী,* তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৪২
১০৬. তত্রৈব, ৯-সংখ্যক কবিতা, *রবীন্দ্রবচনাবলী,* তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৪৪।
১০৭. *জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী,* দশম খণ্ড, পৃ ৫৫
১০৮. *'সামুদ্রিক জীব। (প্রথম প্রস্তাব) কীটাণু',* ভারতী, বৈশাখ ১২৮৫, পৃ. ৩৪
১০৯. *চোখের বালি, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, রবীন্দ্ররচনাবলী,* অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২২৫
১১০. *Religion of Man,* p. 22.
১১১. *'পরশপাথর', সোনার তরী, রবীন্দ্ররচনাবলী,* অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫-৬
১১২. *'রাত্রি', কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্ররচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৪

১১৩. *'উর্বশী', চিত্রা, রবীন্দ্ররচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫১১

১১৪. *জাপানযাত্রী, রবীন্দ্ররচনাবলী,* দশম খণ্ড, পৃ. ৪৮৫

১১৫. *'The Poet's Religion', Creative Unity,* London, Macmillan, 1988, p. 9

১১৬. Bayard H. McConnanghey, Robert Zottdi, *Introduction to Marine Biology*, The St. Louis; C. V. Mosby, 4th ed., 1983, p. 368

১১৭. Ananda K. Coomarswamy, *Yaksas*, Part II, Delhi, Munshiram Manoharlal, 1971, p. 70.

১১৮. 'দালিয়া' গল্পকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের তৈরি চিত্রনাট্যের খসড়ায় 'জলদেবী'র এই নতুন ধারণাটি সংযোজিত হয়েছে। বিশ্বভারতী পত্রিকা'র প্রথম বর্ষ দশম সংখ্যায় *'রবীন্দ্রনাথের অরচিত নাটকের পরিকল্পনা'* নামে প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত এই খসড়াটি প্রথম প্রকাশ করেন।

১১৯. *Phaedrus, Plato with an English Translation, 1,* trans. by Harold North Fowler, London, William Heinemann, 1953, p. 513.

১২০. *Religion of Man,* p. 42.

১২১. *জীবনস্মৃতি প্রথম পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্রবীক্ষা,* সংখ্যা ১৩, রবীন্দ্রভবন কর্তৃক প্রকাশিত, বিশ্বভারতী, ১৯৮৫, পৃ. ৬৬

১২২. *ছিন্নপত্রাবলী,* ১১৮-সংখ্যক পত্র, *রবীন্দ্ররচনাবলী,* একাদশ খণ্ড, পৃ. ১৩১

১২৩. তত্রৈব, ১৩-সংখ্যক পত্র, *রবীন্দ্ররচনাবলী,* একাদশ খণ্ড, পৃ. ২৩

১২৪. *পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি, রবীন্দ্ররচনাবলী,* দশম খণ্ড, পৃ. ৫৪৩

১২৫. তত্রৈব।

১২৬. ডি প্রোফন্ডিস', *আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৯৭৪-৫

১২৭. আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে', *রবীন্দ্ররচনাবলী,* চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৩

১২৮. *[জীবনদেবতা] উৎসর্গ,* ১৩-সংখ্যক কবিতা, *রবীন্দ্ররচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৮

১২৯. 'এই বুঝি মোর ভোরের তারা', *রবীন্দ্ররচনাবলী,* চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৯

১৩০. অনন্ত প্রেম', *মানসী, রবীন্দ্ররচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩১৮

১৩১. 'শেষ', *বীথিকা, রবীন্দ্ররচনাবলী,* তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৩৩

১৩২. সূচনা, *চিত্রা, রবীন্দ্ররচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৬৩

১৩৩. 'কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট', *সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৮২৬-৭

১৩৪. *Religion of Man,* p. 40.

১৩৫. *মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্ররচনাবলী,* দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৫৭৪

১৩৬. 'শেষ কথা', *তিন সঙ্গী, রবীন্দ্ররচনাবলী,* সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৯৭৬

১৩৭. *বিশ্বপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৮৭১-২

১৩৮. *আত্মপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী,* দশম খণ্ড, পৃ. ১৬৮

১৩৯. *কবি-কাহিনী,* চতুর্থ সর্গ, *রবীন্দ্ররচনাবলী,* পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৮১

১৪০. তত্রৈব, পৃ. ৮৪

১৪১. 'সর্ব্বোপর্য্যেব পশ্যান্তি কবয়োহন্যে ন চৈব হি'—*বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্বখণ্ড*, ২৫। ৮২ জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাবানুবাদ : '[কবির] দৃষ্টি সর্বোপরি দৃষ্টি। তিনি যা দেখেন অন্যে তা দেখতে পায় না।' দ্র. *কবি ও কবিতা*, দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ৩১৮

১৪২. *কবি-কাহিনী*, চতুর্থ সর্গ, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৮৩

১৪৩. *রক্তকরবী* প্রস্তাবনা, দ্র. গ্রন্থপরিচয়, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, চৈত্র ১৩৫৩, পৃ. ৫৪৮

১৪৪. তত্রৈব, পৃ. ৫৪৭

বাংলার তৈজসপত্র : দৈনন্দিনতার ধাতুশিল্প

তারাপদ সাঁতরা

বাংলার ঘর-গৃহস্থালিতে একসময়ে যে কাঁসা-পিতল শিল্পদ্রব্যের রমরমা ছিল, আজ তা প্রায় অন্তর্হিত। বিবাহাদির মতো আচার-অনুষ্ঠান বা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কিছু কিছু কাঁসা-পিতলের দ্রব্য যে নিয়মরক্ষার জন্য আজও ব্যবহৃত হয় না এমন নয়। তবে একসময়ে গোটা অবিভক্ত বাংলা জুড়ে গৃহস্থের ঘরে ঘরে কাঁসা-পিতল তৈজসপত্র ব্যবহারের দরুন যে কাঁসা-পিতল ধাতুশিল্প গড়ে উঠেছিল, তা ছিল একান্তই অভাবনীয়। বাংলার তাঁতশিল্পের গৌরবময় ঐতিহ্যের পাশাপাশি কাঁসা-পিতল শিল্পের নাম করা যেতে পারে। বংশপরম্পরায় হাজার হাজার পিতল-কাঁসা কারিগর এই শিল্পে নিযুক্ত থেকে শহর ও গ্রামাঞ্চলের ধনী বা গৃহস্থের ব্যবহারের জন্য পিতল-কাঁসার নানাবিধ তৈজসপত্র সরবরাহ করে এসেছেন।

বাংলার কাঁসা-পিতল শিল্পের ঐতিহ্য নিয়ে একদা কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে, 'মুসলমান অধিকারে মালদহে ও ঢাকায়, পরে মুর্শিদাবাদে ও বর্ধমানের দাঁইহাটে কাঁসা-পিতলের বাসন নির্মাণের উন্নতি হইয়াছিল।' প্রসঙ্গত তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন, 'খাগড়ার উৎকৃষ্ট কাঁসার বাসন তখন জন্মগ্রহণ করে নাই। বিদরির কাজ মুর্শিদাবাদে এক সময় নকল হয়ে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল।'

আর একজন বিশিষ্ট শিল্পরসিক সুধাংশুকুমার রায় বাংলার থালা বাসনের গৌরব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, কাংস্যকারদের ধাতুপাত্রগুলি নির্মাণের মধ্যে সে সময় বাংলায় অতি অনুপম ও স্বতন্ত্র বৃত্তিধারী এক শিল্পগোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল। তার ফলে বাংলায় উদ্ভূত হয়েছিল ধাতুদ্রব্য নির্মাণের এক উচ্চাঙ্গ শিল্পীসম্প্রদায়। সে সময়ের তমলুকের বিখ্যাত চকাই বাটি, খাগড়ার চামু গ্লাস (তেলুগু চম্বু) ও ফেরো ঘটি, বিষ্ণুপুরের ঘড়া বা কলসি এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত নানান দ্রব্য প্রভৃতি ছিল বাংলায় ধাতুশিল্পীদের উজ্জ্বল কর্মধারার নিদর্শন।

কিন্তু এ শিল্পের পতন শুরু হল সস্তায় অ্যালুমিনিয়াম ও এনামেল পাত্র বাজারে আমদানি হওয়ার দরুন। বর্তমানে স্টেনলেস স্টিলের বাসনপত্র আমদানি হওয়ায় কাঁসা-পিতলের তৈজসপত্রের ব্যবহার প্রায় উঠে গেছে বললেই হয়। এছাড়াও বহু ক্ষেত্রে ছিল কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে মহাজনের হস্তক্ষেপ। মহাজনেরা কাঁচামাল কারিগরদের সরবরাহ করতেন, পরিবর্তে দিতে হত নিখুঁতভাবে সম্পাদিত মালপত্র, যার দরুন কারিগর কেবলমাত্র লাভ করত মজুরি, যাকে বলা হত 'বাণি'। এক্ষেত্রে মহাজন তাদের

তৈরি জিনিসপত্র বিক্রি করে কী পরিমাণ লাভ করত, তা দরিদ্র ও অজ্ঞ কারিগরদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না এবং এইভাবেই তারা কোনো প্রতিবাদ না জানিয়ে দিনের পর দিন শোষিত হয়েছে।

এইসব নানা কারণে আজ কাঁসা-পিতলের তৈজসপত্র যেন দেশ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আজও কোনোমতে টিকে আছে গোটা তিন-চার উল্লেখযোগ্য কাঁসা-পিতল শিল্পকেন্দ্র, কিন্তু কাঁসা-পিতলের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হওয়ায় সেগুলিও কোনোক্রমে টিকে আছে মাত্র। একদিন গোটা বাংলা জুড়ে যে অনুপম শিল্পকর্মটির ব্যাপ্তি ঘটেছিল, সে বিষয়টি সম্পর্কে অবগতি ও দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, সে সব উৎপাদনস্থলের নাম ও উল্লেখযোগ্য দ্রব্য নির্মাণের এক তালিকা লেখ্য-প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরা হল, যা থেকে বাংলার ধাতুশিল্পের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ে সম্যক অবহিত হওয়া যায়।

কাঁসা-পিতল তৈজসপত্রের উদ্ভব ও বিকাশ

অতীতকাল থেকে গ্রাম-জীবনে ঘর-গৃহস্থালির প্রয়োজনে যেসব পাত্র গ্রাম্য কারিগররা নির্মাণ করেছিলেন, তার উপাদান ছিল মাটি ও কাঠ। তামা আবিষ্কারের পর সেসব ঘরকন্নার দ্রব্য তামা এবং পরে পিতল-কাঁসা প্রভৃতি ধাতুতে রূপান্তরিত করা হয়। পদ্মপাতার অনুকরণ করেই তৈরি করা হয়েছে থালা, সে মাটির বা ধাতুর যাই হোক না কেন। আদিম সমাজে লাউ-কুমড়োর খোলা দিয়ে যেসব জলপাত্র নির্মাণ করা হয়েছিল, সেগুলির গড়ন পরে কুম্ভকারের চাকে একটা বিশেষ রূপ গ্রহণ করেছিল এবং এরই অনুকৃতি করে ধাতুশিল্পীরা তামা ও পিতল-কাঁসায় গড়ে তুললেন জলপাত্র হিসাবে ঘটি। সেইভাবে একদা খোদাই করে তৈরি কাঠের পিপের অনুকরণে যে মাটির কলসি তৈরি করা হল, তারই ধরনে সেটি ধাতুনির্মিত কলসিতে রূপান্তরিত করে দিলেন ধাতুশিল্পীরা। অন্যদিকে কাঠের কেঠো থেকে মাটির গামলার যে চল হল, তাই থেকে আবার তৈরি হল পিতলের গামলা ইত্যাদি। দীর্ঘদিন ধরে স্থায়িত্বের প্রয়োজনে ধাতুশিল্পীরা যেমন তৈরি করলেন মাটির হাঁড়ি থেকে পিতলের হাঁড়ি, তেমনি আবার ডোম শিল্পীদের তৈরি বাঁশের চাল ধোয়ার ধুচুনির অনুকরণে শিল্পীরা পিতলের পাত দিয়ে তৈরি করলেন পিতলের ধুচুনি সেইভাবে পোড়ামাটির ধুনুচি রূপান্তরিত হয়েছে পিতলের ধুনুচিতে। সুতরাং একদিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনে কাঠ, বাঁশ ও মাটির উপাদানে যেসব ঘর-গৃহস্থালির তৈজসপত্র নির্মিত হয়েছিল, তারই অবয়ব অনুসরণে ধাতুতে রূপান্তর ঘটল গ্রাম-বাংলার পিতল-কাঁসার কারিগরদের হাতে। শিল্পরসিক সুধাংশুকুমার রায় তাই যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে, বাংলার ধাতু নির্মিত পাত্রে অবয়ব ও নকশার বিষয়বস্তুগুলি হল, মৃৎপাত্রের এক সার্থক অনুকৃতি।

সভ্যতার উষালগ্নে যখন তামা আবিষ্কৃত হল, পরবর্তী সময় থেকে নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই নির্মিত হতে শুরু হল তামার বাসনকোসন। এরপর উদ্ভাবনী শক্তির জোরে কালে কালে এল পিতল, তথা কাঁসার নানা তৈজসপত্র। কিন্তু তা হলেও কাঁসা-পিতলের

দ্রব্য ব্যবহারের সঙ্গে পাশাপাশি চালু থাকল তামার তৈরি ধাতুপাত্র। অপরদিকে দেখা গেল, মুসলিম সমাজে তামার বর্তন ব্যবহারের দিকেই যেন বেশি আগ্রহ।

ধাতুপাত্রের শ্রেণিবিভাগ

বাংলার ধাতু নির্মিত তৈজসপত্রগুলিকে মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এর মধ্যে একটি হল, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক, যার বেশ কিছু তামার তৈরি এবং সেই সঙ্গে দেব-দেবীর ঢালাই ক্ষুদ্র বৃহৎ মূর্তি প্রভৃতি। অন্যটি হল পিতল কাঁসা ভরন নির্মিত রান্না ও আহারের প্রয়োজনে ব্যবহৃত বাসনপত্র। আলোচ্য এইসব তৈজসপত্রের দফাওয়ারি শ্রেণিবিভাগযুক্ত এক তালিকা করলে যা দাঁড়ায়।—

ক. ঘর-গৃহস্থালির বাসনপত্র

১. থালা
২. বাটি
৩. ছাকাই বাটি— অর্থাৎ খুরো দেওয়া বাটি
৪. খুরি বা গ্লাস
৫. ফেরো বা চম্বু ঘটি
৬. হাঁড়ি
৭. বোকনো
৮. বাটা
৯. রেকাবি
১০. কৌটো
১১. হাতা ও খুন্তি
১২. ঝাঁঝরি বা ধুচুনি
১৩. কলসি অথবা ঘড়া
১৪. পানের ডাবর
১৫. গামলা
১৬. ডিবে বা মুখ ডিবে, যা পান রাখার জন্য ব্যবহৃত
১৭. বৈঠক— হুঁকো রাখার জন্য

খ. ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক পিতল-তামার দ্রব্যাদি

১. পুষ্পপাত্র—যা পুজোর ফুল রাখার জন্য ব্যবহৃত।
২. সাজি
৩. কোষা-কুষি, যা বিশেষ করে তামার তৈরি।
৪. প্রদীপ
৫. পঞ্চপ্রদীপ

৬. পিলসুজ
৭. ঘট— পিতল ও তামা নির্মিত
৮. কুণ্ড বা হোম কুণ্ড— যা হোমের জন্য ব্যবহৃত
৯. সিংহাসন, দেবতার অধিষ্ঠানের জন্য
১০. দেবদেবীর ক্ষুদ্র বৃহৎ মূর্তি

গ. মাদুলি-তাবিজ-কবজ

ধাতুশিল্পের কারিগর

এইসব ধাতুশিল্পের যাঁরা কারিগর তাঁদের মোটামুটি তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে এক শ্রেণি হল, যাঁরা সোনা-রূপোর কাজ করে থাকেন; অর্থাৎ, যাঁদের বলা হয় স্বর্ণকার। দ্বিতীয় শ্রেণি হল, যাঁরা কাঁসা-পিতলের কাজ করে থাকেন; অর্থাৎ যাঁদের কাঁসারি বা কাংস্যকার নামে অভিহিত করা হয় এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই আবার নিজেদের কাংস্যবণিক (বৈশ্য) বলে পরিচয় প্রদান করে থাকেন।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কাঁসারি সম্প্রদায় সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে :

"কাঁসারি পাতিয়া শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল
বাটী খোরা বড় হাণ্ডী সীপ।
সাপুড়া চুনা-বাটা নূপুর ঘাঘর ঘটা
সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ।।"

এছাড়া, তৃতীয় শ্রেণি হল, লোহা ও ইস্পাত শিল্পের সুদক্ষ কারিগর; অর্থাৎ কর্মকার সম্প্রদায়; যদিও তাঁরা পিতল-কাঁসার দ্রব্য তৈরির কাজে সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন।

ধাতুশিল্পে নিযুক্ত সম্প্রদায়ভিত্তিক এই তালিকা ছাড়াও সমাজের অন্যান্য শ্রেণির, বিশেষ করে অন্ত্যজ শ্রেণির লোকজনও এই শিল্পের প্রয়োজনে সহযোগী ভূমিকায় যুক্ত ছিলেন। এইসব সহযোগীকে বিভিন্ন কাজ অনুযায়ী বলা হত, আউটদার, গড়নদার, পিটনদার, মাঠিয়ে, চাঁছিয়ে, কুঁদিয়ে, টানিয়ে, মাজিয়ে ও ঝালাইদার প্রভৃতি। প্রধানত মাটির মুচি ও ছাঁচ তৈরি করা, ঢালাই-এর কাজে সহায়তা করা, নোয়ালি ও উকো দিয়ে ঢালাই বস্তুকে চেঁছে পরিষ্কার করা, কুঁদ টানা-পোড়েন করার কাজে, কাঁসার ঢালাই পাত তৈরিতে, ভারী ধরনের হাতুড়ি পেটানো প্রভৃতি কাজে এই সহযোগীরা হাত লাগাতেন এবং পরে পরে কার্যক্ষেত্রে এঁরাও একসময়ে সুদক্ষ ধাতুশিল্পীতে পরিণত হতেন।

কাঁসা-পিতল শিল্পের কাজে নিযুক্ত কর্মকার ও কাঁসারি সম্প্রদায় ছাড়াও, আর যে সম্প্রদায় এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের বলা হত টেঠারি। এই সম্প্রদায় নিজস্ব দক্ষতা অনুযায়ী পিতল-কাঁসার দ্রব্য যেমন গড়তেন, তেমনি নির্মিত দ্রব্যগুলি মাথায় মোট করে গ্রামে গ্রামে ফিরি করে বেড়াতেন এবং সেইসঙ্গে অব্যবহৃত বা ভগ্ন কাঁসা-পিতল দ্রব্যাদি গৃহস্থদের কাছ থেকে যথাযোগ্য মূল্যে সংগ্রহ করতেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর জেলায় সাধারণত এই সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল বলে জানা যায়।

অন্যদিকে এইসব পিতল-কাঁসা শিল্পের কাজে স্থানীয় মহিলারাও যে অংশগ্রহণ করতেন

না, এমন নয়। বিশেষ করে এই শিল্পে তাঁদের ভূমিকা ছিল মাটির ছাঁচ নির্মাণে, যা ছিল খুবই জটিল ধরনের কাজ। এক্ষেত্রে মহিলারা কিন্তু খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে এসব কাজ সম্পাদন করতেন। জটিল বলার কারণ এই যে, পিতলের ঘটি, বাটি বা গেলাস তৈরির কাজে মাটির ছাঁচগুলি হত দু-খোল এবং সেক্ষেত্রে ভিতর ও বাইরের ছাঁচের মধ্যবর্তী স্থানটি এমনভাবে ফাঁকা রাখা হত যার মধ্যে স্থান করে নিত গলানো পিতল বা কাঁসা। এসব কাজ গ্রাম্য মহিলারা কম পয়সার মজুরিতে বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে সম্পাদন করতেন।

ছাঁচ তৈরি ছাড়া, গ্রাম্য মহিলারা বিশেষ করে কাঁসার থালা নির্মাণের পর সেগুলিকে সরষের তেল ও ছেঁড়া চুলের সাহায্যে বিশেষ করে দু-পায়ের ঘষা দিয়ে পরিষ্কার করার কাজেও নিযুক্ত হতেন।

সেকালের উল্লেখযোগ্য কাঁসা-পিতল কারিগরদের নাম বিস্মৃতির অন্ধকারে আজ হারিয়ে গেলেও, মেদিনীপুর শহর থেকে প্রকাশিত 'মেদিনী বান্ধব' পত্রিকায় উল্লিখিত হয়েছে এমন কয়েকজন কৃতী ধাতুশিল্পীর নাম। ১৯০৪ ও ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর শহরে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যে কৃষিশিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে এইসব কারিগরপ্রদত্ত শিল্পকর্মের দরুন যাঁরা পুরস্কৃত হন সেইসব শিল্পীর নাম প্রকাশিত হয়েছিল স্থানীয় 'মেদিনী বান্ধব' পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৫ ও ৪৬ সংখ্যায়, যথাক্রমে ১০ই ফাল্গুন, ১৩১১ ও ৯ই চৈত্র, ১৩১১ তারিখে এবং ৭ম খণ্ড, ২৪শ সংখ্যা, ১৪ই ভাদ্র ১৩২২ তারিখে। উপরি-উক্ত পত্রিকায় মুদ্রিত এই বিবরণ থেকে জানা যায়, তামার তৈরি শিঙ্গা শিল্পী হিসাবে যে দু-জন পুরস্কৃত হয়েছিলেন, তারা হলেন ঘাটালের শ্রীবাস কীর্তন্যা ও চন্দ্রকোণার রামচন্দ্র কীর্তন্যা। বৃহদাকার থালা তৈরির শিল্পী হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন খড়ারের চিন্তামণি কর্মকার ও পূর্ণ কাঁসারি। পিতলের ঘটি তৈরির কারিগর হিসাবে রঘুনাথপুরের (চন্দ্রকোণা) বসন্তকুমার দাস মহাপাত্র, বৃহৎ পিলসুজ নির্মাণের কারিগর হিসাবে চন্দ্রকোণার পরাণ কর্মকার, হুঁকোর বৈঠক ও পিতলের গাড়ু তৈরির শিল্পী হিসাবে ঘাটাল-নিশ্চিন্তিপুরের সনাতন মল্লিক প্রমুখ পুরস্কৃত হয়েছিলেন। এছাড়া, সনাতন মল্লিক পিতলের হ্যারিকেন লণ্ঠন নির্মাণের জন্যও পুরস্কার পেয়েছিলেন। পিতলের পেয়ালা ও পিতলের সাঁওতালি গহনা নির্মাণের জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন, যথাক্রমে চন্দ্রকোণার শিবু ডাব এবং কৃষ্ণদাস প্রহরাজ।

ধাতব দ্রব্যের কাঁচামাল

তামা : তামা পাওয়া যায় তামার খনি থেকে এবং গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে সংগৃহীত অব্যবহৃত বাজে তামা প্রভৃতি দিয়েই তৈরি হত তামার নানান পাত্র।

পিতল : তামার সঙ্গে পরিমাণ মতো দস্তা মিশিয়ে তৈরি করা হয় পিতল; অর্থাৎ ভালো পিতল পেতে হলে ১৭ ভাগ তামা ও ১৫ ভাগ দস্তার মিশ্রণ লাগে। পিতলের চাদর বা শিট পিতল তৈরি করতে হলে লাগে ১৮ ভাগ তামা ও ৪ ভাগ দস্তা।

কাঁসা : এক্ষেত্রে ৭ ভাগ তামা ও ২ ভাগ রাং বা টিন মিশিয়ে তৈরি মণ্ডটি কাঁসায়

পরিণত হয়। কারিগররা এই মিশ্রণ সম্পর্কে যে আর্যাটি বলতেন :

'সাতে দুইয়ে করো জড়ো
তাতে আনো তাতে গড়ো।'

অর্থাৎ ৭ ভাগ তামা আর ২ ভাগ টিন মিশিয়ে গরম কর আর তা পিটিয়ে পাতলা কর। আসলে অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এই মিশ্রণের ফলে তৈরি কাঁসার তালটিকে পিটিয়ে তবেই কাঁসার থালা প্রস্তুত করা হয়।

ভরন : কাঁসার মতো দেখতে, অথচ সস্তায় ঢালাই করা আর এক ধাতুর মিশ্রণ হল ভরন। কাঁসা তৈরির সময় রাং কম দিয়ে তামা ও দস্তা বেশি দিলে যে মিশ্রণটি পাওয়া যায় সেটিই হল ভরন, যা একটু সাদাটে ধরনের দেখতে হয় বলে নিম্নতর শ্রেণির কাঁসা নামে অভিহিত করা হয়। এর ফলে ভরন ঢালাই দ্রব্যগুলি সস্তায় বিক্রি হয়।

মিশ্র ধাতু প্রস্তুত প্রণালী

ধাতুশিল্পের বিশিষ্ট কারিগররা এই ধাতুমিশ্রণ করার জন্য তাঁদের দোকান বা কারখানার মেঝেতে ২ ফুট ব্যাস অনুযায়ী ফুট তিনেক গভীর করে একটি গোলাকার গর্ত খুঁড়ে নেন, যা হল ফার্নেস তৈরির প্রথম ধাপ। এবার ওই ফার্নেসের উপর মাপমতো পাতলা করে মাটি লেপা একটি লোহার ঝাঁঝরি বা জাল বসানো হয়, যার উপর সম-দূরত্বে নিয়মমাফিক বেশ কিছু গর্ত রাখা হয়। ওই গর্তগুলির উপর তিন ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মাটির গোলাকার নল জুড়ে দেওয়া হয়, যাতে ওই নল দিয়ে ফার্নেসের জ্বালানির ছাই ইত্যাদি সহজেই বেরিয়ে যেতে এবং হাওয়া প্রবেশ করতে পারে। এইভাবেই যে ফার্নেসটি তৈরি হল ধাতুশিল্পীরা তাকে বলে থাকেন 'শাল'।

পরবর্তী ধাপে ওই গোলাকার ফার্নেসটি বোঝাই করা হয় কাঠ-কয়লা দিয়ে, কোথাও বা উন্নতমানের কয়লা দিয়ে। অন্যদিকে ধাতু মিশ্রণ বা গলাবার জন্য যে বিশেষ পাত্রটি পূর্বেই তৈরি করে রাখা হয় তাকে দেশি কথায় বলা হয়ে থাকে 'মুচি'। এসব মুচি মাটি দিয়ে তৈরি করা হলেও সেটি প্রস্তুতের সময় পরিমাণমতো বালি, ধানের তুষ ও পাটকুচি মেশাতে হয়। আসলে মুচিগুলি তৈরিতে বেশ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, যাতে ধাতু মিশ্রণের সময় কোনোক্রমে ফাট না ধরে। এবার পিতল, কাঁসা বা ভরন জাতীয় মিশ্র ধাতু তৈরিতে হিসাবমতো যেসব ধাতু লাগে তার পরিমাণ অনুযায়ী ধাতুর টুকরো ওই মুচিতে রেখে ওই ফার্নেসে বসিয়ে দেওয়া হয়। ফার্নেসে যতগুলো ধরে তত পরিমাণ 'মুচি' সংস্থাপন করে কাঠ কয়লা বা কয়লায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং পূর্বে উল্লিখিত ওই নলযুক্ত ঝাঁঝরিটি ফার্নেসের উপর চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। কোনো কোনো কারিগর হাপরের সাহায্যে ফার্নেসে হাওয়া দেবার ব্যবস্থা করে। তবে বহুক্ষেত্রে ফার্নেসের গায়ে হাওয়া যাবার যে নল রাখা হয়, তাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এইভাবে ঘণ্টা তিনেক লাগে সেগুলি তাপে মিশ্র ধাতুতে পরিণত হতে এবং তার জন্য মাঝে মধ্যে নুনের বা সোহাগার ছিটে দেওয়া হয় যথাযথ দ্রবণের জন্য।

কাঁসার তৈজসপত্র প্রস্তুত প্রণালী

ক. ঢালাই ও পেটাই দ্বারা কাঁসার দ্রব্য

কাঁসার থালা-বাটি ও রেকাব তৈরিতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা হল ফার্নেস থেকে গলিত ধাতুপূর্ণ মুচিটিকে দীর্ঘ হাতলযুক্ত সাঁড়াশি দিয়ে বের করে এনে ছোটো বড়ো পিণ্ডের আকারে ঢালাই করা হয়। এবার যে মাপের থালা বা বাটি তৈরি হবে, সেই পরিমাণমতো কোনো একটি ঢালাই পিণ্ডকে হাপরের আগুনে পোড়ানো হয়। সেটি পুড়ে লালবর্ণ হয়ে গেলে তা জলে ডুবিয়ে আবার তাকে পোড়ানো হয় যথাযথ পান দেওয়ার জন্য। পরবর্তী ধাপে পুনরায় সেই পিণ্ডটিকে পোড়ানোর পর সেটিকে সাঁড়াশি দিয়ে হাপর থেকে বের করে এনে নেহাইয়ের উপর ধরা হয় এবং এক বা একাধিক ব্যক্তি ভারী ধরনের হাতুড়ি দিয়ে ওই পোড়ানো পিণ্ডটির উপর ক্রমাগত ঘা মেরে পাতলা পাতে পরিণত করতে থাকেন। এইভাবে ওই ঢালাই পিণ্ডটি নির্দিষ্ট পাতে পরিণত হলে, ইচ্ছামতো সেটাকে পুনরায় পুড়িয়ে নিয়ে এক খণ্ড কাঠের গুঁড়ির উপর গোলাকার গর্তের মধ্যে রেখে হাতুড়ির ঘা মেরে মেরে যথাযথ আকারে থালা, রেকাব বা বাটির আকার দেওয়া হয়। তারপর চেঁছে-ছুলে পরিষ্কারের কাজ করা হয়।

খ. পিতলের চাদর থেকে তৈরি ধাতুপাত্র প্রস্তুত প্রণালী

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে কাঁসার থালা-বাটি প্রস্তুত ছাড়াও পিতলের শিট বা চাদর থেকেই নানাবিধ বস্তু, যথা পিতলের ঘড়া, জলের জালা, হাঁড়ি, ঘটি, কমণ্ডলু ও নৈবেদ্যর থালা প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। একসময় এই পিতলের চাদর এদেশের কারিগররা তৈরি করলেও, বিদেশ থেকেও এই পিতলের চাদর আমদানি করা হত। সাধারণত এই পিতলের চাদর দৈর্ঘ্যে প্রস্থে হত চার ফুট আকারের এবং এগুলি থেকে কারিগর তার উদ্দিষ্ট জিনিস তৈরির জন্য মাপ মতো অংশ কাঁটা-কম্পাসের সাহায্যে দাগ দিয়ে, তা একধরনের লোহার কাঁচি দিয়ে কেটে নিত। কাটার এই যন্ত্রটিকে কারিগররা বলতেন 'কাটারি', যা থেকে পরবর্তী সময়ে চলতি কথায় তার নামকরণ হয়েছে 'কাতুড়ি' বা 'কাতারি'। এবার কাতুড়ি দিয়ে কেটে নেওয়া অংশ, যাকে কারিগররা বলেন চাকি, তা হাপরে গরম করে নেহাইয়ের উপর রেখে উদ্দিষ্ট বস্তুটি তৈরির প্রয়োজনে সেইভাবে পিটিয়ে নির্দিষ্ট অংশগুলি তৈরি করা হয়। তারপর সেইসব খণ্ডাংশকে জোড়া হয় ঝালাই করে। জোড়মুখে সোহাগা লাগিয়ে তামা ও দস্তার মিশ্রণে তৈরি ঝালাই দিয়ে জোড়া লাগানো হয়। এবার পরিপূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত বস্তুগুলিকে কুঁদ যন্ত্রে বসিয়ে চাঁছা ও পালিশ করা হয়।

গ. ছাঁচ ঢালাই পিতল ও ভরনের ধাতুপাত্র প্রস্তুত প্রণালী

উপরি-বর্ণিত প্রণালী ছাড়াও গ্লাস, ঘটি, বাটি, কলসি, বোকনো প্রভৃতি পিতল বা ভরনের বাসনপত্র এবং পিতলের আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক দ্রব্যাদি যথা পিলসুজ, প্রদীপ,

পঞ্চপ্রদীপ ও ঘণ্টা প্রভৃতি নির্মাণে ঢালাই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তবে পঞ্চপ্রদীপ বা পিলসুজের ক্ষেত্রে সেগুলিকে কয়েকটি অংশে ঢালাই করে পরে প্যাঁচ কেটে জোড়া লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে এসব দ্রব্যগুলি নির্মাণের জন্য প্রয়োজন হয় যথাযথ ছাঁচের, যা মিহি কাদার সঙ্গে পাটের কুচি মিশিয়ে তৈরি করা হয়। এই ছাঁচ তৈরি পর্যায়ের কাজটিকে কারিগররা বলে থাকেন ছাঁচ গড়া যা চলিত কথায় দাঁড়িয়েছে ছাঁচ কাড়া। বলা বাহুল্য, এই ছাঁচ গড়া কাজটি যথেষ্ট মুন্সিয়ানার কাজ এবং বিশেষ করে ঘটি তৈরির ছাঁচগুলি করার কাজে একসময় গ্রাম্য মহিলারা নিযুক্ত থেকে নিপুণভাবে তা সম্পাদন করতেন।

অনেক সময় কাঠ ও পোড়ামাটির মডেল ব্যবহার করেও ছাঁচ প্রস্তুত করা হত। একসময়ে রাণাঘাট এলাকার কাঁসারি কারিগররা মোমছাঁচ ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। এছাড়াও ছিল বালি দিয়ে তৈরি ছাঁচ।

ছাঁচ তৈরির কাজ সমাধা হয়ে গেলে, ফার্নেসের মধ্যে রাখা মুচিতে গলানো পিতল বা ভরনের গলিত অংশ প্রয়োজনমতো অতি দক্ষতার সঙ্গে প্রস্তুত করে রাখা ওই ছাঁচের মধ্যে ঢালা হয় এবং ছাঁচের মধ্যেকার ফাঁকা অংশে যথাযথ গলানো ধাতুটি স্থান করে নেয়। পরে ঠাণ্ডা হবার পর ছাঁচটিকে শাবল দিয়ে ভেঙে প্রার্থিত ঢালাই বস্তুটি বের করে নেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তামার দ্রব্য বা পাত্রাদি কিন্তু ঢালাই করে প্রস্তুত হয় না—তৈরি হয় তামার চাদর থেকে। সেদিক থেকে তামার দ্রব্যাদি হিন্দুরা পূজার্চনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, কিন্তু মুসলিমরা ঘর-গৃহস্থালিতে বা ভোজের জন্য তামার তৈরি বাসনকোসনই বেশি পছন্দ করে থাকেন।

ধাতুশিল্পের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি

পিতল-কাঁসার ধাতুপাত্র বা তৈজসপত্র প্রভৃতি নির্মাণে কারিগররা যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকেন সেগুলি হল :

বিভিন্ন আকারের লোহার নেহাই ও ছোটবড়ো লোহার হাতুড়ি, ছেনি, লোহার সাঁড়াশি, লোহার উকো, কুঁদ যন্ত্রে বসিয়ে পাত্রাদি চাঁছার কাজে লোহার চাঁচনি, যাকে বলা হয় নোয়ানি, বিভিন্ন আকারের লোহার গজ বা শাবল, তিনকোণা লোহার চাঁচনি যাকে বলা হয় ছুরি— যেটি কাদার তৈরি ছাঁচকে প্রয়োজনে চাঁছার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, লোহার কাঁচি— যাকে বলা হয় কাতুড়ি, কাঠের হাতুড়ি, কুঁদ যন্ত্র, হাপর, দু-পায়া কাঠ— যাকে বলা হয় 'দোঠেঙ্গা', অর্থাৎ যেটি দিয়ে শাবল ধরা হয়, ইত্যাদি যন্ত্রপাতি। এছাড়াও আছে কাঁটা-কম্পাস ও ঝালাই করার যন্ত্র তাতাল।

বিভিন্ন ধাতুনির্মিত দ্রব্যের শ্রেণিবিভাগ ও প্রাপ্তিস্থান

তামা, পিতল, কাঁসা ও ভরনের তৈরি ধাতুপাত্র প্রভৃতির শ্রেণিবিভাগপূর্বক প্রাপ্তিস্থানের এক বিবরণ প্রদান করেছিলেন শ্রদ্ধেয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এস. সি. মিত্র ও

সুধাংশুকুমার রায়। তাঁদের সেই বিবরণ অনুসরণে একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা নিম্নে উল্লিখিত হ্ল।

ক. পান-ভোজনের তৈজসপত্র

থালা : বড়ো আকারের কানা নিচু কাঁসার থালাকে বলা হয় বগি থালা। কানা উঁচু থালাকে বলা হত 'কটকী' থালা এবং সেইসঙ্গে থালার আর এক রকমফের ছিল 'কটকী বগি থালা'। হয়তো ওড়িশার কটকে নির্মিত থালার অনুকরণে তৈরি করা হত বলেই এই নামকরণ। এছাড়া, তৈরি হত 'বেলেঞ্চি থালা', যেটির কানা সমানভাবে উঁচু হয়ে শেষ প্রান্ত একটু বাইরের দিকে ছড়ানো আকৃতির হত। কটকী ও বেলেঞ্চি থালা প্রস্তুত হত নদীয়া জেলার শান্তিপুরে। কাঁসার থালা ছাড়া তামা ও পেতলের থালাও তৈরি হয়। তামার থালাকে বলা হয় 'নগনস্', যা বিশেষ করে মুসলিমরা ব্যবহার করে থাকেন। পেতলের থালা সাধারণত পেতলের চাদর থেকে তৈরি করা হয়। কাঁসার থালার ক্ষেত্রে অবশ্য ঢালাই ও পেটাই এই দু-ভাবে নির্মিত হয়।

পিতলের যেসমস্ত থালা প্রস্তুত হত সেগুলির মধ্যে একটি হল সাধারণ বড়ো থালা, যা কলকাতায় প্রাপ্ত পিতলের চাদর থেকে নির্মিত। অন্য আর তিনটি হ'ল চাঁচ, বেলি ও সাগরি নামের থালা, যার প্রাপ্তিস্থান ছিল বাঁশবেড়িয়া (হুগলি)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মেদিনীপুর জেলার সুন্দরনগরে কাশীজোড়া রাজবাড়িতে রাধাষ্টমী উপলক্ষে ব্যবহৃত এমন তিনটি বড়ো ধরনের থালা দেখা যায়, যার ব্যাস ১-৭১/২" থালা তিনটির মধ্যে দু-টি থালার একটির উল্টোপিঠে লিপি খোদাই আছে, যথা 'রাধাষ্টমী ওঃ ৬ সের ৩ পোয়া' এবং অন্যটিতে 'রাধাষ্টমী ওঃ ৫ সের ৬ ছ্টাক'।

কাঁসার থালা যা তৈরি হত, তার মধ্যে হল, মিহি কাঁসা, অগ্রিথালা, কাঞ্চনথালা, সনকথালা, গয়েশ্বরী ও বালেশ্বরী (যা ওড়িশার বালেশ্বরের নকল বলেই নামকরণ) বগি থালা নামকরণে ভূষিত, নির্মাণস্থল ছিল খড়ার (মেদিনীপুর)।

এছাড়া ছিল কাঁসার তৈরি 'পেটা কাঞ্চন' নামের থালা, যার নির্মাণস্থল ছিল বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) এবং সেইসঙ্গে 'দু-পিঠ ছোলা বগি থালা' নামের থালাও তৈরি হত মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর, খাগড়া ও সেখানকার অন্যান্য স্থানে।

পলওয়ারি থালা তৈরি হত বাঁশবেড়িয়াতে (হুগলি), ঢালাই পদ্ধতিতে 'ভুবনেশ্বরী' ও 'ধলা-কাঞ্চন' ও গৌরীকাঁটা নামের থালা তৈরি হত বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়রে এবং গয়েশ্বরী থালা প্রস্তুত হত বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে।

উল্লেখ্য যে, ছোট কাঁসার থালাকে বলা হয় কাঁসি।

একদা বাংলার জেলাওয়ারি উল্লেখযোগ্য থালা নির্মাণস্থল বা মোকামগুলি হল :

জেলা : বীরভূম

কবিলাসপুর (থানা : রাজনগর), পাথরকুচি ও লোকপুর (থানা : খয়রাশোল), দুবরাজপুর (থানা : দুবরাজপুর), নলহাটি (থানা : নলহাটি)

জেলা : বাঁকুড়া

মদনমোহনপুর (থানা : সোনামুখী), পাত্রসায়র (থানা : পাত্রসায়র), বিষ্ণুপুর (থানা : বিষ্ণুপুর), বেলিয়াতোড় (থানা : বেলিয়াতোড়)

জেলা : মালদহ

কাঁসারিপাড়া, কুতুবপুর, শঙ্করবাটি (থানা : মালদহ), ইংলিশবাজার ও আরাপুর (থানা : ইংলিশবাজার)

জেলা : নদিয়া

ফরিদপুর (থানা : কালীগঞ্জ), শান্তিপুর (থানা : শান্তিপুর)

জেলা : বর্ধমান

বনপাশ (থানা : ভাতার), করমপুর (থানা : মন্তেশ্বর), কৈতড়া (থানা : গলসী), সেহারাবাজার (থানা : রায়না), পূর্বস্থলী ও চুপি (থানা : পূর্বস্থলী), জাবুই (থানা : মেমারি), কাঞ্চননগর (থানা : বর্ধমান), দাঁইহাট (থানা : কাটোয়া)

জেলা : মেদিনীপুর

সাহেবগঞ্জ (থানা : ঘাটাল), খড়ার (থানা : ঘাটাল), চন্দ্রকোণা (থানা : চন্দ্রকোণা), রামজীবনপুর (থানা : চন্দ্রকোণা)

জেলা : মুর্শিদাবাদ

কাঁদি (থানা : কাঁদি) বহরমপুর (থানা : বহরমপুর), খাগড়া (থানা : বহরমপুর)

জেলা : হুগলি

বাঁশবেড়িয়া (থানা : মগরা)

বাটি : থালার সঙ্গে চাই বাটি। ভোজনকালে থালায় যেমন বিশেষ করে অন্ন পরিবেশন করা হয়, তেমনি তার সঙ্গে ব্যঞ্জনের প্রয়োজনে বাটি। বাটিও আবার নানাধরনের প্রস্তুত হত, তবে অধিকাংশই হত কাঁসার। কিন্তু পিতল বা ভরনের যে তৈরি হত না এমন নয়। বাটি যে কতরকমের এবং কতধরনের তৈরি হত, তার এক তালিকা করলে দেখা যায়,

১. দাঁইহাটে (বর্ধমান) পাওয়া যেত 'মালা বাটি' 'মিহি বাটি' ও 'বোকনা বাটি' নামের নানাবিধ বাটি।

২. 'আচকা খানক্রাই' ও 'জীবন তারা' নামের বাটি তৈরি হত মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা, বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের এবং বর্ধমান জেলার দাঁইহাট ও অন্যান্য স্থানে।

৩. এছাড়া 'চন্দ্রকোণা' 'ফুলপোশাকি', 'নমুনা খানক্রাই' ও 'তলা পালিশ', 'চিন পেয়ালা', 'বিট খানক্রাই', 'মনসা-পিয়ালি', 'দিলখুশ' নামের বাটি তৈরি হত মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা, বর্ধমানের দাঁইহাট ও বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়েরে। উল্লিখিত স্থানগুলিতে 'সরপোষদার' নামের যে বাটি তৈরি হত তার উপরে থাকত ঢাকনা।

৪. নবাববাটি, রেলবাটি, (পলতোলা), কামরক্ষিবাটি, বড়ো ঠিকা বাটি, (খুরো দেওয়া) মাঝারি টিকা বাটি, ছোটো টিকা বাটি তৈরি হত চন্দ্রকোণায়।

৫. 'গয়ার বাটি', যার নকল করা হয়েছিল গয়ায় তৈরি বাটি থেকে।

৬. 'এলোকেশী বাটি'— তারকেশ্বরের মোহন্তের সঙ্গে এলোকেশীর সম্পর্ক নিয়ে

তার স্বামী তাকে হত্যা করায় কাঁসা-পিতলের কারিগররা হতভাগিনী এলোকেশীর স্মৃতি রক্ষার্থে তার নামে এই বাটির প্রচলন করে।

৭. 'রানিগঞ্জের বাটি', যা তৈরি হত রানিগঞ্জে (জেলা বর্ধমান)।

৮. 'চিড়িয়াখানার বাটি'— যা সর্বত্র কাঁসা-পিতলের কেন্দ্রগুলিতে তৈরি হত।

৯. 'কৃষ্ণক্রান্তি বাটি', 'বিরহিনী বাটি', 'মনমোহিনী বাটি', 'তলাপালিশ বাটি' ও 'চাঁদ পেয়ালা' বাটি প্রভৃতির প্রাপ্তিস্থান ছিল বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়রে।

১০. 'কটৌরা' নামে তামার একধরনের বাটি তৈরি হত, যা সাধারণত মুসলমান পরিবারই ব্যবহার করতেন।

১১. তমলুকে (মেদিনীপুর) তৈরি হত 'চকাই' নামের বিখ্যাত বাটি।

১২. শান্তিপুরে (নদিয়া) তৈরি হত 'চিন পেয়ালা বাটি', 'দুধ খাওয়া বাটি' এবং 'গ্যাস বাটি'—যার মাথার দিকটা হত ঢেউ খেলানো।

১৩. খাগড়ায় (মুর্শিদাবাদ) তৈরি হত সরফুলি বাটি, বড়োপোষ বাটি।

১৪. বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে তৈরি হত পোশাকি বাটি।

১৫. নবদ্বীপে (নদিয়া) পাওয়া যেত সাদা বাটি।

আঞ্চলিকভাবে নির্মিত ওইসব নামের বাটি ছাড়া, অন্য স্থান থেকে চালান আসা যেসব বাটি বাংলার কাঁসা-পিতলের ব্যবসা কেন্দ্রে পাওয়া যেত, সেগুলি হল :

১. বালেশ্বরী বাটি—ওড়িশার বালেশ্বরে প্রস্তুত;

২. 'ক্ষেত্তুরি বাটি' বা 'পুরী বাটি'— ওড়িশার জগন্নাথদেবের স্মৃতিস্বরূপ নির্মিত বাটি;

৩. 'গদাদ্দির বাটি'—যা ওই নামের কোনো এক স্থানে প্রস্তুত হত।

একদা জেলাওয়ারি বাটি তৈরির উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি হল :

জেলা : নদিয়া

বাহিরগাছি (থানা : নাকাশিপাড়া), সাধনপাড়া (থানা : কৃষ্ণনগর), নবদ্বীপ (থানা : নবদ্বীপ), মুড়াগাছা (থানা : নাকাশিপাড়া)

জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা

বাদুড়িয়া (থানা : বসিরহাট), নাটাগড় (থানা : পানিহাটি), বসিরহাট (থানা : বসিরহাট)

জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জয়নগর-মজিলপুর (থানা : জয়নগর)

জেলা : বীরভূম

টিকরবেতা (থানা : ইলামবাজার), লোকপুর (থানা : খয়রাশোল), পাথরকুচি (থানা : খয়রাশোল), হায়াৎপুর (থানা : খয়রাশোল), লাউবেড়ে (থানা : খয়রাশোল), কবিলাসপুর (থানা : রাজনগর)।

জেলা : মেদিনীপুর

তমলুক (থানা : তমলুক), সাহেবগঞ্জ (থানা : ঘাটাল), রাধানগর (থানা : ঘাটাল),

ক্ষীরপাই (থানা : চন্দ্রকোণা), খড়ার (থানা : ঘাটাল) ও চন্দ্রকোণা (থানা : চন্দ্রকোণা)

জেলা : হাওড়া

কল্যাণপুর (থানা : বাগনান)

জেলা : বর্ধমান

রানিগঞ্জ (থানা : রানিগঞ্জ), পূর্বস্থলী (থানা : পূর্বস্থলী), দিগনগর (থানা : আউশগ্রাম), কাঞ্চননগর (থানা : বর্ধমান)

জেলা : বাঁকুড়া

পাত্রসায়র (থানা : পাত্রসায়র), নতুনবাজার (থানা : বাঁকুড়া), বিষ্ণুপুর (থানা : বিষ্ণুপুর), লক্ষ্মীসাগর (থানা : সিমলাপাল), ময়নাগড় (থানা : সিমলাপাল), মলিয়ান-লালবাজার (থানা : খাতড়া), গোদারডিহি (থানা : বড়জোড়া), শুশুনিয়া (থানা : শালতোড়া), মদনমোহনপুর (থানা : সোনামুখী)

জেলা : মুর্শিদাবাদ

কাঁদি (থানা : কাঁদি), বালুচর (থানা : জিয়াগঞ্জ), খাগড়া (থানা : বহরমপুর)

জেলা : মালদহ

নবাবগঞ্জ (থানা : মালদহ), আরাপুর (থানা : ইংলিশবাজার), কাঁসারিপাড়া, শঙ্করবাটী, কুতুবপুর (থানা : মালদহ), ইংলিশবাজার (থানা : ইংলিশবাজার)

জেলা : হুগলি

খামারপাড়া (থানা : চুঁচুড়া), খন্যান (থানা : পাণ্ডুয়া), শিয়াখালা (থানা : চণ্ডীতলা) , চন্দননগর (থানা : চন্দননগর)

জামবাটি : বাটির এক বড়ো সংস্করণ হল জামবাটি, যা বিশেষভাবে কাঁসার তৈরি হয়। জামবাটি তৈরির উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হল :

জেলা : বীরভূম

লোকপুর (থানা : খয়রাশোল)

জেলা · নদিয়া

মুড়াগাছা (থানা : নাকাশিপাড়া), মেটেরি (থানা : কালীগঞ্জ), দেবগ্রাম (থানা : কালীগঞ্জ) সারক-ফরিদপুর (থানা : কালীগঞ্জ)

জেলা : বাঁকুড়া

পুখুরিয়া, লক্ষ্মীসাগর ও ময়নাগড় (থানা : সিমলাপাল), মলিয়ান-লালবাজার (থানা : খাতড়া)-পুখুরিয়ায় ১-৫ কেজির জামবাটি তৈরি হয়। শ'তিনেক পরিবার এ কাজে যুক্ত। নেপাল, অস্ট্রেলিয়া, জাপানে রফতানি হয় বাটি। লালমোহন, ভাস্কর, তরণী, বিশ্বনাথ কর্মকার বিশিষ্ট কারিগর। শ্রমিকরা ৫০ টাকা, গড়নদার ১০০ টাকা দৈনিক পায়।

পাওলি : পাওলি হল ঘটির আকারে জল খাবার পাত্র। এগুলি আবার নানান ধরনে

ও নানান নামে প্রচলিত ছিল এবং অধিকাংশই তৈরি হত কাঁসা ও ভরন ধাতুতে। এগুলি যেখানে তৈরি হত সেখানকার নামকে কেন্দ্র করে নামকরণও সেভাবে করা হয়েছিল, যথা মোহনপুরি, বিষ্ণুপুরী, খাগড়াই, শান্তিপুরী, কলাগেছে ইত্যাদি। বালি-দেওয়ানগঞ্জে তৈরি হত ঝালা পাউলি ও মোহনপুরিয়া পাউলি।

আবখোরা : বিশেষ আকার ও ধরনের এই জলপানের পাত্রটি বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়ই ব্যবহার করতেন। সাধারণত এই পাত্রটি ভরন ধাতুতেই নির্মিত হত এবং এর প্রাপ্তিস্থান ছিল বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে। একটি বিশেষ গড়নের এই আবখোরা কলকাতায় পাওয়া যেত, যার নাম ছিল 'জাহানা'।

বিদরি : মুর্শিদাবাদে একসময় বিদরিও নির্মিত যে হত, সে সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখা 'আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

চুমকি : চুমকি নামটার উদ্ভব হয়েছে চুমুক দিয়ে জলপানের নিমিত্ত ক্ষুদ্রাকার ঘটি থেকে। যদিও এর ব্যবহার খুবই কম হত, তাহলেও অনেক স্থানে গৃহস্থেরা এই চুমকি দিয়েই দুধের পরিমাপ করতেন। তাছাড়া, এটি বিশেষভাবে আলতো করে জল পান করার জন্যেও ব্যবহৃত হত।

গেলাস : গেলাস কথাটির উৎপত্তি বিদেশি পানপাত্র 'গ্লাস' থেকে। গেলাস তৈরি হত বাংলার নানা স্থানে কাঁসা, পিতল ও ভরন ধাতুতে। একদা বলা হত মুর্শিদাবাদের খাগড়ায় তৈরি গেলাসই সর্বোৎকৃষ্ট। বাংলার বিভিন্ন স্থানের কাঁসা-পিতল শিল্পকেন্দ্রগুলিতে যেসব নামের ও ধরনের গেলাস তৈরি হত তার দফাওয়ারি বিবরণ হল :

১. *চিড়িয়াখানা গেলাস* : যা ছিল পলতোলা এবং তৈরি হত মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণায়।

২. *সরপোষদার গেলাস* : এ গেলাসে ঢাকনা দেওয়া হত এবং তৈরি হত মুর্শিদাবাদের খাগড়া এবং বাঁকুড়ার পাত্রসায়রে।

৩. *গৌঁড়ি চোঙ গেলাস* : এ ধরনের গেলাসও তৈরি হত মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা ও বাঁকুড়ার পাত্রসায়রে।

৪. *গোঁড়ি খাগড়াই* : নাম গোঁড়ি খাগড়াই হলেও তৈরি হত উপরিউক্ত চন্দ্রকোণা ও পাত্রসায়রে।

৫. *সেজ গেলাস* : উৎপাদনস্থল চন্দ্রকোণা ও পাত্রসায়র।

৬. *চোঙ গেলাস* : এও তৈরি হত উপরিউক্ত চন্দ্রকোণা, শান্তিপুর ও পাত্রসায়রে।

৭. *খাগড়াই গেলাস* : উৎপাদনস্থল মুর্শিদাবাদের খাগড়া।

৮. *পলদার গেলাস* : এও তৈরি হত মুর্শিদাবাদের খাগড়ায়, পাত্রসায়র (বাঁকুড়া) এবং বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া)।

৯. *তামা খুরো গেলাস* : তৈরি হত মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণায়।

১০. *জল সন্দেশ গেলাস* : এ গেলাসে আবার তিন থাক কুঠরি থাকত। উপরের

থাকটি মিষ্টান্ন রাখার স্থান, মধ্যে থাকে জল এবং সবশেষে নিচের থাকে পান-সুপুরি রাখার জায়গা। আসলে বলা যেতে পারে এটি ছিল সেকালের টিফিন কৌটো সদৃশ গেলাস। তৈরি হত বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের খাগড়ায়।

১১. *পেটা খাগড়াই :* এও তৈরি হত মুর্শিদাবাদের খাগড়ায়।

১২. *চামু গেলাস :* দক্ষিণ ভারতের চম্বু গেলাসের অনুকরণে খাগড়ায় (মুর্শিদাবাদ) তৈরি হত।

১৩. *গয়া গেলাস :* তৈরি হত শান্তিপুরে।

১৪. *গামছা মোড়া বা খেজুরছড়ি গেলাস :* যেটির গায়ে মোড়ানো গামছার বা খেজুর ছড়ির নকশা করা হয়। তৈরি হত বাহিরগাছি (নদিয়া) ও বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া)।

১৫. *মনোরঞ্জন গেলাস, চিত্তরঞ্জন গেলাস, এলোকেশী গেলাস* এবং কলকে ফুল গেলাস : তৈরি হত বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া)।

গেলাস তৈরির জেলাওয়ারি শিল্পকেন্দ্রগুলি হল :

জেলা : বাঁকুড়া

পাত্রসায়র (থানা : পাত্রসায়র), বিষ্ণুপুর (থানা : বিষ্ণুপুর), লক্ষ্মীসাগর ও ময়নাগড় (থানা : সিমলাপাল), মলিয়ান-লালবাজার (থানা : খাতড়া), মদনমোহনপুর (থানা : সোনামুখী)।

জেলা : মুর্শিদাবাদ

কাঁদি (থানা : কাঁদি), খাগড়া (থানা : বহরমপুর)।

জেলা : নদিয়া

নবদ্বীপ (থানা : নবদ্বীপ), সাধনপাড়া (থানা : কৃষ্ণনগর), বাহিরগাছি (থানা : নাকাশিপাড়া), শান্তিপুর (থানা : শান্তিপুর), সারক-ফরিদপুর (থানা : কালীগঞ্জ), মুড়াগাছা (থানা : নাকাশিপাড়া)।

জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা

নাটাগড (থানা : পানিহাটি), বসিরহাট (থানা : বসিরহাট), বাদুড়িয়া (থানা : বাদুড়িয়া)

জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জয়নগর-মজিলপুর (থানা : জয়নগর)।

জেলা : হুগলি

খামারপাড়া (থানা : চুঁচুড়া), খন্যান (থানা : পাণ্ডুয়া), শিয়াখালা (থানা : চণ্ডীতলা), চন্দননগর (থানা : চন্দননগর)।

জেলা : বর্ধমান

কাঞ্চননগর (থানা : বর্ধমান), বেগুনকোলা (থানা : কেতুগ্রাম)— উল্লেখ্য যে, এখানে ভরন ঢালাই গেলাস তৈরি হত; দিগনগর (থানা : আউসগ্রাম)।

জেলা : বীরভূম

টিকরবেতা (থানা : ইলামবাজার)

জেলা : হাওড়া

কল্যাণপুর (থানা : বাগনান)।

জেলা : মালদহ

শঙ্করবাটি, কাঁসারিপাড়া ও কুতুবপুর (থানা : মালদহ)।

জেলা : মেদিনীপুর

মহিষাদল (থানা : মহিষাদল), গম্ভীরনগর ও কুশপাতা (থানা : ঘাটাল), ক্ষীরপাই (থানা : ঘাটাল), খড়ার (থানা : ঘাটাল), সাহেবগঞ্জ (থানা : ঘাটাল), চন্দ্রকোণা (থানা : চন্দ্রকোণা), রাধানগর (থানা : ঘাটাল)

রেকাবি : রেকাবি তামা, পিতল ও কাঁসায় নির্মিত হত। তামার রেকাবি বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায় ব্যবহার করে থাকেন। অনেক রেকাবিতে নকশা করা থাকত।

রেকাবি তৈরির উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি হল :

জেলা : মেদিনীপুর

তমলুক (থানা : তমলুক)।

জেলা : মালদহ

নবাবগঞ্জ (থানা : মালদহ)।

জেলা : হুগলি

খামারপাড়া (থানা : চুঁচুড়া)।

জেলা : মুর্শিদাবাদ

বালুচর (থানা : জিয়াগঞ্জ)।

জেলা : নদিয়া

মুড়াগাছা (থানা : নাকাশিপাড়া)।

জেলা : বাঁকুড়া

বেলিয়াতোড় (থানা : বেলিয়াতোড়)।

কলকাতা

বামনদাস মুখার্জি রোড

খ. তাম্বুল চর্চা সংক্রান্ত পাত্র

ডাবর : অভিধানে বলা হয়েছে, 'ক্ষুদ্র গামলার সদৃশ ধাতুনির্মিত পাত্র বিশেষ'। আসলে এটি পান রাখার জন্য ব্যবহৃত। এটি তৈরি হয় ঢালাই পদ্ধতিতে। উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্র হল হুগলির বালি-দেওয়ানগঞ্জ (থানা : গোঘাট), বর্ধমানের পূর্বস্থলী (থানা : পূর্বস্থলী) ও বেগুনকোলা (থানা : কেতুগ্রাম), মালদহের নবাবগঞ্জ (থানা : মালদহ), ঘুরিয়া, গড়বেতা (মেদিনীপুর) ও কলকাতার কালীঘাট।

বাটা : 'বাটা' অর্থে হল পানের থালা। কাঁসা শিল্পীদের হাতে পড়ে এটি হয়েছে একটি গোলাকার বাক্স স্বরূপ, যাতে পান, চুন, সুপারি ও অন্যান্য মশলা রাখার জায়গা থাকে। লৌকিক ছড়ায় বাটার উল্লেখ পাওয়া যায়—

'ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি ঘুমের বাড়ি যাও,
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খাও।'

বাটা কাঁসা ধাতুতে তৈরি হয় এবং উল্লেখযোগ্য নির্মাণস্থল হল : বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়র (থানা : পাত্রসায়র), মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর।

ডাবর যেমন ঢালাই পদ্ধতিতে তৈরি হয়, বাটা তৈরি হয় কাঁসার চাদর দিয়ে।

পান-দান : এটিও কাঁসার তৈরি পান রাখার পাত্র, যা দু-ধরনের তৈরি হয়। এক হল গোলাকার এবং অন্যটি হল পটল চেরা আকৃতির। এটি তৈরি হত কলকাতার কালীঘাট এলাকায়।

পান-ডিবে : পান রাখার কৌটো বা ডিবে হত ডিম্বাকার বাক্স ধরনের। গৃহস্বামীর নিজের বা অতিথিদের আপ্যায়নের প্রয়োজনে এইসব কৌটো তৈরি করা হত বিভিন্ন আকারে বা গড়নে। ওইসব ডিবের নামগুলি ছিল নিম্নরূপ—

১. বেল ডিবে—বেলের আকৃতির মতো দেখতে হওয়ায় এই নামকরণ;
২. চন্দ্রকোণা ডিবে—চন্দ্রকোণায় তৈরি হত;
৩. পালিশ ডিবে—এ ডিবে খুব ভাল করে পালিশ করা হত বলেই এই নামকরণ;
৪. মুখ ডিবে—উপরের খোলটা হত পুরুষ বা নারীর মুখাকৃতি;
৫. ছাদি ডিবে;
৬. খাগড়াই ডিবে;
৭. গোল ডিবে—তৈরি হত চন্দ্রকোণায়;
৮. বই ডিবে—যা ছিল বাঁধানো বইয়ের আকৃতি।

ডিবেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হত কাঁসার তৈরি এবং এই ডিবেগুলির উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ছিল, খাগড়া (মুর্শিদাবাদ), চন্দ্রকোণা (মেদিনীপুর), ও পাত্রসায়র (বাঁকুড়া)।

গ. ধূমপান সংক্রান্ত

গড়গড়া বা ফরসি : সাধারণ মানুষ নারকোলের তৈরি হুঁকো বেশি পছন্দ করলেও মুসলমানরা পিতল বা কাঁসায় তৈরি গড়গড়াই বেশি ব্যবহার করত। ওইসব গড়গড়ার গায়ে অনেকসময় নকশি অলংকরণ করা হত।

কলকে বা ছিলম : গড়গড়া বা হুঁকোর প্রয়োজনে কলকে অতি অবশ্যই লাগে। মাটির কলকে ছাড়াও একসময়ে ধুতরো ফুলের আকৃতি সদৃশ পিতলের কলকেও তৈরি হত।

পিতলের হুঁকো : একসময়ে নারকোলের হুঁকোর অনুসরণে পিতলের হুঁকোও তৈরি করা হয়েছিল এবং বিশেষভাবে এই হুঁকো তৈরির কেন্দ্র ছিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার টাকিতে (থানা : বসিরহাট)।

বৈঠক : হুঁকো রাখার জন্য পিতলের যে তেপায়া হুঁকোদান তৈরি করা হত, তাকেই বলা হত 'বৈঠক'। এটির উপর দিকটা পানপাত্রের মতো, যার সঙ্গে তিনটি পায়া লাগানো থাকত। এইসব 'বৈঠক'ও হত নানান আকৃতির, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১. 'সাপ বৈঠক'— অর্থাৎ ফণা তোলা সাপের উপর দিকে হুঁকো বসানো হত। এগুলির উৎপাদনস্থল ছিল বিশেষ করে নদিয়া জেলার শান্তিপুর ও রাণাঘাট।

২. 'পরী বৈঠক'— পরীর মূর্তি লাগানো 'বৈঠক'। এটি তৈরি হত, নদিয়া জেলার দোগাছি, রাণাঘাট ও শান্তিপুর এবং উত্তর ২৪-পরগনা জেলার টাকি এলাকায়।

৩. তেপায়া পরী বৈঠক।

৪. চৌপায়া পরী বৈঠক।

৫. সেজয়ালা বৈঠক—দেখতে হত পিতলের ল্যাম্পের মতো।

৬. এস বৈঠক—ইংরেজি 'এস' অক্ষরের মতো পায়াগুলি নির্মিত হত।

৭. পলয়ালা বৈঠক।

৮. দেওয়াল বৈঠক।

৯. রেকাবওয়ালা বৈঠক।

ঘ. জল রাখার পাত্র

ঘটি : ভারতবর্ষের সর্বত্র যা 'লোটা' নামে পরিচিত, বাংলায় তা হল ঘটি। লৌকিক ছড়ায় ঘটির উল্লেখ হয়েছে এই বলে—'তালপুকুরে ঘটি ডোবে না' ইত্যাদি। 'ঘট' অর্থে যেখানে কলস বা কুণ্ড, ঘটি অর্থে সেখানে ধাতুনির্মিত ক্ষুদ্র ঘটবৎ জলপান পাত্র বিশেষ। আসলে জলপাত্র হিসাবে ঘটির ব্যবহার হলেও, এটি একদা বাংলায় বিভিন্ন আকারে ও ধরনে তৈরি হত, যেজন্য এর নানান নামকরণ করা হয়েছে, যথা :

১. *সামশাই ঘটি*—লম্বাটে ধরনের পিতলের ঘটি, যা একদা হুগলি জেলার বালি-দেওয়ানগঞ্জে (থানা : গোঘাট) এবং মেদিনীপুর জেলার ঘুরিয়া-গড়বেতায় তৈরি হত।

২. ঢালা পায়োলি—এটিও পিতল ঢালাই ঘটি, তৈরি হত উপরিউক্ত বালি-দেওয়ানগঞ্জে।

৩. *পেটা মথুরি*—পিতল চাদর থেকে পেটাই করা ঘটি— যা ছিল মথুরার ঘটির অনুকরণ। তবে এটি তৈরি হত নবদ্বীপে।

৪. *টুকনি*—এই নামের একটি সাধারণ পিতলের ঘটিও তৈরি হত নবদ্বীপে।

৫. *ঢালা মির্জাপুর রাজশাহী ঘটি*—উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরের ঘটির অনুকরণে রাজশাহীতে (বর্তমান বাংলাদেশ) পিতল ঢালাই করে নির্মাণ করা হত।

৬. *চাদর ঘটি*—এ ঘটি তৈরি হত পিতলের পাত দিয়ে, কলকাতার সিমলা এলাকায়।

৭. *পলদার ঘটি*—পিতলের পলতোলা ঢালাই ঘটি, তৈরি হত মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণায়।

৮. *সাহেবগঞ্জ ঘটি*—এটি তৈরি হত পূর্ব বাংলার সাহেবগঞ্জে। পিতলের চাদর দিয়ে তৈরি বড়ো ধরনের এই ঘটিটি দুটি অংশে জোড় দিয়ে নির্মাণ করা হত।

৯. *জগন্নাথ ঘটি*—বালেশ্বর, কটক ও পুরীতে পিতল ও ভরনে তৈরি এই ঘটির অনুকরণে মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণায় তৈরি হত। এ ঘটির গায়ে থাকত ফুল লতা পাতার নকশি অলংকরণ।

১০. *রামচন্দ্রপুর ঘটি*—এটি সাধারণত পূর্ববাংলার রামচন্দ্রপুরে ভরনে তৈরি হত। কলকাতার কালীঘাটেও পাওয়া যেত রামচন্দ্রপুর ঘটি।

১১. *বিলাতি চম্বু*—দক্ষিণ ভারতের ঘটির অনুকরণে পিতল ও ভরনে তৈরি হত।

১২. *ঢালা চম্বু*—পিতল ঢালাই করে তৈরি হত হুগলির বালি-দেওয়ানগঞ্জে (থানা : গোঘাট) এবং ছোটো আকারের ঢালা চম্বু জলপানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত।

১৩. *চাদর মথুরি*—পূর্বে উল্লিখিত পেটা মথুরি ঘটির মতো এটিও তৈরি হত পিতল চাদর দিয়ে কলকাতার সিমলায়।

১৪. *সাদুল্লাপুর ঘটি*—মালদহ জেলার কুতুবপুরে তৈরি এই ঘটিকে সাদুল্লাপুর ঘটি নামে অভিহিত করা হত।

১৫. *ফেরো ঘটি :* তৈরি হত শান্তিপুরে।

১৬. *বলরামী ঘটি :* নির্মাণস্থল ছিল বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) এবং লালবাজার (বাঁকুড়া)।

১৭. *মুঙ্গেরি ঘটি :* তৈরি হত বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)।

১৮. *বিজাপুরি ঘটি :* এটিরও নির্মাণস্থল ছিল বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)।

১৯. *পাটনাই লোটা :* তৈরি হত বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে।

২০. *নেপালি ঘটি :* নির্মাণস্থল বাঁকুড়ার লালবাজার।

২১. *হাম্বু কাশীয়ালা :* বাঁকুড়ার লালবাজারে তৈরি হত।

২২. *বিলাসপুরি ঘটি :* নির্মাণস্থল বাঁকুড়ার লালবাজার।

২৩. *মৌচিয়া ঘটি :* নির্মিত হত বাঁকুড়ার লালবাজারে।

২৪. *শ্যামসাই ঘটি :* তৈরি হত ঘুরিয়া-গড়বেতায় (জেলা : মেদিনীপুর)।

সুতরাং বাংলায় ঘটি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বাংলার বাইরে অন্যত্র প্রচলিত ঘটির অনুকরণে এখানেও প্রস্তুত হচ্ছে, চাদরের মথুরি, বিলাতি চম্বু, জগন্নাথ ঘটি, পেটা মথুরি, বলরামী, মুঙ্গেরি, বিজাপুরি, ঢালা মির্জাপুর প্রভৃতি ঘটি। এছাড়া কলকাতার কাঁসা-পিতলের দ্রব্যের বাজারে আসত বিভিন্ন নামের ঘটি। মির্জাপুর থেকে আসত আক্কেল সরাই, কাশীয়াল ও কন্দলি ঘটি, মুঙ্গের থেকে মুঙ্গের ঘটি, উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে চিড়িয়াদার ও হাঁসগলা ঘটি, বেনারস থেকে কালীর ঘটি প্রভৃতি।

বিভিন্ন জেলার যেসব স্থানে পিতল ঢালাই ঘটি প্রস্তুত হত, সেগুলি হল :

জেলা : মেদিনীপুর

গম্ভীরনগর (থানা : ঘাটাল), কুশপাতা (থানা : ঘাটাল), ফতেবাড় (থানা : ডেবরা), লোয়াদা (থানা : ডেবরা), পাইকপাড়া (থানা : ডেবরা), আজুড়িয়া-কামালপুর (থানা : দাসপুর), সাহেবগঞ্জ (থানা : ঘাটাল), মহিষাদল (থানা : মহিষাদল), মীরগোদা-চন্দনপুর (থানা : এগরা)।

জেলা : হুগলি

শিয়াখালা (থানা : চণ্ডীতলা), চন্দননগর (থানা : চন্দননগর), বালি-দেওয়ানগঞ্জ, (থানা : গোঘাট)।

জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা

বসিরহাট (থানা : বসিরহাট), বাদুড়িয়া (থানা : বাদুড়িয়া), নাটাগড় (থানা : পানিহাটি)।

জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জয়নগর-মজিলপুর (থানা : জয়নগর)

জেলা : বর্ধমান

বেগুনকোলা (থানা : কেতুগ্রাম), এ স্থানে ভরন ঢালাই ঘটি প্রস্তুত হত; জাবুই (থানা : মেমারি); দিগনগর (থানা : আউশগ্রাম)

ঘড়া : পিতলের কলসিই হল ঘড়া এবং এটি তৈরি হত সাধারণত দু-ধরনের—পিতল চাদর ও ঢালাই থেকে। ঢালাই করে নির্মিত ঘড়াকে বলা হত 'ঢালা', যার দু-অংশ ঢালাইয়ের জন্য মধ্যস্থলে একটি জোড় দেওয়ার চিহ্ন থেকে যেত। অন্যদিকে পিতলের চাদর দিয়ে তৈরি ঘড়াতে দু-টি জোড়ের চিহ্ন থাকত, যার মধ্যে একটি মধ্যস্থলে ও অন্যটি গলার কাছে।

ঢালাই ঘড়া একসময়ে কলকাতায় চালান আসত পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার রাজনগর থেকে। পেটাই করে পিতল চাদরের ঘড়া তৈরি হত কলকাতার নতুনবাজার. হুগলির বাঁশবেড়িয়া, নদিয়ার শান্তিপুর এবং বর্ধমানের নানাস্থানে। মাটির ঘড়ার অনুকরণে আর এক ধরনের ঘড়া তৈরি করা হত নবদ্বীপে যাকে বলা হত মেটে ঘড়া। এছাড়া এখানে তৈরি হত লোহাজঙ্গ কলসি। অনুরূপ রাজশাহী জেলার বুধপাড়ায় (বাংলাদেশ) এই ধরনের এক ঘড়া প্রস্তুত করা হত।

নদিয়া জেলার শান্তিপুরে বিভিন্ন ধরন ও আকৃতির যেসব ঘড়া তৈরি হত, সেগুলির নাম হল :

১. জামুই ঘড়া, যার অপর নাম সর্বসুন্দরী ঘড়া।
২. রাজনগর ঘড়া।
৩. নদে ঠিলি ঘড়া (ছোটো আকৃতির ঘড়া)।
৪. কাকমারী ঘড়া।

হুগলির বালি-দেওয়ানগঞ্জে (থানা : গোঘাট) যেসব বিখ্যাত ঘড়া প্রস্তুত করা হত, সেগুলির নাম ছিল

১. সর্বসুন্দরী
২. সব কোঁদা
৩. গোটা কোঁদা
৪. কলতা কলসি

বাঁকুড়ার লালবাজারে তৈরি হত সবকোঁদা ও আধকোঁদা ঘড়া।

এছাড়া, সে সময়ে অন্য যেসব স্থানে ঘড়া প্রস্তুত করা হত সে কেন্দ্রগুলি হল :

জেলা : মেদিনীপুর

গম্ভীরনগর (থানা : ঘাটাল), তমলুক (থানা : তমলুক), খড়ার (থানা : ঘাটাল)।

জেলা : বাঁকুড়া

পাত্রসায়র (থানা : পাত্রসায়র)।

জেলা : বাঁকুড়া

বিষ্ণুপুর (থানা : বিষ্ণুপুর)।

জেলা : মালদহ

নবাবগঞ্জ (থানা : মালদহ)।

জেলা : নদিয়া

মাটিয়ারি (থানা : কালীগঞ্জ), ধর্মদহ (থানা : কৃষ্ণনগর), নবদ্বীপ (থানা : নবদ্বীপ)।

জেলা : হুগলি

বালি-দেওয়ানগঞ্জ (থানা : গোঘাট), কলাগাছিয়া (থানা : গোঘাট)।

জেলা : বর্ধমান

বনপাশ-কামারপাড়া (থানা : ভাতার)।

জেলা : বীরভূম

জয়দেব-কেঁদুলি (থানা : ইলামবাজার)।

জালা : এক সময়ে মাটির জালার অনুরূপ পিতলের পাত দিয়ে জালাও তৈরি করা হত। এগুলির প্রাপ্তিস্থান ছিল কলকাতার কাঁসারিপাড়া এবং কালীঘাট।

কেঁড়ে : একদা গ্রাম-বাংলায় দুধ বা তেল রাখার জন্য কালো রঙের যে বিশেষ ধরনের ভাঁড় তৈরি করা হত সেগুলোকেই বলা হত কেঁড়ে। মাটির কেঁড়ের আদলে পিতলের চাদর দিয়ে কেঁড়েও নির্মাণ করা হয়েছিল, যার নির্মাণক্ষেত্র ছিল কলকাতার কালীঘাট।

বদনা : বদনা পিতলের ইংরেজি 'এস' অক্ষরের মতো নল লাগানো গাড়ুর মতোই, তবে উপরের মুখটা বেশ বড়ো গোলাকার। পিতলের বদনা তৈরি হলেও তামার বদনার চল খুব বেশি, কারণ মুসলমান সম্প্রদায় এটিই বেশি ব্যবহার করে থাকেন। পিতলের তৈরি বদনার উল্লেখযোগ্য নির্মাণস্থল হল :

জেলা : মেদিনীপুর

পাইকপাড়া (থানা : ডেবরা), খাঞ্জাপুর (থানা : দাসপুর), কুশপাতা (থানা : ঘাটাল), হরিশপুর (থানা : ঘাটাল), কামালপুর-আজুড়িয়া (থানা : দাসপুর), ঘাটাল (থানা : ঘাটাল), পাঁচমাড়ো-প্রতাপপুর (থানা : ঘাটাল)।

গাড়ু : গাড়ু সাধারণত তৈরি হয় পিতল ঢালাই করে এবং এতে ছোটো মুখ যুক্ত সরু নল লাগানো থাকে। গাড়ু বিভিন্ন নামে ও আকারে যেসব স্থানে তৈরি হত তার তালিকা নিম্নরূপ :

১. *নেপালি গাড়ু*—সম্ভবত নেপালে তৈরি গাড়ুর অনুরূপ তৈরি হত বলেই এই নামকরণ এবং তৈরির কেন্দ্র ছিল হুগলি জেলার বালি-দেওয়ানগঞ্জ (থানা : গোঘাট)।

২. *হাঁসগলা গাড়ু*—হাঁসের গলার মতো আকার বলেই এর নামকরণ করা হয়েছে হাঁসগলা এবং এটিও হুগলির বালি-দেওয়ানগঞ্জে তৈরি হত।

৩. *জাঁতের গাড়ু*—এটি তৈরি হত হুগলি জেলার খানাকুলে।

৪. *কুসুরি গাড়ু*—এই গাড়ুটি হত ছোটো আকারে এবং নির্মাণস্থল ছিল হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়াতে।

৫. পারের গাড়ু—এ নামের গাড়ুও তৈরি হত বাঁশবেড়িয়াতে।

উল্লিখিত স্থান ছাড়াও আরও যেসব স্থানে গাড়ু নির্মিত হত, তার তালিকা হল :

জেলা : মেদিনীপুর

কুশপাতা (থানা : ঘাটাল), আজুড়িয়া-কামালপুর (থানা : দাসপুর), ঘাটাল (থানা : ঘাটাল)।

জেলা : নদিয়া

কৃষ্ণনগর (থানা : কৃষ্ণনগর)।

জেলা : বর্ধমান

জাবুই (থানা : মেমারি)।

জেলা : বাঁকুড়া

লালবাজার (থানা : বাঁকুড়া)।

জগ : বিলেতি 'জাগ'-এর অনুকরণে তৈরি হয় পিতলের জগ। একদা কলকাতার নতুনবাজার ও মুর্শিদাবাদের খাগড়া প্রভৃতি স্থানে নির্মিত হত। এছাড়া মেদিনীপুর জেলার ফতেবাড় (থানা : ডেবরা) কুশপাতা ও গম্ভীরনগর (থানা : ঘাটাল) গ্রামেও তৈরি হয়। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ জগই তৈরি করা হত মোটা চাদরের পাত থেকে।

ভৃঙ্গার : ফারসি 'আফতাব'-এর অনুকরণে পিতলের পাত থেকে তৈরি করা হয়। এসব ভৃঙ্গারের নির্মাণস্থল হল, মেদিনীপুর জেলার গম্ভীরনগর ও কুশপাতা (থানা : ঘাটাল), মনোহরপুর-হরিশপুর (থানা : ঘাটাল), আজুড়িয়া-কামালপুর (থানা : দাসপুর), পাঁচমাড়ো-প্রতাপপুর (থানা : ঘাটাল)।

বালতি : সাধারণত পিতলের পেটাই চাদর থেকে তৈরি করা হত পিতলের বালতি। এসব বালতি তৈরির কেন্দ্র ছিল কলকাতার কালীঘাট, নদিয়া জেলার মাটিয়ারি এবং হুগলি জেলার ধনিয়াখালি প্রভৃতি স্থান।

ঙ. রান্নার বাসনকোসন

ডেকচি : সাধারণত তামার পাতের ঠোকাই কাজ দ্বারা এটি তৈরি করা হত এবং মুসলমানদের ভোজ রান্নার কাজে এগুলি ব্যবহৃত হত। নির্মাণকেন্দ্র নতুনবাজার (কলকাতা), কালীঘাট (কলকাতা)।

হাঁড়ি : এটি তৈরি হত পিতলের পেটাই চাদর থেকে। হাঁড়ি তৈরির নির্মাণকেন্দ্র ছিল : কালীঘাট (কলকাতা), ধনিয়াখালি (হুগলি), দাঁইহাট (বর্ধমান), মাটিয়ারি (কালীগঞ্জ নদিয়া), রামজীবনপুর (চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর), বাঁশবেড়িয়া (হুগলি), আজুড়িয়া-কামালপুর (মেদিনীপুর), বাঁশগোড়া (থানা : খেজুরি, মেদিনীপুর), জয়দেব-কেঁদুলি (ইলামবাজার, বীরভূম), সাহাগঞ্জ (হুগলি), এছাড়া নদিয়া জেলার শান্তিপুরে তৈরি হত 'আমসির হাঁড়ি', 'ঢাকাই হাঁড়ি' ও 'বাঁটসুই হাঁড়ি' নামের বিভিন্ন প্রকার হাঁড়ি। কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে তৈরি হত ওসিক হাঁড়ি, ঢাকা হাঁড়ি ও বাংলা হাঁড়ি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বীরভূমের রাজনগরে তৈরি পিতলের হাঁড়িই সেসময় ছিল বহুল ব্যবহৃত। কলকাতার সিমলা ও কাঁসারিপাড়ায় তৈরি হত তামার পাতের হাঁড়ি।

তিজেল : মাটির তিজেল হাঁড়ির অনুকরণে পিতলের পাত দিয়ে তৈরি তিজেল হাঁড়ি —যার প্রাপ্তিস্থান ছিল কলকাতার কালীঘাট ও নতুনবাজার।

গোল খোলা : মাটির খোলার মতোই রান্নার কাজে ব্যবহৃত গোলাকার ধরনের পাত্র এবং এটির নির্মাণস্থল ছিল বর্ধমান জেলার দাঁইহাট।

ভরনখোলা বা বোকনো : এটিও পিতলের পাতে তৈরি হাঁড়ির অনুরূপ। নির্মাণ কেন্দ্র : কলকাতার কালীঘাট ও নতুনবাজার, হুগলি জেলার সাহাগঞ্জ এবং বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়র।

সরা : মাটির সরার মতোই একদা পিতলের সরা ঘর-গৃহস্থালিতে শোভা পেত। এগুলি তৈরি হত কলকাতার কালীঘাট ও নতুনবাজার, হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ও বাঁশবেড়িয়ায় (থানা : মগরা)।

দুধ ঢাকা ও দুধ ছাকনা : দুধ ঢাকা দেবার উদ্দেশ্যে নির্মিত পিতলের পাত্র এবং পিতলের দুধ ছাকুনি। তৈরি হত কলকাতার কালীঘাটে।

কড়াই : লোহার কড়াইয়ের মতো পিতলের কড়াইও এক সময়ে নির্মিত হত এবং প্রস্তুত স্থান ছিল, কলকাতার কালীঘাট ও হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া (থানা : মগরা)।

খুলি : মাটির খুলির অনুকরণে একদা তৈরি করা হত। প্রাপ্তিস্থান কলকাতার কালীঘাট।

খুন্তি : লোহার খুন্তির মতো পিতলের খুন্তিও নির্মিত হত, উৎপাদন কেন্দ্র কলকাতার কালীঘাট।

হাতা : লোহার হাতার মতোই পিতলের হাতা তৈরির কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতার কালীঘাট ও নতুনবাজার এবং নদিয়া জেলার নবদ্বীপ।

ডাবু : বড় ধরনের পিতলের হাতা—নির্মাণস্থল কালীঘাট ও নতুনবাজার (কলকাতা)।

চামচে:: বিলেতি ধরনের চামচে, যা তৈরি হত কলকাতার কালীঘাটে।

গামলা : পিতলের পেটাই চাদরে নানা আকারের তৈরি করা হত এবং পেটাই চাদর ছাড়া ঢালাই করেও নির্মিত হত। কলকাতার সিমলা, নতুনবাজার ও কালীঘাট ছাড়াও ধনিয়াখালিতেও (জেলা : হুগলি) নির্মিত হত। উল্লেখ্য যে, একসময়ে কলকাতায় কালীঘাটে

'এলোকেশী' এবং কাদাচারি বা বৃন্দাবনী নামে গামলারও নামকরণ করা হয়েছিল।
বেড়ি : লোহার অনুকরণে তৈরি হত কলকাতার কালীঘাটে।
ছান্তা : লোহার ছান্‌তার মতোই পিতলের চাদর দিয়ে তৈরি হত কলকাতার কালীঘাটে।
ধুচুনি : চাল ধোয়া বাঁশের ধুচুনির মতো পিতলের পাত দিয়ে তৈরি হত এই ধুচুনি, যার প্রাপ্তিস্থান ছিল কলকাতার কালীঘাট, বর্ধমান জেলার জাবুই (থানা : মেমারি)।
কুলো : বাঁশের কুলোর অনুকরণে কালীঘাটের কারিগররা তৈরি করেছিলেন পিতল চাদর দিয়ে কুলো।
চুবড়ি : এটিও বাঁশের অনুকরণে তৈরি হত কলকাতার কালীঘাটে।
চালুনি : বাঁশের চালুনির অনুকরণে তৈরি করা হত কলকাতার কালীঘাটে।
ডালকাঁড়া : কাঠের ডালকাঁড়ার অনুকরণে পিতলের ডালকাঁড়া তৈরি হত কলকাতার কালীঘাটে।
চোঙা : উনুন ধরাবার উদ্দেশ্যে বাঁশের চোঙার অনুকরণে পিতলের নলাকার চোঙাও তৈরি করতেন কলকাতার কালীঘাটের কারিগররা।
চাকি : কাঠের চাকির অনুকরণে পিতল ঢালাই চাকি প্রস্তুত করা হত কালীঘাটে।
বেলুন : চাকির সঙ্গে বেলুনও তৈরি হত কালীঘাটে।
হামানদিস্তা : লোহার মতো পিতল ঢালাই হামানদিস্তাও একসময়ে প্রস্তুত করেছিলেন কালীঘাটের এবং বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের কারিগররা।

চ. অন্যান্য ঘর-গৃহস্থালি দ্রব্যাদি

পিলসুজ : একটি দণ্ডের উপর সংস্থাপিত প্রদীপই হল পিলসুজ। অনেক সময় সেটির উপর মাটির বা পিতলের প্রদীপও আলাদাভাবে বসানো হয়। তৈরি হত ঢালাই পিতলে এবং আকৃতি অনুযায়ী নানান তার নামকরণ। যথা :

১. বাবু পিলসুজ
২. চারটি পায়াযুক্ত চৌপায়া পিলসুজ
৩. গোল পিলসুজ
৪. পদ্মপায়া পিলসুজ, যার নিচে থাকত পদ্মাকৃতি পায়া
৫. শ্যামাদান পিলসুজ
৬. পরী পিলসুজ, যার দণ্ডটি ছিল এক পরীর আকৃতিযুক্ত।

পিলসুজ তৈরি হত, মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা, গম্ভীরনগর ও কুশপাতা, (থানা : মহিষাদল, ঘাটাল); নদিয়া জেলার শান্তিপুর ও রাণাঘাট; বর্ধমান জেলার দাঁইহাটে এবং বাঁকুড়ার পাত্রসায়রে।
পিতলের লম্ফ (ল্যাম্প) : এটি তৈরি হত বর্ধমান জেলার দাঁইহাট ও বেগুনকোলায় (থানা : কেতুগ্রাম) এবং মেদিনীপুরের কুশপাতা (থানা : ঘাটাল) ও গম্ভীরনগর।
প্রদীপ : মাটির অনুকরণে তৈরি হত, কলকাতার কালীঘাটে, বর্ধমানের দাঁইহাটে এবং মেদিনীপুর জেলার প্রতাপপুরে (থানা : পাঁশকুড়া)। ঢালাই ও পিতলের পাতে তৈরি

দু'ধরনের পাওয়া যেত। এছাড়া, নদিয়ার নবদ্বীপে যে একধরনের প্রদীপ পাওয়া যেত, তার তলায় এক কুঠরিতে জল রাখার ব্যবস্থা ছিল, যাতে তেল গরম না হয়ে কম খরচ হত।

চিলামচি : মুখ-হাত ধোওয়ার উদ্দেশ্যে গোলাকার পিতলের পাত্র। নির্মাণস্থল, কলকাতার কালীঘাট ও কাঁসারিপাড়া।

পিকদান : ছোটো ঘটির আকার পাত্রের উপর চওড়া বাড় দেওয়া পিকদান, যা তৈরি হত কলকাতার কালীঘাট ও নতুনবাজারে।

বাক্স : পিতলের বাক্স; কলকাতার কালীঘাটে তৈরি হলেও বেনারস থেকে আমদানি করা হত।

পিতলের তালা : নির্মাণস্থল কলকাতার কাশীপুর।

ছ. পূজার্চনার নানাবিধ পাত্রাদি

কোষা : তামার পাতে তৈরি এবং দেখতে মোচা খোলের আকৃতি। এছাড়া, কোষার দু-টি ধরনও দেখতে পাওয়া যায়, যার মধ্যে ভারী ধরনেরটিকে বলা হত 'অর্ঘ্য' এবং হালকাগুলিকে 'মাজা' নামে অভিহিত করা হত। নির্মাণস্থল ছিল, কলকাতার কালীঘাট, সিমলা ও কাঁসারি পাড়া; নদিয়া জেলার শান্তিপুর ও নবদ্বীপ; বর্ধমান জেলার দাঁইহাট এবং হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া এবং কলকাতার বামনদাস মুখার্জি রোড।

কুষি—এটিও হয় কোষার মতো তবে ক্ষুদ্রাকৃতি। প্রাপ্তিস্থান উপরি-বর্ণিত স্থানের মতোই।

তাম্রকুণ্ড : বাড় উঁচু গোলাকার তামার পাত্র। সাধারণত এই তাম্রকুণ্ডে দেব-দেবীকে স্নান করানো হয়। নির্মাণস্থল ছিল, কলকাতার কাঁসারিপাড়া, সিমলা ও কালীঘাট; বর্ধমানের দাঁইহাট ও হুগলির বাঁশবেড়িয়া।

টাট : তামার তৈরি ফলক, যার উপর দেবতাকে স্নানের পর বসানো হয়। এটি তৈরি হত কলকাতার সিমলা, কাঁসারিপাড়া ও কালীঘাট; এবং নদিয়া জেলার শান্তিপুর ও নবদ্বীপ।

পুষ্পপাত্র : ফুল রাখার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গোলাকার তাম্রপাত্র এবং এটির বাড় ও মধ্যস্থলে ফুল লতাপাতার অলংকরণ থাকে। একসময়ে তৈরি হত নদিয়া জেলার নবদ্বীপ ও শান্তিপুর; বর্ধমান জেলার দাঁইহাট; হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া; কলকাতার কাঁসারিপাড়া, সিমলা ও কালীঘাটে। বর্তমানে তামা ও পিতলে তৈরি হয় নদিয়া জেলার মাটিয়ারিতে (থানা : কালীগঞ্জ)।

পাওলি : জলপানের পাত্র হিসাবে পাওলির ব্যবহার হলেও, পূজার্চনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তামার তৈরি ছোটো একপ্রকার ঘটি। বিশেষভাবে এটি একদা নদিয়া জেলার নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে নির্মিত হত।

তামার ঘড়া : পুজোর গঙ্গাজল রাখার জন্য ব্যবহৃত হত এই তামার ঘড়া। তৈরি হত নদিয়া জেলার শান্তিপুর এবং কলকাতার সিমলা, কাঁসারিপাড়া, বামনদাস মুখার্জি রোড ও কালীঘাটে।

চরণামৃত পাত্র : এটি ছিল আমের মতো ফাঁপা আকৃতির, যাতে ভক্তরা চরণামৃত নিয়ে আসতেন। প্রাপ্তিস্থান ছিল কলকাতার কালীঘাট।

শঙ্খ : তামা দিয়ে তৈরি শঙ্খ, অবশ্য বাজানোর উদ্দেশ্যে নয়—পূজার্চনার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। তৈরি হত কলকাতার কালীঘাটে।

বাটি : এ বাটি তৈরি হত তামার পাত দিয়ে—যাতে পুজোর উপকরণ রাখা হত এবং সবচেয়ে ছোটো বাটি তৈরি হত চন্দন রাখার জন্য, যেজন্য তার নাম হয়েছিল চন্দন বাটি। অন্যদিকে মুসলমানরা তামার বাটিকে বলে থাকেন কটোরা। এ বাটির নির্মাণস্থল ছিল, নদিয়ার নবদ্বীপ এবং বর্ধমানের বেগুনকোলায় (থানা : কেতুগ্রাম)। তৈরি হত ঢালাই ভরনের চন্দন বাটি।

সিংহাসন : তিনদিকে পিতলের পাতের উপর জালিকাজ করা এবং তার সঙ্গে থাকত পাখি সহ লতাপাতার নকশা। নদিয়ার শান্তিপুর ও নবদ্বীপে সিংহাসন তৈরি হলেও বেনারস থেকে আমদানি সিংহাসনেই বাজার ছেয়ে ছিল। শান্তিপুরে এক ধরনের যে সিংহাসন তৈরি হত, তা ছিল সিংহের পিঠের উপর স্থাপিত এক পদ্ম, যার উপরে দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা হত।

গরুড়াসন : এটি তৈরি হত ঢালাই পিতলের এবং এক গরুড় মূর্তির মস্তকে একটি পদ্ম পুষ্পাকৃতি স্থানে শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত করা হত। এগুলির নির্মাণস্থল ছিল, বর্ধমানের দাঁইহাট (থানা : কাটোয়া) এবং নদিয়া জেলার শান্তিপুর।

পদ্মাসন : একটি খাড়াভাবে স্থাপিত বৃন্তের উপর সংযোজিত পদ্মাকার আসন, যার উপর দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। উল্লেখযোগ্য নির্মাণস্থল, নদিয়া জেলার শান্তিপুর।

বৃষাসন : ক্ষুদ্র এক বৃষের উপর স্থাপিত গোল পদ্মাকার আসন, যার উপরে ক্ষুদ্রাকার শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হয়। প্রাপ্তিস্থান নদিয়া জেলার শান্তিপুর।

ছ-পায়া : পিতল নির্মিত এর ছটি পায়ার উপর ময়ূর বা ফুল লতাপাতার নকশি অলংকরণ থাকত এবং উপরের দিকে সংস্থাপিত হত গোলাকার পদ্ম আকৃতির আসন যার উপর বসানো হত টাট। এগুলি তৈরি হত নদিয়া জেলার রাণাঘাট ও শান্তিপুর এবং বর্ধমান জেলার দাঁইহাটে।

তে-পায়া : উপরি বর্ণিত ছ-পায়ার মতোই অলংকরণযুক্ত তেপায়া, যা তৈরি হত পিতলের এবং প্রাপ্তিস্থান ছ-পায়ার নির্মাণস্থলের মতোই।

ত্রিপদী : এটি তিন পায়া যুক্ত হলেও উপরের দিকে ত্রিভুজাকৃতি পিতল ঢালাই এবং পূজার্চনার শাঁখ রাখার জন্যই ব্যবহৃত হত। অনেক সময় ওই তিন পায়ের গায়ে পেঁচানো সাপের অলংকরণ থাকত। তৈরি হত নদিয়া জেলার শান্তিপুরে।

গেলাস : ব্রোঞ্জ ও পিতলের তৈরি এই গেলাসের গায়ে থাকত নানাবিধ নকশি অলংকরণ। নদিয়ার শান্তিপুর ও নবদ্বীপে তৈরি হলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেনারস থেকে আমদানি করা হত।

পঞ্চপ্রদীপ : পাঁচটি ক্ষুদ্রাকার প্রদীপ হাতে ধরা মূর্তি যার গায়ে আবার হাতল লাগানো থাকত এবং তৈরি হত ঢালাই পিতলে। নির্মাণস্থল ছিল নদিয়া জেলার শান্তিপুর,

মুড়াগাছা, মেটেরি ও দেবগ্রাম।

একদীপ : একটি প্রদীপ হাতে ধরা পিতল ঢালাই নারীমূর্তি, যা তৈরি হত নদিয়া জেলার শান্তিপুরে।

ধুনুচি : মাটির ধুনুচির অনুকরণে তৈরি হত কলকাতার কালীঘাট, নদিয়া জেলার রাণাঘাট এবং বর্ধমান জেলার দাঁইহাটে।

কর্পূরদানি : পিতল ঢালাই হাতলযুক্ত ক্ষুদ্রাকার বাটি, যার উপর কর্পূর জ্বালিয়ে দেবারতি করা হত। নির্মাণস্থল, নদিয়া জেলার শান্তিপুর।

ধূপদানি : ধূপ জ্বালাবার পাত্র, যা তৈরি হত নদিয়া জেলার রাণাঘাটে।

কমণ্ডলু : তামা ও পিতলের তৈরি হয়—কখনো বা অর্ধেক তামা ও অর্ধেক পিতল দিয়ে গড়া হয়। এটির তলায় থাকে খুরো এবং উপরে হাতল ও পাশে ইংরেজি 'এস' অক্ষরের মতো নল লাগানো হয়। নির্মাণস্থল, নদিয়া জেলার শান্তিপুর ও বাঙ্গালঝি (থানা : চাপড়া)।

সাজি : বাঁশের ফুলের সাজির মতোই হাতলযুক্ত পিতলের পাতে তৈরি হত। কলকাতার কাঁসারিপাড়ায় তৈরি হলেও, বেনারস থেকে আমদানি করা হত বিভিন্ন নকশি জালির সজ্জাযুক্ত সাজি। হাতলের দুপাশে থাকত চন্দনের বাটি।

পঞ্চপাত্র : লম্বাকৃতি তামার ঘড়ার অনুরূপ, যার গায়ে অলংকৃত হত নানাবিধ ফুল লতা-পাতার নকশা এবং সঙ্গে একটি চামচও দেওয়া হত। বিশেষ করে এটি বেনারস থেকে আমদানি করা হত।

জ. গীতবাদ্যের যন্ত্রাদি

করতাল : পিতল কাঁসায় তৈরি হয়, যার প্রাপ্তিস্থান নদিয়া জেলার নবদ্বীপ ও কলকাতার কালীঘাটে।

খঞ্জনি : কাঁসার তৈরি ছোটো আকারের করতাল। প্রাপ্তিস্থান, নদিয়া জেলার নবদ্বীপ।

মন্দিরা : গোল পলতোলা ক্ষুদ্রাকৃতি কাঁসার তৈরি এবং এটি তৈরি হত কলকাতার নতুনবাজার ও কালীঘাট এবং নদিয়া জেলার নবদ্বীপে।

শিঙ্গা : সম্পূর্ণ তামার পাতের তৈরি ইংরেজি 'এস' অক্ষরের মতো। ফুঁ দিয়ে বাজানো এই বাদ্যযন্ত্রটিকে বলা হত 'রামশিঙ্গা'। একমাত্র নির্মাণস্থল ছিল মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা। এখনো স্থানীয় হরিনাম দলে খোল-করতালের সঙ্গে শিঙ্গা বাদ্যটির স্থান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, রামশিঙ্গার মতো চন্দ্রকোণায় ফুঁ দিয়ে বাজানো শুষির পর্যায়ের তামার তৈরি আরও যে কয়েকটি রণশিঙ্গা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র একদা তৈরি হত, সেগুলির নামকরণ ছিল তুরি, ভেরী ও নাগফণী।

ডুগডুগি : পিতলের বাদ্যযন্ত্র, সাধারণত ভিক্ষাব্রত সন্ন্যাসী এটি ব্যবহার করে থাকেন। একদা তৈরি হত কলকাতার সিমলায়।

ঘুঙুর : নৃত্যে ব্যবহৃত হয়, কাঁসার তৈরি। একদা নির্মাণস্থান ছিল হুগলি জেলার ঘোলশাড়া (থানা : আরামবাগ)।

ঘণ্টা : ঘণ্টা নির্মিত হত পিতল বা ব্রোঞ্জে। ঘণ্টারও আবার আকার ভেদ ছিল, যথা :

১. *পূজার্চনার ঘণ্টা*—এ ঘণ্টায় হাতল লাগানো থাকত এবং হাতলের উপর দিকে থাকত গরুড়ের মূর্তি, নয়তো বা উদ্যত সর্প ফণার নীচে এক বা একাধিক তপস্যারত মুনির মূর্তি। এ ঘণ্টা তৈরি হত নদিয়ার নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও রাণাঘাটে।

২. *ঝোলানো ভারী ধরনের ঘণ্টা*—এগুলি তৈরি হত মেদিনীপুরের খড়ার (থানা : ঘাটাল)।

৩. *গরুর গলায় ঝোলানো ঘণ্টা*—প্রাপ্তিস্থান কলকাতার কালীঘাট।

কাঁসর : চারপাশে বাড় তোলা গোলাকার থালার সদৃশ, তবে একমাত্র খাঁটি কাঁসাতেই নির্মিত হয়। সেজন্য কাঁসরের গায়ে কালো রঙের ছোপ দেখা যায়—যা পরিষ্কার করা হয় না। অনেক সময় কাঁসরের মধ্যভাগে কিছু নকশি অলংকরণ দেখা যায়। কাঁসর তৈরির স্থান, নদিয়া জেলার নবদ্বীপ ও রাণাঘাট।

কাঁসি : কাঁসার তৈরি ছোটো আকৃতির কাঁসর। ঢাকির সঙ্গে থাকে কাঁসি বাজনদার, যা নিয়ে একটি ছড়া প্রচলিত :

'ভাত খাই, কাঁসি বাজাই, রগড়ের ধার ধারি না।'

এই বাদ্যযন্ত্রটি তৈরি হয় নদিয়ার নবদ্বীপ ও রাণাঘাটে।

পেটাঘড়ি : বাড় না দেওয়া কাঁসার তৈরি গোলাকার পুরু ধরনের পেটা ঘড়ি, যা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে বাজাতে হয়। সেজন্য উপরের দিকে দড়ি ঝোলাবার জন্য ছিদ্র রাখা হয়। পেটা ঘড়ি নির্মাণের স্থান কলকাতার কাঁসারিপাড়া ও নদিয়া জেলার নবদ্বীপ ও রাণাঘাট।

ঝ. কাঁসা-পিতলের ছোটো-বড়ো মূর্তি

কলকাতার কালীঘাট, নতুনবাজার ও উল্টোডাঙায় এক সময় পিতল ঢালাই করে নির্মিত হত ছোটো-বড়ো নানান দেবদেবীর মূর্তি। এখনো নবদ্বীপে কিছু কিছু ক্ষুদ্রাকার মূর্তি নির্মিত হয়। একদা বিভিন্ন স্থানের কাঁসা-পিতল শিল্পীরা পিতল ঢালাই করে যেসব মূর্তি নির্মাণ করতেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, নাড়ুগোপাল, কৃষ্ণরাধা, কালী, দুর্গা, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্তিক প্রভৃতি। বহু স্থানে প্রায় দশ কেজি ওজনের কৃষ্ণ বা রাধা মূর্তি নির্মিত হতে দেখা গেছে। নদিয়ার শান্তিপুরের ঢালা পিতলের বিরাটাকার হরগৌরীর মূর্তিটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এক কারুকৃতি। এছাড়া, মেদিনীপুর জেলার বেলডাঙ্গায় (থানা : দাসপুর) মদনমোহন মন্দিরে পূজিত জগদ্ধাত্রীর পিতল নির্মিত মূর্তিটিও ধাতুশিল্পের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মূর্তিটি দাসপুর থানার আজুড়িয়া গ্রামের দেবীদাস কর্মকার যে নির্মাণ করেছিলেন সে বিষয়ে মূর্তির পাদদেশে লিপি প্রমাণ বিদ্যমান।

পিতল-কাঁসায় বিভিন্ন দেবদেবীর ঢালাই মূর্তি নির্মাণ ছাড়া এক সময়ে বিভিন্ন দেবদেবীর অষ্টধাতুর মূর্তিও নির্মাণ করা হত। অষ্টধাতুর মধ্যে যে আটটি ধাতুর সংমিশ্রণ করা হত সেগুলি হল, সোনা, রূপা, তামা, রাঙ, দস্তা, সিসা, লোহা ও পারদ। নামে অষ্টধাতু হলেও পিতল ধাতুর মিশ্রণই থাকত বেশি পরিমাণে। নবদ্বীপে পূজিত

'সোনার গৌরাঙ্গ' মূর্তিটি নামে সোনার হলেও আসলে সেটিও অষ্টধাতুর মূর্তি। সে মূর্তিটি ঢালাই করেন শতাধিক বৎসর পূর্বে শান্তিপুরের ব্রজলাল দাস নামে জনৈক কৃতী কাঁসারি শিল্পী। অনুরূপ, কলকাতায় ৫৭ বেনেটোলা স্ট্রিট-এ নবদ্বীপের নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরে (১১৮৭ বঙ্গাব্দ) স্থাপিত গৌর-নিতাই-এর মূর্তি দু-টিও সোনা দিয়ে তৈরি বলে প্রতিষ্ঠাতা পরিবার দাবি করে থাকেন। সে মন্দিরে প্রবেশপথে উৎকীর্ণ দু-লাইন লিপির পাঠ নিম্নরূপ :

শ্রী শ্রী সোনার গৌরাঙ্গ—নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শ্রী শ্রী নবমন্দির / প্রভুবর শ্রী নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যারত্ন পণ্ডিতপ্রবর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

ঞ. মাদুলি-তাবিজ-আংটি

রোগমুক্তির জন্য লৌকিক তুকতাকে বিশ্বাসী গ্রামের মানুষজন মাদুলি-তাবিজ-এর উপর আস্থা রাখার কারণে ধর্মীয় পুরোহিত বা গুনিন-ওঝা সম্প্রদায় যে মাদুলি-তাবিজ ধারণের বিধান দিতেন, সেই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হত সোনা, রূপা, তামা, পিতল ও লোহার মাদুলি। কলকাতার বামনদাস মুখার্জি রোডে তৈরি হয় মাদুলি-কবচ, তামা-পিতলের মাদুলির উৎপাদনস্থল হল, নদিয়া জেলার তিলিপাড়া ও রামনগর, সে এলাকার কারিগররা পাতলা তামার বা পিতলের পাত আকারমতো কেটে নিয়ে প্রার্থিত গোল বা চৌকো আকারের মাদুলি-তাবিজ তৈরি করে বিশেষ কায়দায় ঝালাই করে আংটা লাগিয়ে দিত। এরপর তৈরি করা মাদুলিগুলিকে দেশি প্রথায় পরিষ্কার করে সম্পূর্ণ রূপ দিত। উল্লেখ্য যে, মাদুলি হয় গোলাকার, কিন্তু তাবিজ হয় চৌকো আকারের।

মাদুলি বা তাবিজ ধারণের মতো তামার আংটিও সংস্কারবশত একই উদ্দেশ্যে গ্রাম-সমাজে ব্যবহৃত হত। এইসব তামার তারের আংটির প্রকারভেদ নিয়ে ড. পূর্ণেন্দুনাথ নাথ লিখেছেন যে, "...আংটি মোটামুটি তিন প্রকারের হয়। খোঁপা আংটি, টালি আংটি ও কর আংটি। তামার তারকে আড়াই প্যাঁচ দিয়ে গোলাকৃতি করা হয়। তার উপর তামার তার পেঁচিয়ে খোঁপার মতো করে লাগানো হয়। তাই এর নাম 'খোঁপা আংটি'। অপরদিকে আংটির উপর দিকে টালির মতো চৌকো তামা লাগানো আংটিকে 'টালি আংটি' বলে। এই টালিটি শিল্ড বা অন্য আকারেরও হয়। এর উপর অনেকসময়েই মিনে করা থাকে। তাই একে আবার 'মিনে' আংটিও বলে। আর 'কর' আংটি সাধারণ একটি বেড় আকারের হয়। তাই অনেক সময় 'বেড় আংটি'-ও বলা হয়। কর আংটি বা বেড় আংটি সাধারণত মাদুলি তাবিজের অনুরূপ কারণে ধারণ করলেও অপর দুই প্রকার আংটি নিছক শখের কারণে পরা হয়।" তামার মাদুলি-কবচ ও আংটি বিষয়ক এই শিল্পটি শান্তিপুরের এক বিশিষ্ট শিল্পকর্ম।

ট. অবিভক্ত বাংলার উল্লেখ্য পিতল-কাঁসার দ্রব্য নির্মাণের বর্ণানুক্রমিক স্থানসমূহ

[* চিহ্নিতগুলি বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত]

আজুড়িয়া, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : দাসপুর

আরাপুর, জেলা : মালদহ, থানা : ইংলিশবাজার
*আবদুল্লাপুর, জেলা : ঢাকা, বাংলাদেশ
ইংলিশবাজার, জেলা : মালদহ, থানা : ইংলিশবাজার
*ইসলামপুর, জেলা : ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ
উল্টোডাঙা, কলকাতা

কবিলাসপুর, জেলা : বীরভূম, থানা : রাজনগর
করমপুর, জেলা : বর্ধমান, থানা : মন্তেশ্বর
কলাগাছিয়া, জেলা : হুগলি, থানা : গোঘাট
কলাগাছিয়া, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : দাসপুর
কল্যাণপুর, জেলা : হাওড়া, থানা : বাগনান
কাঁদি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, থানা : কাঁদি
কাঁসারিপাড়া, কলকাতা
কাঁসারিপাড়া, জেলা : মালদহ, থানা : মালদহ
*কাগমারি, জেলা : ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ
কাঞ্চননগর, জেলা : বর্ধমান, থানা : বর্ধমান
কামালপুর, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : দাসপুর
কালনা, জেলা : বর্ধমান, থানা : কালনা
কালীগঞ্জ, জেলা : মালদহ, থানা : খড়বা
কালীঘাট, কলকাতা
কাশীপুর, কলকাতা
কুতুবপুর, জেলা : মালদহ, থানা : মালদহ
কুশপাতা, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : ঘাটাল
*কুষ্টিয়া, জেলা : কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ
কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া, থানা : কৃষ্ণনগর
*কেশবপুর, জেলা : যশোহর, বাংলাদেশ
কৈতাড়া, জেলা : বর্ধমান, থানা : গলসি
ক্ষীরপাই, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : চন্দ্রকোণা

খড়ার, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : ঘাটাল
খন্যান, জেলা : হুগলি, থানা : পাণ্ডুয়া
খাগড়াবাজার, জেলা : মুর্শিদাবাদ, থানা : বহরমপুর
খানাকুল, জেলা : হুগলি, থানা : খানাকুল
খামারপাড়া, জেলা : হুগলি, থানা : চুঁচুড়া
খাঞ্জাপুর, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : দাসপুর

গম্ভীরনগর, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : ঘাটাল
গোদারডিহি, জেলা : বাঁকুড়া, থানা : বড়জোড়া

ঘাটাল, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : ঘাটাল
ঘুরিয়া-গড়বেতা, জেলা : মেদিনীপুর
ঘোলমাড়া, জেলা : হুগলি, থানা : আরামবাগ

চন্দননগর, জেলা : হুগলি, থানা : চন্দননগর
চন্দনবাটি, জেলা : বর্ধমান, থানা : ভাতার
চন্দ্রকোণা, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : চন্দ্রকোণা
*চিলমারি, জেলা : রঙপুর, বাংলাদেশ
চুপি, জেলা : বর্ধমান, থানা : পূর্বস্থলী

জয়নগর-মজিলপুর, জেলা : দঃ ২৪ পরগনা, থানা : জয়নগর
জয়দেব-কেঁদুলি, জেলা : বীরভূম, থানা : ইলামবাজার
জাঙ্গিপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, থানা : রঘুনাথগঞ্জ
জাবুই, জেলা : বর্ধমান, থানা : মেমারি

টাকি, জেলা : উঃ ২৪ পরগনা, থানা : বসিরহাট
টিকরবেতা, জেলা : বীরভূম, থানা : ইলামবাজার

তমলুক, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : তমলুক

দাঁইহাট, জেলা : বর্ধমান, থানা : কাটোয়া
দিগনগর, জেলা : বর্ধমান, থানা : আউসগ্রাম
*দীঘালি, জেলা : ঢাকা, বাংলাদেশ
দুবরাজপুর, জেলা বীরভূম, থানা : দুবরাজপুর
দেওয়ানগঞ্জ, জেলা : হুগলি, থানা : গোঘাট
দেবগ্রাম, জেলা : নদিয়া, থানা : কালীগঞ্জ
দোগাছি, জেলা : নদিয়া, থানা : কৃষ্ণনগর
*দৌলতগঞ্জ, জেলা : কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

ধনিয়াখালি, জেলা : হুগলি, থানা : ধনিয়াখালি
ধর্মদহ, জেলা : নদিয়া, থানা : কৃষ্ণনগর
*ধানকুড়িয়া, জেলা : ঢাকা, বাংলাদেশ
*ধামরাই, জেলা : ঢাকা, বাংলাদেশ

নতুনবাজার, কলকাতা
নতুনবাজার, জেলা : বাঁকুড়া, থানা : বাঁকুড়া
নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, থানা : নবদ্বীপ
নবাবগঞ্জ, জেলা : মালদহ, থানা : মালদহ
নলহাটি, জেলা : বীরভূম, থানা : নলহাটি
নাটাগড়, জেলা : উঃ ২৪ পরগনা, থানা : পানিহাটি
*নোয়াখালি, জেলা : নোয়াখালি, বাংলাদেশ

পাঁচমোড়া-প্রতাপপুর, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : ঘাটাল
নাটনা-বীরবন্দর, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : খেজুরি
পাইকপাড়া, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : ডেবরা
পাত্রসায়র, জেলা : বাঁকুড়া, থানা : পাত্রসায়র
পাথরকুচি, জেলা : বীরভূম, থানা : খয়রাশোল
*পালা জেলা : ফরিদপুর, বাংলাদেশ
প্রতাপপুর, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : পাঁশকুড়া
পূর্বস্থলী, জেলা : বর্ধমান, থানা : পূর্বস্থলী

ফতেবাড়, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : ডেবরা
ফরিদপুর, জেলা : নদিয়া, থানা : কালীগঞ্জ
*ফিরিঙ্গিবাজার, জেলা : ঢাকা, বাংলাদেশ
ফুলবাড়ি-বাবুটোলা, জেলা : মালদহ, থানা : ইংলিশবাজার

বনপাশ, জেলা : বর্ধমান, থানা : ভাতার
বসিরহাট, জেলা : উঃ ২৪ পরগনা, থানা : বসিরহাট
বহরমপুর জেলা : মুর্শিদাবাদ, থানা : বহরমপুর
বাঁশগোড়া, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : খেজুরি
বাঁশবেড়িয়া, জেলা : হুগলি, থানা : মগরা
*বাখরগঞ্জ, জেলা : বাখরগঞ্জ, বাংলাদেশ
বাঙ্গালঝি, জেলা : নদীয়া, থানা : চাপড়া
*বাজরাপুর, জেলা : যশোহর, বাংলাদেশ
বাদুড়িয়া, জেলা : উঃ ২৪ পরগনা, থানা : বাদুড়িয়া
বামনদাস মুখার্জি রোড, কলকাতা
বালি, জেলা : হুগলি, থানা : গোঘাট
বালুচর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, থানা : জিয়াগঞ্জ
বাহিরগাছি, জেলা : নদিয়া, থানা : নাকাশিপাড়া
বিষ্ণুপুর, জেলা : বাঁকুড়া, থানা : বিষ্ণুপুর

বিদ্যাধরপুর, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : এগরা
*বুধপাড়া, জেলা : রাজশাহী, বাংলাদেশ
বেগুনকোলা, জেলা : বর্ধমান, থানা : কেতুগ্রাম
বেলিয়াতোড়, জেলা : বাঁকুড়া, থানা : বেলিয়াতোড়
বেলুড়, জেলা : হাওড়া, থানা : বালি
*ব্রাহ্মণগাঁও, জেলা : ঢাকা, বাংলাদেশ

ভবানীপুর, কলকাতা

*মগরা, জেলা : ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ
মদনমোহনপুর, জেলা : বাঁকুড়া, থানা : সোনামুখী
মনোহরপুর, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : ঘাটাল
ময়নাগড়, জেলা : বাঁকুড়া, থানা : সিমলাপাল
মলিয়ান-লালবাজার, জেলা : বাঁকুড়া, থানা : খাতড়া
মহিষাদল, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : মহিষাদল
*মহেশপুর, জেলা : নদিয়া, বাংলাদেশ
মাটিয়ারি, জেলা : নদিয়া, থানা : কালীগঞ্জ
মীরগোদা-চন্দনপুর, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : এগরা
মুড়াগাছা, জেলা : নদিয়া, থানা : নাকাশিপাড়া
*মেহেরপুর, জেলা : নদিয়া, বাংলাদেশ

*রণডিহা, জেলা : ঢাকা, বাংলাদেশ
*রাজনগর, জেলা : ফরিদপুর, বাংলাদেশ
রাজনগর, জেলা : বীরভূম, থানা : রাজনগর
রাণাঘাট, জেলা : নদিয়া, থানা : রাণাঘাট
রাধানগর, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : ঘাটাল
রানিগঞ্জ, জেলা : বর্ধমান, থানা : রানিগঞ্জ
*রামচন্দ্রপুর, বাংলাদেশ
রামজীবনপুর, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : চন্দ্রকোণা

লক্ষ্মীসাগর, জেলা : বাঁকুড়া, থানা : সিমলাপাল
লাউবেড়ে, জেলা : বীরভূম, থানা : খয়রাশোল
লালবাজার, জেলা : বাঁকুড়া
লোকপুর, জেলা : বীরভূম, থানা : খয়রাশোল
লোয়াদা, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : ডেবরা
*লোহাজঙ্গ, জেলা : ঢাকা, বাংলাদেশ

শঙ্করবাটি, জেলা : মালদহ, থানা : মালদহ
শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, থানা : শান্তিপুর
শিয়াখালা, জেলা : হুগলি, থানা : চণ্ডীতলা
শুশুনিয়া, জেলা : বাঁকুড়া, থানা : শালতোড়া
*শোলাপুর, জেলা : ঢাকা, বাংলাদেশ

সাধনপাড়া, জেলা : নদিয়া, থানা : কৃষ্ণনগর
সারক-ফরিদপুর, জেলা : নদিয়া, থানা : কালীগঞ্জ
সাহাগঞ্জ, জেলা : হুগলি, থানা : চুঁচুড়া
সাহেবগঞ্জ, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : ঘাটাল
*সাহেবগঞ্জ, বাংলাদেশ
সিমলা, কলকাতা
সেহারাবাজার, জেলা : বর্ধমান, থানা : রায়না

হজরতপুর, জেলা : বীরভূম, থানা : খয়রাশোল
হরিশপুর, জেলা : মেদিনীপুর, থানা : ঘাটাল
হায়াৎপুর, জেলা : বীরভূম, থানা : খয়রাশোল

দুঃখের কথা, আলোচিত শিল্পকেন্দ্রের বহুলাংশ আজ কালের গতিতে লুপ্ত, অথবা কোথাও কোথাও বা আজও কোনোমতে টিকে আছে মাত্র। বাংলার এই শিল্পসম্পদ নিয়ে বিস্তারিতভাবে তেমন কোনো আলোচনা হয়নি বা এইসব উল্লেখযোগ্য মূর্তি-ভাস্কর্য বাদে কোনো নিদর্শন সংগ্রহশালায় তেমনভাবে সংগৃহীত হয়নি। সেজন্য পিতল-কাঁসার নানা শিল্পদ্রব্যের বর্ণনা বর্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ করা হলেও, সেগুলির আলোকচিত্র সংগ্রহ করা ভীষণ কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, গত পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় গ্রামের অধিকাংশ গৃহস্থ পরিবার তাদের সংগৃহীত বহু কাঁসা-পিতল দ্রব্য অভাবের তাড়নায় মহাজনদের বিক্রি করে দিয়েছেন। পরবর্তী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিক্রিত এইসব ধাতুশিল্প দ্রব্য ঢালাই করে যুদ্ধের নানাবিধ প্রয়োজন মেটানো হয়েছে। বহু জমিদারি সেরেস্তার সংগৃহীত পিতল-কাঁসার নানান দ্রব্য জমিদারি উচ্ছেদের পর নিলাম করে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বাংলার ধাতুশিল্পের গৌরব অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়াম, এনামেল, স্টেনলেস স্টিল ও প্লাস্টিকের দ্রব্য আজ ধীরে ধীরে বাংলার ঘর-গৃহস্থালিতে স্থান করে নিয়েছে। তাই সেদিনের গৌরবময় ধাতুশিল্প ও সংস্কৃতির কথা বর্তমান প্রবন্ধে নথিভুক্ত করে রাখা হল।

উল্লেখপঞ্জি

১. Trailokya Nath Mukharji—*Brass, Bronze and Copper Manufactures of Bengal, 1891*

—*Art Manufactures of India*, 1888

২. Sudhansu Kumar Roy—*The Artisan Castes of West Bengal and their craft—The Tribes and Castes of West Bengal*. 1953.

৩. S. C. Mitra—*A Recovery Plan for Bengal*. 1934

৪. Meera Mukherjee—Metal Craftsmen in India, 1978

৫. কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—*মধ্যযুগে বাংলা*, ১৯২৩

৬. ডঃ পূর্ণেন্দুনাথ নাথ—*শান্তিপুর সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

৭. কালীপদ লাহিড়ী—*গৌড় দর্পণ*, ১৯৮২

ভারতবর্ষে আধুনিকতার ইতিহাস
সময় কল্পনা

দীপেশ চক্রবর্তী

'আধুনিক' হওয়ার ধারণার মূলে আছে 'আধুনিক' ও যা 'আধুনিক' নয়, এই দুইয়ের বৈসাদৃশ্যের কথা। 'অনাধুনিক' বা 'প্রাগাধুনিক' ছাড়া যা আধুনিক তাকে চিহ্নিত করব কীভাবে? আমাদের আধুনিক হবার অভিজ্ঞতার একটি নিত্যনৈমিত্তিক উপাদান হল পরস্পর বিসদৃশ দুটি বস্তুর বা অভ্যাসের বা রীতির একই সময়ে সহাবস্থান। যেমন ধরা যাক, রিকশাযাত্রীর হাতে একটি কম্পিউটার বা কোনো 'অত্যাধুনিক' ইলেকট্রনিক যন্ত্র, বা হালফ্যাশনের জুতোর দোকানের সামনের ফুটপাথে 'প্রাগাধুনিক' যন্ত্রপাতি নিয়ে বসা চর্মকার। এইসব দৃশ্য আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। এই চেনাজানা দৃশ্যগুলি আমাদের মনে নানারকমের ভাবনাকে উশকে দেয়। কখনো আধুনিকীকরণের তাড়ায় মনে হয় রিকশাওয়ালা, রাস্তায় বসা চর্মশিল্পী-এরা যেন 'পিছুটানের' মতো—ভারতবর্ষ প্রকৃতই আধুনিক হলে এরা জাদুঘরের সামগ্রী হয়ে দাঁড়াবে। আবার কখনো এই বিসদৃশ বস্তুর বা রীতির সহাবস্থানকেই আমাদের ইতিহাস ও সমাজের বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য বা সৌন্দর্য বলে মনে হয়। বিদেশি টেলিভিশনের সাক্ষাৎকারে বম্বের এক বিখ্যাত প্রগতিশীল চিত্রতারকাকে এও বলতে শুনেছি যে ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য ঠিক এটাই। এদেশে বিভিন্ন শতাব্দ যেন একই সঙ্গে বিরাজমান।

পাঠকের মনে থাকবে যে প্রখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বি এই ধরনের চিন্তা থেকেই ইতিহাস অনুসন্ধানের একটি অত্যন্ত মৌলিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। 'প্রাচীন' ভারতের অনুসন্ধানে পুনা শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত নিজের বাড়ির আশপাশে ঘুরে বেড়াতেন কোশাম্বি। নিত্যকার বস্তু বা অভ্যাসটিকে দেখতেন নৃতাত্ত্বিক ও ঐকান্তিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি সম্মিলন করে। তাঁর অনুসন্ধিৎসার পথে পাঠককেও তিনি সঙ্গী করে নিতেন। দেখাতেন কীভাবে বাতিল হয়ে যাওয়া উপাদান মিলেমিশে আছে আধুনিক সমাজের রূপগুলির সঙ্গে, কীভাবে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এই নিদর্শনগুলোর মধ্যে অঙ্কিত হয়ে ওঠে।[1] এমনি করেই এসেছে তাঁর আলোচনায় নানা লৌকিক দেবদেবীর কথা বা তাঁর পড়শি উপজাতি 'পারধি'দের কথা। এই 'আদিম' (primitive) মানুষগুলি তখন (অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকে) ডেহুর অস্ত্রাগারে কাজ করেন। ইঁদুর শিকারের প্রাচীন কলকৌশল সে সময়ে লুপ্তপ্রায়। কিন্তু তাঁদের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক চালচলনে—

যেমন কষ্টার্জিত পয়সায় ভোজনের ধুম, বা বিসদৃশ ও অকেজো সাজপোশাকে অর্থব্যয়— এইসবে কোশাম্বি দেখতে পান প্রাচীন সমাজের ছাপ, তাঁর ভাষায় 'true Primitive fashion'।[২]

কোশাম্বির এইসব চিন্তায় আমাদের আধুনিক হবার যে একটি প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা— পরস্পর বিসদৃশ বস্তু বা রীতির সহাবস্থান— তা নিয়ে কীভাবে ভাবব তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। কোশাম্বির অনুসন্ধিৎসু মনের কাছে কিছুই বাদ পড়ে না। আলোচনা করেছেন শিল-নোড়ার কথা, পোশাকি নাম 'Saddle-quern'। আজ মধ্য ও উচ্চবিত্তের ঘরে বৈদ্যুতিক পেষাইকল এসেছে। কিন্তু এক দশক আগেও কোনো উপমহাদেশীয় রন্ধনশালাকে শিলনোড়া ব্যতীত ভাবা যেত না। কোশাম্বি যখন লিখছেন, তখন ইলেকট্রিক স্টোভের পাশেই এর জায়গা। যেমন বাটা কোম্পানির পাশে বিহারী চর্মকার বা মারুতি ১০০০-এর পাশে ঠেলাগাড়ি। কাজেই আদিম সভ্যতার উৎখনিত ক্ষেত্রে কেবল শিল-নোড়াকে খুঁজলে চলবে না। আধুনিক ভারতের রান্নাঘরেও তার উপস্থিতিটুকু যেন অনুসন্ধিৎসুর চোখ না এড়ায়। শিলনোড়ার ইতিহাসে ভারতীয় আধুনিকতারই একটি মূলসূত্র খুঁজেছেন কোশাম্বি।[৩]

শুধু যে ইলেকট্রিক বা কেরোসিন স্টোভের পড়শি হয়েই আছে শিল-নোড়া, তা নয়। কোশাম্বির মতে, তাঁর 'সমসাময়িক' ব্রাহ্মণগৃহে এই প্রস্তর যুগের যন্ত্রটির অবস্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কোশাম্বির চোখে ধরা পড়েছে কীভাবে স্মৃতিশাস্ত্রের নিগড়কে তুচ্ছ করে শিশুর নামকরণের দিনে শিলনোড়া পুণ্য আচারের অঙ্গে পর্যবসিত হয়। নোড়াটিকে সাজানো হয়, বাচ্চার দোলনার চারপাশে সজ্জিত নোড়াকে ঘুরিয়ে শেষে তার পায়ের কাছে সেটাকে রাখা হয়।[৪]

কোশাম্বি মনে করেন যে এই আচারটির মূলে আছে 'ম্যাজিকের ধারণা'। হয়তো 'নোড়া' পাথরটির মতোই অটুট ও দীর্ঘজীবী হয়ে উঠবে শিশুটি, এই আশা। এ ছাড়া অন্য যে প্রতীকী অর্থ থাকতে পারে তাও কিছু কিছু আলোচনা করেছেন কোশাম্বি। কিন্তু বামুনবাড়িতে আধুনিক ইলেকট্রিক বা কেরোসিন স্টোভের পাশাপাশি এমন একটি প্রস্তরযুগীয় যন্ত্রের এইরকম 'জীবন্ত' অবস্থানের মানে কী? কোশাম্বির উত্তরটা খুবই সোজা সরল। তিনি লিখেছেন, অতি পুরাতন এক হাতিয়ারের সঙ্গে চলে এসেছে এক প্রস্তরযুগীয় রীতি, চারপাশের জনগোষ্ঠী-অনুসৃত সেই আচারকে তুলে নিয়েছে ব্রাহ্মণ পরিবার।[৫]

বলা বাহুল্য, কোশাম্বির সময় চিন্তায় এক ধরনের বিবর্তনবাদী বা ভূতাত্ত্বিক কল্পনা কাজ করেছে। ভূতাত্ত্বিক খননকার্যে যেমন পৃথিবীর মাটির বিভিন্ন স্তরকে অতীতের বিভিন্ন সময়ের সাক্ষ্য বলে ধরা হয় বা বিবর্তনবাদী চিন্তায় যেমন ভাবা হয় 'survival' বা 'remnant' এর কথা। তেমন করেই ভেবেছেন কোশাম্বি। বার বার তাঁর কাছে ঘুরে ফিরে এসেছে 'থেকে যাওয়া' 'পড়ে থাকা' বা 'অবশিষ্টের অংশ' বিশেষের ধারণা। কোশাম্বি তাই লেখেন, সবকিছুই ভারতে টিকে থাকে। এখানে তাম্রপ্রস্তর ও আণবিক যুগের চমৎকার সহাবস্থান সম্ভব।[৬] আধুনিক ভারতের মধ্যে কোশাম্বি দেখেছিলেন

আর একটি সভ্যতার অবশেষ। ভারতের নাগরিক সভ্যতার আনাচে কানাচে, পুলিশের সন্দিগ্ধ বাঁকা নজরের আওতায়, আগুয়ান অর্থনীতির চাপে ম্রিয়মান হয়েও টিকে আছে হাজার হাজার ছোটোখাটো উপজাতির দল, কোনোক্রমে জিইয়ে রেখেছে তাদের আদিম রীতিনীতিগুলো।

পঞ্চাশের দশকে আঁকা এই ছবি আজ পুরোটা মিলবে না। এও সত্যি যে সমাজের কোণঠাসা হয়ে যাওয়া এই আদিবাসী মানুষের প্রতি কোশাম্বির যে সহানুভূতি তা শ্রদ্ধেয় ও সমর্থনযোগ্য। সামাজিক সংঘাতের—'suspicion of the police'; 'heavy pressure of the more advanced elements' ইত্যাদি—এ সমস্তের মূলে কোশাম্বি দেখেছেন সামাজিক বিবর্তন ও তার মধ্যে 'survival' ও 'remnant' এর সমস্যা। তাঁর কাছে এই অবশেষগুলি শুধু সহানুভূতির বিষয় নয়। ঐতিহাসিক বিকাশের ব্যাখ্যার সূত্র হিসেবেও অবশেষগুলি গুরুত্বপূর্ণ।[৭] কোশাম্বির প্রতিক্রিয়া যতটা হৃদয়গত, মানবিক, ঠিক ততটাই বৌদ্ধিক।

কিন্তু কোশাম্বির এই সময় চিন্তার সঙ্গে এক ধরনের 'প্রগতি'র ধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 'survival' এর বা 'থেকে যাওয়া'র সূত্র ধরেই কাউকে ভাবতে হয় 'অগ্রসর' (advanced elements) ও কাউকে 'পিছিয়ে পড়া' (backward) বলে। তাতে সমস্যাটি কী হয় দেখুন। ব্রাহ্মণ গৃহের সেই 'শিলনোড়ার' আচারের উদাহরণ দিয়ে বলি। কোশাম্বি নিজেই লিখেছেন, শিল-নোড়ার অনুষ্ঠানটি একান্ত 'মেয়েলি' প্রথা, সধবা সন্তানবতী ও বয়স্কা মেয়েদের আচরণ।[৮] এই মহিলারা ব্রাহ্মণ কন্যা, উপজাতীয় বা আদিবাসী নন। ব্রাহ্মণ পুত্র কোশাম্বির নিজের জগতেরই মানুষ তাঁরা। তবু তাঁদের মধ্যে 'দ্রষ্টা' (observer) ও 'দৃষ্ট' (observed) বা বিষয়ী ও বিষয়ের (subject and object) সম্পর্ক। কোশাম্বি দ্রষ্টা, যুক্তিবাদী ও বিবর্তনবাদী চিন্তায় তাঁর অবস্থিতি। তাঁর নিজের বিচারেই তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণী দৃষ্টি 'প্রাগ্রসরতার' পরিচায়ক। নোড়া সংশ্লিষ্ট স্ত্রী আচারটি এই দ্রষ্টার অবস্থান থেকে প্রস্তরযুগীয় ম্যাজিকের মনোভাব প্রকাশ করে। এই মনোভাবই 'থেকে যাওয়া', 'পিছিয়ে পড়া' মনোভাব। যুক্তিবাদী পুরুষ একদিন মধ্য বা প্রস্তরযুগীয় মনোভাবের (স্ত্রী) লোককে—বা সাধারণভাবে নিম্নবর্ণের মানুষদের দেখাবেন যুক্তিবাদ ও প্রগতির পথনির্দেশ। এটাই তাঁর স্ব-আরোপিত ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ববোধের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে আধুনিক রাষ্ট্র ও রাজনীতির ধারণা।

এখন কেউ বলতেই পারেন, পুরোনো সব কিছুই কি ভাল? অনেক পুরোনো জিনিস বা রীতিই আজকের বিচারে খারাপ। তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাষ্ট্র বা আমলাতন্ত্র একটি হাতিয়ার হতেই পারে। সুতরাং ন্যায়বিচারের খাতিরে 'advanced' ও 'backward' এর ফারাক আমাদের করতেই হবে।

কথাটা যুক্তিগ্রাহ্য। অর্থাৎ বৃহত্তর অর্থে এই ধরনের যুক্তিবিন্যাসকে রাজনৈতিক দর্শন বলা যেতে পারে। এই তত্ত্ব আমাদের বোঝায় যে চেতনায় স্ব-বিরোধিতার অবসান

করাই হল 'আধুনিকতার' লক্ষণ। অতএব ইলেকট্রিক স্টোভের পাশে 'প্রস্তরযুগীয়' শিল-নোড়া আমাদের চেতনার প্রতীক হিসেবে বেমানান। কোনো কোনো বিশেষ সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে এইরকম চিন্তা আপাত ফলপ্রসূ ও জোরালো। এবং সে ক্ষেত্রে কোশাম্বির মতোই বিবর্তনবাদী ভূতাত্ত্বিক সময়-কল্পনার প্রয়োগের কথা ভাবতে হবে, যেন সময় বয়ে যাচ্ছে বহতা নদীর মতো ও একমুখী তার স্রোত, বিভিন্ন বস্তু ও সামাজিক রীতিনীতিতে পড়ে যাচ্ছে তার বয়ে যাবার চিহ্ন। তাই জানি, কিছু ব্যবহার ও চিন্তা 'advanced' ও কিছু 'backward', কিছু 'এগিয়ে চলে', বাকিরা 'পশ্চাৎমুখী'।

অন্য এক বীক্ষার কথা কেউ তুলতে পারেন। যদি এই প্রতীতি থেকে 'আধুনিকতা'র ইতিহাস লিখি যে চেতনার আপাত স্ববিরোধিতাই মানুষের মানুষী বৈশিষ্ট্য এবং আধুনিকতার যে ধারণা আমাদের চেতনা বা মানসিকতার স্ববিরোধিতা নির্মূল করতে উৎসাহ দেয় তা ক্ষেত্রবিশেষে রাজনৈতিকভাবে কার্যকর হলেও তাতে জীবনচর্যার বৈচিত্র ও জটিলতা ধরা পড়ে না। অর্থাৎ, ইংরেজি করে বললে যদি life-philosophy (জীবনবীক্ষা) ও political philosophy-র (রাজনৈতিক দর্শন) মধ্যে প্রভেদ টানি তাহলে কোশাম্বির সময়-কল্পনা থেকে আমাদের সরে আসতে হবে।

কীভাবে, কোথায় সরে আসব? কথাটা অন্যভাবে ভাবা যেতে পারে। ভাবনাটির জন্য আমি শ্রীরণজিৎ গুহ মহাশয়ের নিকট ঋণী। যেকোনো 'বর্তমান'কে বহতা সময়ের একটি অংশ না ভেবে 'সময় গ্রন্থি' হিসেবে ভাবা যায়। 'বর্তমান' বলতে যে 'সময়' বুঝি তা যেন একটি 'গেরো' বা 'গাঁট'-এর মতো। ধরুন, ঠাকুর্দার কাছে শোনা তাঁর ঠাকুর্দার সম্বন্ধে একটি গল্প আপনার স্মৃতিতে ধরা আছে। গল্পটা ঠিক যেমন চারপুরুষ পূর্বের সময়ের কথা বলে, তেমন আপনারই আজকের চেতনার খানিকটা জুড়ে সে আছে, আপনার সঙ্গে আপনার পরিবেশ ও ভবিষ্যতের যে সম্পর্ক তাতে তারও একটি ভূমিকা আছে। তাই সে আপনার বর্তমানেরও অংশ। অর্থাৎ ভেবে দেখলে একথা বলাই যায় যে, যেকোনো সময়ে আমরা নিজেরাই অর্থাৎ 'আধুনিকরা' খানিকটা 'মধ্যযুগীয়' বা 'প্রস্তরযুগীয়' বলেই 'মধ্যযুগ' বা 'প্রস্তরযুগ'-এর সমাজ সম্পূর্ণ অপরিচিত ঠেকে না আমাদের কাছে। নতুবা অন্য যুগের মানস পৃথিবীতে প্রবেশ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হতো।

একথা সত্যি যে, প্রাতিষ্ঠানিক, রাষ্ট্রিক ও রাজনৈতিক কারণে 'প্রগতি'র কোনো না কোনো ধারণা অনিবার্যভাবেই আমাদের ঐতিহাসিক সময়-কল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। এই অনিবার্যতার কারণ আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক জীবনের মধ্যে নিহিত, Civil Society-র প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সৃষ্ট। সেখানে 'প্রাগ্রসর' ও 'পশ্চাৎপর'—এগুলোই তাৎপর্যমণ্ডিত কথা। এমনকি কোনো গবেষণা কর্মের জন্য অনুদান চাইতে গিয়েও আমাদের লিখতে হয় কেন আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পটি সর্বাধুনিক, বা কীভাবে তা জ্ঞানের উন্নতি ঘটাবে। 'জ্ঞান'-এর মডেলটিই এখানে 'প্রগতি'। সুতরাং প্রাতিষ্ঠানিক জীবনের যে মুক্তি, তাতে কোশাম্বির ব্যবহৃত সময় চিন্তা থেকে মুক্তি নেই।

কিন্তু রাষ্ট্রিক বা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাবিন্যাসের আওতার বাইরের কোনো অবস্থান থেকে যদি ইতিহাস ও তার সময় নিয়ে চিন্তা করি? তখন পরস্পর বিসদৃশ বস্তুর বা রীতির পাশাপাশি সহাবস্থানের সমস্যাটি আমাদের কাছে 'survival'-এর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হবে না। তখন প্রশ্নটি বরং এইরকম চেহারা নিতে পারে : ইলেকট্রিক স্টোভের পার্শ্বস্থ শিল-নোড়াটি কেবল একটি প্রস্তরযুগীয় ফসিল নয়। মার্কসের ভাষায় একটি 'unvanquished remnant of the past' বলেও ভাবতে হবে না তাকে। আমরা ভাবব : হ্যাঁ, ওটি 'প্রস্তরযুগের' ঠিকই, কিন্তু 'প্রস্তরযুগ'ও তো আধুনিকতার অংশ। এই অর্থে, যে শিল-নোড়ার মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীর সঙ্গে যে সব সম্বন্ধ সৃষ্টি করে সেই সব সম্বন্ধসৃষ্ট জগৎ আমার কাছে আজকের মানুষ হিসেবে সম্পূর্ণ অগম্য নয়। এমনকি চুল্লিটি যদি ইলেকট্রনিকও হয়, তাহলেও নানাভাবে 'শিল-নোড়া' সৃষ্টি করে যায় আমাদের মানসিকতা ও চেতনার পরিসর। গল্পের, ম্যাজিকের, আচারের নানা অনুষঙ্গে তারা বর্তমানেরই অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। যে শিল-নোড়া আমাদের বর্তমানের অংশ, তাকে প্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির অবশেষ ভাবলে যে সমস্যা হয় তা আগেই দেখেছি। আবার প্রস্তরযুগ-অতিক্রান্ত সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু ভাবলেও শিল-নোড়ার শরীরে ও অনুষঙ্গে অতীতের অশরীরী উপস্থিতি ব্যক্ত হয় না।

ঐতিহাসিকরা যাকে সচরাচর 'continuity' বলেন, আমি তার কথা বলছি না। অর্থাৎ প্রস্তরযুগে শিল-নোড়ার উদ্ভাবন হলেও আজও তা আমাদের রান্নাঘরে বিদ্যমান। সুতরাং শিল-নোড়া ইতিহাসের 'continuity'র অঙ্গ— এমন কথা বলছি না আমি। বা, মার্কসবাদী ইতিহাস রচনার প্রচলিত ধরতাই-এ 'কী জীবন্ত ও কী মৃত'— 'what is living and what is dead'— তার কথাও বলছি না আমি। 'শিল-নোড়া'দের অস্তিত্বটি এমন যে রান্নাঘর থেকে জাদুঘরে জিনিসটি উঠে গেলেও আমাদের জীবনে তার অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে না। এই যে অস্তিত্ব বা উপস্থিতি—যাকে বিবর্তনবাদী 'জীবন্ত' ও 'মৃত'র দ্বৈতে ধরা যায় না— তাকেই 'ভূতুড়ে অস্তিত্ব' নাম দিয়েছেন দার্শনিক জাক দেরিদা। 'ভূত' জিনিসটাই তো, তাঁর মতে, 'the surviving of a survival that is reducible neither to living nor dying'।[৯]

এই কারণেই বলা যেতে পারে যে, যে সময়কে আমরা অভিজ্ঞতায় পাই, তার চরিত্র বহতা নদীর মতো নয় (ঐতিহাসিক কালক্রম বলতে যা বোঝেন), টান করে ধরা ফিতের মতোও নয় সে, বরং তা যেন কুণ্ডলী পাকানো একটি গ্রন্থির মতো। কোশাম্বি যদি এইভাবে ভাবতেন তাহলে শিল-নোড়া বা আদিবাসী বিষয়ে তাঁর ইতিহাস রচনার ছকটি কীরকম হত?

উল্লেখপঞ্জি

১ 'So. let me take the reader on a brief tour beyond my house on the boundary of Poona city.....it will be possible to see the interaction of obsolete with modern

forms of society. to see the historical process illustrated....Damodar Dharmanand Kosambi. *An Introduction to the Study of Indian History*. Bombay, 1975, 27-28.

২. ঐ ৩৩-৩৪।

৩. 'The saddle-quern is found all over the world in prehistoric excavations, but also in India Kitchens today even when cooking is done on an electric of kerosene stove'. D. D. Kosambi. ঐ ৪৭।

৪. 'With the implement (which developed with first agriculture before the end of stone age) is performed a ceremony in force even among brahmins. yet without sanction in any of the brahmin scriptures...Before or on the name day of a child..., the top roller stone is dressed up. passed around the cradle containing the child and finally deposited at the foot of the infant in the cradle'. D. D. Kosambi. ঐ ৪৮।

৫. 'The implication is that a stone age ceremony has come down with the implement, and has been borrowed by the brahmin families from the surrounding population'. 49.

৬. Damodar Dharmanand Kosambi. ঐ ৭-৮। কোশাম্বি আরও লেখেন, 'There are still. in India, visible remnants of tribal society which seem most impressive—to casual observers—only in marginal, undeveloped areas...in every locality. even in the neighbourhood of well-developed modetn cities. one finds little bonds of tribal people holding on to whatever they can of their ancient customs. under constant suspicion by the police and heavy pressure of the more advanced elements of society which live by a money economy.' ঐ ২৬-২৭।

৭. 'Survival as backward groups also furnishes the real problem for explanation in the light of historical development'. D. D. Kosambi, ঐ ৭-৮।

৮. D. D. Kosambi, ঐ, ৪৯

৯. Jacques Derrida, Specters of Marx, the State of the Debt, the Work of Mourning and the New International. trans. Peggy Kamuf, New York & London. 1994. p. 178 n 3.

উত্তরবঙ্গের ভল্লুক দেবতা

নির্মলচন্দ্র চৌধুরী

উত্তরবঙ্গের অরণ্যসঙ্কুল পল্লী অঞ্চলে যাঁরা কখনো বসবাস করেননি, তাঁদের পক্ষে এখানকার বাসিন্দাদের ধর্ম ও সংস্কারের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু জানা অসম্ভব। হিমালয়ের পাদমূলে অবস্থিত সরল অশিক্ষিত মানুষের সংস্কার এবং নিম্নভূমির মার্জিত শিক্ষিতজনের বিশ্বাসের ভেদরেখা এত সূক্ষ্ম যে একের শেষ ও অন্যের শুরু চিহ্নিত করা কঠিন। এই মানসিক ক্রিয়া কি সত্যই অজ্ঞতাজনিত কুসংস্কার? উত্তরবঙ্গে ভালুকের উপদ্রবে জর্জরিত পল্লী এলাকার বাসিন্দাদের চিন্তা ও বিচারবুদ্ধি দিয়েই এর বিচার করা যাক। শহরাঞ্চলে এবং পল্লী অঞ্চলে অনেক সময়ে ডুগডুগি বাজিয়ে ভালুকের নাচ দেখানো হয়ে থাকে। জনসাধারণ, বিশেষত ছোটো ছেলেমেয়েরা সাগ্রহ কৌতূহল নিয়ে সেই নাচ দেখে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র ভালুকের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণের মন্ত্র ছড়ার মতো করে আবৃত্তি করে :

আহাস্তি অহমৃণ্ড অপ্ অপ্ থপ্ থপর্ থপর্ করে পা[১]
এ সীমা ছাড়ি তু অন্য সীমা যা।
গণ্ডা[২] গমল দূর পালা, উড়্ শিকাল বেড়া।[৩]

[[১] ভালুক যেভাবে মাথা নেড়ে মানুষের দিকে এগিয়ে আসে, এখানে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে [২] গণ্ডার, ভালুক প্রভৃতি প্রাণী [৩] মন্ত্র দিয়ে তোকে বাঁধলাম; এখন পালিয়ে যা]

কখনো আবার ছেলেভুলোনো এবং শিশু সম্পর্কিত ছড়াতেও ভালুকের দেখা পাওয়া যায়। শিশুকে ঘুমোতে নিয়ে গিয়ে মা বলতে থাকেন :

আয়রে ঘুম আয়—
ভালুকে নুন কুথা পায়, ভালুকে ত্যাল কুথা পায়,
আল্‌না-মালনা[১] খায়েঁ ভালুক
বন্‌কে পালায়ে যায়।
আয়রে ঘুম আয়...

[[১] আল্‌না-মাল্‌না = আলুনি]

মায়েরা কখনো বা বলে থাকেন :

আয় ঘুমানি আয়
ভালুকে তেঁতোল খায়
তারা নুন কোথা পায়?

শ্যাওলা গাছের নুন
কুসুম গাছের তেল
তাই দিঁয়ে দিঁয়ে খায়।

ছেলেভুলোনো ছড়াতেই আবার কখনো শুনতে পাওয়া যায় :

আয় ঘুমানি আয়
ভালুকে তেঁতোল খায়
নদীর বালি ঝুর ঝুরানী
নুন বলে খায়।

আবার কখনো ছড়া শুনতে পাওয়া যায় পল্লী রমণীদের মুখে :

ঝিম্ ঝিমানো ঝিম্ ঝিমানো ভালুক লাটা পাটা[১]
বড়ো বউকে বড়ো টরকা ছট ছোটো বউকে ছট
টরকা ছট[২]
হারার হুড়র বাজে কি, রাঙি ধানের খৈ।
বাঙ্গাল বগা চইলে যাবে দখিন পথে সৈ।

[[১] ঝোপঝাড় থেকে ভালুক এলো [২] গরু মোষের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য তাদের গলায় কাঠ বা টিনের যন্ত্র লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাদের টরকা বলে। টরকা ছট = টরকার আওয়াজ]

প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের এই ছড়াটি সীমান্ত পশ্চিমবঙ্গেও অন্যরূপে দেখা যায় :

বাঘ ভালুকে নাই ভয়।
ঢেঁকি দেখলে প্রাণ যায়।।

উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েরা 'ভাণ্ডীখেলি' নামে একরকম নাচের খেলা খেলে থাকে। এর নাম 'মুখানাচ'। নিমকাঠে তৈরি মুখা অর্থাৎ মুখোস পরে এই অঞ্চলের লোকেরা কালী, চামুণ্ডা, রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি যেমন নাচাতো, তেমনি ভালুকের নাচেও ব্রতী হতো। এক্ষেত্রে ভালুকের মুখা এবং কালো রঙে রাঙানো শন বা পাটের চুল দিয়ে সারা শরীর আবৃত করে মানুষ ভালুকের মুখা পরত এবং আর একজন মানুষ সেই ভালুককে নাচাত। এখনও উত্তরবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে মুখা নাচ একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। বোঝা যায় ভালুক ছিল এই অঞ্চলের মানুষদের গৃহপালিত পশুদের অন্যতম এবং হয়তো এদিককার পশুপালক শ্রেণির একটি লোকশাখায় 'টোটেম'-ও।

'উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় ভল্লুকের নাম ভাণ্ডী। হিংস্র পশুদের মধ্যে ভাণ্ডীও একটি প্রধান পশুবিশেষ। বনাবৃত উত্তরবঙ্গে অন্যান্য পশুদের ন্যায় ভাণ্ডীর অত্যাচারও বোধ করি কম ছিল না। কেননা এতদঞ্চলে ভাণ্ডীর ঝাড়ের নাম যত্রতত্র শুনিতে পাওয়া যায়। ভাণ্ডানী ঠাকুরানীর নামকরণের প্রশ্নেও এই ভাণ্ডী কোনো-না-কোনো প্রকারে জড়িত থাকিতে পারে [১]।' ভালুকের আর এক নাম ভাণ্ডী এবং এই ভাণ্ডী নামাঙ্কিত গ্রামের অভাব উত্তরবঙ্গে নেই। যেমন—ভাণ্ডীগুড়ি, ভাণ্ডাপুর, ভাণ্ডীর ঝাড়, ভাণ্ডীবন। মালদহ জেলায় ভালুকা রেলস্টেশনের নামটিও ভালুক থেকে এসেছে। কোচবিহার জেলার

তুফানগঞ্জ থানার একটি গ্রামের নাম ভাণ্ডীজালাস, দার্জিলিং জেলার কালিম্পং মহকুমার একটি গ্রামের নাম ভালুখোপ খাসমহাল, বর্ধমান জেলাতেও ভাল্কি নামক একটি স্থান আছে এবং সেখানকার একটি কিংবদন্তী বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পুরুষ ভালুককে বলা হয় ভাণ্ডা এবং স্ত্রী ভালুককে বলা হয় ভাণ্ডী।

উত্তরবঙ্গের 'ভাণ্ডিখেল' নাচের সঙ্গে গায়করা গান করেন :

'নাচ ভাণ্ডী নাচ—
হাটের চুচুর [১] মাছ, বাড়ির বাইগন
তাক খায়া ভাণ্ডী ধইল্লে নাচন।
সোকোল[২] মাছ খিলালো ভাই
না খিলালো কই
বুক্কের উপর দিয়া
চুইয়া ফেলালেন নই[৩]।

[[১] চুচুরা মাছ = ছোটো বা চুনো মাছ [২] সোকোল = সকল [৩] নই = ঘাম অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ ঘামে নেয়ে বা স্নান করে উঠল। 'লহ' বা রক্ত থেকেও এই কথাটি আসতে পারে]

আদিম যুগে মানুষ যেমন ভালুককে দেখে ভয় পেত তেমনি হিংস্র জন্তু ভালুককে হত্যা করবার জন্যও দলবদ্ধভাবে এগিয়ে যেত। একটি লোকসঙ্গীত থেকে সে তথ্যও জানা যায় :

সেলায়[১] না কইচুঁ[২] রে ভাণ্ডী
ও তুই সেই না জেঙ্গোল ছাড়িস;
সেই না জোঙ্গোলের চক্রপাখে[৩]
ঘিরিবে শিকারী।
আনিয়ে গোড়ে গোড়ে
নাগাইসে কুহা[৪]
ভাণ্ডা ভাণ্ডি গিলা
নাগাইসে তার মাইর[৫]
হুলুম ঝুলুম[৬] ভাণ্ডীরে
যাইস কতো দূর
মোর বাড়ি যাবোতে[৭]
চল্ ভজনপুর,
এণ্ডাবাড়ী ভেণ্ডাবাড়ী[৮]
কুহা নাগাইসে
ভাঁড়া ভাঁড়ী গিলা
মরাই নাগাইসে।

[[১] সেলায় = তখনই। [২] কইচুঁ = বলেছি [৩] চক্রপাখ = চারদিক [৪] কুহা = কুয়াশা [৫] মাইর = যুদ্ধ [৬] হুলুম ঝুলুম = পাট, শন দিয়ে তৈরি ভালুকের সাজ [৭] যাবোতে = যাবি যদি [৮] এণ্ডাবাড়ী = এরণ্ড ও ভেরেণ্ডা ক্ষেত]

অনেক সময় দেখা যায় নাচের সময় ভালুকের জ্বর এসেছে; জ্বর গায়ে সে শুয়ে পড়ে। প্রাচীন কবি হরিদেবের 'শীতলামঙ্গল' কাব্যেও দেখা যায় :

'ভল্লুকেরে দিল বর দণ্ডে দণ্ডে হইবে জ্বর
ভল্লুক নামেতে হইল জ্বর।
এই বর তারে দিল আমা সনে যুদ্ধ কৈল
বুদ্ধি হরা করিল সর্তর'।।

বাঙালি সমাজে অল্পক্ষণ স্থায়ী জ্বরকে 'ভালুকী জ্বর' বলা হয়ে থাকে। 'ভাণ্ডী খেলা'-তে ভালুকের জ্বর ছাড়ানোর জন্য মন্ত্র পাঠ করা হয়। যেমন :

উতরে দখিনে গে গাহিল চালুঁ[১] ফুঁ
পাটি পুটি শিথিলা কটি।
কটি বাহিয়া বাহির হইল আঠামাটি।
ফুঁ ঝারিনু ফুকিনু পালাইল বিষ—
এক কাঠা মোক কালাই খাবার দিস[২]।

[[১] চালুঁ—লাঠিচাল [২] সামগ্রিকভাবে মন্ত্রটির কোনো অর্থ নেই।]

মন্ত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ভালুকের জ্বর ছেড়ে গেল। সে উঠে নাচতে শুরু করল। সেই সঙ্গে আরম্ভ হল গান :

চল্ চল্ বুড়া ভাণ্ডী
হাট বেসেরা যাই[১]
তামসা খেলায়া
নামিজা[২] করিমো বোঝাই।
ওরে চেঙ্গেরা চেঙ্গেরী হাট যাবে
ভাণ্ডী খেলেয়া পাইসা দিবে—
আর তো দুঃখ নাই।
তামসা খেলিয়া নামিজা করিমো বোঝাই।

[১ হাট বেসারা যাই = হাটে বেসাতি করতে যাই; ২ নামিজা = থলে]

ভালুক নাচানোর সময় গাওয়া হয় :

হেসেক-পেসেক না হয়[১]
মোর ভাণ্ডীর খেল্;
বলশক্তি কমেয়া গেইল[২]।
হায়রে পরমেশ্বর,[৩]
সাগায় কহিছে ঢাড়িকয়[৪]।

[১ হেসেক পেসেক না হয় = আজেবাজে না হয় ২ কমে গেইল = কমিয়া গেল

৩ পরমেশ্বর = ভগবান ৪ এখানে ঘুরে ঘুরে খেলা দেখানোকে 'ঢাড়ি' ধরা বলা হয়। গানটি ভালুক নাচানোর সময় গীত হলেও এটি আসলে ভালুকের কথা নয়—যে ভালুক নাচায় তারই কথা।]

মালদহ জেলায় গম্ভীরা গানের সময়ও ভালুকের নাচ দেখানো হয়।

শুধুমাত্র ছড়ায় বা ভাওয়াইখেলির গানে নয়, উত্তরবঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যেও ভালুকের দেখা পাওয়া যায়। ১১০৬ বঙ্গাব্দে রচিত 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যে রাজা কান্তেশ্বরের বিবরণীতে আছে :

'রাজশূন্য পাঙ্গাবাসীর সে রাজা হইল।
ভালুকের ছাও রাজা জঙ্গলে দেখিল॥
রাজা বলে এই বন সবে ঘিরি যাও।
এক গোটা ধরি দেও ভালুকের ছাও॥ [২]

এই যে ভালুক সম্পর্কিত ছড়া উত্তরবঙ্গে তা শুধুমাত্র ছেলেভুলোনো মেয়েলি ছড়াতেই পর্যবসিত হয়নি। ভালুক এখানে দেবতার মর্যাদাও পেয়েছে। একথা সকলের জানা আছে যে আদিম মানুষ জন্তুকে দেবতা ভাবত বা দেবতার জন্তুরূপ কল্পনা করত। সভ্য মানুষের পুরাণাদিতেও তার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরে জন্তুরূপী দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। যে পিরামিড সবচেয়ে পুরোনো তারও অনেক আগে থেকে—মানুষের বর্বর অবস্থা থেকে এই পূজার ধারা চলে এসেছে। মিশরীয় দেবতা 'হেথর' (Hethor)-এর গাভীরূপ এবং 'সেবেক' (Sebek)-এর কুম্ভীররূপ প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশেও রুদ্র-শিব, ভগবতী প্রভৃতির বৃষভ, গাভী, শৃগাল প্রভৃতি রূপের কথা পাওয়া যায়। বানরমূর্তি মহাবীর এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষের পূজা পাচ্ছেন। আদিম মানুষ যে জন্তুরূপী দেবতার পূজা করত এসব তারই নিদর্শন। আদিম মানুষ মনে করতো জন্তুর শক্তি, সাহস ও বুদ্ধি তার নিজের চাইতেও অনেক বেশি। আরও বিশ্বাস করত জন্তু মরে গেলেও তার আত্মা মরে না। মৃত্যুর পরেও তার আত্মা তেমনি শক্তিশালী থাকে এবং মানুষের ইষ্ট বা অনিষ্ট করতে পারে। তারই ফলে জন্তুকে দেবতারূপে কল্পনা করা তার পক্ষে অতি স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিল; সে বিশ্বাস করল জন্তুদেহেও দেবতা আপন শক্তি প্রকাশ করতে পারেন। এইরূপ বিশ্বাসবশতই উত্তরবঙ্গের আদিম সমাজে ভল্লুক দেবতা আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

জগতের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে ভালুকের উল্লেখ আছে। এতে জানা যায় যে, কুরুবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্বরণের (ঋ. ৫/৫৩/১০) পিতা ছিলেন ঋক্ষ বা ভল্লুক। পৌরাণিক যুগে দেখা যায় ভল্লুকরাজের নাম জাম্ববান। ইনি ব্রহ্মার পুত্র : রামায়ণের কালে লঙ্কাসমরে রামচন্দ্রের মন্ত্রী। সীতা অন্বেষণকালে দক্ষিণদিকে প্রেরিত অঙ্গদ প্রভৃতির ইনি সহচর ছিলেন (রামায়ণ ৪, ৪১. ২; কৃত্তিবাসী রামায়ণ-উত্তরকাণ্ড-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ ৫৫ পৃ)। এই প্রসঙ্গে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ৩৪ অধ্যায়ের ১২১-১২৩ সর্গের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে দেখা যাচ্ছে রাবণবধের পর শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাকে উদ্ধার করে অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা করলেন, 'তখন সুগ্রীব ও বিভীষণ

তাঁদের অনুচর বানর ভল্লুক ও রাক্ষসগণের সঙ্গে (পুষ্পকরথে) আরোহণ করে প্রশস্ত আসনে সুখে উপবিষ্ট হলেন।' রামায়ণে উত্তরকাণ্ডের চতুর্দশ অধ্যায়ের ৩৮-৪০ সর্গ থেকে জানা যায়; ওই সকল 'বানর ভল্লুক ও রাক্ষসগণ মধুপান ও মাংস ফলমূলাদি ভক্ষণ করে পরম সুখে কয়েকমাস অযোধ্যায় বাস' করে রামের অনুমতিক্রমে সুগ্রীব বিভীষণাদির সঙ্গে স্বদেশে ফিরে যায়। এ থেকে রামায়ণের যুগে আর্যজাতির মধ্যে ভল্লুকাদি জন্তুর সংশ্রবের কথা জানা যায়। এটি বিশেষ লক্ষণীয় যে ভাল্লুক ভারতীয় সভ্যতার আদিম যুগ থেকেই পুরাণেতিহাসে পরিচিত। ভল্লুকরাজ জাম্ববান এবং ভল্লুক রাজকন্যা জাম্ববতী-র নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভল্লুকরূপী এই পাত্রপাত্রীরা বীর্যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে আর্যদের চেয়ে কম ছিলেন না। [৩]

ঋক্ষ বা ভল্লুকরাজ জাম্ববানের ভাগিনেয় (শ্রীকৃষ্ণের পত্নী জাম্ববতীর পুত্র) শাম্ব এককালে এদেশে পূজা পেতেন। 'বায়ুপুরাণ'-এর সপ্তনবতিতম অধ্যায়ে সূতকথিত প্রথম শ্লোকে আছে :

মনুষ্য প্রকৃতীন্ দেবান্ কীর্তিমানান্নিবোধত।
সঙ্কর্ষণ বাসুদেব প্রদ্যুম্ন শাম্ব এব চ।
অনিরুদ্ধশ্চ পঞ্চতে বংশবীরাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।

নৈমিষারণ্যে পুরাণকাহিনী শ্রবণেচ্ছু সমবেত ঋষিগণকে সম্বোধন করে সূত বললেন— মনুষ্য প্রকৃতি দেবতাদিগের যে সকল নাম কীর্তিত হচ্ছে তা আপনারা শ্রবণ করুন। সঙ্কর্ষণ (অর্থাৎ বলরাম), বাসুদেব (অর্থাৎ কৃষ্ণ), প্রদ্যুম্ন, শাম্ব এবং অনিরুদ্ধ — (এঁরাই) পাঁচজন বংশের বীর বলে প্রকীর্তিত হয়ে থাকেন। এই বংশ যে বৃষ্ণি বংশ তাতে সন্দেহ নেই। পুরাণকার এঁদেরকে শুধু দেবতা বলেই ক্ষান্ত হন- নি। তাঁরা যে আদিতে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কর্মবীর মনুষ্য ছিলেন এবং পরে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা 'মনুষ্য প্রকৃতি' বিশেষণটির দ্বারা সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে ভল্লুকরাজ জাম্ববানের ভাগিনেয় শাম্ব দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

বায়ুপুরাণের উপরে উদ্ধৃত শ্লোক এবং মোরা শিলালেখ থেকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তা এই যে, পঞ্চরাত্র ব্যূহবাদের সম্যক প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত ভল্লুকরাজ-ভাগিনেয় শাম্বের পূজা তাঁর অন্য তিনজন আত্মীয়ের পূজার সঙ্গে সমভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে ভবিষ্য, বরাহ, শাম্ব প্রভৃতি পুরাণে শাম্বের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে দেওয়া হয়েছে। এর কারণ কী তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। হয়তো তিনি যে অনার্যবংশীয় জাম্ববতীর কন্যার (ভাল্লুকরাজ জাম্ববানের ভগিনী) গর্ভজাত পুত্র এটাই কি তাঁর বহির্গমনের একমাত্র কারণ? অথবা অন্য সম্প্রদায়ের দেবতা শিবের প্রসাদে তিনি জাম্ববতীর কোলে এসেছিলেন জন্যই কি তাঁকে বৈষ্ণব দেবতাদের মধ্যে অপাংক্তেয় করা হয়েছিল? আবার এও সম্ভব যে কাকদ্বীপীয় প্রথায় সূর্যপূজা প্রচলনের জন্য সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্যই তাঁর অসম্মান হয়েছিল। কিন্তু এ সবই পরবর্তীকালীন পৌরাণিক কাহিনী ও কিংবদন্তী। তবে এসব কিংবদন্তীর কারণ যাই হোক না কেন, খ্রিস্টিয় প্রথম কয়েক শতকেও যে সস্ত্রীক শাম্ব কিছুটা সম্মান ও পূজা

পেয়ে আসছিলেন বরাহমিহির তাঁর 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থের প্রতিমালক্ষণ অধ্যায়ে সে কথা লিখে গেছেন :

শাম্বশ্চ গদাহস্তঃ প্রদ্যুম্নশ্চাপভৃৎ সুরূপশ্চ।
অনয়োঃ স্ত্রিয়ৌ কার্যৌ খেটকনিস্ত্রিংশ ধারিনৌ।।

এরপরে ভল্লুকরাজ জাম্ববানের ভাগিনেয় শাম্বের পূজা আর্য সমাজে রহিত হয়ে যায়। কারণ পরবর্তীকালে বাসুদেব কৃষ্ণ ও তাঁর তিনজন নিকট আত্মীয়ের নামের সংখ্যা বৃদ্ধি গুপ্তযুগ পর্যন্তও সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় [৪]। কিন্তু এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে অবহেলিত শাম্বের এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সংখ্যার মধ্যে কোনো স্থান হয়নি। সে যাই হোক, ভল্লুক বংশোদ্ভব ব্যক্তিও যে এককালে এ দেশে জনসমাজে পূজা পেতেন এই তথ্যও এদেশে ভল্লুক পূজার অন্যতম নিদর্শন।

এদেশের পুরাণে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার বাহন হচ্ছে ঐরাবত বা হাতি। কিন্তু বাংলার প্রাচীন কবি হরিদেবের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে দেখা যায়, ভল্লুক হচ্ছে বিশ্বকর্মার বাহন। গণেশের জন্মের পর দেবতারা যখন শিবভবনে তাঁকে দেখতে এলেন তখন :

ছাগল বাহনে আইলা দেব হুতাশন।
ভল্লুকেতে বিশ্বকর্মা কুরঙ্গে পবন॥

বিশ্বকর্মার এই বাহন পরিবর্তনের কি কোনো বিশেষ তাৎপর্য আছে?

কবি হরিদেব তাঁর 'শীতলামঙ্গল' কাব্যে ভল্লুক শহর নামক একটি নগরও সৃষ্টি করেছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত অংশ থেকে দেখা যাবে ভল্লুকের স্থান সেকালে কবিকল্পনায় হীন ছিল না। নারদ মুনি শীতলাদেবীকে বলছেন :

তবে কেন নাহি পূজা ভল্লুক শহর।
এহ মম দুঃখ মা গ ভাবিচি অন্তর।।
এতেক বলি এ মনি গেল ব্রহ্মাপুরে।
মনিবাক্যা মহাঁমাত্র কম্পে কলেবরে।।
হিতিকা সহিত বসি রত্ন সিংহাসনে।
কিরূপে লইব পূজা ভল্লুক ভুবনে।।
দাসী বলে শুন মাতা মোর নিবেদন।
জাইব ভল্লুকপুরী রথ আরোহণ।।
রথসজ্জা বসন্ত জেমন পুষ্পঝারা।
কখিলের রব হবে ভ্রমর ঝংকারা।।
ভল্লুক শহরে আছে সুসেন নন্দন।
তাহার পুরিমন্ত্রী হয়তো জাম্বুবান।।

রামেরে ভজনা করে মন্ত্রী জাম্বুবান।।
ভল্লুক শহর মধ্যে সভে কম্পমান।। ইত্যাদি।

কবি হরিদেব লিখেছেন নারদের পরামর্শে দেবী শীতলা ভল্লুক নগরে যাত্রা করলেন

বসে মাতা পুষ্পরথে পবনবেগের পথে
শন্নে উঠে পবনের ভয়ে।
... ...
সভে বলে আচম্বিত রাজসংবাদ প্রণিপাত
দেখি চাঁদ ভূমে পড়ে খসি।
দেখ আসি ভল্লুকের রায়।
বুঝি তব গেল গর্ব শহর মজিল সর্ব
এতদিনে তব রাজ্য জায়।।
শুনিয়া ভল্লুক রায় অন্তরে লাগয়ে ভয়
কহ মন্ত্রি বুঝিতে না পারি।
এই কি শুনি অকস্মাত রাজ্য মদ্ধে বজ্জোঘাত
শূন্য মার্গ রথ এসো ধরি।।
জতেক ভল্লুক হায় পর্বত ধরিতে চায়
হাত বাড়াইল জেন চাঁদে।
দ্বিলক্ষ জোজন থাকি চাঁদ করে ঝিকিমিকি
না ধরতে পড়িল প্রমাদে।

শীতলাদেবীর প্রতাপে ভল্লুক নগরে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হল। নগরীর অধিপতি জাম্বুবান চিন্তায় পড়ে গেলেন :

ত্রেতাযুগে ভজি রাম রঘুমণি।
তবে পূজি ভগবতী সভে পায়ে প্রাণী।

এই অবস্থায় শীতলাদেবীর পূজা করি কী করে? তখন :

আইল বশিষ্ঠ মুনি রামের পুরোহিত
কর এ দেবীর পূজা বেদের বিহিত।
শতদল কমল লক্ষ লক্ষ বিল্বদলে
গন্ধ চন্দন লাল জবা আর গঙ্গাজলে।
জাগ জজ্ঞে হমে পূজে দেবীর চরণ...
জয়ধ্বনি শংখধ্বনি উঠিল গগন।
ভল্লুক শহর মদ্ধে পূজে জাম্বুবান
ছয়মাসের মরা উঠে পায়ে প্রাণদান।
জীবজন্তু বৃক্ষ-আদি যত মরেছিল
দেবীর বরেতে সভে উঠিয়া বসিল।

কবি হরিদেব রচিত শীতলামঙ্গলে উল্লিখিত 'ভল্লুক শহরের' বৃত্তান্ত কোনো পুরাণে নেই। তবে 'শীতলার মুখের আদল হিমালয়ের মানুষের। সেই পরম্পরাতেই কি হরিদেব শীতলাকে বাস করাইয়াছেন হিমালয় পর্বতের শিখরদেশে' [৪]। যিনি ভল্লুক শহরে

শীতলাদেবীর পূজা করেছিলেন, সেই আদর্শ বশিষ্ঠ মুনি চীনাচার তন্ত্রে সিদ্ধ [৬]। ওই তথ্য থেকে একটি মূল্যবান সঙ্কেত পাওয়া গেল। হরিদেবের কল্পনার ভল্লুক শহর যেখানেই থাকুক না কেন সেটি ছিল হিমালয়ের পাদদেশে। উত্তরবঙ্গের অধিবাসী চর্যাকার ভুসুকু ছিলেন রাউত ও সহজযোগী। হাজার বৎসর পূর্বের অপভ্রংশ দোঁহাপদে, বজ্রনৌকা বয়ে চণ্ডালী গ্রহণ করে বাঙালি হবার যে তত্ত্ব তিনি ব্যক্ত করে গেছেন, দূরকালের ব্যবধানেও সে 'বঙ্গাচার' বেঁচে আছে, বেঁচে আছে আর্য ও আর্যেতর যুক্ত সাধনার মধ্যে। সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে মঙ্গলকাব্যের গভীরে প্রবেশ করলে এই 'বঙ্গাচারের' প্রকৃত স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

যাই হোক, ব্রাহ্মণ্য ও আদিম আর্যদের দেবভাবনায় দু-টি সম্পূর্ণ পৃথক ধারা দেখতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য উপাস্য দেবতার প্রতীকে তত্ত্বগত শাস্ত্রীয় প্রতিমা পূজিত হচ্ছে এবং আদিম আর্যদের পূজা চলছে স্বভাবজ উল্কা, ফসিল, কাঠ বা পাথরের চ্যাং (block), বিবিধ প্রকারের গাছ, জন্তু এবং তির্যক প্রাণীর মিশ্রমূর্তি বা মুণ্ডাদি। 'প্রতিমালক্ষণ' শাস্ত্রের লক্ষণান্বিত ব্রাহ্মণ্য দেবতার পূজার পাশাপাশি, মিশ্র বা অবিমিশ্র রূপে এই সব লৌকিক পূজাও সুদূর অতীতকাল থেকেই চলে আসছে। 'ঠুঁঠা', 'কূর্ম', 'চ্যাংমুড়ি, বট, তুলসী, বিল্ব, সিজ, হাতি, বাঘ, ঘোড়া, বরাহ প্রভৃতির পূজা সুপরিচিত। আলোচনার অভাবে ভল্লুক দেবতার পূজা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেনি।

হরিদেবের 'শীতলামঙ্গল' কাব্যে দেবী পুষ্পরথে আরোহণ করে পবনের বেগে শূন্যপথে যাতায়াত করছেন। কিন্তু কবি দৈবকীনন্দনের দৃষ্টিতে দেবী শীতলা 'ভল্লুকবাহনা'।

আনুষঙ্গিক উপাদান বর্জন করলে দেখা যায় বনদেবতার পূজা উত্তরবঙ্গের অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। হিমালয়ের পাদদেশস্থ ডুয়ার্স এবং তরাই অঞ্চলের সীমানা থেকে মালদহ পর্যন্ত। সুদূর অতীতকাল থেকে এই সকল বনদেবতার পূজা-উৎসবের সঙ্গে স্থানীয় বনবাসীদের প্রকৃত জীবনযাত্রার গভীর ও প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। এই সব উৎসব পার্বণ বা ধ্যান ধারণা বৈদিক আচারভুক্ত নয়। পশ্চিম থেকে পূর্ব ভারতে আর্য সংস্কৃতির বিস্তার হয়েছে ধীরে ধীরে এবং অনেক পরে। তাও এক সময়ে সব অঞ্চলে হয়নি। কৌতূহলী পাঠক বাংলাদেশে আর্য-সংস্কৃতির ক্রমবিস্তার সম্বন্ধে ইতিহাসাচার্য ড. দীনেশচন্দ্র সরকারের Spread of Aryanisation in Bengal (J A. S. B. Vol 18, No 2, 1952) শীর্ষক পড়ে দেখতে পারেন। ঐতিহাসিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন, আর্য-সংস্কৃতির প্রসার প্রথমে হয় উত্তর ও পূর্ববঙ্গে, পরে পশ্চিমবঙ্গে।

আর্য-সংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিষ্ঠার আগে উত্তরবঙ্গে অনার্য-সংস্কৃতির একটা সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। তার পরিচয় মেলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরাস্ত্র থেকে। নিষাদ বা আদি অষ্ট্রান এবং কিরাত জাতির বিভিন্ন শাখার সাংস্কৃতিক আধিপত্য এই এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিকার, পশুপালন, কৃষি প্রভৃতি নানা পর্যায়ভুক্ত ছিল এই সংস্কৃতি! বন্য জন্তুর স্বভাব দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ করে, তাকে পোষ মানিয়ে, তার বংশবৃদ্ধি (breeding) করার কৌশল উদ্ভাবন করে (খাদ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহারের জন্য) সেকালের জনসাধারণ অনেক সমস্যার সমাধান করেছিলেন। গো পালন করা, হাতিকে পোষ মানানো প্রভৃতির মতো বুনো ভালুককেও তারা পোষ মানিয়েছিলেন এবং ক্রমে

ভালুক হয়ে উঠেছিল গৃহপালিত পশুদের অন্যতম এবং এদেশের পশুপালকদের একটি শাখার বা ক্ল্যানের 'টোটেম'-ও ছিল ভালুক। আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে ১৩১৯ সালে 'জন্মভূমি' প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'শিবাখ্যা কিন্নকর কাব্য' নামক একখানি বই। যার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল অমরাগড়ের 'মাহিন্দী রাজার' বীরত্বের কাহিনী প্রচার করা। এতে দেখা যায় মহেন্দ্র রাজার বংশবিবরণে ভল্লুকের সংশ্রবের কাহিনী :

শোন মহারাজ শোন দিয়া মন
কহি মহেন্দ্রের বংশ বিবরণ,
পিতামহ তার ক্ষত্রিয় কুমার
ভল্লুপদ নাম জানে সর্বজন,
ভল্লুকে তাহারে করিল পালন।
...জাতীয় প্রকৃতি লুকাবার নয়,
শৈশবে সে শিশু নির্ভয় হৃদয়,
মৃগয়া করিত শ্বাপদ বধিত
বনের বরাহ করিয়া বিজয়।]৭]

এই বর্ণনা থেকে অমরাগড় অঞ্চলে পশুপালকদের প্রাধান্যেরই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আরও জানা যাচ্ছে যে ভালুক ছিল পালিত পশুদের অন্যতম। অমরাগড় রাজবংশে ভালুক সংশ্রব থাকার ফলে আজও ভালুক মরলে তাঁদের অশৌচ পালন করতে হয়। কারণ 'জাতীয় প্রকৃতি লুকাবার নয়'; ক্ষত্রিয় কুমার হলেও তার—

ভল্লুপদ নাম জানে সর্বজন,
ভল্লুকে তাহারে করিল পালন।

কিংবদন্তী বলে থাকে, এই ভল্লুপাদ (ভল্লুপদ, ভল্লুকপদ) ছিলেন একজন ঋষি। ভালুক পালিত বা ভালুকের আকৃতি বলে তাঁর নাম হয় ভল্লুপাদ। আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীতে তিনি গোপভূমে (আধুনিক বর্ধমান জেলা) যে রাজ্য স্থাপন করেন, তারই নাম ভাল্কি; রাজধানীর নাম অমরাগড়। এখনও গ্রাম প্রদক্ষিণকালে গ্রাম-প্রধানেরা হাতিশালা, ভালুকশালা, ধনাগার প্রভৃতি নাম করে উঁচু উঁচু ঢিবি দেখিয়ে থাকেন। ভালুক টোটেম এবং ভালুক সম্পর্কিত কাহিনী আদিম পশুপালক সমাজের নিদর্শন। এই তথ্য থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গেও যে ভালুক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।

জৈনধর্মেও ভণ্ডী বা যক্ষ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। জৈনশাস্ত্র পিণ্ডনিরুক্তি গ্রন্থে সামিলা নগরের বহির্ভাগে একটি বাগানে অবস্থিত যক্ষের মন্দিরে প্রার্থনা করে মণিভদ্র জলবসন্ত রোগ থেকে মুক্ত হয়েছিল। আর মথুরার জনপ্রিয় দেবতা ভণ্ডীর যক্ষ ভাণ্ডীর বনতীর্থে বাস করতেন। জৈন শাস্ত্রে গুহ্যকগণের উল্লেখ আছে। গুহ্যকগণ হিমালয় পর্বতোপরি কৈলাসনিবাসী— তাঁরা ভালুকের মূর্তিতে পৃথিবীতে বাস করেন। [৮] ভাণ্ডীর সঙ্গে কি ধর্মঠাকুরের সংশ্রব আছে? যাদুনাথের ধর্মমঙ্গলে ভাল্লুক

বনের উল্লেখ আছে। জননী মদনা বালকপুত্র লুইচন্দ্রকে যেসব বনে ভাল্লুক প্রভৃতি বন্যজন্তু বাস করে সেইসব বনে বেড়াতে নিষেধ করে বলছেন :

বাছা না যাইও বল্লুকার বনে
কি জানে আছয়ে ভালে নিশি অবসান কালে
বিপরীত দেখিনু স্বপনে।
কোলে বইস দেখি চাঁদমুখ
তোমার বিপদ বাণী কহিতে বিদরে প্রাণী
মনে বড় পাইয়াছি দুখ।

এই বল্লুকা বা ভালুকের বন কোথায় অবস্থিত ছিল জানা নেই। তবে ধর্মরাজের প্রভাব এককালে উত্তরবঙ্গেও বিশেষভাবে বিস্তৃত ছিল, এজন্য হিমালয়ের পাদদেশস্থ অঞ্চলে ওটির অবস্থিতি কল্পনা করলে অন্যায় হবে না।

এই হিমালয়ের পাদদেশস্থ ডুয়ার্সে প্রচলিত একটি কিংবদন্তী থেকে ভাণ্ডী বা ভালুকের বিশেষ প্রাধান্য যে এই অঞ্চলে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব দুরামারী গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ রায় নামক এক প্রবীণ 'দেউনিয়ার' মুখে শুনেছি, অতীতে টোসাসুর, বীরুবাগ, ভাণ্ডাকুড়া, ঘোগাসুর, লোহাসুর, এবং জিজিরা-মজিরাসুর নামক ছয় ভাই উত্তরদিকের পাহাড় থেকে নেমে আসেন এবং আসার পর সমানে মানুষের ঘাড় মুচড়িয়ে মারতেন। এঁদের অত্যাচারে মনুষ্য-সমাজে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল। শেষপর্যন্ত এঁদের পুজোর ব্যবস্থা করা হলে এঁরা শান্ত হয়ে দক্ষিণ দেশের দিকে চলে যান। এই কিংবদন্তীটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কারণ এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে অতীতের এক ইতিহাস; সে ইতিহাস হিমালয়ের ওপার থেকে ইন্ডো মঙ্গোলয়েড বা কিরাত জাতির আগমনের ইতিহাস। এই ইতিহাসের প্রথমপর্ব আদি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, কিরাতরা যাদের শাখা-জন। দ্বিতীয় পর্ব জৈন ও বৌদ্ধদের ইতিহাস এবং তৃতীয় পর্ব হিন্দুব্রাহ্মণ্য সভ্যতার ইতিহাস এবং এই পর্বে এই অঞ্চলে শৈবধর্মের প্রচলন। একথা মনে রাখা দরকার যে, শিব আদি অকৃত্রিম প্রাগার্য ও অনার্য দেবতা, যিনি খুব সহজে আমাদের দেশে সর্বশ্রেণির হিন্দুর লোকদেবতায় পরিণত হয়েছেন। নৃতত্ত্ব বা Ethnology এইভাবেই শাখা বিস্তার করে থাকে।

যাই হোক, উল্লিখিত নবাগত ছয় ভাইয়ের মধ্যে বীরুবাগ এবং ভাণ্ডাকুড়া নাম দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বেশ বোঝা যায় এ দু-টি কথার মধ্যে ব্যাঘ্র (বীরুবাগ) এবং ভালুক (ভাণ্ডী = ভাণ্ডাকুড়া) লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ বাঘ ও ভালুকের উৎপাতে ও উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ এদের পূজা করে বশীভূত করবার চেষ্টা করে। ভাণ্ডানী, সোনারায় বীরুবাগ, ভাণ্ডাকুড়া প্রভৃতি নানারকম বনদেবতার পুজোর প্রচলন তাই আজও ডুয়ার্সের অরণ্যসঙ্কুল অঞ্চলে বেশি এবং এই সব দেবদেবীর পূজা সংক্রান্ত কিংবদন্তীর প্রাচুর্যও লক্ষণীয়। গয়েরকাটা বনাঞ্চলের সীমানা সন্নিহিত পূর্ব দুরামারী ও খট্টিমারী গ্রামে অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে পৃথক পৃথক মণ্ডপে পূজা পাচ্ছেন ব্যাঘ্রদেবতা বীরুবাগ এবং ভল্লুকদেবতা ভাণ্ডাকুড়া। নাম থেকেই বোঝা যায়—ভাণ্ডাকুড়া হচ্ছেন 'ভাণ্ডী' বা ভালুকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং এই দেবতার পূজায় দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

ছিল। এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, প্রাগৈতিহাসিক অনার্য জন্তু পূজার এটি অন্যতম নিদর্শন।

'ভাণ্ডাকুড়া' ঠাকুরের মূর্তি মাটি দিয়ে তৈরি—দেখতে সন্ন্যাসীর মতো। শ্বেতবর্ণ, পরণে ব্যাঘ্র-চর্ম, মাথায় জটা, দ্বিভুজ, শিরে সর্পভূষণ, পাশে অন্যকোনো মূর্তি নেই। বাহনও নেই। চৈত্র সংক্রান্তির দিন পূজা অবশ্য করণীয়; তবে অন্যসময় করলেও বাধা নেই। প্রায় কুড়ি বছর আগে চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে মেলা হত, এখন বন্ধ হয়ে গেছে। হয়তো বা আর্থিক কারণেই। 'ভাণ্ডাকুড়া' ঠাকুরের পূজার উপকরণ সবরকমের ফুল, দুর্বা, চন্দন, ফল, মিষ্টি, বাতাসা, চিড়া, মুড়ি, খৈ, দুধ, দৈ প্রভৃতি। পূজায় অনেকে মানত করে পাঁঠা, ছাগল, হাঁস, পায়রা প্রভৃতি। পাঁঠা ও পায়রা ঘাড় মুচড়ে বলি দেওয়া হয় (এটি আদিম মানবসমাজের পশুহত্যার নিদর্শন); কিন্তু ছাগল আর হাঁস বলি দেওয়া হয় না— উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই পূজার একটি বিশেষত্ব এই, সকল রকমের ফুল দিয়ে পূজা করা হলেও বেলপাতা বা তুলসীপাতার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ শিবপূজায় অবশ্য প্রয়োজনীয় বেলপাতা বা বিষ্ণুপূজায় অবশ্য প্রয়োজনীয় তুলসীপাতার প্রয়োজন হয় না। এর একটিমাত্র অর্থই হতে পারে যে ইনি শিবও নন, বিষ্ণুও নন, নেহাত একজন গ্রামদেবতা। এমনও হতে পারে যে ইনি পূর্বদিকের অধিপতি সূর্য।

গ্রামদেবতার স্বরূপ ভাবনায়, বিশেষত সূর্যের কল্পনায় ও পূজা-আচারে শিব, বরুণ, যম, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবসত্তার সংমিশ্রণ ঘটেছে। বিভিন্ন দেবসত্তার সংমিশ্রণের জন্য বিস্মিত হবার কিছু নেই। এক দেবতার বর্ণকর্ম অন্যে আরোপিত এবং একের সঙ্গে অন্যের সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। সেইজন্যই দেখা যায় একই মন্ত্রে ভাণ্ডাকুড়ার এবং বীরুবাগের পূজা হয়ে থাকে, এবং একই প্রাঙ্গণে অবস্থিত তাদের পূজার থান। এই সংস্কারমুক্ত উদারতার প্রতীক 'ভাণ্ডাকুড়া' উত্তরবঙ্গের অতীত সংস্কৃতির আদিমতম নিদর্শনরূপে আজও বিরাজমান।

'ভাণ্ডাকুড়া' নামক ভল্লুকদেবতার পূজা করেন স্থানীয় রাজবংশী অধিকারী। কোনো পুরোহিত ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। পূজায় যে মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তা হল :

আসন— গোঁসাই গোবিন্দ নাম চিত্রকূটের বরে।
ভাণ্ডাকুড়া বসিল মোর পূজার ভিতরে।।
মোর পূজা ছাড়ি ঠাকুর অন্য পূজায় যাবু।
দোহাই লাগে দেবধর্ম কীর্তিকের মুণ্ড খাবু।।

পূজা— অং নামে সং সেবা সম্বন্ধের নামে পূজা।
জলে পুষ্পে ভাণ্ডাকুড়া ঠাকুর তোমার পদে পূজা।।

শান্তি— শান্তি পুরি মাই শান্তি পুরি মাই।
তোমার জনম স্থান দেখিবারে চাই।।
দেখিনু দেখিনু মুই নিরলে বসিয়া।
হেনকালে মহাদেব মিলিল আসিয়া।।

অতুল কুণ্ডল মাও সরস্বতী হাতে।
বাড়ীর বাসস্থ তুই সন্তানের থান শিরি।।
বিসর্জন— সওয়া শত বন নিলু মুই হস্তেতে করিয়া।
মোর পূজা খা ভাণ্ডাকুড়া ঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়া।।
পূজা পালি খায়া বাবা তুষ্ট করেক মন।
দখিন দেশের নাগি করহ গমন।।

দুরামারী বা খট্টিমারী গ্রামে ভাণ্ডাকুড়ার কোনো ইট পাথরে তৈরি মন্দির নেই। সাধারণ ঢেউ তোলা টিনের ছোটো ঘরে তিনি প্রতিষ্ঠিত। সকাল থেকেই পূজা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠাতা 'দেউনিয়া'-র পূজা হলে তবে অন্যেরা পূজা দেবার অধিকার পায়— গ্রামের প্রতিবেশী এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাসিন্দারাও পূজা পাঠান। আগে পাঁঠা, পায়রা, হাঁস যে কত বলি হত তার ইয়ত্তা নেই; এখন কমে গেছে—হয়তো সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফলে, অথবা আর্থিক কারণেই। বলির সঙ্কেত পেলেই যে যেখানে থাকে পাঁঠা, পায়রা নিয়ে বলি দিতে আরম্ভ করত; বলি নিয়ে কাড়াকাড়িও হত। অর্থাৎ যুদ্ধ। আজ যা বর্বরতা বলে মনে হয়, অতীতে যে বীরত্বের খেলা বলে গণ্য হত তাতে সন্দেহ নেই। বেশ বোঝা যায় ভাণ্ডাকুড়া বা বীরুবাগের উৎসবকে কেন্দ্র করে একসময়ে ডুয়ার্স অঞ্চলে একরকম বীরত্বের প্রদর্শনী হত। এখন তার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে শুধু।

খট্টিমারী গ্রামের 'ভাণ্ডাকুড়া' ঠাকুরের পূজার থান বিশেষত্বের দাবি করতে পারে। জলপাইগুড়ি জেলার পল্লী অঞ্চলে মজা বিলকে বলে 'কুড়া'। খট্টিমারী গ্রামে এইরকম একটি 'কুড়া' আছে, যার উপরিভাগ কচুরিপানা ও অন্যান্য আবর্জনা জমে জমে শুকিয়ে গেছে; কিন্তু তলদেশে রয়েছে জল। এই শুকনো জমাট দ্রব্যাদি এখন মাটি হয়ে গেছে এবং তার উপরে উঠেছে 'ভাণ্ডাকুড়া' ঠাকুরের মণ্ডপঘর। হয়তো এককালে এই 'কুড়া' বা জলাশয়ে আসত 'ভাণ্ডী' বা ভালুকরা জল খেতে এবং তা থেকেই জায়গাটির নাম হয়েছে ভাণ্ডাকুড়া এবং বনদেবতার নামও হয়েছে তা থেকেই। এখানকার ভল্লুকদেবতা ভাণ্ডাকুড়ার পূজা পদ্ধতি দুরামারী গ্রামের পূজা পদ্ধতিরই অনুরূপ।

কিংবদন্তীর আশ্রয় ছেড়ে 'ভাণ্ডাকুড়া' ঠাকুরের পূজাস্থানের বাস্তব পরিবেশ থেকে তার ঐতিহাসিকতার কী ইঙ্গিত পাওয়া যায় দেখা যাক। প্রথমে বিচার্য ভৌগোলিক অবস্থান। পূজাস্থানের অদূরে পূর্বদিকে মাইল তিনেক দূরে গয়েরকাটা বনাঞ্চল এবং দক্ষিণে মাইল পনের দূরে লাটাগুড়ি বনাঞ্চল, যার অন্যতম হচ্ছে গরুমারা গণ্ডার নিবাস। এই অঞ্চলে এককালে ভালুকের উপদ্রব ছিল খুব বেশি। 'কালচার জোন' হিসেবে এই এলাকাটিকে ভাণ্ডাকুড়া পূজার অন্যতম 'জোন' বলা যায়। এই অঞ্চলে নানারকম ব্যাঘ্র দেবতা, সর্প দেবতা, বিষহরি, কৃষিদেবতা মহাকাল, হাতির দেবতা গণেশ প্রভৃতির পূজা যেমন হয়ে থাকে, তেমনি পূজা হয়ে থাকে ভল্লুক দেবতার। এই এলাকায় অনার্য নিষাদ ও বোড়ো সংস্কৃতির অজস্র শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে উত্তর থেকে ক্রমে দক্ষিণদিকে এসেছে।

এই দক্ষিণদিকের কথায় মনে পড়ে ভাণ্ডাকুড়া পূজার মন্ত্রের শেষ দু-টি লাইনের কথা :

পূজা পালি খায়া বাবা তুষ্ট করেক মন।
দক্ষিণ দেশের লাগি করহ গমন।

কিরাত বা ইণ্ডো মঙ্গোলয়েড বোডো সংস্কৃতি উত্তরদিক থেকে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল ডিঙিয়ে দক্ষিণদিকে প্রসারিত হয়েছে। এই তথ্য যেমন এই শ্লোক থেকে মেলে, তেমনি মেলে ইতিহাসের আরও এক তথ্য। ইণ্ডো মঙ্গোলয়েড কিরাত জাতির লোকেরা উত্তরদিক থেকে আসা ছাড়া, এই অঞ্চলের অন্য সব অভিযানই এসেছে দক্ষিণ দিক থেকে। এবং এইসব দক্ষিণী অভিযানের ফলে এই অঞ্চলে লোকেরা অত্যাচারিত হয়েছে সময়ে সময়ে। এইজন্য 'দক্ষিণী'-দের প্রতি এই অঞ্চলের লোকের বিরূপতা খুব স্বাভাবিক এবং এই মন্ত্রটি একটি ঐতিহাসিক সত্যেরই সন্ধান দিয়ে থাকে।

ডুয়ার্স অঞ্চলে প্রচলিত গোরক্ষনাথের গানে শোনা যায় :

'বেগমপুর পাইকপাড়া— তিন নয় আঠার এ ঘোড়া।
ঘোড়ায় ঘোড়ায় জুঝাইলাম, বাইশ বদলে হারাইলং।
বাইশ বদলা গাছি, ওজি ধরি বাঙালোক কাটিয়া পুজি।
এই বাঙালোক করিব কি, ঘায়ে ঘুয়ে চৌচির।
চৌচির চালিতা হাসে, তাক দেখে মাগুয়া হাসে।
অন্য আর এক গানে শোনা যায় :
শিবের মাগন ভাই শিবের মাগন।
ভাটি হইতে আইল পীর হাতে কঙ্কণ।।
হাতে কঙ্কণ পীরের মুখে চাপ দাড়ি।
দই দুধ মাঙ্গিয়া গেল নন্দ গোয়ালার বাড়ি।।
গোয়ালা বলে আছেরে, গোয়ালিনী বলে নাই।
গোপত করিয়া মইল সাত সওয়া গাই।।

এই দুই ছড়াতে দক্ষিণ দেশাগত 'বাঙাল' এবং 'পীরের' অত্যাচারের বিবরণ জানা যায়। উত্তরবঙ্গের 'ময়নামতীর পালা'-য় রাজা মাণিকচাঁদের নবনিযুক্ত কর্মচারীর প্রসঙ্গে শুনতে পাওয়া যায় :

দক্ষিণ হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুল্লকৎ কৈল বাড়ি।।
দেওয়ানগিরি চাকুরি রাজা সেই বাঙ্গালক দিল।
দেড় কুড়ি খাজনা ছিল পনর গণ্ডা নিল।।

উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের উল্লেখ করে (মাণিকচন্দ্র রাজার গান এবং গোপীচন্দ্রের গান) গ্রীয়ারসন লিখেছেন, 'This and other northern Country Songs, it should be noted, are remarkable for their hatred of the 'Dakshina desa', from which the evil-mind vangala comes.'

G. A. S. B 1877 No 3 p 189 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বন ও মেলা' গ্রন্থের মালদহ জেলার বিবরণীতে (১ম খণ্ড-২৫ পৃ) লেখা আছে, 'বাঙাল কথাটি পূর্ববঙ্গীয়দের 'বাঙাল'

নামের সহিত কোনো সম্বন্ধ নাই, ইহা পলিয়া রাজবংশীদের আঞ্চলিক নাম। উহাদের ভাষার সহিত কোচবিহারের ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।' কিন্তু কোচবিহারের ইতিহাস লেখক খান চৌধুরী আমানতউল্লা লিখেছেন 'পূর্বে কামরূপবাসীগণ মুসলমানকে 'বঙ্গাল' বলিতেন; পরে দক্ষিণ-পশ্চিম দেশ হইতে আগত ব্যক্তিমাত্রই 'বঙ্গাল' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আসামে ইয়োরোপীয়গণকে 'বগাবাঙ্গাল' (সাদা বাঙ্গাল) বলে। শ্রীহট্টের পূর্বাঞ্চলে, জয়ন্তীয়া এবং কাছাড় অঞ্চলে 'বঙ্গাল' বলিতে এখনও মুসলমান বুঝাইয়া থাকে'। [৯] ভাণ্ডাকুড়া পূজায় হিংস্র জন্তুদের দক্ষিণদেশে যাবার অনুরোধের অর্থ এ থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মুসলমান অত্যাচারের ফলে এই অঞ্চলের হিন্দুদের মঠ-মন্দিরাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং অন্যান্য অত্যাচারের ফলে দক্ষিণ দেশাগত ব্যক্তি অর্থাৎ ভাটিয়াদের প্রতি যে বিদ্বেষের সূত্রপাত হয় তার রেশ সুদীর্ঘকাল পরেও রয়ে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভাণ্ডাকুড়া ঠাকুরের পূজার থান দুরামারী গ্রাম থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে রয়েছে মোগলগড় এবং মোগলকাটা নামক স্থান, যা এই অঞ্চলে মুসলমান শাসন এবং অত্যাচারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণের বীরত্বের পরিচায়ক।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ডুয়ার্স অঞ্চলে কিরাত সংস্কৃতি ধারার একটা নিটোল নিজস্ব রূপ আছে। যা বাংলাদেশে আর কোনো অঞ্চলে নেই। তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য বা আর্য সংস্কৃতির প্রাধান্য এখানে যে কত কম, তা জিজ্ঞাসু মন নিয়ে গ্রামাঞ্চলে ঘুরলেই বুঝতে পারা যায়। উপর উপর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রলেপ আছে তা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না। শুধু তাই নয়। আর্য বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে যে পদে পদে তথাকথিত অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে আপোষ করে চলতে হচ্ছে, জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চল বোধ হয় তার অন্যতম প্রধান সাক্ষী।

এই প্রসঙ্গে দেবীরূপিনী স্ত্রী ভালুকের পূজার কথা উল্লেখ না করলে রচনা অসমাপ্ত রয়ে যাবে। কোচবিহার জেলার পাটকুড়া গোপালপুর গ্রামে ভল্লুক দেবতার স্ত্রী মূর্তি ঝাউলিদেবীর পূজা হয়ে থাকে। জঙ্গলাকীর্ণ এই অঞ্চলে যখন ভালুকের উপদ্রব খুব বেশি পরিমাণে ছিল, তখন দ্বিভূজা মাতৃমূর্তি চিন্তা করে ভল্লুকবাহনা ঝাউলিদেবীর পূজা প্রচলিত হয়। দেবীর একজন সহকারিণী আছেন, ঝপরীদেবী। উভয়ে সহোদরা ভগ্নী। দ্বিহস্ত বিশিষ্টা লাল হলুদ মিশ্রিত রঙ। ঝপরী দেবীর কোনো বাহন নেই। এই ঝাউলীদেবীর পূজায় কোনো বলির বিধান নেই। কলার খোলায় দৈ দুধ মুড়ি চিড়া মিষ্টি প্রভৃতি পূজার উপকরণ। একটা ধূপকাঠি, তিনটে টগর ফুল, চারটে তুলসীপাতা এই মাত্র পূজার সামগ্রী। এই পূজা সর্ববিঘ্ন দূর করে। পূজায় কোনো ব্রাহ্মণের অধিকার নেই, মন্ত্রও নেই— স্থানীয় গ্রামদেবতার মন্ত্রেই এই দেবীর পূজা হয়। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। উত্তরবঙ্গের রুহিদাস উপাধিধারী মুচিদের মধ্যে একটি সাঙ্কেতিক ভাষা প্রচলিত আছে, যাতে জয়ের প্রতিশব্দ 'ভালুক'। এরা ঝাগ্‌লি বলে বাঙালিদের দেবদেবীকে এবং তা থেকেই হয়েছেন ভল্লুকবাহনা দেবী 'ঝাউলি'। এই দেবীর সঙ্গিনীর নাম ঝপরী দেবী। এই নিদর্শন থেকে বোঝা যায় যে একসময় উত্তরবঙ্গের নানস্থানে ভল্লুকবাহনা দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল এবং সেটা আদৌ উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রতিপত্তির সাক্ষী নয়।

আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'দক্ষিণ-দেশেতে তুমি করহ গমন' মন্ত্রটিও একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায়নি। কারণ উত্তরবঙ্গ থেকে সুদূর দক্ষিণে উড়িষ্যায় ভল্লুক পূজার পরিচয় পাওয়া যায়। 'উড়িষ্যায় কুমারী মেয়েরা (আদিবাসীরা নয়) এক বিশেষ ব্রত পালন করার সময় আলুলায়িত অবিন্যস্ত কেশে গান গেয়ে নাচে। এই অবস্থায় তাদের 'ভালুকুনী' (ভল্লুকী) বলা হয়। তাই সেই ব্রতের নাম 'ভালুকুনী ওষা'। 'ওষা' অর্থ ব্রত বা পূজা উপলক্ষে উপবাস।' [অমৃতের সন্তান/গোপীনাথ মোহান্তি]।

কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড. হরিপদ চক্রবর্তী পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থেকে 'ভল্লুকী তন্ত্র' নামক একখানি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেছেন। ড. চক্রবর্তীর মতে পুঁথিখানি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কিত। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলার আছে। অতীতে উত্তরবঙ্গের জনজীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য ছিল এবং বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ জনজীবনে বিশেষ প্রাধান্যের অধিকারী ছিলেন। সিদ্ধ পুরুষগণের তালিকার ৩৯ সংখ্যক সিদ্ধ পুরুষের নাম পাওয়া যায় 'ভাণ্ড' [হরপ্রসাদ রচনাবলী/২য় খণ্ড/৪৫৯ পৃঃ]। চর্যাগীতির পুঁথিতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ভাদের একটিমাত্র চর্যা পাওয়া গিয়েছে। তিব্বতি ঐতিহ্যে ইনি 'আচার্য', নামান্তর 'ভাণ্ডারিন'। ভল্লুকের চর্ম পরিহিত অবস্থায় ইনি চলাফেরা করতেন। প্রশ্ন জাগে মনে এই ভাদে, ভাণ্ড বা ভাণ্ডারিনই কি পরবর্তীকালে ভল্লুকদেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন? অসম্ভব নয়। কারণ ভল্লুকরাজ জাম্ববানের ভাগিনেয় শাম্ব 'বায়ুপুরাণ'-এর মতে দেবত্বে উন্নীত হয়েছিলেন। 'মনুষ্য প্রকৃতীন্ দেবান্ কীর্তিমানানিবোধত।'

উল্লেখপঞ্জি

১. গিরিজাশঙ্কর রায়, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের পূজা পার্বণ ও দেবদেবী/—৫৩ পৃ.
২. বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—২য় খণ্ড—১৪০৫ পৃ.
৩. পঞ্চানন মণ্ডল—সাহিত্য প্রকাশিকা/চতুর্থ খণ্ড, ভূমিকা—১১৭ পৃ.
৪. জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—/পঞ্চোপাসনা
৫. সাহিত্য প্রকাশিকা [বিশ্বভারতী]—চতুর্থ খণ্ড, ভূমিকা—১৫৪ পৃ.
৬. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩৬২, পৃ. ১৯৬, পৃ. ২৫৯-৬০
৭. বিনয় ঘোষ—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি/১ম খণ্ড—১১৬ পৃ.
৮. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য—হিন্দুদের দেবদেবী/তৃতীয় পর্ব—৪১১ পৃ.
৯. খান চৌধুরী আমানতউল্লা—কোচবিহারের ইতিহাস/১ম খণ্ড—২৪ পৃ.

জনপ্রতিনিধি

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

জনগণের যথার্থ প্রতিনিধি কে? সম্প্রতি এই নিয়ে নানা দেশে গোলমাল বেধেছে। নেপালে ক-দিন আগে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটল। আমজনতার ভোটে জিতে সে-দেশের মাওবাদীরা ঘোষণা করেছিল, আধুনিক যুগে রাজা কখনও জনগণের প্রতিনিধি হতে পারে না। যথার্থ রাষ্ট্রপ্রধানকে জনগণের সমর্থনে নির্বাচিত হয়ে তবে তাঁর পদে বসতে হবে। অন্যদিকে আবার জিম্বাবওয়ের রাষ্ট্রপতি রবার্ট মুগাবে নিশ্চিত পরাজয়ের সামনে পড়ে ভোট বানচাল করে দিয়ে সদম্ভে বললেন, 'আমিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাত থেকে এই দেশকে মুক্ত করেছি। আমি এই দেশের জনক। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ আমায় রাষ্ট্রপতি পদ থেকে সরাতে পারবে না।' তাহলে আসল জনপ্রতিনিধি কে?

একটা কথা মনে রাখা দরকার। রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী যারা, তাদের যে জনগণের প্রতিনিধি হয়ে রাষ্ট্র চালাতে হয়, এ-কথাটা কিন্তু অল্প কিছুদিন হল সারা জগতে ছড়িয়ে গিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন পৃথিবীর নানা প্রান্তে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের শাসন চালু ছিল, সে সময়কার বিদেশি শাসকেরা বলতেন বটে যে তাঁরা অনুন্নত অসহায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মঙ্গলের জন্য শাসন করেছেন, কিন্তু সেইসব প্রজাদের প্রতিনিধি হওয়ার কনও দায় তাঁদের কাছে আছে, এমন কথা তাঁরা কখনওই স্বীকার করতেন না। আর যেসব দেশে রাজারাজড়ার দল বহাল তবিয়তে রাজত্বে কায়েম ছিলেন, সেখানে তাঁরা বলা বাহুল্য মনে করতেন যে বংশগৌরবের মহিমায় অথবা ঈশ্বরদত্ত অধিকারে তাঁরা সিংহাসন আলো করে বসে আছেন। যদি কেউ জনগণের প্রতিনিধিত্বের কথা তুলত, তার গর্দান যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। অথচ আজ দেখা যায়, চরম স্বৈরাচারী একনায়ক কিংবা সেনাশাসক অথবা একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান, সকলেই অহোরাত্র বলে চলেছে যে তারা জনগণের প্রতিনিধিমাত্র। এর কারণ, বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগুলো থেকে, পুরোনো সাম্রাজ্যবাদের অবসানের পর, রাষ্ট্রসংঘের ছত্রছায়ায়, এই ধারণাটা সর্বজনস্বীকৃত হয়ে গিয়েছে যে আধুনিক রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অবিসম্বাদি উৎস একমাত্র জনগণ, সার্বভৌমত্বের আর কোনো সূত্র সাধারণভাবে গ্রাহ্য হতে পারে না। সুতরাং যে-ই ক্ষমতার অধিকারী হোক, তাকেই আজ দাবি করতে হয় যে সে জনগণের প্রতিনিধি।

নেপালে রাজতন্ত্রের অবসান হয়ে প্রজাতন্ত্রের সূচনা হতে চলেছে, এতে আমরা সবাই

নিশ্চয় খুশি। মুগাবে যে অমন জঘন্য স্বৈরাচারী আচরণ করেছেন, তাতেও নিশ্চয় আমরা অত্যন্ত হতাশ ও ক্ষুব্ধ। তার কারণ আমাদের মনে মোটামুটি একটা ধারণা আছে যে প্রকৃত জনপ্রতিনিধি জনগণের স্পষ্ট সম্মতি নিয়ে তবেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, অন্যথা নয়। সম্মতি জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায় জনসাধারণের ভোট। অর্থাৎ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিই যথার্থ জনপ্রতিনিধি। তাই রাজা নয়, নেপালের নবনির্বাচিত সাংসদ, আর তাদের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানকেই আমরা প্রকৃত জনপ্রতিনিধি বলে স্বীকার করতে চাইব। জিম্বাবওয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্ণধার হিসেবে মুগাবের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়ে তাঁকে বলব, মাপ করবেন, এত বছর ক্ষমতায় থাকার পর আজ আপনি জনসমর্থন হারিয়েছেন, এবার পদ ছাড়ুন।

এটা সবচেয়ে মান্য উপায় বলছি বটে, কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র আজকের পৃথিবীতে মোটেই সর্বজনীন নয়। সঠিক হিসেব করে বলতে পারব না, কিন্তু যতগুলো দেশে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র আছে, তার চেয়ে বেশি দেশেই বোধহয় তার অভাবটা দেখতে পাওয়া যাবে। আগেই বলেছি, আজকের দুনিয়ায় প্রত্যেক শাসকই বলে থাকে যে সে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য শাসন করছে। কিন্তু প্রতিনিধিত্বের প্রমাণ যদি হয় প্রকাশ্য অবাধ ভোটে জনসমর্থন, তাহলে রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী অনেক শাসকই প্রমাণ দিতে রাজি হবেন না। হয় তাঁরা এমন নিয়ম করবেন যে বিরোধী দল বা প্রার্থীদের নির্বাচনে দাঁড়াতেই দেবেন না, অথবা জোরজবরদস্তি কিংবা জোচ্চুরি করে নির্বাচন জিতবেন। সুতরাং জনপ্রতিনিধিত্বের নিয়মটা তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও বাস্তবে তা মোটেই সর্বত্র রূপায়িত হয়নি।

অথচ, এরই মধ্যে নানা মহল থেকে ধুয়ো উঠছে, জনগণের ভোটই প্রতিনিধিত্বের একমাত্র মাপকাঠি কেন হতে যাবে? অন্যভাবেও তো প্রতিনিধি পছন্দ করা যেতে পারে যেমন আদালতে মামলা করতে হলে আমরা উকিল ঠিক করে তাকেই দায়িত্ব দিয়ে দিই আমাদের স্বার্থরক্ষা করার। অসুখ করলে ডাক্তারের ওপরেই নির্ভর করি চিকিৎসার জন্য। এক অর্থে এঁরাও আমাদের প্রতিনিধি, কারণ এঁরা যা করবেন, আমাদের মঙ্গলের জন্যই করবেন, এই বিশ্বাস আমাদের কাছে। কিন্তু আমাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এঁদের আমরা ভোটে দাঁড়াতে বলি না। সরকারি কাজকর্মে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাহলে এই মডেলটা চলবে না কেন? সেখানে আমরা ভোটের পরীক্ষা দিতে বলি কোন কারণে?

এ প্রস্তাব কোনো তৃতীয় বিশ্বের সেনানায়ক অথবা একদলীয় শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে এলে খুব একটা আশ্চর্য হওয়ার ছিল না। তারা তো এরকম কথা কবে থেকেই বলে আসছে কারণ তারা তো আর অবাধ নির্বাচনী গণতন্ত্র চায় না। চমকে যাওয়ার ব্যাপার হল যে এই কথাটা ইদানীং শোনা যাচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের খাসতালুক পশ্চিম ইউরোপ থেকে। কোনো অতিদক্ষিণবর্তী প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিবাদী মহল থেকে নয়, রীতিমতো ইমানদার লিবেরাল মহল থেকে। ব্যাপারটা বোঝাতে গেলে ইউরোপ নিয়ে সাম্প্রতিক হট্টগোলটা একটু বুঝতে হবে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভিন্ন ভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এক রাষ্ট্রাতীত আধিকারিক হিসেবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউরোপের লিবেরালদের কাছে তা বড়ো গর্বের বিষয়। কয়েক-শ বছরের ইতিহাস উপেক্ষা করে ইউরোপের দেশগুলো একে অপরের সঙ্গে শুধু যে শান্তিতে বাস করছে, তাই নয়, জাতি-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে সংযুক্ত ইউরোপের বিধিনিষেধ রীতিমতো মাথা পেতে মেনে নিচ্ছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য-রাষ্ট্রদের মধ্যে একের পর এক চুক্তির মাধ্যমে মুদ্রাব্যবস্থা, করব্যবস্থা, যাতায়াত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, মানবাধিকার—হেন বিষয় নেই যা নিয়ে ইউরোপব্যাপী নিয়ম বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রের নিজস্ব আইন করার ক্ষমতাকে সীমিত করে দেয়নি। সম্প্রতি তৈরি হয়েছে এক বিশাল নিয়মাবলির সংকলন যাকে ইউরোপের সংবিধান বলে অভিহিত করা হচ্ছে। প্রতিটি সদস্য দেশ এবার এটিকে গ্রহণ বা বর্জন করবে। মুশকিল হল, যখনই এরকম কোনো সাংবিধানিক প্রস্তাব ইউরোপের কোনো দেশে জনগণের সামনে রাখা হচ্ছে, তা ভোটে হেরে যাচ্ছে। ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মত হলো, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বড়ো দূরের জিনিস। সেখানকার আমলারা কেন কী করে, আমরা জানতেও পারি না, বুঝতেও পারি না। সেখানে আমরা প্রতিনিধি পাঠাই বটে, কিন্তু বিশ-পঁচিশটা দেশের প্রতিনিধিদের ভিড়ে মিশে গিয়ে তারা যে কী করে, তার ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই ইউরোপের নিয়ন্ত্রণহীন খবরদারি আমরা মানতে রাজি নই।

ইউরোপের লিবেরাল বুদ্ধিজীবীরা জনগণের এই আচরণে হতবাক হয়ে গিয়েছেন। লোকে যা ভেবে ভোট দিচ্ছে, তা তো নিতান্তই অবুঝ আর নির্বোধের ভাবনা। তারা এটা বুঝছে না কেন যে জাতি-রাষ্ট্রকেন্দ্রিক দুনিয়ায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের সীমা ছাড়িয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যা তৈরি করতে পেরেছে, তা আসলে ভবিষ্যতের পথনির্দেশক। আজকের দুনিয়ার অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, পরিবেশনীতি, দণ্ডনীতি, সবই এতই জটিল, বিশ্বব্যাপী, আর একে অপরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে জাতি রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে তার সুষ্ঠু পরিচালনার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো এক সংযুক্ত রাষ্ট্র-সংগঠনই মানবজাতিব ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে পারে।

কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনগণের প্রতিক্রিয়া দেখে অনেক লিবেরাল চিন্তাবিদই মনে করেছেন, অধিকাংশ মানুষ এখনো সেই পুরনো জাতি-রাষ্ট্রের ছকে চিন্তা করতে অভ্যস্ত থেকে গেছে। সেখান থেকে এগিয়ে আসতে পারছে না। জাতি-রাষ্ট্রের কাঠামোর ভেতর জনপ্রতিনিধিত্বের যে পুরনো প্রথা, তাকেই অবশ্যমান্য ধরে নিয়ে তারা ভাবছে ইউরোপের কর্তারা তাদের যথার্থ প্রতিনিধি নয়। কারণ, দেশীয় সংসদের প্রতিনিধিদের মতো তাদের হাতের কাছে পাওয়া যায় না, জবাবদিহি করতে বলা যায় না। ইউরোপের বুদ্ধিজীবীরা বলেছেন যে, আসল মুশকিল হল, বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজনীতি অর্থনীতির প্রকাশ্য আলোচনা বা বিতর্ক বহুলাংশেই জাতীয় গণ্ডির ভেতর আটকে রয়েছে। তাই

ইউরোপীয় পরিধির যে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত অধিকাংশ মানুষের কাছে তা মনে হয় অতি জটিল, দুরধিগম্য। ইউরোপীয় বিষয় নিয়ে তাই তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

সুতরাং প্রস্তাব উঠেছে, মানুষকে বোঝানো হোক যে সব ব্যাপারে নির্বাচনী প্রতিনিধিত্বই একমাত্র প্রতিনিধিত্বের মডেল নয়। সময় সময় যেমন আমরা ডাক্তার, উকিল বা অন্য বিশেষজ্ঞদের হাতে আমাদের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে দিই, ঠিক তেমনই রাষ্ট্রচালনার জটিল বিষয়গুলো নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বদলে বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। তারা সত্যিই আমাদের স্বার্থরক্ষা করল কি না বিচার হবে ফলাফল দিয়ে। কিছুদিন বাদে যদি সত্যি দেখা যায় যে অবস্থা ভালো হওয়ার বদলে খারাপ হয়েছে, তাহলে নিশ্চয় বিশেষজ্ঞ বদল করতে হবে। অথবা এরকম বিশেষজ্ঞ পরিষদের একটা নির্দিষ্ট কার্যকাল থাকতে পারে যার পর তাদের বদল করা দরকার হবে। কিন্তু সবরকম রাষ্ট্রনীতি তা সাধারণ ভোটদাতা, এমনকি সাংসদদের কাছেও যতই দুর্বোধ্য হোক না কেন, একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মতি নিয়েই তা কার্যকর করা যেতে পারে, এই সনাতন গোঁড়ামি অবিলম্বে ত্যাগ করা উচিত। খোদ কলেজ দ্য ফ্রঁসের ডাকসাইটে অধ্যাপক পিয়ের রসভালিয়ো এই নিয়ে এক জব্বর কেতাব লিখেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীব ইউরোপে, গণতন্ত্রের যুগের আগে, একটা কথা চালু ছিল, মঙ্গলজনক স্বৈরাচার। সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরাও কথাটা ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ শাসক স্বৈরাচারী বটে, কিন্তু প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই তাঁকে স্বৈরাচারী হতে হয়েছে। অত্যাধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রস্তাব শুনে সেই মঙ্গলজনক স্বৈরাচারের কথা মনে হতে পারে। তাতে কিন্তু তাঁরা এতটুকুও ঘাবড়াবেন না। উত্তর-আধুনিক কায়দায় বললেন, প্রাক-আধুনিক বা গণতন্ত্রপূর্ব বলেই ইতিহাসের ফেলে আসা নিদর্শন দেখে আঁতকে উঠতে হবে কেন? সে উদাহরণ থেকে যদি আজকের ব্যবহার্য প্রকরণ তৈরি করে নেওয়া যায়, তাতে ক্ষতি কী? বরং আধুনিকতার প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বা পদ্ধতিতে অনস্বীকার্য, অপরিবর্তনীয়, অমোঘ বলে মেনে নেওয়ার চাপ থেকেই তো ক্ষতি হয়ে চলেছে অনেক বেশি।

তর্ক ক্রমে গভীরে চলে যাচ্ছে। পণ্ডিত ভাবুক বুদ্ধিজীবীদের সুপরিকল্পিত ভবিষ্যৎচিন্তার সঙ্গে স্বল্পবুদ্ধিসাধারণ মানুষের আশু লাভ-ক্ষতি আশা-আশঙ্কার দূরত্ব যত বাড়ছে, ততই নির্বাচনী প্রতিনিধিত্বের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা তীব্রতর হচ্ছে।

দুই

আমাদের দেশে অবাধ সাধারণ নির্বাচনকে ভিত্তি করে সংসদীয় গণতন্ত্রের বয়স সবে অর্ধ শতাব্দী পেরিয়েছে। কিন্তু নির্বাচনী প্রতিনিধিত্ব নিয়ে সংশয় এখানেও কিছু কম নেই। খবরের কাগজ কিংবা টেলিভিশন দেখলে মনে হয়, এম পি, এম এল এ তথা গোটা রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই ব্যাপক ক্ষোভ আর অনীহা ছড়িয়ে পড়েছে। ধিক্কার আর ব্যঙ্গবিদ্রূপ ছাড়া তাদের আর কিছু পাওনা আছে বলে মনে হয় না। তাঁদের

বিরুদ্ধ প্রধান অভিযোগ যে একবার নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁরা আর তাদের নির্বাচকদের খোঁজ রাখেন না, ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে ওঠা আর নিজেদের আখের গোছানোতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রতিনিধি হয়েও তাঁরা যথার্থ জনপ্রতিনিধি থাকেন না। সুতরাং তাঁদের ভোট দেব কি দেব না, তাই নিয়ে সময় নষ্ট করে কী হবে?

এই মনোভাব যদি সত্যি ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে স্থায়ী হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে নির্বাচনী প্রতিনিধিত্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ আছে। কিন্তু বিপরীতগামী আর-একটি প্রবণতা লক্ষ না করলে ভুল হবে। সেটা হল, নিজেদের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের লোককে প্রতিনিধি করে ক্ষমতার কেন্দ্রে পাঠানো। সে যদি কোনো সম্মান বা পদ পায়, তাই নিয়ে গোষ্ঠী হিসেবে গর্বিত হওয়া এবং আশা করা যে ক্ষমতা পেয়ে সে তার নিজের লোকেদের জন্য কিছু করবে। এই প্রবণতা আছে বলে নির্বাচন আর প্রতিনিধিত্ব নিয়ে হতাশা এখনও মোটেই সর্বগ্রাসী নয়। বস্তুত একাধিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভারতবর্ষে নির্বাচিত গণতন্ত্র নিয়ে অনীহা সবচেয়ে বেশি শহরবাসী মধ্যবিত্তের মধ্যে এবং সবচেয়ে কম গ্রামবাসী দরিদ্র, বিশেষ করে দলিত শ্রেণীভুক্ত মানুষের মধ্যে।

দুটি প্রবণতা কিন্তু নির্বাচনী গণতন্ত্র নিয়ে চিরাচরিত লিবেরাল ধারণা থেকে আমাদের অনেক দূর সরে যেতে বাধ্য করছে। প্রথম প্রবণতার অর্থ হল, নির্বাচিত প্রতিনিধির ওপর নির্বাচকমণ্ডলীর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকছে না। এমনকি, পরের নির্বাচনে সে হেরে যেতে পারে, এই ভয়টাও আর কাজ করছে না, কারণ ততদিনে সে নিজের স্বার্থটা যথেষ্ট গুছিয়ে নিতে পারবে। অর্থাৎ নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়াটা যেন পাঁচ বছরের জন্য একটা ব্যবসায় লাইসেন্স পাওয়া, ওটা ভাঙিয়ে যা পারো করে নাও। এমন হলে গণতন্ত্রে প্রতিনিধির আসল কাজ যে কিছুই হয় না, তা বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয় প্রবণতার অর্থ, প্রতিনিধি কেবলই তার ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কথা ভাববে, বৃহত্তর স্বার্থের দিকে তাকাবার সুযোগ পাবে না। ক্ষমতার ধড়াচুড়ো পরে সে নিজের লোকেদের কাছে বাহবা পাবে, কিন্তু তাতে সামগ্রিক জাতীয় বা সামাজিক মঙ্গল কিছু হবে না।

প্রথম প্রবণতার সমস্যাটা আধুনিক গণতন্ত্রের গোড়া থেকেই জানা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনার সময় ফেডেরালিস্টদের আলোচনার কিংবা ফরাসি বিপ্লবের সমসাময়িক বিতর্কে এই প্রশ্নটা অনেকবার উঠেছে। সমস্যার একটা সমাধান প্রতিনিধিকে প্রতিনিয়ত তার নির্বাচকদের নজরদারিতে রাখা। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংসদে ভোট দেবার আগে সে যেন যাচাই করে নেয় তার নির্বাচনকেন্দ্রের মানুষ কী চায়। অনেক দেশের গণতন্ত্রে এমন নিয়ম আছে যে মেয়াদ শেষ হবার আগেই কেন্দ্রের ভোটাররা ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি ফেরত নিয়ে এসে নতুন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। এই ধরনের নিয়মে প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্রচালনার বদলে খানিকটা জনগণের সরকারি গণতন্ত্রের আদল চলে আসে। কিন্তু তার আবার অন্য অনেক সমস্যা আছে। দু-দিন অন্তর ভোট দিতে হলে অধিকাংশ মানুষ চটে যাবেন। সব ব্যাপারে যে

তাঁরা ঠিকমতো জেনেশুনে যথাযোগ্য বিচার করে ভোট দেবেন, এমনও কোনো কথা নেই। ফলে আবার সেই প্রতিনিধির ওপরই নির্ভর করতে হয়।

জনপ্রতিনিধি যে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি না করে জনগণের মঙ্গলের জন্য সময় দিয়ে কাজ করবেন, তার দু-ধরনের আদর্শ আছে। একটি আদর্শকে বলা যেতে পারে রাজসিক। এখানে জনপ্রতিনিধি হবেন সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, সম্মানিত ব্যক্তি, যাঁর অর্থোপার্জনের জন্য রাজনীতি করার প্রয়োজন নেই। সাধারণত ইনি অভিজাত পরিবারের লোক অথবা উচ্চশিক্ষিত সফল পেশাদার ব্যক্তি। রাজনীতিতে তিনি আসবেন কিছুটা আদর্শের তাগিদে, দেশের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করার ইচ্ছায়। এমন লোকের কাছে চারিত্রিক দৃঢ়তা আশা করা যায়, সুনীতির প্রতি তিনি নিষ্ঠাবান থাকবেন এমন ভরসা করা যায়। পারিবারিক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদির গুণে তিনি যে রাষ্ট্রনীতির খুঁটিনাটি বিষয় অন্যের চেয়ে ভালো বুঝবেন, তাও খুব আশ্চর্যের কথা নয়। এমন লোককে সাধারণ মানুষ সৎ, পরোপকারী নির্ভরযোগ্য মনে করে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করবে। বলা যেতে পারে, আধুনিক যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশে এই রাজসিক আদর্শই কিন্তু সাম্প্রতিকাল অবধি চলে এসেছে। অন্তত এমনটা হলেই ভালো হয়, এই ধারণাটা চলে এসেছে। আমাদের দেশে বহু লোকের মনে যথার্থ প্রতিনিধি বলতে এমন একজন মানুষের কথা হয়তো বেশির ভাগ সময় মনে আসে।

দ্বিতীয় আদর্শের নাম দেওয়া যেতে পারে সাত্ত্বিক, কিন্তু ত্যাগী বললে তা আরো যথাযথ হয়। এই আদর্শ আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদী এবং সমাজবাদী রাজনীতির যুগে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। গান্ধীবাদীদের দৃষ্টান্ত এখানে সকলের জানা। সত্যি কথা বলতে কি এককালে জনপ্রতিনিধি বলতে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট অথবা কমিউনিস্ট পার্টির ছোটোবড়ো বহু নেতার নাম মনে পড়বে যাঁদের মানুষ চিনত তাঁদের ত্যাগ কৃচ্ছ্রসাধন আর নির্লোভ পরোপকারী চরিত্রের জন্য। এমন দৃষ্টান্ত বহুসময় মনে পড়ে বলেই হয়তো এখনকার রাজনীতিকদের সম্বন্ধে মানুষের এতটা বিতৃষ্ণা। এটাও সত্যি যে এমন আত্মত্যাগী নেতারা উঠে এসেছিলেন নানা রাজনৈতিক আন্দোলন আর সংগ্রামের ভেতর থেকে। সেই সব ত্যাগস্বীকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখনও দেশের যেখানে যেখানে সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছে, সেখানে এমন আদর্শবান জনপ্রতিনিধি দেখতে পাওয়া যাবে।

কিন্তু দেশের সর্বত্র, সবসময় অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ক্রমাগত আন্দোলনের ঢেউ বজায় থাকা সম্ভব নয়। বস্তুত, তীব্র আন্দোলনের সময় বা তার পরে যে ধরনের নেতা-প্রতিনিধির দেখা পাওয়া যায়, গণতন্ত্রের ইতিহাসে তা ব্যতিক্রম। অধিকাংশ সময় যা স্বাভাবিক তা হলো নিয়মমাফিক রাষ্ট্রচালনা—দৈনন্দিন সরকারি কাজ, অর্থাৎ আইন প্রণয়ন, আইন রক্ষা, প্রশাসন সেগুলো ঠিকমতো করা। এর জন্য কি উচ্চ আদর্শের ব্যতিক্রমী প্রতিনিধি সত্যি দরকার?

গণতন্ত্রের একটা মস্ত বড় দোষ বা গুণ যাই বলুন তা হল সাধারণ মানুষের যা

গড়পড়তা স্বভাব তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যেও সেই গড়পড়তা স্বভাবটাই বেশি দেখতে পাওয়া যাবে। অনেকেই বলে থাকেন যে গণতন্ত্রে মাঝারিয়ানার প্রাদুর্ভাব হয়। সুতরাং জনগণের পছন্দসই প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্রচালনই যদি নিয়ম হয়, তাহলে রাজসিক কিংবা আত্মত্যাগী রাজনীতিকের আশায় বসে না থেকে রুটিন কাজ চালাতে পারবেন, এমন লোকের ওপর নির্ভর করাই সমীচীন। অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি হবেন পেশাদার আইনপ্রণেতা কিংবা প্রশাসক, যাঁর সরকারি কাজকর্ম পরিচালনা করার মতো শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা আছে। তিনি সেইমতো যথাযোগ্য পারিশ্রমিক পাবেন যাতে দুর্নীতির প্রলোভনে তাঁকে পড়তে না হয়। তিনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে পারেন কিন্তু ভোট দেবার সময় মানুষ বিচার করবে প্রয়োজনীয় কাজটা করার মতো যোগ্যতা তাঁর আছে কি না।

এই যুক্তিটাকে আর কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেছেন, নির্বাচিত প্রতিনিধির বদলে রাষ্ট্রচালনার বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব তুলে দেওয়া হোক বিশেষজ্ঞদের হাতে। আমাদের দেশেও যে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে না, এমন নয়। টেলিকম, বিদ্যুৎ, যানবাহন, পানীয় জল, ইত্যাদি নানা পরিষেবা যা একসময় পুরোপুরি সরকারি দপ্তরের মন্ত্রীদের তত্ত্বাবধানে ছিল তা এখন স্বতন্ত্র রেগুলেটরি অথরিটি বা নিয়ন্ত্রণ আধিকারিকের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। যুক্তি হচ্ছে নির্বাচনী রাজনীতির চাপে পড়ে মন্ত্রীরা প্রয়োজন হলেও বিদ্যুতের দাম বাড়াতে পারেন না, জল সরবরাহের ওপর কর বসাতে পারেন না। সরকারি পরিষেবা অযৌক্তিকভাবে ভরতুকি-নির্ভর হয়ে পড়ে।

মজার কথা হল, তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যে দরকারি কাজটা প্রয়োজনমতো করবেন, এই ভরসা কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যেও খুব একটা নেই। সাধারণত মনে করা হয় এম পি এম এল এ দূরের মানুষ হলেও স্থানীয় পঞ্চায়েতের সদস্যরা অন্তত ঘরের লোক। তাদের ওপর ভোটারদের নজরদারি একটু বেশি থাকবে, ফলে তাঁরা কিছুটা স্থানীয় মানুষের প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করবেন। পশ্চিমবঙ্গে কিছুদিন আগে পর্যন্তও মনে করা হতো যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষের মোটের ওপর আস্থা আছে। কিন্তু গত দু-বছরের কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সে-পরিস্থিতি আর নেই। পশ্চিমবাংলার প্রতিটি জেলায় ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষ তাদের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের কাজ নিয়ে হতাশ। কে কোন দলের সদস্য, তাতে কিছু এসে যায় না, সকলের সম্বন্ধেই একই মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। পঞ্চায়েত নেতাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ যে তাঁরা গ্রামের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না, পরামর্শ করেন না, সব সিদ্ধান্ত নিজেরা নেন। অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস, দল নির্বিশেষে বেশির ভাগ পঞ্চায়েত সদস্য দুর্নীতিগ্রস্ত।

অন্যদিকে আবার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা বলেন পঞ্চায়েতে দুর্নীতি বেড়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার কারণ পঞ্চায়েতের যে-পরিমাণ কাজ বেড়েছে, প্রতিদিন নতুন নতুন দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে পঞ্চায়েতের ঘাড়ে, সেই তুলনায় পঞ্চায়েত প্রধান বা সদস্যদের পারিশ্রমিক এবং ভাতা প্রায় নামমাত্র রয়ে গেছে। ফলে যোগ্য

লোকেরা কেউ পঞ্চায়েতের নির্বাচনে দাঁড়াতে চান না। যাঁরা দাঁড়ান, তাঁরা হয় পদ ভাঙিয়ে কিছু করে নেবেন, এই মতলবেই এগিয়ে আসেন, আর না হলে দু-দিন বাদেই প্রলোভনে পা দেন। পঞ্চায়েতের টাকা খরচ করার ক্ষমতা যত বাড়ছে, দুর্নীতির মাত্রাও তত দ্রুত বেড়ে চলেছে।

লক্ষণীয়, গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী যাঁরা রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট, তাঁরা কিন্তু এ-কথা বলছেন না যে পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হোক, অথবা ভবিষ্যতে তাঁরা আর নির্বাচনে ভোট দেবেন না। অর্থাৎ ব্যাপক অসন্তোষ সত্ত্বেও প্রতিনিধি-ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হোক, এ-কথা কিন্তু খুব কম লোককেই বলতে শোনা যায়। পশ্চিমবাংলার সমীক্ষায় অনেকে অবশ্য বলেছেন যে, যে-সব কাজ পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো সরকারি দপ্তরের হাতে দিলে কাজ আরো ভালো হত, কারণ পঞ্চায়েতে দক্ষ কাজের লোক নেই।

কিন্তু একটি প্রবণতা ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চলেই সত্য, বিশেষ করে দরিদ্র এবং পিছিয়ে-পড়া শ্রেণির মধ্যে। তা হল, নিজের গোষ্ঠী বা সমাজের লোককে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা। এমন প্রতিনিধির কাছে রাজসিক অথবা ত্যাগী, কোনো ব্যবহারই আশা করা হয় না। তাঁরা যে রাজকার্যে বিশেষ পারদর্শী, এমনও নয়। কিন্তু ক্ষমতার অন্দরে আমাদের নিজের লোক ঢুকতে পারছে, সম্মান পাচ্ছে, উচ্চবর্গের সঙ্গে একাসনে বসতে পারছে, এতে কিন্তু অবহেলিত মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগে। গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের সারবস্তুহীন। কিন্তু ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক রাজনীতিতে এর প্রচণ্ড প্রভাব বর্তমান ব্যবস্থায় চট করে বদলানোর সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু আসল রাজকার্য তাহলে চলবে কীভাবে? বলা বাহুল্য, সমাজের উচ্চবর্গের দুশ্চিন্তা এই নিয়ে সবচেয়ে বেশি। তাই ইউরোপের লিবেরাল পণ্ডিতদের প্রস্তাব দিয়ে এই আলোচনা শুরু করেছিলাম। আমরা ধারণা, নির্বাচনী প্রতিনিধিদের পাশাপাশি নানা অছিলায় সরকারি কাজকর্মে বিভিন্ন অংশ অল্প অল্প করে নির্বাচিত সাংসদ-মন্ত্রীদের হাত থেকে সরিয়ে এনে বিশেষজ্ঞ পরিচালিত পরিষদ বা প্রতিষ্ঠানের আওতায় নিয়ে আসা হবে। এই প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেবে আমলা, বিচারক, শিল্পপতি, সংবাদমাধ্যম আর শহরবাসী মধ্যবিত্ত। সংসদে কোটিটাকার নোটের বাণ্ডিল দেখানোর মতো দৃশ্য যত বেশি চাউর হবে, তত এই প্রক্রিয়ার সপক্ষে যুক্তি সাজানো সহজ হবে। জনপ্রতিনিধিরা থাকবেন, কিন্তু আসল রাজকার্য করবে অন্য লোকে। একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র বোধ হয় এই দিকেই এগোচ্ছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

২৪ আগস্ট ২০০১-এ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে লিখবার প্রস্তাব দিলেন অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলুম ব্যক্তিগত ব্যাধিদশার মধ্যেও পাঠকের সঙ্গে একটু বসতে— কারণ এক গল্প। গল্পটি আমাকে জানান পার্থ মুখোপাধ্যায়— সত্যি মিথ্যে জানি না, উল্লেখ করছি।

গল্প এবম্প্রকার : সাল ১৯৬০, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কক্ষে অন্য এক অধ্যাপক এসেছেন; ঘরের অন্যান্যদের তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন গৃহকর্তা অলোকরঞ্জন, অধ্যাপক বাধা দিয়ে বললেন, 'অমুক বললেন যে আপনি নাকি সুধীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখছেন?' অলোকরঞ্জনের জবাব ঠিক কী ছিল তা জানা যায়নি। আগত অধ্যাপক বললেন, 'লিখছেন তাহলে। বা বা, বেশ বেশ। টিট ফর ট্যাট— বেশ হয়েছে, টিট ফর ট্যাট—।

সুধীন্দ্রনাথের মত প্রসঙ্গে, অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্রবৎ ধীমান বা আমার মতো এক অকেজো বিমান (যে উনিশশো ষাট সালে এক প্রিকশ্যাস, পশ্চাৎপক্ক বা সকালে-পাকা বালক, একটি খারাপ ছাত্র এবং স্বরুচিকর বিষয়ের গরুড়খিদের পাঠক) কে যে আসল টিট, সেটা আরও কিছুদিন বাদে মালুম হবে। লেখকরা অবশ্য পশ্চাৎপক্কই হন, একদম হালের লেখকরা কিছু বেশি বয়সে লেখা ও লেখার লেখাপড়া ধরছেন।

তা ষাট সালে সুধীন্দ্রনাথের নাম জানলেও, লেখা পড়েছি আরও দু-বছর বাদে। এর মাঝখানে, বারো ক্লাসের সেই বালকটির মনে রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ ধুন্ধুমার চলছে। *পূর্বপত্র* পত্রিকাটার কথা অনেকের মনে নেই। পিতৃসূত্রে, সমকালীন *চতুরঙ্গ*, *পরিচয়* এমন অনেক কাগজের সঙ্গে এই কাগজটাও আমি পড়তে পেতুম। নানা কাগজের সূত্রে এটুকু বুঝতে পেরেছিলুম, একটি বিশেষ বলয়ে সুধীন্দ্রনাথ নিরন্তর ও নিরতিশয় পূজিত ছিলেন। 'ষাট দশক', মানে গত ইংরেজী শতকের সপ্তম দশকে সুধীন্দ্রনাথের শাশ্বতী যখন এক নবীন যুবা আলোড়িত উচ্চারণেই লোকজনকে বিলোড়িত করে দেব এমন এক প্রকট ইচ্ছায় পড়তে গেলেন, আমার কানে এক বয়স্কের কথা ঢুকল— 'সুধীন্দ্রনাথও এমন কয়েকটা তরল লেখা লিখেছেন—'

মানে এমন কিছু করেছেন যে শফরীবৎ, বাতাসলঘু পাঠকও তাঁকে নিয়ে টানাটানি করে। একদল এমন থাকেন : কবি, তুমি নাকি জনপ্রিয় হলে? এ হে হে, তুমি গেলে, ফৌজী অফিসারদের মনোরঞ্জনে বীরমেইড হলে তুমি প্রায়। অন্য দল : কেমন কবি আপনি, কেমন পাবলিসিটি? ইয়ার্কি নয় ডিয়ার, বই জিনিসটা আদি মধ্য অন্তে বিক্রি হবারই জিনিস, সরকারি টাকাপয়সা কবিরাও পেয়ে থাকেন— যে কেউ নিয়ে যাবে নাকি?— দু-পক্ষই, গুরুত্ববাদী। আমরা স্কটিশের বাল্যকালে গুরুর বিপরীতকে বলতুম, গুরুতর!

সে যাক। ৮৯ থেকে আমহার্স্ট স্ট্রিটকে ব্যস্ততম পথ করে নেওয়ার পর— আরও নানাকারণে, আমরা এখন সকলেই দশ-বারো বছরের। ১৯৬০-এ সুধীন্দ্রনাথ ডাক্তারী মতে প্রয়াত হলেও, ৬০-৭০-৮০-র দশকেও কলকাতা শহরে ও অন্যত্র তাঁর মনোবীজ ছড়ানো আছে ইফ ইট ডাই-এর ভঙ্গিতে, এমন মনে হত। তখন এ শহরে চিল দুর্লভ ছিল না। যত হাইরাইজ রয়েছে, সবই জনতার জঘন্য মিতালি। সুধীন্দ্রনাথের মনমর্জির রেণুকণা আর পাওয়া যাবে না শহর উপশহরের এখনকার বর্ণালীবিভঙ্গে। এমনকী, ৬৬ সালে ছাপা সেই *স্মরণে* পত্রিকা (উৎপলেন্দু চক্রবর্তী সম্পাদনা করতেন)— যাতে সুধীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে অনেকে লিখেছিলেন, সে পত্রিকা দেখলেও অবাক লাগে— এত অন্যপাশে সরে গেছে! পিছিয়ে যায়নি। এগিয়েও নেই। খুব কাছাকাছিও নেই। এমনই একটা দিকে, এমনই একটা পার্শ্ববর্তিতায় সুধীন্দ্রনাথ-*পরিচয়*-রাজেশ্বরী দত্তের সেই উদ্‌যাপিত জীবনধারা।

২

আমি সুধীন্দ্রনাথের সহৃদয় পাঠক ছিলুম না। 'সপ্ততুরগরাগে আগত সবিতা উদয়শৈলশিখরাগ্রে' বা 'মৌনে পড়ে তীর্থামৃত লোমশও'— এসব পঙ্‌ক্তির লেখক কী করে 'পাতী অরণ্যে কার পদপাত শুনি'র মতো পঙ্‌ক্তি লেখেন? এ তো শুনেই মনে হয় রঙ্‌মহলে কেউ বাজে নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছে। তবে তাঁর প্রবন্ধের ভক্ত ছিলুম। তবু সেখানে— অবশ্য এটা ওই সময়ের সকলেরই আছে— একটু নাটুকেপনা লেগে থাকে। ' লেখার মতো কথা যদি মানসে জমে'— অর্থাৎ, মানস জিনিসটা একটা ট্যাঙ্ক, ফ্লাশ টানা হয়েছিল, জল বেরিয়ে গেছে; ফের সেই ট্যাঙ্ক ঘরের মতই ভরে উঠবে কি না, তা লেখক জানেন না।

তদুপরি, মা ন স! যেন আমি বা কেউই জানে যে মানস কাকে বলে। সার্ত্রের কথা মনে পড়েই, 'ডু নট রাইট গুড উয়রডস্। ইট অফেন্ডস্।'

সে যাক, সুধীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ কেউই এ ধরনের কিছুটা নাট্যভাব থেকে নিষ্কৃতি পাননি— এটা ওঁদের কর্ম্মসময়ের, যৌবনপ্রৌঢ়তার বিশেষ চিহ্ন। অকালপক্ক বালক হিসেবে এঁদের কাছাকাছি বয়েসের লোকজনদের কাছে শুনতুম, আত্মপ্রকাশই মনুষ্যজীবনের আসল জিনিস। সে আত্মপ্রকাশে অনেকসময় অন্যের পক্ষে 'শক্' থাকে। এবং, কিঞ্চিৎ নাট্যপরতা না থাকলে আত্মপ্রকাশ হয় কী করে।— কথা খুবই ঠিক। পত্রিকা বার করা— যেমন অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্ররা করছেন— সেও এক নাটক হাজির করা— অন্য কিসিমে। আত্মপ্রকাশও যে পত্রিকাপ্রকাশের অন্যতম বা মূল লক্ষ্য তা-ও খুবই ঠিক, কিন্তু পত্রিকাটি যদি অতিরিক্ত, নিষ্প্রয়োজন দৃষ্টি-আকর্ষণী খোলে তাহলে...

এসব উষ্মা মনে থাকার জন্যে, বছর দশ আগের একটা কথোপকথনে সুধীন্দ্র-বিষ্ণু প্রমুখদের আমি 'ড্রেসিংগাউন পরা কমল মিত্র' বলেছিলুম। (পরে দেখেছি, কমল মিত্র অনেকসময় স্টিরিওটাইপড় হলেও, রসিক, প্রাপ্তবয়স্ক চরিত্রের অভিনেতা ছিলেন।) আরো একটা উষ্মা ছিল— এঁরা জীবনানন্দকে অনেকটা অমর্যাদা করতেন বলে মনে হয়েছিল।

৩

মনে রাখা দরকার, আমার বাল্যস্কুলের পাশেই সুধীন্দ্রনাথের প্রথম পরিণীতা ছবি দত্তকে আমি দেখি। তুষার রায়, ৬৬ সালের কফিহাউসে একদিন গল্প করতে করতে বললেন, 'রাজেশ্বরী ভ্যানিটি ব্যাগ গুছিয়ে প্যারাগন বিউটির মতো দাঁড়িয়ে কুচিচুল আর মুক্তোর দুল নেড়ে সুধীন্দ্রনাথকে বললেন, 'আজ রেডিওতে আমার অমুক সময় ব্রডকাস্টিং, শুন'। সুধীন্দ্রনাথের জবাব পাওয়া গেল না। রাজেশ্বরী চলে যাবার পর, সুধীন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট ইয়োরোপীয় আসবে (মনে হয় পোর্টই বলেছিলেন তুষার) আঙুর ডুবিয়ে মুখে দিতে থাকলেন। গান শুনবেন, এমন কোনো উৎসাহ নেই।' শুনে মনে হয়েছিল, এর মধ্যে একটা প্রমথেশ বড়ুয়া ধরনের অবহেলা আছে— অনেকের অবহেলার প্রকাশটি এতই মনোজ্ঞ, বিধুরম্লব, এতই বড়ুয়াসুলভ হয় যে মুহূর্তে তাঁদের অন্যদের থেকে ঢের বেশি সারসত্যওয়ালা প্রাজ্ঞ মনে হয়, আমরা তটস্থ হয়ে পড়ি— অবশ্য তার আগে তাঁদের বাড়ি, সম্পত্তিপরিমাণ ও সংগৃহীত গ্রন্থরাশি দেখে-টেখেও নিই, যাতে আভিজাত্য, মননশীলতা, সত্যসন্ধান এসব কথা তাঁদের সম্পর্কে বলতে পারি (চূড়ান্ত হচ্ছে, নিঃশ্রেয়সের অন্বেষক বলা), বলতে পারি, জানো, তিনি না আগাগোড়াই তেতো থাকতে জানতেন। যেন, despair— total despair কাউকে অ পর্যন্ত লিখতে দেয়!— সুধীন্দ্রনাথের এমন একটা ভাবমূর্তি তৈরিও করেছেন তাঁর ভক্তেরা—অহো এ যে কী দুর্লভ বৈদগ্ধ্য এইসব বলতে বলতে। অবশ্য, জ্যোতির্ময় দত্ত সুধীন্দ্রনাথের ঠিক পরিচয়টা বিবৃত করেছিলেন।

স্মরণে পত্রিকায় সুনীল বলে দিয়েছিলেন, সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা বাউল মন ছিল যা নানা কারণে বেরিয়ে আসার সুযোগ পায়নি।...মরক্কো-রেক্সিনে বাঁধানো বই-এর সোনার জলের শিল্প বা বই খুললে মৃদু আপেলের গন্ধ— বইপ্রকাশের সুবর্ণযুগে সুধীন্দ্রনাথ জীবন কাটিয়েছেন।

না, ঠিক বাউল নয়। হালফিলের বাউলদের কথা হচ্ছেই না, দ্বাদশে উগ্র গ্রহস্থিতির জন্যে যারা য়ুরোপ মার্কিনে অসিজ্-এ ভ্রমণে প্রমোদে সেলফোনে ক্যাশকার্ডে আছেন; আমাদের বাল্যের বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের বাউলরাও নাকি জলমেশানো—সমরেশ বসুর সঙ্গে এক আড্ডায় জেনেছিলুম। সমরেশের কৈশোরের বাউলরীতি ও গান সমরেশ হাজির করেন সেদিন— সেই সিংহবিক্রান্ত ধরনের গান, সুর ও কর্তার সিংহাবলোকন আমি ওই একবারই পেয়েছি। তা যদি খাঁটি বাউল হয় তাহলে কোনো অর্থেই সুধীন্দ্রনাথ বাউল নন, latent অর্থেও নয়।

৪

কিন্তু অমন কটুকথা-কটাক্ষ করার পরই আমার পশ্চাত্তাপ শুরু হয়েছিল। ওই তাপে, রণজিৎ দাশের চোখের শান্ত অসমর্থনও ইন্ধন দিয়েছিল। আবার, ইতস্তত, দেখতে থাকি তাঁর লেখা। এই করতে করতে, একটা ভগবানভীত কাগজে, দীপংকর দাশগুপ্তর একটা নিবন্ধ পেয়ে গেলুম। কবিতাবিষয়ে বা সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ে নয়, নিতান্ত জীবনবিষয়ে।

শ্রদ্ধা/ প্রেম/প্রীতি/ রতি— এমন চারটি বিভাজন, নরচিত্ত বিষয়ে, দীপংকর করেছিলেন। আমি দেখলুম, এই বর্গীকরণটা আমার পক্ষে উপাদেয়— অন্তত নিজেকে বোঝাতে পারব যে কিছু বুঝেছি।

ওই পদ্ধতির প্রয়োগে, আজ দেখতে পাচ্ছি, সুধীন্দ্রনাথের গ্রন্থবহুল যে জীবনটা— সেটা শ্রদ্ধেয় তো নিশ্চয়ই, এবং শ্রদ্ধেয় হবার বড় বেশি সরাসরি, অতিপ্রকট চেষ্টাও সেখানে আছে; সুধীন্দ্রনাথের লেখায়, এই জীবনযাপনের আস্তরণ আছে। এটা শ্রদ্ধাবর্গীয় দিক। তিনি রমণ বা রতিকোটির লোক ছিলেন না। 'জনতার জঘন্য মিতালি'র জঘন্যটা লক্ষ করলেই বোঝা যাবে।

প্রেম ও প্রীতিই তাঁর স্বাভাবিকতা ছিল। কিন্তু, এতে খুব নির্ভর করতে পারেননি সুধীন্দ্রনাথ। গ্রন্থ, তত্ত্ব, পাঠ, দুরূহ কঠিন চিন্তা, মনস্বিতা— এমন সব শব্দ— যারা সমাজে অতিঅভ্যর্থিত শব্দ— যত ইম্পিরিয়াল, ন্যাশনাল বা ইন্টারন্যাশনাল লাইব্রেরির যে অক্ষগুটিকার দীপ্তি, যে তামস অশ্বিনীর দ্রুতি, তার মোহ ছাড়তে পারেননি সুধীন্দ্রনাথ। কাজেই, তাঁর কোনো-কোনো লেখায় যে শুভসৌন্দর্যকে আমরা পাই তা অনেকটা পাহাড়ের কাছাকাছি থাকা ছোটো শান্ত গ্রাম বা শহরের মতো, আরও বড়ো সমতলের বিপুলায়তন বসতির ধ্যানধারণ সেখানে নেই।

এমনটাই হবার কথা এবং সুধীন্দ্রনাথ কেন, আর এক কিসিমে গ্রন্থদুর্গশালা বা রতিসিন্ধুর অভিযাত্রিকতা এই হালেই থেমে আসছে বাংলা কবিতায়। বৃহদায়তন অর্থনীতির প্রযুক্তির থেকে যখন 'হাসিখুশি' অর্থনীতির ধারণাকে স্পষ্টতর করা হল— সামান্য পাঁচবছর— সেই তখন থেকে, একতালে, একই কাজ হচ্ছে কবিতাতেও। এরও কিছুদিন আগে, শ্বেতাঙ্গিনী কবায়িত্রীরা পরিষ্কার করেছিলেন যে কবিতা বিষয়টি an act of love।

১৯৭১-এ যেটা হরলালকা হয়ে যায় সেই শ্যামবাজার কফিহাউসে (খান্নার কফিহাউস) ৬৮ সালে নিজের দৈহিক স্থূলতায় তৃপ্ত ও ক্লান্ত এক আড্ডাবাজ এসে বললেন, 'জলাং তো!' জল এল। বললেন, 'ওঃ, কবিতা! য়্যেকটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে (একটিতে উচ্চারণগত অধোরেখা) ভর করেছিল সা-আ-আ-ত্‌টি অমরাবতী! গেল রে, সব্বোনাশ হল!'

বাস্তবিক ওই 'সাতটি' শব্দটা ভুল, সপ্তম সর্গ, সপ্তর্ষির বা সপ্তপদীর, সেভেন পিলার্স অব উইজডাম—যে বোধরণনকে আশা করেই বসানো হোক না কেন। কিন্তু এই যে মনোজাগতিক ওয়েটলিফটিং এর প্রবণতা, পুরুষপৌরুষতন্ত্র নয়, পুরুষের পেশীতন্ত্র— এটা যখন পুরো রাজ্যপাটে, সুধীন্দ্রনাথ তখনই তাঁর সাবালক জীবন যাপন করছেন— বম্বার্ড করতে চাইছেন। কাজেই অমন যথাযথ কবিতায়ও এই একটা ভুল রয়েছে মনে করুন, 'শক্তিমান কবি'— একথাটা তো আমরা এখনো বলি। এই শক্তিমত্তা কিন্তু সেই বৃহদায়তনিকতা, বিস্তারবাদিতাকে ইঙ্গিত করে। যা সম্ভবত অর্থপ্রতিষ্ঠার ভুবনেও, আমরা সিংহভাগ লোকজনই চাই— হাসিখুশি অর্থনীতির নবীন ধারণাটি আবার সেই দুধেভাতে থাকা সন্তানদের বহুযুগের ওপার থেকে এসেছে, দেখাও যাচ্ছে যে বৃহত্ত্ববাদী অর্থনীতির যতটা গর্জন ততটা বর্ষণ নেই— তা ফুলিয়ে দিতে পারে কিন্তু ফলিয়ে দিতে পারে না— এই একই বোধ এখন বাংলা কবিতা লেখা-পড়া-মনেকরার ক্ষেত্রেও ঢুকছে।

শক্তিমান ওয়েটলিফটার হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ হয়তো একটু গোলমাল করেইছেন সর্বত্র, কিন্তু তাঁর প্রেমের কবিতা, প্রীতি বা প্রেয়রসের কবিতা এখনো অক্ষোভ্যঅমিতাভঅমোঘসিদ্ধি।

গীতায় দেখা যায়, সেই বহুবিতর্কিত ভগবান চার রকমের ভক্ত পান : আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এই জ্ঞানী কিন্তু প্রেমিক অর্থে।

ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে জল্পক, নাট্যক ও পদ্যক বলতেন।

এখন আর্তি, অর্থার্থিতা, জিজ্ঞাসা—এসবই নাট্যগুণসম্পন্ন, কাজেই সবই শক্তির কোঠায় পড়ে। কিন্তু যেখানে লেখককবির শক্তিমত্তার প্রশ্ন পাঠককবিকে আর কোনো রেভারেনশাল অ্যা-এর দিকে নিয়ে যায় না, মানতেই হয় সেসব লেখায় জ্ঞানী প্রেমিকতা আছে, তার গল্প, নাটক বা পদ্যগুণ তখন মদে-তীক্ষ্ণে-কর্মচক্রে থাকে না, কল্পে-সুখে-ধর্মে চলে আসে। সম্ভবত এটা একটু অপরিষ্কার করে বলেছিলেন বিনয় মজুমদার, 'জীবনানন্দের মধ্যে একটাও আনন্দের কবিতা পাইনি।'

আনন্দ শব্দটা অজস্রাঙ্গ, ও দিয়ে কিছু বোঝা যায় না। দরকারও নেই। আমরা যদি ঠিক করে নিই যে শক্তিমত্তার প্রদর্শন আমরা বাদ দেব কবিতা থেকে—তাহলে এর একটা প্রতিক্রিয়া অন্য মানুষশ্রেণিতেও পড়তে পারে। সেটা হয়তো বড়ো বেশি আশার কথা হচ্ছে; কিন্তু যদি এমন ভাবি, যদি ব্যক্তিকবিতার থেকে দেশকবিতার দিকে নজর যায়, সঙ্গে সঙ্গে, ধুলো সরিয়ে সুধীন্দ্রনাথকে, আনতে হবে। সহজেই জানা যাবে, কোন্‌গুলি তাঁর আয়ুধ এবং কোন্‌গুলি তাঁর মালা।

যাঁরা এখনো সায়ুধ হতে চান, তাঁদের সুধীন্দ্রনাথকে দরকার নেই। যাঁরা অন্যরকম ভাবছেন, তাঁদের আরও অনেকের মতো সেই সুধীন্দ্রনাথকে দরকার, যিনি কোনো কোনো লেখায় বর্মাবরণ খুলে রেখেছেন। সেইসব লেখায় তিনি, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ—আরও অনেকেই—

সমান মাপের কবি। মহাকবি নন।

স্নেহাকর ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, 'ভালবাসা কবিসম্মেলন।'

ভালবাসা শব্দটিতে যাঁরা কিছু ক্রন্দনগন্ধ বা ওই জাতীয় ঘ্রাণ পাচ্ছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে জানালুম যে শম্ভু মিত্র একবার লিখেছিলেন, ঝগড়া মারপিটের দৃশ্যে সবাই অভিনয় করতে পারে। প্রেমের অভিনয় করা কঠিনতম।

আরও তীব্র বললে, গাছের ডাল ধরে গান গাওয়া, শিল্পকৃতি হিসেবে সব থেকে কঠিন। এদেশের এক বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী বলেছিলেন, বাংলা ফিল্ম এখন তেমন হয় না কারণ দর্শকদের 'বন্ধু' ভাবা হয় না।...সুধীন্দ্রনাথ কোনো কোনো লেখায় পাঠককে বন্ধু ভেবেছিলেন— কোন লেখায় ভাবেননি। দ্বিতীয়টা তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যা। তার জন্যে, যদি প্রথমাংশকে বর্জন করা যায়, তাহলে আরো একটু অবন্ধুত্ব ছাড়া, আমাদের জন্য প্রাপ্তি হবে না।

কবিকে জনপ্রিয় হতে হবে—এই দায় নেই ঠিক, কিন্তু সজ্জনপ্রিয় হতেই হবে। পাঠককেও, 'দুর্ধর্ষ' কবিপ্রাপ্তির খোয়াব কাটাতে হবে—যদি ধর্ষণ শব্দটা অন্যদিক থেকে সত্যিই অপছন্দের হয়।

এই লেখকের হয়ত উচিত ছিল সুধীন্দ্রনাথের প্রণয়লেখাগুলি চিহ্নিত করে দেওয়া; তা সে করল না—জিনিসটা খুবই সহজ, সূর্যের আলোয় সোনার গয়নার মত, সকলেই চিনতে পারবেন—যদি বৈদগ্ধ্য বা শক্তিমত্তার দিকে কোন bad faith বা মোহ না থাকে।

অনির্বাণকে, আবার, ধন্যবাদ। এই সঙ্গে ধন্যবাদ ভূমেন্দ্র গুহকে। একই দিনে, তাঁর সঙ্গে,

সুধীন্দ্রনাথ নিয়ে কথা হল। রবীন্দ্রনাথের থেকে আলাদা হবার চেষ্টা সুধীন্দ্রনাথের ছিল—একটু বেশী জোরের সঙ্গে কোথাও-কোথাও, সেখানেই সুধীন্দ্রনাথ সায়ুধ; কবিতার রসবস্তুটার আবেদন যখন সুধীন্দ্রনাথের চোখে আগে ধরা পড়েছে তখন তিনি আর খেয়াল রাখেননি যে সেসব লেখায় কতটা রবীন্দ্রছাপ থাকছে; এইসব লেখাতেই তিনি মাল্যবান।

আজ আমরা জানি যে এমন আলাদা হবার চেষ্টায় আলাদা হওয়া যায়। সে প্রখরতা তবু সেই সব দেশে মানায়, যেখানে ব্যাধিশত্রুভয় অর্থকষ্ট অবন্ধুত্ব অনেকটা কম। সেসব দেশ ঠিক ভারতীয় উপমহাদেশ নয়। জনতার যে জঘন্য মিতালিতে আমরা নিযুক্তোহস্মি, সেখানেই আমাদের যথাসাধ্য থাকতে হবে—কবিতাতেও। অবশ্য এই কার্যক্রম মনে রেখে লেখারা এসে পড়ে না। তবু পশ্চিমবাঙলায়, গত যাটবছরের কবিতার রণপরিশ্রমের পর, দেখা যাচ্ছে, সুধীন্দ্রনাথ কেন, আরো নানা কবির সাঁজোয়া দিকগুলি নিতান্ত নিশ্চলমূর্তি হয়েছে—বিবুধ কবিমণ্ডলীর নানা রসভাষ্যকে প্রায় কিছুই না নিয়ে, কবিতার্থীরা প্রকারান্তরে 'শাশ্বতী'দের বেছে নিচ্ছেন এক জীবনের দীর্ঘ স্মৃতির জন্যে। যেন তথাগতের ইতিহাস আসলে সুজাতার হাত থেকে পরমান্ন গ্রহণের ইতিহাস। 'শাশ্বতী'ত মহাভারতের রুরু চরিত্রটির পুনর্লিখন।

ঐ ইতিহাসই কি আসলে বাঙালীর মনের মন্দ্রষড়জ, মধ্যম বা পঞ্চম? আমি জানি না, কিন্তু এমন মনে হচ্ছে। তা যদি হয় তবে বলতে হয় বাউল নয় সুধীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ ছিলেন তাঁর নিবেদনের, রেন্‌ডিশনের দিক থেকে—যদিও, হৃদয়ের এই দিকনির্দেশের বাইরেও তিনি চলাফেরা করেছেন। তাঁর স্বাস্থ্যের অক্ষয়বটের কাছে গিয়ে দেখা যায় নানা গূঢ় বৃক্ষতল থেকে সেমিটিক সাম্রাজ্যবাদের স্মৃতি বা শীলনের বিষ ঝরছে—যদি, তরুণ মুখাবয়ব নিয়ে, আমরা তাকাতে পারি।

৫

হালে আমার ঝোঁক হয়েছে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাজে লাগানোর দিকে। সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও কবিতার উৎপন্ন চারিত্র্য (ইতোমধ্যে জেনেছি, অপ্রকাশিত সুধীন্দ্রনাথ বিপুল) আমার কাছে শরদিন্দু-প্রণীত 'চিড়িয়াখানা' উপন্যাসের অন্যতম নায়ক 'নিশানাথ সেন' চরিত্র। সংক্ষিপ্ত বিবরণ: 'মধ্যবয়স্ক একটি ভদ্রলোক। আকৃতি মাধ্যম, একটু নিরেট গোছের, চাঁছা-ছোলা ধারালো মুখ, চোখে ফ্রেমহীন ধূমল কাচের চশমা পরিধানে ময়ুল-শুভ্র প্যান্টুলুন ও সিল্কের হাতকাটা কামিজ। পায়ে মোজা নাই, কেবল বিননি করা চামড়ার গ্রীসান স্যান্ডাল। ছিমছাম চেহারা।'

ফুলের ব্যবসা এই চরিত্রের। 'কথা বলিবার ভঙ্গিটি ত্বরাহীন, যেন আলস্যভরে কথা বলিতেছেন। কিন্তু এই মন্থরতা যে সত্যই আলস্য বা অবহেলা নয়, বরং তাঁহার সাবধানী মনের বাহ্য আবরণ মাত্র, তাহা তাঁহার সজাগ সতর্ক মুখ দেখিয়া বোঝা যায়। মনে হয় দীর্ঘকাল বাক্‌সংযমের ফলে তিনি এইরূপ বাচনভঙ্গীতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। ব্যোমকেশের বাক্‌প্রবন্ধাবলীও অতিথির প্রভাবে একটি চিন্তামন্থর হইয়া গিয়াছিল'...সুধীন্দ্রনাথ পড়তে গেলে আমরাও তাই হই, তারপর আমাদের মধ্যে অধিক মগজবানেরা ধরতে পারেন, ইতি শুধু পুষ্পব্যবসায়ী নন, সিভিলিয়ান, জজ কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু আগেই অবসর নিয়েছেন, উঁচু রক্তচাপের কারণে

মস্তিষ্কের কাজ করতে চাইছেন না। নিজের সম্পর্কে বলছেন, ভাবনাচিন্তা কিছু নেই—যেটা পুরোটাই অনৃত।

নিশানাথ blackmail-এর বাঙলা প্রতিশব্দ জানতে চান। সুধীন্দ্রনাথের দুরূহতা যে প্রতিশব্দসন্ধান ক্ষেত্রে হয়েছে, এটা বলে দিতে হবে না। ব্যোমকেশ মন্তব্য করছেন নিশানাথ সম্পর্কে— 'ওঁর পরিমার্জিত বাচনভঙ্গী থেকে মনোবৃত্তির যেটুকু ইঙ্গিত পেলাম তাতে মনে হয় উনি মনুষ্যজাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। ঘৃণাও করেন না; একটু তিক্ত কৌতুকমিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব। উচ্ছের সঙ্গে তেঁতুল মেশালে যা হয় তাই।'

নিশানাথের প্রতিষ্ঠিত স্থানটির নাম ছিল গোলাপ কলোনী, যাকে চিড়িয়াখানা বা পিঁজরাপোলও বলা হত। তিনি কথোপকথনের হাল্কা সুরেই বলেন, 'বর্তমান সভ্যতা কি শ্রদ্ধা হারানোর সভ্যতা নয়? যারা নিজের ওপর শ্রদ্ধা হারিয়েছে তারা আর কাকে শ্রদ্ধা করবে?'

যাঁরা 'চিড়িয়াখানা' পড়েছেন তাঁরা জানেন, নিশানাথের আসল চারিত্র্য তাঁর প্রেমিকতায়।

৬

কালীকৃষ্ণ গুহের সঙ্গে কথা হচ্ছিল; সুধীন্দ্রনাথ সব লেখাই কোন না কোন লক্ষ্য নিয়ে, সংকল্পবদ্ধভাবে লিখেছেন—এ বিষয়ে আমরা একমত হতে পারলুম; পদ্যছন্দ সর্বত্র—এভাবেও তাঁকে চেনা যায়। সুধীন্দ্রনাথের 'জীবনদর্শন' কী ছিল আমি জানি না; তবে নরজীবনের যে দৃক্‌ভঙ্গী তিনি পাঠকদের উপহার দেন, সেই কখনো কষায় কখনো করুণমধুর রসে আসা, পাঠকের পক্ষে সম্ভবত চল্লিশোত্তীর্ণ না হলে সম্ভব হয় না। যাঁদের 'ফিয়ার অব্ ফিপটিজ' এসে গেছে, তাঁদের পক্ষে বিশেষ করেই সম্ভবপর। পাঠককে সান্নিধ্য দেওয়ার বিষয়ে, সুধীন্দ্রনাথ, অন্যান্য যে কোন লেখকের মতই লয়োদয়শীল—হয়ত একটু বেশীই। ভারতীয় পুরাণের দেবদেবীরা সকলেই যৌবনাবস্থায় থাকেন; কিন্তু মনুষ্যকুলে জরা বার্ধক্য প্রৌঢ়তা আমোঘ, ধ্রুবপদী, স্পষ্ট যৌবন থেকে সূক্ষ্ম যৌবনান্তরে যাওয়ার সময় একে ছুঁয়ে যেতে হয়। সুধীন্দ্রনাথ এমনি এক কবিপ্রৌঢ় যিনি আর্ত, অর্থার্থী (তাৎপর্যকামী), জিজ্ঞাসু ও প্রেমিক তাঁকে অবহেলা করা যায়—এই শর্তে করা যায় যে পরে এই হেলার জন্য অনুতপ্ত হয়ে পুনঃপাঠে যেতে হবে।

কবি হবার ঘোড়দৌড়ে কে বিপুল স্কোর করলেন এমন চিন্তায় অনেক সময় গিয়েছে। এতে ক্ষতি একটাই। প্রণীত কবিতাগুলি আমাদের কতটা বহন করছে, আমরা তাদের কতদূর বহন করতে পারব— এসব হুঁশ থাকে না। একদিন সুধীন্দ্রনাথকে মনে করা হত শ্রেষ্ঠ কবি, জীবনানন্দকে পাণ্ডুর, মিটমিটে, ধূসর। পরে দেখা গেল জীবনানন্দই কলোসাল স্ট্যাচু অব্ লিবার্টি, সুধীন্দ্রনাথ নিতান্তই পশ্‌পাড়ার ম্যানারিজম...কিন্তু কোনোটাই নয়।

অবধূতের একটা ছোটো গল্প এই শয্যাবরুদ্ধ দশায় পড়ছিলুম। এক সিঁড়িপাহাড়ের গল্প। একটি মন্তব্য আছে, 'উঁচুতে উঠলে বোঝা যায় যেটাকে নীচু বলে মনে হচ্ছে সেটা আর একরকমের উচ্চতা— যেটা এ জগতের সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার।'

শীর্ষে পৌঁছে, অবধূত প্রার্থনা করেছিলেন, যা সত্যিই বিশ্বাসের তাকে যেন ঋজু অকাপট্যে বিশ্বাস করতে পারেন।...কবিদের এইসব মহাকবিত্ব বিশ্বসনীয় নয়। যেটুকু বিশ্বাসের, সেই সূত্রে

দেখলে স্পষ্ট হয় সব কবিই সমানভূমির— কারো রচনা কিছু কম, কারো কিছু বেশি। কিন্তু একটি কবিতাই যে আমাদের পক্ষে অনেক। গঙ্গা এমুলুকে বেশি চওড়া, ও মুলুকে ক্ষীণ, এতে কি গঙ্গার কোনো তারতম্য হয়?

সুধীন্দ্রনাথকে, নতুন করে সঙ্গে নিতেই হবে। কবিতা পড়ার জন্যে, প্রেমে-পড়ার জন্যেও। আবার বলে নেওয়া যাক, তাঁর সম্পর্কে আকর্ষণ-বিকর্ষণ একই সঙ্গে চলতে থাকবে—বিকর্ষণের কারণ সুধীন্দ্রনাথের শাব্দ উন্নাসিকতা— রবীন্দ্রধারা থেকে একটু বেশি চোখে আঙুল দিয়ে আলাদা হবার চেষ্টা ছিল তাঁর ভাষার বয়নে। জিনিসটা ঝুঁকির হয়েছিল, সর্বত্র লাভ হয়নি। ভাষাবুনোনের ব্যক্তিমোহরদানের অতিশয় স্বাতন্ত্র্য লেখক বা পাঠক, কারো পক্ষেই সহ-জ হয়ে ওঠে না। লেখক ও পাঠকের সম্পর্কটা বেঁচে থাকে— শেষপর্যন্ত লেখাটি যে অনুভব তৈরি করে দেবে, তার উপর। সুধীন্দ্রনাথ আগেই বেশি মাননীয় হয়ে পড়েন—সমীহযোগ্য অর্থে, কিন্তু শ্রদ্ধার শারীরিক বোধ কিছু আলাদা হয়! মনে হয় যে সুধীন্দ্রনাথ বই-পড়াকে যে মূল্য দিয়েছিলেন, বই-না-পড়া মানসঅধ্যয়নের দিকে সেই একই মূল্য ধার্য করেননি।

এ সত্ত্বেও, সুধীন্দ্রনাথ থাকেন। তাঁর অনেক কবিতায়, প্রেম আছে— মানে সেগুলো পড়লে প্রেমের বোধ হয়। শিক্ষাভিমানী ধনী ব্যক্তিত্বের গন্ধ সেখানে থাকে না। এই প্রণয়ঋদ্ধ লেখাগুলি প্রায়চিরঞ্জীব ও সম্প্রীতিশালী। তাঁর উত্তম রচনাই তাঁর অন্যবিধ লেখাদের— ব্যক্তিগত দুর্বলতাকে চিনিয়ে দেয়। তিনি এমন এক কবি যিনি গ্রন্থপ্রেমে জর্জর কিশোর সরলতা থেকে যখনি সরে এসেছেন তখনি ধ্রুববৎ কবিতা বা কবিতাংশ রচনা করেছেন।— নিজের উপর পুরো সুবিচার তিনি করতে পারেননি।

কিন্তু আজ যখন দেখা যাচ্ছে কবিতাকে শেষতক শ্রদ্ধাবোধ, প্রেমবোধ, প্রীতিবোধ বা কামবোধের 'পরে বেঁচে থাকতে হয়— বারবার পঠিত হওয়ার জন্যে, পাঠককে আরো একটু ব্যাপ্ত মানুষ করার জন্যে, তখন সুধীন্দ্রনাথ পড়ার দরকার থাকেই। প্রেম, যা উজ্জ্বল মধুর রস, সেটাতে আশ্রিত বাংলা কবিতা এ মুহূর্তে কম, এবং এই পথে, সুধীন্দ্রনাথ অনেক কবির সহায়তা করতে পারেন। পাঠকের ক্ষেত্রে তো বটেই।

কল্পনার কাজ : ঔপনিবেশিক বাংলায় সময় ও ইতিহাস-চেতনা

প্রথমা বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ইতিহাস লেখার ডাক দেন। বলেন যে, স্বদেশচিন্তার প্রথম কদম হল সকলের একজোটে ইতিহাস লেখার চেষ্টা। এটা প্রমাণ করে দেওয়া যে, যাঁরা বলেন, ভারতে ইতিহাস নেই, ইতিহাস চেতনা নেই, ঐতিহাসিক আকর-গ্রন্থ নেই, তাঁরা নিতান্তই ভুল। তারপর, আমরা জানি, বাংলায় ইতিহাস লেখার ধুম পড়ে যায়—ভারতদেশের ইতিহাস থেকে বাংলার ছোট্ট গ্রামের ইতিহাস, রাজস্থানের ইতিহাস থেকে নানা ঐতিহাসিক উপন্যাস, ভাষার ইতিহাস থেকে শিল্পের ইতিহাস, কী না লেখা হয় বাঙালির হাতে।

এই নতুন ইতিহাস-সচেতনতার প্রথম ও প্রধান দাবি হয়ে দাঁড়ায় এই যে, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কীর্তি ও উপকরণ। আমাদের পক্ষে যে ইতিহাস লেখা সম্ভব, আমরা যে বহু শতাব্দ ধরে ইতিহাস লিখে এসেছি, এর প্রমাণ এই যে আমরাই একসময় মহাভারত লিখেছিলাম। আর মহাভারত নিঃসন্দেহে নিজেই একটি বিশাল ইতিহাস গ্রন্থ। তাই মহাভারতের মতো কাব্যের ঐতিহাসিক প্রামাণ্য ও সত্যতা প্রমাণ করাই বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। আর তা করতে গিয়ে বঙ্কিম চেষ্টা করেন মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে যতসব কাল্পনিক উপকরণগুলিকে উপড়ে ফেলে দিতে। কারণ কল্পনা বাদ দিয়ে যা বাঁচল, তাই আসল ইতিহাস—ইতিহাসের সংজ্ঞা বঙ্কিম এভাবেই ধরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' তাই আস্‌লি আর কাল্পনিককে বেছে বেছে আলাদা করারই এক প্রকল্প বলে ধরা যায়।

কল্পনা বাদ দিয়ে যা রইল, তাই বিজ্ঞান, তাই ইতিহাস, তাই সত্য—ইতিহাসের এই তথ্যবাদী ধারণা আর সত্যের এই অবিকল্প সংজ্ঞা, এ দুয়েরই সীমাবদ্ধতা ও ভঙ্গুরতা প্রমাণ করেছেন আজকের নানা ঐতিহাসিক। গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ্ত কবিরাজ, ইন্দিরা চৌধুরী প্রভৃতি গবেষকরা দেখিয়েছেন, কীভাবে উনিশ শতকীয় বাঙালি লেখকেরা, এমনকী বঙ্কিম নিজেও, তথ্যের সঙ্গে কাহিনি, মিথ, কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ইতিহাস তৈরি করেছেন, কীভাবে আপাত সত্যের ওপর ব্যঙ্গ-র প্রয়োগ করে, তথাকথিত একক সত্যের পর্দা ফাঁশ করেছেন।[১] এও আমরা জেনেছি, কীভাবে সত্যের এক ও অবিকল্প হওয়ার দাবির মধ্যেই লুকিয়ে আছে অন্য সত্যের অস্তিত্ব, অপরের সত্যকে পরাজিত করার প্রচেষ্টা। এও জানা গেছে যে, সত্যের বিভিন্নতা ও নানা সত্যের দ্বন্দ্বের

ওপরই দাঁড়িয়ে আছে Nationalism এর আলাদা আলাদা রূপ ও দাবি, দেশের ইতিহাস, দেশের অস্মিতা, দেশের বোধ ও কল্পনা। আজ এ কথা না মেনে উপায় নেই, ঐতিহাসিক সত্যের খোঁজ কখনোই স্বপ্নকে, আকাঙ্ক্ষাকে, ভবিষ্যৎ-চিন্তার নানা কল্পনাকে মিথ্যে করে দিতে পারেনি।

এর মানে শুধু এই নয় যে কাল্পনিক-কে উপড়ে ফেলার বঙ্কিমি চেষ্টা অসফল হয়েছে। আবার এও ঠিক, শব্দ ও ধারণা— এই দুই অর্থেই কল্পনা কথাটি বার বার ফিরে এসেছে খিড়কি দিয়ে, স্বদেশচিন্তা আর স্বদেশসৃষ্টির নামে। তাই যেমন 'ইতিহাস কাকে বলে?' প্রশ্নটি আধুনিক বাঙালির চিন্তার দিগন্ত তৈরি করেছে, ঠিক তেমনই 'কল্পনার কাজ কী?', এই প্রশ্নটিও আধুনিক বাঙালি চিন্তাবিদ-দের শুধু সাহিত্যবোধই নয়—স্বদেশ আর ইতিহাসবোধকে অন্যভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। 'কল্পনার কাজ কী?'—এই প্রশ্নটি নিয়েই এই লেখার চেষ্টা।

মনে রাখা দরকার, imagination শব্দটিকে এক ঐতিহাসিক ধারণার চেহারা দেন প্রথম Benedict Anderson, বছর কুড়ি আগে, তাঁর *Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* বইটিতে। তিনি দেখান যে nation বা দেশ বা রাষ্ট্র কোনো স্বতঃসিদ্ধ ভৌগোলিক, ভাষাগত বা প্রাকৃতিক সত্য নয়। দেশকে আমরা সক্রিয়ভাবে গড়ে তুলি আমাদের imagination বা কল্পনা দিয়ে। আর এই প্রথম কল্পনার ধারণা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে ইতিহাস-লেখন আর সমাজ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ concept হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যদিও imagination শব্দটির ব্যবহার আজ আমাদের নজরে nation বা দেশের ধারণাটিকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে, ঐতিহাসিকরা imagination শব্দটির নিজস্ব অর্থ ও ইতিহাস নিয়ে এখনও তেমন ভাবেননি। একমাত্র দীপেশ চক্রবর্তীই দেখিয়েছেন যে ইউরোপীয় romantic পরম্পরায় আমরা যাকে একটা ব্যক্তিগত ও আন্তরিক মানসিক ক্রিয়া বলে বুঝি, সেই imagination কে বাংলার ইতিহাস প্রসঙ্গে একটা যৌথ, সামাজিক ক্রিয়া হিসেবে দেখলে তবেই শব্দটির যাথার্থ্য বোঝা যায়। অমূর্তকে মূর্ত হিসেবে, নির্গুণকে সগুণ ও বর্ণনীয় হিসেবে দেখার সামাজিক প্রণালী—যাকে আমরা দর্শনের পরম্পরা বলে জানি—এটাই imagination বা কল্পনা। এই দর্শনের দ্বারাই দেশ ভারতমাতা ও ঈশ্বর মূর্তি হিসেবে প্রতীত হন। এই কল্পনা, যা আপাত-অনুপস্থিতিতেও উপস্থিতি ও প্রতিষ্ঠা দেখতে সাহায্য করে, তাকে এক ব্যক্তির বা কবির বা উপাসকের মনের জগৎ বলে ধরলে এই imagination শব্দটি অ-সামাজিক ও নিতান্তই সাহিত্যে সীমিত বলে প্রকট হয়। কিন্তু ইতিহাস ও nationalism-এর ধারণা বুঝতে গেলে imagination শব্দটিকে একটি সামাজিক অবস্থান দিতে হয়। Imagination শব্দটিতে image, vision, visualisation এর বোধ নিহিত রয়েছে। যা আপাতদৃষ্টিতে নেই, তাকে দেখতে পাওয়ার উপায়ের ইঙ্গিত এই শব্দটি। এই দেখতে পাওয়ারই এক অন্য ধরন—যা বাংলার গ্রামে শহরে আজও

প্রচলিত, যার ইঙ্গিত আমরা দেবদর্শন, ভারতদর্শন, দিগদর্শন ইত্যাদি শব্দ-ব্যবহারের মধ্যে পাই—দীপেশ এই দর্শন পরম্পরাকেই imagination এর এক অন্য সামাজিক মাত্রা হিসেবে দেখিয়েছেন।[২]

এবার একটু অন্যভাবে imagination শব্দটিকে বোঝা যাক। 'কল্পনা' আমাদের কাছে আজও imagination শব্দটিরই সমার্থবোধক অনুবাদ। অন্যদিক দিয়ে দেখলে কল্পনা একটা আলাদা শব্দও বটে, যার একটা আলাদা ইতিহাস রয়েছে। আর এই আলাদা অর্থ ও ব্যবহারগত পরম্পরায় কল্পনা শব্দটি যতটা না দৃষ্টি বা দর্শনের ধারণা বোঝায়, তার থেকে বেশি ইঙ্গিত করে একটা কালবোধের ধারণার দিকে। ঠিকই, চিত্রকল্প, বা কবিকল্প শব্দে কল্পনার বোধ আসে চিত্র বা দৃশ্যের অর্থে। কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত অর্থে দেখলে আবার 'কল্পনায়াঃ নবোদ্ভাবনস্য শক্তি' অর্থাৎ নতুন বিষয় উদ্ভাবনের শক্তিই কল্পনা। কল্প হল ব্রহ্মার একদিন বা দেবতাদের একসহস্রযুগ। কল্প তাই সৃষ্টি লয়ের সময়কাল বোঝায়। আবার অনেক ব্যবহারে কল্প মানে প্রলয়, যা বিশ্ব চরাচরকে ধ্বংস করে ও নতুন সৃষ্টি সম্ভব করে তোলে। একই অর্থে কল্প হল 'সংকল্পের ন্যায় আশু বিনাশী পদার্থ।'[৩] নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষ অনুসারে তাই বলা চলে যে, কল্পবোধ বা কল্পনা যতটা সময়বোধের আধারিত ধারণা, ততটা দৃশ্য বা দৃষ্টিবোধের ওপর আধারিত ধারণা নয়। কল্পনা শব্দটি যে সময়বোধের তরফে ইঙ্গিত করে তা আমাদের সাধারণত ঘড়িতে বাঁধা সময় নয়। এমনকি ইতিহাস -লেখন দ্বারা প্রচলিত সালতামামির, রাজ্য-দেশ-সভ্যতার উত্থান-পতনেরও সময় নয়। এ হল এমন এক সময়বোধ যা সাধারণ বা প্রতিনিয়তের সময়ধারণার পারম্পর্য খণ্ডন করে সৃষ্টি ও প্রলয়, নবোদ্ভাবন ও ধ্বংসের ক্রিয়াকে সম্ভব করে তোলে।

উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায়, এই কল্পনা বা সৃষ্টি লয়ের সময়বোধ ঐতিহাসিক সময়-ধারণার বিকল্প হিসেবে তৈরি হয়ে উঠেছিল অনেক বাঙালির লেখায়। ১৮৯৪ সালে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-পদ্ধতির সমালোচনা লেখেন এই কল্পনার নামেই। লেখেন যে, শাস্ত্র থেকে ইতিহাস উদ্ধার করতে গিয়ে বঙ্কিম যেভাবে কাব্য ও কল্পনাকে ছেঁকে ফেলে দিতে চেয়েছেন, তাতে হয়ত 'ইতিহাস কি নয়', এ কথা বোঝানো গেছে। কিন্তু 'ইতিহাস যে কী', তা মোটেও স্পষ্ট হয়নি। বঙ্কিম বলেছেন যে মহাভারত 'কবিত্বময় ইতিহাস'— যেখানে তা ইতিহাস, সেখানে মহাভারত সত্য, যেখানে কাব্যময়, সেখানে তা কাল্পনিক। অথচ আসলে মহাভারত 'ঐতিহাসিক কাব্য'— এটাই অধিকতর সত্য, কারণ তা ইতিহাসও বটে, কাব্যও বটে। যে তথ্যবাদী দৃষ্টিকোণ দিয়ে বঙ্কিম কৃষ্ণচরিত্রের সত্যতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তাতে কৃষ্ণের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।[৪] অর্থাৎ কল্পনাকে নজরান্দাজ করতে গিয়ে বঙ্কিম কৃষ্ণচরিত্রের সর্বকালীন প্রাসঙ্গিকতা ও যাথার্থ্য জলাঞ্জলি দিয়েছেন। কৃষ্ণ এক পুরোনো, ঐতিহাসিক চরিত্র হয়ে থেকে গেছেন। অথচ কবিকল্পনার মাধ্যমে তিনি চিরকালের, এমনকি বর্তমানের

জাতীয় আদর্শ হয়ে উঠতে পারতেন। বিশেষ করে, কেননা এই আদর্শ স্থাপনই বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল।

বঙ্কিম নিজে উপন্যাসকার ছিলেন— তাই কল্পনাকে তিনি নিশ্চয়ই অপ্রয়োজনীয় বলে মানতেন না। তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধে তিনি 'চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির' প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন। কাব্য যে কত জরুরি তা বোঝাতে গিয়ে তিনি এও লেখেন যে 'কু-কাব্য লেখককে তস্করাদির ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করা উচিত।'[৫] কিন্তু তফাত এই যে তাঁর চিন্তায় কাব্যকল্পনার কোনো বিশেষ স্থান বা প্রাধান্য ছিল না। তাঁর লেখায় কল্পনাবোধ, প্রমাণবোধ ও আনন্দবোধের সঙ্গে উপযুক্ত জাতীয় ধর্মের উপকরণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি হয়তো কখনোই রবীন্দ্রনাথের এ কথা মানতে পারতেন না, যে—

'...যে ব্যক্তি ইতিহাস পড়িবার সুযোগ পাইবে না, কাব্যই পড়িবে, সে হতভাগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি কাব্য পড়িবার অবসর পাইবে না, ইতিহাস পড়িবে, সম্ভবত তাহার ভাগ্য আরও মন্দ।'[৬]

বঙ্কিম মানতেন, কল্পনার দিগন্ত ঐতিহাসিক, কার্য-কারণ-সম্বন্ধ ও ঐতিহাসিক পর্যায় বা stage দ্বারা নির্ধারিত। যেমন বাংলায় গীতিকাব্য অধিক জনপ্রিয় বলে মানা হয়, তার একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণ আছে। যেহেতু বাংলার উর্বর মাটিতে কম বা বিনা শ্রমে ফসল উৎপাদন হয়, সেহেতু বাংলায় আসার পর আর্যরা 'উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখ-পরায়ণ' হয়ে ওঠে। তাই তাদের কল্পনাও কোমলতা ও দম্পতিপ্রণয়ের পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়।[৭] অর্থাৎ বঙ্কিম মানতেন যে কল্পনা ঐতিহাসিক নিয়ম দ্বারা নির্দেশিত হয়, ইতিহাস কখনোই কল্পনার দ্বারা নয়। অথচ রবীন্দ্রনাথ বললেন ঠিক উল্টো কথা, বললেন ঐতিহাসিকতা একটি রস—

'আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে নয়টি মূলরসের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু অনেকগুলি অনির্বচনীয় মিশ্র রস আছে, অলঙ্কারশাস্ত্রে তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই। সেইসমস্ত অনির্দিষ্ট রসের মধ্যে একটিকে ঐতিহাসিক রস নাম দেওয়া যেতে পারে।'[৮]

১৮৭০-এর দশক থেকে বঙ্কিম ও তাঁর সহযোগীদের লেখা, তাঁদের ইতিহাসবোধ, তাঁদের ঐতিহাসিক নভেল নিয়ে নানা experiment বাঙালি মধ্যবিত্তের দেশবোধ, কালবোধ, এমনকি প্রসঙ্গবোধ পর্যন্ত বদলে দেয়। সমাজচিন্তা ও সামাজিকতাও এর প্রভাবে এক নতুন ভাষা পায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, দু-তিন দশকের মধ্যে এমন কী বদলাতে শুরু করল যে, ১৮৯৪ সালেই, রবীন্দ্রনাথের মতো নবীন লেখকের কলমে এই ইতিহাসচেতনার সমালোচনা তৈরি হতে লাগল—তাও কাব্য, কল্পনা ও রসবোধের নামে? রবীন্দ্রনাথ একাই কি এ কাজ করছিলেন? নাকি আরও অনেকে, মোটামুটি একই সময়ে অর্থাৎ বিশ শতকের গোড়ায় কল্পনার ধারণাকে নতুন করে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টায় ছিলেন?

মনে রাখা দরকার যে, বিশ শতকের শুরুতে, ইতিহাসের যে সংজ্ঞা ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল তাও বঙ্কিমী ইতিহাস-ধারণার থেকে সচেতনভাবে আলাদা। সে সময়ের সব থেকে মান্য ঐতিহাসিক, অক্ষয়কুমার মৈত্র, সাহিত্য পরিষৎ সভায় জোর গলায় বললেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সময় এবার শেষ হতে চলেছে। এখন আর 'আমার, তোমার, সবার' লেখা ইতিহাসের প্রয়োজন নেই। এখন সময় এসেছে সঠিক, সত্য আর মান্য ইতিহাস লেখার। এই ইতিহাস যে-সে লিখতে পারে না। তাঁরাই পারেন যাঁরা প্রমাণতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করেছেন। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, ইতিহাস-লেখন কোনো সামাজিক বা সর্বজনিক যৌথ ক্রিয়া নয়, দেশপ্রেম কর্মবোধের প্রকাশ নয়। ইতিহাস-লেখন একধরনের জ্ঞানচর্চা, যাতে একমাত্র ঐতিহাসিক পণ্ডিত সম্প্রদায়েরই অধিকার আছে।[৯] বলাই বাহুল্য, জাতীয় কর্তব্য বা অধিকার থেকে যখন ইতিহাসচর্চা বা গোষ্ঠীগত exclusive অধিকার হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখনই ইতিহাসের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠছে। অনেকেই বুঝতে পারছেন যে এই ইতিহাস সর্বজনিক ভবিষ্যৎ-চিন্তার-সহায়ক হতে পারবে না। এই ইতিহাসচর্চা ও আলোচনা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যাবে। আর এই সীমাবোধই যেন কল্পনা আর কাব্যকে অন্যভাবে বাঙালির চিন্তাজগতে প্রবেশ করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় লিখছেন : 'সময়কে যদি আমরা শুধুমাত্র ইতিহাস ও সালতামামির নজর দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি, তবে আমাদের অস্তিত্বই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের নামে খণ্ডিত হয়ে পড়বে। এই সময়বোধের আধারে সৃষ্টিক্রিয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে, ভবিষ্যৎ কল্পনা করার প্রজ্ঞাও আমরা হারিয়ে ফেলব। যে ভাব বা বাসনা আমাদের ইতিহাস বুঝতে বা লিখতে উদ্বুদ্ধ করে তা শুধু সত্যানুসন্ধান বা জ্ঞানচর্চার আকাঙ্ক্ষাই নয়, তা সৃজনের, ভবিষ্যৎ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। এখানেই হল ইতিহাসের আসল রস—সৃষ্টির আনন্দে, আর ব্যথায়'।[১০] প্রমথ চৌধুরীও লিখছেন—অক্ষয়কুমারের জবাবে—যে, বিজ্ঞান হল প্রাক্-নির্ধারিত বস্তুর হিসেবনিকেশ, নতুন সৃষ্টির পরিচয় বিজ্ঞানের কেতাবে পাওয়া মুশকিল। সেখানে কল্পনা, কাব্য আর কর্মের অধিকার।[১১] অবনীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের বিখ্যাত মতবিভেদও এই প্রসঙ্গে। অক্ষয়কুমার মৈত্র সোজাসুজি লিখছেন : 'শিল্পতত্ত্ব নৃতত্ত্বের অঙ্গবিদ্যা। তাহাতে কল্পনার অধিকার নাই।...বিচারপদ্ধতি যে প্রমাণের উপর নির্ভর করে, শিল্প পরিচয়ও সেই প্রমাণ।'[১২] তিনি এও লিখছেন যে—

"সুনির্দিষ্ট শাস্ত্র-শাসনই ভারতসভ্যতার প্রধান বিশিষ্ট লক্ষণ। কপাল ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহাই প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিচয়। সেই চিরপুরাতন শাস্ত্র-শাসনের 'অতিক্রম-ব্যতিক্রম' ঘটাইয়া, অধুনা যে সকল নববিধান প্রচলনের চেষ্টা প্রবর্তিত হইতেছে, তাহার মূলে পুরাতনের প্রতি অপরিস্ফুটিত অবস্থা। ইহা ভারতবাসীর বংশপরম্পরাগত নহে, পরপ্রভাবপ্রসূত এক আগন্তুক উন্মাদনা; স্বদেশী নহে, বিদেশী।"[১৩]

উত্তরে অবনীন্দ্রনাথও সোজাসুজি বলেন, 'শিল্পের অধিকার আমাদের বর্তমানে, প্রতিবার, নতুন করে অর্জন করে নিতে হয়। ইতিহাস বা পারিবারিক সঞ্চয় যে আইনে পুরুষানুক্রমে, আমাদের হাতে আসে, কল্পনা সে আইনের অধীন নয়'।[১৪] তিনি এও বলেন যে 'মানুষের সমস্ত কাজে-কর্মে শিল্পে সাহিত্যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে কল্পনাটা প্রথম, তারপর বাস্তব।' ইতিহাস যেমন আমাদের কালের অধীন করে, কল্পনা তেমনই কাল বা সময়কে আমাদের অধিকারে নিয়ে আসে। সেই কল্পনার দ্বারাই পুরোনোর কারাগার ভাঙা আর নতুনের সৃষ্টি সম্ভব হয়। কেননা কল্পনা হল 'অবিদ্যমানের নিশ্বাস।'[১৫]

অর্থাৎ, বিশ শতকের শুরুতে, দ্বন্দ্বটা হয়ে দাঁড়িয়েছে কল্পনাবোধ আর ইতিহাসচেতনার মধ্যে। কল্পনা বা রস বা ভাবের সঙ্গে ইতিহাস বা জ্ঞানবোধের বৈপরীত্য খাড়া করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলছেন; জ্ঞানের কথা একবার জানলেই হয়, অথচ ভাবের কথার বৈশিষ্ট্যই এই যে তাকে বারবার অনুভব করতে হয়, জ্ঞানকে প্রমাণ করতে হয়, ভাবকে সঞ্চার করতে হয়। জ্ঞান একজন জানলেও তা জ্ঞান, কিন্তু ভাব লোক পরম্পরাভুক্ত না হলে যথেষ্ট নয়। জ্ঞান ভাষা থেকে ভাষান্তরে, form থেকে অন্য form-এ অনুবাদ করা যায়। কিন্তু ভাব যে form-এ, যে মূর্তিতে আশ্রিত তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বোঝা যায় না। যাঁরা ইতিহাসবোধকে কেবল জ্ঞানবোধ হিসেবে দেখেন, তাঁরাও মানতে বাধ্য যে দেশের ইতিহাসে সকলই গৌরবের নয়, অনেক পরাজয়, অনেক অবমাননার কথা ইতিহাসে লেখা থাকে। তাই কেবল ঐতিহাসিক গবেষণা আর বৈজ্ঞানিক বিচার কখনোই দেশকে ভালবাসতে শেখাতে পারে না। তার জন্য কল্পনা আর সহানুভূতি চাই। যদি ইতিহাস লেখন শুধু তথ্যসংগ্রহ ও সত্যানুসন্ধানই হত, তাহলে এই ইতিহাস যে কেউ লিখতে পারত। কেননা দেশের ইতিহাসে কল্পনা ও সৃষ্টির কাজ প্রধান, এই জন্যই দেশের ইতিহাস নিজেদেরই লিখতে হয়।[১৬]

যদি জ্ঞান বা তথ্য সত্যের দাবি করে, তবে এই কল্পনাও অসত্য নয়। কিন্তু কল্পনা যে সত্যের দিকে নির্দেশ করে, তা জ্ঞানের প্রত্যক্ষ বা প্রামাণ্য সত্যের থেকে আলাদা। রবীন্দ্রনাথ সত্যকে স্বপ্নের মতো সত্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করছেন। 'অনেক দার্শনিক পণ্ডিত প্রত্যক্ষ জগৎটাকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই পণ্ডিত স্বপ্নটাকে উড়াইতে পারেন নাই। তিনি বলেন, প্রত্যক্ষ সত্য নাই—তবে কী আছে? না স্বপ্ন আছে।'[১৭]

এ নিছক রাবীন্দ্রিক উপমার খেলা নয়। মনে রাখতে হয়, উনিশ শতকে, বারবার অনেক চিন্তাবিদদের লেখাতেই আমরা স্বপ্নের অভিজ্ঞতা, স্বপ্নে পাওয়া ভবিষ্যতের ছবি, স্বপ্নে জানা উপদেশ, ইত্যাদির কথা পাই। এই পরম্পরা অনুযায়ী, সচেতনভাবে গড়া কাহিনি, এমনকী ইতিহাস পর্যন্ত, যেভাবে মিথ্যা বা ভ্রমকে সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকতে পারে, স্বপ্ন কখনোই সেভাবে মিথ্যা বলতে পারে না। স্বপ্ন এমন সত্যও তুলে ধরতে পারে, যার খোঁজ চেতন মন সাধারণত পায় না। এমনকি, যা বাস্তব নয়, অথচ

সম্ভাব্য, তাও একমাত্র স্বপ্নই বলতে পারে। যা বর্তমান নয়, যা হারিয়ে গেছে সচেতন স্মৃতি থেকে, তা স্বপ্নেই প্রকট হয়। এ বর্তমান, বস্তুগত, হাতে-ধরা স্মৃতির প্রত্যক্ষ সত্য নয়। এ ভবিষ্যতের অনাগত, অতীতের বিস্মৃত, বর্তমানের অচিন্তনীয় কিন্তু সম্ভাব্য সত্য। রাজনারায়ণ বসু ইতিহাসের নামে এই সত্যেরই খোঁজ করেছিলেন তাঁর 'আশ্চর্য স্বপ্ন'তে।[১৮] ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও তা-ই খুঁজেছিলেন তাঁর 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'এ।[১৯] পরাধীন ও ঔপনিবেশিক বর্তমানের কয়েদের বাইরে, স্বপ্নের জগতে এই সত্যের বাস। এ সত্য অনুভব করা কল্পনার কাজ, জ্ঞানের নয়।

এতক্ষণ ধরে আমরা যেভাবে আলোচনা করছিলাম তাতে এমন মনে হতেই পারে যে, বিশ শতকের গোড়ায়, বাংলায় যে ইতিহাস ও কল্পনার বৈপরীত্য বোধ তৈরি হচ্ছিল, তা মোটামুটি আধুনিক পশ্চিমী জ্ঞানচর্চার সনাতন fact versus fiction দ্বন্দ্বেরই সমগোত্রীয়। এ যেন এক সাধারণ নিয়ম যে বিশ্বের যেখানেই আধুনিকতা ও ইতিহাসচেতনা শিকড় গাঁথে, সেখানে কল্পনা, কাব্য ও স্বপ্নের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা নতুন আর সক্রিয়ভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। Wordsworth, Coleridge এর প্রচেষ্টা যেন রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর প্রচেষ্টারই আর এক উদাহরণ। দু-টিই যেন এক একক ও universal সত্যের আলাদা, ব্যক্তিগত প্রকাশ।

অথচ, এভাবে দেখলে উনিশ-বিশ শতকীয় বাংলার পরাধীন ও ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির বিশিষ্টতা নজরান্দাজ করা হয়। আর সেই সূত্রেই নজরান্দাজ করা হয় এই ক্ষেত্রে কার্যকর কল্পনার ধারণার দু-টি প্রধান ও বিশেষ দিক। একটি দিক হল রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িক লেখকদের লেখায় কল্পনার ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রসবোধের ধারণা—যা, আমরা দেখাব, কল্পনার কাজকে ব্যক্তিগত বা নন্দনতাত্ত্বিক প্রচেষ্টা থেকে এক সামাজিক প্রচেষ্টার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আর দ্বিতীয় দিকটি হল কল্পনার ধারণার আনুষঙ্গিক স্মৃতির বা অতীতবোধের ধারণা—যা অন্য এক সময়চেতনা ও অন্য এক রাজনৈতিক সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করছিল।

তাঁর কাব্য, কল্পনা, সাহিত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশিরভাগ প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ রস, ভাব ইত্যাদি শব্দের বারবার প্রয়োগ করেছেন। এই প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য বুঝতে গেলে ক্ল্যাসিকাল রসভাষ্যের কিছু ধারণার উল্লেখ করতে হয়। অভিনবগুপ্তের রসভাষ্য অনুসারে, কবিকল্পনা যে রসবোধের উদ্রেক করে, সেই রস সার্বিক কার্য-কারণ, প্রমাণ-অনুমান যুক্তির নিয়মতন্ত্রের বহির্ভূত। তার কারণ রসের নিজস্ব চরিত্র : রস পূর্বসিদ্ধ কোনো বস্তু নয়, আবার কোনো কিছুর পরিমাণও নয়—'কর্ম হয়েও কার্য নয়, জ্ঞাপ্য হয়েও জ্ঞাপ্য নয়, নিত্য হয়েও নিত্য নয়।'[২০] অথচ এই রসানুভূতি নির্বিকল্প ব্রহ্মানুভূতির থেকেও আলাদা, কারণ প্রতীতির বাইরে রসের কোনো অস্তিত্বই নেই। এই রসাস্বাদনে কল্পনার বস্তুতে প্রকৃত বা সাদৃশের জ্ঞান হয় না, রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো নিশ্চয়াত্মক প্রতীতিও হয় না, উৎপ্রেক্ষা রূপে জ্ঞানও হয় না, চিত্র বা মূর্তির মতো অনুকরণেরও জ্ঞান হয় না, গুরু-

শিষ্যের শাস্ত্র ব্যাখ্যানের মতো অনুসরণেরও জ্ঞান হয় না।[২১] রসাস্বাদনে যা ঘটে তাকে অভিনবগুপ্ত দেশকাল নির্বিশেষ সাধারণীকরণ বলেছেন। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়। যেমন, ভয় যদি স্বগত বা প্রকৃতরূপে প্রতীত হয়, তবে লৌকিক ভয় জাগে, আবার যদি পরগত বা অনুকৃত রূপে প্রতীত হয় তবে ঔদাসীন্য জাগে। দুই ক্ষেত্রেই কল্পনার ব্যাঘাত জন্মে। কোনো রূপেই তাই ভয় রস হয়ে ওঠে না। ভয় তখনই রস হিসেবে আস্বাদিত হয় যখন তা সাধারণীকৃত হয়, যাতে 'সর্বসামাজিকানাম্ একঘনতা' তৈরি হয়।[২২] মনে রাখার কথা, এই সাধারণীকরণ ভাষার আভিধানিক অর্থে বা ভাষার লক্ষণাগুণে প্রকট হয় না। হয় ভাষার ধ্বনন বা ব্যঞ্জনাশক্তির গুণে।[২৩]

ক্ল্যাসিকাল রসভাষ্য উল্লেখ করে অবশ্য আমি একথা মোটেও বলতে চাইছি না যে রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর সমসাময়িকরা সচেতন ও সক্রিয়ভাবে অভিনবগুপ্তের 'সর্বসামাজিব একঘনতা'-র ধারণা আর কল্পনার কাজকে জনপ্রিয় করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ হয়তো অভিনবগুপ্তের রসাস্বাদন ও ব্রহ্মাস্বাদনের কঠোর ফারাক মানতে চাইতেন না। তবে এটুকু নিশ্চয়ই বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথের বারবার রস, ভাব, কল্পনা ইত্যাদি শব্দগুলির ব্যবহারের মধ্যে একটা সর্বজনীনতার উপস্থাপনা দেখতে পাওয়া যায়। এই সর্বজনীনতার ধারণা রস বা কল্পনার মতো শব্দের অর্থগত ইতিহাসের একটা অংশ বলে দেখানো যেতে পারে; ঠিক যেমন এই সর্বজনীনতার ধারণাকে রাজনৈতিক ধাঁচে ফেলা আধুনিক ও ঔপনিবেশিক সময়েরই একটা সামাজিক গরজ বলে দেখানো যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাঠকদের বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে 'সাহিত্য' শব্দটি ধাতুগতভাবে 'সহিত' থেকে উৎপন্ন অর্থাৎ সাহিত্য তাই যা মিলনের ভাব প্রকট করে।[২৪] তিনি বলেছেন, 'জাতীয় ঐক্যসাধনের প্রধানতম উপায় সাহিত্য'।[২৫] আবার এও বলছেন, 'সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া, সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।'[২৬] এই বাক্যে 'সাহিত্য' শব্দটির জায়গায় 'স্বদেশ' শব্দটি হলেও যেন চলত। দেশ বা জমি সকলের, তাকে অসামান্য ও অনন্য করে তোলা স্বাদেশিকতার কাজ—তারপর যখন সেই দেশ স্বদেশ হয়ে ওঠে, তখন তাকে সর্বজনীন, একীভূত, সংগঠিত করে তোলা স্বদেশ-কল্পনার কাজ। এখানে যেন সাহিত্য আর স্বাদেশিকতা প্রায় একই ভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে—কারণ দুটিতেই কল্পনা কাজ করছে প্রধান শক্তি হিসেবে।

এদিক থেকে দেখতে গেলে, ইউরোপীয় romantic পরম্পরায় imagination-কে যেভাবে উদ্রেক করা হচ্ছে, ঔপনিবেশিক বাংলায় কল্পনার কাজ সামনে আসছে তার থেকে অনেকটাই আলাদা ভাবে। ইউরোপে কল্পনা কাজ করছে industrial ও rational সমাজে, সামাজিক alienation-এর কব্জা থেকে ব্যক্তির নিজস্ব ও আত্মিক মুক্তির সাধন হিসেবে, প্রকৃতির ও আদিমের দিকে ফিরে যাওয়ার পথ হিসেবে। বিশ শতকের গোড়ার বাংলায় কল্পনা কিন্তু শুধু ব্যক্তির আন্তরিক মুক্তি বা ব্যক্তিগত সমাজ-সমালোচনার

প্রক্রিয়া নয়। কল্পনার কাজ এখানে সামাজিক একীকরণের কাজ হিসেবেও চিহ্নিত হচ্ছে।

এ নিছক আপতিক ব্যাপার নয় যে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা অভিনবগুপ্তের মতোই বলছেন, এই জাতীয় একীকরণ সম্ভব যা রচনাতীত, অবাক বা অনির্বচনীয়, তার মাধ্যমে। অর্থাৎ সাহিত্যের অর্থবোধ দ্বারা ততটা নয়, যতটা ভাষার ব্যঞ্জনা, ধ্বনিবোধ দ্বারা। কারণ অর্থ প্রসঙ্গ নির্ভর, তাই দেশকাল নির্ধারিত। ধ্বনি থামলেও তার অনুরণন থামে না।[২৭] এক প্রসঙ্গে বলা কথার মানে সেই প্রসঙ্গেই সমাপ্ত হয়, কিন্তু সেই ভাষার ব্যঞ্জনা, ধ্বনি, অনুরণন অন্য সময়ে, অন্য ক্ষেত্রেও অনুভূত হয়। আর ভাষার এই ধ্বনিশক্তির মাধ্যমেই কল্পনা কাজ করে—এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের যোগাযোগ স্থাপনই শুধু নয়, এক সময়ের সঙ্গে অন্য সময়ের সাজুয্য প্রকট করায়, সময়ের খণ্ডিত ভাব বর্জন করায়। আর এখানেই ক্ল্যাসিকাল রসভাষ্য পাল্টে যাচ্ছে ঔপনিবেশিক বর্তমানের রাজনৈতিক তাগিদে, সাধারণীকরণ এক অন্য কালগত মাত্রা নিয়ে দাঁড়াচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কলমে। আর এই অন্য কালবোধ ইতিহাসকে পেরিয়ে, খণ্ডন করে কল্পনাকে উন্মুক্ত করে তুলছে। রবীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধায় লিখছেন : 'আসল কথা, ঐক্যধর্ম প্রাণধর্মের ন্যায়। সে জড়ধর্মের ন্যায় কেবল একাংশে বদ্ধ থাকেনা। সে যদি প্রদেশে ব্যাপ্ত হইতে পায়, তবে কালেও ব্যাপ্ত হইতে চায়। সে যদি নিকট এবং দূরের মধ্যে বিচ্ছেদ পূরণ করিতে পারে তবে অতীত এবং ভবিষ্যতের সঙ্গেও আপন বিচ্ছিন্নতা দূর করিতে চেষ্টা করে। ...এই অখণ্ডতার চেষ্টা এত প্রবল যে, অনেক সময়ে তাহা কল্পনার দ্বারা ইতিহাসের অভাব পূরণ করিয়া ইতিহাসকে ব্যর্থ করিয়া দেয়।'[২৮]

অর্থাৎ কল্পনার কাজ সময়ের খণ্ডিতভাব দূর করে কালগত সংহতি তৈরি করা—ঠিক ততটাই যতটা সামাজিক সাজাত্য তৈরি করা যায়। এই কালগত মাত্রা যেমন অভিনবগুপ্তের রসভাষ্যে পাওয়া যায় না, তেমনি ইউরোপীয় রোমান্টিক পরম্পরারও তা অংশ নয়। এদিক থেকে বলা চলে যে কল্পনার সঙ্গে সময়ের, ইতিহাসের বা স্মৃতির সম্পর্কের মীমাংসা করা ঔপনিবেশিক সমাজের বিশেষ রাজনৈতিক তাগিদ। এ কথা ঠিক যে, কল্পনার কাজ ইতিহাসের কয়েদ থেকে ঔপনিবেশিকের ভবিষ্যৎ ও মুক্তিচিন্তাকে রেহাই দেওয়া। অথচ একথাও ভোলার নয় যে বঙ্কিমচন্দ্র যে ইতিহাসবোধের কথা বলেছিলেন, তা ছিল প্রধানত এক স্বাধীন ও গরিমাদীপ্ত অতীতের স্মৃতির কথা। এই স্মৃতি নিছক ইতিহাস চেতনাই নয়, progress বা বিবর্তন বা উন্নতির সাধনই নয়, তা বাংলার পরাধীন ও লজ্জাজনক বর্তমানকে অপ্রাকৃত ও অস্থায়ী হিসেবে বোঝার ও মনে রাখার স্মৃতিও বটে। এ স্মৃতি শুধু অতীতবোধই নয়, বর্তমানকে খণ্ডন করার অস্ত্র ও ভবিষ্যৎ মুক্তির সম্ভাবনাও বটে। এই ঔপনিবেশিক সচেতনতার ক্ষেত্রে তাই কল্পনা শুধু নতুন, অভূতপূর্ব সম্ভাবনা স্থাপনের সাধন হলেই যথেষ্ট নয়, তাকে ভবিষ্যতের সঙ্গে স্মৃতির সম্বন্ধ-স্থাপনের শক্তি হয়েও উঠে দাঁড়াতে হচ্ছে। তাই যদিও অবনীন্দ্রনাথ কল্পনাকে 'অবিদ্যমানের নিশ্বাস' বলেছেন, অবর্তমান ও অশ্রুতপূর্বকে সৃষ্টি করার শক্তি বলে

সংজ্ঞায়িত করেছেন, তবুও তিনি কল্পনার সঙ্গে স্মৃতির একটা তালমেলের প্রয়োজনের কথা বারবার বলেছেন। বলেছেন, যে কল্পনাই মানুষকে নতুন সৃষ্টির দিকে উদগ্র করে দেয়, কিন্তু যে 'বিরাট কল্পনা সমস্তকে স্মরণের মধ্যে ধারণ করতে সমর্থ হল সেই বীর হল রূপ ও অরূপ দুই রাজ্যের রাজা, সে হল বীর, সে হল কবি, সে হল শিল্পী, সে হল ঋষি, আবিষ্কর্তা, গুণী, রচয়িতা।'[২৯]

রবীন্দ্রনাথও দু'ধরনের কল্পনার কথা বলেছেন। এক, যা নতুনকে আধুনিক ও অভূতপূর্ব বলেই ভালবাসে, নতুনত্বের আস্ফালন করে। আর দ্বিতীয়, যা সৃষ্টিশক্তির দ্বারা নতুনকে স্মৃতির সঙ্গে সম্বন্ধবদ্ধ বলে পেশ করতে সফল হয়।'[৩০] সময় চেতনা যদি শুধু কালের পূর্বাপরতার চেতনা হয়—অর্থাৎ যদি পূর্বপুরুষের লুপ্তি আর উত্তরের স্থাপনই আমাদের কাছে বিবর্তনবোধ বা ধারানুযায়ীতার চেতনা হয়—তবে কোনো ইতিহাস লেখনই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের বা ভবিষ্যতের সংহতিস্থাপন করতে পারে না। কল্পনা আর স্মৃতির পরস্পর articulation-এর অভাবে এমন হয়ে দাঁড়ায় যেন—

'...সেকালের ভারতবর্ষের সহিত এখনকার কালের কেবল নূতন পুরাতনের প্রভেদ। সেকালে যাহা উজ্জ্বল তাহা এখন মলিন হইয়াছে...অর্থাৎ আমাদিগকেই যদি কেহ সোনার জল দিয়া পালিশ করিয়া কিঞ্চিত ঝক্‌ঝকে করিয়া দেয় তাহা হইলেই সেই অতীত ভারতবর্ষ সশরীরে ফিরিয়া আসে।'[৩১]

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বাংলায় যেন তাই-ই হয়েছে—disciplined ইতিহাসের প্রচলনের ফলে কল্পনা আর সত্যের গৃহবিবাদ দেখা দিয়েছে। সাধারণ ইতিহাসবোধের এই ভ্রম দূর করতে, রবীন্দ্রনাথ বলছেন, আমাদের অন্যভাবে সময় চেতনাকে বুঝতে হবে। কল্পনা যে সময়বোধের দিকে ইঙ্গিত করে, তাকে আমরা সক্রিয়ভাবে বর্তমান বা অতীতের একক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করি।

'প্রকৃত সাহিত্যে আমরা আমাদের কল্পনাকে আমাদের সুখদুঃখকে শুদ্ধ বর্তমানকালে নহে, চিরন্তনকালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি। সুতরাং সেই সুবিশাল প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রের সহিত তাহার পরিণাম সামঞ্জস্য করিতে হয়। ক্ষণকালের মধ্যে হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে যখন চিরকালের জন্য গড়িয়া তোলা যায় তখন ক্ষণকালের মাপকাঠি লইয়া কাজ চলে না।'[৩২]

এক দিক দিয়ে দেখলে, এধরনের মত নিতান্তই অনৈতিহাসিক বলে বোধ হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ও রসবোধের ধারণার কথা মনে রাখলে, এর একটি অন্যদিক চোখে পড়ে। কল্পনার দ্বারা সক্রিয়ভাবে সৃষ্ট এই তথাকথিত 'চিরন্তনকাল' ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদের সমালোচনা হয়ে দাঁড়ায়—যে বিবর্তনবাদ বা progressivism ভারতবর্ষকে সদাই প্রাক্-আধুনিক সময়কালে বা pre-modern stage-এ কয়েদ করে রাখতে চায়, ইউরোপীয় আধুনিকতার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে সদাই পিছিয়ে থাকা দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে রাখে। ক্ষণকাল বা খণ্ডপ্রসঙ্গের মাপকাঠি এই চিরন্তনকালের বিচার করতে পারে

না। কেননা এই চিরন্তনকালে অতীতের কীর্তি আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দুয়েরই বাস, তাই বর্তমানের পরাধীনতা এই কালবোধকে কয়েদ করতে পারে না। এই কালবোধই বর্তমানের কারাগারে আজাদ ভবিষ্যৎ আর স্বাধীন স্মৃতি সৃষ্টি করতে পারে—কল্পনাকে কাজে লাগিয়ে। এই 'চিরন্তনকাল' অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের পারম্পর্য নয়, কল্পনার দ্বারা সম্বন্ধবদ্ধ স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতের যৌথক্রিয়া।

শুধু progress বা বিবর্তনবাদের সমালোচনাই নয়, আরও বড় কথা যে এই সময়বোধ ইতিহাসেরই এক নতুন আধার তৈরির দিকে ইঙ্গিত করে। একথা একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বলতে পেরেছিলেন যে '...ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদেরই ইতিহাস নহে, আমরাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য সমাহৃত।'[৩৩] অর্থাৎ, ইতিহাস কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের আত্মজীবনী নয়। তা কল্পনা দ্বারা সৃষ্ট এক কাহিনি, সে কাহিনির নায়ক হতে সম্প্রদায় সচেষ্ট। আমাদের সময়বোধ ও কর্মবোধ দ্বারা আমরা সেই ইতিহাসেব উপযুক্ত হতে চেষ্টা করছি, সেই ইতিহাসকে সত্য করে তোলার চেষ্টা করছি। জাতি বা দেশ বা সম্প্রদায় কোনো ধ্রুব নয়, যা কালের ব্যাপ্তি, পরিবর্তনশীলতা, গতি ইত্যাদিকে স্থিরতা বা প্রত্যয় দেয়। কালকে কল্পনা দ্বারা অনুধাবন করে, নিজেকে কালে ব্যাপ্ত আর কাহিনিতে ব্যক্ত করাই ইতিহাস, জাতিবোধ, ও আত্মবোধ।

কল্পনা দ্বারা অভিব্যক্ত এই কালবোধের তুলনায় আমরা ঐতিহাসিক কালবোধকে অনেক সহজে বুঝতে পারি। কারণ, আমাদের কাছে বর্তমান অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত হিসেবে প্রকট হয়, আর ভবিষ্যৎ অজানা, অনিশ্চিত হিসাবে। অথচ অতীত যেন 'সংক্ষিপ্তি', যাতে মুহূর্তরাশি সংহত হয়ে অমর হয়ে ওঠে।[৩৪] কিন্তু যাঁরা একথা বলেন, সেই ইতিহাসমনস্করা মানতে চাননা যে আমাদের স্মৃতি যতটুকু, বিস্মৃতি তা থেকে অনেক বিশাল। মানতে চাননা যে 'স্মৃতি বিস্মৃতি একই জাতি। একই স্থানে বাস করে।'[৩৫] অতীত যতটা স্মৃতি দ্বারা নির্ধারিত বিস্মৃতি দ্বারা ততটাই। তাই ভবিষ্যতের মতো, অতীতও কল্পনার ক্ষেত্র। যে ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে সব মনে পড়ে গেলে, সব লেখা হয়ে গেলে, ইতিহাসের কাজ শেষ—তাঁরা শুধু কল্পনাকে কয়েদই করেন না, তাঁরা ইতিহাসের নামে ভ্রম তৈরি করেন। এক মেকি পূর্ণচ্ছেদের দ্বারা মানুষের অভিব্যক্তি, পরিবর্তন ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করেন।

"আসল কথা শেষ মানুষের হাতে নেই। 'শেষ হল' বলে যে আমরা দুঃখ করি তার অর্থ এই—শেষ হয়নি, তবু শেষ হল; আকাঙ্ক্ষা রয়েছে অথচ চেষ্টার অবসান হল।...কারণ মানুষের সমাপ্তির অর্থ অসম্পূর্ণতা।"[৩৬]

এ কথা বোঝা গেল যে বিশ শতকের গোড়ার বাংলায় কল্পনার ধারণাকে উদ্রেক করা হচ্ছিল সামাজিক ও কালগত সংহতি স্থাপনের কাজে। সেখানে ইতিহাস-লেখন ও জ্ঞান-চেতনা অসফল হয়ে পড়ছিল, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কিছু সমসাময়িক চিন্তাবিদদের লেখনীতে কল্পনা ও রসবোধ সক্রিয়ভাবে এক সর্বজনীন ভবিষ্যৎ চেতনার

দিকে ইঙ্গিত করছিল। এখানে কল্পনা কোনো নন্দনতাত্ত্বিক বা ব্যক্তিগত শিল্পচেতনার রূপ হিসেবে নয়, দেশনির্মাণ আর স্বাধীন ভবিষ্যৎ চিন্তার এক রাজনৈতিক সচেতনতার রূপ নিয়ে সামনে আসছিল।

স্বভাবতই, এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, এই বিকল্প সময়বোধ আর অন্য কল্পনার ধারণা রাজনৈতিক agenda-র চেহারা নিতে ব্যর্থ হল কেন? রবীন্দ্রনাথ সত্ত্বেও কেন কল্পনা আজও art-এর পরিধির মধ্যে কয়েদ? কেন এই non-positivist ইতিহাসবোধ নেহেরুর progress আর আধুনিকীকরণের মতবাদের সামনে শুরুতেই হেরে গেল, যদিও আধুনিকীকরণের ideology কখনই ভবিষ্যৎ-কে কোনো নতুন বা বিকল্প চেহারা দিতে পারেনি, ভবিষ্যৎ-কে সর্বদাই নিছক বর্তমানের উন্নত ও বিবর্তিত রূপ হিসেবেই কল্পনা করে সন্তুষ্ট থেকেছে?

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে যাকে আমরা রাজনীতি বলে জানি, সেই ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে ঢুকতে হয়। সে এক বিশাল ক্ষেত্র, কঠিন বিষয়। এখানে শুধু একটা ইঙ্গিতই করা যায়। কেন কল্পনার ধারণার উপর স্থিত ভবিষ্যৎ চিন্তার সফল রাজনীতিকরণ হল না, অথচ উন্নতি (progress) আর আধুনিকীকরণের (modernisation/developmen) ধারণার ওপর আধারিত সময়চিন্তা এত সহজে রাজনৈতিক চেহারা নিল—এর কারণ, আধুনিক রাজনীতি এক বিশেষ ধরনের কর্তা বা নেতা বা subject-এর ধারণার ওপর নির্ভর। এই কর্তা বা subject agent Machiavellian prince-ই হোক, হোক, বা Hegel -এর state, Marx-এর proletariat-ই হোক বা ঐতিহাসিকের nation—এই কর্তা বিশেষভাবে কিছু গুণেব বা জ্ঞানের অধিকারী, যাতে অন্যের অধিকার বা বিচক্ষণতা নেই। এই একক অধিকারই নেতা বা নেতৃত্বকে সংজ্ঞাবদ্ধ করে, সে অধিকার reason-এর বলেই হোক বা nationality-এর অধিকারেই হোক। আর এই নায়কত্বের ধারণাই আধুনিক সমাজে রাজনীতিকে এক বিশেষ ক্রিয়া বা practice হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে।

উন্নতি বা আধুনিকীরণের ধারণা যে বিজ্ঞান ও ইতিহাসবোধের ওপর আশ্রিত, তা প্রধানত একধরনের জ্ঞানবোধ—তা তথ্য, অভিজ্ঞতা, নিয়ম আর কানুনের ভাণ্ডার। বাংলায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের রমরমা, সমাজসংস্কার-আর রাজনীতিতে শিক্ষার ধারণার প্রাধান্য—এ সবের গোড়ায় ছিল কর্তৃত্বের এই ধারণাই। সে জ্ঞান এমন এক অধিকার, এমন এক পুঁজি যা সকলের হাতে নেই, যা মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষই সঠিকভাবে বুঝতে পারে। অর্থাৎ জ্ঞানের ধাবণার ওপর আশ্রিত সময় ও ভবিষ্যৎ চিন্তা এক রাজনৈতিক চোহারা নিতে পারল, কারণ জ্ঞান সহজেই এক একক নেতার বা অধিকারী বা কর্তার ধারণা উৎপন্ন করতে পারে।

'কল্পনা' কিন্তু এই কর্তা বা subject-agent-এর ধারণার ওপরই প্রশ্ন তুলল। কল্পনার ওপর সকলের অধিকার। এমনকি এও মনে করা হয় যে যারা যুক্তিবাদী, তাদের থেকে 'অশিক্ষিত', 'অসভ্যের' কল্পনা-প্রবণতা বেশি। তাই কল্পনার ধারণার

ওপর আশ্রিত ভবিষ্যৎ-চেতন-স্বভাবতই উচ্চ ও মধ্যবিত্তের সামনে এক বিপজ্জনক বিকল্প হয়ে দাঁড়াল। কারণ বিশেষ ধরনের কল্পনার ওপর কার অধিকার তার মীমাংসা কোনো আগাম theory দ্বারা করা সম্ভব ছিল না, একমাত্র রাজনৈতিক ক্রিয়াই তার অস্থায়ী ও অনিশ্চিত জবাব দিতে পারত। এমনকি রবীন্দ্রনাথও এই ভয়ই পেয়েছিলেন। তিনি 'অনার্য্য' সাঁওতালদের কল্পনা ও সৌন্দর্যবোধ নিয়ে নানা কথা বললেও, এও বলেছিলেন যে 'অনার্য্যরা' 'সববিষয়েই নিকৃষ্ট।....তাহারা যেমন আর্য রক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছে, তেমনি আর্যধর্ম আর্যসমাজকেও বিকৃত করিয়া দিয়াছে।'[৩৭] তাই রবীন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত, শ্রেণিসচেতনভাবে, কল্পনাকে এক সংকীর্ণ, নান্দনিক খাঁচায় বন্দি করতে বাধ্য হয়েছেন, কল্পনার ও নিজের রাজনীতিকরণের দিকে ইঙ্গিত করলেও, এই প্রক্রিয়াকে আপন করে নিতে পারেননি। তিনি তাই জ্ঞান-চর্চা ও শিক্ষা প্রসারেই নিজেকে তন্নিষ্ঠ রেখে, 'গুরুদেব' হয়ে থেকেছেন। তবে একথাও মানতে হয় যে, এই একই রবীন্দ্রনাথের লেখাতেই কল্পনার কাজের নানা সম্ভাবনার কথা নিহিত রয়েছে। যদি আজকের বাংলায় রবীন্দ্রনাথ এখনও সবথেকে জনপ্রিয় লেখক হয়ে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই বলা চলে যে কল্পনার সম্ভাবনা আজও বেঁচে আছে।

উল্লেখপঞ্জি

১ গৌতম ভদ্র, 'জাল রাজার গল্প', দেশ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ (ধারাবাহিক রচনা); Partha Chatterjee, *The Nation and its Fragments, Princeton, 1993; Sudipta Kaviraj, The Unhappy Consciousness : Bankimchandra Chattopadhyay and the formation of Nationalist Disourse in India*. Delhi, 1995; Indira Chowdhury, 'Colonialism and Cultural Identity, the Making of a Hindu Discourse. Bengal 1867-1905'. PHD thesis, SOAS, London University. 1993.

২ Dipesh Chakravarty, 'Nation and Imagination'. *Studies in History*. 15. 2 (July-Dec. 1999). 177-208.

৩ নগেন্দ্রনাথ বসু, *বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, দিল্লি ১৯৮৮, ৩১৭

৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কৃষ্ণচরিত্র', *রবীন্দ্ররচনাবলী* (রর) ত্রয়োদশ খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬২, ৯২৬-৯৩১

৫ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ধর্ম্মতত্ত্ব', *বঙ্কিম রচনাবলী* ২য় খণ্ড, (সং) যোগেশচন্দ্র বাগল কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৪, ৬৭০

৬ রবীন্দ্রনাথ, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', ১৩০৯ রর ত্রয়োদশ খণ্ড, ৮২১

৭ বঙ্কিমচন্দ্র, 'বিবিধি প্রবন্ধ : বিদ্যাপতি ও জয়দেব', *বঙ্কিম রচনাবলী* ২য় খণ্ড, ১২০-৯১

৮ রবীন্দ্রনাথ, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', ১৩০৯ পূর্বোল্লেখিত, ৮১৮

৯ অক্ষয়কুমার মৈত্র, 'বক্তৃতা', *সাহিত্য*, ২৫(১), ১৯১৪, ৪২-৫৪

১০ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, *ইতিহাস ও অভিব্যক্তি*, যাদবপুর জাতীয় শিক্ষাপরিষদ গ্রন্থাবলী, ১৯২৯, ৩৯,২৯৯

১১ প্রমথ চৌধুরী, 'সাহিত্যসম্মেলনের সমালোচনা', জ্যৈষ্ঠ ১৯৯৪, *প্রবন্ধসংগ্রহ*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৫২, ৫৫

১২ অক্ষয়কুমার মৈত্র, 'ভারতশিল্প তত্ত্ব (১)' ১৩২৯, *ভারতশিল্প কথা*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮২, ৩৩-৩৪

১৩ অক্ষয়কুমার মৈত্র 'ভারতশিল্পচর্চার নববিধান', ১৩১৯, ভারতশিল্প কথা, ১৫

১৪ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিল্প অনধিকার', বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, রূপা সংস্করণ, কলকাতা ১৯৬২-১১

১৫ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অন্তর বাহির' *বাগেশ্বরী* ১০২

১৬ রবীন্দ্রনাথ, 'ঐতিহাসিক চিত্র', পূর্বোল্লেখিত, ৪৮০-৮১

১৭ রবীন্দ্রনাথ 'লোকসাহিত্য : ছেলে ভুলানো ছড়া' 'পূর্বোল্লেখিত, ৬৬৯

১৮ রাজনারায়ণ বসু, 'আশ্চর্য স্বপ্ন', *বিবিধ প্রবন্ধ*, ওরয়েন্টাল পাবলিশিং এস্টাব্লিশমেন্ট, কলকাতা, ১৮৮২, ৯৪-৯৭।

১৯ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস', বুধোদয় প্রেস, হুগলি, ১৮৯৫, ৫৯-৬১

২০ অবন্তীকুমার সান্যাল, 'অভিনবগুপ্তের রসভাষ্য', বিদ্যাভবন, বর্ধমান ও কলকাতা, ১৯৬৩, ণ

২১ অভিনব ভারতী, উদ্ধৃতি, অবন্তীকুমার সান্যাল, পূর্বোল্লেখিত, ৯৩

২২ অবন্তীকুমার সান্যাল পূর্বোল্লেখিত, ৮৯

২৩ ঐ, ৮০-৮১

২৪ রবীন্দ্রনাথ, 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য', ১৩০১ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সভার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত) রর ত্রয়োদশ খণ্ড ৭৯৫

২৫ রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের গৌরব', ১৩০১, রর ত্রয়োদশ খণ্ড, ৮৬৭

২৬ রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের সামগ্রী', ১৩০১, রর ত্রয়োদশ খণ্ড, ৭৪৩

২৭ রবীন্দ্রনাথ, 'কাব্যে গদ্যরীতি', ১৩৩৯, রর চতুর্দশ খণ্ড, ৫২০; 'গদ্যকাব্য', ২৯ আগস্ট ১৯৩৯, রর চর্তুদশ খণ্ড, ৫২৮

২৮ রবীন্দ্রনাথ, 'ঐতিহাসিক চিত্র', পূর্বল্লেখিত, ৪৭৯

২৯ অবন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অন্তর বাহির', *বাগেশ্বরী*, ১০৫

৩০ রবীন্দ্রনাথ, 'কবির অভিভাষণ', ফাল্গুন ১৩০১, রর চর্তুদশ খণ্ড, ৩৯৫

৩১ রবীন্দ্রনাথ, 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য', ১৩০১, রর ত্রয়োদশ খণ্ড, ৭৯৮

৩২ রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের বিচারক', ১৩১০, রর ত্রয়োদশ খণ্ড, ৭৪৬

৩৩ রবীন্দ্রনাথ, 'পূর্ব ও পশ্চিম', ১৩১৫, রর ত্রয়োদশ খণ্ড, ৫৩

৩৪ রবীন্দ্রনাথ, 'বিচিত্র প্রবন্ধ', ১২১২, রর চতুর্দশ খণ্ড, ৭১৯-২০

৩৫ রবীন্দ্রনাথ, 'আলোচনা : বিস্মৃতি', রর চতুর্দশ খণ্ড, ৫৯৮

৩৬ রবীন্দ্রনাথ, 'বিচিত্র প্রবন্ধ', রর চতুর্দশ খণ্ড, ৭২০

৩৭ রবীন্দ্রনাথ, 'হিন্দুর ঐক্য', ১৩০৫, রর ত্রয়োদশ খণ্ড, ৩০

ঐতিহাসিক, বর্ষ ৯. ১/২

আদর্শ পরিবারে আদর্শ রন্ধনপ্রণালী

প্রদীপ বসু

এই প্রবন্ধ রন্ধনশিল্পের সাহিত্য নিয়ে, এই প্রবন্ধ আবার পরিবার নিয়েও। বাংলায় পারিবারিক রন্ধনপ্রণালী বিষয়ক বইগুলির যখন আবির্ভাব হয় তখন পরিবার সম্পর্কে এক নির্দিষ্ট ধারণা গড়ে উঠছে, যে-ধারণা পরিবার সম্পর্কে এক ভিন্ন চেতনার উন্মেষের সূচনা দেয়। এই ধারণায় পরিবার হল এক অন্তরঙ্গ, স্বাধীন, সুখ ও শান্তির পরিসর এবং পরিবারের এই বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশই মানুষের সমৃদ্ধতর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের এক অন্যতম পরিচালিকা শক্তি। কিন্তু পরিবারকে এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হলে এবং এর মূল স্বভাবকে বজায় রাখতে হলে, আয়ত্ত করতে হবে অনেক কিছুই। এর জন্য জানতে হবে স্বাস্থ্যবিধি, চিকিৎসা ও পুষ্টিবিজ্ঞান, শিশুপালন, শিশু মনস্তত্ত্ব; থাকতে হবে শিক্ষা, রুচি, কর্তব্যবোধ, ধর্মচেতনা; শিখতে হবে পরিবার পরিচালনার বিভিন্ন কলাকৌশল। একটি ভালো পরিবার বলতে যখন আমরা বুঝি এমন এক পরিবার যেখানে সকলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রুচি, মানসিক উৎকর্ষ সম্পর্কে যত্নবান, যেখানে সকলে অন্তরঙ্গ, কর্তব্যপরায়ণ, যেখানে পরস্পরের মধ্যে কোনো মালিন্য নেই, তখন এও মনে রাখতে হবে স্বাস্থ্য, রুচি, অন্তরঙ্গতা প্রভৃতি বিষয়গুলি কীভাবে পরিবারের ধারণাকে গঠিত করেছে এবং ক্রমপ্রসারিত করেছে। লক্ষণীয় যে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যেসব পালনীয় বিধি পরিবারের এই ধারণার অন্তর্ভুক্ত, সেই জ্ঞান কিন্তু বিকশিত হয়েছে স্বাস্থ্য ও জীববিজ্ঞানের নিজস্ব নিয়মনীতি মেনেই। পরিবারের যে ডিসকোর্স, তার অন্তর্ভুক্ত অনেক বিষয় সম্পর্কেই এই এককথা বলা যায়। কিন্তু রন্ধনবিদ্যা বিষয়ক রচনাগুলি সম্পর্কে ওই এককথা বলা যাবে না। পরিবারের ধারণার পৃষ্ঠভূমিতেই রন্ধনশিল্পের সাহিত্য নির্মিত হয়েছে, পরিবারকে আধার করেই রান্নার বইগুলি রচিত হয়েছে। এই রচনাগুলি আবার বহুসময়েই পরিবারের ধ্যানধারণা, নিয়মকানুনকে শক্তিশালীও করেছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর *পারিবারিক প্রবন্ধ* গ্রন্থে লিখেছেন : 'আমার দৃঢ় সংস্কার এই যে, যে বাটীর রান্না ভাল নয়, সে বাটীও ভাল নয়। ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে সে পরিবারের সদস্যরা 'কিছু অলস-প্রকৃতিক, কিছু অযত্নপর, কিছু সুখ্যাতিবিমুখ এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুখদুঃখ-বোধে কিছু অনুভূতিশূন্য হইয়া থাকে।'[১] বস্তুত এই চরিত্রের মানুষ কীভাবেই বা পারিবারিক দায়দায়িত্ব পালন করবে, আর কেমন করেই-বা পারিবারিক সুখের সন্ধান পাবে? আসলে রন্ধনশিক্ষার বই-এর প্রয়োজনীয়তা তখনই অনুভূত হয়

যখন পারিবারিক ডিসকোর্সের পরিসরে ভোজন, ভোজন-বৈচিত্র্য, সুস্বাদু ও রুচিকর আহার পারিবারিক শ্রী, সুখ ও মঙ্গলের এক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত রন্ধনশিক্ষার গ্রন্থগুলি তাই পরিবারের ধ্যানধারণার মূল কাঠামোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। তাই রন্ধনশিক্ষার গ্রন্থগুলি যেমন ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুতপ্রণালী সম্পর্কে নির্দেশ দেয়, ঠিক তেমনি সুখী, আনন্দময়, সংস্কৃতিবান পরিবারের প্রস্তুতপ্রণালী সম্পর্কে ব্যবস্থাপত্রও সরবরাহ করে।

পরিবার সম্বন্ধে এই পত্রিকায় পূর্বপ্রকাশিত একটি প্রবন্ধে[২] আমি লিখেছিলাম পরিবারের ডিসকোর্সে মানুষের অন্তরঙ্গ জীবন ও বহির্জীবন দুই আলাদা জগৎ হিসেবে পরিগণিত হয়। এ এক কাল্পনিক স্বাধীন পরিসর যেখানে বহির্জগতের স্বার্থের হানাহানি নেই, সংঘাত নেই, অধর্ম নেই। বস্তুত পরিবারই দৈনন্দিন রুজিরোজগারের টানাপোড়েনে ক্ষয়প্রাপ্ত জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করবে। *গৃহধর্ম* পুস্তিকায় শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন : "সত্য কথাও এই যে, পারিবারিক রন্ধনে বদ্ধ হইলে যে লাভ হয়, তাহাতে সকল ক্ষতিপূরণ হইয়া থাকে। হে মানব, আর কিছু না হউক শ্রমান্তে পত্নীর প্রীতিপূর্ণ মুখদর্শনের এবং শিশুদিগের অপরিস্ফুট ভাষা শ্রবণের সুখ স্মরণ কর।"[৩] রন্ধনবিদ্যার বইগুলিতেও আমরা এই একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

বাংলায় পারিবারিক রন্ধনপ্রণালী শিক্ষার প্রথম উল্লেখযোগ্য বই হল বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের *পাক-প্রণালী*।[৪] কিন্তু বিপ্রদাসের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বইয়ের কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য সঠিক বোঝবার জন্য আরও দুটি বইয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাহলেই বিপ্রদাসের মৌলিকতার স্বরূপ অনেকটা স্পষ্ট হবে। বাংলা ভাষায় লেখা রন্ধনপ্রণালীর প্রথম বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩১ সালে, এটি হল বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কারের *পাকরাজেশ্বর*[৫]। পরে এটি গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সম্পাদনায় পুনর্মুদ্রিত হয় ১৮৪৩ সালে এবং এরপর বর্ধমান রাজসভা থেকে আবার মুদ্রিত হয় ১৮৫৪ সালে। নামেই বোঝা যায় এ বই ঠিক সাধারণ মানুষের জন্য লেখা হয়নি, এ ছিল রাজা-রাজড়াদের জন্য লেখা রান্নার বই। সামান্য বেগুনের ঘণ্ট রান্নার উপকরণের বহর দেখলে অনেকের পিলে চমকে যাবে। উপকরণ হল : বেগুন একসের, ঘি একপোয়া, দই আধসের, আঙুর আধসের, দারচিনি, আদা ইত্যাদি। রান্না পরিবেশনকারিণীর আদর্শ দেওয়া ছিল সংস্কৃত কবিতার পদ্যানুবাদে। যেমন :

স্নান করি সুন্দরী শোভন বস্ত্র পরি।
সুচারু নূতন ধূপগন্ধে অঙ্গভরি॥
কর্পূর সৌরভে মুখে অনঙ্গ বিভোল্।
বলে ছলে মৃগমদে নয়ন হিল্লোল॥

এ অবশ্যই বাঙালি পরিবারের কোনো পরিবেশিকার বর্ণনা নয়। পরবর্তী সময়ে রান্নার বইয়ে 'অনঙ্গ বিভোল্', 'নয়ন হিল্লোল' প্রভৃতির আর কোনো স্থান হয়নি। রন্ধনকার্য, পরিবেশনা এবং এ সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক কাজ পুনর্গঠিত হয় পারিবারিক

মূল্যবোধের আধারে। এই কারণেই বিপ্রদাস প্রথম দিকে তাঁর বইয়ের পরিশিষ্টে এই পদ্যানুবাদ দিলেও পরবর্তী সংস্করণে অনাবশ্যক মনে করে বাদ দিয়েছিলেন।

পাকরাজেশ্বর ধারার অন্য বইটি হল *ব্যঞ্জন রত্নাকর*[৬] যা বর্ধমান রাজসভার আনুকূল্যে ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। সম্রাট শাজাহানের রন্ধনাধ্যক্ষ নিয়ামত খান আলি শাজাহান যেসব খানা পছন্দ করতেন তার প্রস্তুতপ্রণালী লিপিবদ্ধ করেন। বইটি সেই লেখার বঙ্গানুবাদ। এতে আঠারো রকমের কাবাব, উনিশ রকমের কালিয়ার প্রণালী ছাড়াও আছে হরীসা পাক, ষষ্ঠরঙ্গ মাংস পাক, প্রভৃতি রান্না। বিপ্রদাসই প্রথম বাঙালি পরিবারকে কেন্দ্রে রেখে রান্নার বই লেখেন। বিপ্রদাস নিজে বাঙালি পরিবারের রাঁধাবাড়ার সমস্যাগুলি ভালোভাবে অনুধাবন করেছিলেন, এবং ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় তার পরিমার্জন ও পরিবর্তন সম্ভব এ বিষয়ে তাঁর একটা সুনির্দিষ্ট ধারণাও ছিল।

যদিও বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৪২-১৯১৪) খ্যাতি অর্জন করেন তাঁর *পাক-প্রণালী* বইয়ের জন্য কিন্তু তিনি শুধুমাত্র একজন রন্ধনবিশারদ ছিলেন না। পরিবারের নতুন ডিসকোর্স যেসব বিষয় আদর্শ পরিবার গঠনের আওতার মধ্যে এনে ফেলেছিল সেসব বিষয়ে তাঁর রীতিমতো জ্ঞান ও পড়াশুনা ছিল। বেশ কিছু বিষয়ে তিনি নিজেই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিপ্রদাস 'বঙ্গবাসী' ও অন্যান্য পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন, আবার নিজের পরিবার প্রতিপালনের জন্য বিত্তশালী পরিবারের মেয়েদের রান্না শিখিয়ে ও ভোজে রান্নার নির্দেশ দিয়ে অর্থ উপার্জনও করতেন। যুবক-যুবতীদের জন্য ব্যবহারিক গ্রন্থ হিসেবে লিখেছিলেন *যুবক-যুবতী* (১৮৯১),[৭] যাতে আলোচনার বিষয় ছিল বিবাহিত জীবন, গর্ভধারণ, শিশুপালন, ইত্যাদি। *যুবতী-জীবন* (১৯২৪)[৮] নামে অন্য গ্রন্থে ছিল নারীদের জন্য যৌনবিজ্ঞান, এবং ধাত্রীবিদ্যা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী। *যুবতী বা স্ত্রী জীবনের আদর্শ* (১৮৮৯)[৯] বইটি লিখেছিলেন নারীদের স্বাস্থ্যবিধি, গর্ভাবস্থা, ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুপালন বিষয়ে। হিন্দুদের বিভিন্ন জাতির বিবাহপদ্ধতি নিয়ে লিখেছিলেন *শুভ-বিবাহ-তত্ত্ব* (১৯০৮)।[১০] বাড়িতে শাকসবজির বাগান করে যাতে পারিবারিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায় সেইজন্য লিখেছিলেন *সব্জী-শিক্ষা* (১৯০৬)।[১১] এ ছাড়াও বিপ্রদাসের নানা বিষয়ে আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলি থেকে, যেমন *অপঘাত-মৃত্যু নিবারণ* (১৮৯৩),[১২] *দেদার মজা* (১৯০৫),[১৩] *প্যারিস-গুপ্ত-কাহিনী* (১৮৯৯),[১৪] *মেয়েলি ব্রতের ছড়া* (১৯০৬),[১৫] ইত্যাদি। নিজে রান্না শেখানোর কাজে যুক্ত ছিলেন বলে বাঙালি অন্দরমহলের হাঁড়ি-হেঁশেল সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। বাঙালি রান্নাঘরের অবস্থা, রন্ধনপ্রণালী, ভোজব্যবস্থা, প্রভৃতিকে যুগ ও রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য যে রদবদলের প্রয়োজন এটাও উপলব্ধি করেছিলেন। এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে রান্নাবান্নার কাজে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা যেমন প্রয়োজন সেরকমই প্রয়োজন দৈনন্দিন রন্ধন, আহার সম্পর্কে নতুন অভ্যাসের। বস্তুত তাঁর *পাক-প্রণালী* গ্রন্থে এই পুনর্বিন্যাসের এক সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যায়। এই

কারণেই রান্নাবান্না সংক্রান্ত কোনো খুঁটিনাটিই তিনি বাদ দেননি। বই আরম্ভ করেছেন রন্ধনশালা কীরকম হওয়া উচিত তার বিবরণ দিয়ে, আলোচনা করেছেন ভাঁড়ার ঘর কীরকম হবে তা নিয়ে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘরের প্রয়োজনীয়তা, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আছে উনান ও জ্বাল, পাক-পাত্র, জল, বিভিন্ন উদ্ভিদজাত খাদ্যের প্রকৃতি, রন্ধন মশলা, শাকসবজি, মাছমাংস সঠিক চেনার উপায়, রোগবিশেষে পথ্যাপথ্য, খাদ্যদ্রব্যসমূহের গুণাবলী এবং ভোজে খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন। বিপ্রদাস-প্রবর্তিত এই ছক আজও অপরিবর্তিত আছে। পরবর্তী সময় সব রান্নার বইয়ের লেখক-লেখিকাই এই ছক অনুসরণ করেছেন।

পরিবারের অন্য লেখকদের মতো বিপ্রদাসও রন্ধনবিদ্যা জ্ঞানের সঙ্গে পারিবারিক সুখের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উল্লেখ করে লিখেছেন : "মনে কর, যে ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র ও কন্যাগণের জন্য সর্ব্বদা গুরুতর পরিশ্রম করিতেছেন, তিনি যদি গৃহে আসিয়া সেই পরিবারবর্গের প্রফুল্ল মুখ নিরীক্ষণ করেন এবং স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি স্নেহের ও আদরের প্রতিমাগুলি যদি স্বহস্তে প্রস্তুত উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যসমূহ লইয়া, তাঁহার সেবার জন্য প্রস্তুত থাকেন— আহ! তদ্দর্শনে কোন্ শ্রান্ত জনের শ্রান্তি দূর না হয়;— কোন্ ব্যক্তির মুখে হাসি দেখা না যায় এবং কোন্ মূঢ়ের অন্তঃকরণে করুণ ও পবিত্রভাব উদ্দীপিত না হয়। সেই ভাগ্যবান ব্যক্তির ভবন সুখের আধার, তিনি যতই চিন্তাপীড়িত হউন না কেন, তাঁহার ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা ও উন্নতি লাভের জন্য তিনি যতই উৎকণ্ঠিত হউন না কেন— গৃহে আসিয়া পরিবারবর্গের যত্নাতিশয্য ও হাস্যমুখ দর্শন করিয়া সমস্ত কষ্ট বিস্মৃত হইবে, তাঁহার সমস্ত উৎকণ্ঠা দূরীভূত হইবে ও তদীয় আননে পবিত্র হাস্য-ছটা বিকশিত হইবে।"[১৬] খেয়াল রাখতে হবে 'স্বহস্তে' ও 'উপাদেয়' শব্দ দুটির উপর। নিজের হাতে পরিবারের জন্য খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করার মধ্যে যত্ন, আন্তরিকতার স্পর্শ থাকলে তা পারিবারিক সম্পর্ককে শুধুমাত্র দৃঢ়ীভূতই করবে না, পরিবারে এক নির্মল আনন্দের পরিবেশও তৈরি করবে। যা পরিবেশিত হচ্ছে তা অবশ্যই উপাদেয় হওয়া প্রয়োজন। যদি উপাদেয় না হয় তাহলে পারিবারিক শান্তি তো বিঘ্নিত হবেই, একই সঙ্গে এটাও প্রমাণ হবে যে রন্ধনকারীর ধৈর্য, শিক্ষা, অধ্যবসায় নেই; ভূদেবের ভাষায় তিনি অলস প্রকৃতির, অযত্নপর এবং অন্যের সুখদুঃখ-বোধে কিছুটা অনুভূতিশূন্য। বস্তুত পাক-প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা এক সুখী, আনন্দময়, নীরোগ ও সংস্কৃতিবান পরিবার-প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষাও বটে।

রন্ধনশিক্ষা যে পরিবার পরিচালনা শিক্ষা এবং পাককাজের সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য কাজের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সে কথা বিপ্রদাস প্রথমেই বলে দিয়েছেন; একথাও বলেছেন যে, ভালো রন্ধনকারী হতে হলে অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বলেছেন সমাজে নানারকম পরিবর্তন হচ্ছে, মানুষের রুচিরও পরিবর্তন হচ্ছে, সুতরাং এই বৈচিত্র্য রন্ধনকর্মেও আনতে হবে। অথচ এদেশে "পাকবিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রকার

পুস্তকাদি পাঠ করা হয় না," পারিবারিক দৈনন্দিন রন্ধন দেখেই রান্নাবান্না শেখা হয়, ফলে এ বিষয়ে যতটা ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন তা আয়ত্তে আসে না। লিখেছেন, "অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় রন্ধনবিদ্যাও শিক্ষা সাপেক্ষ", অথচ "পারিবারিক নিত্যরন্ধন দেখিয়া রমণীগণ রন্ধন কার্য্য শিখিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগের রন্ধন কার্য্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে না; যাহা দেখেন, তাহাই শিখিয়া থাকেন।"[১৭] দেখেশুনে শেখা এবং পড়ে শেখা এই পার্থক্য কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার পরিচালনায় এতসব নতুন জিনিস আয়ত্ত করা প্রয়োজন যে তা আর চেনা পরিচিতের গণ্ডির মধ্যে থেকে শেখা সম্ভব নয়। এই সবই হল বিশেষজ্ঞের এলাকা, তাই শিখতেও হবে বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে। পরিবারের আলোচনায় সকলেই মোটামুটি বলেছেন, পরিবার পরিচালনা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়, এর জন্য অনেক কিছু জানতে হবে, শিখতে হবে, পড়তে হবে। জানতে হবে, শিশুপালন, শিশু মনস্তত্ত্ব, স্বাস্থ্যবিধি, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, রন্ধনবিদ্যা, গৃহসজ্জা সবকিছুই এবং এই সূত্র ধরেই পরিবারের মধ্যে বিশেষজ্ঞের অনুপ্রবেশ।

যদিও বই পড়ে রন্ধনবিদ্যা শিক্ষা করা যায় কি না এই প্রশ্ন বিপ্রদাসের আমল থেকে আজ পর্যন্ত উঠে আসছে, কিন্তু *পাক-প্রণালী* প্রকাশ হবার কিছুদিন পরেই অন্তঃপুরিকা পরীক্ষার জন্য পাঠ্য বই হিসেবে গৃহীত হয়। এই বই থেকে নানা প্রশ্নও পরীক্ষায় আসত। যেমন : "মুগের ডাইল ও রুই মাছের ঝোল রাঁধিতে হইলে কি কি মসলার আবশ্যক?" বা "বেতন দিয়া পাচক পাচিকা নিযুক্ত করার যে প্রথা প্রবল হইতেছে তাহার দোষগুণ বিচার করিয়া একটি প্রবন্ধ লেখ।" "কোর্ম্মা ও কালিয়ার প্রভেদ কি?"[১৮] পরীক্ষার জন্য ছাড়াও বই পড়ে যে সে-সময়ের গৃহবধূরা শৌখিন রান্না করতেন এ কথা রেণুকা দেবী তাঁর *রকমারি নিরামিষ রান্না*[১৯] বইতেও বলেছেন। পাঠ্যবই হিসেবে রান্নার বইয়ের ব্যবহার এটাই প্রমাণ করে যে রান্নাও যে শিক্ষার ব্যাপার এবং মেয়েদের জন্য বিশেষ করে এই শিক্ষা যে অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার মতোই গুরুত্বপূর্ণ, এই ধারণা স্বীকৃত হয়েছে।

রন্ধনবিদ্যা-বিশেষজ্ঞ বিপ্রদাসের বইতে আমরা পরিবারের সেই কাঠামো ও উপাদানগুলিই পাই, পরিবারের অন্য আলোচনায় যা স্বীকৃত। এই পরিবার হবে পরিপাটি, সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত। পরিবারে থাকবে নির্দিষ্ট শ্রমবিভাজন, রন্ধনকার্য পরিচালিত হবে পরিবারের স্ত্রীলোকেদের দ্বারা। সময় ও খাদ্যসামগ্রীর অপচয় থাকবে না, কারণ এই অপচয় পারিবারিক সুখশান্তির অন্তরায় হবে। পরিবারের স্বাস্থ্য রন্ধনশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, একই রকম মূল্যবান শিশুর স্বাস্থ্য ও খাদ্য। উপযুক্ত রন্ধনশিক্ষা পরিবারের কাজকর্ম এবং বিশেষভাবে নারীদের কাজকর্মকে আরও কার্যকরী ও যুক্তিসংগতভাবে পুনর্গঠিত করবে। একই সঙ্গে পরিবারের রুচি ও সংস্কৃতির উন্নতিসাধন করবে। পরিবারই হবে খাদ্য ও রসনা বিকাশ ও পরিশীলনের উপযুক্ত স্থান।

যেহেতু পাঠকদের মধ্যে ধনী, দরিদ্র মধ্যবিত্ত সকলেই আছেন, তাঁরা আবার ভিন্ন

ধর্মাবলম্বীও হতে পারেন তাই বিপ্রদাস প্রথমেই বলে দিয়েছেন যে গ্রন্থটি সাধারণের উপযোগী করে লেখা হয়েছে, "পাক-প্রণালী সকল শ্রেণী অর্থাৎ হিন্দু, অহিন্দু প্রভৃতি সমুদায় সম্প্রদায়ের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে" একই সঙ্গে বলেছেন পাক-প্রণালীর প্রয়োজন সবারই, ' সুতরাং কেবল যদি সামান্য শ্রেণির উপযোগী অর্থাৎ যৎসামান্য ঘৃত মসলা দ্বারা রন্ধনের নিয়ম লিখিত হয়, তাহা হইলে উচ্চশ্রেণির ভোক্তাদিগের রসনায় তাহা স্থান পায় না, এবং কেবল যদি তাঁহাদিগের রসনার যোগ্য রন্ধনের বিষয় লিখিত হয়, তাহা হইলে সামান্য গৃহস্থদিগের পক্ষে তাহা কোনো কার্যকারক হয় না। এ জন্য সামান্য হইতে বহুব্যয়সাধ্য সকল প্রকার রন্ধনের বিষয়ই প্রকাশ করা হইল।"[২০] *পাক-প্রণালী* প্রথমে পাঁচখণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং তার বিন্যাসও ছিল পাঠকের পক্ষে অসুবিধাজনক, সেইজন্য বিপ্রদাস বিভিন্ন রন্ধনপ্রকরণ অনুযায়ী গ্রন্থটিকে সুবিন্যস্ত করে ১৩০৪ সালে প্রকাশ করেন এবং এর 'বিজ্ঞাপন' অংশে লেখেন : "ইহাতে দরিদ্রের শাক-সবৃজি হইতে ধনীর পোলাও, কোর্ম্মা এবং রোগীর পথ্য-রন্ধন পর্য্যন্ত সমুদায় লিখিত আছে। কেবল মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার নিয়ম ইহাতে সন্নিবেশিত না করিয়া 'মিষ্টান্ন পাক' নামে স্বতন্ত্র পুস্তক মুদ্রিত হইল।"[২১] *পাক-প্রণালী*-তে ডাক্তারদের ব্যবস্থাপিত পথ্য রন্ধনপ্রণালী ছাড়াও আছে রোগবিশেষে পথ্যাপথ্যের তালিকা, উৎসব ও ক্রিয়া উপলক্ষে নিমন্ত্রিতদের জন্য খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন। অন্য খণ্ড *মিষ্টান্ন-পাক*[২২]-এ আছে স্ত্রীলোকেদের জন্য সরা সাজাইবার ব্যবস্থা, বিভিন্ন মিষ্টির মণ-করা হিসেব, শতলোকের লুচির আয়োজন। শেষ দু-টি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে পরিবারে নিমন্ত্রিত অতিথিদের খাদ্যদ্রব্যাদির আয়োজনের জন্য।

পাক-প্রণালী বইয়ে বিপ্রদাস অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিয়েছেন, শুধুমাত্র প্রস্তুতপ্রণালীর বিষয়েই নয়, অতিথি আপ্যায়ন, উৎসব ক্রিয়ায় কোন্ কোন্ বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে, কী কী বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, এমনকি রান্নাঘর, উনুন, বাসনপত্র কীভাবে ব্যবহার করা উচিত, শাকসবজি, মাছ, মাংস, দুধ কীভাবে চিনতে হবে, কোনো বিষয়ই তিনি বাদ দেননি। বস্তুত গৃহ-পরিবার পরিচালনার এই বিশদ নির্দেশাবলী পারিবারিক জীবনযাত্রার একটা মান নির্দিষ্ট করে দেয়, উচিত-অনুচিতের সীমারেখাও খুব স্পষ্টভাবে টানা হয়ে যায়। অন্যদিকে উত্তরাধিকার সূত্রে পরিবারে অনুসরিত প্রথা ও রীতিগুলির পুনর্মূল্যায়ন ও পরিবর্তন সাধন জরুরি হয়ে পড়ে। আবশ্যক হয়ে পড়ে নতুন বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেওয়া। বিষয়ে বিশেষজ্ঞর কণ্ঠস্বর কঠিন, মনোভাব অনমনীয়। পরিবারে উৎসব ক্রিয়া উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিতদের খাওয়াদাওয়া সম্পর্কে বিপ্রদাস প্রথমেই বলেছেন এসব ব্যাপারে 'কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হয়' অর্থাৎ দৃষ্টি রাখতেই হবে। যেমন, খাদ্য বিষয়ে যেন অভাব না হয়, অপচয় না হয়, সময়ে যেন সকলে খেতে পারে, পরিবেশ যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, ইত্যাদি। এও খেয়াল রাখতে বলেছেন যে "সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে খাদ্যদ্রব্য অধিক লাগিয়া থাকে", মিষ্টির আয়োজনের নিখুঁত হিসেব দিয়েছেন; "শতকরা সাড়ে বার সের হিসাবে প্রত্যেক প্রকার সন্দেশ আয়োজন করিতে

হয়", বিয়ে, আদ্য-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সমারোহে আরও একটু বেশি এবং "যে যে সমাজে পাত হইতে তুলিবার প্রথা প্রচলিত তথায় শতকরা কেমন আয়োজন করিতে হয়।"[২৩] এ ছাড়াও মনে রাখতে হবে "পুরুষ অপেক্ষা মেয়ে ভোজে মাছ ও মিষ্টদ্রব্যের পরিমাণ অধিক করিতে হয়, কারণ স্ত্রীলোকেরা মিষ্টান্ন মাছের ব্যঞ্জন সমধিক ভালোবাসেন।"[২৪]

বিপ্রদাস লিখেছেন যে সমাজে পরিবর্তনের ফলে রুচি ও আহারের পরিবর্তন ঘটছে। সমাজে যেমন "বিজাতীয় রন্ধন প্রথা ক্রমে ক্রমে অনেকটা চলিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সঙ্গে আবার ভোজনস্থলে খাদ্য-দ্রব্যের নামের একটা ফর্দ দেওয়ারও প্রথা দেখা দিয়াছে। ওই ফর্দ কাগজে বা রুমালে ছাপা হইয়া থাকে।... যে নিয়মে খাদ্য বা ভোজ্য দ্রব্যের (মেনু) তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়, নিম্নে, তাহার আদর্শ লিখিত হইতেছে।"[২৫] তিনি দশটি ভিন্ন আদর্শ ভোজ্য তালিকা প্রস্তুত করেছেন, তার মধ্যে একটি উল্লেখ করছি :

> ছানার লুচি, বেগুনভাজা, মাস্তাই কচুরি, গুলেল কাবাব, ভেট্‌কি মাছ ফ্রাই, ছোকা, চিংড়িমাছের কাটলেট্‌, মিঠা আমলেট্‌, মুগের ডালের মুড়িঘণ্ট, মাছের পোলাও, মাছের মালাইকারি, হজপচ্‌ মাংসের হাঁড়িকাবাব, মৎস্যমঞ্জরী, পেঁপের ঝালদার চাটনি, কাশ্মীরি মিঠা পোলাও, রস-মুণ্ডির গোলাপি চাট্‌নি, পোলাও দানা মিঠাই, সরতোয়া, কলাকন্দ, তালশাঁস সন্দেশ, পেস্তার বরফি, চিনি পাতা দই, রাবড়ি বা ক্ষীর।

মোটামুটি সবকটি ভোজ্য তালিকাই এইরকম। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীও তাঁর *আমিষ ও নিরামিষ আহার*[২৬] গ্রন্থে এরকম প্রায় ৬৮টি ভোজ্য তালিকা দিয়েছেন, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'ক্রমণী'। মজার কথা হল, প্রজ্ঞাসুন্দরী লিখেছেন যে পাশ্চাত্য ধরনের ভোজে মেনু টেবিলে সাজাবার প্রথা থাকলেও বাংলা ভোজে এরকম কোনো প্রথা নেই। "আমাদের বাংলা ভোজেও এইরূপ মুদ্রিত তালিকাপত্র নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের হাতে হাতে বিলি করিলে মন্দ হয় না।"[২৭] প্রজ্ঞাসুন্দরী এর মধ্যে নানাবিধ বৈচিত্র্য এনেছেন, ভোজ্য তালিকায় ফরাসি, ইংরেজি রান্না যেমন আছে, তেমনি আবার সম্পূর্ণ বাঙালি রান্নার ভোজ্য তালিকাও তিনি দিয়েছেন। এর মধ্যে বাঙালি রুচিকে কিছুটা আন্তর্জাতিক করে তোলার একটা প্রয়াসও দেখা যায়।

পরিপাটি, সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত রন্ধনগৃহ, যেখানে "দ্রব্যাদি এরূপ নিয়মে সাজাইয়া রাখিতে হয়, দরকারের সময় যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে না হয়",[২৮] পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, এ যেন পরিবারের আদর্শেরই এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। রন্ধনশিক্ষার এই বই পরিবারের শিশু, রোগী, এদের সকলের প্রতি আলাদা মনোযোগ দিতে শেখায়। পুষ্টি, স্বাস্থ্যবিধি এই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার ফলে রন্ধন কাজের দায়িত্বও অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। অথচ পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শক্তি ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য ও জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে হলে এই বিষয়ক গ্রন্থগুলির উপরই নির্ভর করতে হবে। একই সঙ্গে পারিবারিক আয়ের উপর নির্ভর করে এইসব ব্যবস্থা করতে হবে, একটি সুশৃঙ্খল পরিবারে এও দেখতে হবে

যে আহার্য বস্তু প্রস্তুত করতে এবং তার ব্যবহারে কোনো রকম অপচয় না হয়। এখানে অপচয়ের ব্যাখ্যা দুটি অর্থে করা যায়। এক, পারিবারিক প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার্য দ্রব্যসমূহের ব্যবহার এবং দুই, আহার্য বস্তুর পরিমাণ ঠিক থাকলেও, যে বস্তুর মধ্যে কোনো খাদ্যগুণ নেই, অথবা তার প্রস্তুতপ্রণালী খাদ্যগুণ নষ্ট করে দেয়, তাও অপচয়। বালক-বালিকাদের খাদ্য সম্বন্ধে বিপ্রদাস যেকথা বলেছেন তাতে এইসকল বিষয়ই পরোক্ষভাবে দেখা যায়। 'বালক ও বালিকাদিগের প্রাতর্ভোজনের জন্য সচরাচর যে সকল খাদ্য দোকান হইতে ক্রয় করা হইয়া থাকে, তাহা প্রায়ই স্বাস্থ্যের বিরোধী...এই খাদ্য অনায়াসেই গৃহে প্রস্তুত হইতে পারে। আর যে সকল গৃহস্থগণ বালকবালিকাদিগকে বাসী খাদ্য প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে স্বাস্থ্যকর ও বলপ্রদগুণ অতি অল্পই রক্ষিত হয়, এবং যাঁহার পরিপাকশক্তি নিতান্ত অল্প, তাঁহার পক্ষে উহা অতি অপকারক। কিন্তু একটু বিবেচনার সহিত প্রস্তুত করিলে, অতি অল্পব্যয়ে উহা সংগ্রহ করিতে পারা যায়।" এই প্রসঙ্গেই বিপ্রদাস রান্নার ব্যাপারে অগ্রিম পরিকল্পনার কথা বলেছেন : "যদি পূর্ব্বদিনে, পরদিনের প্রাতর্ভোজনের বিষয় স্থির করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে, উহা প্রস্তুত করিতে কোনরূপ ক্লেশ পাইতে হয় না, অল্পব্যয়ে, অনায়াসে এবং উপযুক্ত সময়ে, তৈয়ার করিতে পারা যায়।"[২৯] এইসকল ব্যাপারে যেন কোনো একঘেয়েমি না এসে যায়, সেদিকেও বিপ্রদাস সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন। "বালকবালিকা (দিগের) প্রাতঃখাদ্য নিত্য একরূপ না হইয়া, পরিবর্ত্তন করা ও সহজ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু সাধারণতঃ প্রায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।' বস্তুত সমস্ত পরিবারের খাদ্য সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য, "পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করিলে কোনোরকম অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না।"[৩০]

প্রজ্ঞাসুন্দরী পরিষ্কারভাবেই বলেছেন বাঙালি জীবনে কোনো বিষয়েই একটা বিধিবদ্ধ ভাব দেখা যায় না। "এ দেশে কোনো বিষয়ে একটা শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য নাই। আমাদের আহারেও এই বাঙালি চরিত্র বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। আমাদের ভোজে মাছের সঙ্গে ক্ষীরের সঙ্গে একটা হ-য-ব-র-ল ব্যাপার হইয়া উঠে; এইরূপ আহার যেমন শাস্ত্রবিরুদ্ধ তেমনি স্বাস্থ্যবিরুদ্ধ। এই বিশৃঙ্খলা হইতে উদ্ধার করিয়া বাংলা খাবারকে শৃঙ্খলার সূত্রে আবদ্ধ করা আমার একটি প্রধান লক্ষ্য। এরূপ না করিলে বাংলা খাবারের মেরুদণ্ড কোনও কালেই গঠিত হইবে না।"[৩১] সুশৃঙ্খল রন্ধনপদ্ধতি যে সুশৃঙ্খল পারিবারিক জীবনের এক জরুরি উপাদান, এই ধারণার এক পরিষ্কার ছবি আমরা এই বইগুলি থেকে পাই। বস্তুত শৃঙ্খলা, নিয়ম, বিধিবদ্ধতা, প্রণালী, প্রকরণ— এই সবকিছুর যোগফলে রন্ধনবিদ্যা যে শেষ অবধি নিজেকে বিজ্ঞান বলে দাবি করবে এ আর আশ্চর্য কি? আর বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া পরিবার, সমাজ কবে সমৃদ্ধ হয়েছে? সুতরাং খাদ্য প্রস্তুতপ্রণালী সম্পর্কিত গ্রন্থও যে বিজ্ঞানগ্রন্থের মতো রচনা করতে হবে এবং নতুন নতুন রান্না আবিষ্কার করতে হলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতোই যত্ন, ধৈর্য, অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার

প্রয়োজন একথা প্রজ্ঞাসুন্দরীর বইয়ের মুখবন্ধেই বলা আছে। এই বই-এর মুখবন্ধে ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখেছেন : "দেবী প্রজ্ঞাসুন্দরী বিজ্ঞানবিতের ন্যায় কল্পনার সাহায্যে রন্ধন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন।"[৩২] প্রজ্ঞাসুন্দরী নিজেও বলেছেন যে কতকগুলি খাদ্য প্রস্তুতপ্রণালী সংগ্রহ করে বই প্রকাশ করা বিশেষ ফলদায়ক হয় না, কারণ এর মধ্যে কোনো বিন্যাস বা শৃঙ্খলা নেই। "যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের সমাবেশ অপেক্ষা ব্যূহবদ্ধ মুষ্টিমেয় সৈন্যও অধিক ফলদায়ক, সেই রূপ খাদ্যসম্বন্ধীয় পুস্তকেও শৃঙ্খলা রচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।"[৩৩] এই শৃঙ্খলা আত্মস্থ করলেই প্রকৃতভাবে গৃহপরিচালনা সম্ভব, এবং এই কারণেই, ক্ষীরোদচন্দ্র লিখেছেন প্রজ্ঞাসুন্দরীর নিজের "গৃহস্থালীর পারিপাট্য ও রন্ধনের নিপুণতা" সকলকেই মুগ্ধ করে।

আধুনিক এইসব রন্ধনবিদ্যার বইগুলিতে যেমন গুরুত্ব পেয়েছে পারিবারিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পথ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি, সেইরকম এর এক অন্য প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করতে হয়। সেটা হল স্বাদ ও রুচির বৈচিত্র্যের সন্ধান দেওয়া এবং সৃষ্টি করা, যাতে কোনোরকম একঘেয়েমি না আসে, বিভিন্ন স্বাদ আহরণের ক্ষমতাও প্রসারিত হয়। ক্ষীরোদচন্দ্র লিখেছেন এরকম কথা প্রায় শোনা যায় : "আরে শাক শুক্ত রাঁধিতে আবার কেতাব পড়িতে হইবে কেন?" কেতাব পড়তে হবে নতুন নতুন বৈচিত্র্যের সন্ধানে, কারণ "রন্ধনের বিচিত্রতা ও রন্ধন প্রক্রিয়ার সহস্রতা সমাজের ব্যাপৃতির পরিচায়ক।" পারিবারিক সুখের জন্য বৈচিত্র্যহীনতা, গতানুগতিকতা, নতুনত্বহীনতা, কোনোটাই কাম্য নয়। এর জন্য গৃহসজ্জার পরিবর্তন যেমন আবশ্যক, সেইরকমই রন্ধনেও বৈচিত্র্য আনতে হবে।

বিদেশে সাধারণত দুই ধরনের রান্নার বই পাওয়া যায়। একটি হল শেফদের জন্য রান্নার বই অর্থাৎ যারা হোটেল-রেস্তোরাঁয় চাকরির জন্য এই বিদ্যা শিক্ষা করছেন, তাঁদের জন্য এবং অন্যটি হল পারিবারিক রান্নার বই। বাংলা ভাষায় কিন্তু বিপ্রদাসের পর থেকে শুধুমাত্র পারিবারিক রান্নার বই লেখা হয়েছে। একটি গড় পরিবারকে মাথায় রেখেই রান্নার উপাদান ও পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়েছে, আবার পরিবারের যে-কেউ যাতে বই ব্যবহার করতে পারে সে-কথাও লেখক-লেখিকারা মনে রেখেছেন। বস্তুত রন্ধনপদ্ধতির বই লিখতে গেলে প্রথমে যে সমস্যার সমাধান করতে হয় তা হল উপাদানগুলির পরিমাণের মাপ কীভাবে দেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে প্রজ্ঞাসুন্দরী লিখেছেন : "আমি এই পুস্তকে প্রথমে চামচের হিসাবে পরিমাণ দিয়াছিলাম এই মনে করিয়া যে চামচের পরিমাণ দিলে লোকের সুবিধাজনক হইবে। কিন্তু দুই চারিটি রান্না যখন ছাপা হইয়া গিয়াছে তখন মনে হইল যে চামচের ব্যবহার কয়টা লোকই বা জানে; তাই আবার তোলা প্রভৃতি পরিমাণ আরম্ভ করা গেল।"[৩৪] পঁচানব্বই বছর পর এই বই যখন পুনর্মুদ্রিত হল তখন বিভিন্ন রান্নার উপকরণের মাপ ও ওজন বর্তমান মেট্রিক হিসাবের অনুপাতে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ল। মজার কথা হল সম্প্রতি কালে লীলা মজুমদার রান্নার বই লিখতে গিয়ে বলছেন : "সেকালের আধুনিক

রান্নার বইতে উপকরণের পরিমাপ ঠিক যেন নিক্তি দিয়ে ওজন করা থাকত। স্যাকরা ছাড়া কারো বাড়িতে নিক্তি না থাকাতে ভারি অসুবিধা হত। আজকাল সাধারণ রান্নার বইতে অনেক সহজ মাপ দেওয়া থাকে। চা-চামচ, মাঝারি চামচ অর্থাৎ তিন চা-চামচ, বড় চামচ অর্থাৎ তিন মাঝারি চামচ।" ঠিক একই রকম ভাবে সাধনা মুখোপাধ্যায় তাঁর *রান্না করে দেখুন* বইয়ে লিখেছেন : "আজকালকার দুর্দিনের বাজারের কথা মনে রেখে এই বইয়ে উপকরণের পরিমাণ যথাসম্ভব কম রাখা হয়েছে। সাধারণত গৃহস্থের বাড়িতে দাঁড়িপাল্লা থাকে না তাই কাপ ও চামচে প্রতিটি উপকরণের পরিমাণ দেওয়া হয়েছে।"[৩৬] শুধু মাপের ক্ষেত্রেই নয়, রান্নার বইকে সর্বতোভাবে যুগোপযোগী করে লেখা প্রয়োজন হয়। সুতরাং রান্নার বই যুগের ধারণা ও রুচিকে শুধুমাত্র প্রতিফলিতই করে না, সেই ধারণাকে আরও পরিপূর্ণভাবে পুনর্গঠিতও করে।

তাই রান্নার বই শুধু নতুন নতুন রান্নার পদ্ধতিই শেখায় না, একই সঙ্গে শেখায় গৃহিণীপনা, পুষ্টিবিদ্যা, পথ্য প্রস্তুতপ্রণালী ও রোগীর শুশ্রূষা, দাসদাসীদের সঙ্গে ব্যবহার, স্বাস্থ্যবিধি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শিশুর পরিচর্যা, এই সবকিছুই, লক্ষ করলে দেখা যাবে এই সবকিছুই কিন্তু পরিবারের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত। এর সঙ্গে অবশ্যই যোগ করতে হবে, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, উনান, পাত্র, এবং রন্ধন-দ্রব্যসামগ্রীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা শেখার প্রয়োজনীয়তা। আর রান্নার বইয়ের মাধ্যমে এসব শিক্ষাদানের প্রধান লক্ষ্য হল পরিবারের নারীরা।

২

সম্প্রতি কালে জনপ্রিয় রান্নার বই-এর লেখিকা লীলা মজুমদার তাঁর বইয়ের শুরুতেই বলে দিয়েছেন : "মানবজীবনের কেন্দ্র হল একেকটি পরিবার এবং পরিবারের কেন্দ্র হল গিয়ে ওই রান্নাঘরটি! রান্নাঘরটি যে চালায় সে পৃথিবীর কলকাঠিটিও ঘোরায়।"[৩৭] গৃহ ও পরিবার যে সমাজের মূল এবং যে গৃহ থেকে সমাজ সৃষ্ট হয়, পুষ্ট হয় ও উন্নতিসাধনের উপকরণ লাভ করে, সেই গৃহ পরিচালনার ভার রমণীর হাতে, এ ছিল উনিশ শতকের পরিবারের ধারণা। যেহেতু ভোজনকর্ম পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ কারণ পারিবারিক সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য অনেকটাই তার আহারের অভ্যাসের ওপর নির্ভর, সেইজন্যই এই বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে রান্নার বই-এর লেখক/লেখিকাদের আবির্ভাব। এই প্রসঙ্গেই লীলা মজুমদার লিখেছেন : "খেতে যখন হবেই তখন ভালো করেই খাওয়া যাক না। ভালো করে খাওয়া মানে এমন খাওয়া যার স্বাদ ভালো, গন্ধ ভালো, দেখতে ভালো, বেশি পুষ্টিকর, সহজে ও কম সময়ে, কম খরচে রাঁধা যায়। আমাদের মতে প্রত্যেক পরিবার যদি এইরকম খাওয়া, দিনে একবার সকলে মিলে একসঙ্গে বসে খায়, তাহলে এমন একটা কোমল আন্তরিকতার পরিবেশ তৈরি হয়, যার ফলে অনেক পারিবারিক সমস্যা মিটে যায়, তিক্ততা জমবার সময় পায় না।"[৩৮]

এ বিদ্যা যে কুলনারীদেরই শিক্ষা করতে হবে এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত ছিল না, এখনও নেই। এ বিষয়ে জ্ঞান থাকলে নিত্য নতুন নতুন রান্না করে পরিবারের নারীরা সকলকে শুধু তৃপ্তি দিতেই পারবেন না, নব নব রুচির প্রতি দৃষ্টিও দিতে পারবেন। বিপ্রদাস লিখেছেন, "আমাদের জীবন ও স্বাস্থ্য যাঁহাদের মমতা এবং ভালবাসা রূপ প্রহরী দ্বারা অনুক্ষণ সুরক্ষিত হইয়া থাকে",[৩৯] সেই কুলনারীদের রন্ধনবিদ্যার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করতে হবে। একই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে "রন্ধনকার্য্যের সহিত গৃহস্থালীর অন্যান্য কার্য্যের অতি নিকটতর সম্বন্ধ। সুতরাং সুপাচিকা হইলে, আর আর বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।" 'সুগৃহিণী হতে হলে এই জ্ঞান অধিক পরিমাণে উপার্জন করতে হবে', "সুগৃহিণী সংসারক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তাই বলি, রন্ধনবিদ্যার প্রতি আর উপেক্ষা করিও না।"[৪০] একটি বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে একসময় আমাদের দেশে রন্ধনকার্যের প্রতি রমণীদের যে আস্থা ও যত্ন ছিল, তা ক্রমশই হ্রাস পেয়েছে। এই কথা বলে বিপ্রদাস প্রশ্ন করেছেন : "ইহা যে সমাজের একটি ঘোরতর শোচনীয় অবস্থা, তাহার আর সন্দেহ কি?"[৪১] বৈষ্ণবচরণ বসাকও লিখেছেন ঘরে ঘরে বেতনভোগী পাচক, অথচ "কিছুকাল পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। তখন গৃহিণীগণ পাকশালাকে অতি পবিত্র স্থান জ্ঞান করিতেন।"[৪২] একই কথা শুনতে পাই শরৎকুমারী চৌধুরাণীর কাছে। যে শরৎকুমারী সংসারের দৈনন্দিন ব্যস্ততার কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন "বাস্তবিক পাক-প্রণালী পাঠ করিয়া ওজন করিয়া প্রত্যেক তরকারী রাঁধিতে হইলে দিনান্তে আহার জোটা ভার।" তিনিও উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছিলেন যে রন্ধনকাজে আর কারো বিশেষ উৎসাহ নেই, "অসন্তোষের গুঞ্জন বাংলার সর্বত্রই গুন্ গুন্ করিতেছে শুনিতে পাই। এটা তো উন্নতির লক্ষণ নহে।"[৪৩] সকলেই দাসদাসীদের দিয়ে ঘরের কাজ করাতে চান, "ঘরের কাজ যে গৃহিণীদের আয়ত্তও, সেটা তাঁরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন না।"[৪৪]

এইসব কারণেই বোধহয় ভূদেব *পারিবারিক প্রবন্ধ* গ্রন্থে লিখেছিলেন যে বাড়ির রান্নায় যদি কোনো দোষ থাকে, যদি কোনো ব্যঞ্জন সামান্য স্বাদহীন হয়, তাহলে সেটা তৎক্ষণাৎ যিনি রান্না করেছেন তাঁকে বলতে হবে। ভূদেবের নিজের বাড়িতে এই ব্যবস্থা দেখে তাঁর এক আত্মীয় বলেছিলেন যে "বৌ, ঝি, গৃহিণী প্রভৃতি যাহারা রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত হয় তাহারা কতটা পরিশ্রম করে স্মরণ করুন; উহারা যতদূর সাধ্য তাহা করে—উহাদের কার্য্যে প্রশংসা না করা কি একটু নৈষ্ঠুর্য্য নয়? আমাকে যা দেয়, আমি তাহাই ভালো বলিয়া খাই।" এর উত্তরে ভূদেব বলেন : "আমার প্রণালীতে একটু নৈষ্ঠুর্য্য আছে বই কি?—কিন্তু শিক্ষা প্রদান কাজটা যে বিষয়েই প্রযুক্ত হউক, তাহাতে একটু কঠোরতা থাকেই থাকে। যদি বাটীর রান্না ভালো করিতে চাও, তবে ওই কঠোরতা প্রয়োগে অত ভীত হইও না।"[৪৫] তাই ভূদেব বলেছেন রান্না ভালো করার উপায় নির্ভর করে গৃহস্বামীর শিক্ষাদানে প্রবণতা আছে কি নেই তার উপর। যে বাড়ির কর্তা রন্ধনকাজের প্রতি মনোযোগী সে বাড়ির স্ত্রীলোকেরা রন্ধন কাজটিকে গৌরবসূচক মনে করে এবং

তার উৎকর্ষ ও পারিপাট্য সাধন করতে পারে।

রান্নার বইগুলিতে অবশ্য রান্নার ও গৃহভোজের উন্নতিসাধনের জন্য গৃহকর্তাকে টানা হয়নি। কারণ এই শিক্ষাই তো বইগুলির মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। রন্ধনকাজে নৈপুণ্য ও গৃহকাজে উন্নতির মান এই রান্নার বইগুলিই নির্দিষ্ট করে দেয়, ফলে এটাই এক 'সাধারণ জ্ঞানে' পরিণত হয়, যখন আর কোনো জোর খাটাবার প্রয়োজন থাকে না। এই মানগুলিই পরিবার অন্তস্থ করে নেয়। তাই বৈষ্ণবচরণ *সৌখীন পাকপ্রণালী*-তে লিখেছিলেন : "যদি যথার্থই ভোজনে তৃপ্তি শান্তি চান তবে রমণীয় নমনীয় কমনীয় হস্তে সাদরে ইহা অর্পণ করুন। আহারই দেহধারণের মূলাধার। বাজারের ভেজাল ঘৃত ও ভেজিটেব্‌ল ঘৃত দোষে সাধারণের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। বিশুদ্ধ হিন্দুমতে ঘরে ঘরে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া কুটুম্বিতায় ব্যবহার করুন। সঙ্গীত সুরবোধ যেমন একটি স্বতন্ত্র সামগ্রী পাকবোধও তদ্রূপ।" এই গ্রন্থের মাধ্যমেই পাকবোধ আয়ত্ত করা যাবে। যার পাকবোধ জন্মেছে সেই পাকে সিদ্ধহস্ত ও সমর্থ। এই কারণে বৈষ্ণবচরণ বলেছেন যিনি ভালো রান্না করেন তিনি সাহসী ও সাবধান, কার্যতৎপর অথচ ধীর, পরিষ্কার অথচ পরিশ্রমী, তীব্র দৃষ্টি অথচ সন্তুষ্ট ও আত্মবিশ্বস্ত। এইসব গুণ না থাকার জন্যই কারো কারো আলুনি রাঁধুনি, কাঁচা রাঁধুনি বা পোড়া রাঁধুনি নাম হয়ে থাকে। চলতি কথার উল্লেখ করে বলেছেন : "মাছ পচা না রাঁধুনী পচা?"[৪৬]

পচা রাঁধুনি না হতে গেলে নানা গুণ ও জ্ঞান আয়ত্ত করতে হবে, আবার গৃহ ও পরিবারের কিছু কিছু ব্যবস্থারও পুনর্বিন্যাস করতে হবে। বাঙালি পরিবারের পাকশালার উল্লেখ করে বৈষ্ণবচরণ বলেছেন, "সাধারণত দেখা যায় বাটীর মধ্যে যে গৃহ জঘন্য, যাহা বাসের অযোগ্য তাহাই সূতিকাগৃহ বা পাককার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়।"[৪৭] তাঁর মতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকার জন্য রান্নাঘর এরকম একটা অবহেলার স্থান হয়েছে। বস্তুত এ বিষয়ে বাড়ি তৈরি করার সময়ই খেয়াল রাখা উচিত। যথেষ্ট আলো না থাকলে যেমন কাজের অসুবিধা হয়, সেরকম অপরিষ্কার থাকলে ঝুল বা অন্য ময়লা খাদ্য দূষিত করতে পারে। আর এইরকম ঘরে যাকে পরিশ্রম করতে হয়, তার অসুবিধার কথাও ভাবতে হবে। বাড়ির মেয়েরাই যে এই অন্ধকূপের মতো ঘরে দিনে বেশ কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করেন, এটা কারো খেয়াল থাকে না। যেটা যত্ন ও শ্রমের কাজ, সেই কাজই "ধূমের কষ্টে ও বায়ুচালনার অভাবে ঘর্মাক্ত কলেবরে সম্পন্ন করিতে হয়; সময়ে সময়ে মনে হয় শরীরই যেন সিদ্ধ হইয়া যাইতেছে। অন্ততঃ ভোজনকালে সেই কষ্ট ভাবিয়া দেখিলে, পাচিকার কোন না কোন কালে সেই কষ্ট দূর হইবার উপায় হইতে পারে।"[৪৮] বস্তুত পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি রান্নাঘর, যেখানে আলো বাতাস স্বচ্ছন্দে চলাচল করবে, এইরকম রান্নাঘরের কথা বিপ্রদাস থেকে আরম্ভ করে সকলেই লিখে গেছেন। এই কারণেই রান্নাঘরে উনানের অবস্থান, প্রকার ইত্যাদি নিয়েও এঁদের সকলকে বিস্তারিত আলোচনা করতে হয়েছে। মজার কথা হল, আজকের দিনেও রান্নার বই শুরু হয় ওই একইভাবে এবং একই কথা বলে।

যথার্থ গৃহিণীপনার জন্য রন্ধনবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনের কথা প্রজ্ঞাসুন্দরীর বই-এর মুখবন্ধে খুব পরিষ্কার করে বলা আছে। মেয়েদের যথার্থ শিক্ষার এটি একটি অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ। "গৃহিণী সুগৃহিণী না হইলে সংসার শ্মশানে পরিণত হয়। কুগৃহিণীর গৃহ অলক্ষ্মীর আলয়। অনাচার উচ্ছৃঙ্খলতা, ঋণ ও অসম্মান অশান্তি ও আত্মগ্লানি বিলাসিনীর নিত্য পরিচয়। গৃহস্থালী সুশৃঙ্খল, পুত্রকন্যা সুস্থ ও প্রফুল্ল দাম্পত্য প্রেম চিরভাসিত ইহা অর্থসাপেক্ষ নহে, গৃহিণীপনাসাপেক্ষ, ধনসঞ্চয় আয়ে নহে ব্যয়ে। অল্প আয়োজনে যিনি সুন্দর রন্ধন করিতে পারেন তিনিই পাচিকা, অল্প ব্যয়ে যিনি সুশৃঙ্খলায় সংসার চালাইতে পারেন তিনিই গৃহিণী।"[৪৯] গৃহিণীপনার একটা প্রধান শিক্ষা হল অপচয়ের প্রতি সচেতন হওয়া। বিপ্রদাস একটি প্রচলিত প্রবাদ উল্লেখ করে বলেছেন, পুরুষেরা যদি কোদালে করে দ্রব্যাদি গৃহে নিয়ে আসে আর স্ত্রীলোকেরা যদি ঝিনুকে করে তা অপচয় করতে আরম্ভ করে, তাহলে সে সংসারের কিছুমাত্র উন্নতি হয় না। সুতরাং "রন্ধনের সময় যাহাতে কোন বস্তুর অপচয় না হয়, তৎপক্ষে বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিতে হয়।"[৫০] কারণ সামান্যতম অপচয়ও সংসারের মহান অনিষ্টের কারণ। বৈষ্ণবচরণও বলেছেন কোনো সামগ্রী যাতে অপচয় না হয় সে বিষয়ে যেমন সতর্ক থাকতে হবে, আবার শাক সবজি, ফলমূল এই সবকিছুর মধ্যে যেটুকু অনুপকারী, সেটুকু অবশ্যই ত্যাজ্য। অর্থাৎ গৃহিণীকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান এবং পারিবারিক অর্থনীতি, এই দুই-এর প্রকৃত সমন্বয় সাধন করতে হবে। অপচয় রোধ এবং পরিচ্ছন্নতা এই দুই-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। *পারিবারিক প্রবন্ধ* গ্রন্থে ভূদেব লিখেছেন যে গৃহোপকরণের সামগ্রী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখলে তা রক্ষা হয় না, যথাস্থানে যত্নপূর্বক রাখতে হয় এবং তাতেই পরিচ্ছন্নতা সম্পাদিত হয়. একই সঙ্গে বলেছেন গৃহ বা পরিজনের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন করলেই সমুদয় কাজ শেষ হয় না, "গৃহিণীকেও সুবেশা হইয়া থাকিতে হয়। যে গৃহিণী সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া স্বয়ং পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জ থাকিতে চাহেন না, তাঁহার অন্তরে একটী গূঢ় অভিমান আছে সেটী ভাল নয়, যিনি চেষ্টা করিয়াও পারেন না, তাঁহার লক্ষ্মীচরিত জ্ঞান এখনও সুপক্ক হয় নাই। যিনি বাঁদী এবং বিবি উভয়ই হইতে পারেন, তিনিই লক্ষ্মী।"[৫১]

মোটকথা হল গৃহের অন্যান্য অংশের মতো রান্নাঘরকেও পরিষ্কার ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে, গৃহকাজের মাধ্যমে সমুদয় পারিবারিক শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ও সুচারুরূপে রক্ষিত হবে, এই হল গৃহিণীর পরিচয়। এইজন্য প্রজ্ঞাসুন্দরী লিখেছেন গৃহকাজের প্রত্যেকটি গৃহকর্ত্রীকে তন্নতন্ন করে তত্ত্বাবধান করতে হবে, তাহলেই সুফলের আশা করা যেতে পারে। গৃহকাজ ও রান্নাবান্নার অন্য একটি সুফলের কথাও সকলেই বলে গেছেন। সেটা হল মেয়েদের শারীরিক শ্রমের উপকারিতার কথা। বিপ্রদাস লিখেছেন : "আমাদের দেশে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত; সুতরাং শরীর পরিচালন জন্য গৃহস্থালীর কার্য্যাদিতে লিপ্ত থাকা, স্ত্রী জাতির স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার প্রতি উপেক্ষা

করায়, বর্ত্তমান সময়ে অবলাগণ অধিক রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। সর্ব্বদা কার্য্যে লিপ্ত থাকা জীবনের একটি মহান উদ্দেশ্য; কার্য্যহীন জীবন জীবনই নহে।"[৫২] প্রজ্ঞাসুন্দরীও লিখেছেন, "রাঁধিতে গেলে শুধু যে শারীরিক পরিশ্রমে শরীর সবল থাকে তাহা নয়, রীতিমত শিক্ষা হয়। ভাবিয়া দেখ এক একটা বড় বড় হাঁড়ি তোলা কি সহজ ব্যাপার। ইহাতে বাস্তবিক অনেক বলের আবশ্যক; এবং নিজে রাঁধিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলে দেহ, মন, আত্মা কত না পবিত্র ও প্রশস্ত হয়। নিজের যত্নে ও পরিশ্রমে পরকে সুখী করিতে পারিলে মন কত আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। এই কারণে আমরা রন্ধনকার্য্যকে ধর্ম্মের সহায় বলিয়া মনে করি।"[৫৩] সেই সময় পরিবার সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত লেখকরাই বলেছেন যে গৃহিণীর কর্তব্য অতি গুরুতর। গৃহিণীকে সর্বপ্রকার চপলতা ত্যাগ করতে হবে, না হলে কেউ তাঁকে ভয়ও করবে না, তাঁর আদেশ প্রতিপালনেও অবহেলা করবে। ক্ষমা, দয়া, কর্তব্যজ্ঞান, সম্মানবোধ, সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি গুণ গৃহিণীর থাকা চাই। দানশীলতা ও কৃপণতা এই দুইও তুল্যভাবে গৃহিণীকে আয়ত্ত করতে হবে। তাঁকে আত্মশাসন ও আত্মরক্ষাও শিক্ষা করতে হবে। আধুনিক রান্নার বই বা পরিবার সংক্রান্ত আলোচনায় গৃহিণীকে এত গুণ আয়ত্ত করার কথা না বললেও কিছু জিনিস প্রায় একই আছে। এখন সময়কে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা চাই, তাই রান্নাবান্নার কাজে সুশৃঙ্খল হতে হবে, পরিবারের ব্যবস্থাপনায়ও সেই একই শৃঙ্খলা চাই। গৃহিণীকে জানতে হবে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিশুপালন প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা জটিল তথ্য। বস্তুত যে ধারণার শুরু উনিশ শতকের রান্নার বইতে, তাই আজ বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা ও বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে পরিবারের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। হোম-সায়েন্স বা গৃহ-বিজ্ঞানের জন্মও হয়েছে এই ধারা থেকেই।

৩

পরিবারের আলোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল দাস-দাসী। রান্নার বইগুলিও সেই আলোচনা থেকে দূরে নেই। একটি সুখী পরিবারে দাসদাসীদের সঙ্গে ব্যবহার কীরকম হবে, সেই বিষয়ে সাধারণভাবে মত ছিল যে, দাসদাসীদের পরিবারের অঙ্গস্বরূপ গণ্য করতে হবে, সংসার চালাতে বা দাসদাসীকে শাসন করতে কর্কশ ভাষা বা নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। কোনোরকম ত্রুটি প্রভুর দৃষ্টি অতিক্রম করে না এইটুকু তারা জানলেই যথেষ্ট। তা ছাড়া দাসদাসীদের সহসা অবিশ্বাস করতে নেই। ' অবিশ্বাস জন্মিলে সহসা তাহা প্রকাশ করিতে নাই; অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে আর তাহাকে রাখিতে নাই। কারণ, সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের মধ্যে প্রতিদিন বাস করা প্রভু এবং ভৃত্য উভয়েরই অধোগতির কারণ।"[৫৪] চাকরেরা যে চুরি করে এর উত্তরে ভূদেব লিখেছেন : "আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, চাকরদিগের যত দোষ হয়, সমুদায়ই প্রায় মনিবের দোষে জন্মে। চৌর্য্য, শঠতা, ধূর্ত্ততা, মিথ্যাকথন— এসব ভীরুতার কার্য— নৈষ্ঠুর্য্যের অবশ্যম্ভাবী

ফল। তুমি ভৃত্যের পীড়ন কর ওইরূপে তাহার প্রতিশোধ পাইবে।"[৫৫] প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁর *স্ত্রীচরিত্র* নামে 'স্ত্রীজাতীয় উন্নতি বিষয়ক উপদেশ' দিতে গিয়ে বলেছেন যে পারিবারিক শান্তি বহুল পরিমাণে দাসদাসীদের উপর নির্ভর করে। সুতরাং দেখেশুনে লোক রাখতে হবে, তাদের বেতন বাকি রাখা, ধর্মহানি করা, বা প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। বেশি দাসদাসী রাখবে না, তাতে সুফলের চেয়ে কুফলের আশঙ্কা বেশি। সময় বিশেষে যেমন তাদের দণ্ড দিতে হবে, সেরকম বিশেষ গুণ দেখলে পারিতোষিক দিতে হবে। তবে সাবধানও করে দিয়েছেন : "আজকাল মুঙ্গের ও গয়া জেলা হইতে যেসমস্ত গলিতবসন লম্বোদরগণ চা-বাগানের পথ ভুলিয়া, কিংবা পাটের কল হইতে তাড়িত হইয়া কলিকাতায় চাকরীর জন্য উমেদারী আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা কার্য্যে হস্তিমূর্খ, আহারে যম এবং নিদ্রায় কুম্ভকর্ণ; সেরূপ লোক রাখা আর উষ্ট্রকে স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করান প্রায় সমান।"[৫৬] এ ছাড়া দাসদাসীদের দোষ-গুণ, স্বভাবচরিত্রের প্রতি সর্বদা লক্ষ রাখতে হবে, সন্তোষজনক না হলে তাড়িয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। *অন্তঃপুর* পত্রিকায় বলা হয়েছে যে গৃহকর্ত্রীর দাসদাসীদের সঙ্গে অধিক কথা বলা বা হাস্যপরিহাস করা কখনোই উচিত নয়।

রান্নাঘরের পাচক-পাচিকাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মেয়েদের ঘরের কাজের জন্য দাসদাসীদের উপর ক্রমনির্ভরতার প্রতি সেই সময় অনেকেই উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন একথা আগেই বলেছি। শরৎকুমারী যেমন বলেছেন : "ঘরের কাজ যেন কেবল দাসদাসীদের কাজ—দাসদাসী রাখিতে না পারা যেন দুর্ভাগ্যের ফল, এমনই ধারণা সকলেরই হইয়াছে।"[৫৭] বিশেষ করে রান্নার কাজের জন্য পাচক-পাচিকার নিয়োগের বিরোধিতা প্রায় সকলেই করেছেন। এর কারণগুলি হল : ১) অপচয়, রান্নার লোক হিসেব করে জিনিসপত্রের ব্যবহার করবে না, ফলে জিনিসপত্রের অপব্যবহার হবে; ২) এদের স্বাস্থ্যবিধি বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই; ৩) পরিবারে নারীরা নিজে রান্না করে সকলকে খাওয়ানোর মধ্যে যে আন্তরিকতা আছে এবং এর ফলে যে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়, কাজের লোকের মাধ্যমে সেরকম কখনোই সম্ভব নয়। বিপ্রদাস যেমন বলেছেন : "নিত্য নব নব খাদ্য পাক করিয়া, আত্মীয়স্বজনের তৃপ্তিসাধন করা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে। বিশেষতঃ, পুরনারীগণ যেরূপ আন্তরিক যত্নসহকারে রন্ধন করিয়া থাকেন, বেতনভুক পাচক দ্বারা কখন-ই সেরূপ আশা করা যাইতে পারে না।" এও বলেছেন যে "স্বহস্তে রন্ধন এবং অন্নদান হিন্দুজাতির একটি ধর্মের মধ্যে পরিগণিত।"[৫৮] বৈষ্ণবচরণও বলেছেন যে, "বঙ্গদেশে অধুনা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অবধি গৃহে গৃহে যেরূপ বেতনভোগী পাচক-পাচিকা নিয়োগের প্রচলন হইয়াছে কিছুকাল পূর্ব্বে এরূপ ছিল না।"[৫৯] সেই সময় গৃহিণীরা পাকশালাকে অতি পবিত্র স্থান জ্ঞান করতেন, স্বহস্তে পাক করে ভোজন করানো শুধুমাত্র কর্তব্যবোধ বলে মনে করতেন না, নিজেদের সৌভাগ্য বলেই জ্ঞান করতেন। এককথায় সনাতন ঐতিহ্য, ধর্ম, পারিবারিক অন্তরঙ্গতা—

এই সবকিছু কারণেই মেয়েদের নিজেদের রান্না করা উচিত বলে সকলে মনে করেছেন।

এ বিষয়ে আরও একটু বিস্তারিত আলোচনা করেছেন প্রজ্ঞাসুন্দরী। বলেছেন যে, বাড়ির মেয়েরা স্বহস্তে রাঁধলে যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জিনিসটি হয়, তেমনি রুচিকরও হয়। আর অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়েও আহারের আয়োজন করা যায়। "বেতনভোগী সামান্য পাচকের হস্তে সেরূপ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাহারা বেতন লইতেছে আর কাজ করিতেছে। তাহাদের মূলগত চেষ্টা, কিসে যেমন তেমন করিয়া চটপট কাজটি সারিয়া যাইতে পারে। ভালোমন্দ তাহাদের ভাবিবার অবকাশ থাকে না। ভাতে চুল, ডালে কয়লার গুঁড়া, চচ্চড়িতে না নুন, না ঝাল, না তেল তাহা একরকম ছেঁচকিপোড়া করিয়া যেমন তেমন রাঁধিয়া দিয়া যাইতে পারিলেই হইল। এইরকম রান্না খাইলে মুখের রুচিও হয় না শরীরও অসুস্থ হয়।"[৬০] এ বিষয়ে অন্যান্য লেখকদের মতো প্রজ্ঞাসুন্দরীও সাবধান করে দিয়েছেন যে ভৃত্য নিযুক্ত করার সময় ভালোভাবে দেখেশুনে নিতে হবে, বিশেষ সাবধানও হতে হবে, কারণ "দাস-দাসীর মধ্যে অনেকেরই প্রায় নানারকম সংক্রামক রোগ থাকে, সেইটির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।"[৬১] এ ছাড়া স্বভাবচরিত্র, স্বাস্থ্যের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। ভৃত্যের সংখ্যা যদি বেশি হয়, তাহলে তাদের আলাদা আলাদা কাজ ভাগ করে দিতে হবে, না হলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, আর 'প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্খলাই গৃহকর্মের সর্বপ্রধান আবশ্যক'।

গৃহকর্ত্রীকে অপচয় সম্বন্ধেও সাবধান হতে হবে। এই জন্যও ভৃত্যের উপর বিশেষ নজর রাখতে হবে। প্রজ্ঞাসুন্দরী বলেছেন : "ভৃত্যেরা দোকান হইতে দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিলে তাহাদের নিকট হইতে সেইগুলি ওজন করিয়া লওয়া ভাল। অনেকে বড়মানুষি দেখাইতে গিয়া ওই বিষয়ে অবহেলা করেন, কিন্তু গৃহস্বামীর অবহেলা ভাব দেখিয়া ভৃত্যেরা প্রশ্রয় পায়; গৃহস্বামীর নিকট হইতে তাহারা ক্রমশঃ অসংযত ভাব শিক্ষা করে। অসংযম হইতে লোভের সূত্রপাত হয়; সামান্য হইতে ক্রমে মূল্যবান দ্রব্যের উপর লোভ পড়ে; শেষকালে আমরা যদিও ভৃত্যদের দোষ দিব বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে গোড়ায় যে গৃহস্বামীর দোষ তাহা সুস্পষ্ট। ভৃত্যদের দিতে ইচ্ছা হয় তুমি স্বতন্ত্র পুরস্কার দাও; ভৃত্যেরাও সেটা পাইয়াছে বলিয়া মনে করিবে। বাজারের পয়সা হইতে যতই কেন লউক না কখনও বলিবে না যে মনিবের কাছে পাইয়াছি। সে বলিবে ইহা তাহার স্বোপার্জিত। এ বিষয়ে ভৃত্যদের প্রশ্রয় দিয়া বড়মানুষি দেখাইলে নিজের ক্ষতি ব্যতীত কোন লাভ নাই। দ্রব্য ওজন করিয়া লইলে আর একটি উপকার এই হয়, যে ইহাতে সব সামগ্রীর বাজার দর জানিতে পারা যায়। গৃহস্থের মিতব্যয়ী হওয়াই কর্তব্য। সামান্য অপব্যয়কেও প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত।"[৬২]

সাংসারিক ব্যাপারে গৃহকর্ত্রীকে স্বাবলম্বী হতে বলার আরও একটা কারণ হল যে ভবিষ্যতে আর সুলভে দাসদাসী পাওয়া যাবে না। শরৎকুমারী বলেছেন যে কলকাতা শহরে দাসদাসীদের আবশ্যকতা বৃদ্ধি পেয়েছে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাওয়ার

ফলেই। যেহেতু কুলবধূর বাড়ির চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াবার জো নেই, ফলে স্বামী-পুত্রের অনুপস্থিতিতে দাসী ছাড়া চলে না। কিন্তু তিনিও বলেছেন যে আর কিছুদিন পরে এর প্রচলন কমে যাবে কারণ মধ্যবিত্ত পরিবার দাসদাসীর খরচ কুলিয়ে উঠতে পারবে না। নব্বই বছর পর একই কথা আজকের দিনে লীলা মজুমদার তাঁর *রান্নার বই* গ্রন্থে বলেছেন : "ধরেই নিচ্ছি যে এখনো যদি বা কাজ করবার সারা দিনের ভালো লোক কালে-ভদ্রে পাওয়া যায়, আর সাত বছর পরে তাও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কিংবা এত মাইনে দিতে হবে যে সে না পাওয়ারই সমান হবে। কাজেই রাঁধাবাড়া জিনিসটাকে সহজ, নির্ঝঞ্ঝাট, একটা আনন্দের ব্যাপার করে তুলতেই হবে। . . .আমাদের অভিপ্রায় কোনো একবেলার রান্না দু ঘণ্টার বেশি সময় নেবে না। প্রণালী সহজ করতে হবে, পদ কমাতে হবে।"[৬৩] তা ছাড়া অপচয় একদম চলবে না। "কারো বাড়িতে এক দানা ভাত কি এক চামচ রান্না জিনিস নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। বাড়তি-পড়তি দিয়ে কতরকম ভালো রান্না করা যায়।"[৬৪]

মোটকথা হল পরিবারে রান্নার কাজের দায়িত্ব গৃহিণীকেই নিতে হবে। এ বিষয়ে দাসদাসীদের উপর নির্ভর না করাই ভালো, কিন্তু যদি দাসদাসী থাকে তাহলে তাদের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। দাসদাসীদের কারণে সংসারে শান্তি নষ্ট হতে পারে, বিশৃঙ্খলাও দেখা দিতে পারে। তা ছাড়া স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা এইসব ব্যাপারেও দাসদাসীদের উপর নজর রাখতে হবে। না হলে শুধু পরিবারের শান্তিহানি নয়, স্বাস্থ্যহানিরও সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। পাচক হয়তো সাধারণ ডাল ভাত রান্না করে দিতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিকর রান্নার ব্যাপারে তার কোনো জ্ঞান নেই। আবার ভাল রান্না সম্বন্ধেও, যেমন প্রজ্ঞাসুন্দরী বলেছেন, তাদের বিশেষ 'আক্কেল' দেখা যায় না। "তাহারা ভাবে, রোস্ট, চপ কি কারি রাঁধিতে হইলেই বুঝি যত বেশি বেশি গরম মশলা ঝাল মশলা প্রয়োগ করা আবশ্যক।"[৬৫] বস্তুত এই 'আক্কেলের' অভাবেই তারা যথোপযোগী রান্না করতে ব্যর্থ হয়। এই হল আধুনিক পরিবার পরিচালনার সমস্যা।

৪

পরিবারের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রবেশ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম হল রান্নার বই। আগেই বলেছি বিপ্রদাস, প্রজ্ঞাসুন্দরী, বৈষ্ণবচরণ এঁরা সকলেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যকর আহার, পরিস্রুত জল, ভেজাল দ্রব্য পরিহার ইত্যাদির কথা বলে গেছেন। বিপ্রদাস, বৈষ্ণবচরণ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের গুণাবলীর কথাও আলোচনা করেছেন। এই গুণাবলী অবশ্য আলোচিত হয়েছে আয়ুর্বেদ মতে। যেমন কোন্ কোন্ বস্তু পিত্তনাশক, বমন-নিবারক, বায়ুনাশক, বলবৃদ্ধিকারক, অগ্নিউদ্দীপক, বীর্যকারক, পুষ্টিকর, কামবৃদ্ধিকারক ইত্যাদি। বৈষ্ণবচরণ আবার কোন্ তিথিতে কোন্ কোন্ দ্রব্য আহার করা নিষিদ্ধ তারও তালিকা করে দিয়েছেন। বিপ্রদাস রোগ বিশেষে কোন্‌টি পথ্য হিসেবে গণ্য হবে আর

কোন্‌টি কুপথ্য তারও তালিকা দিয়েছেন। যেমন কৃমিরোগে পথ্য হল : স্রোতের জল, মুগের ডাল, পটোল, থোড়, মোচা, উচ্ছে, করলা, পলতা, নিমপাতা, নালিতাপাতা, আনারস ইত্যাদি। কুপথ্য হল, পাকাকলা, তীব্র মিষ্ট, পচা ফল। তাঁর *মিষ্টান্নপাক* গ্রন্থেও বিপ্রদাস আয়ুর্বেদ মতে দুধ, মাখন, ঘৃত, প্রভৃতির গুণাবলী আলোচনা করেছেন। বিপ্রদাস 'স্বাস্থ্য' প্রভৃতি পত্রিকার পাঠক ছিলেন, এবং এই পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহারও করেছেন, তাই একদিকে যেমন পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা ও স্বাস্থ্যবিধির প্রভাব তাঁর লেখায় পাওয়া যায়, সেইরকম দেশীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞানও তিনি ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি।

বৈষ্ণবচরণ কোন্‌ আহার গুরুপাক আর কোন্‌টি লঘুপাক, এবং কোন্‌টি পরিপাক হতে কত সময় লাগে ঘণ্টা মিনিট ধরে তার তালিকা দিয়েছেন। যেমন, ভাজামুগের ডাল ২ঘণ্টা ২৪মি., বাঁধাকপি ৩ঘণ্টা ২৪মি., পোলাও ৫ঘণ্টা ১২মি. ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে যে উনিশ শতক থেকেই কোন্‌ ধরনের খাদ্যদ্রব্য ও আহার জাতীয় স্বাস্থ্যের উপযোগী, সাহেবি খানা ভালো না দেশীয় খানা, কোন্‌ ধরনের আহার দেশীয় জল, হাওয়ার অনুকূল আর কোন্‌টাই বা প্রতিকূল, এইসব বিষয়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য মত যেমন আলোচিত হয়েছে, দেশীয় মতও বাদ যায়নি। অনেকে এই দুই মতের এক সামঞ্জস্য বিধানেরও চেষ্টা করেছেন। প্রথম যুগের রান্নার বইয়ে এই সামঞ্জস্য বিধানের একটা ছবি পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান আরও প্রবলভাবে এসে পড়ে আরও কিছুদিন পরে প্রকাশিত নীহারমালা দেবী প্রণীত *আদর্শ রন্ধন শিক্ষা*[৬৬] বইটিতে, যার ভূমিকা লিখেছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। কেন এই বই লিখতে হল এই প্রশ্নের উত্তরে লেখিকা তাঁর নিবেদনে লেখেন : "বাজারে রন্ধন সম্বন্ধে পুস্তকের অভাব নাই। ঘরে ঘরেও রন্ধননিপুণা গৃহিণীর অভাব নাই। তবে এই পুস্তকের উৎপত্তি কেন? এ প্রশ্ন হইতে পারে। আমি বলি সে সকল বই অসম্পূর্ণ ও পুরাতন ধরণের। আর অধিকাংশ গৃহিণীই 'রন্ধনে স্বাস্থ্যতত্ত্বের প্রভাব' অথবা 'রন্ধনের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী' সম্বন্ধীয় জ্ঞানে অপটু। কাজেই এই বিজ্ঞানের যুগের ঠিক উপযোগী করিয়া এই বইখানি গড়িয়া তোলা হইয়াছে।"[৬৭] ভূমিকায় বিধানচন্দ্রও লিখেছেন যে "খাদ্যদ্রব্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হইলে তাহা আমাদের কতদূর হৃদ্য ও হিতকারী হইতে পারে ইহা আমরা সম্যক উপলব্ধি করি না।" বইটি সেই জাতীয় অভাব পূর্ণ করবে। এই বইয়ে প্রথমেই লেখিকা বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাটস, সল্টস এবং প্রোটিনের বিবরণ দিয়ে লিখেছেন : "এইগুলি জানিলে এবং গৃহিণীরা এই অনুসারে ভোজ্যতালিকা ঠিক করিলে সকল দিক দিয়াই সুফল লাভ করা যাইবে।"[৬৮] দৈনন্দিন রান্নায় কীভাবে এই জ্ঞান প্রচলিত করা যায় সেই আলোচনা করতে গিয়ে নীহারমালা ভিটামিনের জন্য আছাঁটা চাল, ভাতের ফেন, প্রোটিনের

জন্য বিভিন্ন রকমের ডাল, এ ছাড়া দৈনন্দিন স্বাস্থ্যকর আহারের জন্য রুটি, শাকসবজি, ফলমূলের স্যালাড ইত্যাদির কথা বলেছেন। ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র রায়ের *স্বাস্থ্যধর্ম গীতা* থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করে বলেছেন গৃহিণীদের এই কয় লাইন মুখস্থ থাকলে অনেক উপকার হবে। লাইনগুলি হল :[৬৯]

খাবে ঋতু অনুযায়ী, না হবে মাংসাশী
বসন্তে, বর্ষায়, গ্রীষ্মে খাবে না বাসি।
কাঁচা ডিম, সদ্যোমৃত মৎস্য পরিমিত,
খাইলে না হয় কভু দেহের অহিত।
টাটকা দুধ, শাক-সব্জী, পক্কফল খাবে;
ভাজা-ভুজী, কলে ছাঁটা চাউল এড়াবে।
ঢেঁকী ছাঁটা লাল চাল খাইবে প্রচুর;
স্ফীতি স্নাত, রক্তাল্পতা তাহে হবে দূর।
সফেন অন্নের ভোগে বল বাড়ে ঠিক,
সিদ্ধ হতে আতপের পুষ্টি সমধিক॥

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রন্ধনশিক্ষা বলতে নীহারমালা শুধুমাত্র রন্ধনপ্রণালী শিক্ষা দেবার কথা বোঝাননি, একই সঙ্গে দৈনন্দিন রন্ধনপদ্ধতিতে কীভাবে শৃঙ্খলা আনা যায় সে কথাও আলোচনা করেছেন। রন্ধন সম্বন্ধে শৃঙ্খলার সঙ্গে নীহারমালা যুক্ত করেছেন নিয়মানুবর্তিতার কথা। "রন্ধন বিষয়েও যদি আমরা একটা কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম অনুসরণ করি সঙ্গে সঙ্গে যেমন সুশৃঙ্খলাও আসে, মিতব্যয়িতাও সেইরূপ ইহার অনুসরণ করে। সেই জন্য যদি মেয়েরা কোন একটা নির্দিষ্ট ফর্দ ধরিয়া রাঁধেন তবে তাহার মধ্যে আর গোলমাল কিছু থাকিতে পায় না, অথচ সমস্ত জিনিসটা খুব সোজাসুজি হইয়া আসে। অন্যান্য দেশে অনেক সময়ই গৃহিণীরা এই উপায় অবলম্বন করিয়া অনেক সুবিধা উপভোগ করেন।"[৭০] এইজন্য নীহারমালা গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও বসন্ত এই চার ঋতুর জন্য সপ্তাহের সাতদিনের সকাল ও সন্ধ্যার একটা নমুনা মেনু প্রস্তুত করে দিয়েছেন। যেমন গ্রীষ্মকালে সোমবার সকালে কলাই ডাল, পটল চচ্চড়ি, মাছের ঝাল, অম্বল—সন্ধ্যায়, কুমড়ার ডালনা, পটলের দোর্মা, ছোলার ডাল চাট্‌নি। মঙ্গলবার সকালে অম্লডাল, সুক্তনি, মাছের ঝাল, আমড়ার অম্বল, ভাজা—সন্ধ্যায় ইঁচড়ের ডালনা, চচ্চড়ি, পটল ভাজা, আমের চাট্‌নি। এইভাবে প্রতিটি ঋতুর সাতদিনের সকাল সন্ধ্যার একটা চার্ট করে দিয়েছেন। বলেছেন এইভাবে নিয়ম করে মেনু তৈরি করে রাখলে, একজন গৃহিণী সবদিক বজায় রেখে চলতে পারবেন, এবং একাই সংসারের দায়িত্ব বহন করতে পারবেন। অন্যদিকে এর সাহায্যে পরিবারে সুষম, সামঞ্জস্যপূর্ণ, স্বাস্থ্যকর আহারেরও ব্যবস্থা হবে।

পরিবারের স্বাস্থ্যকে কেন্দ্র করে খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞানের বিস্তারিত তথ্য আয়ত্ত করা এবং তা মনে রেখে রান্নার ব্যবস্থা করা গৃহিণীদের পরিবার পরিচালনার এক স্বাভাবিক অঙ্গ

হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। পরিবার পরিচালনায় বিশেষজ্ঞদের ক্রমপ্রভাবশালী ভূমিকার একটি পরিচয়ও এই নতুন নতুন বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্তি থেকে পাওয়া যায়। রান্নার বইগুলির লেখক-লেখিকারা তাঁদের বই লিখেছেন বিশেষজ্ঞ হিসেবেই, কিন্তু এই বিশেষজ্ঞ পরামর্শের পরিধি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর রূপ পেতে থাকে। কিছু জ্ঞান আবার একরকম নিঃশব্দেই বাতিলের পর্যায়ে চলে যায়। পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত সুলেখা সরকারের *রান্নার বই*-এ[৭১] অত্যন্ত বিশদ আলোচনা আছে ভিটামিন, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, মিনেরাল, সল্টস, ক্যালরি ইত্যাদির। কোন্ ভিটামিনের অভাবে কী রোগ হয়, শিশু ও বাড়ন্ত ছেলের পক্ষে কোন্ ভিটামিন প্রয়োজনীয়, অন্তঃসত্ত্বা নারীর জন্যই বা কোন্ ভিটামিন প্রয়োজনীয়, এইসব কথা যেমন সুলেখা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, সেইরকম ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস্, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, আয়োডিন প্রভৃতি খনিজ লবণের উপকারিতা, কোন্ শাকসবজি ও খাদ্যদ্রব্যে এইগুলি পাওয়া যায় তারও বিবরণ দিয়েছেন। শরীরের আবশ্যকীয় ক্যালরির মাপ, বিভিন্ন বয়সের স্ত্রী ও পুরুষের কত ক্যালরি প্রয়োজন, আমাদের সাধারণ খাদ্যে কত পরিমাণ ক্যালরি থাকে—এইসব তথ্যও জানিয়ে দিয়েছেন। পুরোনো রান্নার বইয়ে যেমন খাদ্যদ্রব্যের গুণাবলী দেওয়া থাকত, সুলেখাও তা দিয়েছেন কিন্তু এখন এই গুণাবলী আধুনিক বিজ্ঞানে সজ্জিত।

খাদ্যদ্রব্যের গুণাবলীর আলোচনায় আলুর গুণ সম্বন্ধে বিপ্রদাস লিখেছেন : রক্ত-পিত্তনাশক, গুরু, স্বাদু, বলকর, স্তন্যদুগ্ধ ও শুক্রবৃদ্ধিকর। সুলেখা বলেছেন, আলুর বারো আনা ভাগ জল হলেও বাকি অংশে লবণ, পটাশ, স্টার্চ, চিনি ও কিছু পরিমাণ ভিটামিন 'বি' আছে। সাধারণ আলুতে ২০ ভাগ শ্বেতসার, ২ ভাগ প্রোটিন, সেলুলোজ ও লবণ জাতীয় পদার্থ থাকে। পেঁয়াজ সম্বন্ধে বিপ্রদাস লিখেছেন : কটু, বলবীর্যকারক, ত্রিদোষনাশক, গুরু, স্বাদু। সুলেখার মত হল : এতে কতকটা ভিটামিন 'বি' ও 'সি', লৌহঘটিত লবণ ও যথেষ্ট গন্ধক থাকে। রান্না করার সময় এইসব দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে শুধুমাত্র অবহিত থাকলেই চলবে না, রান্না করার ফলে এই গুণাবলী যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, সেই খেয়ালও রাখতে হবে। সুস্থ ও অসুস্থ শরীরের জন্য উপযুক্ত খাদ্য কী হবে, আমাদের দৈনন্দিন আহারের মধ্যে বিজ্ঞান-অনুমোদিত এই জ্ঞান আরও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয় সরলরঞ্জন দাশগুপ্তর লেখা *খাদ্য— সুস্থ ও অসুস্থ শরীরে*[৭২] বইটিতে।

আজকের দিনে রান্নাবান্নায় এইসব জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও সব ভিটামিন সম্পর্কে তথ্য, যেমন, ভিটামিন বি-১ বা থায়মিন, বি-২ বা রাইবোফ্লেভিন, বি-৬ বা পাইরিডিক্সিন, নিয়াসিন, কোন্‌টা স্যাচুরেটেড ফ্যাট, কোন্ ফ্যাট গ্রহণে কোলেস্টেরল মাত্রা বেড়ে যায়, এবং কোন্ তেল খাওয়া উচিত, দৈনন্দিন রান্নায় তেলের পরিমাণই বা কত হবে, এইসব নানা তথ্য। ফলে দৈনন্দিন রান্নার নিয়মকানুন সম্পূর্ণভাবেই বিশেষজ্ঞর নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। পারিবারিক জীবন পরিচালনায় বিশেষজ্ঞদের সহযোগী হলেন পরিবারের নারীরা, এঁদের মাধ্যমেই বিশেষজ্ঞরা পারিবারিক শিক্ষার দায়িত্ব পালন

করেন। বিভিন্ন মাধ্যমে এই জ্ঞান ও তথ্যের পুনরাবৃত্তি ও প্রসারের ফলে এইগুলি এক সাধারণ জ্ঞানে পরিণত হয়, পরিবারের ধারণা একরকম সমজাতীয়তা, সমরূপতা অর্জন করে।

৫

আধুনিক পরিবারের ধারণার কেন্দ্রে আছে শিশু। বস্তুত লালনপালন, চরিত্রগঠন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা এ হল আধুনিক পরিবার পরিচালনার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জননীর উপর। এর মধ্যে আবার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সন্তানের আহার; কারণ শরীর বলশালী না হলে চরিত্র, বুদ্ধি কোনো কিছুই বিকশিত হবে না। এ বিষয়ে জননীর কর্তব্য শুধুমাত্র আহারের প্রয়োজনীয়তা, বা খাদ্যদ্রব্যের দোষ-গুণ জানাতেই শেষ হয় না, তাঁকে জানতে হবে উপযুক্ত বা নির্বাচিত খাদ্য দৈনিক কতবার, কী পরিমাণে এবং কী নিয়মে আহার করলে স্বাস্থ্যরক্ষা হতে পারে সেই সবও। আগেই বলেছি বিপ্রদাস আমাদের পরিবারে শিশু ও বালকবালিকাদের আহারের যে ব্যবস্থা আছে তার সমালোচনা করেছিলেন। বলেছিলেন এ ব্যাপারে অনেক বেশি পরিকল্পনার প্রয়োজন। সকলেই বলেছেন শিশুদের বাজারের ভেজাল খাবার খাওয়া থেকে নিরস্ত করতে হবে। বরং বাড়িতে তাদের জন্য নানাবিধ স্বাস্থ্যকর ও মুখরোচক রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে।

এ বিষয়ে রান্নার বই-এর লেখক-লেখিকাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে বালকবালিকাদের টিফিন। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বাজারের খাবার কিনে খেতে উৎসাহ দেওয়া উচিত নয়, আবার নিত্যনৈমিত্তিক তাদের জন্য নতুন নতুন স্বাস্থ্যকর আহার তৈরি করে দেবার হদিশও সাধারণ রান্নার বইয়ে থাকে না। এই কারণেই বীণাপাণি দেবী *ছেলেদের টিফিন*[৭৩] বইটি লেখেন। সম্প্রতিকালে সাধনা মুখোপাধ্যায় লিখেছেন *বাচ্চাদের টিফিন*।[৭৪] এ হল রান্নার বইয়ের এক স্পেশালাইজেশন। রান্নার আলাদা আলাদা বিষয় নিয়ে আলাদা বই লেখার দৃষ্টান্ত আগেও ছিল। বিপ্রদাস *মিষ্টান্ন পাক* লিখেছিলেন, প্রজ্ঞাসুন্দরী লিখেছিলেন *জারক* কিন্তু এগুলি ছিল বিশেষ ধরনের খাবারের জন্য আলাদা বই। আর বাচ্চাদের টিফিন বিষয়ক বইগুলি হল বিশেষ সমস্যা, পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের মোকাবিলা করার জন্য লেখা বই।

সাধনা মুখোপাধ্যায়ের *বাচ্চাদের টিফিন* বইটির পরিচয় দিতে গিয়ে লেখা হয়েছে : "সত্যি তো কী টিফিন দেওয়া যায় বাচ্চাদের। এখনকার সতর্ক, দায়িত্বসচেতন মা মাত্রেই জানেন, এ এক প্রাত্যহিক সমস্যা। আগেকার মতো পয়সা দিয়ে দায়িত্ব এড়ানো শক্ত। অনেক স্কুলেই রাস্তার খাবার বারণ। একঘেয়ে টিফিন পাঠালেও নাকি মায়েদের বকে দেন আন্টিরা। ভুল করেন না। বাইরের খাবারে অসুখের ভয়, একঘেয়ে খাবারে অরুচির। সমস্যাটা তাই গভীর হয়ে ওঠে। কী সেই খাবার, যা রুচিকর হয়েও পুষ্টিকর; যাতে বৈচিত্র্য আনা যাবে, আবার সাত-সকালে বানানোও হবে না ঝামেলার?" সে-

রকম খাবার যে কত ধরনের, সে-কথাই তাঁর এই দারুণ প্রয়োজনীয় বইতে জানিয়েছেন সাধনা মুখোপাধ্যায়, এ-যুগের গৃহিণীদের যিনি কিনা মুশকিল আসান। আড়াইশোর বেশি 'বাচ্চাদের টিফিন' শিখিয়েছেন তিনি এখানে যা পুষ্টিকর, মুখরোচক এবং বহুলাংশেই চটজলদি। দিয়েছেন বহু বাস্তবসম্মত পরামর্শ। "এইসব টিফিন শুধু বাড়ন্ত বাচ্চার মুখেই যে ফোটাবে পুষ্টি আর তৃপ্তির ছাপ, তা নয়, বড়দের জিভেও আনবে জল।"

বাচ্চাদের টিফিন পুষ্টিকর ও মুখরোচক দুই-ই হতে হবে, এও দেখতে হবে যাতে পেটও ভরে। আজকের দিনে কর্মব্যস্ত মায়েরা সকালে তাড়াহুড়োর সময় নানারকম টিফিন তৈরি করার সময় পান না, তাই এমন টিফিন তৈরি করতে হবে যা তৈরি করায় বেশি হাঙ্গামা নেই। সাধনা মুখোপাধ্যায়-এর তালিকায় আছে রংবেরঙের স্যান্ডউইচ, ঘুঘনি নানা স্বাদের, আলুর রকমারি, চিজ, চাইনিজ, সবকিছুই। শুধু রান্নার পদ্ধতিই বাতলে দেননি, সেই রান্না টিফিনে দিলে কী ফলাফল হবে তাও বলে দিয়েছেন। বোধহয় মায়েদের উৎসাহিত করার জন্যই। ঘুঘনি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমে সাবধান করে দিয়েছেন যে এটা টিফিনে পরিবেশন করতে গেলে টিফিনের কৌটো স্টেনলেস স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম বা প্লাস্টিকের হওয়া চাই যাতে তেঁতুলের টক দ্বারা কোনোরকমভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া না হয়, ঘুঘনি মাখা মাখা হতে হবে, যাতে টিফিনের কৌটো থেকে ঝোল গড়িয়ে পড়ে বইপত্র না নষ্ট করে দেয়। এইসব শর্ত মেনে মায়েরা যদি সাদা মটরের চটপটা একদিন তৈরি করে দেন, তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন বাচ্চা স্কুল থেকে এসে বলবে, 'মা এরকম টিফিন রোজ রোজ তৈরি করে দিও, আর একটু বেশি করে দিও, বন্ধুরা সব কেড়ে নেয়।' যদি বাচ্চাকে টিফিনে মটন চপ দেওয়া হয়, তাহলে সে এমন খুশি হবে যে বন্ধুদের ডেকে বলবে 'জানিস মা কি টিফিন দিয়েছে আজ— এক্কেবারে মটন চপ— লুচি নয়।'[৭৫]

খেয়াল করলে দেখা যাবে যে বাচ্চাদের টিফিনের জন্য যেসব রান্না দেওয়া হয়েছে সেগুলি যে নতুন নতুন পদ তা নয়। এইসব রান্নাই অন্যান্য রান্নার বইতেও আছে। সাধনা টিফিনের উপযোগী রান্নাগুলি নির্বাচন করে, সেগুলিকেই কিছুটা সহজ সরল প্রণালীতে রূপান্তরিত করেছেন। আজকের দিনে বিশেষ প্রয়োজন বা পরিস্থিতির দাবি মেটাবার জন্য নতুন যে রান্নার বইয়ের চাহিদা দেখা যাচ্ছে, এই ধরনের বইগুলি তারই একটু ইঙ্গিত দেয়। বিপ্রদাসের *পাক-প্রণালী*-তে প্রায় আটশোর বেশি পদ রয়েছে, প্রজ্ঞাসুন্দরীর *আমিষ ও নিরামিষ* আহার বইটির দুই খণ্ডে রয়েছে প্রায় দু-হাজার পদ। এই ধরনের এনসাইক্লোপিডিক রান্নার বই থেকে এইসব পরিস্থিতির জন্য রান্না খুঁজে পাওয়া সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। বীণাপাণি দেবী যিনি প্রথম *ছেলেদের টিফিন* বইটি লিখেছিলেন, তাঁর অন্য বইটি ছিল *মেয়েদের পিকনিক*।[৭৬] বস্তুত পরিবারের খরচ, সময় ও পরিশ্রমের সদ্ব্যবহার করার জন্যই এই বইগুলি। ভবিষ্যতে বিশেষ বিশেষ পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য রচিত আলাদা আলাদা রান্নার বই হয়তো আরও বেশি আমরা দেখতে পাব।

৬

রান্নার বইয়ের কথা শেষ হয় না যদি না বলা হয় এইসব বই কত বিচিত্র আহার, রন্ধনপ্রণালী, রসনাতৃপ্তির উপায় আমাদের সামনে এনে হাজির করে। রান্না ও আহার যেমন একটি দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অঙ্গস্বরূপ, সেইরকম পারিবারিক ইতিহাসের উপাদানও বটে। বস্তুত সমাজে পরিবারের ধারণা গঠিত ও শক্তিশালী হয় কিছুটা এই রান্নার বইয়ের প্রভাবেও। আবার সমাজে রুচি পরিবর্তনের আভাস দেয় এই রান্নার বইগুলি। সময়ে দেশবিদেশের নতুন নতুন রান্না যেমন রান্নার বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেইরকম পুরোনো দিনের জমকালো, কেতাদুরস্ত রান্না আবার বাদও গেছে।

বিপ্রদাসের *পাক-প্রণালী*-তে যেমন সুক্তো, ডাল, খিচুড়ি, পোড়া, ভাজা, ছেঁচকি, ভাতে রয়েছে, সেইরকমই আছে বেলফুল, জুঁইফুল, চামেলির পোলাও, নূরমহলি জেরবিরিয়ান, তপসে মাছের ইহুদি লবাদান, পর্তুগিজ ভিন্ডালু, মেষ বা হরিণ মাংসের এসক্যালাপ, কাবাব প্রভৃতি পদও। প্রজ্ঞাসুন্দরীর বিশাল বইয়েও বাঙালির দৈনন্দিন রান্নার পদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনেক ফরাসি রান্নার পদও। এর মধ্যে যেমন অয়েস্টারের পদও আছে তেমনি আছে উফ আঁ সাঁস, উফ এ শঁপিন, উফ আলা নিজ, ক্রেপডা পোয়ার্সঁ, ফঁ ডার্টি শো, ফ্লাঁ স জেলে ডে পোয়ার্সঁ, বিভিন্ন ধরনের কক্‌টেল, পাঞ্চ, ক্লারেট কাপ, বার্গেন্ডি কাপ প্রভৃতি। এইসব রান্নার নাম দেখে প্রজ্ঞাসুন্দরীকে একজন পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন লেখিকা ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। অসংখ্য দেশি নিরামিষ রান্না তাঁর বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করে দেশের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের একটা প্রয়াসও তাঁর বইয়ে দেখা যায়। ক্ষীরোদচন্দ্র 'মুখবন্ধে' নিরামিষ আহারের এই সপ্তশতী ব্যবস্থার উল্লেখ করে বলেছেন : "নিরামিষের এ বিচিত্রতা শিক্ষা করিতে পাশ্চাত্য জাতিকে এখনও শত শত বর্ষ অতিবাহিত করিতে হইবে।"[৭৭] বৈষ্ণবচরণ তাঁর বইয়ে বিশুদ্ধ হিন্দুমতে রান্নার উপর জোর দিলেও ইটালিয়ান মাংস গোলক, বা হায়দ্রাবাদি কালিয়ার কথা বলতে ভুলে যান নি। পরবর্তী সময়েও পারিবারিক প্রয়োজনেই রান্নার বইগুলি ব্যবহৃত হবে এই কথা ভেবেই সাধারণ ও সৌখিন দু-রকম রান্নারই সমাবেশ করা হয়েছে, তবে অনেক বেশি মেয়েরা এইসব বই লেখার কাজে এগিয়ে এসেছেন। এঁদের মধ্যে সুলেখা সরকার ও বীণাপাণি দেবীর কথা তো আগেই বলেছি, এ ছাড়া ছিলেন বীণাপাণি মিত্র, *রন্ধন সংকেত* (১৩৬২),[৭৮] বেলা দে, *রান্নাবান্না* (১৩৬৭), *সর্বভারতীয় রান্না ও জলখাবার* (১৩৭১),[৭৯] সুষমা সরকার, *রন্ধন শিক্ষা* (১৩৬৪),[৮০] তনুজা দেবী, *পাঁচ মিশালি*[৮১] (১৩৫৬) এবং ছবি মুখোপাধ্যায়। ছবি মুখোপাধ্যায় যখন তাঁর *চাইনিজ রান্না ও দেশ বিদেশের জলখাবার*[৮২] (১৩৮১) বইটি লেখেন তখনও পাড়ায় পাড়ায় চাইনিজ রান্নার কটেজ ইন্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠেনি, রান্নার বইতেও চাইনিজ রান্না থাকত না। তাঁর অন্য বইটি হল, *বিলিতি ও ফ্রেঞ্চ রান্নার গাইড*[৮৩] (১৩৮২)। সম্প্রতি কালে সাধনা মুখোপাধ্যায় তাঁর *রান্না করে দেখুন* (১৯৭৭) বইটিতে বাহুল্যবোধে বাঙালি রান্না বাদ দিয়ে বরং

অন্যান্য রাজ্যের নানা ধরনের, নানা স্বাদের রান্না দিয়েছেন।

ক্রমপ্রসারমান বাঙালি রুচির একটা ইঙ্গিত নিশ্চয়ই এই বইগুলি থেকে পাওয়া যাবে। প্রশ্ন হল রান্নার বইয়ে এই যে শ-এ শ-এ রান্না দেওয়া থাকে সত্যি কি সকলে এইসব রান্না বই পড়ে যাচাই করেন। উত্তর অবশ্যই নেতিবাচক হবে। আসলে রান্নার বইয়ের ব্যবহার অনেকটা অভিধান ব্যবহারের মতো। অভিধানে অনেক শব্দ আছে যার অর্থ আমাদের জানা, যে শব্দের অর্থ অজানা, যে শব্দের অর্থ নিয়ে সন্দেহ আছে, সে অর্থ দেখার জন্যই অভিধান খুলতে হয়। রান্নার বই যিনি ব্যবহার করেন তিনিও মোটামুটি তাই করেন। কিন্তু এমন মানুষ বোধহয় কেউই নেই যিনি প্রথম থেকে শেষ অবধি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অভিধান পড়েছেন, সেইরকম বই পড়ে প্রথম থেকে শেষ অবধি সব রান্না করেছেন এমন মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বস্তুত রান্নার বই সেইজন্য লেখাও হয় না। লেখা হয় প্রয়োজনে যদি কারো কোনো রান্না করার দরকার হয়, রান্নার বই যেন তাকে হতাশ না করে, এই কথা ভেবে। বস্তুত প্রথম দিকে রান্নার বই লেখাও হয়েছে অনেকটা আভিধানিক রীতি অনুসরণ করেই, যেখানে অসংখ্য রান্না বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে সাজানো হয়েছে, যাতে কোনো একটি রান্না খুঁজে পেতে অসুবিধা না হয়।

শুধু হাতেকলমে রান্না করে দেখা ছাড়াও রান্নার বইয়ের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। সেটা হল রান্নার বৈচিত্র্য ও প্রকরণ সম্পর্কে সচেতন করা। একটি গ্রন্থাগার যেমন মানুষকে জানিয়ে দেয় পৃথিবীতে কত রকমের বই আছে, রান্নার বইও জানায় রসনা পরিতৃপ্তির কত বিভিন্ন উপায় রয়েছে। বৈচিত্র্য সম্পর্কে এই জ্ঞানই আবার এক সুখী পারিবারিক জীবন গড়ে তোলে। পাকবোধ ও স্বাদজ্ঞান এই দুই-এর বিকাশই এক পরিশীলিত, রুচিসম্মত জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজন, এ হল নতুন পরিবারের ধারণার এক অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের সমাজে পারিবারিক মানমর্যাদাও অনেকটা নির্ভর করে সেই পরিবারের রসনাবোধ কতটা পরিশীলিত, সেই পরিবারের রান্নার উৎকর্ষও বা কতটা, এই সবকিছুর উপর। একসময় এই বোধ ও জ্ঞান মানুষ পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রেই অর্জন করত, আজকে রান্নার বই সেই কাজটি করে দেয়। এই কারণেই বোধ হয় আজকের দিনে *ঠাকুরবাড়ির রান্না*[৮৪] নামে বই ছাপা হয়, যে নাম ইঙ্গিত দেয় এমন সব পদ-সংগ্রহের যা রান্না হত কলকাতার এক ধনী, সংস্কৃতিমনস্ক পরিবারে। এটা অবশ্য আলাদা কথা যে বইটিতে আছে সেই কুমড়ো ছেঁচকি, বেগুনপোস্ত, মাছের ঝোল। কিন্তু 'ঠাকুরবাড়ির রান্না' নামকরণের পিছনে যে চিন্তা কাজ করছে সেইটি এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ইঙ্গিতবাহী। তাই আজকের দিনে আবার বর্তমান যুগের উপযোগী করে *পাকরাজেশ্বর* বা *ব্যঞ্জন রত্নাকর* প্রকাশিত হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বস্তুত তখনই বৃত্তটি সম্পূর্ণ হবে। আসলে যে শিল্প বা জ্ঞান এক সীমিত গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, রান্নার বই সেটারই গণতন্ত্রীকরণ করে দেয়। বাঙালি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের অন্তরঙ্গ আলোচনার

প্রিয় বিষয়, কোন্ পরিবারে কত বিচিত্র পদ রান্না হয়, কে কত বড়ো রান্নার সমঝদার, কোন্ গৃহিণী কত বড়ো রন্ধনপটীয়সী, কে কত বিচিত্র পদ খেয়েছে, কার রসনা কত পরিশীলিত এবং এর মাধ্যমে পরস্পরের পারিবারিক কৌলীন্য প্রতিষ্ঠার যে প্রয়াস দেখা যায়, তার মধ্যে তাই আজকে কে সাচ্চা আর কে ঝুটা—এটা আজ আর বোঝার উপায় নেই। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাংলা রান্নার বইয়ের মূল গঠনের আজও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। আজও শুরু হয় রান্নাঘর, বাসনপত্র সাজসরঞ্জাম দিয়ে, তার পর বিবিধ ব্যঞ্জন প্রকরণ, পথ্য প্রস্তুতপ্রণালী, বাড়িতে নিমন্ত্রিত অতিথিকে খাওয়ানো, খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে উপদেশ, গৃহিণীপনার খুঁটিনাটি। কেন পরিবর্তন হয়নি তার সহজ উত্তর হল যে-পরিবারের ধারণার আধারে এই বইগুলি লেখা হয়েছিল, তার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

উল্লেখপঞ্জি

১. ভূদেব মুখোপাধ্যায়. *পারিবারিক প্রবন্ধ*, চুঁচুড়া, বুধোদয় যন্ত্রে, ১৩১৮, পৃ. ১৯৩।
২. প্রদীপ বসু, 'অন্তরঙ্গ পরিবার বহিরঙ্গ সমাজ', *অনুষ্টুপ,* ২৮(১), ১৯৯৩।
৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, *গৃহধর্ম্ম,* কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৮৮১, পৃ. ৬-৭।
৪. বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, *পাক-প্রণালী,* কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৩৪০ (প্রথম সংস্করণ : ১৮৮৫-১৯০২)।
৫ গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, *পাকরাজেশ্বর*। অর্থাৎ নানাবিধ পাকব্যবস্থা ও সংস্কৃত জীর্ণমঞ্জরী তদর্থসহ গৌড়ীয় ভাষায় সংকলিত। বর্দ্ধমানাধীশ্বর হিজ হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাবচন্দ্ বাহাদুরের আদেশানুসারে। দ্বিতীয় বার মুদ্রিত। শকাব্দ : ১৮০১ বাং ১২৮৬। কলিকাতা মীর্জাপুর কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত।
৬. *ব্যঞ্জন রত্নাকর*। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহ্‌তাবচন্দ্ বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে ও ব্যয় দ্বারা। মুনসি শ্রী মহম্মদী, শ্রী গোলাম রব্বানী ও শ্রী তারিণীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রী নারায়ণ হাজরা কর্ত্তৃক নেয়ামৎ খান পুস্তক হইতে অনুবাদিত হইয়া। কলিকাতা। তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। শকাব্দ ১৭৮০ ইংরাজি ১৮৫৮, ২৬ শ্রাবণ।
৭. বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, *যুবক-যুবতী,* কলিকাতা, ভিক্টোরিয়া প্রেস, ১৮৯১।
৮. বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, *যুবতী-জীবন,* কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯২৪।
৯. বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, *যুবতী বা স্ত্রী-জীবনের আদর্শ,* কলিকাতা, নিস্তার প্রেস, ১৮৮৯।
১০. বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, *শুভ-বিবাহ-তত্ত্ব,* কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯০৮।
১১. বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, *সবজী-শিক্ষা,* তাহিরপুর, কৃষি কার্য্যালয়, ১৯০৬।
১২. বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, *অপঘাত-মৃত্যু-নিবারণ,* কলিকাতা, হরি প্রেস, ১৮৯৩।
১৩. বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, *দেদার-মজা,* কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরি, ১৯০৫।
১৪. বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, *পারিস-গুপ্ত-কাহিনী,* কলিকাতা, ভারত মিহির প্রেস, ১৮৯১।
১৫. বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, *মেয়েলি-ব্রতের ছড়া,* কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯০৬।

১৬. *পাক-প্রণালী,* পৃ. ২।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

১৮. বসন্তকুমার সামন্ত, *হিতকরী সভা : স্ত্রী শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৮৭, পৃ. ৫৯/৬২, ৬৬।

১৯. রেণুকা দেবী চৌধুরাণী, *রকমারি নিরামিষ রান্না,* কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৯৮৮।

২০. *পাক-প্রণালী,* পৃ. ৬।

২১. প্রাগুক্ত, 'বিজ্ঞাপন'।

২২. বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, *মিষ্টান্ন-পাক,* কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩০৪।

২৩. *পাক-প্রণালী,* পৃ. ৫২৭-৫২৮।

২৪. *মিষ্টান্ন-পাক,* পৃ. ২৮২।

২৬. প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, *আমিষ ও নিরামিষ আহার,* দুই খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৫ (প্রথম প্রকাশ ১৯০০)। প্রজ্ঞাসুন্দরীর অন্য বইটি হল, *জারক আচার ও চাটনি,* কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৫ (প্রথম প্রকাশ ১৯২৭)। পুষ্টি, পথ্য ও পাথেয়ের উপরও বই লেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু সেই বই প্রকাশিত হয়নি।

২৭. *আমিষ ও নিরামিষ আহার,* প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৭০।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ.২২।

২৯. *পাক-প্রণালী,* পৃ. ১১-১৪।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৩১. *আমিষ ও নিরামিষ আহার,* পৃ. ১৪।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৩৫. লীলা মজুমদার ও কমলা চট্টোপাধ্যায়, *রান্নার বই,* কলিকাতা, আনন্দ, ১৯৭৯, 'ভূমিকা'

৩৬. সাধনা মুখোপাধ্যায়, *রান্না করে দেখুন,* কলিকাতা, আনন্দ, ১৯৭৭, পৃ. ১।

৩৭. *রান্নার বই,* 'ভূমিকা'।

৩৮. প্রাগুক্ত, 'ভূমিকা'।

৩৯. *পাক-প্রণালী,* পৃ. ৩।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৪২. বৈষ্ণবচরণ বসাক, *সৌখীন পাকপ্রণালী,* কলিকাতা, সি সি বসাক এন্ড সন্স, (১০ম সংস্করণ) ১৯১৬, পৃ. ১৯।

৪৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাঃ), *শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী,* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৭, পৃ. ১২৪, ২২১।

৪৪. *শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী,* পৃ. ২২১।

৪৫. *পারিবারিক প্রবন্ধ,* পৃ. ১৯২।

৪৬. *সৌখীন পাকপ্রণালী*, পৃ. ২১।
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।
৫০. *পাক-প্রণালী*, পৃ. ৩।
৫১. *পারিবারিক প্রবন্ধ*, পৃ. ৬০-৬১।
৫২. *পাক-প্রণালী*, পৃ. ৪।
৫৩. *আমিষ ও নিরামিষ আহার*, পৃ. ৫৭।
৫৪. *গৃহধর্ম্ম*, পৃ. ৭৮-৭৯।
৫৫. *পারিবারিক প্রবন্ধ*, পৃ. ৬২।
৫৬. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, *স্ত্রীচরিত্র*, কলিকাতা, নববিধান পাব্লিকেশন কমিটী ১৮৯১, পৃ. ১০২।
৫৭. *শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী*, পৃ. ২২১।
৫৮. *পাক-প্রণালী*, পৃ. ৫।
৫৯. *সৌখীন পাকপ্রণালী*, পৃ. ১৯।
৬০. *আমিষ ও নিরামিষ আহার*, পৃ. ৫৭।
৬১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।
৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।
৬৩. *রান্নার বই*, 'ভূমিকা'।
৬৪. প্রাগুক্ত, 'ভূমিকা'।
৬৫. *আমিষ ও নিরামিষ আহার*, পৃ. ৫৯।
৬৬. নীহারমালা দেবী, *আদর্শ রন্ধন শিক্ষা*, কলিকাতা, নারী সাধনালয়, (২য় সংস্করণ) ১৯১৪।
৬৭. *আদর্শ রন্ধন শিক্ষা*, 'লেখিকার নিবেদন'।
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।
৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-৩৩।
৭১. সুলেখা সরকার, *রান্নার বই*, কলিকাতা, এম সি সরকার, ১৯৭০।
৭২. সরলরঞ্জন দাশগুপ্ত, *খাদ্য—সুস্থ ও অসুস্থ শরীরে*, কলিকাতা, সুনীলরঞ্জন দাশগুপ্ত, ১৯৬১।
৭৩. বীণাপাণি দেবী, *ছেলেদের টিফিন*, কলিকাতা, দাশগুপ্ত এণ্ড কো, (৩য় সংস্করণ) ১৯৫২।
৭৪. সাধনা মুখোপাধ্যায়, *বাচ্চাদের টিফিন*, কলকাতা, আনন্দ, ১৯৮৮।
৭৫. *বাচ্চাদের টিফিন*, পৃ. ৫০, ৮৩।
৭৬. বীণাপাণি দেবী., *মেয়েদের পিকনিক*, কলিকাতা, চক্রবর্তী চ্যাটার্জী, (৩য় সংস্করণ) ১৯৫৪।
৭৭. *আমিষ ও নিরামিষ আহার*, পৃ. ১৭।
৭৮. বীণাপাণি মিত্র, *রন্ধন সংকেত*, কলিকাতা, শরৎকুমার মিত্র, ১৯৫৫।

৭৯. বেলা দে, *রান্নাবান্না*, কলিকাতা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব, ১৩৬৭, *সর্বভারতীয় রান্না ও জলখাবার*, কলিকাতা, কলিকাতা পুস্তকালয়, ১৩৭১।

৮০. সুষমা সরকার, *রন্ধন শিক্ষা*, কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৬৪।

৮১. তনুজা দেবী, *পাঁচ মিশালি*, কলকাতা, ১৩৫৬।

৮২. ছবি মুখোপাধ্যায়, *চাইনিজ রান্না ও দেশবিদেশের জলখাবার*, কলিকাতা, বেঙ্গল পাব, ১৩৮১।

৮৩. ছবি মুখোপাধ্যায়, *বিলিতি ও ফ্রেঞ্চ রান্নার গাইড*, কলিকাতা, বেঙ্গল পাব, ১৩৮২।

৮৪. পূর্ণিমা ঠাকুর, *ঠাকুরবাড়ির রান্না*, কলকাতা, আনন্দ, ১৯৮৬।

ঔপনিবেশিক ভাষানীতি প্রসঙ্গে

মনসুর মুসা

'ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ' কথাটা ভাষাতত্ত্বে খুব বেশি প্রচলিত নেই। কারণ বোধ হয় এই যে, তাত্ত্বিক ভাষাতত্ত্বের আলোচনার আওতায় 'সাম্রাজ্যবাদ' ধারণাটি পড়ে না। একটিমাত্র ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের ধারণাটির সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারত, সেটা হচ্ছে ক্ষমতার্থতত্ত্বের ক্ষেত্র। ইংরেজিতে যাকে বলা যায় 'পাওযার সেমান্‌টিক্‌স্‌' তাকে আমরা বাংলায় ক্ষমাতার্থতত্ত্ব বলতে চাই। ক্ষমতার্থতত্ত্ব পাশ্চাত্যের ভাষাতত্ত্বের তাত্ত্বিক আলোচনায় অত্যন্ত নগণ্য স্থান অধিকার করে আছে। ক্ষমতা এবং সংহতির সর্বনামের আলোচনা প্রসঙ্গেই ক্ষমতার্থতত্ত্বটির বিকাশ লক্ষ করা যায়। জাপানি সৌজন্যবাচক ভাষা ব্যবহারের আলোচনায়ও তত্ত্বটির যৎকিঞ্চিৎ বিকাশ দেখতে পাই। যেক্ষেত্রে ক্ষমতার্থ তত্ত্বটি সবচেয়ে বেশি বিকশিত হতে পারত বলে আমাদের ধারণা সে-ই সংহিতাবদলের ক্ষেত্রে (Code switching) ব্যাপারটির অনুসন্ধান পণ্ডিতদের নজর এড়িয়ে গেছে। এ-সব কারণে 'ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ' ধারণাটি হয়ত ভাষাতত্ত্বে চালু হয়নি। তাত্ত্বিক ভাষাতত্ত্বে চালু না হলেও ভাষা-রাজনীতির ক্ষেত্রে শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তৃতীয় বিশ্বের ভাষাসমস্যার আলোচনার ক্ষেত্রে শব্দটির উপযোগিতা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এবংবিধ কারণে আমরা ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ কথাটি ভাষাতত্ত্বে আলোচিত বিষয় হিসেবে গণ্য করতে চাই। তার আগে ক্ষমতা হিসেবে 'সাম্রাজ্যবাদ' ধারণাটির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিবৃত্ত কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক রূপ, অর্থনৈতিক রূপ এবং সাংস্কৃতিক রূপ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত না হলেও সাম্প্রতিককালে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচিত হয়েছে আমাদের এই বাংলাদেশে এবং বাংলা ভাষায়।[১] পাশ্চাত্যেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।[২] একথা অনেকে জানেন যে, লেনিন অনেক আগেই সাম্রাজ্যবাদকে ধনতান্ত্রিক বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায় বলে চিহ্নিত করেছেন।[৩] সাম্রাজ্যবাদের সাধারণ সম্প্রত্যয় থেকেই বৈদেশিক সাহায্যকে সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়েছে।[৪] সম্প্রতি তৃতীয় বিশ্বের অনেকেই ঔষধ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যকার সম্পর্ক উদ্ঘাটন করেছেন।[৫] যদিও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক কোনো একক গ্রন্থ নেই, তবুও ধারণাটি সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সচেতন জনগণের কাছে অপরিচিত হতে পারে না। আমাদের মনে হয় ভাষা-সাম্রাজ্যবাদকে

সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত। ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরস্পর সম্পর্কিত বলেই শিক্ষাকে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেখা হচ্ছে।[৬] ভাষা সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রচারের অন্যতম প্রধান উপকরণ। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় ইয়োরোপে যখন রোমের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল তাকে তখন স্থায়িত্বদান করেছিল রোমান লিপি ও ল্যাটিন ভাষা। আরবীয়দের সাম্রাজ্য বিস্তারের কালে আরবি ভাষাও মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। পারস্য সাম্রাজ্যের উত্থানের কালে মধ্য এশিয়া ও ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে ফারসি ভাষা প্রসারলাভ করেছিল। আধুনিককালে ব্রিটিশ এবং ফরাসি উপনিবেশগুলোতে যে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষা যথাক্রমে প্রসারলাভ করেছে তার কারণ নিহিত আছে সাম্রাজ্যবাদের কলাকৌশল রচনার মধ্যে, ভাষাদ্বয়ের কোনো আভ্যন্তরীণ সম্পদেব মধ্যে নয়। উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলোতে দেখা যায় ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদেরই সাধারণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি উপ-প্রক্রিয়া। এ উপ-প্রক্রিয়া সাম্রাজ্যবাদকে স্থায়িত্বদানের মূল প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে এবং সাম্রাজ্যবাদের গতিধারাকে সংহত করে সাম্রাজ্যবাদ কবলিত জনগণকে ভাষিক ব্যবধানের দেয়ালের অপর পাশে নিক্ষেপ করে। ফরাসি উপনিবেশগুলোতে কীভাবে ফরাসি ভাষা আরোপণ করা হয়েছে এবং ফরাসি ভাষা দ্বারা কীভাবে ফরাসি উপনিবেশগুলোকে প্রভাব বলয়াধীন রাখা হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ এখন পাওয়া যাচ্ছে।[৭] ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে ইংরেজি ভাষার কার্যকর ভূমিকার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তবে কোনো কোনো ইংরেজ প্রবন্ধকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের কালে ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা করেছিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন পৃথিবীতে অবক্ষয়ের পথে চলেছে তখন অবশ্যই ইংরেজি ভাষাও তার আধিপত্য হারাতে বাধ্য হবে। এ প্রসঙ্গে জর্জ অরওয়েলের সেই বিখ্যাত ইংরেজি ভাষা সংক্রান্ত প্রবন্ধের প্রাথমিক অংশ স্মরণ করা যেতে পারে।[৮] সেই ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দেই অরওয়েল পৃথিবীতে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য সংকুচিত হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সে-আশঙ্কা বহুলাংশে বাস্তবায়িত হয়েছে বটে, তবুও আজ দেখা যায় পূর্বতন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে সৃষ্ট এক ধরনের উপান্তিক (marginal) সংস্কৃতির ধারক ভদ্রলোক সম্প্রদায় (elite) প্রাণপণে প্রকাশ্যে বা সংগোপনে ঔপনিবেশিক ভাষাকে রক্ষার জোর ওকালতি করেন। এ সম্প্রদায়ের ভূমিকার তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়াটি ভালোভাবে উপলব্ধি করা চাই।

'উপনিবেশ' শব্দটির প্রাচীন অর্থ অন্যত্র, দূরে, অপরিজ্ঞাত স্থানে আবাসস্থল নির্মাণ করে সাময়িকভাবে কিংবা চিরস্থায়ীভাবে বসতি করা। এই অর্থে মানুষের নতুন বসতনির্মাণকেই উপনিবেশ বলা হয়েছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইয়োরোপীয় কয়েকটি দেশের লোক পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ব্যবসার নামে অন্য জাতিকে পদানত করার অশুভ প্রতিযোগিতায় নেমেছিল, আধুনিক অর্থে তাকেই ঔপনিবেশিকতা বলা হয়ে

থাকে। সুতরাং ঔপনিবেশিকতার আধুনিক অর্থ হচ্ছে এক জাতির উপর অন্য জাতির আধিপত্য বিস্তার। এ আধিপত্য বিস্তারের ফলে পদানত জাতি তার আপন ভাগ্য নির্ধারণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক ক্ষমতা হারায়। ইয়োরোপীয় ঔপনিবেশিকতার সূচনা হয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি দিক থেকেই। তারও আগে আরবি-ইরানি মধ্য এশিয়ার কোনো কোনো জাতি পরজাতিকে পদানত করার ঔপনিবেশিক তৎপরতা প্রদর্শন করেছে। সুতরাং উপনিবেশিকরণ বলতে আমরা অন্য জাতিকে পদানত করার বিচিত্র প্রক্রিয়াকে বোঝাতে চাই। অনুরূপভাবে যে সব জাতি পরজাতির পদানত হয়ে নিজের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার হারিয়েছিল, ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যে চেতনার সঞ্চার হয় এবং নানা প্রক্রিয়ায় হারানো স্বাধীনতা পুনরাধিকার করে। পদানত জাতির আত্মস্থ হওয়ার বা স্বাধীন হওয়ার বা নিজের ভাগ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়াসমূহকে অনুপনিবেশিকরণ নামে অভিহিত করা যায়। বর্তমান এশিয়ার, আফ্রিকার, লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ বা জাতি এই উপনিবেশিকরণের প্রক্রিয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

যতদূর মনে হয় কার্ল মার্কস প্রথম ঔপনিবেশিকতার ভয়াবহ প্রভাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত করেন। ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে কার্ল মার্কসের চোখে ধরা পড়ে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গূঢ় সম্পর্কসমূহ। এই ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়াকে উপলব্ধি করার জন্য কার্ল মার্কস গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাস ৬৬৪ থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর 'ভারত ইতিহাসের কালপঞ্জী' এই অধ্যয়নেরই ফল।[৯] মনে হয়, মার্কস ভারতের ইতিহাসের ব্রিটিশ পূর্ববর্তী বৈদেশিক আক্রমণের পর্যায়টিকেও ঔপনিবেশিক কাল বলে বিবেচনা করেছেন, সেজন্য দুটো ঔপনিবেশিক পর্যায়কে গুণগতভাবে পৃথক করে দেখানোর চেষ্টা করেননি। অবশ্য মার্কস যে কালে জন্মগ্রহণ করেছেন তাতে তাঁর পক্ষে ঔপনিবেশিকতার সমগ্র ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি দেখা সম্ভবপর হয় নি। দায়িত্ব ছিল পরবর্তী মার্কসবাদীদের বিষয়টিকে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করার। দু-একজন ছাড়া খুব কম মার্কসবাদীই বিষয়টিকে মার্কসের দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেছেন। আধুনিক অর্থে ঔপনিবেশিকতার তাৎপর্য এই যে, এই প্রক্রিয়া মানুষের ইতিহাসে জাতিগত ও রাষ্ট্রগত অসাম্যের জন্মদান করেছে। উপনিবেশকারী জাতি উপনিবিষ্ট জাতির আর্থিক স্বাধীনতা হরণ করে, তার সামরিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে, তার ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা এবং তার সামাজিক বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। এককথায় উপনিবেশকারী জাতি উপনিবিষ্ট জাতির স্বাধীন চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সে যা চিন্তা করে তা-ই উপনিবেশকে চিন্তা করতে শেখায়, সে যাকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে তা-ই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করতে প্ররোচিত করে। স্বাধীনভাবে জীবন জগতকে উপলব্ধি করার সুযোগ উপনিবিষ্টের থাকে না।

বিগত দুশ-আড়াইশ বছরের যে ইতিহাস পৃথিবী অবলোকন করেছে তা হচ্ছে, এই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, যেখানে সূর্যাস্ত হয় না বলে

প্রবাদ ছিল, সে সাম্রাজ্যও, বিগত কয়েক দশকের মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে এবং নতুন জাতিসত্তাগুলো আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করেছে। এই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন কোনো প্রাকৃতিক নিয়মে সম্পন্ন হয় নি, হয়েছে সামাজিক নিয়মে। প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের নির্মাতারা কতগুলো সচেতন সমরকৌশল (tactics) অবলম্বন করেছিল, কীভাবে ঔপনিবেশিকতাকে কার্যকর করতে হবে। আবার উপনিবিষ্টরাও কতগুলো সমরকৌশল অবলম্বন করেছিল কীভাবে ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। প্রথম ধরনের সমরকৌশলগুলোকে আমরা বলতে চাই উপনিবেশিকণের সমরকৌশল আর শেষোক্ত সমরকৌশলসমূহকে বলা যেতে পারে অনুপনিবেশিকরণের সমরকৌশল।

সম্প্রতি কেউ কেউ ঔপনিবেশিক শক্তির অনুসৃত সমরনীতি (strategy) ও সমরকৌশলগুলোর সূত্রায়নের চেষ্টা করেছে।[১০] মোরক প্রধান তিনটি সমরকৌশলের নাম করেছেন : (১) আত্মীকরণ (assimilation) (২) বসতিনির্মাণ (settlement) এবং (৩) বিভেদ ও প্রশাসন নীতি। দেখা যায়, উপনিবেশকারীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপনিবিষ্ট দেশে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে নতুন স্বরূপতা (identity) সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। যেমন পর্তুগীজ ও ডাচেরা শ্রীলঙ্কায় এ উপায়ে বারগের সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছে। গোয়াতে দিয়েছে পর্তুগিজ গোয়ানিজ সম্প্রদায়ের।

দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় এবং আমেরিকায়। বসতনির্মাণ করতে গিয়ে উপনিবেশকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদিম বাসিন্দাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী ও আমেরি-ইন্ডিয়ানদের দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে তুলে ধরা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, উপনিবেশিকারী যেখানে এ দু সমরকৌশলের কোনোটিই অবলম্বন করেনি, সেখানে অবলম্বন করেছে 'বিভেদ ও শাসনের' সমরকৌশল। বিভেদ ও শাসনের সমরকৌশলের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে : 'Divide and Rule may be defined as the conscious effort of an imperalist power to create and/or turn to its own advantage the ethnic, linguistic, cultural, tribal or religious differences within the population of a subjugated colony'[১০]।

পৃথিবীর সব সাম্রাজ্যবাদই কমবেশি বিভাজন ও শাসনের কূটকৌশল অবলম্বন করে এসেছে, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একে যেভাবে নিপুণ কলায় রূপান্তরিত করেছিল তা অন্যদের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। মোরক বলেছেন, 'finalliy, there are the British; making careful study of the manner in which the Roman Empire expanded into the eastern Mediterranean, they developed the strategy of 'divide and rule' into a fine art' মোরক তাঁর প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, এ বিভেদ ও শাসনের সমরকৌশলের কী পরিণতি হয়েছে উপনিবেশ-কবলিত দেশের লোক-সাধারণের উপর। এই সমরকৌশলের মারপ্যাঁচগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধান মারপ্যাঁচ হল উপনিবেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেসব সংগুপ্ত বিভেদ আছে সেগুলোকে প্রকটিত

করে জনগোষ্ঠীকে বিভক্ত করে ফেলা। এ নীতির ফলে ভারতে ধর্মীয় বিভেদ অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় জাতিভেদ, সিংহলী ও তামিল বিভেদের উদ্ভব হয়েছে; দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য অর্থাৎ শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় সম্প্রদায়ের বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে; সৃষ্টি হয়েছে ধর্মীয় বিভেদ যেমন আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান বিভেদ; সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয় ও বহির্দেশীয় দ্বন্দ্ব যেমন মালয়েশিয়ার ভূমিপুত্র ও অন্যান্য জাতিসত্তার দ্বন্দ্ব।

বাংলায় এ বিভেদনীতি যে সচেতনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, তার প্রমাণ রিজলির উক্তিতেই পাওয়া যায়। রিজলি বলেন, 'Bengal united is a power, Bengal divided will pull in several different ways ...one of our main objects is to split up and thereby weaken a solid body of opponents to our rule.'[১১]

এসব সংগুপ্ত বিভেদের পুনর্জাগরণের মাধ্যমে যেমন বিভেদের দ্বারা প্রশাসন নীতিকে চালু রেখেছিল, তেমনি ঔপনিবেশিক ভাষা আরোপ করে সে ভাষা ব্যবহারকে ক্ষমতার দ্বারা লোভনীয়, মর্যাদার দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা স্থায়িত্বদান করে এবং অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করে ভাষানুগত্য (language loyalty) সৃষ্টি করে সমাজে একটি নতুন বিভেদের সৃষ্টি করেছে। ফলে যারা ঔপনিবেশিক ভাষা দখল করতে পারে, তারা ক্ষমতার ভাগ পায়, শোষণের বখরা এবং মর্যাদার আসন পায়। ঔপনিবেশিক ভাষার দেওয়ালের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করে তারা সুকৌশলে জনগণের সঙ্গে ব্যবধান রচনা করতে পারে। এ ব্যবধানের প্রয়োজন তাদের শোষণ ও শাসনকে নিরাপত্তাদানের জন্য। ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থাকে মানুষ সহজে মেনে নেয়নি। বার বার বিদ্রোহী হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে গত দুশ-আড়াইশ বছরে হাজার হাজার কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে, শ্রমিক বিদ্রোহ হয়েছে, ছাত্র অসন্তোষ হয়েছে। এসব বিদ্রোহ প্রমাণ করেছে যে, মানুষ ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থাকে অর্থাৎ অন্য জাতির দ্বারা পদানত হয়ে থাকা কোনোদিন মেনে নিতে পারে নি। সেই একই কারণে ভাষাধিপত্যও মানুষ সহজে স্বীকার করে নেয় না।

মোরক তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কী কী সমরনীতি ও সমরকৌশল অবলম্বন করে উপনিবেশকারীরা তাদের শাসনকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে। আমরা উপনিবেশের জনগণের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করে উপলব্ধি করতে পারি যে, শাসক শোষকদের সমরনীতি ও সমরকৌশলের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তারাও এক ধরনের বিপরীত সমরনীতি (counter strategy) ও সমরকৌশল উদ্ভাবন করেছে।

এই বিপরীত সমরনীতির অন্যতম হচ্ছে অতীত জাতীয় গৌরবের প্রক্ষেপণ এবং সে গৌরব থেকে জাতীয় ঐক্য বা সংহতি কামনা করা। সেজন্য দেখা যায় জাতীয় জাগরণের মুহূর্তে জাতীয় ঐক্যকেই সবচেয়ে কাম্য বলে ধরে নেওয়া হয়। ঔপনিবেশিক বিশেষজ্ঞরা যেখানে তাঁদের শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য বিভাজনকে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন সেখানে দেশীয় বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় অনৈক্যকে সমস্যা ও দুর্ভাগ্যের

মূল বলে বিবেচনা করেছেন। বাংলাদেশে ম্যাকলে, হান্টার আর রিজলিরা যখন জনগণের মধ্যকার সংগুপ্ত বিভেদের উপর সবচেয়ে বেশি আলো ফেলার চেষ্টা করছেন; তখন বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথেরা 'একজাতি একদেশ একমন' ইত্যকার ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন বেশি। ইতিহাস থেকে প্রমাণ করা গেলেও, সেটা আপাতত অবিশ্লেষণের অন্ধকারে ঢাকা। তাই এটা প্রমাণ করার জন্য সমাজ মনস্তত্ত্বের দ্বারস্থ হতে হবে আমাদের। কারণ, দলাচরণ (group behaviour) ওই বিদ্যারই বিষয়, ইতিহাসের নয়।

যা হোক, উপনিবেশিকরণকে প্রতিরোধ করার জন্য যে জাতিগত ঐক্য কামনা করা হয়েছে, সে-কামনার অভ্যন্তরেই নিহিত ছিল জাতীয় ভাষার ঐক্যের কামনা। মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছিল। 'জাতীয় ভাষার প্রশ্ন' বলে যে ভাষিক চেতনাটি সদ্য-স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশগুলোতে দেখা গেছে সেটা মূলত সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অনুপনিবেশিকরণ বা (decolonisation) প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। সেজন্যই জাতীয় ভাষার প্রশ্নটিকে (National language question) ঔপনিবেশিকতার জের বিবেচনা করেছেন কেউ কেউ।[১২]

২

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের সঙ্গে যেমন ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস বিজড়িত, তেমনি ভাষা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গেও ঔপনিবেশিক ভাষানীতি বিজড়িত। যোড়শ শতাব্দী থেকেই পশ্চিম ইয়োরোপে বণিক পুঁজির সূচনা হতে থাকে। সেই সূত্রেই পর্তুগিজেরা, ডাচেরা ফরাসিরা এবং ইংরেজরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বণিকবৃত্তি নিয়ে গমনাগমন শুরু করে। প্রায় অনুরূপ সময় থেকেই বণিকবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য খ্রিস্টান মিশনারিরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গমন করে। ভাববিনিময়ের সংকট উত্তরণের জন্য এবং খ্রিস্টধর্ম-বহির্ভূত লোকদের মধ্যে বাইবেল প্রচারের জন্য তারা পরজাতির ভাষা শিখে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং অনেক ক্ষেত্রে অপ্রতুল ভাষা শিক্ষার কারণে মিশ্রভাষার জন্মদান করে, কিংবা নিজেদের ভাষাকে ব্যাপক যোগাযোগের ভাষা হিসেবে চালু করতে সমর্থ হয়। এ-কারণে ভারতের বন্দরসমূহে পর্তুগিজ ইত্যাদি ভাষা ব্যাপক প্রসারলাভ করে এবং অনেক জায়গায় ব্যাপকভাবে পর্তুগিজ ভাষা প্রচলনও করা হয়। এ সমস্ত বিবরণ দুর্লভ নয়।[১৩]

ভারতে ইংরেজদের আগমন অন্যান্য জাতির চেয়ে বিলম্বিত। সে কারণে ইংরেজি ভাষার আগমনও অপেক্ষাকৃতভাবে দেরিতে ঘটে। অন্য জাতির ভাষায় ভাব-বিনিময়ের কাজ করতে গিয়ে যে ইংরেজদের নানারকম বেকায়দায় পড়তে হয়েছিল তার বিববরণাদি রবার্ট নক্স অন্যান্য ইতিহাস সংক্রান্ত বিবরণে পাওয়া যায়।[১৪] তা ছাড়া দেশীয়দের মধ্যে বাইবেলের বাণী পৌঁছে দেওয়ার ধর্মীয় প্রেরণা তো ছিলই। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদস্যদের কারো কারো মধ্যে ভারতে তথা কোম্পানির অধিকৃত এলাকার মধ্যে ইংরেজি প্রচলনের ইচ্ছা প্রবলভাবে লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে চার্লস গ্রান্টের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

তিনি একজন স্কচ। 'ক্লেফাম' দলের সদস্য ছিলেন। ১৭৯৭ থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যও ছিলেন (১৮০২-১৮১৮)। এই ভদ্রলোকই ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে চার্চ মিশনারি সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন। চার্লস গ্রান্ট ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দেই ইংরেজিকে প্রশাসন, আদালত, রাজস্ব, ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি, বিজ্ঞান এবং খ্রিস্টধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত করার দাবি উত্থাপন করেছিলেন। ভারতের প্রেসিডেন্সিসমূহে মুদ্রাযন্ত্র ও অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করে দেশীয়দের প্রশিক্ষণ দিয়ে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শোখানোর কথা তিনিই প্রথম বলেছিলেন।[১৫] যাকে বলা হয় ঔপনিবেশিক শিক্ষা- ব্যবস্থা, তার রূপরেখা প্রথম তাঁর চেতনাতেই স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। তিনি বলেছিলেন, 'বিজিত জাতিকে আত্মীকরণ করার সুস্পষ্ট উপায় হল তাদের মধ্যে বিজয়ী জাতির ভাষা অনুপ্রবেশ করিয়ে দেওয়া। মুসলমানেরা তাদের ক্ষমতালাভের প্রথম থেকেই সরকারি প্রশাসন ও কাজকর্মে ফারসি ভাষা প্রচলন করে দিয়েছে। এই রীতিটি তাদের আধিপত্য সংরক্ষণে সহায়তা করেছে এবং অন্ধভাবে দেশীয় মুৎসুদ্দিদের উপর নির্ভর না করে, তাদের সরকারি কাজের প্রকৃতি ও বিস্তৃত বিবরণ এবং রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের বোধগম্য হিসেবপত্র সংরক্ষণে সমর্থ করেছে। দেশীয়রা তড়িঘড়ি সরকারের ভাষা আয়ত্ত করে নিয়েছে, কারণ তারা দেখেছে যে এটা সর্বকার্য, রাজস্ব ও বিচারের জন্য প্রয়োজনীয়। তারাই তারপর এ ভাষার শিক্ষক হয়েছে; যে সব প্রদেশে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল, এখন সে-সব প্রদেশের হিন্দুরা এ-ভাষা বুঝতে পারে। তাদের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা আমাদের স্বার্থের অনুকূল হবে।'[১৬]

আরবীয় বা মুসলমানদের অনুসৃত নীতি ইংরেজরা অনুসরণ করলে তারাও লাভবান হবে একথা বলার পর তিনি উপসংহার টেনে এই কথা কটি বলেন, 'এ বিজয় হচ্ছে মহত্তম রকমের বিজয়। আমার বলতে ইচ্ছে হয় যেখানেই আমরা আমাদের নীতি ও ভাষা প্রচলন করব, সেখানেই আমাদের ব্যবসা প্রসারলাভ করবে।'

মনে রাখা দরকার যে, চার্লস গ্রান্ট এ মত প্রকাশ করেছিলেন ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে, ম্যাকলে কিংবা কোলব্রুক-এর প্রায় চার দশক আগে। চার্লস গ্রান্টের এই মত অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে এবং উনবিংশ শতকের প্রথম দু দশকে ইংল্যান্ডে বেশ প্রসারলাভ করেছিল বলে মনে হয়। যেহেতু তিনি চার্চ মিশনারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, সেহেতু সোসাইটির মাধ্যমে উপনিবেশগুলোতে খ্রিস্টধর্ম-প্রেমিকদের অবহেলার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। এসব খ্রিস্টধর্ম-প্রেমিকদের আন্দোলনের চাপে লন্ডনের কলোনিয়াল অফিস অনেক সময় তাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। সে কারণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কলোনিয়াল অফিস উপনিবেশগুলোতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সুযোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। এভাবে তারা শ্রীলঙ্কার গর্ভনর মেইথল্যান্ডকে (১৮০৯) সেখানে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের স্কুল সক্রিয়করণে বাধ্য করেন। এ চাপের ফলেই গভর্নর রবার্ট ব্রাউনবিগ (১৮১২) ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হন। দেখা যাচ্ছে উনবিংশ

শতকের প্রথম পাদ থেকেই ব্রিটিশ কলোনিয়াল অফিস পরোক্ষভাবে খ্রিস্টধর্ম প্রচার এবং সিভিল অফিসারদের প্রশাসনিক প্রয়োজন এ দু- কারণে সব উপনিবেশেই দেশিভাষা শেখার প্রয়োজন উপলব্ধি করে। এভাবে ধর্ম আর রাজনীতি পরপর সম্পর্কিত হয়ে ভাষা সমাগম (language contact)-কে অনিবার্য করে তোলে। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম পর্যায়ে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে যে বিভেদ ছিল সেটা বহুলাংশে মন্দীভূত হয়ে উনবিংশ শতকের প্রথমাংশে সহাবস্থান ও সহযোগিতার পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়। সে কারণে দেখতে পাই যে উইলিয়ম কেরি ধর্ম প্রচারের দায়ে এক সময়ে শ্রীরামপুরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁকেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ নির্বাচন করা হয়েছিল। এসব পদক্ষেপের ফল হয়েছিল এই যে, উপনিবেশগুলোতে ইংরেজি শেখার প্রয়োজন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি দেশি ভাষা শেখারও প্রয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ দ্বিমুখী ভাষা-দাবি (Language demand) কিছুদিন চলার পর সরকার সুস্পষ্ট ভাষানীতির প্রয়োজন অনুভব করে। সে-কারণে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে কোলব্রুক-ক্যামেরুন কমিশন যখন ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে যায় তখন তাদের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল উপনিবেশগুলোতে ইংরেজি ভাষার অবস্থা কী রকম তার প্রতিবেদন পেশ করার জন্য। আর্ল অব বাথার্স্ট, জে টি বিগ্‌গে ও ডব্লিউ এম জি কোলব্রুককে যে পত্রখানি কমিশনের সূচনায় দিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছিল, বিচারালয়ে ও সকল সরকারি কাজে ইংরেজি প্রবর্তন সম্পর্কিত ব্যাপারটিও তাদের অনুসন্ধানের বিষয় হবে। পত্রের ভাষায়—'The introduction of the English language in the courts of law and in all public proceeding connects itself within this branch of your investigation : (Earl of Bathurst to J. T. Bigge and W. M. G. Colebrooke, 18. 1. 1823)[১৭] মনে হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারি ভাষানীতির উদ্ভবের সঙ্গে উপযুক্ত নির্দেশের গভীর সম্পর্ক আছে। যে কমিশনের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সে কমিশন সকল কলোনি বা উপনিবেশের প্রশাসন ও সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানোর জন্যই গঠিত হয়েছিল। এ কমিশনকে কমিশন অব ইস্টার্ন ইনকোয়ারি বলা হয়। সে যাই হোক, এ কমিশনই ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ও পরামর্শদান করেন। ইংরেজি ভাষা অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ভাষানীতি নির্ধারণেও কমিশনের পরামর্শ গুরুত্বলাভ করেছিল বলে মনে হয়। কমিশন প্রতিবেদন প্রকাশ করেন ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে। আর আমরা ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে ম্যাকলের বিখ্যাত ভাষা নির্ধারণী বক্তব্য এবং বেন্টিঙ্কের বিখ্যাত মিনিটের প্রকাশ লক্ষ করি। বেন্টিঙ্ক এবং ম্যাকলের ভাষানীতি ভারতীয় ভাষাপরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। আইনগতভাবে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে রাজভাষা ঘোষণা করা হয়। শুধু তাই নয়, পরবর্তী ত্রিশ বছর ব্রিটিশ প্রশাসন 'শুধুমাত্র ইংরেজি' (English only) নীতি অনুসরণ করে। এক রাজভাষার পরিবর্তে অন্য রাজভাষা প্রবর্তন করতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকার যদি 'ইংরেজি মাত্র' নীতি অনুসরণ না করত তা

হলে হয়তো 'ইংরেজি ভাষা-দাবি' ভারতে এত তীব্র হত না।

এ সময়ে, ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনে ধনতন্ত্রের ইতিহাসের প্রথম অতি-উৎপাদন (over production) সংকট দেখা যায়। সংকট উত্তরণের জন্য ব্রিটিশ ধনিক-বণিকেরা বড়ো বাজার অনুসন্ধানের চেষ্টা চালায়। এমতাবস্থায় চার্লস গ্রান্টের সেই বিখ্যাত উক্তি, 'যেখানেই আমরা আমাদের নীতি ও ভাষা প্রচলন করব, সেখানেই আমাদের ব্যবসা প্রসার লাভ করবে' ধনিক বণিকদের নীতি নির্ধারণকে প্রভাবিত করে থাকবে। ঐতিহাসিক কার্যধারা লক্ষ করলে দেখা যায়, চীনে যখন আফিম ব্যবসা জোরদার করার চেষ্টা হচ্ছিল, তখন ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজি প্রবর্তনের জোর তৎপরতা শুরু হয়। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন বাংলা সরকারের ফারসি বিভাগের সচিব এক পত্রে জনশিক্ষা কমিটির কাছে ঘোষণা করেন যে, সরকারের মনস্কামনা হল ক্রমে ক্রমে ইংরেজি ভাষা চালু করা এবং পরিণতিতে সরকারি কাজকর্মে একে প্রতিষ্ঠিত করা। এই মনোভঙ্গিরই বিচিত্র প্রসারণ ঘটেছিল ম্যাকলের উক্তিতে। তিনি ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি তাঁর এক মিনিটে মন্তব্য করেছিলেন, 'ভারতবর্ষে শাসকশ্রেণি কথা বলেন ইংরেজি ভাষাতে, উচ্চশ্রেণিভুক্ত দেশীয়রা ও সরকারি কাজকর্মে কথা বলেন এই ভাষাতেই। বাণিজ্যের ভাষা হিসেবে ইংরেজি সম্ভবত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে প্রাচ্যের সাত সমুদ্রেই।'[১৮] এর মাস খানেক পরেই ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চে বেন্টিঙ্ক ইংরেজি শিক্ষা সরকারি নীতিরূপে ঘোষণা করেন। সুতরাং বলা হল, 'শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে-অর্থ আলাদা করে রাখা হয়েছে, তার একমাত্র সার্থক নিয়োজন হবে ইংরেজি শিক্ষাতেই।'[১৯] ক্রমে ইংরেজি ভাষার সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। চারদিকে ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। নব্য ধনিক, উঠতি বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি ইংরেজি শিখতে শুরু করে। এ সময়েই আমরা বাঙালির ইংরেজি শেখার সেই বহু মূল্যবান উপদেশ সমাজে প্রচলিত হতে দেখি : যদি ইংরেজি শিখতে চাও, তবে ইংরেজি পড়, ইংরেজি লেখ, ইংরেজিতে ঘুমোও, ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখ ইত্যাদি।

সমাজে ভাষাদাবি উত্থিত হওয়ার পটভূমি হিসেবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও অর্থনৈতিক সুযোগ কীভাবে কাজ করে তার পরিচয় পাওয়া যায় এ-সময়ের ঘটনায়। ইংরেজি ভাষা প্রবর্তনের মনস্কামনা প্রচারের ১৫ বছর পর ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর ব্রিটিশ সরকার শিক্ষা সংক্রান্ত এক সিদ্ধান্তের বলে ইংরেজিকে সরকারি (official) ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ইংরেজি সরকারি ভাষা হওয়ার এক দশক পর ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উড ভারতে ইংরেজি ভাষার বিশেষ প্রচারের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এর ফলে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৫৯ থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের চাকরি শুধুমাত্র ইংরেজি জানা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে দুটো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একটি হচ্ছে উচ্চতর সিভিল পরীক্ষা গ্রহণের একমাত্র ভাষা হবে ইংরেজি। অপরটি হচ্ছে ১৮৬৪ সাল থেকে সকল আইন পরীক্ষা (BL) ইংরেজিতে অনুষ্ঠিত হবে। এভাবে

অনেকগুলো সরকারি সিদ্ধান্তের বলে ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিক আমলে ঔপনিবেশিক ভাষানীতি গড়ে তোলে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভাষানীতির লক্ষ্য কখনোই ভারতের ভাষা পরিস্থিতির সামগ্রিক পরিবর্তন ছিল না। তাই যদি হত তবে ইংল্যান্ডের মতো সর্বজনীন ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারত এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মতো ভাষা বিসর্জনের পালা ভারতেও সংগঠিত হত। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বর্তমান অধিবাসীরা তাঁদের মাতৃভাষায় স্থিত নয়। ঔপনিবেশিক ভাষানীতির চাপে তাঁরা তাঁদের আফ্রিকান মাতৃভাষাকে বিসর্জন দিয়ে ক্রিয়ল ইংলিশ কিংবা ক্রিয়ল ফরাসি কিংবা ক্রিয়ল পর্তুগিজকে গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এদেশে ঔপনিবেশিক প্রশাসন সব সময় সীমিত সুযোগ রেখেছিল ইংরেজির জন্য। তারা ইংরেজিকে এদেশের উচ্চশ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত রেখেছিল, জনগণের ব্যাপক যোগাযোগের ভাষা হিসেবে উন্নীত করেনি। ফলে, ইংরেজি ভাষা ভারতে সামাজিক শ্রেণি নির্মিতির (social class formation) অন্যতম যন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। এবং ভাষা-ব্যবধান সৃষ্টি করে পূর্বতন বর্ণাশ্রম সমাজের ভেদগুলোকে সুদৃঢ় করেছে। ভারতে ইংরেজি প্রবর্তনের সামাজিক পরিণাম কী হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া না গেলেও বেশ কিছু চিন্তা জাগানো লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অনেক আগেই বলেছিলেন,[২০] 'ষাটি বৎসরের ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা ভাঙ্গিতে শিখিয়াছি, গড়িতে শিখি নাই, আমাদের আহারের দ্রব্য বাড়িয়াছে, কিন্তু পরিপাকের শক্তি বাড়ে নাই। আমরা পরের কথার আবৃত্তি করিতে পারি; কিন্তু স্বয়ং বাক্য রচনা করিতে জানি না। আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা হীন; আমাদের জ্ঞানজীবনে পরাধীনতা শোকাবহ। জ্ঞানালোচনায় আমাদের স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা নাই; আমরা আত্মনির্ভর ও আত্মমর্যাদা জানি না।'

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অর্ধ শতাব্দী পর মোহিতলাল মজুমদার যখন বাঙালি প্রতিভা সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন তখন বলছেন, 'চিন্তার ক্ষেত্রে বাঙালী মৌলিকতাকে ভয় করে— তৎপরিবর্তে বিদেশী-বিদ্যার ধার করা বড় বড় বুলি সংক্ষেপে ও সহজে মুখস্থ করিয়া তাহারই আবৃত্তি দ্বারা স্বদেশী সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে। গত একশত বৎসরের অধিককাল যে শিক্ষা জাতীয় শিক্ষারূপে পরিণত হইয়াছে— সে শিক্ষা এই প্রবৃত্তির পুষ্টিসাধন পক্ষে বড়ই উপযোগী হইয়াছে। একধরনের মেধা— যাহাকে পরবিদ্যা মগজস্থ করিবার শক্তি বলা যাইতে পারে— স্বকীয় চিন্তার বিঘ্নমাত্র ব্যতিরেকে পরকীয় চিন্তার অনুসরণ ও তদ্দ্বারা মস্তিষ্ক-ভরণ করিবার সেই যে শক্তি— তাহাই সাধারণ বাঙালী জিনিয়াস।'[২১]

রামেন্দ্রসুন্দর ও মোহিতলালের বক্তব্য ষোলো আনা সত্য না হলেও তাঁদের উপলব্ধি যে যথার্থ তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ উপলব্ধি ঔপনিবেশিক ভাষানীতি-জাত সামাজিক পরিণাম উপলব্ধির চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত। ইংরেজি শিক্ষার পরিণাম সাম্রাজ্যবাদের সমাজতাত্ত্বিক পরিণামের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রাচ্যের একটি দেশে সাম্রাজ্যবাদ কী ধরনের সাংস্কৃতিক ও সমাজতাত্ত্বিক সংকট সৃষ্টি করেছে এ সম্পর্কে শ্রীলঙ্কার একজন

সমাজবিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন।[২২] তিনি দেখিয়েছেন যে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ সাংস্কৃতিক উপান্তিকতা সৃষ্টি করে সমাজে স্বরূপতার সংকট বয়ে আনতে পারে। এ সংকট সংস্কৃতি, শিক্ষা, ভাষা, ও ভাবধারার মাধ্যমে ব্যক্তিচেতনায় পর্যন্ত সংকট সৃষ্টি করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ অর্থনীতিতে, মূল্যবোধে, ভাবধারায় স্বনির্ভরশীলতা অপহরণ করে উপনিবেশের সমাজকে যে অক্টোপাশ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল তারই জের চলেছে স্বাধীনতা উত্তরকালে।[২৩] নব্য উপনিবেশবাদের অপচ্ছায়া সুবিস্তৃত হচ্ছে যথাযথ কৌশল ও মারপ্যাঁচ অবলম্বনের অভাবে। সেক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক হচ্ছে উপান্তিকেরা।

৩

নব্য-উপনিবেশবাদ বলে যে ধারণাটি এখন বিশ্বের রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার আর্থিক, রাজনৈতিক ও যোগাযোগ সম্পর্কিত মাত্রাসমূহ কেন্দ্র-প্রান্ত তত্ত্বের আলোকে নানাভাবে বিশ্লিষ্ট হয়েছে। নব্য-উপনিবেশবাদে ভাষা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার এর ব্যাপক আলোচনা হয়নি। তবুও সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পর্কে যে সব কথা বলা হয়েছে তাতে ভাষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। একজন গবেষক বলেছেন, 'সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নব্য-উপনিবেশবাদের প্রকাশ অত্যন্ত নগ্ন। ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা, গবেষণা ও পর্যালোচনার সর্বক্ষেত্রে এর সুস্পষ্ট প্রকাশ। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র থেকে আমদানি করা হচ্ছে বই কেতাব আর গুরু। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রান্তিক রাষ্ট্র থেকে রপ্তানি করা হচ্ছে শিষ্য ও সাকরেদ।'[২৪]

আর একথা বলা বাহুল্য যে সবটাই সম্ভব হচ্ছে কেন্দ্র ও প্রান্তিক রাষ্ট্রের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ভাষিক প্রতিবন্ধকতা না থাকার ফলেই। আজকে পরাশক্তির মধ্যে প্রকাশ্যে যে 'প্রভাববলয়' সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে, সে-বলয়কে রক্ষা করার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে ভাষা। যে যুক্তিতে প্রভাববলয়টি সংরক্ষিত হচ্ছে সেটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের যুক্তি। প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিকতার নামে নব্য-উপনিবেশবাদী প্রভাববলয়কে দীর্ঘস্থায়ী করাই যে এর উদ্দেশ্য এতে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। আর এসব ব্যাপারে সবচেয়ে সহায়তাকারী, সচেতন কিংবা অসচেতন যেভাবেই হোক না কেন, হচ্ছে উপান্তিকেরা। সে জন্যই অনেকে তাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন ট্রোজান ঘোটকের— ট্রয়ের সেই ঘোড়ার, যার মাধ্যমে ঘটেছিল ট্রয়ের ঐতিহাসিক পরাজয়।[২৫]

উল্লেখপঞ্জি

১. যেমন মোহম্মদ আখলাকুর রহমান, 'সাম্রাজ্যবাদ', 'পটভূমি', ২য় বর্ষ ৭ম-৮ম সংখ্যা (১৯৭৮)
২. যেমন, একটি সাম্প্রতিক বই George Lichtheim. Imperialism. (London, 1971)
৩. V.I.Lenin. Imperialism. the Highest form of Capitalism
৪. Teresa Hayter. Aid as Imperialism. (London, 1971)

৫. Frantz Fanon, 'Medicine and Colonialism' in A Dying Colonialism. (New York. 1965)
৬. Martin Carnoy, Education as Cultural Imperialism (New Yourk, 1974)
৭. Louis-Jean Calvet, Linguistique et Colonialisme. petittraite de glottophagie. Paris. Payot. (Biblitheque Scientifique) 1974
৮. George Orwell. 'Politics and the English Language in Collected Essays. 2nd edition, (London, 1946) (first published in 1945).
৯. কার্ল মার্কস, 'ভারত ইতিহাসের কালপঞ্জী', (অনুবাদ মস্কো)
১০. Richard Morrock, 'Heritage of Strife : the effects of colonist 'divide and rule' strategy upon the colonized people' in Science and Society, Summer 1973. Vol XXXVII No. 2.
১১. উদ্ধৃত, Ghulam Murshed, 'Coexistence in a plural society under colonial rule'. The Journal of the institute of Bangladesh Studies, Vol 1, No 1, 1976 পৃ. ১৪০
১২. R.B. Le Page. The National Language Question. (London, 1468)
১৩. K. A. Rahim. The Portuguese Contribution to Bengali Prose, Grammar & Lexicography, (Dacca, 1976)
১৪. Monsur Musa. Problems of Language Planning in Srilanka, Oriented Series. Vol 1. 1930
১৫. Martin Carnoy, op. cit. পৃ. ৮৪-১১২
১৬. Carnoy. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
১৭. G.C. Mendis. ed. The Colebrooke-Cameron Papers : British Policy, in Ceylon 1776-1833. 2 vols (London, 1956)
১৮. বিনয় ঘোষ 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা : ১৮০০-১৯০০' (কলকাতা, ১৯৬৮), পৃ. ১৮১
১৯. ওই— পৃ. ১৮১
২০. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'ইংরেজী শিক্ষার পরিণাম', (সঙ্কলিত, মনসুর মুসা সম্পাদিত 'বাঙলা ভাষা', ঢাকা ১৯৭০)
২১. মোহিতলাল মজুমদার, 'বঙ্কিম বরণ', (কলকাতা, ১৯৫৬ পৃ. ১১৯)
২২. R Peris, The Sociological Consequences of Imperialism. with special reference to Ceylon, (London University, Unpublished Typescript, 1959)
২৩. Jack Waddis. Introduction to Neocolonialism, (New York. 1972)
২৪. এমাজউদ্দিন আহমদ, 'নব্য উপনিবেশবাদ : কেন্দ্র-প্রান্ত সম্পর্ক, উন্নয়নশীল রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি', 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা', ডিসেম্বর, ১৯৭৯
২৫. Nikolai Yermolov. Trojan Horse of Neocolonialism (Moscow)

আপন কথা : মিথ্যা-সত্য'র প্রাত্যহিক কাব্য

মানস রায়

সবারই কিছু রেখে যাবার থাকে। লিখেছিলেন ফরাসি দার্শনিক পাস্কাল। জীবনের পথে চলতে চলতে জমে ওঠে ছোটোবড়ো, এলোমেলো নানান আসবাব। এমনকি, একান্ত দীন দরিদ্রেরও। হয়তো কোটরে রাখা একটা পয়া আধুলি, বহু ব্যবহারে জীর্ণ চেয়ার বা পুরোনো, মুড়মুড়ে একগুচ্ছ চিঠি। অভিজ্ঞতার সঙ্গে বস্তুজগতের যোগাযোগের সাক্ষ্য হয়ে পড়ে থাকে এইসব নেহাত মামুলি কিছু জিনিস।

সম্প্রতি সমালোচক পিটার ফ্রিটশে পাস্কালের অতীতচর্চার এই বিশেষ ধারাটির সীমাবদ্ধতা বোঝাতে গিয়ে একালের সংস্কৃতিতাত্ত্বিক ভালটার বেঞ্জামিনের প্রসঙ্গ এনেছেন (দ্য আর্কাইভ, ২০০৫)। পাস্কালের তিনশ বছর পর লিখতে বসে বেঞ্জামিন যোগ দিলেন আরেকটি অনুষঙ্গ : স্মৃতি বা মেমারি। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে উত্তরাধিকারহীন স্মৃতি। ফ্রিটশে দেখিয়েছেন কিভাবে শুধু এইটুকু যোগে পাস্কালের তালিকাটির তাৎপর্য অনেকটাই পালটে গেল। ব্যবহার্য বস্তুর কালাতিক্রান্তির গল্প নয়, বরং ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্মৃতির বিচিত্র রকমফের, হাবভাব, মতিগতি চলে এল চিন্তার কেন্দ্রস্থলে। আর এরই জেরে জীবনযাপন এবং সেই জীবনের নানা ব্যবহারিক রেশ— এ দুয়ের নিত্তনৈমিত্তিক সম্পর্কটি আর সরলসাপটা রইল না, দুমড়ে-জড়িয়ে হয়ে উঠল ক্ষমতার এক দুর্মেয় জাল। বেঞ্জামিন একেই বলবেন, স্মৃতিচারণ।

আত্মকথন তাই স্মৃতি ও বিস্মৃতির মমতাময় বৈপরীত্যের এক ক্যালাইডোস্কোপিক জগৎ, যেখানে অতীতচর্চার মূল লক্ষ্য বর্তমানের নির্মাণ ও নির্ণয়। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, কার্য ও কারণ: সাবেকি ইতিহাস পাঠের এই করণিক ধারায় জীবনের গল্প বুঝতে আমরা বারবার ভুল করি। আর্কাইভের ক্ষেত্রে যেমন, নিজের জীবনের গল্প বলতে গিয়েও তেমনি, যুক্তিতর্কে যদিবা টানটান একটা ক্ষেত্র তৈরি করতে গেলাম, বাসনাকামনার ঝাপটায়, নিয়ম ভাঙবার সহজাত প্রবণতায় সব দলছুট হয়ে গেল। বাউলগানের একটা কলি মনে পড়ছে : জল দেখে জাল জড়িয়ে পড়ে/ছড়িয়ে পড়ে না।

তন্ময়তা ও প্রদর্শনী

রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* শুরু হয়েছে অনেকটা এই ছড়িয়ে পড়া, জড়িয়ে পড়ার কথায়। সেই অনবদ্য পংক্তিগুলো আরেকবার আউড়ে নেওয়া যাক :

"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহাকিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে।...
কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে, একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম।...দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—সে রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে; সুতরাং পটের উপর যে-ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।"

হয়তো প্রশ্ন করা যেতে পারে ওই অদৃশ্য চিত্রকরের রচনা রবীন্দ্রনাথ যতটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবছেন, ততটাই কী? প্রত্যেক জীবন নিয়েই, তা সে যতই নিতান্ত হোক, গল্প লেখা যায়। লিখনের মুন্সিয়ানায় সে গল্প চিত্তাকর্ষকও হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু গল্পের মানুষ গল্পেরই অংশ। জীবনবৃত্তান্ত কিন্তু বিষয়ীর ওই বৃত্তান্ত-পূর্ববর্তী অস্তিত্বের প্রকাশ নয়। বরং জীবন ও বৃত্তান্ত-এ দুয়ের টানাপোড়েনই বিষয়ীর অবস্থানকে নির্মাণ করে। গল্প লিখে জীবনকে অর্থবহুল করা যায় ঠিকই, কিন্তু তা বলে আখ্যানের সর্বগ্রাহ্য বিধি-রীতি থেকে ওই গল্পের পালানোর জো নেই। এই সত্য সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—তা সে রেকর্ড করা সাধারণ মানুষের জীবন-বয়ানই হোক বা প্রামাণ্য সাহিত্যকর্ম। আত্মবিবরণে কত কারুকার্যই না লুকিয়ে থাকে : বাদ-ছাঁট, কোথাও হাল্কা কোথাও-বা নিবিড়, কোথাও দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হাইলাইট করা, এলোমেলো হলেও বৃত্তান্তের মধ্যে একটা নিজস্ব রীতি তৈরি করা, হয়তো বা একটা মোটিফ যা ঘুরে ফিরেই আসবে, একটা নির্দিষ্ট বাচনভঙ্গি যা পাঠক বা শ্রোতার সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্ক তৈরি করবে, বৃত্তান্তকারের 'আমি'র অধিকারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা—এসবই হচ্ছে নিজের জীবন বলবার জন্য প্রয়োজনীয় কৃৎকৌশল যার অন্যতম অবশ্যই লিখন বা বাচনের ঐসব তুক পাঠকের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা। কথক যদি সুবোধ, বাধ্য লোকটি হয়, প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির বেড়াজাল ডিঙোতে তার যদি কোনই আগ্রহ না থাকে, তাহলে তার কথনে আমাদের আগ্রহ অচিরেই উবে যাবে। একদিকে আত্মকথন হবে কিছুটা এলোমেলো, অন্যদিকে নিজের গল্প বলার ছলে বক্তা নির্মাণ করবেন সমাজে তাঁর পৃথক কিন্তু সংঘবদ্ধ অবস্থান। খেলাটা এখানেই। গ্রহণযোগ্য হবার জন্য জঁর এবং আইডেন্টিটির—সাহিত্যবর্গ বা সারূপ্যের—তাগিদ একজায়গায় মেলাতেই হবে।

শিল্পতাত্ত্বিক মাইকেল ফ্রিড যে দৃষ্টিকোণ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি শিল্পী জাঁ ব্যাপতিস্ত সিমিয়ঁ সারদ্যাঁর (Jean-Baptiste-Simion Chardin) পেন্টিংগুলো বিশ্লেষণ করেছেন, তা আপনকথা বা আত্মকথনের চরিত্র বুঝতে সহায়ক হতে পারে (জেফ-

ওয়াল, উইটগেনস্টাইন অ্যান্ড দ্য এভরিডে, *ক্রিটিকাল ইনকোয়ারি*, স্প্রিং

ফ্রিডের ধারণা, ইউরোপীয় পেন্টিংয়ে সারদ্যঁ এক নতুন ঘরানার প্রবর্তক, কারণ তাঁর ছবির চরিত্রগুলো যে যার নিজের কাজে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত, দর্শকের উপস্থিতির প্রশ্নে উদাসীন। একটি ছবিতে দর্শকের দিকে পেছন ফিরে আলখাল্লা পরা একটি ছেলে আঁকছে (ইয়াং স্টুডেন্ট ড্রয়িং, ১৭৩৩-৩৪), অন্য একটি ছবিতে এক অল্পবয়সী ড্রাফটসম্যান নিজের কাজের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে (দ্য ইয়াং ড্রাফটসম্যান, ১৭৩৭), আর একটা ছবিতে এক কিশোরী একমনে তাস খেলছে (দ্য হাউস অফ কার্ডস, ১৭৩৭)। প্রসঙ্গত, ওই শেষোক্ত ছবির দুটি তাস দর্শকের দিকে চেয়ে আছে—একটির রঙিন, ছবিওয়ালা দিক, অন্যটির সাদা, উলটো পিঠ। অর্থাৎ দর্শক ও ছবির চরিত্রগুলো এক লিমিনাল সম্পর্কে আবদ্ধ। পাস্কালের প্রসঙ্গ টেনে ফ্রিড দেখিয়েছেন প্রাত্যহিক বস্তুজগৎ নিয়ে এই তন্ময়তা ঈশ্বরসাধনার অন্তরায় বলেই বিবেচিত হত। এই লিমিনাল স্পেসই সম্ভবত ইউরোপের প্রথম সেকুলার প্রাইভেট স্পেস। ছবিতে এই আত্মমগ্নতাকে ফ্রিড বলেছেন, 'দ্য অ্যাবসর্পটিভ মোড'। এর বিপরীতে ফ্রিড রেখেছেন 'দ্য থিয়েট্রিক্যাল মোড'। অর্থাৎ একদিকে আত্মনিমগ্নতা ও অন্যদিকে প্রদর্শনী। আধুনিক ফিগারেটিভ পেন্টিং-এর ক্ষেত্রও এই দুই ধারার অনুশাসনে তৈরি। ফ্রিড এই দুই ধারাকেই পারফরমেন্স বা নির্বাহ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ফ্রিডের আলোচনা অনুসরণ করে আমরা বলব, আত্মকথনও এই দুই পারফরমেন্স-এর একত্রিত রূপ। অর্থাৎ, কথক নিজের গভীরে ডুব দিয়ে তুলে আনবেন তাঁর অদ্বিতীয় সব অভিজ্ঞতা এবং তাদের অনন্য সব সত্য। অন্যদিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের প্রশ্নটিও তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে। এই দুই পারফরমেন্স-এর মাঝেই আছে আত্মকথনের সত্য। তাই স্মৃতিচারণ নিছক স্মৃতির চারণ নয়, বরং এক বিশেষ ধারার চারণতাড়িত স্মৃতি। সেই স্মৃতিচারণই আকর্ষণীয় যেখানে স্মৃতি নিয়ন্ত্রণহীন, এলোমেলো। কিন্তু মালিকহীন স্মৃতি কি সম্ভব, না স্মৃতিহীন মালিক? যাকে মালিক বলছি, সে কি এই টানাপোড়েনেই বিষয়ী হয়ে ওঠে?

হেনরি জেমস একবার লিখেছিলেন, "Adventures happen to those who know how to tell them."। কিন্তু এই 'টু নো হাউ টু টেল' এর সূত্রটা কী? নিছকই লিখনের গুণ? লিখনের গুণের কি কোনো ব্যাকরণ নেই? ট্রিস্টিন রাইনার তাঁর বই *ইয়োর লাইফ অ্যাস স্টোরি* তে এই ব্যাকরণের ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট করেই রেখেছেন : "We are interested in 'lives' so far as they are exemplary and representative expressions of culture." এই অনন্যতা ও প্রতিনিধিত্বমূলকের যৌথ দাবিতে আত্মকথক হয়তো বা নিজের অজান্তেই তৈরি করেন নানা কারুসাজ। এসব ছলাকলায় মুগ্ধ পাঠক বিভোর হয়ে পড়বে কী করে নাসপাতি-চোরা একটি ছেলে একদিন সেন্ট

অগাস্টিন হয়ে উঠল। তবেই না জীবনবৃত্তান্ত সার্থক।

কিছুটা বিপণির তাড়না, কিছুটা বৈদ্যুতিন মাধ্যমের চলতি বিপ্লব আর কিছুটা গণতন্ত্রের সর্বজনীন ঢেউ—সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে নানান ঢঙের আত্মকথনের বাজার রমরমা। স্বীকারোক্তি, রিয়ালিটি শো, ব্লগ-জবানি এবং এইরকম নানান মালমশলায় নার্সিসিজমের যে তুফান উঠেছে, তাতে বাজারি ও ভারিক্কি একসঙ্গে ঘেঁটে গিয়ে অন্দর-আখ্যানের এক নতুন ভাষা তৈরি হয়েছে। আর এই ঘূর্ণাবর্তে সাচ্চা-ঝুটা, মুখ ও মুখোশ মিলে মিশে একাকার। আত্মজবানির সত্যনিষ্ঠতার প্রসঙ্গকে ছাপিয়ে গেছে বাস্তব-ভানের আকর্ষণ। এসব থেকে মূল যে প্রশ্নটা উঠে আসছে তা হল : জীবনবৃত্তান্তের স্রষ্টা কে? রুশোর কাছে এর উত্তর সহজ। আত্মজীবনীর লেখক, ন্যারেটার ও মুখ্য চরিত্র একজনই। আর তিনি হচ্ছেন একজন নিঃসঙ্গ শিল্পী, জীবন গহনের পর্যটক, যাঁর আগ্রহ যতটা না জীবনপ্রবাহের সত্যনিষ্ঠ দলিল রচনায়, তার চেয়ে অনেক বেশি জীবনের নানান ঘটনার মুখোমুখি হয়ে মনের বিচিত্র খেলায়। রুশোর ধারণায় আত্মচরিত বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের বাইরে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। আত্ম-তন্ময়তার গভীর ব্যক্তিগত সত্য বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার ফসল হতে পারে না। এই সত্যের অভিধা একমাত্র সেই ব্যক্তিরই যিনি তা উপলব্ধি করেছেন। প্রকৃতি প্রত্যেকটি মানুষকে স্বতন্ত্র এক ধাঁচায় তৈরি করে, যার প্রতিরূপ সম্ভব নয়।

কিন্তু ধরুন, একজন লোক টেপ রেকর্ডারের সামনে বসে নিজের জীবনের গল্প বলে যাচ্ছেন আর অন্য একজন মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছেন, ছুঁড়ে দিচ্ছেন স্মৃতিচারণে সহায়ক ছোটোখাটো তুক, তারপর ওই বয়ানকে সম্পাদনা করে এক লম্বা আখ্যানের ঢঙে প্রকাশ করছেন। সিনেমা ও টেলিভিশনের যুগে আজ অথারশিপের প্রশ্ন অনেক জটিল ও অনিশ্চিত। ফিলিপ লেজুন (Phillipe Lejeune) তাঁর বই অন *অটোবায়োগ্রাফি*তে সাম্প্রতিক এক ফরাসি ছবি, দ্য মেমারি অফ হেলেন-কে নিয়ে এই রকম এক জলঘোলা অবস্থার আলোচনা করেছেন। ছবির চিত্রনাট্যকার হেলেনে এলেখ, পরিচালক আনি মিগনাড ও মুখ্য চরিত্র হেলেনে। ছবিটি যখন বই হিসেবে প্রকাশ পেল, তার নাম দেওয়া হল *দ্য স্টোরি অফ মাই লাইফ*, লেখকের স্বীকৃতি পেলেন হেলেনে এলেখ ও আনি মিগনাড দুজনেই।

এইসব আইনি যুক্তিতর্কের বাইরে রয়েছে এক গভীরতর নান্দনিক ধাঁধা। ধরা যাক, একজন অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষ কারও জীবনের মৌখিক বিবরণকে লিখিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এখানে একই সঙ্গে দুধরনের প্যাসটিস-এর খেলা চলেছে : যার জীবনের গল্প তার পুঞ্জপুঞ্জ স্মৃতি ও এদের মৌখিক বিবরণ এবং এইসব বিবরণী থেকে একটা টানা ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা যার একটা বাজার আছে। কিন্তু নিজের জীবনের কথা লিখতে গিয়েও আমরা কি এই পদ্ধতিরই পুনরাবৃত্তি করি না? একদিকে জীবনের

নানান ঘাতপ্রতিঘাত ও অভিজ্ঞতা—এককথায় ন্যারেটিভ বা আখ্যানের মালমসলা (জোগান)—অন্যদিকে জঁর ও পাবলিকের চাহিদা : এই দুই অক্ষের একজায়গায় মেলা না মেলার খেলা। এক অর্থে নিজের জীবন লিখতে বসে আমরা নিজেই নিজের ব-কলমি লেখক হয়ে পড়ি। এ এক প্যারাল্যাকটিক দশা, দুই চোখে দুই পৃথক দৃষ্টিকোণের সহাবস্থান : একদিকে যে জীবন বিবৃত হবে, অন্যদিকে বিবরণের নিজস্ব জীবন। আত্মচরিতের মিথ্যা-সত্য এই গোলকধাঁধার ফসল। রুশোর কাছে অবশ্যই বাজার-তাড়িত জীবনের সত্য উপলব্ধি গর্হিত ও নিন্দনীয়। নিজের আত্মচরিত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এ আমার আত্মার ইতিহাস এবং এটি লিখবার জন্য আমাকে একটি কাজই করতে হয়েছে—নিজের অন্দরমহলের অনুপুঙ্খ জ্ঞানসঞ্চয়। কিন্তু তাঁকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে, বিষয়ীর নিজের জীবনের অন্তর্গত সত্য শেষ পর্যন্ত আর দশজনের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। কেবলমাত্র পাঠকের মনে বিশ্বাস জাগিয়েই নিজের সত্তার ও অনুভূতির প্রতিশ্রুত স্বচ্ছতা অর্জন করা যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, ন্যারেটিভেরও একধরনের ক্যাপিটাল বা পুঁজি আছে যা সকলের সম্মতি ছাড়া নিরর্থক। পাঠক যেন সার্বভৌম স্বর, আর তার হাতেই ভেটোর ক্ষমতা।

জীবনবৃত্তান্তের বিপণন-কৌশলের মূল লক্ষ্য একটি বাস্তব জীবনের ব্যক্তিগত আলেখ্যকে বাজারগ্রাহ্য করে তোলা। আখ্যানটি যে নিরঙ্কুশ বাস্তব, জীবনটি যে সত্যিই ওইভাবে প্রবাহিত হয়েছে, পাঠকের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। বেঞ্জামিন ভিলকো মিরশি-র *ফ্রাগমেন্টস* (১৯৯৫) নাৎসি অত্যাচারের শিশুর চোখের দেখা একটি মর্মস্পর্শী টেস্টিমোনি। প্রকাশের পরপরই বইটির কাটতি ছিল চোখধাঁধানো। কিন্তু কিছুদিন পরেই অবশ্য এ তথ্য ফাঁস হয়ে যায় যে লেখক আদৌ ল্যাটভিয়ান ইহুদি ছিলেন না বরং পুরোদস্তুর সুইস, ক্রিশ্চান পরিবারের মানুষ যাঁর শৈশবের একটা অংশ কেটেছে সুইজারল্যান্ডের এক চিল্ড্রেন্স হোমে। হলোকস্ট নিয়ে জালি গল্প এই প্রথম নয়। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করা যেতে পারে *ফ্রাগমেন্টস* এর লেখক তাঁর শক্তিশালী কলমটিকে আত্মকথনের জন্য ব্যবহার না করে উপন্যাস লিখতে কেন নিয়োজিত করলেন না। উত্তর সম্ভবত এই যে, আই উইটনেসের—বিশেষত রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার—একটা আলাদা বাজার আছে যা উপন্যাস লিখে সবসময় নাও ধরা যেতে পারে। এভাবেই বাস্তবের পিপাসা কল্পকথার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে যায়। রিয়ালকে ফেক এবং ফেককে রিয়াল করার মজা আর সব কিছুকে ছাপিয়ে যায়, হয়ে ওঠে পঠনক্রিয়ার মূল আকর্ষণ। ফ্যান্টাসির উপাদান পুরোদস্তুর নিংড়ে নেবার জন্য কোনো কোনো রিয়ালিটি শোয়ে হাজির হন একজন সত্যিকারের স্বামী, তাঁর সত্যিকারের স্ত্রী এবং একজন সত্যিকারের প্রেমিক বা প্রেমিকা। প্রাত্যহিক জীবনের টকঝাল থিয়েটার কপি—অরিজিনালের মিশেলে জমজমাট, আর টি-আর-পিও তুঙ্গে।

পাবলিকের স্বীকৃতি ছাড়া ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্যগুলো যদি কোনো সত্যই না হয়, তাহলে প্রাইভেটের কি পাবলিক থেকে পৃথক কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে? একক, বিশুদ্ধ প্রাইভেটের নির্মাণ কি পাবলিকেরই নতুন এক নির্ণয়? এ এক নির্ভেজাল আধুনিক প্রশ্ন, আধুনিক সময়ের সঙ্গেই এর জন্ম। প্রশ্নটা হচ্ছে, আন্তর স্বর যদি ভিন্ন ভিন্ন বহিঃস্বর দিয়েই তৈরি হবে তাহলে এই স্বরের নিজের বিশেষ রূপটি অর্জন করার শর্তগুলো কী? ইন্টিরিয়রের সঙ্গেই বা বিষয়ীর যোগসূত্র কী? শব্দের সঙ্গে বস্তুর মেলবন্ধনেই শব্দের অর্থ লুকিয়ে আছে—এভাবেই আমরা ভাবতে অভ্যস্ত। আর এই ভাবনা থেকেই আমাদের মনে একান্ত ব্যক্তিগত বস্তুর ভ্রম জন্মায়। মনের অন্দরের রহস্য নিয়ে, সেখানে উপস্থিত নানা বস্তুর ছায়া আবছায়া নিয়ে আমরা যতই লেখাজোখা করি না কেন, ভাষার কিন্তু ইনার বা অন্তর্লোক বলে কোনো আলাদা ক্ষেত্র নেই। ভাষার মাপকাঠিতে এর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অথচ ইনার-এর পুরো অস্তিত্বই ভাষা নির্ভর। আমরা ব্যক্তিমানুষ যেভাবে ভাষাকে আত্মস্থ করি, স্বতঃস্ফূর্ত এমন কি 'বে-আইনি' ব্যবহার করি তাতেই আমাদের অন্তঃস্থ জীবন তার বর্ণময়তা, বৈচিত্র্য, সম্পন্নতা খুঁজে পায়। এভাবে ভাবতে গেলে 'ব্যক্তিগত' মূলত যৌগিক একটি পরিসর—বৃহৎ অর্থে ভাষার মৌলিক সামাজিকতার স্বীকৃতি।

প্রামাণ্য আত্মজীবনী

প্রামাণ্য আত্মজীবনীগুলি খুঁটিয়ে পড়লে, পাবলিক ও প্রাইভেটের গোলকধাঁধা কিছুটা পরিষ্কার হয়। এ ধরনের আত্মজীবনীর রকমফের অনেক। তবু, এক জায়গায় এদের সবার গভীর মিল : অন্তরাত্মার সঠিক মানচিত্রটি খোঁজা লেখকের সমনন তাগিদ এবং সেই সঙ্গে নিজের জীবনের দুর্মেয় সত্যগুলোকে পাঠকের দরবারে তুলে ধরবার সাহস। সাধারণত ধরে নেওয়া হয়, চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে লেখা সেন্ট অগাস্টাইনের *কনফেশনস* জীবন আলেখ্যর প্রথম স্বীকৃত নমুনা। বৃত্তান্তটি আদতে সময়ের মাপকাঠিতে নিজের জীবনের গভীর রূপান্তরের এক কাহিনী। কী করে লেখকের প্রাত্যহিক চালচলতি ও ধ্যানধারণা সময়ের সঙ্গে পাল্টে যেতে থাকে আর এই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সান্নিধ্যে আসা মানুষজনও কীভাবে প্রভাবিত হয়—আত্মকথনটি তারই এক চিত্তাকর্ষক বয়ান। নিজের জীবনের গল্প বলতে গিয়ে অগাস্টিন কেন্দ্রে রেখেছেন তাঁর খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ঘটনাটি। তাগিদের অভাব ছিল না, তবু নানা কারণে দীক্ষাগ্রহণ সম্ভবও হচ্ছিল না। আর এই প্রত্যাশিত মুহূর্তের বিলম্বকেই অগাস্টিন তাঁর জীবনকথনের আখ্যান-কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত সুচারুভাবে, মেলে ধরেছেন নিজের মানস নিসর্গ। আত্মজীবনীর অনেকখানি জায়গা জুড়ে যৌনলিপ্সা-বিমুক্ত হওয়ার নিরবচ্ছিন্ন লড়াই। এ সবই টানটান রাখে পাঠকের কৌতূহল। চতুর্থ শতাব্দীতে লেখা হলেও

এখানেই অগাস্টিনের বিশেষতা—আধুনিক প্রহরের বহু বহু পূর্বেই যেন আধুনিকতার পরিকল্পটি পুরোদস্তুর তৈরি হয়ে গেল।

আমাদের সময়ের কাছাকাছি আসা যাক। মহাত্মা গান্ধির *মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ* একটি ক্লাসিক আত্মচরিত। এখানেও দেখব, মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে আত্মপ্রবৃত্তির উপর চুলচেরা নজরদারি। গান্ধিজী কেন নিজের জীবনের কথা লিখবেন, আত্মজীবনী তো পাশ্চাত্যের ব্যাপার? *এক্সপেরিমেন্টস* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার শুরুতে এ প্রশ্ন করেছিলেন তাঁর অনেক অনুগামী। বিভিন্ন নৈতিক প্রশ্নে গান্ধির যা অবস্থান, তা তো পাল্টেও যেতে পারে ভবিষ্যতে। এভাবে তিনি পাঠকদের বিভ্রান্ত করছেন না কি? এসব সংশয়ের উত্তরে গান্ধি যা বলেছিলেন তা মোটামুটি এরকম : অটোবায়োগ্রাফি পশ্চিমি ধারা হতে পারে, কিন্তু গান্ধিতো তা লিখছেন না। তিনি যা লিখছেন তা এককথায় নিজের জীবনে সত্যের সঙ্গে নানান পরীক্ষানিরীক্ষার গল্প। অটোবায়োগ্রাফির লেখক জীবনের হাজারো ঘটনার কথা লেখেন মূলত গল্প বলার মজার গরজেই। আর গান্ধি শোনাচ্ছেন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক এক প্রকল্পের কথা যার মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর সহযাত্রীদের সঙ্গে এক দীর্ঘস্থায়ী সংলাপে নামতে পারেন। কিন্তু একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা পোক্ত আইনজ্ঞের ঢঙে গান্ধি একথাও জুড়ে দিলেন, যেহেতু তাঁর জীবন মূলত সত্যের সঙ্গে এক ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার গল্প ব্যতীত আর তেমন কিছু নয়, তাই তিনি যা লিখছেন তা কমবেশি জীবন বৃত্তান্তের রূপই নেবে। কথাটি বলার মধ্যে দিয়ে গান্ধি আসলে পাঠককে তাঁর অটোবায়োগ্রাফির মূল আকর্ষণের হদিশই দিলেন। যা একান্তই ব্যক্তিগত তাকে গান্ধি হাজির করিয়েছেন নৈর্ব্যক্তিক, প্রায় নির্মম বিশ্লেষণের আদালতে। আর এভাবেই ঘুচিয়েছেন প্রাইভেট ও পাবলিকের ভেদ। বইটি গান্ধির জীবনের চূড়ান্তভাবে প্রাইভেট ও পাবলিক একটি বয়ান। এক অর্থে বলা যায় র‍্যাডিকালি পাবলিক থ্রু র‍্যাডিকালি প্রাইভেট মিনস।

অগাস্টিনের আত্মজীবনী যদি প্রত্যাশিত ঘটনার ক্রমবিলম্বের আখ্যান-কৌশলের মধ্যে এগোতে থাকে, গান্ধি তাঁর আত্মকথনের গোড়াতেই নিজের অভিপ্রায়ের কথা সরাসরি বলেছেন : আত্মোপলব্ধি, সাক্ষাৎ ঈশ্বর দর্শন, মোক্ষলাভ। গান্ধির বিশ্বাস ছিল মোক্ষলাভের জন্য সবার প্রথমে সত্তাকে ইন্দ্রিয়ের তাড়না থেকে মুক্ত করা দরকার। আর এজন্য তিনি নিজের শরীরকে এক অর্থে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে রূপান্তরিত করেছিলেন। (লক্ষ করুন, তাঁর আপাত খামখেয়ালি পরীক্ষানিরীক্ষাগুলোর জন্য গান্ধি প্রায়শই কোনও না কোনও পশ্চিমি 'বৈজ্ঞানিক' ম্যানুয়ালের সাহায্য নিতেন)। গান্ধির কাছে সবার প্রথমে সত্য, তার পর আসে ধর্ম। এই সত্য অনতিক্রম্য, সম্যক, অনাপেক্ষিক। তবু এই সত্য অজানা থেকে যাবে (অনেকটা কান্টের নৈতিক ধাঁচার noumena-র মতো)। কিন্তু সত্যের নিঃশর্ত অন্বেষণ চিন্তায় আনে ঈশ্বরের প্রতি পরম আস্থা। গান্ধির নৈতিক

প্রকল্পের এই সংক্ষিপ্ত বয়ান থেকেও বোঝা যায় তাঁর সত্যের সন্ধান ভারতীয় সনাতনী অতীন্দ্রিয় সত্তার খোঁজ থেকে অনেকটাই আলাদা।

গান্ধির জীবনের প্রত্যেকটি এক্সপেরিমেন্ট যেন চির অধরা সেই দিশার দিকে এক একটি ধাপ। ছোট্ট মুনিয়ার ছটফটানি, বালক মোহনের বিষাদ, লন্ডনের ড্যান্ডি যুবক, দক্ষিণ আফ্রিকার পাবলিক ফিগার, দেশে প্রত্যাবর্তন ও জাতীয় রাজনীতির নেতৃত্ব এবং শেষ পর্যন্ত এমন এক অধ্যায়ে আসা যখন ব্যক্তিগত বলে আর কিছুই রইল না : ডেভেলাপমেন্টাল এই গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ অসহ্য নৈতিক বাগাড়ম্বর ঠেকতেই পারত, ঠেকে না কারণ গান্ধির লিখন, তাঁর তির্যক রসবোধ এবং সর্বোপরি সত্যের প্রতি নিঃশর্ত অনুরাগ (যদি বা তা হয়তো কিছুটা খ্যাপাটে, খামখেয়ালি)। ইতিহাসচর্চায় ব্যক্তি গান্ধির যাই মূল্যায়ন হোক না কেন, অন্তত *এক্সপেরিমেন্টস*-এর প্রোটাগনিস্টের ছবিটা এইরকমই। আত্মচরিতটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। খানিকটা খুঁটিয়ে দেখলে নজরে আসবে এক জটিল কাঠামো। জীবনবৃত্তান্তটির মূলে রয়েছে ছেলেবেলার দুটি স্মৃতি অনুষঙ্গ। এক, পিতার মৃত্যু-শয্যায় গান্ধির বহু আলোচিত যৌন-তাড়না। এই অসুস্থ পিতাকেই তরুণ গান্ধি শুশ্রূষা করেছিলেন মাতৃস্নেহে। দ্বিতীয়টি নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি। অথচ, পোরবন্দরের কট্টর বৈষ্ণব দিওয়ানের এই ছেলেটির সঙ্গে রাজকোটের মুসলমান পুলিশ প্রধানের ছেলে শেখ মেহতাবের দোস্তি অসাধুতার এক ধারাবাহিকতা এনে দিয়েছিল কিশোর গান্ধির জীবনে : মাংস, সিগারেট এবং শেষ পর্যন্ত বেশ্যালয়, আত্মহত্যার হাস্যকর প্রয়াসে যার সমাপ্তি। মেহতাব রূপকটির তাৎপর্য ও জটিলতা কিছুটা পরিষ্কার হবে গান্ধির জীবনের পরের অধ্যায়ে, যখন তিনি বিলেতে। দেশে থাকাকালীন গান্ধি তাঁর ছেলেমানুষ বৌকে অযথাই জ্বালিয়েছেন ভিত্তিহীন নানা সন্দেহের বশে। কিন্তু বিলেতে গিয়ে প্রায় নিরক্ষর এবং ততদিনে তরুণী এই মহিলাকে লেখা গান্ধির চিঠি আসত মেহতাবের ঠিকানায়। মেহতাবের ওপর দায়িত্ব ছিল বরের লেখা চিঠি কস্তুরবাকে পড়ে শোনানো। মেহতাবের সঙ্গে গান্ধির দোস্তি, মায়ের গভীর আপত্তি সত্ত্বেও, দেশ ছাড়বার বহুদিন পরেও অটুট ছিল। গান্ধির আত্মচরিতে পুরো ব্যাপারটাই গোপন রাখা হয়েছে। আর এখানেই আত্মচরিতের, তা সে যারই হোক না কেন, সত্যমিথ্যার খেলা।

মায়ের কাছে ওই বন্ধুত্বের খবর গোপন রাখলে কি হবে, লন্ডনে যুবক গান্ধি নিজেকে নৈতিকতার পথে ধরে রাখতে বার বার স্মরণ করেছেন (এবং অন্যদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন) মাকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি। গান্ধির জীবনীকার এরিক এরিকসন এই প্রতিশ্রুতির ভেতর দেখতে পান একধরনের মাদার ট্রান্সফারেন্স যা গান্ধিকে সাহায্য করেছে মেহতাব রূপকের দুষ্ট পথ থেকে ক্রমশ সরে আসতে (*গান্ধিস ট্রুথ*)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গান্ধির মায়ের মৃত্যুর পর এই দোস্তির যা অবশিষ্ট ছিল তাও অচিরেই

উবে যাবে। মাকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতির পুনঃ পুনঃ স্মরণের বন্ধন থেকে গান্ধি বেরিয়ে এসেছেন সম্পূর্ণ নিরামিষাশী হবার এক সচেতন এবং নিজের ধারণায় 'যুক্তিনিষ্ঠ' সিদ্ধান্তের সাহায্যে। এ ধরনেরই এক বৌদ্ধিক আত্মনির্বাচন তাঁকে আবার নিতে দেখব বেশ কয়েকবছর পর যখন দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালের পথে গান্ধিকে বাক্সপ্যাঁটরাসমেত রেলস্টেশনে জোর করে নামিয়ে দেওয়া হয়। শীতের ঐ তমসাচ্ছন্ন রাতে গান্ধি যুক্তিনির্ভর এক শপথ নিয়েছিলেন এবং তা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ। বাকিটা ইতিহাস।

যুক্তিনিষ্ঠ সচেতন সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে জীবন হয়ে উঠেছিল একটানা একের পর এক এক্সপেরিমেন্ট। দৈনন্দিন শারীরিক প্রক্রিয়া গান্ধি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করেছেন, অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন রন্ধন ও আহারের জৈব সিমিওটিকস। এর সঙ্গে ফুকো বর্ণিত সত্তার খ্রিস্টিয় হারমেনিউটিকসের আত্মানুসন্ধান ও ভোগবিমুখতার নিযত ও অমোঘ আবর্তের মিল খোঁজা যেতে পারে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, গান্ধির পরীক্ষানিরীক্ষাগুলির সঙ্গে খ্রিস্টিয় হারমেনিউটিকস বা আধুনিক সাইকোঅ্যানালিসিস কোনোটারই তেমন মিল নেই। বরং বাসনা ও প্রবৃত্তির শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিরোধের এক নতুন পথ গান্ধি ভাববার চেষ্টা করেছেন। গান্ধির কথা মানলে সত্যাগ্রহকে দেখা যেতে পারে সত্তার সত্যনিষ্ঠ রূপটির বিস্তার এবং আত্ম ও অপরের সম্পর্কের পুনর্লিখন হিসেবে। এই ধারাতেই লিবারাল শাসনের সমালোচনা গান্ধি করেছেন লিবারালিজমের নীতির স্বঘোষিত শুদ্ধতার ওপর নির্ভর করেই। ব্যাপারটা স্পষ্ট হয় *এক্সপরিমেন্টস* এর চম্পারণ পর্বে।

জীবনবৃত্তান্ত, জীবনের স্বাভাবিকীকরণ ও সামাজিক পুলিশ

বাবার সঙ্গে যৌন সম্পর্কের কথা ক্যাথরিন হ্যারিসন তাঁর বই *দ্য কিস* (১৯৯৮)-এ খোলামেলাভাবে বর্ণনা করে সম্প্রতি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন ঠিকই, কিন্তু সামাজিক নৈতিকতা লঙ্ঘনের দায়ে মার্কিন আইন তাঁকে ছেড়ে দেয়নি। সমাজ-কারণিকের প্রতি অবাধ্যতার দায়ে অস্বাভাবিক চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত হবার সম্ভাবনার এরকম আরও ভূরিভূরি উদাহরণ দেওয়া যায়।

মুশকিলটা হচ্ছে কুয়াশার রাতে রাস্তার পাথুরে আলোর মতো ওই কারণিক ধারাটি যে আমাদের চেতনে, অচেতনে জেগে আছে। কানুনের শাসানি তো আছেই, কিন্তু তার চেয়েও যা অনেক বেশি কার্যকর তা হল সামাজিক রীতিনীতি, যার সঙ্গে ছেলেবয়স থেকেই লালনপালনের সূত্রে আমাদের অবিচ্ছেদ্য যোগ। আপাত খেয়ালখুশিপনায় ভরা আমাদের জীবনের গল্পগুলোর মধ্যেই সামাজিক ব্যক্তি হয়ে উঠবার প্রয়োজনীয় শর্তগুলো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। একমাত্র ব্যক্তিরই গল্প থাকতে পারে। তাই এই গল্পগুলো

বলতে এবং শুনতে আমাদের উদ্যোগের অভাব নেই। এই গল্পগুলো বলার মধ্যেই আমরা জানাই সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে আমাদের দাবি। অন্যদিক থেকে দেখলে গেলে, এই গল্পগুলো বলার মধ্যে দিয়েই আমরা সামাজিকতায় তালিম নিই। অর্থাৎ ন্যারেটিভের কানুন ও রীতিনীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক আইডেন্টিটির কৃৎকৌশল। এজন্যই আত্মকথন নিজস্ব পোয়েটিকসে সমৃদ্ধ একটি জঁর।

মিশেল ফুকো পশ্চিমি আধুনিকতার একটি উৎসের সন্ধান পেয়েছিলেন আইনি দরবারের প্রাথমিক এক পরিবর্তনে। আঠারো শতকের শেষভাগে এবং বিশেষত উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে অপরাধের দণ্ডবিধানে 'হোয়াট ইজ দ্য ক্রাইম?'—এই প্রশ্নকে ছাপিয়ে গুরুত্ব পেতে শুরু করল অন্য এক প্রশ্ন : 'হু ইজ দ্য ক্রিমিনাল?' অর্থাৎ অপরাধীর ' অ্যাক্ট' নয়, তার বায়োগ্রাফি। অপরাধীর অনুপ্রেরণা, প্রবণতা, কামনাবাসনা, পারভারশান—এসব প্রশ্ন থেকেই তৈরি হল homo criminalis ধারণা।

ষোলো বছরের হেতাল পারেখকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসির হুকুম নিয়ে এ শহর তথা বাঙলার উদ্বেলতার কথা পাঠকের নিশ্চয়ই মনে থাকবে। যা আমরা দেখেছিলাম তা সংক্ষেপে ধর্ষণের বিষণ্ণ এক উৎসব। কর্তা-গিন্নি থেকে ভিস্তিওয়ালা সবারই জজসাহেবের রায় নিয়ে নানান বক্তব্য। লোকগাথা, নাটক, যাত্রায় বাজার ছমছম। কোর্টের আটক না থাকলে এতদিনে বোধহয় কয়েকটা মেগাসিরিয়ালও হয়ে যেত। ধনঞ্জয়ের জীবনের কোনা-ঘুপচি সব কিছুই খবর। ওর স্ত্রী কি ওর সম্বন্ধে যৌন ব্যভিচারের অভিযোগ এনেছে? ও স্কুলে কেমনটি ছিল? ওর বাবা কি সত্যিই একজন দরিদ্র নিষ্ঠাবান পূজারী? ধনঞ্জয় কি নিঃসঙ্গ কারাবাসের শেষ দিনগুলো গীতা পাঠে কাটিয়েছে? সবকিছুই যেমন খবর, সব দৃশ্যই তেমনি ছবি। ফ্রন্টপেজের ছবি : ধনঞ্জয়ের শীর্ণ উপবাসী পিতা ঠাকুরদালানে শুয়ে আছেন। ধনঞ্জয়ের বায়োগ্রাফি নিয়ে যারপরনেই আগ্রহ আমজনতার। আর এই আগ্রহের তোড়ে ক্রিমিনাল ছাপিয়ে যায় ক্রাইমকে।

আপনকথা বা জীবনের গল্পকে পড়া দরকার স্বাভাবিকীকরণ প্রকল্পেরই অংশ হিসেবে। বারান্দাঘেরা স্কুলমাঠে ছেলেছোকরারা প্রাণভরে হুটোপাটি করে, কিন্তু আবার একটা মাত্রা ছাপিয়ে গেলে হেডস্যারের ঘরে ডাকও পড়ে। অর্থাৎ হুটোপাটি করার সময়ও ছেলের দল জানে, নজর রয়েছে। এভাবেই চলে স্বাভাবিকতার তালিম। একভাবে দেখতে গেলে আত্মকথনও এই তালিমেরই অংশ। দুক্ষেত্রেই রয়েছে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি ও প্রয়োগ। আবার দুক্ষেত্রেই প্রোথিত আছে লিবারেলিজমের স্বাভাবিকীকরণ, আত্ম উন্নয়নের প্রকল্প। আত্মকথনের হেডস্যার অবশ্যই জঁর।

ঝঞ্ঝাট হয় ধনঞ্জয়ের মতো চরিত্রকে নিয়ে। তাদের আমরা কোন মাপকাঠিতে বিচার করব? এই সব বেয়াড়া চরিত্রের স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক মানদণ্ডে অবস্থান বুঝতে ফুকো

মনস্টার এর সেকেলে সংজ্ঞা পালটে নতুন অর্থ সংযোজন করেছেন। এসব চরিত্র আইনি বিচারে ঘরেরও নয়, বাইরেরও নয়—এঁরা দোরগোড়া বা থ্রেসোল্ড। সনাতনী ধারায় 'মনস্টার' হচ্ছে বাহ্যত কিম্ভূতকিমাকার এক মানুষ-পশু-যেমন ধরা যাক দুই মাথাওয়ালা যমজ বা এক চোখের মুখ বা হার্মোফ্রোডাইট। সাধারণভাবে ধরেই নেওয়া হত, বিকলাঙ্গ দেহের, রাক্ষুসে চেহারার মানুষের মনগুলোও নিশ্চয় অনুরূপভাবে বিকলাঙ্গ, রাক্ষুসে হবে। কানগুলহাইম একে বলেছেন, জুরিডিকো ন্যাচারাল কমপ্লেক্স। (প্রসঙ্গত লাতিন মনস্ট্রেট কথাটার অর্থ প্রদর্শিত, দৃশ্যত)। কানগুলহাইমের ধারণায় মনস্ট্রসিটির প্রাথমিক শর্ত মনস্ট্রাসনেস। কারণ ও পরিণাম। অন্তত তিনি সমীকরণটা এভাবেই তৈরি করেছিলেন। নরমেটিভ বিচারে একটি পড়বে ডাক্তারির কোঠায় (মনস্ট্রাসনেস), অন্যটি আইনের (মনস্ট্রসিটি) : 'দ্য ইমপসিবল অ্যান্ড দ্য ফরবিডন'। কিন্তু ফুকোর কাছে সম্পর্কটা কার্যকারণের নয়, বরং এফেক্ট-এর। আর এই যুক্তি ধরেই মনস্টার-এর নতুন সংজ্ঞা দাঁড়াল : অ্যাবনর্মাল ইন্ডিভিজুয়াল। মনস্ট্রসিটি-র জন্য আর শারীরিক মনস্ট্রাসনেস-এর কোনো প্রয়োজন রইল না। এই পরিবর্তন সম্ভব হল তখনই যখন ক্ষমতা ও জ্ঞানের আধুনিক বিন্যাসে শরীর থেকে বেশি গুরুত্ব পেল চরিত্রের প্রবণতা, স্বভাব, প্রবৃত্তি (যাদের ফুকো এককথায় বলবেন 'soul') : "the figure of the monster now serves as a magnifying model for every little duration, a principle of intelligibility of all the forms that circulate as the small change of abnormality."[অ্যাবনর্মাল, পৃ ৫৬]

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের *এ প্রিন্সলি ইমপস্টার* পূর্ববঙ্গের ভাওয়াল এস্টেটের উত্তরাধিকার নিয়ে অনবদ্য একটি আইনি আখ্যান। ঢাকা থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে লন্ডন—পঁচিশ বছর ধরে চলতে থাকা এই নাটকের আকর্ষণ প্রধানত দুটি কারণে। একদিকে যেমনি সন্ন্যাসী/মেজকুমার—এর স্নায়বিক ভারসাম্য নিয়ে চলবে চুলচেরা বিচার—(স্নায়ুবিকল মানুষের সাক্ষ্যপ্রমাণ কোনো কাজে আসে না, যেমন থাকে না সম্পত্তির ওপর তার যথাযোগ্য দাবি), অন্যদিকে, ওই সন্ন্যাসীই প্রকৃত মেজকুমার না জালি, তা যাচাই করার জন্য ঘেঁটে দেখা হবে দার্জিলিঙের হোটেলের রেজিস্টার, দর্জির কাছে রাখা তার কোটের মাপ, রানিমার শরীরের গোপন চিহ্ন সংক্রান্ত তার জ্ঞান এবং এরকম বিচিত্র অনেক কিছু। মেজকুমারকে ঘিরে রগরগে নাটকের ঢেউ জাতীয় রাজনীতির আঙিনাতেও ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু এতশত কিছুই সম্ভব হত না, যদি না 'ডিসিপ্লিন' ঘাঁটি গাড়ত আধুনিক আইনের পরিসর জুড়ে। অর্থাৎ, নিছক শাস্তিবিধান নয়, আইনের প্রধান আকর্ষণ হবে চরিত্রের অস্বাভাবিকতা, বিচ্যুতি, ব্যভিচার।

মেজকুমারের জীবনের ছোটোবড়ো সত্য, আইনি অভিধায় তাদের অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে তর্কবিতর্ক, বয়ে চলা বর্ণময় রাশিরাশি ঘটনাপুঞ্জের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ও বিশ্লেষণের

মধ্যে দিয়ে মানুষটির ছবি আমরা আঁকতেই পারি, তুলে ধরতে পারি সেই ছবি বৃহত্তর সামাজিক রাজনৈতিক আঙিনায়, কিন্তু তা ততক্ষণই যতক্ষণ মেজকুমারের কথায় আপাত স্ববিরোধ সত্ত্বেও একটা প্রাথমিক আত্মসঙ্গতি রয়েছে। ওই সঙ্গতির জোরেই তাঁর স্ববিরোধী উক্তিগুলোর চুলচেরা আইনি বিশ্লেষণ সম্ভব। কিন্তু ধরা যাক অলিভার স্যাক্স এর *দ্য ম্যান হু মিসটুক হিজ ওয়াইফ ফর অ্যা হ্যাট* (১৯৮৭) আখ্যানটির কথা, সেখানে লেখক জনৈক 'Mr. Thompson' (উদ্ধৃতি চিহ্নটি খেয়াল করুন)-এর নিজের জবানিতে দিনযাপনের কথা বলছেন। টমসন একটানা নিজের কথা বলতে গিয়ে মাঝেমাঝেই সম্পূর্ণ অসংলগ্ন কথাবার্তা বলেছেন। আখ্যানের এই উদ্‌বৃত্তকে ধরে রাখার জন্য গূঢ় আরেকটি ন্যারেটিভ অলিভার স্যাক্সকে ভজাতে হয়েছে। মস্তিষ্কের আঘাতের জন্য টমসনের স্মৃতিবিভ্রাট ঘটে এবং সেকারণেই সংলগ্ন কথাবার্তা মাঝেমাঝে আবোলতাবোল হয়ে যায় (কোরসাকভস সিন্ড্রোম)। অর্থাৎ, টমসনের অস্বাভাবিকতা স্নায়বিক রোগ হিসেবে চিহ্নিত করে লেখক এর অন্য কোনো ব্যাখ্যার বালাই সেরেছেন। তাই টমসনের কথনের কোনো মূল্য নেই (ডাক্তারি মূল্য ছাড়া), যেমনি নেই লোকটার কোনো ব্যক্তিসত্তা। অলিভার স্যাক্স-এর ভাষায় "He has been pithed, scooped-out, de-souled, by disease." (পৃ. ১১৩)

আখ্যান ও মানসিক ভারসাম্যের আলোচনায় পাবলিক-এর বহু আলোচিত জেরবারি প্রসঙ্গে আরেকবার আসা যাক। ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। তখন স্কুলে পড়ি। অনেক সময় দেখতাম ভোরের দিকে বা দুপুরে কিংবা সন্ধ্যায় এক ভদ্রলোক হনহনিয়ে পাশের গলিটা ধরে হেঁটে যাচ্ছেন। আর কীসব ইংরেজি ঊর্ধ্বশ্বাসে বলে চলেছেন। সেসব কথার বেশিরভাগই আমরা ছেলেছোকরারা উদ্ধার করতে পারিনি কারণ আমাদের ইংরেজি জ্ঞান বড়ই সীমিত, অন্যদিকে ভদ্রলোক হড়হড়িয়ে বলে চলেছেন যেন আজই কথা বলবার তাঁর শেষদিন। বাঙালি দুটি কারণে প্রলাপ বকে—এক, প্রেমে দমকা হোঁচট খেলে; দুই, জমা দেওয়ার আগের রাতে থিসিস চোট হয়ে গেলে। আমরা কেন জানি না ঠিক করেছিলাম, ভদ্রলোক দ্বিতীয় দলের প্রার্থী। আর থিসিস যখন খোয়াই যাবে তখন তা লন্ডনে যাওয়াই ভালো। অর্থাৎ, ভদ্রলোককে ঘিরে যে ফোকলোর তৈরি হল তা অনেকটা এইরকম : এই সুদর্শন লোকটি পূর্ববঙ্গের কোনো জমিদার বংশের ছেলে, বড়ো স্কুলে পড়ার সুবাদে ঘোড়ায় চড়া এবং ইংরেজি বলা দুটোই ছোটোবয়স থেকে রপ্ত ছিল, তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে ফার্স্ট হয়ে লন্ডনে কোনো একটি দুরূহ অঙ্কের মডেল সলভ্ করছিলেন। থিসিসটি বেরোলেই নোবেল প্রাইজ একেবারে বাঁধা ছিল। ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে কোনো এক মাদ্রাজি বস্তুটিকে লোপাট করে দেন আর তা থেকেই লোকটির এই দশা। (যদিও আমি একবার মনে হয় ওঁর এই ভুরভুরে ইংরেজির মধ্যে একটি বাক্য উদ্ধার করতে পেরেছিলাম— 'it's rain-

ing cats and dogs' এবং সেই সূত্রে আমার ধারণা হয়েছিল উনি আসলে আমাদের মতো কোনো এলেবেলে স্কুলের ইংরেজি স্যার ছিলেন।) ভদ্রলোক হনহনিয়ে হেঁটে যেতেন, ভুক ভুক করে ইংরেজি বকতেন, মাঝে মাঝে পাড়ার জটলায় আমাদের সামনে দাঁড়াতেন আর যেন অনেক অভিযোগ আছে এ ভঙ্গিতে আঙুল তুলে কীসব আমাদের বলতেন, তারপর আবার একইরকম তাড়ায় হেঁটে চলে যেতেন। কিছু বুঝতাম না, ওঁর কথাগুলো তুবড়ির শেষ ফুলকির মতো চোখের সামনে ভাসত, আমরা একসময় ব্যাপারটা ভুলে যেতাম। অলিভার স্যাকস এর চরিত্রটির মতোই ইংরেজিনবিশ এই লোকটির অস্বাভাবিকতা নিয়ে আমাদের মনে কোনো প্রশ্ন জাগত না। স্যাকস যেমন নিজের স্বাভাবিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নি, তেমনি আমরাও আমাদের অবস্থান নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিত ছিলাম না।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বইটির একটি অধ্যায় জুড়ে আছে ব্যক্তির আইডেন্টিটি ও মানসিক ধারাবাহিকতা নিয়ে মজার মজার নানা ধাঁধা ও চিন্তাবিদদের চুলচেরা নানান তর্কাতর্কির বিবরণ। সতেরো শতকে ইংরেজ দার্শনিক জন লকের কাছে প্রশ্নটা ছিল অনেকটাই সোজাসাপটা : ব্যক্তি-সত্তার (personhood) প্রাথমিক শর্ত হল আত্ম-চেতনার অব্যাহত ধারা। এই ধারা বলতে লক ব্যক্তিস্মৃতির প্রবহমানতাকেই বুঝিয়েছিলেন। প্রশ্নটা এখন আর অবশ্য এতটা নিরঙ্কুশ, এতটা সাদাকালো নেই। আজ ব্যক্তির বড়রকমের স্মৃতি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মানসিক ধারাবাহিকতা স্বীকার করা হয়, যদি অবশ্য দেখান যায় ওই বিচ্যুতির পেছনে রয়েছে স্বাভাবিক কোনো কার্যকারণ। যেমন ধরুন *হারানো সুর* ছবিতে উত্তমকুমারের স্মৃতিবিলুপ্তি তাঁকে অস্বাভাবিক মানুষ করে না, কারণ ঐ বিলুপ্তি একটি দুর্ঘটনার পরিণাম।

মনস্তাত্ত্বিক পারফিট আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন, শুধু স্বাভাবিক কার্যকারণ নয়, যে কোনো বিশ্বাসযোগ্য কারণ, এমনকি যেকোনো কারণ-ই মানসিক ধারাবাহিকতা, তথা ব্যক্তির আইডেন্টিটি স্বীকার করার জন্য জুতসই শর্ত। মেজকুমারের অনেকটা সময় জোড়া জীবন ভাওয়াল সন্ন্যাসীর স্মৃতিতে ছিল না। তাহলে তিনি কি মেজকুমার নন? পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, সন্ন্যাসীর স্মৃতির ব্যাহত ধারার কোনো ঠিকঠাক স্বাভাবিক কারণ যদি নাও পাওয়া যায়, তাহলে পারফিটের সূত্র ধরে যে কোনো কারণই সই। হতেই তো পারে, নাগা সন্ন্যাসীদের যে সব টোট্‌কা, ভোমচুকি দাওয়াই মেজকুমারের জীবনরক্ষা করে, তাদের ক্রিয়াবিক্রিয়াতেই আবার তাঁর স্মৃতি বিলুপ্তিও ঘটেছিল? কিন্তু মানসিক ধারাবাহিকতার সংজ্ঞা আমরা যতটাই নমনীয় করি না কেন, প্রশ্ন তবু থেকেই যাবে ওই আমাদের 'Mr. Thompson' এর মতো চরিত্রগুলোকে নিয়ে—অর্থাৎ, সেসব মানুষ যাদের স্মৃতিবিলুপ্তি যখন-তখন বারংবার ঘটেছে। এসব চরিত্রকে কি আইনি বিষয়ী বলে গণ্য করা যেতে পারে? পারফিটের মানদণ্ডে তো বটেই, অন্যান্য যেসব

মনস্তাত্ত্বিকদের আলোচনা পার্থ চট্টোপাধ্যায় করেছেন, তাঁদের সবার নিকষেই Mr. Thompson এর আইডেন্টিটির অধিকার থাকতেই পারে কারণ তার স্মৃতিবিচ্যুতির একটি স্বাভাবিক ডাক্তারি ব্যাখ্যা আছে—দুর্ঘটনাজনিত কোরসাকভস সিনড্রোম। কিন্তু 'Mr. Thompson'-এর ব্যাধির স্বরূপ এমনই যে তার মস্তিষ্ক এখন একরকম, অন্যসময়ে অন্যরকম ব্যবহার করে। এই সত্যকে মেনে নিলে পর আইডেন্টিটি ও আইনি বিষয়ীর সংজ্ঞাটা কি দাঁড়াবে, আমাদের ভেবে দেখা উচিত। ফরাসী দার্শনিক রিকোর-এর লেখা অনুসরণ করে পার্থ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি চরিত্রের নানা পরিবর্তনের মাঝে এক ধরনের স্থায়িত্ব এনে দেয়। কিন্তু যে গঠন-বিন্যাসের সুবাদে মন সময়ের সঙ্গে তাল রেখে নানা পরিবর্তন অভিযোজন করতে পারে, তা নিজেই যদি কখনোসখনো ন্যুব্জ হয়ে পড়ে, তাহলে ছবিটা কি দাঁড়াবে? দর্শনে উত্তরগঠনবাদ বা পোস্টস্ট্রাকচারালিজমের অভিঘাতের পর—যখন বিষয়ীর সংহত রূপই এক অর্থে আকস্মিক, বরং অনেক মৌলিক তার অসম্পূর্ণ, অস্থায়ী, আধখেঁচড়া চেহারাটা—স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকতার বিচারে আইডেন্টিটির প্রশ্ন তখন 'Mr. Thompson' বা ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মতো বিশেষ চরিত্রের চৌহদ্দিতে আটকে থাকে না, চলে আসে আমার, আপনার এবং আমাদের মতো স্বাভাবিক চরিত্রের সত্তার গহনে। যাকে আমরা স্বাভাবিক বা নর্মাল বলি, হয়তো Mr. Thompson এর ব্যাধি, তারই এক স্ফীত, অতিরঞ্জিত, অসম্বোধিত রূপ। স্মৃতি, বায়োগ্রাফি ও গল্পের মিশেলে ব্যতিক্রমী ইতিহাস চর্চা যতটা না লিখন ও তথ্য সমন্বয়ের প্রশ্ন, তার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানতত্ত্ব বা এপিস্টিমোলজির।

নৈতিক অনুশাসন, সাক্ষ্য-প্রযুক্তি ও নিম্নবর্গীয় প্রাত্যহিকতা

ফুকো ১৯৭৯ সালে দেওয়া ট্যানার বক্তৃতার শিরোনাম রেখেছিলেন বড্ড খটোমটো 'Omnes et Singulatim : Towards A Critique of Political Reason' সম্পাদক ঐ লাতিন শব্দবন্ধের অর্থ করেছেন 'Everyone together and each individually'। অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই সমষ্টি আর সমষ্টির ভেতরেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ফুকোর চিন্তায় 'একক-সমষ্টির' বৈপরীত্যের সহাবস্থানের মধ্যেই ধরা আছে আধুনিক ক্ষমতার বিশেষ রূপটি। তিনি একে বলবেন প্যাসটোরাল পাওয়ার বা রাখালিয়া ক্ষমতা। মেষপালক মেষের দেখভাল করে একইসঙ্গে একক ও সমষ্টিগতভাবে। দেখভাল করে কিন্তু আবার স্বভাব-চরিত্রের নিয়ম বেঁধে দেয়, বৈরী মেষকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়, প্রয়োজনে মেষের নিরাপত্তার জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকে (ওবলেটিভ পাওয়ার)। এই সূত্র থেকে ফুকো দেখিয়েছেন আধুনিক ক্ষমতা কীভাবে মানুষকে একদিকে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, অন্যদিকে সমাজ অনুমোদিত স্বভাবের তালিম—এই দুইয়ের যুগ্মধারায় ক্রমশ উদ্দীপ্ত করে। যেহেতু আধুনিক আত্মকথন ব্যক্তি অনুশাসনেরই অঙ্গ, অতএব আত্মকথনের

সঙ্গে রাখালিয়া ক্ষমতার নাড়ির যোগ। মেজকুমারকে নিয়ে যে সাক্ষ্য-প্রযুক্তি বা টেকনলজি অফ উইটনেসিং তৈরি হয়েছিল, তা নাগরিকের বায়োগ্রাফি নিয়ে আধুনিক রাজনৈতিক ক্ষমতার আগ্রহেরই একটি উদাহরণ।

জীবনবৃত্তান্ত বা এথ্‌নোগ্রাফিক গবেষণা নিয়ে সাম্প্রতিক আগ্রহের একটা কারণ অবশ্যই আধুনিক রাষ্ট্রের গভর্নমেন্টালিটির প্রয়োজন সাধন। গভর্নমেন্টালিটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : 'কনডাক্ট অফ কনডাক্টস' (মিশেল ডীন)। এই নাটা সংজ্ঞাতেও আপনকথার সঙ্গে এই ধারার রাজনৈতিক ক্ষমতার যোগাযোগ কিছুটা স্পষ্ট হয়। অবশ্য সম্পর্কটা ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্য পরিষ্কার হওয়া দরকার ফুকো আধুনিক ক্ষমতার টার্গেট হিসেবে 'পপুলেশন' কথাটা দিয়ে কী বুঝিয়েছেন। 'গভর্নমেন্টালিটি' বক্তৃতায় ফুকো পপুলেশানের আলোচনা করেছেন। প্রথমে বলেছেন, "techniques aimed at collective and social bodies"। তারপরে বলেছেন, "Population makes it possible to identify regularities, to discover things that hold together, and such things may be both analytic tools and objects of intervention, such as birth, death or marriage rates."। জনগোষ্ঠী তৈরির উদ্দেশ্যে জীবন ও যাপনের ওপর শাসন ব্যবস্থার সংখ্যাতত্ত্বের জ্ঞানসমৃদ্ধ, পরিকল্পিত ভিন্ন ভিন্ন ইন্টারভেনশান বা হস্তক্ষেপ—সংক্ষেপে বলতে গেলে এই হল আধুনিক গভর্ননেন্‌সের উপজীব্য এবং এর কাঠামোটা দাঁড়িয়ে আছে পপুলেশনের এই নতুন ধারণার ওপর। সহজ কথায়, ফুকো আধুনিক শাসনতন্ত্র তথা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বুঝেছেন রাষ্ট্রের নিজেকে নাগরিক সমাজ বা সিভিল সোসাইটির আদলে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগের ভেতর। সাধারণত আমরা ধরে নিই, রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজ পরস্পরের বিপরীতে দাঁড়িয়ে, একে অপরের সঙ্গে নিরন্তর ছোটোবড়ো নানা ঘষাঘষি, ধাক্কাধাক্কিতে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করে চলেছে। ফুকো এই সনাতনী ধারণা থেকে একেবারে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে আধুনিক রাষ্ট্র ও নাগরিকের অবস্থান নির্ণয় করেছেন। আধুনিক রাষ্ট্রের আইনি প্রতাপ ও সার্বভৌমত্ব খোয়া যায় না, কিন্তু তার আধুনিকতার মূল দাবি হয়ে ওঠে ব্যক্তি নাগরিকের স্বাভাবিকীকরণে। আর এ সম্ভব হয় তখনই, যখন ব্যক্তি-নাগরিক নিজেই নিজের অনুশাসক হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়ার জন্য জরুরি অনুশাসনমুখী প্রতিষ্ঠানিক পরিবেশ, নিরীক্ষণের নয়া নয়া কায়দা ও নাগরিকের জীবন সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান। রাজনৈতিক ক্ষমতার এই আধুনিক স্থাপত্যকল্পকে টোনি বেনেট ছোট্ট কথায় সুন্দর বুঝিয়েছেন : Knowing what power knows is to know oneself as known by power (*দা এক্সিবিশনারি কমপ্লেক্স*, পৃ. ১২৬)। আর এজন্যই স্বীকারোক্তি, জীবনের গল্প বা আত্মচরিত 'নিউ অর্ডর অফ নলেজ'-এর গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ।

আত্মচরিতের আধুনিকতার প্রশ্ন ক্ষমতায় যে রিলেতে সে অবস্থিত, তার বাইরে

তাকে বোঝা অসম্ভব। সম্ভবত *বাবরনামা* বা বারাণসী দাসের *অর্ধকথানক* এর মতো উদাহরণ বাদ দিলে, আমাদের দেশে আত্মচরিতের সূত্রপাত ঔপনিবেশিক সময়ে। গত শতাব্দীর গোড়াতেও নিজের জীবনের কথা উত্তম পুরুষে লিখে যাওয়াটা একান্তই পশ্চিমী রীতি বলে অনেকেই মনে করতেন। যেমন করতেন গান্ধির অনুরাগীরা। রাসসুন্দরীর *আমার জীবন* বাংলার প্রথম আত্মজীবনী। তিনি লিখেছেন উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন মহিলাদের, এমনকি বাবুঘরের মহিলাদেরও অক্ষর পরিচয় সমাজ অনুমোদন করত না। বহু কষ্টে *শ্রীচৈতন্যভাগবত*-এর মতো ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করার মধ্যে দিয়েই তিনি পঠন লিখনের তালিম নেন। রাসসুন্দরীর অবস্থান ধর্মীয়তে সেকুলার বা সেকুলারে ধর্মীয় : এইধরনের অনুপ্রবেশী কোনো যুক্তিতে কিন্তু ধরা যাবে না। ব্যক্তির অনুশাসনের সঙ্গে আমাদের দেশেও জীবনচরিতের সম্পর্ক নিবিড়, যদিও আমাদের অনুশাসনের জিনিওলজি কী, সে প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনার ইচ্ছা রইল। তবে এটুকু নিশ্চয় বলা যায় যে উনিশ শতকের আত্ম-অনুশাসন ও আত্মকথনের ধারার সঙ্গে মিশে আছে পরিবারের নতুন স্থানাঙ্ক, ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা ও সমাজ সংস্কারের ঢেউ।

নিছক তত্ত্বের চোখে দেখতে গেলে, জীবন বৃত্তান্তের কথক অবশ্যই একজন এজেন্টিভ বিষয়ী, যিনি নিজে এবং নিজের সামাজিক সম্পর্কগুলো সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ও নিরীক্ষণধর্মী একজন মানুষ। কিন্তু তাই বলে, পজেসিভ ইন্ডিভিজুয়ালিজমের বাইরে জীবন বৃত্তান্তের কোনো পরিসর নেই একথা ঠিক নয়। সম্প্রতি চার্লস টেলার তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থ *এ সেকুলার এজ*-এ মন্তব্য করেছেন যে, কেবলমাত্র যুক্তিনিষ্ঠ সেকুলার সময়েই ধর্মীয় হওয়া সম্ভব। টেলরের বক্তব্য অনেকটা এইরকম : ধর্মকেন্দ্রিক সমাজে ব্যক্তির ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসার অবকাশ নেই। সে একটি ধর্মে জন্মায় এবং সেই ধর্মকেই গ্রহণ করে বা করতে বাধ্য হয়। টেলারের বক্তব্যের সঙ্গে কোনো তর্কে না গিয়েও এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না, সেকুলারিজমের সঙ্গে ক্ষমতার যে নতুন বিন্যাস এল তাতে বিষয়ীর স্থানাঙ্কের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির অন্তর্গূঢ় বা ইন্টিরিয়ার বলে এক ক্ষেত্রের আবিষ্কার। আর এই ইন্টিরিয়ারের তালিমের অংশ হিসেবেই স্মৃতিকথা বা memoir ও প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মের নথিরচনা আধুনিকতার বিভিন্ন প্র্যাকটিসের একটি হয়ে উঠল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফ্রান্সে উনিশ শতকের গোড়ায়, অর্থাৎ সেকুলারিজমের উন্মেষলগ্নে ক্যাথলিক সন্তদের লেখাপত্রেও এই আত্মনিমগ্নতা দেখেছেন গেব্রিয়েল মসট্থকিন। এই সন্তরা ইউরোপজোড়া প্রোটেস্টান্টবাদের জোয়ারের মুখোমুখি হয়ে ক্যাথলিক ধর্মমতকে এক বিকল্প দর্শনের রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, এবং সে প্রচেষ্টারই অংশ হিসেবে সেকুলার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন ক্যাথলিক চিন্তা ও জীবনচর্চার নানান গুণাবলির। মসট্থকিনের ধারণায় সন্তদের দিনলিপি ও শৈশবের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়েই আধুনিক memoir-এর জন্ম। তিনি তাঁর বই *টাইম অ্যানড*

ট্রানসেনডেন্স-এ দেখিয়েছেন, কীভাবে এই স্মৃতিচারণা সনাতনী অতীন্দ্রিয়বাদী সময়ের ধারার বদলে নিয়ে আসবে আধুনিক সেকুলার সময়ের ধারণা। যদিও মস্ট্‌ৎকিনের জবানিতে এ এক অসম্ভব জটিল রসায়ন কারণ নিজের কাজকর্ম ও অনুভূতির বস্তুনিষ্ঠ প্রাত্যহিকী লিখতে বসে সন্তরা সরলরৈখিক সময়ের সীমাবদ্ধতাকেও অনুভব করা শুরু করবেন। সত্তার বৈজ্ঞানিক ডিসকোর্স বাসনা ও কল্পনার চাহিদাকে অগ্রাহ্য করতে পারেনা আর এই দুইয়ের টানাপোড়েনই সম্ভবত আধুনিকতা ও আধুনিক হিস্টরিওগ্রাফি।

ফুকোর গভর্নমেন্টালিটি প্রসঙ্গে আলোচনায় আগেই বলেছি, সমসত্ত বা হোমোজেনাস এক-ছকে বাঁধা সমাজ তৈরি করতে গেলে প্রথমত থাকতে হবে পপুলেশানের অনুপুঙ্খ জ্ঞান, বিশেষত সেইসব সেক্টরের যা স্বাভাবিকীকরণ প্রকল্পের এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এ কারণেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা মার্জিনাল পপুলেশন—এদের আচার, ব্যবহার, প্রাত্যহিক জীবন নিয়ে সমাজবিদদের এত আগ্রহ। আমি সমাজচর্চার যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি তার লাইব্রেরির কর্মী, আমাদের সবার-শ্রদ্ধেয়, কালীপ্রসাদ বসু কুম্ভমেলায় ছুটে যান কোনো আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মীয় টানে নয়, কেবলমাত্র 'সাবঅলটার্ন-রা কী ভাবছে' তা হাতেনাতে বুঝতে।

কিন্তু সত্যিই কি আমরা বুঝি? তাদের ভাষার আমরা কতটুকু অংশীদার? আজ সকালে পাড়ার দোকানে চা খাচ্ছি। সামনের ফুটপাতে একমনে এক মহিলা কাপড় কাচছেন। হঠাৎ জেরিক্যান হাতে আট-দশ বছরের ছেলেকে দেখে মহিলা ওর হাতটা খপ করে ধরে ফেললেন। ছেলেটা চুপ মেরে দাঁড়িয়ে গেল। মহিলা ছেলেটার হাত ধরে কী সব বলে চাপা গলায় শাসাতে শুরু করলেন। ব্যাপারটা বেশ অনেকক্ষণ ধরে চলল। মহিলার হাত শিথিল হয়ে এল, তবু ছেলেটা হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে না, ছাড়া পাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, এই যা। এক সময় মহিলা বালতিতে কাপড় ভরে হাঁটা দিলেন। ছেলেটা জেরিক্যান তুলে নিয়ে হাঁটা দেবে এমন সময় বছর তিরিশের একটি লোক একটু দূর থেকে ডাকল :

'এই ক্যাতন?

ছেলেটা কাছে যেতে বলল, 'গণশার ব্যাপারে ধরেছিল, না? কেন বলতে গিয়েছিলি? এখন তোরা সামাল দিতে পারবি?'

মামুলি ঘটনা। এমনই সব তুচ্ছ ঘটনায় ভরা আমাদের রোজকার হাঁটা-চলার জীবন। কিন্তু আমরা এসব ঘটনার কোনো হদিশ পাব না। কে এই গণশা? জানি না। কী ফাঁস করে দিয়েছিল ক্যাতন? জানি না। হাতড়ালে হয়তো জানতে পারব, কিন্তু বুঝতে পারব কি? কার্যকারণের জালে অপরকে কতটা বোঝা যায়? মাঝে মাঝে মনে হয়, যেন চাঁদে হাঁটছি। এক শহরে ছড়িয়ে আছে অনেক শহর, আলাদা আলাদা কোঠায় নয়, বরং একসাথে, চিৎ হয়ে, উপুড় হয়ে, এপাশে, ওপাশে, তবু কথা বলা প্রয়োজন, যতটা না

জানার জন্য তার চেয়ে বেশি বশ করার তাগিদে। ভাষার মধ্যে দিয়ে আমরা সম্পর্ক গড়ি, আবার ভাষাই—আধুনিক ক্ষমতার বাহন হিসেবে—সম্পর্ককে নিঃশেষ করে, আমাদের নিঃশেষ করে।

এথনোগ্রাফার প্রান্তিক মানুষের এলোমেলো গল্পের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান, তাঁর আগ্রহ যেমনি গরীবগুর্বোর আচার ব্যবহারে তেমনি এসব মানুষের অভ্যাস বহির্ভূত ক্রিয়াকর্ম, ফ্যান্টাসি ও আশা-নিরাশায়। এসব আচানক কিছুটা বৈরি ঘটনা ও উক্তির মধ্যে ধরা আছে রোজকার নানান ঘষা-ঝাপটা, মামুলির অচেনা তলদেশ, যার সূত্র ধরে, নানান বৃহৎ প্রশ্ন অনেকদূর ভাবা যায় : জগতে বাস করার অর্থটা কী? কি করে আমরা চারপাশকে নিজের করে নিই? নিজের জগৎ হারিয়ে ফেলার অর্থই বা কী?

দিন কয়েক আগে সেলুনে বসে আছি। একটি মাঝবয়সী লোক আমার চুল কাটছে, আরামে চোখ মুদে আছি (এই আরামের বশে আমি চুল কাটাতে গিয়ে অনেক সময় প্রায় ন্যাড়া হয়ে বেরিয়ে আসি)। হঠাৎ ক্যাশবাক্সে বসা লোকটির 'এ-ই যাঃ, যাঃ' তাড়ানিতে চোখ খুলে দেখি একটু দুরে বছর আড়াইয়ের একটা ন্যাংটো বাচ্চা একজন নাপিতের ধুতি ধরে টানছে, আর দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে মা আমোদে হাসছে। আমাদের সম্মিলিত অস্বস্তির মধ্যেই শুরু হল শিশুর প্রথম পাঠ। লম্বা শব্দে না গিয়ে একে বলা যাক, 'being political', যা 'politics' এর পেশাদারি সমীকরণগুলিকে কেবলই গুবলেট করে দেয়।

সাতের দশকে পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ বেরিয়ে পড়েছিলেন, নিত্যতাড়িত জীবন থেকে মুক্ত, 'অ্যাগোনিজম'-শূন্য এক 'এসেনসিয়াল সেল্ফ'-এর খোঁজে। ওঁদের ধারণা হয়েছিল আমাদের মতো দেশগুলোর তেপান্তরে ভাঙ-চাঙে সমাহিত হলেই ওই 'এসেনসিয়াল সেল্ফ' উড়ে এসে ধরা দেবে। ইতিহাসে সাহেবরা সম্ভবত ওই একবারই ভুল করেছিলেন।

হিপি আন্দোলনের অনেক পরে, আটের দশক তখন প্রায় শেষ হয়ে এল, অস্ট্রেলিয়ার উত্তর কুইন্‌সল্যান্ডের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর আমার সুযোগ এসেছিল। একদিন ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে গেলাম বায়রন বে-তে। বাইনোকুলার নিয়ে তিমি মাছের অপেক্ষায়, আর কিছুটা দুরে ডলফিনের তিড়িংবিড়িং দেখে, ফিস-অ্যান্ড-চিপস্ খেয়ে সারাটা দিন কাটল। ফিরতি পথে, তখন অনেক দূর চলে এসেছি, একটা গ্রামের দেখা মিলল। সে তো হতেই পারে। কিন্তু তাজ্জব বনে গেলাম বাড়িগুলোর লেটারবক্স দেখে। কতকগুলো মাঝারি সাইজের টিনের ড্রাম উলটো করে বসানো আর তাতে সাদা রঙে লেখা মেদিনীপুর, তুম্‌বনী, ভুবনডাঙা-এই সব নাম।

ব্যাপারটা বুঝতে সময় না লাগলেও অবাক ভাবটা কাটতে সময় নিল। গাড়ি থামিয়ে আমি ও আমার বন্ধু পায়চারি করছিলাম। আমাদের দেখে এক প্রৌঢ় বেরিয়ে

এলেন। আলাপ হতে বললেন, 'তোমার দেশে আমাদের জীবনের সবচেয়ে ফলপ্রসূ বছরগুলো পড়ে আছে। তোমার বলি কেন, সে দেশ তো আমাদেরও—পুরোনো হালচাল ভুলে গিয়ে ওখানেই নিজের মূল সত্তা আবিষ্কার করেছি। .....আজকের রাতটা আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে যাও।' প্রৌঢ়ের কথা ফেলতে ইচ্ছে হয় নি।

ভদ্রলোক পেশায় একসময় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, এখন শখের ছবি আঁকিয়ে। মাঝেসাঝে পসরা নিয়ে শহরে যান, ক্বচিৎ কদাচিৎ বিক্রিও হয়। ভদ্রমহিলা পটারির কাজ করেন, হাটবারে ঘরে তৈরি রুটি বিক্রি করেন। এছাড়া আছে ছোটো একটা খামার। ছেলেমেয়েরা গ্রামের কমিউনিটি স্কুলে পড়ে। মাটির গন্ধে, নির্মল রোদে, উপর্যঝরণ বৃষ্টিতে ওরা বড়ো হচ্ছে। অনেক রাতেও একজনকে পেয়ারা গাছের ডালে বসে থাকতে দেখলাম। বাথরুমে ছাদ নেই, পাশের এক মস্ত গাছের পত্ররাজি দিয়ে মোড়া।

বারান্দায় বসে গল্প করছি। গৃহকর্ত্রী একসময় নিস্তেজ গলায় বললেন, 'রাত আর একটু বাড়লে ঐ গাছটা থেকে একটা ময়াল সাপ নেমে আসবে। জ্যোৎস্নায় সামনের মাঠটায় শুয়ে থাকতে ও বড্ড ভালোবাসে।'

সে রাতে ঘুমের মধ্যে ভরা জ্যোৎস্নায় আমি ঠায় জেগেছিলাম।

পুরোনো কথা ভাবতে গিয়ে এখন মনে হয় ঐ পরিবারটি—হয়তো বা পুরো গ্রামটাই—'এসেনসিয়াল সেল্ফ' খুঁজতে গিয়ে রীতিমতো সক্রিয়, নানা ডালপালায় সমৃদ্ধ এক ব্যতিক্রমী গৃহীসত্তা নির্মাণ করে বসেছেন। ফুকো কি একেই বলবেন, টেকনলজি অফ দ্য সেল্ফ?

ব্যক্তির অনুভূতি, ভাবাবেগ, চাঞ্চল্য (এককথায় ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাফেক্ট) ও সমাজের নানা অনুশাসন, সময়-সঞ্চিত ধ্যানধারণা, বিধিরীতি; এই দুইয়ের অন্তবর্তী অবস্থান থেকে এথনোগ্রাফি প্রাত্যহিকতাকে বুঝবার চেষ্টা করে। এই দুই অক্ষের আন্তঃসম্পর্ককেই ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক বোর্দিউ বলেছেন হ্যাবিটাস। ঐতিহাসিক নানা ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সামাজিক গঠন-বিন্যাস এবং একইসঙ্গে রোজকার চলার পথে নানান কৃৎকৌশল—হ্যাবিটাস এই দুইয়ের পোয়েটিকস। স্থায়ী ও নমনীয়, বহুদিন থেকে জমে ওঠা নীতিবোধ, দেখবার বিশিষ্ট স্টাইল, ঝোঁক বা প্রবণতা, আবার চটজলদি নানা ধারণা, অচমকা পথ পাল্টানো, নতুন ও পুরোনোকে মেলাতে গিয়ে বারবার হোঁচট—এসব নানা গল্প নিয়েই হ্যাবিটাস। দার্শনিক পাটোক্‌কা (Patocka) এই দ্বিমুখিনতাকে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন; "We are always already somewhere, we are in the world...singled out as individuals, yet still bound...We call this anchoring, or rooting." (জান পাটোক্‌কা; *ফিলজফি অ্যান্ড সিলেক্টেড রাইটিংস*, পৃ ২৮০) দুয়ের এই সম্পর্ক থেকেই জীবনের গল্পগুলো হয় পাটোক্‌কার ভাষায় 'সেল্ফ এক্সটেনসন' বা 'সেল্ফ-প্রোজেক্সনস অফ ইনকারনেট বিয়িংস'। অনেক ঘটনা থাকতে

কেনই বা কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়, কেনই বা তাদের অর্থবহ মনে করা হয়, কেনই বা রেকর্ড করা হয়, এসব প্রশ্নের উত্তরের সূত্রটা ওই দ্বিমুখী সম্পর্কেই।

ইতিহাসের অচেতন নয়, অবরুদ্ধের, অপসারিতের প্রত্যাবর্তন নয়, জীবনের গল্পগুলোর আকর্ষণের মূলে আছে ক্ষমতা ও বিষয়ীর পারস্পরিক সম্পর্কের পিচ্ছিল ভূমি। ক্ষমতা না থাকলে বিষয়ী নেই, বিষয়ীর অনুপস্থিতিতে ক্ষমতাও অনুপস্থিত। প্রত্যেক স্বরই বহু-স্বর, প্রত্যেক চাউনিই বদলি চাউনিতে তৎপর। ফুকোর অনুসরণে বলা যাক, আয়নায় আমি আমার যে প্রতিবিম্ব দেখছি তা একইসঙ্গে সম্পূর্ণ সত্য ও মিথ্যা। আমার প্রতিবিম্বের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক একটি সত্যের ওপরেই দাঁড়িয়ে; ভারচুয়ালিটি (*অফ আদার স্পেসেস*)। আমরা সচরাচর ধরে নিই, আইডেন্টিটি একটা সাবস্ট্যান্স, এর ঘনত্ব আছে, পরিসর আছে, বা অন্তত একটা বিশেষ চেহারা আছে, আছে বিশেষ চারিত্রিক ও গুণগত বৈশিষ্ট্য। মনে করি সামাজিক আইডেন্টিটি ক্ষমতা দিয়ে নির্মিত এবং ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানানোই এর ভবিষ্যৎ। আদতে আইডেন্টিটির কোনো সাবস্ট্যান্স নেই, যাকে আইডেন্টিটি ভাবছি তা আসলে ছায়া প্রচ্ছায়ায় এক ধরনের আইডেন্টিটি-ভান বা বলা যাক, সিমুলাক্রাম। ক্ষমতার বিপরীতে আছে প্রতিরোধ; এ এক অত্যন্ত জনপ্রিয়, জনমোহিনী ভুল ধারণা। ক্ষমতা মূলত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ার ক্ষমতা, ছত্রভঙ্গ হবার বা করার, বিসরণের ক্ষমতা। প্রতিরোধ অবশ্যই তৈরি করা যেতে পারে, এমনকি দীর্ঘ-মেয়াদি প্রতিরোধও সম্ভব, কিন্তু তার অক্ষ ও চরিত্র পাল্টে পাল্টে যেতে থাকে, কারণ প্রতিরোধ ক্ষমতারই অঙ্গ। আইডেন্টিটির মতো প্রতিরোধও আত্মদীর্ণ।

জীবনবৃত্তান্তকে যদি ডিসকোর্স বলা যায়, তাহলে বলতে হয় এই বৃত্তান্তের মধ্যে আছে হরেক অসমসত্ত, ভিন্ জাতীয়, পাঁচমিশেলি নানা ডিসকোর্সের বলয়, যার প্রত্যেকটিতে বিষয়ীর চেহারাটা পৃথক। এদের একসঙ্গে বেঁধে দিয়ে স্থিতিশীল বিষয়ী নির্মাণের চেষ্টা জঁর চালিয়ে যায়, তবে বড় শক্ত, ক্লেশকর সেই চেষ্টা। শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিয়মদারী যে ভিন্ন ভিন্ন ডিসকোর্সের মধ্যে দিয়ে চিন্তার প্রকাশ ও ব্যাপ্তি, সেই ডিসকোর্সেই আবার নানান ফাঁকফোকর অনিবার্যভাবে উপস্থিত, শৃঙ্খলা-রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ও এদের হরেক বিজ্ঞজন বা এক্সপার্টসকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই। ক্ষমতা একইসঙ্গে পাহারা দেয় ও সিঁদ কাটে—মজাটা এখানেই।

সনাতনী ইতিহাসচর্চা আত্মকথন বা জীবনকথাকে বড়ো একটা পাত্তা দিত না এই ধারণায় যে, আত্মকথনের সত্যগুলো বড্ডবেশি নিটোল। মজার কথা, আজ যখন ইতিহাস নিজে অনেক বেশি অন্তর্মুখী, সেল্ফ-রিফ্লেক্সিভ, ইতিহাসবিদ্যার পুরোনো সত্যগুলো যখন ভেঙে ভেঙে আসছে, তখন আত্মকথনকেও আর নিটোল বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে না। বরং ঠিক তার উলটো। মনে করা হচ্ছে, আত্মকথনের সত্যগুলো বহুমুখী ও স্ববিরোধী এবং এ কারণেই ইতিহাসচর্চার বাজারে এর কদরও বাড়ছে।

ইতিহাসতাত্ত্বিক পিঁয়ের নোরা (*রেলেম্যেস অফ মেমরি* পৃ ২) আক্ষেপ করেছেন, আধুনিক যুগে ইতিহাসের পাকদণ্ডীতে স্মৃতি ক্রমেই উবে গেছে। তিনি বলেছেন : "Our form of memory is nothing but history, a matter of sifting and sorting"। একদিকে প্রাগ-আধুনিক সময়ে স্মৃতির ভরভরন্ত, প্রসাদগুণে মাখা শ্রীময়তা; অন্যদিকে আধুনিককালে তার অন্তঃসারশূন্য, মোড়কসর্বস্ব অস্তিত্ব—নোরা সময়ের গণ্ডি ধরে স্মৃতির যে তীক্ষ্ণ বিভাজন করেছেন তা দার্শনিক ব্রুনো লাতুরের মতে আধুনিকতার এক উপাদেয় ভ্রম। যেন ঐতিহাসিক সময় দুটো মস্ত ক্যাম্পে বিভক্ত। একদিকে ফেলে আসা পুরোনো পৃথিবী, তার দোআঁশলা জগৎ, যেখানে বস্তু আর মানুষের সম্পর্কটা নেহাতই ব্যবহারিক প্রয়োজনে আটকে থাকে না। (এই সময় বিভাজনে আমরা উপনিবেশকে কোথায় রাখব? উপনিবেশের বর্তমান তো অতীত ইউরোপের চলিয়ে বলিয়ে মিউজিয়াম বই অন্য কিছু নয়! নোরা স্পষ্ট করে না বললেও তাঁর উপস্থাপনায় এই ইঙ্গিত রয়েছে)। অন্য ক্যাম্পে রয়েছে আধুনিকতার বিশুদ্ধ সময়, যেখানে শব্দের কাজ বর্ণনাতেই শেষ, পুরোনো জমানার নির্বাহী ভূমিকা শব্দের যেখানে আর রইল না। প্রসাদগুণে ভরপুর বা ইতিহাসের নিছক extra, লাতুরের মতে এই দুই মেরুর কোনোটাতেই আসলে স্মৃতির স্বরূপ ধরা পড়ে না। স্মৃতি আদতে বিরোধ, পরস্পর বিরোধ, স্ববিরোধ—এসব নানান দ্বন্দ্বে বোঝাই এক হাঁসজারু, বর্তমানের অজস্র ট্যাকটিক্সের আস্তাকুঁড়।

এথনোগ্রাফার তক্কে তক্কে থাকেন, কখন গল্প বলে যাওয়া লোকটির আবোল-তাবোল, এবড়ো-খেবড়ো কথার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবে সেই অরূপরতন যা প্রাত্যহিকতার দাসমুক্তি ঘটিয়ে এক ঝলকে সমাজ ও ব্যক্তির নানা সত্যকে হাতের নাগালে নিয়ে আসবে। তিনি হয়তো জ্ঞানের তাগিদে ছোটেন কিন্তু তাঁর গবেষণা গভর্নমেন্টালিটির সমস্ত প্রকল্পের জন্য বড্ড জরুরি। অন্য একটা দিকও মনে রাখা দরকার : যেসব মুহূর্তে বা হালচালে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য সবচেয়ে বেশি প্রকট, যেসব বেশভূষায় বা চলাফেরায় ব্যক্তি নিজেকে আর দশজন থেকে পৃথক মনে করে, সেইসব মুহূর্তেই, সেইসব আর দশজনের সঙ্গে না মেলা চলাফেরা, বেশভূষা, আকার-প্রকরণ, চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়েই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি টোটালাইজড হন। ব্যক্তির উগ্র স্বাতন্ত্র্য তাকে সমষ্টির অংশমাত্র করার জন্য অত্যন্ত কার্যকরি। এজন্যই পোর্টফোলিও ক্যাপিটালিজমের আজ জয়জয়কার।

প্রাত্যহিকতার প্রসঙ্গে শেষ একবার আসা যাক। সাধারণভাবে আমি যা, তা-ই আমার প্রাত্যহিকতা—এই ধারণা বোধহয় ঠিক নয়। প্রাত্যহিকতা এক বিমূর্তায়ন বা অ্যাবস্ট্রাকসন। আমার আজকের দিনটি, আমার গতকাল বা আগামীকাল আমার প্রতিদিন নয়। দিনগত মামুলি যে আমি—এই যে আজ সকালে বেরোনোর সময় সার্টের নিচে গেঞ্জি পরিনি, ভেবেছি দুপুরে গরম লাগবে, এখন সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা হওয়া দিচ্ছে, শীত শীত

করছে—এইসব নিত্তিদিনের খুচরো উদ্বেগ, সুখ-দুঃখ চাপা পড়ে যায় প্রাত্যহিকীর গড়পড়তায়, বিমূর্তায়ণে। সন্ত অগাস্টিন তাঁর *কনফেশনস* বইয়ের একাদশ খণ্ডে কি এরকমই কিছু একটা আভাস দিয়েছেন, যখন তিনি বলেন, যে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম, প্রাত্যহিকী তারই বিলম্বায়ণের এক অনিবার্য প্রতীক? বিরল অদ্ভুত ব্যতিক্রমীকে বিস্মৃতির আড়ালে রেখে প্রাত্যহিকের বিশেষ ক্ষেত্রটির সৃষ্টি। যাদের বাদ দেওয়া হল, তারা অবশ্য উবে যায় না, ফিরে আসে, দোরগোড়ায় হাজির হয়, তবে নিছক অদ্ভুত ও ব্যতিক্রমী হিসেবে নয়, প্যাথোলজি হিসেবে।

যাতনা, শ্রবণ, নৈতিকতা

দশটা পাঁচটার যে ছাপোষা চাকুরেটি প্রবল তাড়ায় ভোগেন, ভোগাটা যাঁর স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে, দিনের পয়লা কাপ চা থেকে শুরু করে দিনশেষের রমণ—সবকিছুতেই যাঁর সময়ের তীক্ষ্ণ অভাব ('তা-তাড়ি, তা-তাড়ি উফ বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে!'), এরকম একটা লোকের সাদামাটা জীবন নিয়ে স্বভাবতই এথনোগ্রাফার বা ওরাল হিস্টোরিয়ান-এর মাথাব্যথা থাকার কথা নয়। মুশকিলটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং জীবনের খোঁজে অনেক সময়েই আমরা 'ট্রুলি এক্সেপ্শনাল' অভিজ্ঞতার বাইরে কিছু গ্রাহ্য করতে চাই না। উর্বশী বুটালিয়া দেশভাগ ও দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের অভিজ্ঞতা তাঁদের নিজেদের বাচনে ধরে রাখতে গিয়ে এমন সব জীবনকে বেছে নিয়েছেন যা যে কোনো হিসেবেই স্পেকটাকুলার। যেমন ধরুন সেই সব মহিলারা যাঁরা দাঙ্গায় বারবার ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, শেষপর্যন্ত গণধর্ষণের হলকা থেকে বাঁচবার জন্য—কোনোক্রমে শ্বাসরোধ করে বাঁচবার জন্য—বিয়ে করেছেন ধর্ষককেই। এর বহুবছর বাদে 'স্বস্থানে' প্রত্যাবর্তনের ফরমান এলে এসব মহিলার অনেকেই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন কারণ তাঁদের কাছে তখন দাম্পত্য ও প্রাত্যহিক, নিয়ম করে ধর্ষণ—এই দুইয়ের মধ্যে আর কোনো ফারাক নেই। বলা বাহুল্য, ঐসব মহিলার জীবনভাষ্য আমাদের যারপরনাই ব্যথিত করে, তাড়া করে বেড়ায়।

কিন্তু দেশভাগের পরবর্তী সময়ের তো আরও একটা দিক আছে যা একান্তই রোজকার নামচা, যেখানে স্পেকটাকুলার কিছু ঘটে না, আবার দেশভাগের দীর্ঘ ছায়া থেকেও যেখানে রেহাই নেই। এই ইতিহাস বহু লক্ষ কোটি মানুষের।

অন্যের জীবনের গল্প লেখার কথায় নৈতিকতার প্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী হিসেবেই এসে যায়। অনেকসময়ই এ আলোচনা যার জীবনী লেখা হচ্ছে, তার প্রথানুসারী সম্মতি নেওয়া হয়েছে কি হয়নি সে প্রশ্নে এসে ঠেকে। অন্যের বক্তব্য, উপলব্ধি, পর্যবেক্ষণ, জীবনের ছোটোবড়ো গোপনীয় তথ্য বা গল্প আত্মসাৎ করা, সম্মতি ছাড়াই ছাপিয়ে দেওয়া অবশ্যই অন্যায়। কিন্তু ওই বিধিসম্মত পারমিশানের ব্যাপারটার অন্য একটা

দিকও আছে। বক্তা যখন তাঁর জবানির সম্ভাব্য পাবলিক লাইফ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন, তখন তিনি অনেক সতর্ক হয়ে পড়েন, অনেককিছু বলতে নিজের অজান্তেই এক সংকোচবোধ কাজ করে, তাঁর কথা বা চিন্তার প্রবাহে একটা বাঁধুনি আসে। আর এভাবেই এথিকসের নাম দিয়ে ডিসকোর্সের চলতি দস্তুরগুলোই আধিপত্য করে। একারণে মিশেল দ্য সারতো অপরের ডিসকোর্সের অপর-অনুমোদিত ভাষ্যকে বলেছেন, ফেক হেটারোলজি। দ্বন্দ্ববহুল, ভাঙাচোরা যেসব কথা বাস্তবের অনেকান্ত বাচন বলে এথনোগ্রাফার পাঠককে উপহার দেবেন তা কিন্তু এক অর্থে জালি।

নৈতিকতার গভীর কেন্দ্রিয় আদতে প্রশ্নটি লিখবার নয়, শ্রবণের। অন্যের জীবনের গল্প শোনার অর্থ বা তাৎপর্য কী? প্রায়শই বলা হয়, শ্রবণের নীতিধর্ম হচ্ছে পারস্পরিক স্বীকৃতি প্রদান। ব্যাপারটায় কিন্তু একটা প্যাঁচ আছে। পারস্পরিক স্বীকৃতি বলতে এটা ধরা যেতে পারে, আমি নিজেকে বোঝাবো যে অপর ঠিক আমারই মতো এবং আশা করবো, অপরও ঠিক এমনি করে আমাকে তার নিজের থেকে ভিন্ন কিছু মনে করবে না। এককথায়, আমরা পরস্পরকে পরস্পরের আপন করে নেব। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে যে এ ধারণার ভেতর আত্মসত্তার প্রভুত্বের একটা বাসনা কাজ করছে।

গিভিং অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ ওয়ানসেল্ফ বইয়ে জুডিথ বাটলার এক নতুন ন্যায় বোধের কথা বলেছেন, যার প্রেরণা আমার জ্ঞান নয়, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। আমরা দুজন ব্যক্তি, আমরা বুঝতে পারি নিজের অনেক কিছুই আমরা জানি না, কোনোদিন জানতেও হয়তো পারবো না। নিজের এই অনুভূত অস্বচ্ছতা আমাদের দুইজনের মধ্যে এক যুগ্মতা তৈরি করে। আমি যা ভাবছি আমি তা নই—এই স্বীকৃতি নিজের ভেতর এক নতুন বোধের জন্ম দেয়, অন্যের ভিন্ন আচার-চিন্তার প্রতি আনে সহিষ্ণুতা, অন্যকে নিজের অনুরূপ করার পরোপকারী মোহ দমিত রাখে।

আমি পাঠককে যদি এই ধারণা দিয়ে থাকি যে দেশভাগকেন্দ্রিক সাম্প্রতিক ডিসকোর্স নিছক বাজারতাড়িত, তাহলে তা শুধু ভুল নয়, রীতিমতো অন্যায়। উর্বশী বুটালিয়া এবং তাঁর সতীর্থরা প্রত্যক্ষদর্শীর জবানিতে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছেন, প্রশ্ন তুলেছেন অপরের দুঃখযাতনার সঙ্গে বিষয়ীর নৈতিক যোগসূত্র নিয়ে। তথাকথিত অনুকরণীয় নৈতিক ব্যক্তিত্ব-র বেড়াজালের বাইরে নিজের জীবনের গল্প বলা বা অন্যের গল্প অনুধাবন করা, আগেই বলেছি, এক গভীর অর্থে নৈতিকতার প্রশ্ন। প্রয়োজন এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, লালন-উন্মুখ মনের বা আমি-হীন ব্যক্তিগতর। লেভিনাস একে বলেন, 'ইনফাইনাইট রেস্পন্সিবিলিটি' ও 'অথরলেস কমপ্যাশন'। অবগুণ্ঠিত স্মৃতি 'আমি' উচ্চারণে হারিয়ে যায়। এই লালন-উন্মুখ নৈতিকতা কোন্ অনুধায় নিছক ব্যক্তির গুণ না থেকে এক নতুন রাজনৈতিক কৌমের জন্ম দেবে, লেভিনাস সে প্রসঙ্গে যান নি। প্রশ্নটা কিন্তু জরুরি। এ প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে বিষয়ীসত্তার নির্মাণ প্রকল্পটাই চোখের আড়ালে চলে যাবে,

চলে যাবে ক্ষমতা আর ব্যক্তির আন্তরিক সম্পর্কের সদাপরিবর্তনশীল মানচিত্রটি। ফুকোর ভাষায়, এই সম্পর্ক হচ্ছে 'অ্যাগোনিজম', মিশেল দি সারতো এর প্রকাশ দেখতে পান যেভাবে প্রাত্যহিক নানা ছলেকলে মানুষ জ্যামিতির শাসানিকে আমল না দিয়ে নৃতত্ত্বের জয় ঘটাতে থাকে, তার মধ্যে। প্রসঙ্গত, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার খসে পড়ার দশ বছর আগে সারতো তাঁর প্রবন্ধ 'ওয়কিং ইন দ্য স্ট্রিট' (*দ্য প্রাকটিস অফ এভরিডে লাইফ*) -এ লিখেছিলেন, এ বাড়ির একশোদশ তলা থেকে নিচের রাস্তার মানুষগুলোর অজস্র তৎক্ষণিক কৃৎকৌশল, রেওয়াজছুট চলাফেরা—কিছুই নজরে আসবে না, বরং যা দেখা যাবে তা হচ্ছে, মানুষের মত দেখতে হাজার হাজার লাশ।

সমাজদর্শনের সাবেকি আলোচনায়, অপরের দুঃখযাতনা এক অর্থে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন অটোনমাস বিষয়ীর চারিত্রিক ত্রুটি বিশেষ। সাধারণভাবে বলতে গেলে বিষয়ীর নিজের যন্ত্রণা প্রদর্শনীয় অলংকার, আর অপরের যন্ত্রণা এক্সটিক এক সামগ্রী। সুজান সনটাগ-এর ভাষায় : 'alien, foreign, exotic and at some level, inhuman' (*দ্য পেইন অফ আদারস*, পৃ. ১৩২)। ট্রমাটাইজড মানুষের জীবনীর যাত্রাপথ কিন্তু অনিশ্চিত। বাজারের প্রশ্ন ছাড়াও এখানে আরেকটি প্রশ্ন আছে। তা হচ্ছে, লেখার বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপট যেখানে আইনি, ডাক্তারি ও মিডিয়ার শুশ্রূষার ভূমিকা প্রশ্নাতীত। এর প্রভাবে ক্ষত-স্তব্ধ জীবনের গল্পে অনেকসময় চলে আসে নিরাময়ের আশা, ক্যাথারসিস হিংসাকে ছাপিয়ে যায়। অবরুদ্ধ যাতনার দ্বার খুলে দেওয়ার মানে ছকবাঁধা স্মৃতি ও জীবনচারণ থেকে মুক্তি, এ নাও হতে পারে—ব্যথার বোঝা নিরাময়ী টিলিওলজির পাল্লায় পড়ে নৈতিকতার কাটতি স্রোতে গা ভাসাতেই পারে।

[অবভাস পত্রিকার এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, ২০০৭ সংখ্যায় দক্ষিণ কলকাতার গোবিন্দপুর কলোনির ভূপতি হালদারের (পেশায় নাপিত) সঙ্গে আমার এক দীর্ঘ কথোপকথন প্রকাশিত হয়েছিল। ওই সংলাপের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলাম সংক্ষিপ্ত একটি ভূমিকা। বর্তমান নিবন্ধটি তারই পরিমার্জিত রূপ।]

ঋত্বিক ঘটক : একটি আত্মীয়তার কাহিনি

মৈনাক বিশ্বাস

নাগরিকের যাত্রাপথ

অপুর সংসার-এর সমাপ্তি ঋত্বিক ঘটকের মনমতো হয়নি; লিখেছেন, "একেবারে ছবির শেষটা, আমার মনে হয়, একটা মারাত্মক প্রমাদে ভুগছে"।[১] উপন্যাসের শেষে অপু কাজলকে নিয়ে ফিরে গিয়েছিল নিশ্চিন্দিপুরে। কাজল যখন ঠাকুর্দার পোড়ো ভিটের কাছে এসে দাঁড়ায় সেই অঞ্চল ও তার যত হারানো বাসিন্দা—মৃত পূর্বপুরুষ, আঞ্চলিক দেবতা, লোককথা আর মহাকাব্যের যত চরিত্রেরা—কাজলের উদ্দেশে কথা বলতে থাকে; কাজলের মধ্যে দিয়ে অপুর প্রত্যাবর্তন ঘোষণা করে। ঋত্বিকের মনে হয়েছে এটা অপরিহার্য, একে বাদ দেওয়া যায় না: " সেই মারাত্মক শেষ পংক্তিটি— 'অপু নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া যায় নাই। সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।' বই-এর প্রাণবস্তু বোধহয় এখানেই ছিল।" [২]

সত্তা ও আখ্যান বিষয়ে ঋত্বিকের ভাবনার হদিস মেলে এইরকম মন্তব্য থেকে। বিভূতিভূষণের উপন্যাসের শেষের ওই প্রত্যাবর্তন নভেলের ঐতিহ্যসিদ্ধ গ্রাম থেকে শহরে যাত্রার মানচিত্র মানে না, উল্টো পথে হাঁটে।[৩] এই অস্বীকৃতিই আমাদের স্পর্শ করে। গ্রাম নিজে এখানে উপস্থিত অবলুপ্ত চৈতন্যের রূপ ধারণ করে। সত্যজিৎ তাঁর ছবি শেষ করেছেন নাগরিকের পরিক্রমার ধ্রুপদী একটি ইমেজ দিয়ে : কাঁধে কাজলকে নিয়ে অপু হেঁটে আসে ক্যামেরার দিকে, গ্রামকে দিগন্তরেখায় পিছনে ফেলে ; ভবিষ্যতের দিকে ফেরানো তাদের মুখ। *পথের পাঁচালী* ও *অপরাজিত*-র প্রতি ঋত্বিক তাঁর গভীর অনুরাগের কথা লিখেছেন। কিন্তু এমনকি *পথের পাঁচালী*-তেও গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার অন্তিম ইমেজটি ওঁর ভালো লাগেনি; মনে হয়েছে, এই সমাপ্তিতে " মূল বইয়ের উদার, ভবঘুরে যাত্রীর সুরটা বাজে না।"[৪]

পুনরাবর্তনের পৌরাণিক সম্ভাবনা ঋত্বিককে আকৃষ্ট করেছে। ইতিহাসের প্রবাহকে অনুকরণ করে যে-আঙ্গিক তা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি; এমন আঙ্গিক খুঁজেছেন যা ইতিহাসকেই পরিক্রমার বিষয় করে তুলবে। এহেন অনুসন্ধানে একটি বিশেষ আলোড়নের কথা ঋত্বিককে বলতে হয়েছে, যে প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্যে দিয়ে তাঁর দেশের মানুষ সমকালীন নেশন-এর মঞ্চে পরিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এই যাত্রার বিবরণ দিতে গিয়ে ঐতিহ্য ও অতীত বনাম আধুনিকতার কোনো ছক বেছে নেবার উপায় ঋত্বিকের ছিল না, ফলে নিজের নির্বাচনে তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। সমালোচকের কাছে এই নিঃসঙ্গতা

একটা চ্যালেঞ্জ। সমালোচকের পক্ষেও সহজে এমন স্থির করা সম্ভব নয় যে তাঁর ছবিতে ঐতিহ্যসিদ্ধ আঙ্গিক আধুনিকতার বিরুদ্ধতায় রত। এরকম কোনো রাস্তা খোলা নেই তাদের সামনে।

বিস্মৃতির শহর

সারা রাত্রি কলকাতার মজায় গা ভাসিয়ে *সুবর্ণরেখা*-র দুই পলাতক, ঈশ্বর আর হরপ্রসাদ ট্যাক্সি চড়ে যাত্রা করে আরও গভীর রাত্রির অভ্যন্তরে। এর কিছুক্ষণ আগে, পানশালায় শুনেছি উপনিষদের আবৃত্তি, সঙ্গতে ছিল *লা দোলচে ভিতা*-র সঙ্গীত। সাংস্কৃতিক উদ্ধৃতির বর্ণাঢ্য কোলাজে শহরের প্রলাপমত্ত চৈতন্য শরীর ধারণ করে, দুই মাতাল বন্ধুকে গিলতে থাকে রাত্রি। পর্দার ওপর দিয়ে বয়ে যায় রাজপথের আলোর সারি, কিছুটা অস্পষ্ট। দুজনের কণ্ঠস্বর শুনি :

—অ্যাটম বম দ্যাখে নাই

—দ্যাখে নাই। দ্যাখে নাই?

—নেভার। যুদ্ধ দ্যাখে নাই, মন্বন্তর দ্যাখে নাই, দাঙ্গা দ্যাখে নাই, দেশভাগ দ্যাখে নাই....... অকারণ সেই পুরাতন সূর্যবন্দনা মন্ত্র.....

এর কিছুক্ষণ পরে ঈশ্বর উপস্থিত হবে সীতার দরজায়, তার প্রথম খরিদ্দার হয়ে। সীতা বঁটি দিয়ে কেটে ফেলবে নিজের গলা। পরিচালক ভয়াবহ শব্দে ঘোষণা করেছেন তাঁর প্রস্তাব: স্মরণ ছাড়া পরিত্রাণ নেই।

চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রকল্পের কাছে ঋত্বিক তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। চল্লিশের ট্র্যাজেডিকে উনি দেখেছেন শুধুমাত্র বিপ্লবের ব্যর্থতা হিসেবে নয়, বিস্মরণ আক্রান্ত এক জনগোষ্ঠীর দুর্ভাগ্যের নিরিখে। নিজের হারানো বাংলাদেশের কথা লিখেছেন যে ভাষায় তা *পথের পাঁচালী*-র লেখকের খুব কাছাকাছি; গৃহ, শৈশব, নৈসর্গিক প্রাচুর্যের দেশ সেটা।[৫] কিন্তু ওঁর ছবিতে স্মৃতির খননকার্য শুধু শিকড়ের সন্ধান নয় (যদিও তেমনই ভাবা হয়েছে অনেক সময়)। স্মৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্ধার বিচ্ছেদের আদি মুহূর্তটিকে চৈতন্যে ফিরিয়ে আনে, যে-মুহূর্ত আঘাতে বিহ্বল মানুষ কী করে স্মরণ করতে হয় তা জানেনা। এই স্মরণ-উদ্যোগের গতিপ্রকৃতি বুঝতে চাইলে একটা চ্যালেঞ্জ সামনে এসে দাঁড়ায়: ওঁর ছবিতে স্মৃতির পুনরুদ্ধার সময়ের প্রবাহকে সম্পূর্ণ করে, কিন্তু ভায়োলেন্সের ওপর প্রতিষ্ঠিত কালক্রমকে নিয়তিজ্ঞানে মেনে নিতে বলে না। ইতিহাসের গতি মাত্রেই প্রগতি এমন কোনো বিশ্বাসে ওঁর ছবি পৌঁছয় না, বিশ্বাস করায় না যে হাতে এসে বর্তানো বর্তমানই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার একমাত্র সম্ভাব্য পরিণতি। লব্ধ ইতিহাসের প্রতি এরকম কোনো বিশ্বস্ততা ওঁর ছিল না। সম্ভবত সেই কারণেই গ্রাম থেকে শহর অভিমুখে যাত্রা, নিয়তির মতো যার অবয়ব, ভবিষ্যতের যেখানে নিশ্চিত অভ্যর্থনা—সেই যাত্রা নিয়ে ঋত্বিক অস্বস্তি বোধ করেছেন। অথচ ওঁর ছবিতে বা লেখায় ইতিহাস বনাম পুরাণ—এমন কোনো প্রতর্কে আশ্রয় পাবার সুযোগ নেই। রয়েছে

অনেক বেশি কঠিন একটি প্রস্তাব, বর্তমানের যুক্তিহীন অধস্তলকে উন্মোচিত করার প্রস্তাব। যার একটা অর্থ রিয়ালিজম আর মেলোড্রামার গোপন আঁতাতকে উন্মোচিত করা।

ওই লুকোনো সমঝোতা ছাড়া বাস্তববাদ বা মেলোড্রামা কেউই সচরাচর আবির্ভূত হয় না। সেই সন্ধি যখন ভেঙে ফেললেন, ঋত্বিককে চলচ্চিত্রের পরিচিত পন্থাগুলি থেকে দূরে সরে যেতে হল। এখানে স্মরণ করা যাক যে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি ভারতীয় চলচ্চিত্রে বাস্তববাদ (বা আর্ট ফিল্ম) এবং মেলোড্রামা (বা জনপ্রিয় ছবি) দুটোই তাদের পরিণত ক্লাসিক আকার ধারণ করে। স্বাধীনতা-উত্তর জাতি রাষ্ট্রের আধুনিকায়নের প্রকল্পে নতুন মেলোড্রামা বিশেষ উৎসাহে সাড়া দিয়েছিল। শহরের রোমাঞ্চকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল নাগরিকত্বে উত্তরণের কাহিনী, শহরজীবনের অ্যাডভেঞ্চার পাল্টে দিয়েছিল আখ্যানের গতিপ্রকৃতি। এ ছবিতে যে নতুন প্রেম আবির্ভূত হলো তাকে এক অর্থে বলতে পারি আধুনিকতার সঙ্গে রোমান্স। নাগরিক সত্তা আবিষ্কারের শর্ত মেনেই এখানে রোমান্টিক যুগলকে বৃহৎ পরিবারের বলয় থেকে মুক্ত করবার, যুগলের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার একটা স্পষ্ট প্রয়াস দেখা যায়। ইতিহাসের ট্র্যাজেডিকে প্রাথমিক kinship-এর পরিধিতে, তার উদ্বর্তনের গণ্ডিতে টেনে এনে এক অর্থে ঋত্বিক মেলোড্রামার বিশ্বজুড়ে পরিচিতি একটি রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু স্মরণ করা যাক সমকালীন বুর্জোয়া মেলোড্রামার প্রয়াস: একদিকে পুরনো পরিবার ও গোষ্ঠী জীবনের আশ্রয় আর অন্যদিকে শিল্পায়ন ও ব্যক্তি-নাগরিকের বিকাশ—এই দুয়ের মধ্যে সেখানে আপস খোঁজা হচ্ছে। খুব কাছেই ছিল বাংলা নব্য মেলোড্রামার উদাহরণ, যে-গোত্রের ছবির সঙ্গে উত্তমকুমারের নাম ওতপ্রোত জড়িয়ে গেছে। সেখানে এহেন আপস থেকেই একটি শক্তিশালী আঙ্গিক জন্ম নিয়েছিল। বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে শহর-অভিযানের সবচেয়ে শক্তিশালী ফ্যানট্যাসি এখনও পর্যন্ত এখানেই লভ্য। অতীতের আশ্রয় না হারিয়ে এখানে ঐতিহাসিক বহির্বিশ্বে প্রবেশ সম্ভব।

ঋত্বিক ঘটকের মেলোড্রামা-অবলম্বনে এই নিরাপত্তার আশ্বাস নেই, *অযান্ত্রিক*-এর পরে ওঁর সেই মোড় বদল সত্যিকারের শঙ্কাজনক। সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে পারিবারিক পরিধিতে টেনে আনা মেলোড্রামার স্বভাব। ঋত্বিক আরও এক ধাপ এগিয়ে একেবারে প্রাথমিক সম্পর্কের বলয়ে প্রবেশ করেছেন, পৌঁছেছেন সেই সীমানায় যেখানে দাঁড়ালে এমনকি পারিবারিক ব্যক্তিসত্তা, পারিবারিক সমাজের আদলটিও অর্থময় হয় না, ব্যক্তির বিকাশের বিরুদ্ধে যেখানে প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে। শেষ অবধি এগিয়ে এই প্রথম মুহূর্তে পৌঁছোন ঋত্বিক, এমন একটা প্রাক সামাজিক স্তরে পৌঁছোন যেখানে ইতিহাসের অন্ধ ও নির্বাক স্তরগুলি কথা বলতে থাকে। ইতিহাসের চ্যালেঞ্জকে দুভাবে স্বীকৃতি দেয় ওঁর ছবি। একদিকে রয়েছে এমন এক আখ্যানতন্ত্র যা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় উন্মুক্ত হয়, ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ থেকে আহরণ করে তার সংহতি। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ সম্ভবত *কোমল গান্ধার* (১৯৬১)। ঐতিহাসিক স্মৃতির সাহায্যে সাজিয়ে না নিলে এ ছবি সম্পূর্ণ হয় না। অন্য পদ্ধতিটিকে বুঝতে হলে বোধহয়

তাকানো উচিত *সুবর্ণরেখা*-র (১৯৬২) দিকে—স্মরণ সেখানে শুধু অতীতকে চেনার উদ্যোগ নয়, ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিচে যা চাপা পড়ে গেছে তার উদ্ধার। প্রথম পদ্ধতিটি নিয়ে কিছুটা আলোচনা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, এই নিবন্ধে দ্বিতীয় প্রকল্প সম্পর্কে দু-একটা কথা বলব।

নিজের দেখা ইতিহাসের একটি বিচ্ছেদকে—দেশভাগকে—ঋত্বিক চূড়ান্ত বলে স্থির করেছিলেন। ক্রমশ প্রসারিত হয়ে সেই একটি ঘটনা এক মানবগোষ্ঠীর যাবতীয় বিচ্ছিন্নতা বিপন্নতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। লেখায় আলোচনায় ঋত্বিক চারপাশের সমস্ত অবক্ষয়ের কথা বলেছেন ওই একটি অবচ্ছেদের নিরিখে। একে অনেকের আতিশয্য মনে হয়েছে, অতীতচারিতা মনে হয়েছে। বারবার এক কথা বলা কি বাড়াবাড়ি নয়? সত্যিকারের পরিহাস সম্প্রতি আমাদের গোচরে এসেছে: ওই বিপুল বিপর্যয় আর ধ্বংসের ঘটনা, ঔপনিবেশিক শাসক ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের ওই যুগ্ম বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা আমাদের শিল্প সাহিত্যে নগণ্য অভিঘাত রেখে গেছে। দেখা যাচ্ছে লোকে দেশভাগের কথা বলতে ভুলে গিয়েছে।

গত কয়েক বছরে সমাজবিজ্ঞানীরা নানাভাবে এই নীরবতাকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। নীরবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে-আখ্যান ইতিহাস-কথনের আদলকে অনুসরণ করে তাকে কিছুটা অস্বীকার করবার প্রয়োজন অনুভব করেছেন ঋত্বিক, কৌম-কেন্দ্রিক নানা আঙ্গিকের মিশেল ঘটিয়েছেন তাতে, মহাকাব্য, ক্রনিক্‌ল প্লে, রূপক, সাঙ্গীতিক নাটকের উপাদান টেনে এনেছেন, আখ্যান-সংকর তৈরি করেছেন। কিন্তু পাশাপাশি আরও একটা উপায় অবলম্বন করেছেন: ওই ইতিহাসকে না মানার মুখোমুখি পড়ে এমন এক নাটক উনি রচনা করেছেন যেখানে কিছু হতভাগ্য লোক ঠিক ওই কথাটাই চেঁচিয়ে বলে, বলে 'আমরা মানি না'। এরা সেইসব লোক যারা পাহাড়ের গায়ে চিৎকার করে বলে তারা বাঁচতে চায়, পরিবর্তনের নির্মম নিয়মের সামনে দাঁড়িয়ে যারা গুটিয়ে নেয় বৃত্ত, নেতির বিরুদ্ধে ছুঁড়ে দেয় নেতি।

এই নাটকে একটি আত্মীয়তা বিশেষ তীব্রতায় উপস্থিত হয়, এমন চেহারায় উপস্থিত হয় যে মেলোড্রামার যুগল নির্মাণের যুক্তি পরাভূত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, বৃহৎ পরিবারতন্ত্রের যে মেলোড্রামা, 'ফিউডাল ফ্যামিলি রোমান্স' যাকে বলি—তার যুক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। সমাজ ও রাষ্ট্রের একক হিসেবে যে-পরিবারকে চিনি তার পরিধির বাইরে সরে যেতে থাকে এই আত্মীয়তা।

প্রথম পর্যায়ের ছবি

অযান্ত্রিক-কে (১৯৫৮) বাদ দিলে পঞ্চাশ ও ষাট দশকের সব ছবিতে বারবার বলা আছে ভাই ও বোনের ভালোবাসার কথা।[৬] রোমান্টিক যুগল অনুপস্থিত, রয়েছে ভাই-বোনের গল্প। রোমান্টিক যুগলের অভাব *অযান্ত্রিক*-কেও অবশ্য বেঁধে ফেলেছে ওই একই সূত্রে। *অযান্ত্রিক*-এ দ্বি-সত্তা-ভিত্তিক প্রাক্-সামাজিক বন্ধন রয়েছে বিমল আর তার ভাঙা গাড়ি জগদ্দলের মধ্যে। বিমল উৎকেন্দ্রিক, নিঃসঙ্গ; তার কথা বলার সঙ্গী শুধু

জগদ্দল আর গ্যারেজের ছেলে সুলতান। বাজারের অন্য ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা বিমলকে নিয়ে তামাশা করে। ওই গাড়িই কি তার অওরৎ? তাদের প্রশ্ন। হয়তো তাই; কিন্তু কেমন নারী সে? এক জায়গায় নিজের স্বাভাবিক নীরবতা ক্ষুণ্ণ করে সুলতানকে নিজের কথা বলে বিমল; বলে, এই মাগ্গি গণ্ডার বাজারে দিনের অন্নটুকু অন্তত তার হাতে তুলে দেয় জগদ্দল। এবং জানায়, জগদ্দল তার জীবনে আসে সেই বছর যে-বছর তার মা মারা যায়। পলাতকা মেয়েটির দৃশ্যগুলো মনে করা যাক। তার আবির্ভাবমাত্রই বিমল বিভ্রান্ত, অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, হাস্যকর অবস্থা হয় তার। পাল্লা দিয়ে অস্থির হয়ে ওঠে জগদ্দল—মারাত্মক তার প্রতিক্রিয়া, ঈর্ষার বশে সে প্রায় খুন করে বসে মেয়েটিকে। কিছুদিন বাদে সেই মেয়ের সঙ্গে আবার দেখা। প্রেমিক পরিত্যক্ত মেয়েটি ট্রেনে করে চলে যাবার ঠিক পরে পরেই এই একাত্মতার কাহিনি, যন্ত্রের মানুষ হয়ে ওঠার গল্প, গল্পের হিউম্যানিজম, আমাদের চোখের সামনে ভেঙে পড়ে। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে বিমল মেয়েটিকে পরের স্টেশনে ধরবার চেষ্টা করে, মাঝরাস্তায় বিকল হয়ে যায় জগদ্দল, বিশুদ্ধ জড়ত্বে পুনর্বাসিত হয়, মানুষ হয়ে উঠতে অস্বীকার করে। চারদিকের নিসর্গ রাজকীয় ঔদাসীন্যে দাঁড়িয়ে দেখে এই দৃশ্য। ক্যামেরার দৃষ্টি এই মুহূর্তে এসে কাহিনীর ভূমি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, ভেসে আসে অজানা উৎস থেকে।[৭]

বিমল যখন সামাজিক যৌনতার বলয়ে প্রবেশ করে, ওই পলাতকার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যখন যুগল-নির্মাণের কোনো এক সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখনই আখ্যানের বাস্তববাদী শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে (জগদ্দল নিথর হয়ে যাবার পরে পরেই আসে ওঁরাও নাচের দৃশ্য—*অযান্ত্রিক*-এর বহু -কথিত বিচ্যুতি)। প্রাক্-সামাজিক থেকে সামাজিকে প্রস্থান কেন এমন সংকট ডেকে আনবে? এ প্রশ্নের উত্তরে হয়তো জানা যাবে শুধু পরিচিত আঙ্গিক নয়, আঙ্গিক ও অনুভূতির পরিচিত বোঝাপড়া থেকে ঋত্বিকের দূরত্ব বিষয়ে কিছু সূত্র। গোটা প্রশ্নটা অনেক বেশি জটিল হয়ে ওঠে যখন মা ও সন্তানের সম্পর্ক নয়, যুগল-সম্পর্কের বিপরীতে উপস্থিত হয় ভাই বোনের বন্ধন। প্রকাণ্ড ও তীব্র হয়ে ওঠে তখন অভিঘাত। মাতা-পুত্র ও দাম্পত্য/যুগল সম্পর্কের সংঘাত অনেক বেশি পরিচিত, পুরনো—ভারতীয় মেলোড্রামা বেশ কয়েক দশক ধরে এই সংঘাতেরই নিষ্পত্তি ঘটাবার চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু বিশুদ্ধ যুগলের মূর্তিতে এই ভাই-বোনেদের আবির্ভাবের জন্যে আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না।

নাগরিক-এর (১৯৫৩) শেষ দিকে রামুকে তার প্রেমিকা উমা জানায় রামুদের পরিবারের সঙ্গে সেও বস্তি বাড়িতে উঠে যেতে প্রস্তুত। এই প্রতিশ্রুতি পাবার পর রামু তাদের পেয়িং গেস্ট সাগরকে বলে তার বোন সীতাকে গ্রহণ করতে, অনির্দেশ ভবিষ্যৎ-যাত্রায় তাদের সঙ্গী হতে। কিন্তু রামু-উমার সম্পর্ক ছবিতে সংক্ষিপ্ত, অপ্রধান; মূল সম্পর্ক রচিত হয়েছে রামু আর সীতার মধ্যে। বাড়িতে বসে ক্ষয়ে যাওয়া, বিবাহ-অযোগ্যা সীতা একমাত্র তার দাদার কাছে এসে হাসতে পারে, খেলায় মাততে পারে, মন খুলে কথা বলতে পারে। আর বারবার ইন্টারভিউতে ব্যর্থ, পরাজিত রামুর ওপর অবিচল আস্থা রাখে একমাত্র সীতা, সেই তার প্রধান আশ্রয়। প্রাত্যহিক দারিদ্র্যের পীড়ন

বাবা-মাকে মাঝে মাঝে নিঃসাড় করে ফেলে, কিন্তু এই সহোদর সম্পর্কের ছোট গণ্ডির মধ্যে বেঁচে থাকে সংবেদন, বাঁচবার ইচ্ছে।

আদান-প্রদানের চরম মুহূর্তে এ ছবিতে শরীর নাটকীয় ভঙ্গিতে সজ্জিত হয়। ষাটের দশকের তিনটি ছবিতে এইসব ভঙ্গিমা ক্রমশ ভাস্কর্য বা নৃত্যের মুদ্রায় বিবর্তিত হবে (নীতা ও অনসূয়ার কথা স্মরণ করা যাক), *নাগরিক*-এ এর প্রাথমিক রূপটা দেখছি। কিন্তু লক্ষ করার মতো ব্যাপারটা হলো এই সব ভঙ্গি রামু আর উমার মধ্যে যতটা রামু আর সীতার মধ্যে ঠিক ততটাই তীব্রতায় উপস্থিত। রামু-সীতার সংলাপে চূড়ান্ত আবেগের মুহূর্তে দেখা দেয় এইসব ভঙ্গি— একের যন্ত্রণা যখন অন্যের শরীরকে এসে বিদ্ধ করে। ঋত্বিকের ছবিতে চরিত্রের নামকরণ সবসময়েই রূপক-আশ্রিত; এদের নাম রাম আর সীতা।

বাড়ি থেকে পালিয়ে-র (১৯৫৯) শহর-যাত্রার রূপকথায় রাজকন্যার ভূমিকায় এসেছেন মা। তাঁর জন্যেই কাঞ্চন শহরে ঐশ্বর্য সন্ধানে এসেছে। কিন্তু একজন ছোট বোনকে পাওয়া গিয়েছিল এই অভিযানে, একটি আদি-প্রেমের প্লটে সেই ছিল নায়িকা। কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ছোট্ট মিনির, সে স্বপ্ন দেখেছিল মিনিকে নিয়ে মার কাছে যাবার। মিনির মা কাঞ্চনকে আপন করে নিয়েছিলেন, তাকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন নিজের বাড়িতে। কাঞ্চন আর মিনি *সুবর্ণরেখা*র অভিরাম-সীতাকে মনে পড়িয়ে দেয়। এই ছেলেমেয়েরা যে ভালোবাসার প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি করে তাকে মাতৃপ্রতিমার প্রতি পরিচালকের তথাকথিত অভিনিবেশের প্রসারণ হিসেবেই দেখা যায়।

বিচ্ছেদের অনুজ্ঞা ও অবরোধ

রক্ত-সম্পর্কের এই অতিরেক আলোচিত হয়নি, কিন্তু সব ছবিতেই এর নজির রয়েছে। *মেঘে ঢাকা তারা*-র (১৯৬০) নীতা সনৎ-এর সঙ্গে সম্পর্কে ব্যর্থ হয়; কিন্তু সেই সম্পর্কে নীতাকে বিশেষ কোনো উৎসাহে অংশগ্রহণ করতে দেখি না। আর একবার সনৎ-এর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানবার পর তাকে আর খুব বেশি এই সম্পর্ক নিয়ে ভাবিত বলেও মনে হয়না। সংক্ষুব্ধ উদ্বাস্তু সংসারের মধ্যে দাদা শঙ্করের সঙ্গে নীতা নিজেদের এক ছোট দ্বীপ রচনা করে নেয়া নিজস্ব এক ভাষার আদান-প্রদান ঘটে সেখানে, গোপনে। তার মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, রয়েছে ছেলেবেলার খেলা, শিল্পী আর স্বপ্নবিলাসীর দৈনিক লাঞ্ছনা ঠেকাতে নানান উপায় উদ্ভাবন।

বোন-গীতার সঙ্গে সনৎ-এর বিয়ে নিয়ে আসে প্রথম ক্লাইম্যাক্স। শঙ্কর এরপর বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, ক্ষয়ে যেতে শুরু করবে নীতা। বিয়ের আগে একদিন নীতা দাদাকে বলেছিল তাকে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাতে। সেই গান যখন তারা গায়, উচ্ছ্বাসের তীব্র ভঙ্গিমায় সজ্জিত হয় দুজনের শরীর, একের পর এক মুদ্রায়। ক্রমশ এই এক্সট্যাসির শীর্ষে পৌঁছোয় নীতার শরীর, গ্রীবার সঙ্গে সমকোণে শায়িত মুখ ভেসে যায় বেড়ার ঘরে ঢুকে পড়া জ্যোৎস্নায়। এই বিলাপ কি শুধু প্রেমিককে হারাবার জন্যে? ছবির প্রথম থেকে শরীরের মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকা আইকনের সম্ভাবনা মূর্তিধারণ করে এই গানের

দৃশ্যে, নীতা আর শঙ্করের শরীর জুড়ে যায় যৌথ প্রতিমার মুদ্রায়। গানে ভর দিয়ে কলোনি বাড়ির ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয় দুটি উন্মূল শরীর। নীতা জন্মেছিল জগদ্ধাত্রীপুজোর দিন, এরপর তার শরীর যখন বিলুপ্তির দিকে ঢলে পড়বে সাউন্ডট্র্যাকে শুনব মেনকার বিলাপ। কারা যেন নারীকণ্ঠে তাকে ডাকে, ফিরে যেতে বলে পাহাড়ে, তার নিজের ঘরে। সেই যাত্রায় যাবে নীতা তার পৃথিবীর ঘর ছেড়ে, সেই ঘর উঠোন ছেড়ে যেখানে কেউ তাকে চিনতে পারেনি। তার আগে শঙ্কর, শিব, তাকে ছেড়ে গিয়েছিল।

কোমল গান্ধার ঋত্বিক ঘটকের একমাত্র ছবি যেখানে কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছে প্রেম। মূল উপমাটি যদিও প্রেমের নয়, বিবাহের। ত্রিকোণ সম্পর্কের রূপক প্রলম্বিত হয়েছে তিনটি স্তরে—ব্যক্তি সম্পর্কে, দুটি গোষ্ঠীর সম্পর্কে, দুই ভূখণ্ডের সম্পর্কে। রাজনৈতিক নাট্যকর্মী হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন পরিচালক, নিজের বিবাহের কাহিনী বুনে দিয়েছেন প্লটে, দেশভাগের কথা বলেছেন সরাসরি প্রথমবার, চরিত্রদের সাক্ষী রেখে। এই দুঃসাহসের জবাবে এসেছিল প্রত্যাখ্যান ও নিন্দা: রাশিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে *মিরর* নামক আত্মচরিত সৃষ্টি করার দরুন আন্দ্রেই তারকোভস্কির যে-দশা হয়েছিল অনেকটা। প্রেক্ষাগৃহ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল *কোমল গান্ধার* কে। দেশভাগ নিয়ে অপরিমিত আক্ষেপ নয়, সে সময়ে বহু দর্শকের বিরাগের একটা কারণ ছিল ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ্যে বলার এই আয়োজন। কিন্তু সেটাই ছিল পরিচালকের অভীষ্ট: আত্মচরিতকে উপস্থিত করা ঐতিহাসিক কাহিনি হিসেবে।

ছবির আবহ জুড়ে রয়েছে বিয়ের গান, বিয়ের রিচুয়াল অনুষঙ্গ। সেই অনুষঙ্গ বৈদিক নয়, লৌকিক; স্ত্রী আচার, মেয়েদের গানে ভর করে তা এসেছে। রিচুয়াল ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করে। নায়িকা অনসূয়া দুই নাটকের দলের বিবাদের মধ্যস্থতা করে, কিন্তু নিজের দল ছেড়ে তার ভৃগুর দলে গিয়ে নাটক করবার মধ্যে দুই গোষ্ঠীর ভিতর নৃতাত্ত্বিক বিনিময়ের ইঙ্গিত রয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্য সেই বিনিময় ঘটাচ্ছে নারী নিজেই। এইভাবে প্রতিসরণ ঘটে প্রেমের গল্পের, দুই বাংলার মিলনের গল্পে এসে সংলগ্ন হয়। দম্পতি-নির্মাণ মূল পরিবার থেকে মূল গোষ্ঠী থেকে নারীর বিচ্ছেদ দাবি করে, *কোমল গান্ধার* বিবাহের মোটিফ ব্যবহার করে বিচ্ছেদের শুশ্রূষার জন্যে। শোকযাপন ও শুশ্রূষার জন্যে ভাবা হচ্ছে নতুন রাজনৈতিক নাটকের কথা: ভৃগু (এবং ঋত্বিক নিজে) ফিরে যাচ্ছে কালিদাসের *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্*-এ, এপিক আঙ্গিকের অনুসন্ধানে। সেই নাটকের যে সব দৃশ্য আমরা দেখি তার প্রায় সবই শকুন্তলার তপোবন ছেড়ে পতিগৃহে যাত্রার। দুই নাটকের দল একই সঙ্ঘের দ্বিধাবিভক্ত রূপ, দুই দেশ একই ভূখণ্ডের দুই খণ্ড, শঙ্খ বাদ্য উলুধ্বনি গানে যাদের মিলনের প্রস্তাব শুনছি তারা এক শরীরের দুই টুকরো। এই ছবির প্রেমিক-প্রেমিকাকে বিশুদ্ধ দুই ব্যক্তি বলে চিনলে চেনা সম্পূর্ণ হয় না।

ছবির শেষে রেল লাইনের ধারে ভৃগু আর অনসূয়া হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকে

মুখোমুখি, বৈবাহিক আচারের ভঙ্গিতে। ছবির গোড়ার দিকে লালগোলার দৃশ্যে এই রেল লাইনের সঙ্গে আমরা প্রথম পরিচিত হই। দৃশ্যের পর দৃশ্য জুড়ে সেখানে পরিসর, গতি আর সংগীতের এক বিস্ময়কর সঙ্গতি তৈরি হয়ে উঠেছে, আর তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভৃগু আর অনসূয়া পদ্মার ওপারে তাদের ফেলে আসা দেশের কথা বলছে। সেই সংলাপ শুনে হঠাৎ মনে হয় যেন একই বাড়ি, একই শৈশব ছেড়ে এসেছে তারা। দ্বিতীয় ভ্রমণের সময়, কার্শিয়াং পাহাড়ে, অনসূয়া সঙ্গিনী জয়াকে বলেছিল তার মায়ের কথা। রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন তার মা, নোয়াখালির দাঙ্গায় মারা গিয়েছিলেন। অনসূয়া বলে, "একটা আগুনের শিখার মত" ছিলেন তার মা, তাঁর চোখে একটা "আকুল করা" দৃষ্টি ছিল, আর সেই দৃষ্টি সে দেখতে পেয়েছে ভৃগুর চোখে। এরপর বোলপুরে ওরা যখন তৃতীয় ভ্রমণে যায় অনসূয়া তার সযত্নে আগলে রাখা মায়ের ডায়ারিটি ভৃগুর হাতে তুলে দেয়, বলে, "তুমি আমার মায়ের ছেলে, তোমায় আমি দেখেই চিনেছি।"

এই থিম কিছুটা আত্ম-সচেতন হয়ে উঠেছে "সুবর্ণরেখা"-তে। কুমার সাহানি লিখেছেন, এ-ছবি একটা গভীর অসুখকে চিনিয়ে দিচ্ছে, একটা গোটা শ্রেণির আত্মঘাতী অজাচারী প্রবণতা ঈশ্বর আর সীতার সম্পর্কে প্রতিবিম্বিত।[৮] কিন্তু যে-সম্পর্কের কথা বলছেন তিনি তার ভূমিকা শুধু ধ্বংসের নয়, লালনের। ঋত্বিক ঘটকের গোটা চলচ্চিত্র কর্মের দিকে তাকালে সে-কথা পরিষ্কার হয়। তাছাড়া সম্ভবত অজাচার নয়, ঈশ্বর-সীতার সম্পর্কে আরও বেশি লক্ষ করার মতো হলো এমন এক বস্তুর উপস্থিতি যা 'নিজের অতিরিক্ত'; যার সামাজিক সংজ্ঞা নেই, সেই সংজ্ঞায়নের ভূমিতে যা এখনও প্রবেশ করেনি। যৌনতার যেসব সামাজিক নাম পরিচয় আছে অজাচারকে তার মধ্যে ফেলতে পারি, কিন্তু সেই নামকরণের প্রাক্-লগ্নে কোথাও এই বস্তুগত সম্পর্ককে রাখতে হবে। সম্পর্কের প্রতীকী বিস্তার, সংজ্ঞার বিস্তারের মধ্যেই এই অতিরিক্তের জন্ম হচ্ছে।

ঈশ্বরের জীবনে কোনো নারী নেই। উদ্বাস্তু কলোনিতে ঘর বাঁধতে গিয়ে সে তার ছোট্ট বোনের পিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কলোনি ছেড়ে ঈশ্বর ছাতিমপুরে চাকরি নিয়ে চলে যায় (হরপ্রসাদের ভাষায়, পালিয়ে যায়) সীতার ভবিষ্যতের কথা ভেবে। মা-হারা অভিরাম তাদের সঙ্গী হয়। অভিরাম বোর্ডিং স্কুলে পড়তে চলে যাবার পরে ওই নির্জন দেশে সীতাই ছিল ঈশ্বরের একমাত্র সঙ্গী। বড় হয়ে ওঠা সীতার মধ্যে ঈশ্বর নিজের মাকে আবিষ্কার করে (যে মাকে সে দেখেনি "কোত্থেকে ঠিক তার মতো ধমক দেওয়া, ঘাড় বেঁকিয়ে হাঁটা আর গোমড়া মুখ করা" শিখল সে?—সীতার প্রতি তার প্রশ্ন)। এই ভালোবাসায় ঈর্ষা অনুপস্থিত নয়। যুবক অভিরামের সঙ্গে ঈশ্বরের দূরত্ব এবং অভিরাম ও সীতার সম্পর্কের কথা জানতে পেরে তার উন্মত্ত রাগ, সীতা পালিয়ে যাবার পরে তার উন্মাদনা—এ সবকিছু কাহিনির যুক্তিতে সিদ্ধ, কিন্তু প্রতিক্রিয়ার যে-নকশা এইভাবে গড়ে ওঠে তাতে অন্য এক যুক্তি প্রবেশ করে, গোপনে অন্য অনুভূতির ভর তৈরি হয়। হরপ্রসাদের আমন্ত্রণে ঈশ্বর আবার শহরে যাবে, কলকাতার 'বীভৎস মজায়' গা ভাসাবে, হাজির হবে সীতার দরজায়। পুনর্মিলনের সেই মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে

যাবে সীতা। এইসব কাকতালীয় কান্ড সমালোচকদের হতাশ করেছিল, কিন্তু কাকতালীয় বলে একে মানেননি পরিচালক, লিখেছেন, "ওই ভাই যে কোনো মেয়ের ঘরেই যেত, সেও কিন্তু ওর বোনই হত।"[৯]

ঋত্বিক তাঁর প্রিয় লো-অ্যাংগ্‌ল শট নিয়ে ছবি জুড়ে খেলা করে গেছেন। সেই খেলার মাঝে এক সময় আসন্ন ধ্বংসের ছায়া এসে পড়ে ইমেজে। ঈশ্বর সীতাকে কাছে টেনে নিয়ে জিগ্যেস করছে কী করে ঠিক সে তাদের মায়ের মতো হয়ে উঠল; সীতা সামনে ঝুঁকে দাদার কপালে হাত বুলিয়ে আদর করে, তার কানে ফিসফিস করে বলে, "আমি তো তোমার মা-ই।" চূড়ান্ত নিচু কোণে এদের দুজনকে ধরে রাখে ক্যামেরা, দৃশ্যমান হয় সিলিং-এর ঘুরন্ত পাখা। ফ্রেমের পরিসীমার ওপর তীব্র চাপ, এক অস্বাভাবিক টান যেন নির্দেশ করে সংজ্ঞার সীমা লঙ্ঘন করা সম্পর্কের দিকে। সীতা ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর এই ফ্রেম ফিরে আসবে : যেখানে ফ্যান ঝুলছিল সেই আঙটায় কাপড় ঝুলিয়ে আত্মহত্যার আয়োজন করবে ঈশ্বর।

অস্পৃশ্য অভিরামকে বিয়ে করে সীতা। অভিরামের মায়ের নাম যে কৌশল্যা তা সংক্ষেপে ছবির গোড়ায় আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই উদ্বাস্তু, অন্ত্যজ রাম আর সীতা একই বাড়িতে মানুষ হয়েছে, বড় হয়েছে ভাইবোনের মতো। পরিত্যক্ত বিমানবন্দরের দিকে তারা যখন ছুটে যাচ্ছে নিসর্গের মধ্যে দুজনের মূর্তি খুব স্পষ্ট 'পথের পাঁচালী'-র অপু-দুর্গাকে মনে করিয়ে দেয়। এই গভীর নির্জন দেশে তাদের আর কোনো সঙ্গী কোথাও নেই, তৃতীয় কোনো চরিত্রের আবির্ভাবের পথ নেই। যুবক অভিরামের প্রথম পদার্পণেই সরাসরি সীতা আর তার প্রেমের কথা উঠে আসে, যেন এমনটাই হবার কথা ছিল। ওই দুই শিশুকে দেখে কি এরকম প্রত্যাশা তৈরি হয়?

এই আত্মীয়তার লালন ও সৃষ্টির খুব কাছেই যে রয়েছে সর্বনাশ সেকথা ছবিগুলি বিস্মৃত হয়নি, কিন্তু বলা যায় *সুবর্ণরেখা*-তে প্রথম এই দুই সম্ভাবনা একই সঙ্গে উচ্চারিত। ইতিহাসের বৃহৎ কাহিনির সঙ্গে এই ভালোবাসার গল্পের সংযোগ সন্ধান করতে গিয়ে শহর আর প্রান্তভূমির সম্পর্ককে টেনে আনা যায়। সীতা, অভিরাম আর ঈশ্বর শহর থেকে দূরে, অপরিচিত প্রকৃতির আড়ালে এক প্রলম্বিত শৈশব কাটিয়েছিল। তিনজনকেই শহরে ফিরতে হয়, ফিরতে হয় সেইখানে যেখানে ঐতিহাসিক বর্তমান শরীর ধারণ করেছে। সেখানে নর-নারীর সম্পর্কের পরিচিত রূপ প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সীতা হারায় তার দুই ভাইকে।

পুরাকাহিনি ও ইতিহাস

ঋত্বিক ঘটকের নিজের কিছু লেখা আজ অবধি তাঁর ছবি বিষয়ে সবচেয়ে জরুরি আলোচনা হয়ে রয়েছে।[১০] কিন্তু এই থিম-টি সম্পর্কে তিনিও নীরব। নিজের ছবির কয়েকটি পুনরাবৃত্ত উপাদানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঋত্বিক সাইকোঅ্যানালিটিক প্রত্যয় ব্যবহার করেছেন, ইয়ুং থেকে ধার করেছেন সেসব প্রত্যয়। সমসাময়িক মার্কসবাদী চিন্তায় আত্মতা বা ঐতিহ্যের প্রশ্নে যে নীরবতা ছিল তা পূরণ করবার তাগিদে এহেন

চিন্তা প্রকরণের আশ্রয় নিতে হয়েছে। ইয়ুং সাহায্য করেছেন সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে এই প্রশ্নগুলো তুলতে; মননের যে পরিবেশে তিনি বাস করতেন সেখানে ফ্রয়েডকে টেনে আনার অর্থ হতো খুব বেশি ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার বলয়ে ঢুকে পড়া। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক প্রশ্নে ঋত্বিকের গভীর উৎসাহের কথা ভাবলে জানতে কৌতূহল হয় ফ্রয়েডীয় চিন্তায় যাকে 'ফ্যামিলি কমপ্লেক্স' বলে সে বিষয়ে কোন ভাবনায় তিনি উদ্যোগী হতেন। ব্যক্তি মনস্তত্ত্ব বা সর্বজনীন নিয়তির গণ্ডি পেরিয়ে বারবার এই কমপ্লেক্স-এর কাঠামো নিয়ে ভাববার প্রয়োজন আসে। বিষয়ীর সামাজিক নির্মাণের সূত্র সন্ধান করা যায় এই কাঠামোয়, বিনিময়ের সামাজিক জগতে বিষয়ীর প্রবেশের রূপক হিসেবে পড়া যায় মনোসমীক্ষণের এইসব প্রস্তাবকে।

এই ভাইবোনেরা দ্বি-সত্তা-ভিত্তিক যে বদ্ধ সম্পর্ক তৈরি করে তা এক অর্থে ইডিপাস পরিক্রমাকে অস্বীকার করে। এবং সেই অর্থেই ব্যক্তির নিয়মমাফিক 'ঐতিহাসিক' বিকাশেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ইডিপাস কমপ্লেক্স সর্বজনীন কিনা এ নিয়ে নানা সময়ে নৃতাত্ত্বিকরা প্রশ্ন তুলেছেন: কিন্তু আমরা ইডিপাস কাঠামোর কোনো একটা সংস্করণ ভারতীয় সমাজে বা এই সব ছবিতে খুঁজে বার করার প্রশ্ন তুলছি না। উপরে কথিত ওই প্রতিবন্ধকতার গতিপ্রকৃতি বা গঠনকে বুঝতে ইডিপাস উপমাটি সাহায্য করে কিনা সেটাই প্রশ্ন। কবি ও প্রাবন্ধিক এ কে রামানুজন তাঁর একটি রচনায় বলেছেন ইডিপাসের গল্প ভারতীয় লোক-কাহিনীর ভাণ্ডারে অবশ্যই উপস্থিত, কিন্তু গল্পটা প্রায় সবসময়েই শুনছি মায়ের জবানীতে। মূলত মায়েরা মেয়েদের বলছে গল্পটা, আকাঙ্ক্ষার গতিমুখ ফেরানো আছে ছেলের দিকে।[১১] এক কাহিনীর নানাবিধ শৈল্পিক বিন্যাস দেখিয়ে দেয় কীভাবে একটি সংস্কৃতিতে আকাঙ্ক্ষার রীতি আর পারিবারিক বিধির মধ্যেকার দূরত্ব সৃষ্টিশীল চৈতন্যের আকার নেয়। এইরকমই এক ভারতীয় কাহিনীতে মা তার স্বামীর সন্তানের জন্ম দেবার পর জানতে পারে সেই স্বামী আসলে তারই হারানো ছেলে। সদ্যোজাত সন্তানের আচ্ছাদনের কাপড় দিয়ে নিজের গলায় ফাঁস দেবার আগে সে গান গেয়ে শিশুটিকে ঘুম পাড়ায় :

ঘুমোও
ছেলে আমার—
নাতি আমার
আমার স্বামীর ভাই
ঘুমোও তুমি ঘুমোও
ঘুমোও।[১২]

মৃত্যুর আগে এমন কোনো গান মনে পড়তে পারত সীতার।

রামানুজন ভারতীয় ইডিপাস কাহিনীর যেসব উদাহরণ দিয়েছেন গ্রীক পুরাণের সঙ্গে তাদের আশ্চর্যরকম মিল। কিন্তু গল্পগুলো যে মায়ের মুখে বলা সেটা মনে রাখলে ইডিপাস কমপ্লেক্সের নিষ্পত্তির মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির বিকাশের কাহিনীকে নতুন করে সাজাতে হয়। এভাবে সাজালে গল্পটা প্রাক্-ইডিপাস আকার ধারণ করে। দুই সত্তার

মাঝখানে তৃতীয় এককের প্রবেশ, পিতা নামক আইন, বিধি, সমাজের প্রবেশ, কমপ্লেক্সের মুহূর্তটি সূচিত করে। এখানে তো শুনছি জোকাস্তার গল্প, ইডিপাসের নয়; মায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটাকে ওই কমপ্লেক্সের কাঠামোয় ফেলা যায় না।[১৩] কোথায় পাওয়া যাবে সেই কাহিনি যা সমাজে গ্রন্থিত বৃহৎ আখ্যানের প্রতিধ্বনি তৈরি করবে?

পুরাণে যেহেতু তাঁর বিশেষ অভিনিবেশ ছিল ঋত্বিক হয়তো কখনও ভেবেছিলেন ইডিপাসের কন্যার কথা। পুরাণে 'আন্তিগোনে'ই ভাইবোনের সবচেয়ে পরিচিত কাহিনি যেখানে আত্মীয়তা এসেছে নাগরিকসত্তা নির্মাণে প্রতিবন্ধকতা হয়ে। আন্তিগোনে ভাই-এর সৎকার করতে গিয়ে নগরের আইন লঙ্ঘন করার সিদ্ধান্ত নেয়। দুই বিধির এই সংঘাতের একটি ভাষ্য রচনা করেছিলেন হেগেল। ওই সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন এ এমন এক বন্ধন যা 'transience' এবং 'Inequality' থেকে মুক্ত। উনি বলছেন একজন বোন 'ethical life'-এর উন্নততর স্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পৌঁছোতে পারে। কেননা কন্যা হিসেবে একজন নারীকে তার পিতামাতার মৃত্যু মেনে নিতে হয়। মা বা স্ত্রী হিসেবে তার অবস্থান দৈবনির্ভর, অন্য কেউ সে-অবস্থানে থাকতে পারত; এবং সেই সম্পর্ক আকাঙ্ক্ষার গণ্ডিতে বদ্ধ। স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক অসম, তদুপরি এক্ষেত্রে সে অপরের মধ্যে নিজেকে চিনে নিতে পারে না। কিন্তু এই অপরের সাপেক্ষে নিজের বিশুদ্ধ 'recognition' তার ভাই-এর মধ্যে সম্ভব : "The loss of a brother is therefore irreparable to the sister."[১৪] এসব কথা সোফোক্লেসের নাটকে আন্তিগোনের সংলাপেরই প্রতিধ্বনি।[১৫]

আন্তিগোনে কি শুধু পারিবারিক বিধির পক্ষ নিয়ে নগরের আইনের বিরুদ্ধে সওয়াল করছে, নাকি একটি সম্পর্ককে অন্য সব সম্পর্কের অধিক, অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে সে পারিবারিক সম্পর্কের অর্থনীতিকেই বিপর্যস্ত করে তুলেছে? হেগেলের পরে প্রশ্নটাকে এই অবধি টেনে এনেছেন একজন দার্শনিক।[১৬]

আইন ও রাষ্ট্রের এই রূপক আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক, ঋত্বিকের ছবিতে ফিরে ফিরে আসা একটি অবরোধকে চিনতে একে প্রয়োজন হবে। এই অবরোধ বড় হবার অনুজ্ঞার বিরুদ্ধে, 'বিকাশে'র আখ্যানের বিরুদ্ধে। ভারতীয় চলচ্চিত্র তখন আধুনিক নাগরিকের সত্তা সন্ধানে রত। পঞ্চাশ ষাট দশকের চলচ্চিত্রে প্রায় সর্বত্র এই উদ্যোগের জবাবে ঋত্বিক বলছেন সেই শোকযাপনের কথা যাকে ছাড়া কোনো নতুনের অভিষেক সম্পূর্ণ হয় না। আন্তিগোনে-র কাহিনির মতোই ওঁর ছবিতে ভালোবাসা আত্মীয়তার অর্থনীতির অতিরিক্ত হয়ে ওঠে, পরিবার তথা রাষ্ট্রের বাইরের এক পরিসর চিহ্নিত করে। দুই-এর আদি বন্ধনের প্রয়োজনীয় সামাজিক বিভাজন ঘটতে দেয় না। স্মরণের যে-উদ্যোগ উনি নিয়েছেন দেখা যাচ্ছে তার স্বার্থেই আসছে অস্বীকার, ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বিচ্ছেদের অস্বীকৃতি। এ কাজ ঐতিহাসিকের পক্ষে করাটা বিপজ্জনক, অতি পরিচিত প্রতিক্রিয়াশীলতার জন্ম হতে পারে এর থেকে। কিন্তু একজন শিল্পী এইভাবে একটা জনপ্রিয় প্রবণতাকে সত্য-উদ্‌ঘাটনের সীমায় টেনে নিয়ে যেতে পারেন। মেলোড্রামা সামাজিক সংকটকে পারিবারিক সংকটের পরিসরে স্থানচ্যুত করে, ত্রিকোণ সম্পর্কের

আড়ালে 'ফ্যামিলি কমপ্লেক্স'-এর অবতারণা করে— সেই স্বভাবকে ঋত্বিক এমন এব সীমানায় টেনে আনছেন যেখানে অস্বীকার বিশুদ্ধ যন্ত্রণার উচ্চারণ হয়ে ওঠে। সাইকোঅ্যানালিসিস যাকে বলে 'সিম্বলিক' জগৎ, এই ভাইবোনেরা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে তার আওতা থেকে সরে যায়, সরে যায় লেনদেনের সেই সমাজ থেকে যেখানে সবকিছুর নাম পরিচয় সিদ্ধ, সবার নিয়তি ইতিমধ্যেই বিবৃত। একরকমের ইতিহাসের বোধ আছে যেখানে যে-কাহিনি ঘটে চলেছে তার পরিণতি আগে থেকেই নিশ্চিত, বলার আগেই বর্ণিত, ধ্বংস ও গণহত্যার মধ্যে দিয়েও সেখানে ইতিহাস কেবলমাত্র 'এগোয়'। এহেন বিবর্তনের প্রতিবাদে প্রাপ্তবয়স্ক হতে অস্বীকার করে ঋত্বিকের ভাইবোনেরা।

'সিম্বলিক' ভাষার সংসার। সিম্বলিক-এর বলয় থেকে অপসৃত হলে নীরবতা সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় জান্তব চিৎকার, ব্যাখ্যার অতীত যন্ত্রণার। *মেঘে ঢাকা তারা*-র ওই উচ্ছ্বাসে অবরুদ্ধ শরীরকে আর কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? কীভাবেই বা বোঝা যায় পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত, পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে পাড়ি দেওয়া চিৎকারকে? খুব বিশেষ একটা অর্থে নীতার মতো মেয়েরা বহির্জগতে, প্রাপ্তবয়স্কের দুনিয়ার সংস্পর্শে আসতে পারে না, চায় না। এই বর্হিবিশ্ব তাদের নিসর্গকে ধ্বংস করেছে, যে-নিসর্গ আর ঘর তাদের কাছে একাকার ছিল। এইরকম অস্বীকার নঙর্থক, পশ্চাদপদ হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু কোনো আমূল পরিবর্তন সাধনে এই নেতির মুদ্রা প্রাথমিকভাবে জরুরি। বিদ্যমান বাস্তবতার সমস্ত নিয়মকানুন থেকে, অর্থাৎ তার ভাষা থেকে, নিজেকে সরিয়ে নেবার মুদ্রা এটা।

ভাইবোনের সম্পর্ক আর রোমান্টিক যুগলের সংলগ্নতার কথা ভাবলে এমিলি ব্রন্টির *Wuthering Heights*- এর কথা মনে পড়বে। ওই উপন্যাসে 'সিম্বলিক' থেকে অপসরণের প্রক্রিয়াকে জুলিয়েট মিচেল হিস্টিরিয়ার বয়ানের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন (ক্যাথরিন সেখানে শেষ পর্যন্ত নিজেকে হিথক্লিফের থেকে আলাদা করে উঠতে পারে না, নেলিকে সে বলে, "Heathcliff is me")। মিচেলের মতে মেয়েদের নিজস্ব ভাষা এইরকম বয়ানের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে। কারণ সত্যিকারের অপসরণ সম্ভব নয়, পলায়ন সম্ভব নয়, কথা বলতে গেলে পুঁজিবাদী পিতৃতন্ত্রের কথার ভিতর থেকেই বলতে হবে— সে কথা শোনাবে হিস্টিরিয়ার মতো। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে মিচেল বুর্জোয়া নভেলেরই একটি সাধারণ চরিত্রলক্ষণ সন্ধান করেছেন। এর থেকে যেমন মিল্‌স অ্যাণ্ড বুন রোমান্স তৈরি হতে পারে তেমনি সৃষ্টি হতে পারে *Wuthering Heights* এর সত্য।[১৭]

একজন মার্কসবাদী পরিচালকের থেকে যেরকম আশা করা যেতে পারে সেরকম রাজনৈতিক চলচ্চিত্র ঋত্বিক ঘটক কখনই তৈরি করেননি। আবেগের ইতিহাসকে অস্বীকার করেননি বলে ওঁর রাজনীতি অনুভবে এতটা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। একদিকে মানুষের দৈনন্দিন লড়াইয়ের ছবি আঁকছেন জোরালো সোজা টানে, অন্যদিকে বলছেন জরুরি অথচ বিপজ্জনক এক অস্বীকারের কথা, দিনের আলোয় বেরোতে না-চাওয়া মানুষের গল্প। জীবিকার লড়াই-এ, সংসারের শ্রমে, বাঁচা-মরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নীতা, অনসূয়া,

সীতা সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত সামাজিক প্রাণী; কিন্তু এক অসহনীয় কোমল উদ্ভাসে ঘেরা এদের সত্তা। *মেঘে ঢাকা তারা*-র বিবেকরূপী বংশী মুদি বলেছিল : "শান্ত মেয়ে, ওর কি অত কষ্ট সাজে?" এরা বহির্বিশ্বের নির্মমতার সঙ্গে যুঝতে না পেরে যে তাদের আত্মার অংশ তাঁকে আঁকড়ে ধরে। এই আত্মীয়তায় ঘর ছাড়তে হয় না, লুকোনো থাকে সেই দেশ যাকে ঘর বলা যায়। এসব ছবিতে যে দুর্বোধ্য যন্ত্রণার আমরা মুখোমুখি হই তার উৎস বোধহয় এই লুকোনো দেশে।

এই আবেগ একতরফা সম্মতি পায়নি ঋত্বিকের কাছ থেকে (নীতা, সীতা বা ঈশ্বরের দিকে অভিযোগের আঙুলও তোলা হয়েছে), কিন্তু একে অস্বীকার করবার উপায় তাঁর জানা ছিল না। এর মধ্যে তিনি ধ্রুপদী ট্র্যাজেডির উপাদান খুঁজে পেয়েছেন, এমন বস্তুর দর্শন পেয়েছেন যাকে আত্মস্থ করবার ক্ষমতা তাঁর সমসাময়িক রিয়ালিজম বা মেলোড্রামা কারুরই ছিল না। রিয়ালিজমের আইনকানুন থেকে বিচ্যুত হবার দরুন ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত ঘটিয়েছেন তিনি, কিন্তু আধুনিক আঙ্গিক থেকে বিচ্যুত হবার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। কী মূল্যে এই সব পর্বান্তর, এই আধুনিকতা আমাদের জীবনে সংশ্লিষ্ট হয় তার একটা হিসেব তৈরি করছিলেন।

উল্লেখপঞ্জি

১. ঋত্বিক ঘটক, 'একমাত্র সত্যজিৎ রায়', *চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু* (কলকাতা: 'সন্ধান' সমবায় প্রকাশনী ১৩৮২), পৃ. ৬৭।

২. তদেব।

৩. বিভূতিভূষণের উপন্যাসের এই অংশে অবশ্য বিশুদ্ধ কোনো প্রত্যাবর্তন নেই। গোটা উপন্যাসের রীতিটি এখানেও অনুসৃত: একদিকে রয়েছে পুনরাবর্তন, অন্যদিকে পরিবর্তন, সম্মুখযাত্রা। এই অংশে অপুর বয়ানে ইংরিজি শব্দের অনুপ্রবেশ এবং শৈশবের সাথী গ্রামবাসীদের সঙ্গে অপুর দূরত্ববোধের করা স্মরণ কথা যেতে পারে।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬।

৫. ঋত্বিক ঘটক, 'ছবি করা', *চিত্রবীক্ষণ* ১৮ : ১-২ (অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৮৪), পৃ. ৩৫।

৬. *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৩৭৩) ও *যুক্তি তক্কো আর গপ্পোকে* (১৯৭৪) এই আলোচনার বাইরে রাখছি, কিন্তু ওই দুটি ছবিতেও এই থিমটি প্রসারিত। কিশোর-সুবল-বাসন্তী বা নচিকেতা-বঙ্গবালার কাহিনি একটু অন্যভাবে এই একই সম্পর্কের কথা বলছে।

৭. এইরকম ধারকবিহীন অজানা উৎস থেকে আসা দৃষ্টিকে জাক লাকাঁ বলেন 'gaze'। এ-বিষয়ে একটি প্রবন্ধে *অযান্ত্রিক*-এর আলোচনা করেছি ('আধুনিকতা, অযান্ত্রিক ও অবশেষের যুক্তি', *বারোমাস*, শারদীয়, ১৯৯৭)।

৮. Kumar Shahani, 'Violence and Responsibility'. in Ashish Rajadhyaksha and Amrit Gangar ed. *Ritwik Ghatak, Arguments / Stories* (Bombay : Screen Unit. 1987). pp. 88-89.

৯. ঋত্বিক ঘটক, 'সুবর্ণরেখা : পরিচালকের বক্তব্য', *চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু*, পৃ.৪১।

১০. যে প্রবন্ধগুলির কথা বিশেষ করে ভাবছি তার মধ্যে পড়ে : 'মানবসমাজ, আমাদের ঐতিহ্য, ছবি করা ও আমার প্রচেষ্টা'; 'কোমল গান্ধার প্রসঙ্গে'; 'সুবর্ণরেখা : পরিচালকের বক্তব্য'; 'অযান্ত্রিক নিয়ে কিছু ভাবনা'; 'Music in Indian Cinema and the Epic Approach'; 'An Attitude to Life and an Attitude to Art.'

১১. Ramanujan, 'The Indian Oedipus'. in Lowell Edmunds and Alan Dundes ed. *Oedipus, A Folklore Casebook* (New York and London : Garland Publishing. Inc.. 1983), p.p. 238-261.

১২. তদেব

১৩. সোফেক্লেসের 'ইডিপাস রেকস'-এ জোকাস্তা ইডিপাসকে জানায় মা-কে বিবাহ করবার ইচ্ছা কোনো রহস্য নয় যার উদ্‌ঘাটন প্রয়োজন, এ সর্বজনবিদিত সত্য।

১৪. G.W.F. Hegel. *Phenomenology of Spirit* S 457, trans. A.V. Miller. Analysis and Foreword by J.N. Findlay (Delhi : Motilal Banarasidas Publishers Pvt.Ltd. 1998) pp 274-275.

১৫. 'I would not have done the forbidden thing
For any husband or for any son
For why? I could have had another husband
And by him other sons. if one were lost ;
But father and mother lost. where would I get
Another brother?'
Sophocles. 'Antigone'. *The Theban Plays*, Trans. E.F. Watling (Harmondsworth : Penguin Books. 1947) p.150

১৬. জাক দেরিদা এই তর্ক তুলেছেন। দ্র. Derrida. *Glas*, trans. John p. Leavy. Jr. and Richard Rand (Lincoln : University of Nebraska Press. 1986)

১৭. Mitchell. *Women : The Longest Revolution, Essay on Feminism, Literature and Psychoanalysis* (London ; Virago. 1984). pp 287-294.

বাঙালি ভদ্রলোকের হিমালয় দর্শন

রণবীর লাহিড়ী

উনিশ শতকের শেষ দশকে হিমালয়-কেন্দ্রিক এক শ্রেণির ভ্রমণসাহিত্য বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে দেখা দেয়। প্রায় এক শতক ধরে এই সাহিত্য শুধুমাত্র জনপ্রিয় নয়, বাঙালির হিমালয় ভ্রমণ ও দর্শনের একটা নকশা এখানে তৈরি হয়ে আছে, যা কেবল হিমালয় ভ্রমণের নির্দেশিকাই নয়, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি মানসের মানচিত্রও বটে। এই ঘরানার যে ক-জন লেখক এই সাংস্কৃতিক ঘটনাকে ধ্রুপদি সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছেন তাঁরা হলেন জলধর সেন, প্রমোদকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। যদিও বিক্ষিপ্তভাবে বাঙালির এই হিমালয়-মগ্নতা দেবেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দ— সবার লেখাতেই কমবেশি দেখা যায়। তবে, জলধর সেনের 'হিমালয়' বাঙালির হিমালয়-নির্ভর ভ্রমণ সাহিত্যের আদি গ্রন্থ যাকে আশ্রয় করে এক বিপুল সাহিত্য-সংস্কৃতি শতাধিক কাল জুড়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে, উপনিবেশের বাঙালি ভদ্রলোকের নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব, টানাপোড়েন তার এই হিমালয়-মুখীনতার আড়ালে গোপনীয়তা রক্ষা করে এসেছে। এটা তার নিছক প্রকৃতিপ্রেম বা সৌন্দর্য-দর্শনের গল্প নয়, এ এক ধরনের রাজনৈতিক বিবৃতিও বটে। এখন প্রশ্ন হল বাঙালির এই হিমালয়মুখীনতার রাজনীতি কী? এ-কি উপনিবেশের পরাভূত জাতির এক ধরনের অরাজনৈতিক অবস্থান, দাসত্বের গ্লানির উদ্‌বৃত্তিগত অবস্থান্তর মাত্র? না কি নবোদগত জাতীয়তাবাদের এক প্রচ্ছন্ন প্রকল্প যা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের হাত ধরে মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিল? কোনো সহজ উত্তর এখানে দেওয়া যায় না। দেওয়াটা কাম্যও নয়।

এই প্রশ্নের সঙ্গে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে আছে যে প্রশ্নটি তা হল এই ভ্রমণ-সাহিত্য কীভাবে পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বকে নিজের মতো করে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। অষ্টাদশ শতকের পশ্চিমি সৌন্দর্যতত্ত্বের কেন্দ্রস্থ ধারণা 'সাবলাইম'-এর যথাযথ প্রতিশব্দ বাংলা ভাষায় নেই। বেশ কিছু শব্দের ব্যবহারে হয়তো বা সাবলাইমের সমধর্মী অর্থবিন্যাসে পৌঁছোনো যায়। শব্দগুলো যথাক্রমে 'বিশাল', 'প্রকাণ্ড', 'অসীম', 'অনির্দিষ্ট'। এদের জড়ো করলে যা দাঁড়ায় তা হল এমন কিছু যা যুগপৎ ভয় ও সমীহ উদ্রেক করে। হিমালয়ের ভাবগম্ভীর রূপ চিত্রণে যে আত্মসাৎ করার কৌশল গৃহীত হয়েছে সেখানে পশ্চিমের 'সাবলাইম'কে মিশিয়ে নেওয়া হয়েছে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে। এই মেলানোমেশানোর প্রক্রিয়া এতটাই জটিল যে হিমালয় এখানে হয়ে দাঁড়ায় হিমালয়োত্তর

এক বিশাল রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মঞ্চ। তাই, নিছক কোনো ভৌগোলিক অবস্থান নয়, হিমালয় উপনিবেশের শিক্ষিত বাঙালির (যার প্রকৃতিপ্রেম অনেকটাই গড়ে উঠেছে ইউরোপের রোমান্টিসিজম ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায়) এক জটিল সাংস্কৃতিক নির্মাণ। আবার, এভাবেই বলা যায় বাঙালির এই হিমালয়-নিবিষ্টতা এক বহুস্তরবিশিষ্ট মধ্যস্থতার কাহিনি। এই কাহিনির শুরু হতে পারে পশ্চিমি সাহিত্য ও শিল্পে 'সাবলাইম' কীভাবে এসেছে তার আলোচনা দিয়ে।

২

বিগত তিনশো বছরের পশ্চিমি নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত ধারণাটি হল 'সাবলাইম'। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যুক্তির দাপটকে বুড়ো আঙুল দেখাবার উদ্দেশ্যে যে নান্দনিক অস্ত্রটি ব্যবহার করা হয় সেই সাবলাইমের ইতিহাস কিন্তু প্রায় দু হাজার বছরের। ইতালীয় সমালোচনা-সাহিত্যের নামজাদা অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ লনজিনাস খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে এই ধারণার অবতারণা করেন। যদিও তাঁর কাছে সাবলাইম ছিল এক নিছক ভাষিক কৌশল, এক আলঙ্কারিক প্রকরণ যার প্রয়োগে পাঠকের মন উন্নীত হয় এক উচ্চ স্তরে। অষ্টাদশ শতকে প্রথম থেকেই সাবলাইমের এই অলঙ্কারকেন্দ্রিক অর্থনির্ভরতা স্থানচ্যুত হয়ে বস্তুবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতি হয়ে ওঠে এই সাবলাইমের আধার। এই যে এত বড়ো অবস্থানগত ও অর্থগত প্রসারণ সেটা ঘটে যায় রোমান্টিকতার মধ্যস্থতায়। সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে রোমান্টিসিজম ইউরোপের ইতিহাসে দেখা দেয় এক বিকল্প সাংস্কৃতিক চেহারায়। তার প্রতিবাদী স্বর প্রকৃতি ও মানবমনের অন্য এক বাস্তব সামনে তুলে আনে। যুক্তিবাদী বীক্ষণে প্রকৃতি যেখানে যন্ত্রমাত্র, সেখানে রোমান্টিসিজম প্রকৃতির এক বিপরীতধর্মী ছবি তুলে ধরে। প্রকৃতি এখানে জীবন্ত, রহস্যময়, অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট। শুধু কিছু নিয়মের শাসনে বাঁধা পড়ে যাওয়া প্রকৃতি এ নয়, যার কোনো সহজ পাঠ ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। সাবলাইম এই জীবন্ত প্রকৃতির কোনো সংহত, সুসমঞ্জস রূপ নয়। এ হল প্রকৃতির এক বেআক্কেলে, খাপছাড়া, অনির্দিষ্ট, সীমাহীন বিস্তার যার সামনে কল্পনা, বোধ, যুক্তি গুটিসুটি মেরে স্তব্ধ হয়ে যায়। এ যেন যৌক্তিক শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে প্রকৃতির বিশৃঙ্খলার রণহুঙ্কার।

প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে এই যে এক বিকল্প দর্শনের সূত্রপাত যেখানে সাবলাইমের ধারণা আরও পারিপাট্যের সঙ্গে সূত্রবদ্ধ হয়, তার পেছনে দুটি নিবন্ধের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রথমটি এডমন্ড বার্কের philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful (১৭৫৭) আর দ্বিতীয়টি হল ইমানুয়েল কান্টের Critique of Judgement (১৭৯০)। ইউরোপের অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ঘরানায় অনুগত বার্ক সাহেব সাবলাইমকে প্রতিস্থাপন করেন প্রকৃতির সীমাহীন, অনির্দিষ্ট নৈরাজ্যের মধ্যে। নন্দনতত্ত্বের এই নতুন দার্শনিক অবস্থান সুস্পষ্ট করার জন্যে তিনি সুন্দর (beautiful) ও সাবলাইমের ধারণাকে তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে টেনে নিয়ে আসেন।

সুন্দর হল এমন কিছু যার একটা নির্দিষ্ট অবয়ব আছে আর যার সৃষ্টির পেছনে টের পাওয়া যায় এক ধরনের উদ্দেশ্য। উল্টোদিকে, সাবলাইম হল প্রকৃতির সেই দিকটি যা 'Purposeless' যার সাক্ষাতে দ্রষ্টার মনে একই সময়ে সঞ্চারিত হয় উদ্বেগ আর সুখানুভূতি। এই উদ্বেগের দুটি কারণ চিহ্নিত করা যায়। একটি হল প্রকৃতির প্রকাণ্ড অবয়বহীনতার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ক্ষুদ্রত্ব ও অসহায়ত্ব বোধজনিত উৎকণ্ঠা। অন্যটি হল প্রকৃতির এই অনির্দিষ্ট বিশালতাকে ধারণা ও চিত্রণ করার ব্যাপারে কল্পনার ব্যর্থতা। এই আলোচনায় মূলত প্রাধান্য পায় এক জটিল মনস্তত্ত্ব ও ক্ষমতার এক নতুন বিন্যাস। তবে, মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের এই যে নতুন মূল্যায়ন সেখানে ঈশ্বর অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক।

৩

এখানে যা দেখার বিষয় তা হল সাবলাইমের এই পশ্চিমি ধারণাকে হিমালয়-নির্ভর সাহিত্য কীভাবে বদলে নিয়েছে। জলধর সেনের বর্ণনা এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য— 'আজ আমার সম্মুখে সহসা যে দৃশ্য উন্মুক্ত হয়েছে, এ অলৌকিক। মানুষের ক্ষমতা ও ক্ষমতার গর্ব এই বিরাট বিশাল নগ্ন সৌন্দর্যের পাদদেশে এসে স্তম্ভিত হয়ে যায়; প্রতি মুহূর্তে নতুন বলে সুরঞ্জিত অভ্রভেদী শৃঙ্গের দিকে তাকালে আমাদের, ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারি, সৃষ্টি দেখে আমরা স্রষ্টার মহান ভাব কতক পরিমাণে হৃদয়ে ধারণা করবার অবসর পাই।' সাবলাইমের পশ্চিমি ধারণায় মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অসম ক্ষমতা বণ্টনের যে স্পষ্ট নির্দেশ আছে তা উপরোক্ত বর্ণনায় মোটামুটি একইভাবে এসেছে। তবুও জলধর সেনের বর্ণনায় বেশ বড়ো ধরনের অবস্থান্তর লক্ষণীয়, আর তা 'অলৌকিক' শব্দের প্রয়োগে পরিষ্কার হয়ে গেছে। 'অলৌকিক' শব্দটি এখানে সাবলাইম সম্পর্কিত দুটি ভিন্ন দর্শনের মধ্যকার বিভাজিকা। অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় যুক্তিনির্ভর সংস্কৃতির বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে সাবলাইমের আবির্ভাব, যার মধ্যে একধরনের 'excess' অসংবদ্ধ হয়ে আছে। ঈশ্বরকে বাইরে রেখে প্রকৃতির দুটি সমান্তরাল ব্যাখ্যা নিজেদের মধ্যে আপস করে চলে। নিয়মাবদ্ধ প্রকৃতির পাশেই জায়গা করে নেয় আর এক চঞ্চল, অস্থির, ভায়োলেন্ট প্রকৃতি। টার্নার তার তেল-জলে ধরতে চেয়েছেন প্রকৃতির মধ্যকার এই উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন সন্ত্রাসকে যার সামনে মানুষ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। প্রকৃতির এই শাসানির মধ্যে আমরা নিজেদের বামনত্ব টের পাই। তাই উত্তরণ নয়, কাঙ্ক্ষিত অবস্থান হল দূরত্ব।

হিমালয়ের যে 'বিরাট বিশাল মগ্ন সৌন্দর্যের' কথা জলধর সেন বলছেন তার সামনে দাঁড়ালেও ক্ষুদ্রতার বোধ অনস্বীকার্য। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। উত্তরণের একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া এখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে তা হল সৃষ্টি থেকে স্রষ্টা, জড় প্রকৃতি থেকে তার রূপকার। এই উত্তরণের আবশ্যিক শর্ত হল ক্ষুদ্রতা আর দুর্বলতার বোধ যা শুধুমাত্র অসম ক্ষমতা বিন্যাসের পরিচায়ক নয়। স্রষ্টার নাগাল পেতে গেলে

যে অহংবোধ অবলুপ্তির প্রয়োজন হয় এটা তারই প্রস্তুতি। এডমন্ড বার্ক যে ভয় ও শ্রদ্ধার যুগপৎ উপস্থিতির কথা বলেছেন, এক্ষেত্রে সামান্য রদবদল ঘটিয়ে অধ্যাত্মবাদকে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। শ্রদ্ধার মতো সেকুলার আবেগ স্থানচ্যুত হয়ে জায়গা করে দিয়েছে ভক্তির। একটা উদ্ধৃতি বোধ হয় এখানে যথেষ্ট হবে—'আমাদের আগে পাছে চারিদিকে ধূসর পর্বতশ্রেণী বিরাট পাষাণ প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়েছিল। সেই গগনস্পর্শী স্তূপাকার অন্ধকাররাশির দিকে তাকিয়ে ভয় ও ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়।' হিমালয়ের এই যে বর্ণনা তার সঙ্গে কান্ট বর্ণিত 'mathematically sublime'-এর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। কান্ট সাবলাইমকে 'natural sublime' ও 'mathematically' এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করে নিয়েছেন। প্রথমটির মধ্যে প্রকৃতির ক্ষমতার প্রকাশ যার সান্নিধ্যে মানুষ ভীত ও অসহায় বোধ করে। কিন্তু 'mathematically sublime' বলতে প্রকৃতির 'infinite magnitude' কে বোঝায় যার সামনে কল্পনা স্তব্ধ হয়ে যায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর একাধিক কবিতায় এই মানসিক অবস্থা ধরবার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতির এই সীমাহীন (absolutely great) বিস্তারের হাত ধরে কোনো এক ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতায় টের পাওয়া যায় স্রষ্টার উপস্থিতি। অধ্যাত্মবাদের এই যে সূত্রপাত তা যে একইভাবে আসে তা নয় ওয়ার্ডসওয়ার্থে তা এসেছে সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকর্মের সাময়িক অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথে এই বোধ পরিব্যাপ্ত হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত বিন্দুকে আশ্রয় করে। চেতনার ছড়িয়ে যাওয়ার এই রাবীন্দ্রিক মন্ত্র হিমালয়াশ্রয়ী সাহিত্যে সাবলাইমের ধারণাকে আরও প্রাণিত ও বেগবান করে তুলেছে। সাবলাইমের অনুভূতি তাই এখানে শুধুমাত্র মুহূর্তের খোলসে আটকে পড়ার অভিজ্ঞতা নয়। একই সময়ে তা এই খোলস ভেঙে বেরিয়ে পড়ার গল্প। সর্বত্রই এই টানাপোড়েন হিমালয়মুখী ভ্রমণ সাহিত্যকে নিছক একদল গেরুয়াধারী ক্লান্ত সংসারবিমুখ পরিব্রাজকের নিষ্ক্রমণ কাহিনি করে তোলেনি।

হিমালয় ভ্রমণের গল্প কোনো একটা বিশেষ মুহূর্তে আটকে পড়ার গল্প নয়। এ হল পথ চলার গল্প। কোনো বিশেষ প্রস্তুতির আয়োজন যেখানে সাবলাইমের অনুভূতি পথক্লান্ত পরিব্রাজকের পথিমধ্যে আর পাঁচটা পাওয়ার (হয়তো বা সবচেয়ে বড়ো) মধ্যে অন্যতম পাওয়া। হিমালয় ভ্রমণ এখানে হিমালয়ের গা বেয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো নয়, একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে লক্ষ্যে পৌঁছোনোর ধারাবাহিক বর্ণনা এ সাহিত্যের মূল কাঠামো আর এই সরলরৈখিক উর্দ্ধগামী যাত্রার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে তীর্থভ্রমণের সারাৎসার। তীর্থের প্রয়োজন যাত্রার অভিমুখ হিমালয়গামী হলেও লেখকের অবস্থান বিশেষে এই প্রয়োজন কিন্তু দস্তুরমতো পালটে গেছে। একমাত্র জলধর সেনের হিমালয় যাত্রার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তার আপনজন হারানোর শোক। এখানে শোকাহত মনকে নিয়ন্ত্রণে আনার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিষেধক হিসেবে হিমালয়ভ্রমণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই প্রতিষেধক যে কার্যকরী হয়েছে তা বলা যাবে না। কারণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাসে দোলায়িত জলধর সেনের মন কোনো আশ্রয়কেই চূড়ান্ত বলে মেনে নেননি।

অতঃপর নির্ধারিত লক্ষ্যে পদার্পণ সত্ত্বেও অন্বেষণ জারি থেকেছে। যে নিশ্চয়তার খোঁজে তাঁর অস্থির মন পশ্চিম হিমালয়ের ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা তীর্থস্থানগুলিতে পাড়ি দিয়েছে সেখানে প্রাপ্তির চেয়ে যন্ত্রণার পরিমাণ অনেক বেশি। এ শুধু স্বজন হারাবার যন্ত্রণা নয়, এ হল অস্তিত্বের কেন্দ্রহীনতার মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতা। ক্রমাগত নিজের কাছে উচ্চারিত ব্যর্থতার এই স্বীকৃতি তাঁর ভ্রমণের দিনলিপিকে করে তুলেছে সংশয়পীড়িত আত্মার আর্তনাদে—'যাঁরা নিষ্ঠাবান ধার্মিক, ভগবানের চিরপ্রসন্নতাই যাঁদের লক্ষ্য, এবং ভক্তিকেই যাঁরা জীবনপথের অমূল্য পাথেয় বলে ধ্রুব জেনেছেন, তাঁদের শান্তিলাভ অসম্ভব কথা নয়। কিন্তু আমার লক্ষ্য, আমার উদ্দেশ্য যে কিছুই নেই।' জীবনের কেন্দ্র যে অর্থহীনতার বোধ তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায় তার মূল কিন্তু নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের অক্ষমতায়, কোনো প্রশ্নাতীত আনুগত্যে নিজের ক্ষুদ্র আমিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ব্যর্থতায়। কত সঠিকভাবে ধরতে পারেন তাঁর সংকটের চরিত্রকে— 'দেবতায় ভক্তি নেই; চির প্রেমময়ের মঙ্গলময়ত্বেও বিশ্বাস নেই, তবু আশা, যদি প্রাণ শীতল হয়। জানি ধর্মরাজ্যে, প্রেমের রাজ্যে, স্বর্গরাজ্যে 'যদি'র প্রবেশ নেই। প্রচলিত অর্থে তীর্থ বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে এই 'যদি'র উপস্থিতি অন্য সমস্যা তৈরি করে। কতকটা কৌতুক মিশিয়ে বলেন—'হৃদয়ের সুখ দুঃখ লোটা-কম্বলে নিয়ন্ত্রিত হবার নয়, যা ফেলে এসেছি, তাদের আসক্তি ও আকর্ষণ এখনও চির নবীন। এখানে যে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আসক্তি-অনাসক্তি, প্রেম-অপ্রেম মঙ্গল-অমঙ্গল এর দ্বন্দ্ব লেখককে তাড়া করে বেড়াচ্ছে তার নিরসন সম্ভব নয়, তীর্থের যে সাংস্কৃতিক অর্থে আমরা পুষ্ট যার মধ্যে সংকটমোচন ও পুণ্যার্জনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকে তা কিন্তু এখানে নেই। তীর্থের যে প্রচলিত 'Quest motif' তা এখানে ব্যবহার করা হলেও গ্লানি বা পাপবোধ থেকে মুক্ত হওয়ার অনুপুঙ্খ রোজনামচা এ নয়। যে অন্বেষণের কথা এখানে বলা হয়েছে তা নৈতিক বা ধর্মীয় নয়। তা যথার্থই বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক। জীবনের অর্থ ও স্থিরতার সন্ধানই এই হিমালয় ভ্রমণের মূল চালিকাশক্তি।

প্রবোধ সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' এই অন্বেষণেরই গল্প। মহাপ্রস্থানের পথ ধরে বেরিয়ে যাওয়া (great exit) নয়, আরও স্বচ্ছতা নিয়ে ফিরে আসা নিজের পরিচিত বৃত্তে। ঠিক কী কারণে এই গ্রন্থের কেন্দ্রিয় চরিত্র হিমালয় ভ্রমণে উদ্যোগী হয় তা না জানা গেলেও যা প্রতিনিয়ত টের পাওয়া যায় তা হল এক অস্থির, অশান্ত মন কোনো এক স্থির পরিসরের সন্ধানে গৃহহারা। কিন্তু সেই পরিসর কোনো নির্দিষ্ট মন্দির, প্রয়াগ বা সঙ্গমে পাওয়া যাবে না। তা ছড়িয়ে আছে হিমালয়ের অগণিত কেন্দ্রে। এখানে প্রতি মুহূর্তেই আছে আবিষ্কারের সম্ভাবনা, কারণ তীর্থদর্শনের পাশাপাশি চলতে থাকে আত্মার অন্তর্মুখী পর্যটন। আত্মার এই স্বশাসিত অন্বেষণ নিজস্ব এক চিহ্ন-ব্যবস্থা তৈরি করে নেয় যা অনেকটাই প্রকৃতিনির্ভর। 'হিমালয়ের মহাতীর্থে' প্রমোদকুমার মুখোপাধ্যায় তীর্থ শব্দটির অর্থ নিরূপণে প্রকৃতিনির্ভর এই স্বতন্ত্র চিহ্ন-ব্যবস্থাকেই উল্লেখ করেছেন—'তারপর আর

মন্দিরের দেবতা দেখবার জন্য মন্দিরের মধ্যে যাবার প্রয়োজন রইল না। এ কথা সত্য, তীর্থের পবিত্র রূপ, মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালেই যথার্থই দেখা যায়।' শুধু তাই নয়, তিনি হিমালয়স্থ তীর্থকেন্দ্রগুলির (ভৌগোলিক) অবস্থানগত সুযোগ সুবিধার কথাও স্মরণ করেছেন—'এই যে মহা মহা উচ্চভূমিতে তীর্থস্থানগুলি এগুলি যেন দৈব সমাজের মত মানুষের মধ্যে কাজ করে। যে যতটুকু ক্ষুদ্র স্থানে থাকে তার মনও ক্ষুদ্র পরিধিতে ক্রিয়া করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। প্রাণ তাদের সঙ্কুচিত অবস্থায় ক্রিয়া করে, প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায় না।' অন্যত্র একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন—'উচ্চ স্থানে উঠলে, ক্ষণেকের জন্য হলেও মানুষের মন উচ্চ হয় বৈকি, আনন্দই যে তার শেষ ফল।' তবে ধর্ম-পুরাণ-নিরপেক্ষ প্রকৃতির এই প্রভাব যার মধ্যস্থতায় ঘটে তা হল এক ধরনের বিশেষ সংস্কৃতি। এখানে প্রকৃতি একটা টেক্সট যার পাঠ আমাদের ঔপনিবেশিক পাঠক্রমের অংশ ছিল। যে ভ্রমণসাহিত্যের কথা এখানে বলা হচ্ছে তা কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মানসের নির্মাণ। এই মূল্যবান সত্যটি প্রমোদবাবুর লেখায় আলোচিত হয়েছে—'আর এক শ্রেণীর যাত্রী তারা বেশীরভাগ বাঙালী আমার নজরে পড়েছে। তারা হিমালয় তীর্থাঞ্চলটি বেশ উপভোগ করার ভাব নিয়েই ঘোরাফেরা করছেন। তাঁরা শিক্ষিত কাজেই জীবন ব্যাপারে অনেকটা প্রস্তুত, তারপর পূর্বাপর অল্পাধিক কয়েকজন ইউরোপীয় পর্য্যটকের হিমালয় ভ্রমণ বৃত্তান্তের সঙ্গে পরিচিত তাই অনুসন্ধিৎসু হয়ে আসেন, বিদেশীয়গণের সুখ্যাতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে, নিজের চক্ষে দেখে অভিজ্ঞতা, সঞ্চয় ও দৃশ্যাদি উপভোগের প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে প্রবলই থাকে।'

উপনিবেশের শিক্ষিত বাঙালি মানসে দেশজ ও পশ্চিমি সংস্কৃতির যে সংঘাত ও সমন্বয় ঘটছিল তার ছাপ হিমালয়চিত্রণে উপস্থিত। এই জটিল প্রক্রিয়ার অন্যতম লক্ষণ হল প্রকৃতির দৃশ্যগত রূপের স্বাতন্ত্র্য। কোনোরকম ধর্ম বা পুরাণের চাপ অগ্রাহ্য করে দৃশ্যকে তার দৃশ্যের মর্যাদা দেওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন প্রমোদ মুখোপাধ্যায়—'যিনি যেভাব নিয়ে-ই আসুক না কেন তীর্থ ধর্ম ছাড়া মানুষের অনুভূতির একটা সহজ ভাব আছে, মন প্রাণভরা দৃশ্যরূপ, যা নিরালম্ব, অপর কোনো ভাব বা সংস্কার তার সঙ্গে জড়িত নেই, এমন-ই ভাবে যিনি দেখবার অধিকারী, তিনি-ই দেখবেন হিমালয়ের শিবালিক থেকে গ্রেট হিমালয় রেঞ্জ পর্যন্ত অর্থাৎ তুষার রাজ্য অবধি সর্বস্তরেই রূপ ও রস পরিপূর্ণ।' হিমালয়ের এই স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের উদযাপন এক বিশুদ্ধ দৃষ্টিগ্রাহ্য নন্দনতত্ত্বের (visual aesthetics) দ্বারোদঘাটন করে। এখানেও পথিকৃৎ হলেন জলধর সেন। তাঁরা বর্ণনায় দেবভূমির মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয় প্রকৃতির দৃষ্টিগোচর রূপের স্বাতন্ত্র্যে—'বরাবর এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখে আসা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত যাত্রী তীর্থভ্রমণ করতে আসে, তারা শুধু দেবমন্দির ও দেবতা ছাড়া আর কিছুতেই মনোনিবেশ করে না। হয়তো তারা সেটা বাহুল্য জ্ঞান করে; না হয়, একমনে, একপ্রাণে অভীষ্ট দেবতার চিন্তাতেই তারা তন্ময় হয়ে থাকে, এবং তাতেই তারা এমন নিবিষ্টচিত্তে পথ চলে যে,

চতুর্দিকে আর যা কিছু দেখবার আছে, তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের অবসর পায় না। এ পর্যন্ত কত তীর্থযাত্রীর সাথে দেখা হল : তারা বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য, চতুর্দিকের অভিনব দৃশ্যরাজির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কোন কথাই বলে না।'

হিমালয়ে এই দৃষ্টিসর্বস্ব রূপের যে দ্বিমাত্রিক প্রকাশ চিত্রবৎ (picturesque) ও ভাবগম্ভীর (sublime)—তার সঙ্গে নিরন্তর বিরোধ চলেছে হিমালয়ের আখ্যান-অধ্যুষিত রূপের। আসলে সাধারণ ভারতীয়ের কাছে হিমালয়ের এই দ্বিতীয় দিকটির আবেদনই বেশি। হিমালয়ভ্রমণ মানেই আমাদের পুরাণ, মহাকাব্য আর তার কত শত আঞ্চলিক তর্জমার সান্নিধ্যে আসা। প্রতিটি রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গল্প। শুধু কি তাই পাথরে-পর্বতে-গুহায় উৎকীর্ণ হয়ে আছে তাদেরই চিত্রিত রূপ। গল্পের এই বাহুল্যে প্রকৃতির দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। গল্পের এই ভিড় কাটিয়ে প্রকৃতির দিকে ফিরে তাকানো দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। হিমালয়-নির্ভর এই যে সাহিত্য তা কিন্তু কোনোভাবেই আখ্যান-বর্জিত নয়। তবে এ সাহিত্যের মূল উপজীব্য কিন্তু হিমালয়ের আখ্যানভাগ আর দৃষ্টিগত রূপের টানাপোড়েনে। এ কারণেই বোধহয় পূর্ব হিমালয়কে এ সাহিত্যের আওতায় আনা হয়নি। পূর্ব হিমালয় সেভাবে কোনোদিনই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতের অংশ হয়ে ওঠেনি। তাই হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব অনুপস্থিত থাকায় এ-অঞ্চল কখনোই তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠেনি। সে কারণে পরতে পরতে পৌরাণিক কাহিনীর যে ঠাস বুনন পশ্চিম হিমালয়ে পাওয়া যায় তা এখানে আশা করা যায় না। এখানে কাহিনীর উপস্থিতি অবশ্যই আছে কিন্তু তার উৎসভূমি এখানকার আঞ্চলিক সংস্কৃতি যা জানার প্রয়োজন মধবিত্ত হিন্দু ভদ্রলোকেরা সেভাবে বোধ করেননি। এর ফলে অবশ্য প্রকৃতির দৃশ্যরূপ কোনো কিছুর মধ্যস্থতা ছাড়াই সামনে দেখা দেয়। পূর্ব হিমালয়ের এই প্রাকৃত রূপ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষকেই আকৃষ্ট করে। তারা কেউই তীর্থযাত্রী নয়। তারা মূলত পর্যটক ও অভিযাত্রী। কিন্তু পশ্চিম হিমালয়ে (বিশেষ করে গাড়োয়াল ও কুমায়ুন অঞ্চলে) অহিন্দু পর্যটক প্রতি পদে হোঁচট খাবেন। হিন্দু সংস্কৃতির দাপট এখানে এত প্রবল যে বিধর্মীদের শুধুমাত্র শ্বাসরোধ হয়ে আসবে তাই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে আসবে বিযুক্তিবোধ।

পশ্চিম হিমালয়ের এই কাহিনি-ধ্বস্ত রূপের চিত্রণে বাঙালি ভদ্রলোক লেখকেরা একটা বড়ো রকমের রদবদল ঘটিয়ে দিয়েছেন। কাহিনি এখানে এসেছে, বার বারই এসেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্র কখনোই সেখানে থেমে থাকেনি। গল্প হয়তো তাঁদের সাময়িকভাবে ব্যস্ত রেখেছে, আমোদিত করেছে। অথবা, ধর্মের মধ্য দিয়ে একটা জনপ্রিয় সংস্কৃতি নির্মাণের প্রক্রিয়ায় তাঁদের অংশগ্রহণও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রয়াস নিরন্তর জারি থেকেছে কীভাবে গল্পের বয়নশিল্প অতিক্রম করে হিমালয়ের দৃশ্যরূপে পৌঁছানো যায়। এই গল্প ও গল্পহীনতার যে দ্বন্দ্ব তার নিরসন কোনোভাবেই এ সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, যে বিষয়টি এখানে সমস্যায়িত হয়েছে তা হল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত

বাঙালির মানস। এর একদিকে রয়েছে ধর্মকে আশ্রয় করে যে জনপ্রিয় সংস্কৃতি তার প্রতি টান। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাজনিত এক নতুন সৌন্দর্য-চর্চার প্রতি আনুগত্য। এই সৃজনধর্মী টানাপোড়েন হিমালয়ের যে প্রচলিত দেবভূমির ধারণা তাকেও অন্যভাবে দেখার দাবি তোলে।

দেবভূমির ধারণা যে শুধুমাত্র লেখকের বিপরীতধর্মী অবস্থানের জন্যই খর্বিত হয় তা নয়, লেখক তাঁর ভ্রমণ আখ্যানে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের একটা বড়ো রকম জায়গা নির্দিষ্ট রেখেছেন। ভ্রামণিকের দিনলিপির একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে সেখানকার মানুষ, তাদের ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি। এই বিশ্লেষণের প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ করা হয় লিপিবদ্ধ ও বাচনিক ইতিহাস থেকে আর তাকে প্রেক্ষিত হিসেবে ব্যবহার করে সমকালীন সমাজকে নিয়ে আসা হয় এক তীব্র পর্যবেক্ষণের মধ্যে। এর ফলে দেবভূমির বাস্তবের সঙ্গে সমতলের বাস্তবের দূরত্ব অনেকখানি কমে আসে। যদিও হিমালয়কে অন্যভাবে প্রতিপন্ন করার একটা চেষ্টা সব সময়ই চলতে থাকে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান কল্পেই হিমালয় ভ্রমণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে পুণ্যার্জনের জন্য এই দেবভূমির প্রয়োজন হয় তার সমাজবাস্তব নানা আবিলতায় পরিপূর্ণ। জলধর সেনের সজাগ দৃষ্টি উচ্চভূমির এই সমাজকে ঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন—'পুণ্যভূমি উত্তরাখণ্ডে পাহাড়ের মধ্যে এসে মনে করেছিলুম, ঝগড়া-বিবাদ-বাদ-বিসংবাদ, ভ্রাতৃবিরোধ ও আত্মীয় বিচ্ছেদ বুঝি বহু পশ্চাতের সমভূমে ফেলে এসেছি; কিন্তু ক্রমে দেখলুম এখানেও বিবাদ মামলা মোকদ্দমা আমাদের দেশেরই মতন। এখানেও ভাই ভাইকে প্রবঞ্চিত করতে ছাড়ে না, জ্ঞাতি জ্ঞাতির বুকে ছুরি মারবার জন্যে প্রস্তুত।' এখানে কোথাও এই সমাজকে আদর্শায়িত করার চেষ্টা হয়নি। তবে আক্রমণের লক্ষ্য সব সময়ই মন্দির-কেন্দ্রিক রাজনীতি ও তার বিপুল ঐশ্বর্য, স্তর নির্বিশেষে পুরোহিতশ্রেণির লোভ ও বিলাসবহুল, ভোগসর্বস্ব জীবনযাত্রা। এমনকি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে একশো বছরের পুরনো দলিল বার করে জলধর সেন সামনে নিয়ে এসেছেন মোহন্তদের বেশ্যাচার ও যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা। যাবতীয় তথ্য পরিবেশন ও তার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এ জাতীয় ভ্রমণসাহিত্য ক্রমাগত তার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে গেছে।

পঞ্চপ্রয়াগ, পঞ্চবদ্রী ছাড়াও হিমালয়ের বুকে এক হাজার বছরের কিছু বেশি সময় ধরে (আনুমানিক নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্যের হিমালয় অভিযান থেকে) অসংখ্য মন্দির আর তীর্থস্থান গজিয়ে উঠেছে। এ কিন্তু শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসার নয়, এ হল পশ্চিম হিমালয় জুড়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিজয়াভিযান। কিন্তু এর ফলে যে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও তীর্থস্থান পত্তনের হুড়োহুড়ি লেগে যায় তার হাত ধরে চলে আসে সমতলের সভ্যতা আর সেই সভ্যতার শীর্ষরূপ হল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। যত এই ধর্মাশ্রয়ী সভ্যতা প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ততই হিমালয়ের সমাজ ও তার নিজস্ব সংস্কৃতি হারিয়ে

গেছে। সরল, সহজ জীবনাশ্রয়ী মূল্যবোধ অন্তর্হিত হয়ে কোনো নতুন উন্নততর মূল্যবোধের অবতারণা হয়েছে, তাও নয়। পশ্চিম হিমালয়ের এই অঞ্চল রূপান্তরিত হয়েছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে যাকে মূল স্রোতের ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি তার লেখায়, তার কল্পনায়, তার যাপনে এখনও উদ্‌যাপন করে চলেছে। বাঙালির হিমালয়-কেন্দ্রিক ভ্রমণ সাহিত্যে এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সরব হওয়ার ইঙ্গিত সর্বত্র। আর এই সরব হওয়া মূলত বর্ণিত হয়েছে সভ্যতা ও প্রকৃতির যুগ্ম বিরোধিতার (binary opposition) অবস্থানকে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে। প্রকৃতি বনাম সভ্যতার যে বাচন পশ্চিমি সাহিত্য ও রাজনীতির দর্শনকে রেনেশাঁসের সময় থেকে অধিকার করে রেখেছিল, ঠিক সেই আদলেই এক বিতর্ক ফিরে এসেছে এখানে। বিতর্ক অনেকটা এই রকম— সভ্যতার পুরো ব্যাপারটাই হল পোশাকি, প্রকৃতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপার। অন্যভাবে দেখলে, এটা এক ধরনের আগ্রাসন। মধ্যবিত্ত রোমান্টিক বাঙালি উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় নগরোন্নয়নের প্রক্রিয়া লক্ষ করেছিল। তার সঙ্গে সে এটাও লক্ষ করেছিল শান্ত পল্লী সমাজের ক্রম বিলীয়মান প্রান্তরেখা। যে স্মৃতিমেদুরতায় সে আক্রান্ত হয়েছিল তা-ই দেখা যায় হিমালয়ের বুকে অপসৃয়মান তার নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতির বর্ণনায়। এত সব কিছুর পরেও হিমালয়কে দেবভূমির আখ্যা দেওয়ার অর্থ তার ধর্ম-বর্জিত প্রাকৃতিক রূপকেই প্রাধান্য দেওয়া। মানুষের চিহ্নহীন এই প্রাকৃতিক পরিসরকেই জলধর সেন স্বর্গরাজ্য বলে অভিহিত করেছেন—'বেলা এগারোটার সময় আমরা নন্দপ্রয়াগে পৌঁছুলুম। এখানে গঙ্গার সঙ্গে অলকানন্দার সঙ্গম রয়েছে। কারো কারো মতে অলকানন্দার সঙ্গে গঙ্গা সঙ্গম হয়েই এখান হতে অলকানন্দা নাম হয়েছে। এ সব নদী যে সশরীরে এই পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, আমাদের সে জ্ঞান ছিল না। ছেলেবেলায় ভূগোল পড়বার সময়ে এ সকল নামের সঙ্গে পরিচয় না হওয়ায় এগুলিকে স্বর্গরাজ্যে সামিল ধরে রেখেছিলুম, এখন দেখছি সেগুলি স্বর্গের নয়, এই মর্ত্যেরই জলধারা। বাস্তবিক আমাদের দেশ যদি পৃথিবী হয়, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অনুর্বর ক্ষেত্র যদি পৃথিবী হয়, মাড়োয়ারের দগ্ধ মৃত্তিকা যদি পৃথিবী হয়, তা হলে যাঁরা এ স্থানকে স্বর্গ বলে উল্লেখ করে গেছেন তাঁরা অন্যায় করেন নি।...এসব দেশে যা আছে, স্বর্গে তার চেয়ে আর বেশি কি থাকবে।' স্বর্গের এই যে প্রাকৃত ও সেকুলার রূপ তা তীর্থদর্শনের যে ধর্মীয় ব্যাখ্যা তাকে খর্ব করে ভ্রমণ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক নতুন দর্শন মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের সামনে তুলে ধরেছে। হিমালয়ের এই প্রাকৃত রূপ স্বীকার করার অর্থ বস্তুবিশ্বের ইন্দ্রিয়াতীত রহস্য অস্বীকার করা নয়। বরঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের হাত ধরে দৃশ্যাতীত রহস্যের খোঁজ করা। সীমাকে আশ্রয় করে সীমাতিক্রান্ত (transcendental) বাস্তবের এই যে সন্ধান বাঙালির হিমালয় দর্শনে বারবার ফিরে এসেছে তার মূল প্রেরণা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দর্শন। রবীন্দ্রসাহিত্য ও দর্শনে বুঁদ হয়ে থাকা ভ্রমণসাহিত্যের এই লেখক সম্প্রদায় এই ভিন্নধর্মী বাস্তবতার মধ্যে

ভারসাম্য বজায় রেখে যে অধ্যাত্মবোধের ইঙ্গিত দিয়েছেন তা কিন্তু আমজনতার ধর্মাচরণের ধারে কাছেও নেই।

হিমালয়ের পুরাণ ও মহাকাব্যে মোড়া দেবীকীর্ণ পরিসরের বাইরেও একটা অন্য চেহারা আছে যার সীমাহীন বিস্তার ও ধ্যানমগ্ন রূপের সামনে দাঁড়ালে একই সঙ্গে ভয় ও শ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে। কিন্তু এ ভয় সন্ত্রাস নয়। যে কারণে পশ্চিমের নন্দনতত্ত্বে ভয় ও সুখানুভূতির যে সহাবস্থান সাবলাইমের অনুভূতিতে চিহ্নিত হয়েছে, তা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জড় প্রকৃতির যে সন্ত্রাস, তাকে অতিক্রম করার একটা নান্দনিক উপায়মাত্র। বিশৃঙ্খল প্রকৃতির সাক্ষাতে যে অসহায়তার বোধ তৈরি হয় তার থেকে মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব তৈরি করার মধ্যে দিয়েই সুখানুভূতির উদয়। অর্থাৎ, আমি কোনোভাবেই বিপদ সীমানার মধ্যে নেই—এই বোধের সঙ্গে সঙ্গেই সাবলাইমের অনুভূতি দেখা দেয়। কিন্তু হিমালয়কে কেন্দ্র করে যে সাবলাইমের অনুভূতির কথা বলা হয়েছে সেখানে ভয়ের সঙ্গে সুখানুভূতি নয়, আনন্দানুভূতির যোগ দেখানো হয়েছে। সেই ভয় থেকে আনন্দের দিকে যাত্রা কিন্তু হিমালয়ের ভাবগম্ভীর রূপকে মানসিকভাবে অতিক্রম করার মধ্যে দিয়ে নয়। তাকে আত্মস্থ করা, তার সীমাহীন প্রকাণ্ড রূপকে ধ্যানের মধ্যে টের পাওয়া, প্রকৃতির সঙ্গে এক নতুন সামঞ্জস্য তৈরি করা—হিমালয়দর্শনের নন্দনতত্ত্ব মানুষ আর প্রকৃতির আত্মীয়তার এই অন্য এক কাহিনি পাঠকের কাছে নিয়ে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় বাঙালি লেখকদের এই সাহিত্য-চর্চার ব্যক্তিমানস ও প্রকৃতিকে যে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তাই নয়, তাদের আত্মীয়তার ও যোগসূত্রের কথাও বলা হয়েছে। ইউরোপের নন্দনতত্ত্বে সাবলাইমের প্রসঙ্গ যখনই এসেছে তখনই ব্যক্তিমানস স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও তার সন্ত্রাসের কথা বলা হয়েছে। অথবা, ব্যক্তিমানসের কাছে জড় প্রকৃতির পরাভবের গল্প শোনানো হয়েছে। এডমণ্ড বার্কের সাবলাইম আলোচনা প্রসঙ্গে মানুষের ওপর জড় প্রকৃতির ক্ষমতা ইতিমধ্যে কিছুটা জানা গেছে। কিন্তু কান্টের সাবলাইম সম্পর্কিত মতামত অন্য এক গল্প হাজির করে। সেখানে ছবিটা উলটে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতার মধ্যে সাবলাইমকে পাওয়া যাবে না। এখানে সাবলাইম সম্পূর্ণ একটা মানসিক ঘটনা।* যদিও প্রকৃতির কোনো কোনো ঘটনা ও বস্তুর সান্নিধ্যে এলে যে সাবলাইমের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাবে কান্ট তার একটা দীর্ঘ তালিকা পেশ করেছেন। তবে যে মানসিক প্রক্রিয়ায় এই অবস্থান্তর ঘটে তা অনেকটা এই রকম : প্রকৃতির সীমাহীন, অবয়বহীন বিস্তারের সামনে মানুষের কল্পনা খেই হারিয়ে ফেলে, বিভ্রান্ত বোধ করে। ঠিক এখানেই দেখা দেয় এক ধরনের উৎকণ্ঠা। কিন্তু, অনতিবিলম্বেই সামনে এগিয়ে আসে যুক্তি (reason)। যুক্তি তার নিজস্ব ধারণা (বিশালতত্ত্বের ধারণা, সীমাহীনতার ধারণা) প্রয়োগ করে প্রকৃতির এই অসংহত রূপকে বাগে আনে। এভাবে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করার ফলে স্বাভাবিকভাবেই মনোলোকে সঞ্চারিত হয় এক ধরনের সুখানুভূতি। সাবলাইমের বোধ এখানে একইসঙ্গে প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে

যাওয়া ও তার ওপর চিন্তন—প্রক্রিয়ার নিয়ম কানুন চাপিয়ে তাকে নিজের মতো করে নির্মাণ করে নেওয়া।

সাবলাইম সম্পর্কে যে দুটি পশ্চিমি মডেল (এডমন্ড বার্ক ও ইমানুয়েল কান্ট) মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে প্রভাবিত করে এসেছে তার মূলে কিন্তু আছে দ্বন্দ্ব। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার বিভাজন যে শুধুমাত্র স্পষ্ট তাই নয়, তাদের মধ্যে রয়েছে রক্তাক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস। পশ্চিমি সভ্যতার যে মডেল তা কিন্তু প্রকৃতির ওপর মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা বিস্তারের গল্প। প্রকৃতিকে 'অপর' হিসেবে চিহ্নিত করলে তার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করার আবেগও যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। এই প্রাধান্য বিস্তারের দুটো পথ আছে। প্রথমটা হল তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে বিভাজন ও প্রযুক্তির সাহায্যে তাকে নিংড়ে নেওয়া। অপরটি হল প্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ চরিত্রকে অস্বীকার করে পুরোপুরি চিন্তন-প্রক্রিয়ারই একটি নিরালম্ব রূপ বলে চালিয়ে দেওয়া।

হিমালয়দর্শনের যে নন্দনতত্ত্ব বাঙালি সাহিত্যিকদের লেখায় উঠে এসেছে সেখানে পশ্চিমি দুনিয়ার এই দ্বন্দ্বের মডেলটি অনুপস্থিত। দ্রষ্টার সঙ্গে হিমালয় যে ভাবাবেগ তৈরি করে তা নিছক ভয় বা অসহায়তার বোধ নয়, তার সঙ্গে মিশে আছে বিস্ময়, শ্রদ্ধা, মুগ্ধতা ও আত্মসমর্পণের ইচ্ছা। বাঙালির এই আবেগপুষ্ট হিমালয়মগ্নতার একটা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যেতে পারে। যে ভাবাবেগের কথা এখানে বলা হচ্ছে তা আসলে উপনিবেশের বিজিত জাতির মনস্তত্ত্ব যা সে আপাত রাজনীতি-নিরপেক্ষ জমির ওপর প্রতিস্থাপন করে দাসত্বের গ্লানি থেকে মুক্তির পথ খুঁজছে। উপনিবেশের অসম ক্ষমতার বিন্যাস এখানে রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক স্তর থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে সময়বহির্ভূত কোনো এক স্থির অবস্থানে যেখানে বৃহত্তর কোনো কিছুর বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া অধ্যাত্মবাদী শিক্ষার পূর্বশর্ত। এই অরাজনৈতিক অবস্থানের একটা নিজস্ব রাজনীতি আছে কিন্তু সে রাজনীতিকে সহজেই চিহ্নিত করার চেষ্টা উপনিবেশের রাজনীতির অতিসরলীকরণ ছাড়া আর কিছু নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় উপমহাদেশে উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদের অন্যতম উপাদান হিসেবে অধ্যাত্মবাদ অতি প্রবলভাবেই দেখা দেয়। রাজনৈতিক স্তরে ভারতের এই অধ্যাত্মবাদী সংস্কৃতি জাতিসত্তা নির্মাণের ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়ায় হিমালয়ভ্রমণ কারণ হিমালয়কে চিহ্নিত করা হয় ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী সংস্কৃতির মূল ও আদি কেন্দ্ররূপে। তাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় সারির সব নেতারাই কোনো একটা সময়ে হিমালয় দর্শনে বেরিয়ে পড়েছেন, উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আরও নিবিড় যোগাযোগ আর তার সঙ্গে নিজের আত্মশুদ্ধি যেটা না ঘটলে পরাধীনতার হাত থেকে ভারতমাতাকে উদ্ধার করার মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ কখনোই সম্ভব নয়। সুতরাং হিমালয় ভ্রমণ একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ। প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের লেখায়

এই ঘটনার উল্লেখ আছে যে গত শতাব্দীর প্রথমদিকে গাড়োয়াল অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রশাসন বাঙালি তীর্থযাত্রীদের ওপর বিশেষ নজর রেখেছিল। কারণ তাদের একটা বড়ো অংশ চরমপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। আসলে সে সময়ের বাঙালির কাছে হিমালয় দর্শন দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডের অন্যতম গোপন অ্যাজেণ্ডা ছিল। তাই পরাধীন ভারতবর্ষে বাঙালির হিমালয়টানকে এক ধরনের political transcendence হিসেবে দেখলে রাজনীতির জটিল প্রক্রিয়াকে খর্ব করা হবে।

হিমালয় ভ্রমণের খণ্ডিত রাজনীতি হিমালয়াশ্রিত সাহিত্যে যেভাবে এসেছে তা হল হিমালয়ের দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকে উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে শঙ্করাচার্যের খাসতালুকে অদ্বৈত বেদান্তের মায়াবাদী ঝোঁককে খর্ব করা। জলধর সেন সম্মুখ সমরে নেমে এই দর্শনের অসারতা প্রমাণ করতে তৎপর হন। ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে হিমালয় যাত্রায় যে বৈদান্তিককে তিনি পেয়েছিলেন, সেই হয়ে দাঁড়ায় জলধর সেনের সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু—'হায় মায়াবাদী বৈদান্তিক। তোমার এই মায়াবাদ কি স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র। তুমি দুঃখ-দারিদ্র্য পদদলিত করে তীর্থস্থানে যেতে চাও, দরিদ্র প্রজার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে কাশীতে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করতে চাও; ভগবানের অজস্র করুণা ও চিরন্তনের মঙ্গলেচ্ছাকে ত্যাগ করে, বৈরাগ্যের হৃদয়হীনতাকেই সার পদার্থ বলে মনে কর। সকলে তোমার মত হলে পৃথিবী একদিন শ্মশান হতো।' যে ' বৈরাগ্যের হৃদয়হীনতার' কথা এখানে বলা হচ্ছে তা আসলে একধরনের আত্মমগ্ন অমানবিক দর্শন। আরও নির্দিষ্টভাবে তাঁর জেহাদ অন্যত্র সরব হয়ে উঠেছে—'কিন্তু আমাদের কাছে জীবন স্বপ্ন, জগৎ মায়াময়, সংসার মরুভূমিতুল্য। কোনোরকমে চোক মুখ বুজে যদি চল্লিশটা বছর পার হতে পারি, তা হলে আমাদের আর পায় কে?' নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয় স্তব্ধ করে শূন্যতার মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্মার ধ্যান নয়। বরঞ্চ বস্তুবিশ্বের বৈচিত্র ও জটিলতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে আরও ছড়িয়ে যাওয়া। বার বার এ প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে যে মন্দির বহিরস্থ হিমালয়ের প্রকৃতিগত রূপ তীর্থ ভ্রমণের মূল আকর্ষণ। প্রকৃতি শুধুমাত্র সীমাহীন বৈচিত্র্যের আধারই নয়, সর্বত্রই সে বহন করে চলেছে স্রষ্টার স্বাক্ষর। স্রষ্টার ওই লীলা আর প্রকৃতির বৈচিত্র্য যে সমার্থক তা অনেকভাবেই ধরা পড়েছে—'মন্দির বা মন্দিরস্থ গর্ভগৃহের মধ্যে দেবতার বিগ্রহের কথা বলছি না আমি, বরং ঐ মন্দিরের বাইরের কথাই বলছি,—যার প্রভাব আমাদের সম্মোহিত করে, আমাদের অন্তরের দ্বার খুলে চিন্ময় দেবতার সামনেই পৌঁছে দেয়, সেইখানেই আমরা ইষ্ট দর্শন করে জন্ম ও জীবন ধন্য করি।' এই যে মন্দিরের বাইরে প্রকৃতির যে রূপ তার হাত ধরে স্রষ্টা সমীপে হাজির হওয়ার যে তত্ত্ব তা এক ভাষাগত কৌশল যার প্রয়োগে মায়াবাদ প্ররোচিত সমস্ত রূপের স্কিৎসোফ্রেনিক প্রবণতাকে প্রতিহত করা যায়। হিমালয়ের প্রাকৃত রূপের ধ্যান যে শুধুমাত্র ছড়িয়ে পড়া, প্রসারিত হওয়ার পথ সুগম করে তাই নয়, এর ফলে স্মৃতির গভীরে তৈরি হয় প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্যবোধের এক স্থির কেন্দ্র। অস্থির নাগরিক জীবনের দাপটে যখন পল্লীজীবনের স্মৃতি

বাঙালির কাছে লুপ্তপ্রায়, হিমালয়ের শান্ত সুষম প্রাকৃতিক রূপ কিছুটা হলেও ক্ষতিপূরণের দাবি মেটায়। ঠিক যেভাবে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের কিছু পরে শিল্প-সাহিত্য ও দিনগত যাপনে 'natural sublime' এর প্রয়োজন বিপুলভাবে অনুভূত হয়।

একটা বিষয় এ-জাতীয় সাহিত্যে বার বার এসেছে। হিমালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে লেখকের ভাষিক ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি। কোথাও হয়তো সেই ব্যর্থতাবোধ কিছুটা সূত্রবদ্ধ ও সংহত— 'হিমালয়ের এই যে মহান রূপ, যা আবহমান কাল থেকেই অচল, এবং গূঢ়, তার রহস্যময় পরিস্থিতি ভাষায় বর্ণনা অসম্ভব।' আবার কখনো সেই ব্যর্থতাবোধ 'natural sublime' ও তার চিত্রণের মধ্যকার যে দুস্তর ব্যবধান তারই উপলব্ধি হয়ে দেখা দেয়—'হিমালয়ের পরম পবিত্র মহিমা আমি কীর্তন করতে পারিনি। যেটি যেমন করে বললে ভালো হত, যেটি যেভাবে বর্ণনা করলে ঠিক কথাটি বলা হত, আমার দুর্বল লেখনী তা বলতে পারেনি। যে দৃশ্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সর্বপ্রধান শিল্পী নিজের দুর্বল হস্তের অযোগ্যতায় কাতর হয়ে তুলিকা দূরে নিক্ষেপ করে সেই মহান দৃশ্যের সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থেকেই কৃতার্থ হন, আমি সেই হিমালয়ের মহিমা বলতে গিয়েছিলুম—আমার স্পর্ধা কম নয়।' যে ব্যর্থতাবোধে লেখক আক্রান্ত তা কিন্তু সাবলাইম অনুভূতিরই এক অপরিহার্য অংশ। কিন্তু যে ক্ষমতাহীনতার অভিজ্ঞতা এখানে বর্ণিত হয়েছে তা কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিপুষ্ট লেখকের মধ্যে কোনো সংকল্প তৈরি করে না। সাধারণত যেটা ঘটে থাকে পশ্চিমি সংস্কৃতিতে। হয় প্রকৃতির বিশালতা ও বেয়াড়াপনাকে বাস্তবে জয় করা অথবা কেটে ছেঁটে তার একটা গৃহপালিত রূপকে মগজে ঠাঁই দেওয়া। কিন্তু শক্তিহীনতার যে বর্ণনা হিমালয়কে শব্দে ধরার চেষ্টায় পাওয়া যায় তা ভারতীয় সংস্কৃতিসমর্থিত। এখানে প্রকৃতির এই বিশালতার সামনে দাঁড়ানো আধ্যাত্মিকতার প্রথম পাঠ। এ এক ধরনের spiritual discipline (স্পর্ধা নয়, নিজের অহং বোধের যথাযথ মূল্যায়ন)। এ হল নিজের অস্তিত্বের সীমা সীমাহীনতার পটভূমে দেখে নেওয়ার আদিম অনুশীলন যার অভাবে আজকের যন্ত্রনির্ভর মানুষ সর্বত্রই শুনতে পায় শুধুমাত্র নিজের দর্পিত পদধ্বনি।

৪

গত পঁচিশ বছরে বাঙালির হিমালয়ভ্রমণ সাংঘাতিক বেড়ে গেছে এখন শুধুমাত্র পশ্চিম হিমালয়ের তীর্থস্থান নয়, পূর্ব হিমালয়ের যত্রতত্র বাঙালির আনাগোনা। তবে পাহাড় বলতে এখনো সে হিমালয়কে বোঝে। যদিও প্রশ্ন করলে হয়তো সে তার এই হিমালয়-সংলগ্নতার শেকড় কোথায় তা বলতে পারবে না। আসলে, সে-অর্থে শেকড় বোধহয় নেইও। প্রতি বছর সময়ে অসময়ে দল বেঁধে হিমালয়ের দিকে যে যাওয়া হয় তা তৈরি হয় গণমাধ্যমের সুবাদে, যেখানে হিমালয় সংক্রান্ত অসংখ্য প্রতিবেদন থাকে। এই খণ্ডিত, টুকরো-টাকরা লেখা ও দৃশ্যগুলো আজকের এই উত্তর আধুনিক সময়ে গণসংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হিমালয়কে নির্মাণ করে। আজকের অসংখ্য ভ্রমণ

সংক্রান্ত পত্রিকা ও নির্দেশিকাধর্মী পুস্তিকা এই খণ্ডিত হিমালয়কে তার পাতায় পাতায় মুড়ে ভ্রমণেচ্ছু পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়। কোথায় কখন কীভাবে যেতে হবে তার বিবরণ নানা ছুটকো-ছাটকা মজার ঘটনার মধ্যে দিয়ে পরিবেশিত হয়। এ ধরনের সাহিত্য বা নির্দেশিকার মূল কাজ হল 'পর্যটক দৃষ্টি' ('tourist gaze') তৈরি করা। পর্যটনের প্রতিটি মুহূর্ত নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে এই 'পর্যটক দৃষ্টি'র মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ, আমরা কী দেখব, কখন দেখব, কতখানি দেখব তা নির্ধারিত হয় এই 'tourist gaze' এর মধ্যস্থতায়। এখানে হিমালয়-অভিজ্ঞতা কতটা সাবলাইমধর্মী তার আলোচনা থাকতে পারে না, কারণ হিমালয় তো 'Visual grand narrative' আর তাকে টুকরো টুকরো করে দেওয়াই তো গণমাধ্যমনিয়ন্ত্রিত পর্যটন-সাহিত্যের উদ্দেশ্য। এই যে ভ্রমণ থেকে পর্যটনে অবস্থান্তর— এটাই হল আধুনিক থেকে উত্তর আধুনিক সময়ে চলে আসার অন্যতম ইঙ্গিতবাহী ঘটনা। আর পর্যটন হল গণসংস্কৃতির সবচেয়ে প্রচারিত অংশ। ছড়িয়ে যাওয়া নয়, আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ নয় কারণ সেটা ঘটে যায় 'ইনটারনেট' ও 'ভারচুয়াল ট্রাভেল'-এর মধ্যে দিয়ে। ভ্রমণ/পর্যটন এখন আমাদের ভোগবাদী, জনগণতান্ত্রিক সমাজের বিজ্ঞাপিত সংস্কৃতি। আর এই সংস্কৃতিপুষ্ট সমাজের একটা অদৃশ্য অংশ যদি এখনও জলধর সেন আর প্রবোধ সান্যালে ফিরে যেতে চায় তাহলে বলতেই হয় বাঙালি ভদ্রলোকের প্রবল নস্টালজিয়া অন্য সেই হিমালয়ে এখনও মগ্ন হয়ে আছে যা ভ্রমণপুস্তিকা, প্যাকেজ ট্যুর, রিসর্ট আর হ্যান্ডিক্যামের মধ্যস্থতায় তৈরি হয়নি।

বোবা যুদ্ধের সৈনিক

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি জ্ঞানী নন, আদপেই নন, ছোটোবেলায় শেখা বামপন্থায় প্রতিবাদীর যে আদলটিকে জানি তিনি তা-ও নন। গভীর, প্রশান্ত, স্নিগ্ধ সাহিত্য ট্র্যাডিশনের তিনি কেউ নন। 'না' এই শব্দটিই কেবল বড়ো হতে থাকে, জটিল হতে থাকে, সূক্ষ্ম-ও। কিন্তু এই 'না'-ও প্রবল, হার্মাদ, দুর্দান্ত বিস্ফোরক যে তা-ও নয়। একটা বেশ ভঙ্গুর ভাব আছে। জেরা, প্রশ্ন ও জবরদস্ত আক্রমণের মুখে পড়লে, যে তার অনুনাসিক স্বরে বলবেই, 'আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি তো এলেবেলে।'

এই রচনাটিতে সন্দীপনের একটি গল্প আমরা পড়ব। কোনো সামগ্রিক আলোচনায় আমার শক্তি এবং আস্থা দুই-ই কম। তা ছাড়া, সামগ্রিক আলোচনা মানে, শেষ কথা, রায় দান এসব-ও থাকে। এই রচনাব ধর্ম তা নয়, টুকরো কথা, কিছু প্রশ্ন, কিছু ভালো লাগাই এর মূলধন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা লেখেন, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের লেখকদের সম্পর্কে খুলে কথা বলার সময় তাঁদের এখনো হয়নি। হয়তো দেখতে চান নির্মম কালের ধোপে ক-জন টেকে। আমরা জানি না কালের ওই বিচারের মাপকাঠি কী। এবং তা শাশ্বত কেন? আর যদি এরকম বিচার মেনেও নিই সে-সম্পর্কে ঘামানোর মতো মাথা দু-পেয়েদের নেই।

পঞ্চাশের লেখক বলে যাঁদের ধরা হয় সন্দীপন নিশ্চয়ই তাঁদের অন্যতম। গদ্য চর্চায় তারাশঙ্কর-বিভূতি-মানিক-সতীনাথের পরবর্তী অধ্যায় হিসাবে যদি সময়টাকে ধরি, তবে তা পুরোটা কালানুক্রমিক হবে না। আমাদের লক্ষ্যও নয় সেটা। যেটা ধরতে চাইছি তা হল একটি বাঁক নেওয়া, মোড় ফেরা। কারণ, একটু নজর করলেই দেখবেন তারাশঙ্করের, বিভূতির দুর্বল রিমেক এখনো সহজলভ্য। উপন্যাসকে সাংবাদিকতার কাজে নিয়োগ করে পুরস্কার-টুরস্কার পেয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন কেউকেউ। নিন্দার জন্য নয়— সন্দীপনের মতো লেখক সম্পর্কে কথা বলতে গেলে সমসময় ও লেখালিখির পরিবেশটা এসে পড়বেই। কারণ, বাস্তবকে দুয়ো দিয়েও লেখালিখির প্রচলিত রাজনীতি তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেননি। এই আবহাওয়ায় তাঁর শ্বাসকষ্ট হত। সমাজ-ইতিহাসের গল্পে আমি বিশেষ যেতে চাইছি না, একটা কথার উল্লেখ থাকুক, রাজনৈতিক স্বাধীনতা মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের দৈনন্দিন জীবনকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করায়; দেশভাগ, দাঙ্গা কোনো ক্ষণিক স্মৃতি নয়, বাঙালির আত্মজীবনীর অচ্ছেদ্য অঙ্গ।

গল্প পড়ার আগে আরও কিছু আশু কাজ আছে। আর তা হল একা ও একক সন্দীপন যে হয়ে উঠতে পেরেছিলেন অবিশ্বাসী, এবং নতুন সময়ের নতুন ধারার লেখকদের আইকন, সেটা কীভাবে সম্ভব হল, এর পিছনের গল্পগুলো কী কী। আইকন কিন্তু প্রতিনিধি নন। কৃত্তিবাসের অনেকেই তো পূর্বসুরি লেখকদের প্রতিমা ভেঙেছেন, পরে আবার সমঝোতাও করেছেন কিন্তু এই ভাঙার খেলায়, এই নাশকতায় সন্দীপন-ই পিরামিডের মাথায় উঠতে পারেন অন্যরা নয় কেন?

বোদ্ধা পাঠক, সমালোচক এবং গুণমুগ্ধদের-ও তো নানারকম প্রম্পটিং থাকে। একটু হালকা চালেই বলি, কোনো লেখক সম্পর্কে এক হেভিওয়েট সমালোচক বলে দিলেন, অমুকের লেখায় ডিটেলের কাজ অসাধারণ। এবং মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে উক্ত লেখক এরপর তাঁর জীবনটি ডিটেলের কাজেই বিনিয়োগ করেন। সন্দীপনের ক্ষেত্রেও কি এমন কিছু ঘটেছিল, যে জন্য, তাঁর রচনা সম্পর্কে, মুদ্রাদোষ ও পুনরাবৃত্তিকে আড়াল করতে বার বারই আশ্রয় নিতে হয় একটি বাক্যের 'লেখা মানেই আত্মজীবনী'। এ কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় স্মরণও থাকে না যে বিপরীতটি কিন্তু সত্য নয়। সে যাই হোক, প্রচারের মাহাত্ম্য মেনে তাহলে আমাদের তো লেখক সন্দীপনের আত্মজৈবনিক ব্যাপার-স্যাপারের প্যাঁটরাও একটু নজর করতে হবে।

সন্দীপনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সন্দীপনে আচ্ছন্ন পাঠককে এখানে একটা 'টিপস' দিয়ে রাখি, আমি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মনে করি, সন্দীপন-কে পড়া হবে বার বার, কথাও উঠবে অনেক। আমরা আসলে এই দরিদ্র জাতির (বাঙালি মধ্যবিত্ত) স্পর্ধার স্থান, তার সাহিত্যচর্চার পরিবেশ, পরিস্থিতি একটু ছুঁয়ে যেতে চাইছি ভবিষ্যতের কথা ভেবে। এই রচনার দ্বিতীয় অংশে বিজন এবং রেণু সংবর্ধনা পাবেন—নিশ্চিত থাকুন।

আমাদের লেখালিখির পরিবেশ, নিম্নমানের সমালোচনা ও প্রাপ্তির সুযোগ কম থাকায় একটা দলাদলি-খেয়োখেয়ির মধ্যেই সবাইকে লিখতে হয়েছে, হয়তো ভবিষ্যতেও লিখতে হবে। এর মধ্যে রাজনীতি থাকবে, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু যেটা বেশি মাত্রায় কাজ করে তা হল রাজনৈতিক চতুরতা। কয়েকটি সরল সত্যও কবুল করা যাক, লেখকের মাথার পিছনে কোনো জ্যোতির্বলয় থাকে না, সন্দীপনের তো লক্ষই ছিল কথাটা। যিনি আত্মপীড়ন, শ্রম ও নিষ্ঠায়, উন্মাদ কল্পনার হিস্টেরিয়ায় লিখে চলেছেন, তাঁর শরীর আছে, জীবন আছে, তিনি ব্যক্তি, তিনি নাগরিক। এই ব্যক্তির লেখক হয়ে ওঠার পথে, লেখাকে ঘিরে তাঁর চিন্তা যেমনই হোক—স্বীকৃতি এবং প্রতিষ্ঠা তাঁরও কাম্য। সন্দীপনের একই নৌকার যাত্রী আরও কয়েকজন ছিলেন, এখনও আছেন, তাঁদের কাজও হেলাফেলার নয়। এটা ঠিকই তাঁর সতীর্থরা দুটি-তিনটি গ্রন্থের বেশি রচনা করতে পারেননি, ফুলটাইম লেখক থেকে পার্টটাইম এবং ক্রমে কদাচিৎ লিখেছেন। হয়তো লেখকের অভিমানেই এঁরা ভেবেছিলেন, প্রতিষ্ঠা এঁদের বাড়িতে এসে কড়া নাড়বে। সেটা হয়নি। সন্দীপন লড়েছেন দাঁতে-দাঁত দিয়ে। আপাত উদাসভাবের, তাচ্ছিল্যের মুদ্রার আড়ালে নিজের লেখার জন্য ওকালতিতে তিনি বিন্দুমাত্র ফাঁকি দেননি।

প্রসঙ্গটি একটু বিস্তার করব। সন্দীপনের লেখালিখির প্রধান কয়েকটি দিক অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দীপক মজুমদারই ধরতে পেরেছিলেন বলে আমার ধারণা। এই কথায় আমরা পরে ফিরে আসব। পঞ্চাশের লেখকদের সবার মধ্যেই বাক-বিভূতির মোহ ছিল সংক্রামক ব্যাধির মতো। তাঁরা সফলও হয়েছেন এই বিভূতিতে ছোটো-ছোটো পাঠকগোষ্ঠী, লিটল ম্যাগ এবং তরুণ সমালোচকদের কাত করতে। দীপক মজুমদার তো এ ব্যাপারে নমস্য, গুরুস্থানীয়।

দীপক লিখেছিলেন, 'যে কোনো চালাক তরুণ লেখকদের আড্ডায় সন্দীপন সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হয়ে উঠেছে আজকাল।'[১] আজকাল বলতে, সময়টা যাচাই করে দেখেছি 'একক প্রদর্শনী' রচনার সময়, অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ সালকে বোঝানো হয়েছে। সন্দীপনের প্রথম উপন্যাস লেখা হচ্ছে তখন। অনুমান করতে পারি সেই সময়কার বৈপ্লবিক আবহাওয়ায় মৃত্যু, যৌনতা, শ্বাস গুনেগুনে বাঁচার বা নিজেকে কামনার ক্রীতদাস বোঝাতে টিপিক্যাল সন্দীপনীয় বচন, যথা 'প্রেম নেই তবু তো শায়ার দড়ি খুলি'[২] সেই সময়ের তরুণদের জাদু করতে পারেনি। পারেনি বলেই তরুণরা 'চালাক' হতে যাবেন কেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে সত্তরের ঝড় স্তিমিত হওয়ার পর মধ্যবিত্ত, বাবু, ভদ্রলোকের সন্তানদের একাংশে সন্দীপন আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে থাকেন। হয়তো এর একটা সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও সম্ভব— ওটা পণ্ডিতদের এলাকা, ওই পাড়ায় যেতে আমার ভয় করে। তবে, দীপক বেশ প্রফেটিক। সন্দীপনের লেখা ছাড়া ও ধরা, মানে কয়েকবছরের অনুপস্থিতি তথা ছেদ-কে বিনাশ করে যখন নিয়মিত লিখতে থাকলেন, যাকে *আজকাল*-পর্ব বলে ধরতে পারি, তখন যেমন তাঁর নতুন পাঠক জুটল, তেমনই কলকাতার তরুণ লেখকদের মধ্যে তাঁর আকর্ষণও কমতে শুরু করল।

লেখালিখি, আমাদের জীবনযাপন এবং সমাজ সম্পর্কে অনেক টিপ্পনী, খোঁচা এবং কিছু প্রশ্ন তোলার সন্দীপনী স্টাইলটি শক থেরাপির হাত-ধরা হয়েই থেকেছে। যেজন্য তাঁকে না-দেখাটা প্রায় অসম্ভব। এর মধ্যে 'আমাকে দেখুন' গোছের বিজ্ঞাপনী মেজাজও ছিল। আবার আধুনিকতার বারবার নবীন হয়ে ওঠার ধর্মটিও তো আছে। যথেষ্ট চাউর নয় এমন কথা, নিষিদ্ধের উপর থেকে আবরণ উন্মোচন, ভদ্রতার গুষ্টির তুষ্টি করা এবং যৌনতাকে অস্ত্র হিসাবে চেনা ও কাজে লাগানোর একরোখা ভাবটিতে প্রতিবাদকে নতুন ভাবে সেজে উঠতেও দেখি। ষাটের দশকে এবং সত্তরের মধ্যভাগ পর্যন্ত সন্দীপন ঝকঝক করছেন। গত দু-দশকে সেই ভাবমূর্তি কিন্তু কিছুটা ম্লান, কিছুটা পিছনে সরে যায়।

এই সময়ে যৌনতা সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনার কেন্দ্র মিশেল ফুকোর দখলে চলে আসে। সম্ভবত, ১৯৮০ সাল নাগাদ ইংরেজিতে ফুকোর বই কলকাতায় পাওয়া গেল। তারপর বাংলা ভাষায় ফুকো অবলম্বনে লেখা, ফুকোর লেখার অংশবিশেষ অনুবাদ ও চর্চার জোয়ার বইতে শুরু করে যা আজও অব্যাহত। বিদ্যাচর্চার পরিসর থেকে বাণিজ্যিক সংবাদপত্র পর্যন্ত ফুকো চর্চা প্রসারিত হওয়ার পর, বুদ্ধিজীবী বাঙালি পাঠকের যে-

অংশটিকে সন্দীপন টানতে পেরেছিলেন সেই অংশে ভাঙন ধরারই কথা। আর তাই ষাটে, হাড়ের ওপর চামড়ার প্রলেপ লাগানো, কাজল চোখ, মৃদু হাসির এই লেখকটির মধ্যে যে তরতাজা ভাবটি তাঁরা দেখেছেন, নব্বইয়ে তা যেন হয়ে উঠল এক বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি। সেকেন্ড ইনিংসের সন্দীপনের প্রকাশক জুটল, পাঠক বাড়ল। কিন্তু তখন তিনি ভয়ঙ্কর প্রেডিক্টেবল। তাঁর সম্পর্কে উৎসাহ, কৌতূহল মরে আসছে।

যৌনতা ও মৃত্যু সন্দীপনের লেখার দুই প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু দুয়েরই আদিম, জৈবিক দিকটাই নিয়তির মতো তাঁর লেখাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ছাঁচ একটাই। বারবার, ঘুরে ফিরে আসে। যৌনতার সঙ্গে আধিপত্য বা ক্ষমতার সম্পর্কটিকে পরের দিকের লেখায় তিনি ডাকটিকিটের মতো জুড়ে দিয়েছেন। তবে তা সাম্প্রতিক থাকার একটা চেষ্টা হিসাবেই রয়ে গেছে।

সীমালঙ্ঘনের উচ্চাশা তাঁর যথেষ্টই ছিল। নির্মিত মানব-মানবীকে ভাঙতেও চান। সভ্যতার নামে হাজার জঞ্জালে জড়ানো হয়েছে আমাদের। শ্বাস নিতে পারছি না। ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে এ কারণেও মুখ ফেরাতে চান, স্যাভেজকে ধরবেন বলে। নঞর্থক অভিজ্ঞতা ও নিষ্ক্রিয়তার দিকে যাত্রাও কি সে জন্যই! যৌথ নয়, সমূহ নয়, তাঁর নির্বাচন একজন। এই একজন কি ব্যক্তি? শুধু শালীনতার সীমালঙ্ঘনেই কি ব্যক্তির আদল পাওয়া যাবে? নৈতিকতার সঙ্গে সংঘর্ষে না জড়ালে নির্মিতি ভাঙা অসম্ভব। সন্দীপন ভাঙতেই চান। খুব ভালো কথা। কিন্তু তাঁর চরিত্ররা তার কতটুকু যোগ্য! হাবাগোবা, অকপট, সরল একজন প্রায় প্রত্যেকে। এই চরিত্ররাই ভিতর থেকে তাঁর লেখাকে সাবোতাজ করে। সন্দীপনের শিল্পবস্তু, বা থিমেটিক আধুনিকতার প্রকল্পে বালতি বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয়।

'দ্য অ্যাসথেটিক্স অফ সাইলেন্স'-[৩] এর ভক্ত, যিনি মনে করেন, লেখার 'প্রথম শর্তই হল সমাজ-বিরোধিতা,'[৪] লেখার বিষয় বলতে বোঝেন 'একজন মানুষের অস্তির কাহিনী, অস্তিত্বের জগৎ' এরকম আরও অনেক কিছু; অথচ আমরা দেখি কী নিদারুণভাবেই না ব্যর্থ তিনি। নিজের সম্পর্কে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ছুতোনাতায় 'ব্যর্থতা' শব্দটির গায়ে (পোষা বেড়ালের গায়ে) হাত বোলান সন্দীপন।

ব্যর্থতা = সাফল্য

তাঁরই কথা। বৃত্তান্তটিতে শেষপর্যন্ত এই সূত্রটিই জিতবে। হারের জয়। খুব স্পষ্ট করে এবং একটু মোটা দাগেই কথাটা বলতে হবে, আর এভাবে বলার ঝুঁকি থাকেই, কিন্তু আমার উপায় নেই। অন্যভাবে বলতে গেলে এক তো অনেক কথা বলতে হবে, দুই তা আমাদের লক্ষ্য থেকে অনেক দূরেও নিয়ে যাবে। কথাটা এই : নাশকতা, ব্যক্তি ও অস্তিত্বের প্রসঙ্গে আমাদের এই লেখক মহাশয়ের ভাবনায় বড়ো বড়ো ফাঁক ছিল। তবে সেটাও বড়ো কথা নয়, তাঁর যেন-বা চিন্তার-মননের কোনো প্রশিক্ষণই নেই। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না, এ তাঁর চর্চার অভাব, নাকি তিনি আধুনিক মানুষের অস্তিত্বের সংকটের দু-একটি মোক্ষম তার স্পর্শ করেই, আন্দাজটুকু পেয়েই মজে যান,

এ নিয়ে পর্বে পর্বে ভাবার প্রয়োজন বোধ করেননি। প্রশ্নটি খোলা থাক। না-ভাবা, বা ভাবতে না পারাটা অবশ্য দারুণ কাজে লাগল। বক্তব্য মুছে গেল, বক্তব্য কিছু তো নেই। পড়ে রইল যন্ত্রণা, আর্তস্বর। জান্তব গোঙানি। বোবা ভাষা।

এর সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় সাহিত্য-নিধনের প্রয়াস। তবে সে সংক্রান্ত কথাবার্তা যা বলেছেন তার সবটাই টোকা। সেখানে জাঁকিয়ে বসে আছেন আর্লি-বার্থ (যখন রলাঁ বার্থ 'রাইটিং ডিগ্রি জিরো' লিখেছেন)। বার্থ নিজে এবং পশ্চিমের আধুনিক নন্দনতত্ত্ব পরে এই অবস্থান থেকে অনেকটাই সরে যায়। কিন্তু সন্দীপন পড়ে রইলেন জিরো ডিগ্রিতেই। দীপকের মন্তব্যকে একটু সম্পাদনা করে নিলে, বা অনুপযুক্ত শব্দটির তলায় দাগ দিলে এখন আর আমরা কোনো ভুল করব না।

এখানে, বা এই ঘটনাটির মধ্যে যে নির্মমতা তা কি প্রবাহের, সৃজনকর্ম অব্যাহত রাখার অনিবার্য শর্ত-ও নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে কাকেই-বা রেয়াত করেছিলেন সন্দীপন। নতুনের আবাহনে নিবেদিত তিনি তো ঐতিহ্যকে অতীত, শব-ই ভেবেছেন প্রায়। বঙ্কিমের একটুখানি, মানিকের প্রতি সামান্য পক্ষপাত, এক চিলতে জগদীশ গুপ্ত, কমলকুমার সম্পর্কে আগ্রহ এবং আপত্তিতেই প্রথম জীবনে বাংলা সাহিত্যের একটা ক্যাপসুল বানিয়ে ফেলেন। কালানুক্রমিকতা দিয়েই সাহিত্যে পর্বায়ণের কাজও সেরেছেন যান্ত্রিকভাবে। অতীত লেখকদের অনেকেই যে আজও যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের লেখালিখিতে শ্বাস ফেলেন এবং ফেলবেনও, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন সে কথা। আমরা মানতে বাধ্য যে এই নৈরাজ্য, স্বাধিকার প্রমত্ততা ছাড়া তাঁর লেখা নিজস্বতায় উজ্জ্বল হতে পারত না। সম্ভবত সেই একই যুক্তিতে আজকের তরুণ লেখককেও সন্দীপন থেকে অনেকটাই সরে আসতে হবে। তাঁকে ভুলতে শিখতে হবে। সাহিত্যকে মহিমাচ্যুত করা তাঁর আশু কর্তব্য। সাহিত্য বলতে যে 'পবিত্র', 'মহান শিল্পকলা' তাকে তিনি আক্রমণ করতে চান। এখানে সন্দীপন কমলকুমারের শিষ্য হয়েও গুরুবধের আয়োজনে ব্যস্ত। নিজের রচনায় অন্তত তিনি কমলকুমারের প্রায় কেউ নন। কমলবাবুর ভাষাকে আক্রমণ এক প্রকৃতির সন্দীপনের আর এক। বিরোধটা ধ্রুপদী সাহিত্য সম্পর্কে চিন্তার। এবং বাংলা নামের ভাষা প্রবাহে চিরনবীন ঐশ্বর্যে অযত্ন ও অবহেলা। ভাষা-শিল্পী মাত্রেই যে ভাষাটির ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকেন, সেই বোধেরও অভাব। সাহিত্যের বিরুদ্ধে তিনি নাশকতায় লিপ্ত। ভাষা দীর্ঘকাল শিল্প নির্মাণে ব্যবহৃত হয়ে নীরক্ত, মেকি এবং অর্থহীন হয়ে পড়েছে যেন। খুঁজতে হবে নীরবতার ভাষা, আবিষ্কার করতে হবে আত্মহননের আর্তস্বর।

মাননীয় পাঠক, আপনি আমাকে অনুদার কৃপণ বা হিংসুটে বলতে পারেন জেনেও, ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। সন্দীপনে মুগ্ধ পাঠক-সমালোচকদের মুখে বারবার একটা কথা শুনেছি ব্যাখ্যা-তাৎপর্য-বিশ্লেষণসহ অথবা তৃপ্তির পূর্ণ ঢেঁকুর সমেত তা উচ্চারিত হয়েছে— আর্বান, আর্বানিটি। আমাদের একমাত্র আর্বান লেখক।

নীরবতার ভাষা বা আত্মহননের স্বর-সন্ধানের যে কথা বলা হল, আমার পর্যবেক্ষণে

সেই ব্যাপারটি সন্দীপন যতটা তলিয়ে ভেবেছেন তার থেকে অনেক বেশি কাজ করেছে প্রকাশের আগ্রহ এবং এই প্রকাশের প্রধান উৎস প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়া বলেই, চিন্তন প্রক্রিয়া কম জোরদার বলেই, তাঁর লেখা জীবন্ত, স্বতঃস্ফূর্ত হতে পেরেছে। আবার নিজের ছাঁচে বন্দি বলে নিষ্প্রাণও কোথাও কোথাও। অর্থাৎ, যেজন্য তাঁর প্রতি আগ্রহ দেখা গেছে, সেই যৌনতা ও নাশকতার মিশ্রণে গড়া নিয়তি নামক একমাত্র ভবিতব্যের কানা গলিতে তিনি শেষ পর্যন্ত ঢুকবেনই। ওটা যেন তাঁর তুরুপের তাস। আর এই তাস, জীবন-মৃত্যুর এই দাবা খেলায় নারীকে পুরুষের চোখেই দেখা হয়েছে। যৌনপুতুল সে। সন্দীপনের চোখেও। আর্বানিটির একটি নমুনা পেশ করি, একক প্রদর্শনীতে যেভাবে আছে সেভাবে নয়, শুধু সংলাপ লক্ষ করুন :

—দাদা কি হাইকোর্ট দেখেছেন?

—নেমে আসুন।

—কেন বলুন তো?

—কারণ, আপনার দাঁতগুলো আমি খুলে নেব।

—কেন, দাদা কি দাঁতের ডাক্তার।

এই সংলাপে, বিবরণে, দেখায় 'আর্বানিটি' আবিষ্কার করে 'পেয়েছি, পেয়েছি' বলে উল্লসিত হচ্ছেন এমন পাঠক আমি দেখেছি। তাঁদের প্রতি সশ্রদ্ধ থেকেও, ফিচলেমি, ঠেস দিয়ে কথা বলা, ভেংচি কাটা, নামজাদা লোকের নামে কেচ্ছা ফাঁদার যে কলকাত্তাইয়া কালচার তা স্নানের ঘাটের গ্রাম্য রসিকতার এক কলকাত্তাই সংস্করণ বলেই আমি জানি। অন্তর্ঘাত থেকে তা দূরের বস্তু। আর্বান-আর্বান করে চিল চিৎকার সন্দীপনকে লেখক হিসাবে যেজন্য একটু খাটোও করে ফেলে। অর্থাৎ কলকাতা তাঁকে কলকাত্তিয়ার খোপেই পুরে ফেলতে ব্যস্ত। আর তিনি তো বাঙাল ননই। ভক্তগণ জানেনও না যে এই কাজটি করতে গিয়ে তাঁরা প্রিয় লেখকের মর্যাদাহানিই করেছেন। কারণ, সোজা কথাটি হল, আর্বানিটি মডার্নিটির একটি লক্ষণ হতে পারে বড়জোর। সন্দীপন সারাজীবন চেষ্টা করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে তাঁর সময়ের আধুনিকতাকে বুঝতে, তাকে প্রসারিত করতে, অনন্য করে তুলতে। এই কাজে তিনি যৎসামান্য সফল হয়ে থাকলেও তা যথেষ্ট বড় কাজ।

আর্বানিটি ও সন্দীপন সমার্থক, প্রায় সংস্কারে পর্যবসিত হওয়ার পিছনে অনেক কারণ দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে জোরদার একটি হল তাঁর নার্সিসাস ধর্ম। নার্সিসাস বলেই আত্মজৈবনিক। 'লেখার মধ্যে 'দেশ, জাতি, সময়, ইতিহাস' ঢুকে পড়াটাকে তাই মনে হয় নিছক পরিহাসের বিষয়।'[৫]

অস্তিবাদ, অস্তিত্ববাদ এজাতীয় শব্দ আমাদের লেখক মহাশয় (যিনি স্বঘোষিত পশ্চিমি ঐতিহ্য অনুসারী) আকছার ব্যবহার করেন, সমালোচকরা তাঁরই ছুঁড়ে দেওয়া ওই মুদ্রা লুফে নিয়ে সন্দীপনের লেখালিখির বিচারও করেছেন। দার্শনিক ঘরানা হিসাবে যে

অস্তিত্ববাদের কথা আমরা জানি সন্দীপনের গল্প কিন্তু সেই পাড়াটি এড়িয়েই চলে। বা, তার খুবই প্রাথমিক এবং সরলীকৃত কিছু ধ্যান-ধারণাকে কোল দেয় বড়ো জোর। সন্দীপনের আধুনিকতা সন্ধানেও ফ্যাশন, মুদ্রাদোষ এবং বাইরের চাকচিক্য কম নেই বলে অনেকসময় তাঁকেই বরং চালাক বলে ভুল হয়। তবে, সেটা ভুল-ই। তাঁর অস্তিত্ববাদ অনেকটা ওই স্রেফ বেঁচে থাকা, কাজের অর্থ পুনরাবৃত্তিমূলক টিক মারা, এর বাইরে কোনো জীবন নেই। আদর্শ নেই। দীর্ঘদিনের বাম আন্দোলন আদর্শের অসহনীয় চাপ সৃষ্টি করেছিল, যে চাপের দরুন জীবনের স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন রুদ্ধ হয়ে আসছিল। সন্দীপন এবং তাঁর সমসাময়িক উদয়ন ঘোষ, বাসুদেব দাশগুপ্ত এবং অরূপরতনের লেখাতেও এর বিরুদ্ধাচরণ আছে। এটা সময়েরই প্রতিক্রিয়া। সন্দীপনে এই প্রতিক্রিয়া শরীরী, জান্তবও অনেকটাই। পশ্চিমেও তখন এরকম এক অর্থহীনতা ও শূন্যতাবোধ থেকে গল্প-উপন্যাস- কবিতা রচিত হচ্ছে। চর্চিত ভাষায় তো বটেই, এমনকী 'ইতর' ভাষা থেকেও কি দেশ, সমাজ, ইতিহাসের চিহ্নগুলো মুছে ফেলা সম্ভব? আমরা বরং একটা ইঙ্গিত পেতে পারি জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হতে গেলে জনজীবনের যে কাহিনী, দেশের একটা ভূগোল, সমাজ-ইতিহাসের দলিল ইত্যাদি প্রয়োজন—এখানে সেরকম লেখার কথা বলা হচ্ছে না।

সন্দীপনের গল্প পাঠের আগে আরও গুটিকয় কথা আমাদের খেয়াল রাখাটা জরুরি। তার কোনটা তাঁর পক্ষে আর কোনটা তাঁর বিপক্ষে যাচ্ছে সেটা আদৌ বিবেচ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য তো নয়-ই।

হালকা চালে বলা, লেখা তাঁর অনেক নিদারুণ মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণকে চ্যাংড়ামি ভাবা হয়েছে। যেখানে তিনি ন্যারেটিভ স্টাইলে নতুন কিছু করতে যত্নবান, উদ্ভাবনশীল থেকেছেন সেই সব কাজকে 'এক্সপেরিমেন্টাল' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'এক্সপেরিমেন্টাল' শব্দটি সায়েন্টিফিক চিন্তার অঙ্গ। এ একটা পদ্ধতি যার দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণ বা অ-প্রমাণ করা সম্ভব। শিল্পে ঠিক-ভুলের কোনো জায়গা নেই। নতুন ধরনের কাজ সম্পর্কে যেজন্য ইনোভেটিভ বা উদ্ভাবনশীল কথাটাই জুতসই। যাকে আমরা সাহিত্যের প্রধান স্রোত বলে থাকি, সেই স্রোতটির দক্ষ সাঁতারুদের দেওয়া অভিধা এইটি। যা, অসতর্কভাবে সবাই গ্রহণ করেছেন। মেইনস্ট্রিম এভাবে বাদ দেওয়া, এক পাশে সরিয়ে রাখা, পরে দেখা যাবে গোছের একটা মানসিকতা তৈরি করে দেয়।

আবার, সমান্তরাল সাহিত্যের আঙিনায় এমন একটি ঝোঁক বর্তমান, যাকে অভিমান ও প্রতিক্রিয়ার মোড়কে পাওয়া গেলেও, ঝোঁকটি তত নিরীহ নয়, বরং বেশ ক্ষতিকারক। গোদাভাবে বললে কথাটা এইরকম, এই অঞ্চলে শিল্পীরা ধরেই নেন জনপ্রিয়তা লেখালিখির শত্রু। তাঁরা ভুলে যান, জনপ্রিয় লেখকরাও এক ভাবে ভাষাটিকে জীবন্ত রাখছেন। হয়তো ভ্যালু অ্যাডিশন করতে পারছেন না। হয়তো তাঁরা অত বড়ো মাপের লেখক নন, যে, অসাধারণ হল আবার জনপ্রিয়-ও হল এমন লেখা লিখতে পারেন। অথচ এ যে শুধু তাত্ত্বিক ভাবেই সম্ভব তাও তো নয়। কোনোরকম বাণিজ্যিক পোষ্টা না পেয়েও

সন্দীপনেরই প্রিয়তম উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-য় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তো এ ব্যাপারে অনেকটাই সফল।

পোষ্টা-প্রতিষ্ঠান-পুরস্কার সূত্রে বিপণনের ব্যবস্থাটির কথা এখানে মনে পড়তে পারে। পড়েও। এবং সেই কারণে অন্য ধারার লেখক সম্পর্কে বঞ্চনা-ভাতা চালু করতে হবে এমন একটা মনোভাবও আছে। অমুক তো কিছুই পেলেন না। তমুক দুর্মুখ বলে, পীরদের ভজাতে পারল না বলে, শূন্য হাতে ফেরে— ইত্যাদি যথেষ্ট অপমানজনক এবং ক্ষতিকারক আমার মতে। সন্দীপন বা সন্দীপনের মতো লেখকদের রচনা পড়ার আগে এরকম সারি সারি যেসব পাঁচিল আছে সেগুলো উড়িয়ে দিতে হবে।

শেষ কথাটি হল, এমনভাবে সন্দীপনকে প্রোজেক্ট করা হয় যেন তিনি একাই এত কিছু করলেন। এ কথাটিও ডাহা মিথ্যে। সন্দীপনের লেখালিখির সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য এবং অনেক ভিন্নতা (স্বাতন্ত্র্য) আছে এরকম তিনজন লেখকের নাম আগেই উল্লেখ করেছি। যদিও নামের তালিকাটি আরও বড়ো করা সম্ভব। পাঠক-সমালোচক-প্রতিষ্ঠানের কৃপা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিতদেরই বেছে নিয়েছি বলে তাঁর শরিক লেখক হিসাবে এই তিন জনের কথাই শুধু বললাম। 'রন্ধনশালা'-র বাসুদেব দাশগুপ্ত, 'অবনী বনাম শান্তনু'-র উদয়ন ঘোষ এবং 'ধ্বংসস্তূপ'-এর অরূপরতন বসু এবং সন্দীপন কিন্তু একই নৌকার যাত্রী। এঁদের ঐক্যসূত্র নিঃসন্দেহে মডার্নিটি। যা, পরে অনেক নতুন দিকে হাত বাড়িয়েছে। ভাষা যেন একটা ক্যানভাস, লেখা এমন এক কাজ যা ব্যক্তিক উচ্চারণ চিহ্নে জ্বলজ্বল করেও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত নয়। তা ইতিহাসের কিংবা সমাজের ধামাধরাও নয়। এ এক ভিন্ন অঞ্চল, দুয়ের মধ্যবর্তী এক ভাষা পরিসর। সন্দীপন এই ভঙ্গুর, সংবেদী নৈতিকতার একটা আন্দাজ মাত্র পেয়েছিলেন।

১৯৪৭-এ তিনি চোদ্দ বছরের কিশোর। প্রথম গল্পের বই প্রকাশের সময় সন্দীপন আঠাশের যুবক। বলা যাবে না মধ্যরাত্রির সন্তান। আবার স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের গৌরবজনক ইতিহাস থেকেও বঞ্চিত। আগমার্কা বামপন্থী ছিলেন না এবং তাঁর সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন জনসাধারণের নানাবিধ অধিকারের আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন সন্দীপনের সেদিকটাও তেমন জোরদার নয়। ১৯৬০-এ প্রকাশিত 'ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী'-কে সূচনাপর্ব বলে ধরব। বিশিষ্ট বলে। তখন এবং তার পরেও দীর্ঘকাল দেশ, সমাজ সন্দীপনের লেখায় প্রান্তিকই থেকেছে।

বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা, কালোবাজার এবং পূজনীয় মানবতাবাদের কঙ্কালসার অবস্থা কলকাতার ওই কিশোরকে কতদূর একা করেছিল, উদ্দেশ্যহীন করেছিল, বোবা করে তুলেছিল, কার্যকারণ-ব্যাখ্যা-টীকা রহিত সেই অনুভূতির অভিজ্ঞতাই (অনুভূতিই এখানে চিন্তা) তাঁর রচনা। সন্দীপনের না আছে কোনো স্মৃতি-লালিত পশ্চাদ্‌ভূমি, না

কোনো ঝলমলে ভবিষ্যদ্‌ভূমি। এখানে পড়ে আছে শুধু অস্তিত্বের হাড়গোড়।

সত্তা সার কিংবা সার্ত্রে অতিক্রমণের যে কথা শুনি সন্দীপনে তার বিন্দু-বিসর্গ নেই। হয়ে ওঠা, সংকল্পেরই-বা স্থান কোথায়? সংকল্প পূর্বের যে-অবস্থা, তার দুটি ধাপ যদি ধরি, তবে প্রথমেই সামনে চলে আসে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। পরের ধাপ ব্যক্তি সত্তা সন্ধান। শূন্যে ছবি আঁকার আকুলতা, যাকে সঙ্গীত বলেও জানি। এই গীত সন্দীপনে আছেই। কিন্তু তা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার আর্ত স্বর। সেখানেই তার সীমা। বদ্ধতা। এই বদ্ধতায় দম আটকে আসার কথা। লেখা একঘেয়ে, বোরিং ও বর্ণহীন হতে পারত। তাকে ওই মৃত্যুর হাত থেকে যে বাঁচায় তার নাম শৈলী। মুখে তিনি অজস্র হাবিজাবি কথা বললেও, ক্র্যাফট্‌সম্যানশিপ কারিগর-কারিগরি সম্পর্কে, ধ্রুপদী সাহিত্য সম্পর্কে অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি প্রকাশ করলেও, প্রাচীন শিল্পী-বংশধরের পরিচিতি তাঁর রচনায় জ্বল জ্বল করছে। তারা তাঁর ঘোষিত প্রকল্পের বিরুদ্ধে শান্ত প্রতিবাদ। সিম্বল, ইমেজ, অ্যালিগরি, মেটাফর সম্পর্কে বিতৃষ্ণাময় সন্দীপনের সমস্ত বচন ব্যর্থ করে দেয় তাঁর নিজেরই রচনা।

ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী সন্দীপনের জন্ম দিল। আমরা দেখেছি মৌলিকতাকে এক হাত নেওয়া সন্দীপন এই চটি বইটিতে আশ্চর্য রকমের স্বতন্ত্র। এ জিনিস বাংলা ভাষায় ছিল না। এ যেমন সত্য, তেমনই মৌলিকতার এই বিশেষ ছাঁচটি ভবিষ্যতে যে তাঁকে ক্রীতদাস করেছিল তাও সমান সত্য। আজকের বাজারের ভাষায় এ যেন শেষ পর্যন্ত ব্র্যান্ড নির্মাণই। কথাটা নির্দয় শোনালেও, ওই যে প্রথমেই কেল্লা ফতে, প্রথমেই লেখার সম্পূর্ণ নিজস্ব মুদ্রা আবিষ্কারের একটা রেখাচিত্র পেয়ে যাওয়া, বাকি সারা জীবন সন্দীপনী থাকতে তাই টুকে গেছেন, তারই ফাঁক পূরণ করেছেন নিপুণ হাতে।

আবার এই প্রসঙ্গটি একটু অন্যভাবেও দেখা সম্ভব। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের এক স্মরণ অনুষ্ঠানে (সাহিত্য অকাদেমি আয়োজিত) আমি বিষয়টি উত্থাপনও করেছিলাম— প্রথম গল্পগ্রন্থের শুরুতে সন্দীপন গুটিকয় কথা লিখেছিলেন। এমনভাবে যেন তা এই বইটির (ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী) ধরতাই। ছোটো-বড়ো দু-তিনটি প্যারা, কয়েকটি নিঃসঙ্গ বাক্য, কবিতা যেন-বা, গদ্য-ও। বিজনের মৃত্যুভয়, মৃত্যু চিন্তার আভাস যেমন ছিল, তেমনই মৃত্যু-দণ্ডিত অতি সাধারণ শহুরে মধ্যবিত্তের বেঁচে থাকার দিকে তা যেন এক সন্ত্রস্ত চেয়ে থাকা।

'আমরা, যাদের গ্রন্থপ্রীতি নেই...জ্ঞান নেই জ্ঞান নেই বলে প্রেম নেই বন্ধুতা নেই শ্রদ্ধাভক্তি বিশ্বাস কিছু নেই,

আমরা যারা তবু বেঁচে থাকতে চাই আমরা নরনারী যারা পরস্পরকে যৌনপ্রহার করে বেঁচে থাকতে চাই তবু আমাদের অতীত নেই ভবিষ্যৎ মৃত্যু আমাদের বর্তমানের আজ পর্যন্ত কোনো ব্যাখ্যা হয়নি।

...যখন পরাধীন আমরা সেই উড্ডীয়মান পতাকাকে দেখতুম শীতে দাঁড়িয়ে শৃঙ্খলিত করজোড়ে...'[৬]

এর আগেই এসেছে 'জন্মক্ষণের.. শৃঙ্খলিত করজোড়'-এর কথাও।

এই কথামুখ 'বিজনের রক্তমাংস' গল্পে শুধু নয়, সন্দীপনের যে কোনো লেখাতেই আছে এর অলক্ষ উপস্থিতি— যেন তাঁর কোনো গ্রন্থ পাঠের সময় এই বাক্যরাজি কুটো হয়ে চোখে পড়বেই। কথনে প্রত্যক্ষতা, স্পর্শযোগ্যতার উৎস এখানে আন্তরিকতা, বিজন তা বলেও বার বার সে এই জিনিসটাই আঁকড়ে ধরতে চায়। তাঁর এই দেখার সত্য-মিথ্যা হয় না, এই দেখা এক ভয়ঙ্কর অস্বস্তি, উলঙ্গ কিছু প্রশ্নের সাজ। যা কেবলই সরিয়ে দিতে থাকে রক্তমাংসের জীবন থেকে সংস্কৃতির আচ্ছাদন। বিজনের এই জীবন, শুধু এইটুকু— রক্ত আর মাংস।

আমার ধারণা, জেনে বা না জেনে 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' বইটির শুরুতে এক দমে বলে ফেলা এই সব কথা তাঁর লেখার ম্যানিফেস্টো। ইতিপূর্বে কোনও বাঙালি লেখক বা আমি অন্তত জানি না আদৌ কোনো লেখকই এমন স্পর্ধা দেখিয়েছেন কি না।

এ জীবন যেন স্যাভেজের। এক বোবা মানুষের। 'সভ্যতা'-কে যে দিগন্তেও দেখতে পাচ্ছে না। শিল্পীর দূরদৃষ্টিতে উপনিবেশ উত্তর মধ্যবিত্তের একটি রূপ এই নজর ছাড়া ধরাই যেত না।

নজরটি কেমন?

...'এই সময় যা কিছু শব্দ শোনা যায়— রেল, মেঘ কী ট্রাফিকের হর্ন, জলের ছপছপ, বা মানুষের স্বর, সবই প্রতিধ্বনির মতো মনে হয়। ...বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে হাল্কা জামরঙের।'[৭]

...'বৃষ্টি শেষের অপরাহ্নের আলোর মতো সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল তার বুক জুড়ে।'[৮]

...'এই সময় হাওয়া উঠে এমন কাঁপিয়ে দিয়ে গেল বৃষ্টিটা যে, কিছুক্ষণ বারিপাতের আওয়াজও আর শোনা গেল না।'[৯]

বৃষ্টির বর্ণনায় অসাধারণত্ব কিছুই নেই। ভাষা-ও যে স্বাতন্ত্র্যে দারুণ উজ্জ্বল তা বলা যাবে না। বরং 'অপরাহ্ন', 'সমুজ্জ্বল', 'বারিপাত' জাতীয় শব্দের ব্যবহার অন্যমনস্ক-ই মনে হয়, হয়তো পরের দিকের লেখায় এই দুর্বলতা কেটে যাবে। আমরা এরকমটা ভাবতেই পারি। আবার, ভাষার অব্যক্ত ধর্মটি খেয়াল রাখলে, বিজনের আর যা-যা ঘটবে, যা-যা সে ভাববে, অর্থহীনতার অন্ধচক্রটির আদল যে-ভাবে গড়ে উঠবে তার সঙ্গে এই বিবরণের এক নিবিড় যোগ-ও দেখতে পাব।

ঈশ্বরের অদৃশ্য হস্তলিপি, তার নানান দুর্বোধ্য চিহ্নগুলিই যেন পড়তে চাওয়া হচ্ছে। সেই পুস্তকটি বিজনের সামনে খোলা। বিজন তা দেখে 'থ্রু আ গ্লাস ডার্কলি'। বাস্তব প্রতিধ্বনি, প্রতিচ্ছবিতেই তার কাছে ধরা দিতে পারে। শব্দ, ছবি, অনুভব তারই। তবে

ইন্দ্রিয় যতটা সহায়ক সে যেন ততটুকুই দেখতে ও বুঝতে পারছে। হাল্কা জাম রঙের ধোঁয়া কিছু কি স্পষ্ট হতে দেয়। সন্দীপনের মতোই সে বলতে পারে— কী করে বলব কোনটা কী। যদিও সে তা বলে না। বৃষ্টি, মাথায় জমা নির্বোধ মেঘ, টুকরো ছবি মিলে একটা মর্বিডিটির আস্তরও বিছিয়ে দিচ্ছে। পরস্পর সম্পর্কহীন, শব্দ ও চিত্রের এক জগৎ ধরা পড়ছে ওই ধোঁয়াটে কাচের আড়াল থেকে দেখার জন্য। এ-যত-না দৃষ্টিভঙ্গি তার থেকে অনেক বেশি নজর-কোণ। সেই দেখার যে বিবরণ তাকে তো বাস্তব বলা যাবে না, পয়েন্ট অব ভিউ রূপে নয় ভিউ-পয়েন্টের গুণে তা তখন একটা ধারণা। বর্ণনা আবার ধারণাটিকে পেশ করে ভাষাচিত্রে, ভাষাধ্বনিতে, ভাষার যে অর্থ-তাৎপর্য সন্দীপন তা এড়াতে চান বেশির ভাগ সময়। এ কারণে, প্রকাশের পন্থা, প্রক্রিয়াটিই বড়ো হয়ে ওঠে, প্রকাশ নয়।

সন্দীপনের এই নজর তাঁর প্রায় সমস্ত লেখাতেই হাজির। ওই ধূসর কাচের আড়ালেই নির্বাসিত তিনি। দৃষ্টি পিপাসায় বুক শুকিয়ে আসছে, চোখ টন টন করছে। কিন্তু ঈশ্বরের জটিল হস্তলিপির সামনে তিনি নিজেই যেন অপুর এক বিপরীত সংস্করণ, যেন এক হাবাগোবা মানুষ। ভাষাহীন, সন্ত্রস্ত মানুষ।

তাঁর বোবাযুদ্ধের সঙ্গে অতএব ওই নজর সর্বদা জড়িয়ে আছে। তারা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। পরস্পরের শুশ্রূষায় মগ্ন। কিন্তু কোথাও চিন্তার স্থান নেই। ভাবনার জন্য সংরক্ষিত এলাকা তিনি নষ্ট করেন। কিছু বোঝা যাবে না, কিছুই বোঝা সম্ভব নয়—সন্দীপনের এই সম্ভবত বিশ্বাস।

সন্দীপনের সতর্ক পাঠকের এই অভিজ্ঞতা হবেই, যে, এতাবৎ কালের সমস্ত চিন্তা, বিশ্বাস কোনোটার প্রতিই তাঁব আস্থা নেই। বরং তিনি যেন মনে করছেন এ-সমস্তই এক পরাণ-কথা, মিথ। তিনি যে এ-সবের বাইরে কোনো সত্য খুঁজছেন তাও নয়। এখানে একটা সম্ভাবনা ছিল ভ্রমের কীর্তন তার ঐশ্বর্য উন্মোচন, বা মিথ্যাভাষণ, অসত্য উচ্চারণের পক্ষে সওয়াল করা। সন্দীপনের সেটাও পথ না হওয়ায়, সন্দেহ ও সংশয় পথ আগলে অনড় বলে ডিসকোর্সের সম্ভাবনাও জাম রঙের ধোঁয়া গ্রাস করে। আবার, নোটস ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ডে দস্টয়েভস্কি ঘৃণার যে ইন্দ্রিয়জ জটিল বিবরণ পেশ করেন, সেই নির্দয় প্রতিভার আঁচ-ও আমরা সন্দীপনে পাই না। এই সব মিলে আমাদের এই প্রিয় লেখক নিজেই যেন সাহিত্যের একটি চরিত্র, যে চরিত্রটি আবার রচনাকর্মে নিয়োজিত, আমি একে অপুর এক বিপরীত চরিত্র হিসাবে সনাক্ত করতে চাইছি। নিজের সময়ের জগৎ ও জীবনের জটিলতাগুলো যাকে ঠেলছে, ধাক্কা খেতে খেতে, যন্ত্রণা পেতে পেতে অবিশ্বাস, সন্দেহ, আক্রোশ, কপটতা, কৃত্রিমতাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে বাঁচার চেষ্টায় নিজেরই হাড় মাংস রক্তের মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড ডেরা বানানো ছাড়া যে কিছুই পারে না। বেঁচে থাকাটা বহাল রাখার জন্য যার কাছে কেঁচোর জীবনও কাম্য।

একটা শব্দ অবশ্য বাদ রইল, জীবনের আগে সন্দীপন 'সম্পূর্ণ' শব্দটি বসিয়েছেন। কী কী দিয়ে ভরে তুললে কেঁচোর জীবন সম্পূর্ণ হতে পারে কেউ কি জানে। কেঁচোর

বড়ো জোর থাকতে পারে জীবনচক্র। প্রশ্ন বা সংশয়টি আমরা চিরতরেই মুলতুবি রাখতে পারি, এজন্য যে ভাবনা বিজনের। তবে পিছনে একজন লেখক আছেন। তিনিই বিজনকে কথা জুগিয়ে চলেছেন। তথ্য হিসাবে জানি বিজন অসুস্থ। 'গুরুতর অসুখ', 'যে-কোনো মুহূর্তে এর ওষুধ বেরিয়ে যেতে পারে।' ওষুধ আবিষ্কৃত হওয়া পর্যন্ত তার বেঁচে থাকাটা, তাকে বাঁচিয়ে রাখাটাই চিকিৎসা, 'বিজনের ততদিন বেঁচে থাকা দরকার।' অসুখ সূত্রে তাহলে বিজনের শরীর জ্ঞানের একটি শাখা চিকিৎসা বিজ্ঞানের অবজার্ভেশনে রইল। জ্ঞান তার শরীরটাকে পুরো দখল করতে পারল না। সে শুধু ওই শরীরটির টিকে থাকার সহযাত্রী হতে পারে বড়ো জোর।

অতীত, স্মৃতি, মন-মনস্তত্ত্ব, গভীরতা, দার্শনিকতা ইত্যাদির কোনো ঠাঁই তিনি সজ্ঞানে লেখায় রাখেন-ই না। পাঠক হিসাবে আমরা বিমূঢ়। কারণ, এ অসম্ভব। বস্তুময়তা কিছুটা সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে। আর 'অসুখ' একটা স্থায়ী গৎ-এর মতো তাঁর লেখায় বার বার আসবেই। আর যা অনুক্ত, তা নির্ঘাৎ নিরাময়। নিরাময়-ই চাইছি আমরা। মনে হয় সেই আশ্চর্য ওষুধ কোনোদিনই আবিষ্কৃত হবে না। মনুষ্যজন্মই দণ্ডিতের জন্ম। যন্ত্রণায় বিদ্ধ হওয়া তার ললাটলিপি। বিজন বই-পড়া লোক নয়, তার জ্ঞান নেই, এসব সে জানে না, জানতে চায়-ও না। অতি সাধারণ, ভবিষ্যতের পোস্ট-লিটারেট সমাজের এক কুচোও যেন তার মধ্যে আছে।

অসুখটা তা হলে কোথায়? অসুখ, অসুখ তোমার কি শুধুই অসুখ? তা-ও শরীরের?

বোবা ভাষায় ছবি স্পষ্ট হয় না, প্রশ্ন গড়ে ওঠে না। শুধু আভাস। ভাষা ইংগিতেই শেষ। অসুখ তো ডাকঘরের অমলেরও ছিল। সে-ই কি তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন সাজে ফিরে এল? রবীন্দ্রনাথ নিধনে, অস্বীকারে, সচেতন ভাবে ভুলে যাওয়া এবং সরে আসার চেষ্টায় সন্দীপন এই গল্পে তো তাঁকেও শুষে নিচ্ছেন দেখি। একটা ক্রিটিক খাড়া করছেন। অমল এক চিরকালীন শিশু, আমরা সবাই তাই। বিজন তো বটেই, সে এমনকি অপোগণ্ড— তার জ্ঞানটুকুও নেই।

দেহ ও মন, দুয়ে পৃথকভাবে এবং একসঙ্গে আমাদের চিন্তা, অনুভব, বিশ্বাস, অবিশ্বাসকে বার বার বিপন্ন করছে। আত্মতা বলতে বিজন শরীর ছাড়া কিছুই বুঝছে না, অথচ স্মৃতিকে বাদ দিয়ে কী করে সে নিজেকে চেনে। স্মৃতি সূত্রে সংস্কৃতি, ধ্যানধারণা সবই চলে আসার কথা। সন্দীপন সেসব চেঁছে ফেলে দিয়ে, বেঁচে থাকার শক্তি ও সম্ভাবনার ভাঁড়ার শুধু শরীরটাই আঁকড়ে ধরছেন।

এ একটা জবর প্রতিক্রিয়া।

বাঙালি, মধ্যবিত্ত বিশেষ করে, শরীর, যৌনতা এবং যা কিছু দেহজ তাকে গোপন করার, লুকিয়ে ফেলার ও অস্বীকারের পাঠ শেখে দ্বিভাষী হওয়ার আমল থেকেই। আমাদের আধুনিক সাহিত্যও মন, ভাব, আইডিয়া, প্রতিবাদ ও সমাজচিত্রণে ব্যস্ত। এই লিগাসি ঝেড়ে ফেলে সন্দীপন যেন একটি সম্পূর্ণ সাদা প্রেক্ষাপট চাইছেন। যেখানে অতীতের কোনো আঁচড় নেই। সাধারণ নাগরিক একা মানুষকে, ইতিহাসের দায়-

দায়িত্বহীন এক ব্যক্তিকেই চাইছেন, বিচ্ছিন্নতা যার স্বাভাবিক রক্তস্রোত। এরকম একটা টাইপ, নিখুঁত এরকম একজনকে কল্পনা ছাড়া কোনো ভূমিই ধারণ করতে পারে না। বিজন সেই রূপকথা। আমাদের এক দ্রুত অপসৃয়মান, ক্ষণিকের, অন্তর্বর্তী এক ছোটো সময়ের সাহিত্য।

বিজনের চাওয়া-টা লক্ষ করুন :

...'সে যদি বলে, আমি কিছুই চাই না, মানুষের পরিবর্তে একটা কেঁচোর জীবন গ্রহণ করতেও আমি খুব রাজি আছি, কারণ আমি যদিই বেঁচে উঠি, অর্ধজীবিত হয়ে বেঁচে থাকতে আমি চাই না, এর চেয়ে মেরুদণ্ডহীন হলেও কেঁচোর সম্পূর্ণ জীবন আমার কাম্য— এমন কি সে যদি লিখে দেয় ভবিষ্যতে নারী সম্পর্কেও সমস্ত দাবি সে ছেড়ে দিচ্ছে, তাহলেও কি অনির্বচনীয় স্বস্তির মালিক তার শরীর থেকে সব ক'টি বীজাণু তুলে নিতে পারে, পারে না।'[১০]

মনে হতেই পারে একদম বানানো নয়, অন্তর থেকে লেখা এক বন্ধুর চিঠি পড়ছি। পাণ্ডুলিপি পড়তে পেলে হয়তো দেখতাম অক্ষরের কোনও ছাঁদ-ছিরি নেই। যেখানে-সেখানে কালি পড়ছে, বানানের ভুলও হয়তো অসম্ভব নয়।

বাক্যের আরও একটা ধরন দেখুন—

"প্রীতিকর হাসি হেসে স্মিতচক্ষে বেচু তাকাল"।[১১]

'হাসি হেসে' কেউ লেখে! 'প্রীতিকর' শব্দটি আগে বসানোয় তো মনে হতেই পারে এ অত্যন্ত আড়ষ্ট এবং দুর্বল অনুবাদ।

সন্দীপনের ভাষা সম্পর্কে মুখ খুললেই যাঁরা শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে মূর্ছা যান, তাঁরা অন্তত ধরতেই পারেন না, জোরটা আসলে কোথায়?

সন্দীপনের গুণগ্রাহী, সাহিত্য রসিক, ভুয়োদর্শী দীপক মজুমদারই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই ভাষা-লক্ষণ, তার সংকেত ধরতে পেরেছিলেন :

'...এক চরিত্রহীন ভাষা সন্দীপনের; কিন্তু সেই জন্যই স্টাইল এবং অলঙ্করণের প্রতি তার আঘাত, এত কার্যকরী। যতদূর সম্ভব কথ্যভাষার কাছাকাছি অথচ সাংবাদিকতার ব্যভিচার নয়। ভাষা সম্পর্কে, সত্যি বলতে কি কোনো সংস্কার, কোনো অভ্যাসই সন্দীপনের লেখায় নেই। কোনো একটি ভাষার অভাবকেই বারবার অনুভব করা যায় পড়ার সময়...মনে হয় কোনো লোক ভাষা ভুলে যাচ্ছে, যে-কোনো প্রথাসিদ্ধ শব্দের অর্থই সে হারিয়ে ফেলছে...'[১১]

ভাষা প্রসঙ্গে এখুনি ফিরব, তার আগে এই মাত্র যে-কথাটা মনে হল, সেই কথাটা এখানে থাকুক। ছোটোমোটো চাকরি করা, জীবনে বড় স্বপ্ন, বড় আশা কিছু নেই এরকম যে ভিড়, সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন দুর্বল কণ্ঠস্বরে কিছু বলতে চাইছে। ভিড়ের ওই মধ্যবিত্তটির নাগরিক অধিকার আছে, একেবারে গড়পড়তা একজন নাগরিকের ছবি। দ্যা পোর্ট্রেইট অফ সিটিজেন অ্যাজ আ ইয়ং ম্যান।

সংস্কৃতিচেতনাহীন এই ব্যক্তি বাচাল তো বটেই, সব সময় লোক খুঁজছেন কথা

বলার জন্য। তার একমাত্র প্যাশন হল বকবককানি। যার ল্যাজামুড়ো, যুক্তি, শৃঙ্খলা কিছুই নেই। সে জানে না কথা আর কোলাহল এক নয়। জানার দরকারও নেই। কোথায় যেন রয়ে যায় এক সর্বগ্রাসী নিরক্ষরতা। উনিশ শতকে যার শরীরে বর্বরের উল্কি দেগে দেওয়া হয়েছিল তার-ই এক পুনরাগমন যেন-বা। সে তার শরীরটা মেলে ধরছে। শরীর থেকে মুছে ফেলতে চাইছে সংস্কৃতির নানা উল্কি ও পরিচ্ছদ। নগ্ন হতে চাইছে। আর তা আন্তরিকভাবে চাইছে বলেই (আমরা আগেই দেখেছি, সন্দীপনের লেখা এক অর্থে ভয়ঙ্কর রকম লেখক কর্তৃত্বে বিশ্বাসী। কথাটা অবশ্য বলা হয়েছিল অন্যভাবে, সন্দীপন স্বয়ং চরিত্র এবং লেখক। তাঁর ক্ষেত্রে এই রকম আশ্চর্য ঘটনা সম্ভব হওয়ায় লেখার যে বানানো ধর্ম, যে নির্মাণ সেটা অকেজো এখানে। চর্চা অপ্রয়োজনীয়। কৃত্রিমতার স্থান নেই। এ এক আদিমতা, আধুনিকতা যাকে কাজে লাগাচ্ছে।) সাহিত্য-ভাষা থেকে সরে আসাটা তেমন সচেতন প্রয়াস নয়, বরং স্বতঃস্ফূর্ত। ফলে শিশুর ভাষাশিক্ষার ব্যাপারটি, তোতলানো, অপপ্রয়োগ, ভুল, বিকৃতি সহজেই ঘটছে। চর্চার প্রশ্ন পরে, ভাষা এখানে যেন বিজাতীয়, বিদেশি, অনুবাদের গন্ধ, আড়ষ্টতার চিহ্ন এ জন্যই।

বর্ণনা যে এত বস্তুময়, এতখানি ফিজিক্যাল, তথ্য যে এমন খাপছাড়া, অসংলগ্ন, এমন নিঃসম্পর্ক এবং অর্থহীন তারও মূলে সম্ভবত শিশুর নজর, চ্যাপলিন মার্কা মজা

...'হরিকান্তবাবু মোটাগোছের নন, বেশ রোগাই, কিন্তু বিশেষ নড়াচড়া করেন না। হরিকান্তবাবু চুলে কলপ মাখেন, মাথাটা পাকা তালের মতো, লম্বা লম্বা মাথা-ভাঙা কানের ভেতর থেকে ঝুলে রয়েছে কয়েকগাছি চুল, যেন দুটো জামরুল গোঁজা দু-কানে— তাঁর মুখ লাবণ্যময়, চোখ ব্লেড দিয়ে চিরে দেওয়া—- আসলে, কৃতি ও তৃপ্ত মানুষগুলির মুখে যে একটা রগড় আছে, হরিকান্তবাবুকে না দেখলে তা বোঝা যায় না।'[১৩]

আমাদের চোখের সামনে যথেষ্ট ভিজিবল করে তোলা হল লোকটিকে। যেন একজন ভাস্কর দেখিয়ে দেখিয়ে গড়লেন। শিশুর নজর বলে, সম্পর্ক ও সংগতির অভাবজনিত কৌতুকও আছে। তিনি, হরিকান্তবাবু যা নন সে কথা জেনে আমাদের লাভ কী? সে কী শুধু এইটে বোঝানোর জন্য মোটা মানুষের সঙ্গে ওই একটা মিল থাকলেও লোকটা কিন্তু রোগা। লেখকের কাছে আমরা একটু জ্ঞানগম্যি আশা করি। এটা আগে থেকেই স্থির করা আছে। বর্ণনায় অতিকথনের বদলে থাকা চাই সূক্ষ্মতা। বর্ণনা হবে খুব পরিপাটি। নৈর্ব্যক্তিক তো হতেই হবে। আর এখানে যেন কুলগোত্রহীন প্রায় এক অনপড় লেখকের খপ্পরে পড়ে গেছি আমরা। যাঁর কোনো আটক নেই। তোয়াক্কা করেন না নৈর্ব্যক্তিকতার। ভুলভাল যা খুশি লিখবেন তিনি।

আর একটি বাক্য লক্ষ করা যাক :

...'অপ্রত্যাশিতভাবে এলিয়ট থেকে দু-লাইন কোট করল। ভুল, বিজনের না-পড়া থাকলেও সে বুঝতে পারল।'[১৪]

বিজনের এই রকম আশ্চর্য বোঝার সঙ্গে তাল রাখতে না পেরেও বাক্যটি আমাদের মধ্যে অন্তত কৌতুক চালান দিতে পারে। লেখা, লেখার কাজটিতে সন্দীপন তাঁর স্বাধীনতাকে অসম্ভবের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন যেন। যার ভাল লাগে শোন কিংবা পড়। না লাগলে ফেলে দিতেও পার— তাতে সন্দীপনের কিছুই যায় আসে না। কারণ, লেখকের স্বাধীনতা সর্বাগ্রে। যা থাকার পূর্বশর্ত, স্বাধীন পাঠক— যিনি লেখালিখির বাঁধা নিয়ম, ছাঁদ, এথিক্সকে শিরস্ত্রাণ করেননি। বিজনের ঘাড়ে ভর করা সন্দীপন এই অবস্থানটি অনেকদিন-ই ধরে রেখেছিলেন। বছরে একটা উপন্যাস লেখার পর্বে অবশ্য মূর্খকে বেশ সামাজিকই মনে হয়। হয়তো বচনপ্রিয় সন্দীপন অনেক কিছুর মতোই এটাও খেয়াল করে দেখেননি, 'সমাজ-বিরোধী' হওয়ার মধ্যেও নাস্তিকের পুজো একটা থেকেই যায়।

'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য' তাঁর দ্বিতীয় কৃশ গ্রন্থ— যেখানে সন্দীপন তাঁর ভাষা অনেকটাই পেয়ে গেছেন। কবিদের যেমন নিজস্ব ইডিয়ম খুঁজে নিতে হয়, সন্দীপনেরও ছিল সেই প্রয়োজন। অভাষা-বিভাষা এই বইটিতে এসে আমাদের ভাষা প্রবাহের অন্তর্গত হয়েও একটা স্পষ্ট ভিন্নতা গড়ে তুলতে পেরেছে। ন্যারেটিভ স্বল্প পরিসরের। বাক্যগুলি ছোটো-ছোটো শ্বাস যেন। একটা আশ্চর্য প্রত্যক্ষতা, শরীরী হাজিরা ভাষায় টের পাচ্ছি মুদ্রাদোষ সমেত।

...'অমানুষিক শরীর-কাঁদানোর পর চিন্তা থেকে চৈতন্যে পৌঁছে কেউ কেউ প্রফেট হয়, কিন্তু স্টুপিড কত আগে থেকেই সেই আরব্ধ লক্ষ্যে বসে আছে। রেস্তোরাঁর কেবিনে ওয়াইলড উডবাইনের ধোঁয়ার ভেতর থেকে অমূল্যের মুখের মাংস ভেসে আসে।'[১৫]

এই অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যাংশটি 'বিশ্বাস আছে কেবল স্টুপিড ও প্রফেটের' খুব হাততালি পেয়েছিল। পাঠের আসর মাত করা, হাততালি জোটানো বাক্য সন্দীপনের অজস্র। একটি কবিতার কোনো একটি লাইন যদি দলছুট ও মন-কাড়া হয়ে ওঠে এবং মুখে মুখে ফিরতে থাকে, তাহলে কবিতাটির দিক থেকে তা এক মস্ত ক্ষতি বলেও ভাবা যেতে পারে। সন্দীপনের রচনায় এই ক্ষতি যে নেই তা নয়। কিন্তু একটু মনোযোগী হলেই আমরা দেখব জাদুকরের মতো তিনি কীভাবে তা সামলে নেন, ভারসাম্য ফিরিয়ে আনেন। যেমন এখানে ধোঁয়ার ভিতর থেকে মুখ নয় মুখের মাংস ভেসে আসার চিত্রকল্পটি।

আমরা বিজনে ফিরব এবং এই অকিঞ্চিৎকর প্রয়াসে কোথাও তো ছেদ টানতেই হবে বলে লেখাটি একসময় স্তব্ধ হবে। তার আগে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে দু-চার মুহূর্ত যাপন করি।

বইটির ১৫ পৃষ্ঠার একটি বাক্যাংশ, 'সঙ্গম বিনা আমাদের কারুরই আর ঘুম আসে না।' ৩৯ পৃষ্ঠায় 'সঙ্গম বিনা আমাদের কারোরই আর কোনোপ্রকার ঘুম হয় না' কথাটিকে পুনরাবৃত্তি বলতে পারব না শুধু এই কারণে নয় যে বানানের হেরফের এবং দু-একটা শব্দ-বদল ঘটেছে, দ্বিতীয়বার বাক্যটির উদ্দেশ্য পালটে গেছে বলে—'একথা আমি অন্তত একজন মহিলাকে বুঝিয়ে যাব'...।

তবু, শেষ পর্যন্ত, মনে হবেই, যে পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। এর ধারক সম্ভবত অবিশ্বাসী সন্দীপনের আন্তরিকতার প্রতি বিশ্বাস, আস্থা ইত্যাদি। যেমন তিনি নিজের লেখার জন্ম বৃত্তান্ত শোনাতে গিয়ে বলেন, একদিন সত্যি এরকম ঘটেছিল, দেখেছি ইত্যাদি। অর্থাৎ আমি বানাচ্ছি না, কল্পনা করছি না। একেবারে বাস্তব ঘটনা তাকে ভাষার স্বরলিপিতে ধরছি মাত্র। এক করণিকের ভীত, সংশয়দীর্ণ জীবনবৃত্ত কত বড়ো-ই হতে পারে! আবার, যেহেতু তিনি সেই জীবনের গল্পই বলবেন, তা খণ্ডিত, পুনরাবৃত্তিমূলক হতে বাধ্য। সন্দীপন এই অদৃষ্টলিপি এড়াতে পারেননি।

'জল দিয়ে একটা পিঁপড়ের চতুর্দিকে গণ্ডী টেনে দিলে সে যেমন রেখার ধারে ধারে তীরবেগে ঘোরে, থেমে পড়ে, জল শোঁকে ও পালাতে চায়'—[১৬] গোছের বাক্য-ছবি যে কতবার ঘুরে আসে তাঁর লেখায়! কতবার গণ্ডি যে ফাঁস হয়ে গলায় বসে!

'তোৎলামিকে সে প্রায় একটা বাচনভঙ্গিতে এনে দাঁড় করিয়েছে।'[১৭] একথা যখন তিনি লেখেন, তার মধ্যে-ও হয়তো ঘাপটি মেরে থাকে ভাষা বিষয়ে তাঁর একপ্রকার শ্লাঘা। তিনি এমন এক বাচনিকতার দিকে যেতে চাইছেন যা সম্পূর্ণ নিজস্ব। মৌলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী এই লেখকের আসল ব্যায়রামটির নাম যে ক্রমাগত স্ববিরোধ তা বুঝেও অপেক্ষা করতে হয়েছে পরের লেখাটির জন্য। আর লেখার কাজ তার প্রক্রিয়া সন্দীপনকে ক্রমে মাসম্যান থেকে আলাদা করেছে, আইডেনটিটি গড়ে উঠতে থাকে, লেখক সন্দীপন জ্ঞানবৃক্ষের ফলের দিকেও হাত বাড়িয়েছেন। নাশকতার, অন্তর্ঘাতের চিহ্নগুলো পড়ে রইল মাত্র।

বিজন রেণুর কাছে যাবে, যে মহিলা নয়, নারীও নয় যেন, যে বেশ্যা, যার সামনে সময় স্তব্ধ। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত এই বইটির আমলে কলকাতায় যৌনতা, হিংসা, পুরুষ-তান্ত্রিকতা সম্পর্কে তেমন কোনো চর্চা-ই বা কোথায়! বরং শ্রেণি সম্পর্কে একটা স্থায়ী ও চূড়ান্ত মনোভাব থেকে সংঘর্ষের দিকে যাওয়াটাই বড় কথা তখন। এই সাংস্কৃতিক আবহাওয়া, সভ্যতা, মানবতা ও জ্ঞানচর্চা সম্পর্কে আনাড়ির মতো হলেও প্রথম গুটিকয় ঢিল ছোঁড়ার এবং শার্সিতে ফাটল রচনার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব সন্দীপনের প্রাপ্য। শুধু এখানে একটা কথা আবার স্মরণ করতে হবে, সন্দীপনের লেখাতেও যৌনতাকে পুরুষের চোখেই দেখা হয়েছে, যৌনতার সঙ্গে হিংসার যোগটাও যেন ন্যায্য না হলেও একটা মান্যতা পেয়ে যাচ্ছে। মানবতাবাদকে আক্রমণের সময়-ও পুরুষতান্ত্রিক প্রবল ঝোঁক ও আধিপত্যবাদ সন্দীপনের তেমন নজরে পড়ে না। যদিও লেখার প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা, নিজেকে গুছিয়ে নেওয়া সন্দীপন তাঁর পরের দিকের লেখায় কোনো-না-কোনোভাবে এদের জায়গা করে দিয়েছেন। সম্ভবত, পলিটিক্যালি কারেক্ট থাকার একটা চাপেই।

বাস্তবের জন্য তিনি কাণাকড়ি দাম ধার্য করেছিলেন। সেখান থেকে নিজেকে উৎপাটিত করে নিজেরই গভীরে ডুবতে চান। সমষ্টির স্বপ্ন ও আদর্শের ছকগুলি ঘৃণ্য তাঁর কাছে।

কিন্তু ইতিহাস ও ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্ক অধ্যয়ন দূরস্থান, তিনি যেন একে নজর-ও করতে চান না তাঁর লেখালিখির সবচেয়ে শক্তিশালী প্রথম পর্বটিতে।

ডস্টয়েভস্কি, বিশেষ করে 'নোটস ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড' এর লেখক একটা প্রতর্ক খাড়া করেছিলেন। পশ্চিমের সাহিত্য থেকেও তো জন্ম নিতে পারে আমাদের সাহিত্য, এমন ঘোষণা যাঁর, জানতে ইচ্ছে করে, ডস্টয়েভস্কির এই বইটি পাঠের অভিজ্ঞতা তাঁর কেমন। সমসাময়িক লেখকদের সম্পর্কে বাঙালি লেখকরা খুলে কথা বলেন না, লেখেন না, তার পিছনে নানা হিসেব থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের লেখকদের পাঠ-অভিজ্ঞতার বিবরণটাই যে কেন এত দুর্লভ বুঝে উঠতে পারি না। সন্দীপন-ও এসব ব্যাপার মন্তব্যেই সারেন সর্বদা।

বিজন রেণুর কাছে এসেছিল সুদে-আসলে উসুল করবে বলে, যৌন খিদে মেটাতে। রেণুর পরনে শুধু শায়া। ব্লাউজের নিচের বোতাম খোলা। 'স্তনের বোঁটায় শ্বেতঅশ্রুর মতো জমাট দুধ'। এলোচুল। সিকনি আর চোখের জলে মাখামাখি চৌকোগোছের মুখ ইত্যাদি, ইত্যাদি রেণুর বর্ণনা। যে গলাকাটা ছাগলের মুণ্ডুটার মতো ছটফট করছে। রেণু তাহলে এক অসহায়, আক্রান্ত জন্তু। আশ্চর্যের কথা এই জন্তুর শরীরের মধ্য থেকেই আর্তস্বরে নৈতিকতার প্রশ্নটি একরকম ভাবে সামনে চলে এল। তার প্রশ্ন : আমি কি চোর?

চোর অপবাদ ও অভিযোগে সে নির্যাতিত হয়েছে, তাকে হাজতে রাখা হয়েছিল পর্যন্ত। অর্থাৎ দণ্ড যা পাবার সে পেয়েছে। তবু এই মাতাল বেশ্যাটি (যৌনকর্মী এই নতুন পরিচয় তখন ছিল না) চোরের পরিচয় নিয়ে বাঁচতে চাইছে না, সব কিছু খুইয়ে-ও তার আচরণ যেজন্য উন্মাদের মতো। সে হিস্টেরিক। রেণু তার ভুল পরিচয় মুছে ফেলতে সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। বিজন সর্বস্ব হারাতে রাজি শুধু সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকার জন্য। যা, সে আগেই বলেছে, কেঁচোর সম্পূর্ণ জীবন। সত্তা, আত্মপরিচয় এমনকী অমন যে ভয়ের চড়া নেশা তথা মৃত্যু সব কিছুই ভুলতে সে রাজি। এই ভাবে ইতিহাসের বাইরে মানব-কীট হয়ে বাঁচাটাও তার কাছে যেন এক অশেষ প্রাপ্তি। বিজনের তো স্মৃতিলোপও ঘটেছে। শামুকের খোলার মধ্যে সে আবারও ঢুকে পড়ে। রেণুর আঙুলে মরা মাংস, রেণুর বুকে কাকাতুয়ার নোখের মতো কর্কশ, কর্কশ ও বাঁকা, ভয়ঙ্কর কয়েকগাছি চুল সে দেখতে পেল। রাক্ষসীর ওষ্ঠহীন হাসি দেখল। প্যারানয়েড সে। তার দৃষ্টি যেন এক ঢেউ খেলানো আরশি। তা হলে বিজনের অসুখের অধিষ্ঠান কোথায়? বিজন এমনকী তার নিজের গলায় একটা বেল্টও দেখতে পায়।

এতখানি নির্মমতা সত্ত্বেও, এত সব ভাঙচুরের পরেও বিজন এক বাবু-ই বটে। এই বাবুটির হাত থেকে মুক্তি না পেলে বাঙালি পুরুষ বাঁচতেই পারবে না। দণ্ড তো দু-জনেরই। বিজনের অসুখ আর রেণুর চোর অপবাদ। সমান্তরাল দুটি গল্প যেন। তারা হাত ধরাধরি করে নাচতে পারত। বিজনের অস্তিবাদী ঝোঁক, রেণুকে প্রান্তে ঠেলে দেয় এবং তাকে চূড়ান্ত অপমানটি করে। যৌন-শ্রম না কিনেই রেণুর মজুরি সে দিয়ে দেয়।

বিষণ্ণ মাদকতায় আচ্ছন্ন এক মিথ্যেই মৃত্যুর জপমালা হয়ে আছে। এই মৃত্যুর হাত থেকে কে-বা বাঁচায় তাকে? বিজনকে এবং সন্দীপনকে। অ্যাবসার্ড!

উল্লেখপঞ্জি

১. দাহপত্র, দীপক মজুমদার সংখ্যা,
২. 'একজন সন্দীপন', মিনিবুক ১,
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭।
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।
৫. অদ্রীশ বিশ্বাস ও প্রবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে দুটো-একটা কথা যা আমরা জানি', ভূমিকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫।
৬. সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী', প্রতিভাস, ২০০৩।
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।
১১. পূর্বোক্ত।
১২. দাহপত্র, দীপক মজুমদার সংখ্যা, ২০০২, পৃ. ১১৩।
১৩. সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী', প্রতিভাস, ২০০৩, পৃ. ১৬।
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।
১৫. সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য', প্রতিভাস, ২০০৩, পৃ. ১৩।
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬।

কবি বিদ্যাপতির সঙ্গীতচিন্তা

রাজ্যেশ্বর মিত্র

বিদ্যাপতি মিথিলার কবি; কিন্তু তিনি তাঁর জীবিতকাল থেকেই বাংলার জনমানসে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা যাকে মহাজনপদ বলে জানি তার স্থাপয়িতা ছিলেন বিদ্যাপতি। তাঁর প্রভাব থেকেই বিরাট পদাবলী সাহিত্য গড়ে উঠেছে আমাদের দেশে। এখানকার আদি বৈষ্ণব সম্প্রদায়, যাঁরা শ্রীচৈতন্যের অনুগামী ছিলেন, তাঁরা এই পদাবলীকে অবলম্বন করেই কীর্তনগানের সূচনা করেন। আদি কীর্তনে বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদই প্রধানত প্রযুক্ত হয়েছে এবং সেই কারণেই এর আখ্যা হয়েছে পদাবলী-কীর্তন। কিন্তু কীর্তনগানে বিদ্যাপতিকে আমরা যেরূপে পাই তা তাঁর স্বকীয় ধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। খের্তরির মহোৎসবে ঠাকুর নরোত্তম দত্ত পদাবলী কীর্তনের যে গায়ন-পদ্ধতির প্রচলন করলেন তা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। এর সুর এবং গায়নপ্রণালী মিথিলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির গান থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—এই সঙ্গীতশৈলী একান্তভাবেই কীর্তনীয়াদের উদ্ভাবিত বাঙালি ধারা। বৈঠকী কীর্তনে খুব বড়ো বড়ো দুরূহতালে এই পদাবলী গাওয়া হয়, অথচ রাগসঙ্গীত যে সুচারুভাবে অবলম্বন করা হয় এমন কথা বলা যাবে না। এইসব তালের কোনোটাই বিদ্যাপতির অনুমোদিত ছিল না, কারণ তিনি মার্গতালের, এমনকি দেশি তালের বাঁধাবাঁধিও পছন্দ করেননি। তিনি অকুতোভয়ে বলেছিলেন যে, প্রচলিত তালের রীতিপদ্ধতি মেনে চলতে তিনি আদৌ রাজি নন। তিনি তাঁর গানকে বিন্যাস করেছিলেন ছন্দ অনুসারে; সে ছন্দ কবিতার ছন্দ, — তাতে বারবার সমে এসে পড়াটা আবশ্যিক ছিল না। তাঁর গানে যদি তিনি ভৈরবী সুর আরোপ করতেন তাহলে কবিতা অনুসারে তার যে ছন্দ প্রযুক্ত হত তাকেও তিনি বলতেন ভৈরবী তাল। অপর সুরের গানে যদি একই ছন্দের কবিতা ব্যবহৃত হয় তাহলে সেই ছন্দটি উক্ত সুরের নামেই পরিচিত হত। অর্থাৎ, তাঁর গানে সুর এবং ছন্দ একই আখ্যায় প্রচারিত হত। তাল বলে একটা জিনিস, যা নিয়ে ওস্তাদ মহলে মাথাখোঁড়াখুড়ির অবধি নেই, তাকে তিনি আমলই দিতেন না; কাব্য এবং তার আবেদন, — এই দু-টি জিনিসই ছিল তাঁর কাছে প্রধান। এছাড়া, তিনি তাঁর গানে তিনটি লয় অবলম্বন করতেন, — সত্বর, মধ্য এবং বিলম্বিত। প্রয়োজন অনুসারে একই গানে সুবিধামত তিনটি লয়ই প্রযুক্ত হত, কখনো দু-টি, আবার ক্ষেত্র বিশেষে একটি লয়েই গানটি করা হত। এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে বহু শতাব্দী পরের গীতকার রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। তাঁর 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধে তিনি যে বিষয়টি

উত্থাপন করেছেন সেটিও হচ্ছে এই সমস্যা নিয়েই, অর্থাৎ গানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত তাল প্রয়োগ করাটা আবশ্যিক কিনা। তাঁর যুক্তি এবং বিদ্যাপতির যুক্তির মধ্যে প্রভেদ ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে এই চিন্তার জন্য স্বকীয়তার কৃতিত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং বিদ্যাপতি যে অনুরূপ চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন সেকথা আমাদের সুধীসমাজে অজ্ঞাত বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যাপতিও হাতেকলমে গান রচনা করে সেই ছন্দ অনুসারে গেয়ে তাঁর যুক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এর প্রমাণ রয়েছে মৈথিলী এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'রাগতরঙ্গিণী' নামক গ্রন্থে। গ্রন্থকার একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন; তাঁর নাম লোচন ঝা। গ্রন্থটি রচিত হয় আনুমানিক ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে। এই গ্রন্থটি যে বাংলায় অজানা ছিল এমন নয়; বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রন্থটির পুথি দেখেও ছিলেন (যখন এটি ভালোভাবে ছেপে বেরোয়নি)। পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনও এই বইটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু প্রধানত বইটি দেখা হয়েছে বিদ্যাপতির পদসমূহ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, যদিচ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাপতির অনেক পদই আমাদের পদাবলী-সঙ্কলনগুলির মধ্যে নেই; এমনকি 'রাগতরঙ্গিণী'তে প্রদত্ত অপরাপর বহু প্রখ্যাত পদাবলীও এদেশের কোনো সংগ্রহ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কোন্ 'রাগতরঙ্গিণী' সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন (গীতবিতান বার্ষিকী, মাঘ ১৩৫০) বোঝা শক্ত কারণ যথার্থ 'রাগতরঙ্গিণীর' সঙ্গে তাঁর বর্ণনার মধ্যে বহুলাংশে মিল নেই। তিনি বলছেন লোচন বল্লালসেনের সময়ে ছিলেন, কিন্তু আসলে তিনি অনেক পরবর্তীকালের লোক এবং বাঙালিও নন। লোচন প্রণীত 'রাগতরঙ্গিণীর' একটি corrupt এবং অনির্ভরযোগ্য পুথি পুনা থেকে প্রকাশিত হয়ে প্রচুর গোলমালের সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে পণ্ডিত বলদেব মিশ্র দারভাঙ্গা রাজ প্রেস থেকে এই গ্রন্থটি সুসম্পাদিত করে প্রকাশ করেন। আমাদের সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেউ কেউ যে গ্রন্থটির খবর রাখেননি এমন নয়, কিন্তু তাঁদের কেউই এ পর্যন্ত গ্রন্থটির মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করেননি, করলে অনেক উল্লেখযোগ্য সূত্র পাওয়া যেত। ফলে এই গ্রন্থটি আজ পর্যন্ত অনাদৃত রয়েছে এবং মিথিলায় যে একদা একটি ওরিজিনাল সঙ্গীতচিন্তা গড়ে উঠেছিল যা এই বঙ্গভূমিকেও প্রভাবিত করেছিল সেই সংবাদটি বিদগ্ধসমাজের অগোচরেই থেকে গেছে। বিদ্যাপতি যে রবীন্দ্রনাথের বহুপূর্বেই তাঁর 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধের মূল যুক্তিটি অনুভব করেছিলেন এবং সমগ্র মিথিলা ও তৎসন্নিহিত দেশে উপস্থাপিত করেছিলেন সেই ব্যাপারটিও অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থটি মৈথিলী এবং সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই লেখা। প্রধানত থিওরির অংশগুলি সংস্কৃতে লেখা কিন্তু উদাহরণ সবই মৈথিলীতে। বিদ্যাপতি ব্যতীত আরও বহু মৈথিল পদকর্তার রচনা এই গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে। এমন মৈথিলী শব্দ এইসব গানে আছে, যেগুলির অর্থোদ্ধারে বেগ পেতে হয়, কারণ বাংলা পদাবলী সংগ্রহের মধ্যে

এইরকম শব্দ দুর্লভ। গ্রন্থারম্ভে লোচন ঝা প্রসঙ্গক্রমে মিথিলার রাজন্যবর্গের যৎসামান্য উল্লেখ প্রদান করেছেন। তিনি ভানু নামক একজন তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রাজার নাম করেছেন। তারপর স্বনামধন্য কীর্তিমান রাজা ছিলেন মহেশ ঠাকুর (১৫৫৬-১৫৬৯)। তাঁর পুত্র শুভঙ্করও রাজা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই শুভঙ্কর কিন্তু প্রসিদ্ধ সঙ্গীতগ্রন্থ 'সঙ্গীত দামোদর' রচনা করেননি। তিনি ছিলেন বাংলার লাহিড়ীবংশীয় জনৈক শুভঙ্কর। উক্ত রাজার বহু পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ সুন্দর ঠাকুর (১৬৪১—১৬৬৮) তাঁদের কীর্তিধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তাঁর পুত্র মহীনাথ ঠাকুর (১৬৭১—১৬৯৩) বীর শাসকরূপে পরিচিত ছিলেন। মহীনাথ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরপতিকে রাজ্য প্রদান করেন। নরপতি ঠাকুর (১৬৯৩—১৭০৩/০৪) মিথিলার দেশীয় সঙ্গীতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। লোচন এঁকে 'ধুনিগান সিন্ধু' বলেছে। যাকে আমরা আজকাল 'ধুন' বলে থাকি, তাকেই 'ধুনিগান' বলা হয়েছে। এই শব্দে মিথিলায় প্রচলিত বিশেষ প্রকারের গানকে বোঝাচ্ছে। এঁরই আজ্ঞানুসারে লোচন শর্মা 'রাগতরঙ্গিণী' নামক গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এ সম্বন্ধে লোচন বলছেন :

তস্য শ্রীনৃপসুন্দরাত্মজ মহীনাথানুজস্যাজ্ঞয়া, বিপ্রঃ
কোঽপি সুবংশজো নরপতেঃ কীর্তিস্তনোতি প্রিয়াম।
কিঞ্চিৎ সমাহৃত্য কুতশ্চিদন্যৎ
স্বয়ঞ্চ সম্পাদ্য পদপ্রবন্ধম্।
বিতন্যতে লোচন নামধেয়—
দ্বিজেন সা রাগতরঙ্গিণীয়ম্।।

উপরের উদ্ধৃতি থেকে 'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থটি কীভাবে প্রস্তুত হয়েছে সেটি বোঝা যাবে। লোচন গ্রন্থে প্রদত্ত বিষয়বস্তুর কিছু সংগ্রহ করেছিলেন, কোনো কোনো অংশ অন্য উপায়ে আহরণ করেছিলেন, নিজেও বহু পদ বা প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ গ্রন্থটি প্রধানত একটি সংকলন, যদিচ তাঁর স্বরচিত পদাবলীতে সমৃদ্ধ। লোচন যদি গ্রন্থটি নরপতি ঠাকুরের আদেশক্রমে সম্পাদনা করে থাকেন তাহলে তিনি রাজা হবার আগেই এই অনুরোধটি তাঁর কাছে এসেছিল। নরপতি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ হওয়াতে বহু পূর্ব থেকেই তিনি রাজসভায় সম্পাদিত সঙ্গীতাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। লোচন ঝার বংশ আজও বিদ্যমান আছে বলে জানা যায়। তিনি শ্রোত্রীয় মৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর পিতার নাম বাবু ঝা। পণ্ডিত বলদেব মিশ্র তৎসম্পাদিত 'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থের ভূমিকায় এই বংশাবলীর উল্লেখ করেছেন। লোচন প্রধান ছয়টি রাগের মূর্তি-লক্ষণ বর্ণনা দিয়ে গ্রন্থের সূত্রপাত করেছেন। রাগরাগিণীর এই রূপকল্পগুলি মধ্যযুগে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। প্রতিটি রাগ এবং রাগিণীর একটি রূপ পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং এই রূপগুলিকে অবলম্বন করে মোগল এবং রাজপুত মিনিয়েচার পেইনটিং পাওয়া যায়। আজও এসব চিত্রের

কপি অ্যালবামে দেশ-বিদেশে শিল্প সংগ্রহ হিসাবে বিক্রি হয়। মূলত এই বর্ণনাগুলি সংস্কৃতে রচিত হয়েছিল; পরে এইগুলি বিভিন্ন দেশভাষায় অনূদিত হয়। লোচন বর্ণনাগুলি প্রধানতঃ 'সঙ্গীতদর্পণ' বা 'সঙ্গীত-দামোদর' থেকে সংগ্রহ করে মৈথিলী কাব্যে রূপদান করেন। তিনি বলছেন— ইদন্তু সকললোকসাধারণ ঝটিত্যুদ্বোধহেতু মধ্যদেশভাষামাশ্রিত্যাপি লিখত (অর্থাৎ, এই মূর্তিলক্ষণকে সমস্ত লোকসাধারণের তাড়াতাড়ি বোঝবার জন্য মধ্যদেশভাষাকে আশ্রয় করে লেখা হয়েছে)। এই 'মধ্যদেশভাষা' বলতে কোন্ ভাষাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটিও জানা আবশ্যক। এটি আসলে ভোজপুরী ভাষা। সমগ্র চম্পারন জেলাটি এক সময় ছিল মিথিলার কেন্দ্রস্থল। এখানকার ভাষাকেই মধেশী বা মধ্যদেশীয় ভাষা বলা হয়। এটি ভোজপুরী আখ্যায় সাধারণ্যে প্রচলিত। অন্য গ্রন্থেও মধ্যদেশীয় ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে কিন্তু ব্রজভাষার ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থেও ব্রজভাষার নিদর্শন অল্প নয়।

মূর্তিনিরূপণ করবার পর লোচন গীতের প্রসঙ্গে এসেছেন। তিনি মিথিলায় প্রচলিত গীতের বর্ণনাতেই প্রধানত আত্মনিয়োগ করেছেন। এই কাজটি সমসাময়িক অপর অনেক শাস্ত্রকারই করেননি; যদি করতেন, তাহলে বহু দেশজ গীতের ইতিবৃত্ত বা বিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যেত। অতএব, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ; এটি করে তিনি যে শুধু তাঁর জনপদে প্রচলিত গানের আকৃতি প্রকৃতি আমাদের গোচরে এনেছেন তাই নয়, সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গীতিকবি বিদ্যাপতির একটি গভীর সঙ্গীতচিন্তাকে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। এই ধারাটিকে বলা হয়েছে মিথিলার 'গীতগতি'। লোচন বলছেন— 'গীতগতয়ঃ দেশ্যশ্চ তদ্রাগাশ্রিতাস্তাস্তত্তদ্দেশগীতগতয়ঃ।' এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, দেশে দেশে যেসব দেশজ গীত প্রচলিত আছে সেগুলি উক্ত দেশসমূহে প্রচলিত বিভিন্ন রাগকে আশ্রয় করে অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত গানের রীতিনীতি সর্বভারতে প্রচলিত রাগসঙ্গীতের মতো একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করে চলে না, সেগুলি দেশের রুচি অনুযায়ী নিজেদের নিয়মে পরিচালিত হয়, তাদের গতিপন্থা তাদের দেশের প্রচলন অনুসারে নির্দিষ্ট হয়। এই কারণেই একে 'গীতগতি' বলা হয়েছে এবং মিথিলায় যে-দেশজ প্রথায় গীত নির্ধারিত হয়েছে তার আখ্যা দেওয়া হয়েছে—'মিথিলার গীতগতি'। ঠিক এই পদ্ধতিতেই বাংলার গীতগতি বা মহারাষ্ট্রের গীতগতিও নির্ণয় করা যেতে পারত। এইখানে আমাদের মিথিলা বলতে কোন্ অঞ্চলকে বোঝায় সেটা উপলব্ধি করা আবশ্যক। মৈথিলী ভাষাভাষীরা যে-অঞ্চলকে তাঁদের ভাষাদ্বারা বিধৃত বলে মনে করেন, সেটা হচ্ছে পুরো দারভাঙ্গা এবং ভাগলপুর; এ ছাড়া মুজাফ্ফরপুর,পাটনা, মুঙ্গের এবং পুর্ণিয়ার কিয়দঞ্চলও মিথিলার অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। তবে মৈথিলী ভাষার ব্যাপ্তি সমগ্র বিহারে অনেকখানি জুড়ে আছে বলেই মৈথিলীদের বিশ্বাস। উদাহরণস্বরূপ গয়া, হাজারিবাগ, পালামৌ প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ করা যায়।

লোচন ব্যাপকভাবে মিথিলার গীতগতি সম্বন্ধে বর্ণনা প্রদান করেছেন বলেই মার্গসঙ্গীতের প্রণালী নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হননি; কেবলমাত্র পূর্বভাগে কতিপয় প্রধান রাগরাগিণীর রূপবর্ণনা এবং মূর্তিনিরূপণ করেছেন। গ্রন্থশেষে অবশ্য আরও কিছু রাগগায়নের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। পূর্বে যে-গীতগতির কথা বলা হয়েছে তা মার্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল,—তাকে লোচনের ভাষায় বলা যেতে পারত গান্ধর্বগীতগতি। কেননা গান্ধর্বগীত মার্গসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। লোচন সামগ্রিকভাবে রাগ-সঙ্গীতসংগ্রহের একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; তার নাম—'রাগসঙ্গীত সংগ্রহ'। এই গ্রন্থটি এ পর্যন্ত উদ্ধার করা গেছে বলে খবর পাইনি। দেশজ গীতগতির মধ্যে আবার যেটি 'সুদেশীয়' তাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। লোচন বলেছেন,—'দেশ্যামপি সুদেশীয়ত্বাৎ প্রথমং মিথিলাপভ্রংশ ভাষয়া শ্রীবিদ্যাপতি কবিনিবদ্ধাস্তাস্তা মৈথিলগীতগতয়ঃ প্রদর্শ্যন্তে।' মিথিলা তৎকালে ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি প্রখ্যাত বিদগ্ধ দেশ বলে পরিচিত ছিল। বিশেষ করে বাংলার শিক্ষিতজন বিদ্যাচর্চার জন্য সর্বদাই মিথিলায় যাতায়াত করতেন। মিথিলার সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল বলেই বিদ্যাপতি তাঁর জীবিতকালেই এতদ্দেশে পরিচিতি এবং স্বীকৃতি লাভ করেন। বিশ্বম্ভর মিত্র (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) পদাবলী সঙ্গীতকে বিশেষ গৌরবপ্রদান করবার ফলে বিদ্যাপতির পদ আমাদের পদাবলীকীর্তনে প্রধান স্থান অধিকার করে। কিন্তু এদেশের পদাবলী কীর্তনীয়ারা বিদ্যাপতির গানকে নিজেদের মতো করে নিজেদের উদ্ভাবিত তালে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। একেও হয়তো বাংলার গীতগতি বললে অত্যুক্তি হয় না। যাই হোক, বলেছি যে ওই মৈথিলী ভাষাকে সুদেশীয় ভাষা বলা হয়েছে, তার কারণ উক্ত ভাষায় বিদ্যাপতির সময় থেকেই গদ্য-পদ্য রচিত হয়ে আসছে এবং লোচনের সময় লিরিকের দিক থেকে এই ভাষা রীতিমতো সমৃদ্ধ ছিল। এই সুদেশীয় ভাষাটি কী জাতীয় ছিল, সেটি নির্দিষ্ট করবার জন্য বলা হয়েছে—'মিথিলাপভ্রংশভাষয়া শ্রীবিদ্যাপতি কবিনিবদ্ধাস্তাস্তা মৈথিল গীতগতয়ঃ প্রদর্শ্যন্তে।" বিদ্যাপতি অপভ্রংশ ভাষায় রচনা করে গেছেন। আমাদের শাস্ত্রে তিন প্রকার ভাষার স্বীকার করা হয়েছে : সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ। সংস্কৃতকে দেবভাষা বলা হয়েছে, প্রাকৃত তার থেকে উদ্ভূত বলে তাকে বলা হয়েছে তদ্ভব। আর যে ভাষা প্রাকৃত অপেক্ষা বিকৃত তাকে বলা হয়েছে অপভ্রষ্ট বা অপভ্রংশ। এই অপভ্রষ্টই মিথিলার 'অবহট্ঠ' বলে প্রচারিত হয়ে এসেছে। বিদ্যাপতি নিজেই 'কীর্তিলতা' নামক গ্রন্থে অবহট্ঠের নিদর্শন রেখে গেছেন। কিন্তু লোচন 'মিথিলাপভ্রংশ' শব্দটি ব্যবহার করে মিথিলার দেশজ মৈথিল ভাষার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন, অর্থাৎ মৈথিলভাষা মাত্রেই অপভ্রংশ বলে চিহ্নিত হবে না। বিদ্যাপতিপ্রযুক্ত অবহট্ঠ মৈথিলী অপেক্ষা আরও একটু কৃত্রিম এবং ভিন্নতাসম্পন্ন, একথা বলাই তাঁর উদ্দেশ্য। এই কারণেই তিনি তাঁর গ্রন্থে বহু পদকর্তার গান সন্নিবেশ করেছেন যা থেকে মৈথিলভাষার বহু স্বকীয় নিদর্শনও চোখে পড়ে; শুধু

তাই নয়, ব্রজভাষা এবং হিন্দিরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এর উল্লেখ পূর্বেই করেছি।

বিদ্যাপতিই এই গ্রন্থে গুরুত্বলাভ করেছেন, এই কারণে গ্রন্থসম্বন্ধীয় অপরাপর আলোচনার পূর্বে তাঁর সম্বন্ধে কিছু পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। বিদ্যাপতির সঠিক জন্মতারিখ বোধ করি জানা যায় না; অনুমান করা হয় যে তিনি ১৩৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'গর্হবিসফি' নামক স্থানের অধিবাসী একটি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই তিনি রাজসভায় যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন এবং একজন সভাসদরূপে পরিগণিত হন। মহারাজ কীর্তিসিংহের সভায় তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং এই সময় তিনি 'কীর্তিলতা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন (১৪০২-৫ খ্রি)। এই গ্রন্থটি অবহট্ট ভাষায় রচিত। কীর্তিসিংহের মৃত্যুর পর তিনি মহারাজ দেবসিংহের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর পৌত্র স্বনামধন্য মহারাজ শিবসিংহ রাজ্যলাভ করেন ১৪১২-১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এঁর সঙ্গে পূর্ব থেকেই বিদ্যাপতির সখ্য ছিল সুগভীর। শোনা যায় অভিষেকের সময় শিবসিংহের বয়স ছিল ৫১ বৎসর এবং বিদ্যাপতি তাঁর চেয়ে দুবছরের বড় ছিলেন। শিবসিংহের পত্নী মহাদেবী লখিমার সঙ্গে বিদ্যাপতির অন্তরঙ্গতা নিয়ে বহু কাহিনি প্রচলিত আছে। রাজা এবং রানী উভয়েই কবির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। শিবসিংহের প্রশস্তিস্বরূপ তিনি মৈথিলী অবহট্টে 'কীর্তিপতাকা' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময় তিনি 'পুরুষপরীক্ষা' নামক সংস্কৃত গল্পসংগ্রহটিও সমাপ্ত করেন। তবে এযুগে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বিপুল সংখ্যক মৈথিলপদ রচনা। তাঁর এই সব গানের কয়েকটি 'গোরক্ষবিজয়' নামক সংস্কৃত নাটকে সন্নিবেশিত হয়। এই নাটকটিও মহারাজ শিবসিংহের অনুরোধক্রমেই রচিত হয়। এর সংলাপ অংশ সংস্কৃতে হলেও গানগুলি কিন্তু মৈথিলীতেই রাখা হয়েছিল। শিবসিংহ মুসলমানদের আক্রমণে পরাজিত হবার পর মহাদেবী লখিমা নেপালের রাজাবনৌলী নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বারো বৎসর সেখানে বাস করেছিলেন। কবিও সেখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এখানে তিনি 'লিখনাবলী' নামে পত্ররচনাসম্পর্কিত একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই সময়টা তিনি অপেক্ষাকৃত অবসররূপে যাপন করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থটি হাতে লিখে কপি করতে আরম্ভ করেন। তাঁর হস্তলিখিত এই পুঁথিটি নাকি দারভাঙ্গা রাজ লাইব্রেরিতে রক্ষিত ছিল; সম্ভবত আজও সেটি বর্তমান আছে। কী উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে এই কাজে নিয়োজিত করেছিলেন সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করেন : কেউ কেউ বলেন এটি পুণ্যকর্ম হিসাবেই করা হয়েছিল। মহাদেবী লখিমার মৃত্যুর পর কবি মহারাজ পদ্মসিংহের সভায় যোগদান করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রানী বিশ্বাদেবীর অনুরোধে তিনি 'গঙ্গাবাক্যাবলী' রচনা করেন। শৈবপূজা সম্পর্কে 'শৈবসর্বস্বসার' নামক একটি পুস্তকও তিনি রচনা করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্মৃতি বিষয়ক 'বিভাগসার' নামক একটি নিবন্ধে তিনি উত্তরাধিকার ও বিষয়বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা

করেছিলেন। এইটি তিনি রাজা হরিসিংহদেবের (১৪৩৩ খ্রি) আশ্রয়ে আসবার পর হাতে নিয়েছিলেন। এঁরই পত্নী রানী ধীরমতির অনুরোধে তিনি দান সম্পর্কিত বিবিধ প্রণালী নিয়ে 'দানবাক্যাবলী' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। শেষভাগে তিনি রাজা বীরসিংহ (১৪৪০-১৪৪৬) এবং তাঁর পরবর্তী রাজা ভৈরবসিংহের সভায় অবস্থান করেছিলেন। ভৈরবসিংহের সময়েই তিনি 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' রচনা করেছিলেন। এগুলি ছাড়া তিনি তীর্থভ্রমণ সম্পর্কিত 'ভূপরিক্রমা' এবং গয়াকৃত্যসংক্রান্ত 'গয়াপট্টলক' নামক দুটি পুস্তক রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর দুটি বিবাহ ছিল। প্রথম বিবাহে তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে হরপতি ঠাকুর পণ্ডিত এবং কবিরূপে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর স্ত্রী চন্দ্রকলাও কবি ছিলেন। তাঁর একটি পদ 'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে; তা থেকে জানা যায় তিনি বিশেষভাবে জয়দেবের অনুসরণ করতেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের নাম নরপতি ঠাকুর। বাচস্পতি ঠাকুর তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের সন্তান এবং একটি কন্যাও তাঁর ছিল; নাম— দুল্লহি। তাঁর জীবিতকালেই তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় পৃষ্ঠপোষকগণের মৃত্যু হয়; এঁদের মধ্যে নিঃসংশয়েই মহারাজ শিবসিংহ তাঁর সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিলেন। মহাদেবী লখিমার মৃত্যুর পরেও বহু বৎসর তিনি বহু সঙ্গীত রচনা করে গেছেন, কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যে বিদ্যাপতি যে প্রেরণালাভ করেছিলেন, তা আর তাঁর জীবনে কেউ দিতে পারেননি। শিবসিংহ গত হবার বত্রিশ বৎসর পরে একদিন কবি তাঁকে স্বপ্নে দেখেন এবং তখনই তাঁর মনে হয় তাঁর মৃত্যু আসন্ন। এর কয়েক মাস পরে সুপরিণত বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুকাল আনুমানিক ১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দ।

বিদ্যাপতির জীবনবৃত্তান্ত থেকে জানা যায় তিনি বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। অনেকে বলেন তিনি শৈব ছিলেন; কিন্তু বৈষ্ণব কবিতাই তাঁর জীবনের সর্বোত্তম কীর্তি। তাঁর কাব্যে ভক্তিরস অবশ্যই আছে; কিন্তু যেটা মুখ্য সেটা হচ্ছে মানবিক প্রেম, যে প্রেম দেহকে অস্বীকার করে না অথচ দেহের মিলনেই তার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা বলেও সমর্থন করে না। দেহ এবং অন্তর— এই দুটির অপূর্ব সমন্বয় তিনিই করেছিলেন এবং পরবর্তী কবিরা তারই অনুসরণ করে গেছেন।

আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরি। 'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য এবং ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে লোচন একটি বিবরণ প্রদান করেছেন। ভবভূতি নামক একজন সুবংশোদ্ভূত পণ্ডিত রাজা ছিলেন। তিনি প্রতিভাবলে প্রচলিত কাব্যগুলিকে পুরাণের রূপ প্রদান করেন। তৎকালীন কাব্যগুলিতে প্রধানত রাজরাজড়ার উপাখ্যান থাকত। এঁদের সেই কাহিনিগুলির যে 'পুরাণপ্রতিম' রূপ দেওয়া হয়েছিল সেগুলি কথকতার ধরনে রাজসভায় পাঠ করা হতো। অর্থাৎ, ভবভূতি একটি আধুনিক কথকতার প্রণালী উদ্ভাবিত করেছিলেন। সাধারণত ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির উপাখ্যানাদি কথকতায় প্রচার করা হতো; কিন্তু মিথিলায় যেটা প্রতিষ্ঠিত হল সেটা কাব্যসাহিত্যের উপাখ্যানভাগের বর্ণনা। তার উদ্দেশ্য

শ্রোতার মনোরঞ্জন, ধর্ম বা নীতির প্রচার নয়। ক্রমে কায়স্থবংশীয় সুমতি নামক একজন কলাবিদ্ প্রসিদ্ধ কথকরূপে গণ্য হলেন। তাঁর পৌত্র জয়ত গানে খ্যাতি অর্জন করেন এবং মহারাজ শিবসিংহ তাঁকে কবিশেখর বিদ্যাপতির হাতে সমর্পণ করলেন। বিদ্যাপতি এঁকে যথোচিত শিক্ষা প্রদান করে মনের মতন করে গড়ে তুললেন। তিনি তাঁর গানে মিথিলায় প্রচলিত একটি রাগ বেছে নিতেন এবং তার ধ্রুবা অংশটি রচনা করতেন। ধ্রুবা বলতে কী বোঝায় সেটি একটি উদাহরণ দিয়ে দেখানো যাক।

রাগ—দেশাখ, ছন্দ—দেশাখ।

সরদক সসধরসম মুখমণ্ডল
কাঞে ঝাঁপাবহ বাসে,
অলপও হাস সুধারস বরিসও
ছাড়ও এঞমিঞ পিয়াসে
।।ধ্রু।। *কি আরে মানিনি আপনহুঁ মনে অনুমান,*
রূসৈতে এঞনহুঁ বোলব অগেয়ান।
হাটক ঘটন সিরীফল সুন্দর কুচযুগ কোটি করু আধে,
পাণিপরস রস অনুভব সুন্দরি ন কর মনোরথ বাধে।
নাগরি অঙ্গবিভঙ্গক আগরি
বিদ্যাপতি কবি ভানে,
রাজা শিবসিং রূপনারাএন
লখিমাদেবি রমণে।।

অর্থ :

তোমার মুখমণ্ডল শরৎকালের শশধরের মতো; কেন তাকে বস্ত্রদ্বারা আবৃত করছ? তোমার অল্প হাসিটি সুধারস বর্ষণ করছে, অমিয়পিপাসাকে সে নিবৃত্ত করেছে। ওগো মানিনি, নিজের মনেই চিন্তা করে দেখ; অন্যকে রোষযুক্ত করাকে (তোমার মানদ্বারা) অজ্ঞানের কাজ ছাড়া আর কী বলব? তোমার সুন্দর স্তনদ্বয় স্বর্ণনির্মিত ঘটের ন্যায়; কটির বস্ত্র অর্ধনমিত করে রেখেছ, করস্পর্শের রস অনুভব কর; হে সুন্দরি আমার মনোরথপূরণে বাধা প্রদান কোরো না। কবি বিদ্যাপতি লখিমাদেবীকে যিনি সম্ভোগ করেন, সেই রূপ নারায়ণ শিবসিংহকে ভণিতা যুক্ত করে বলছেন, সেই নাগরী কেন অঙ্গবিভঙ্গকে আগলে রাখতে চাইছে?

এই গানে—'কি আরে মানিনি আপনহুঁ মনে অনুমান,
রূসৈতে এঞনহুঁ বোলব অগেয়ান।'

এই অংশটি ধ্রুবা। 'ধ্রুবা' গানের এমন একটি অংশকে নির্দেশ করে যেটি গানের মুখ্যতম আবেদনকে প্রকাশ করে। এটিই গানের প্রধান অঙ্গ। এই কলিটি সাধারণত গানের প্রথম দুটি পদের পরে আসে এবং গানের সূচনায় যে ভাবটি সূচিত হয় তাকে

পরিস্ফুট করে তোলে, অনেক সময় একটি গানে ধ্রুবা অংশটি মাঝে মাঝেই অপর পদাদির মাঝখানেও গীত হয়ে থাকে।

জয়ত, রাজসভায় একজন নিপুণ গায়ক (উগ্রগাতা) হিসাবে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করলেন। বিদ্যাপতির সহযোগিতায় শিবসিংহের সভায় কথকতা বস্তুটি গানে, ভাষায় একটি অপরূপ সমৃদ্ধিলাভ করল। দেখা যাচ্ছে বিদ্যাপতি কথকতাকেও একটি অপূর্ব আর্টে পরিণত করেন। এই রকম কথকতার আকারে গ্রন্থাদি বাংলাতেও রচিত হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের তথাকথিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এইরূপ একটি কথকতার গ্রন্থ। এই গীতকাব্যটি কী পর্যায়ের সঙ্গীতে প্রযুক্ত হতো এ নিয়ে বহু পর্যালোচনা হয়েছে; কিন্তু 'রাগতরঙ্গিণী'তে প্রদত্ত এই বিবরণের পর এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এটিও আসলে একটি কথকতার কাব্য। তবে এর সঙ্গে বিদ্যাপতির রীতির একটু তফাত ছিল। সেটি হচ্ছে এই যে, এর গানগুলিতে প্রচলিত দেশিতাল প্রয়োগ করা হয়েছে, বিদ্যাপতির নির্দেশ অনুসারে কবিতার ছন্দকে অবলম্বন করে সঙ্গীত সম্পাদিত হয়নি। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানগুলি বৈঠকি ঝুমুরের রীতিতে গাওয়া হতে আরম্ভ করে। বৈঠকি ঝুমুর (যা এখনও পুরুলিয়া এবং বিহারের তৎসন্নিহিত অঞ্চলে প্রচলিত) বিদ্যাপতির পদ থেকেই প্রভাবিত হয়ে প্রচলিত হয়েছিল।

কথকগায়ক জয়তের পুত্র বিতৃষ্ণকৃষ্ণও এই প্রকার গানে সাফল্যলাভ করেন। ক্রমে এই ধারা প্রসারিত হয়ে এল তাঁর পুত্র পৌত্রদের মাধ্যমে। বিতৃষ্ণকৃষ্ণের পুত্র হরিহর মল্লিকের তিন পুত্র ছিলেন— খড়্গারাম, ঘনশ্যাম এবং কল্পীরাম। এঁদের মধ্যে ঘনশ্যাম তাঁদের গায়কীটি ধরে রেখেছিলেন। তাঁর তিন পুত্র রামান্তা, লছিরাঘব এবং টীকা— সকলেই গায়ক ছিলেন। এতকাল ধরে শ্রীমদ্‌বিদ্যাপতি কবিকর্তৃক কাব্য, বর্ণ এবং রাগে অনুবদ্ধ যে-গীতগুলি ছিল এবং তাঁর অনুসরণে রচিত আরও যে সব গান রচিত হয়েছিল, সেগুলির সংখ্যা বেশ স্ফীতকায় হয়ে উঠেছিল। রাজা নরপতিঠাকুরের আদেশ ক্রমে লোচন ঝা সেগুলিকে সংগ্রহ করে মহা সমাদরে তদীয় গ্রন্থ রচনা করলেন। বলা বাহুল্য, লোচন এই গ্রন্থে সেই বিপুল সংগ্রহের সবগুলিই সন্নিবেশিত করেননি, উদাহরণস্বরূপ কতিপয়মাত্র উদ্ধৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এরপর লোচন ঝা তদীয় গ্রন্থে মিথিলার তীরভুক্তি নামক জনপদে প্রসিদ্ধ এবং সেখানকার ঐতিহ্যানুসারে প্রচলিত কয়েকটি বিশেষ রাগের নাম করেছেন। এই রাগগুলির উল্লেখের পূর্বে, তীরভুক্তি বলতে কোন্ অঞ্চলটি বোঝায় সে সম্বন্ধে ধারণা করা আবশ্যক। তীরভুক্তি বলতে সেই অঞ্চলটিকে নির্দেশ করা হয়েছে যেটি তিরহত নামে পরিচিত। মোগলযুগে তিরভুক্তি বিহারকে নিয়ে যে সুবা গঠিত হয়েছিল তার একটি সরকার হিসাবে পরিচিত ছিল এবং বর্তমান মুজাফ্ফরপুর, ভাগলপুর, দারভাঙ্গার অধিকাংশ ও মুঙ্গেরের কিছুটা নিয়ে গঠিত হয়েছিল। বহু প্রসিদ্ধ নদীর তীরদেশসমূহ এই

ভূভাগের অন্তর্গত ছিল বলেই বোধ হয় এই অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছিল তীরভুক্তি। এই দেশে প্রধান যে কটি রাগ প্রচলিত ছিল সেগুলি হচ্ছে ভৈরবী, বরাড়ী, কৌশিক, দেশাখ, রামকরী, ললিতা, কেদার, কামোদ, শ্রী, বসন্ত, মালব, আশাবরী, মলারী, ভূপালী এবং গুর্জরী। এই রাগগুলি কিন্তু তীরভুক্তি প্রদেশে মিথিলা গতিকে অবলম্বন করে প্রযুক্ত হতো। এই কারণেই লোচন বিশেষ করে বলছেন—

তীরভুক্তৌ বিজাতীয়াঙ্গতিমাসাদ্য সংস্থিতাঃ।
তীরভুক্ত্যন্য দেশেভ্যস্তীরভুক্তৌ বিলক্ষণাঃ।।
স্বরভেদাৎপরং নাম্না তেনতৈনৈব বিশ্রুতাঃ।।

এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, উপরে উদ্ধৃত রাগগুলি সর্বভারতে প্রচলিত থাকলেও তীরভুক্তিতে যেভাবে সংস্থিত ছিল তাতে তাদের বিজাতীয় গতি অবলম্বন করতে দেখা যেত। এই বিজাতীয় গতিটিই হচ্ছে মিথিলার নিজস্ব গতি। তীরভুক্তিতে তো এই রাগসমূহের গান বিলক্ষণভাবে ছিলই, এতদ্ব্যতীত কাছাকাছি অন্যান্য দেশেও প্রচলিত হয়েছিল। অপরাঞ্চলে এইসব রাগে প্রযুক্ত স্বরাদির তারতম্য পরিলক্ষিত হত এবং তাতে অনেক সময় নামেরও পরিবর্তন ঘটা অস্বাভাবিক ছিল না।

লোচন মিথিলায় প্রচলিত ভৈরবীরাগের নিদর্শন হিসাবে জয়দেবের একটি প্রসিদ্ধ পদ উদ্ধৃত করেছেন; সেটি হচ্ছে,

রজনিজনিত গুরুজাগর রাগ কষায়িতমলস নিবেশম্।
বহতি নয়নমনুরাগমিবস্ফুট মুদিত রসাভিনিবেশম্।।
হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মাদব কৈতব বাদম্।
তামনুসর সরসীরুহ লোচন যা তব হরতি বিষাদম্।। ইত্যাদি।

জয়দেব এটি যতি তালে নিবদ্ধ করেছিলেন; কিন্তু বিদ্যাপতির মতানুবর্তীরা এই তাল কিংবা লঘু, গুরু, প্লুত ইত্যাদি মাত্রানির্দিষ্ট চচ্চৎপুট, চাচপুট প্রভৃতি মার্গতালও পরিত্যাগ করেছিলেন। এর কারণ, যাঁরা এই সব তালে পারদর্শী নন তাঁদের পক্ষে গানে প্রযুক্ত এই সব তালকে অনুধাবন করা অসম্ভব। যা সাধারণ শ্রোতার উপলব্ধি-গোচর হয় না, তাঁরা সেই তালরীতিকে অবলম্বন করলেন না। এর চেয়ে তাঁরা কাব্যের ছন্দকে মেনে নিয়ে সত্বর, মধ্যম এবং বিলম্বিত এই তিনটি লয় বা গতিকে প্রয়োগ করে গানটিকে একটি বিশেষ রূপ প্রদান করলেন। এই পদ্ধতিকেই 'তালগতি' বলা হয়েছে। উল্লিখিত জয়দেবের গানটির, তালগতি সম্পর্কে গ্রন্থকার বলছেন,

দোএ সত্বর অরু মধ্য দোএ
এআমে চারিএ তাল
এ আতেঁ বহি বহি জাত সুর
তব্ রাগিণি হোতি বিহাল

এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, উল্লিখিত ভৈরবী সুরের গানটির দুটি অংশ সত্বর

গতিতে এবং দুটি অংশ মধ্য গতিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই রীতি থেকে বিচ্যুতি ঘটলে সুর বা রাগিণী তালের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলতে সমর্থ হবে না।

এইভাবে তালগতি প্রদর্শনের পর লোচন ছন্দের প্রসঙ্গে এসেছেন। ছন্দেও তালের ন্যায় লঘু, গুরু-ঘটিত ব্যবস্থা আছে। এটি বোঝাতে তিনি সাধারণ নিয়ম অনুসারে লঘু এবং গুরু বর্ণের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি 'গণ' নিয়মও উদ্ধৃত করেছেন। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী তিনটি বর্ণে এক একটি 'গণ' হয়। লঘু এবং গুরু বর্ণের সন্নিবেশ অনুযায়ী নানারকম গণ নির্ণয় করা হয়েছে। এই লঘু এবং গুরুকে যদি মাত্রার নিয়মে বোঝাতে হয় তাহলে বলতে হবে একটি হ্রস্ব বর্ণ বা লঘুবর্ণকে এক মাত্রারূপে গণনা করা হয়; যেমন 'ক' এইটুকু বললে এতে একমাত্রা বোঝায়, কিন্তু কা, কে, কো, কৌ—এইরকম উচ্চারণ করলে এটিতে দুই মাত্রা বোঝায় কারণ ক-এর সঙ্গে আকার, একার, ওকার বা উকার যোগ করলে বর্ণটি দীর্ঘ হয়ে দ্বিমাত্রিক হয়ে যায়। গুরু বা দীর্ঘায়িত বর্ণের আরও বিবিধ নির্দেশ আছে। এই গণনিয়মে সংস্কৃত বা প্রাকৃতভাষার গান গাওয়া হতো, কেননা উক্ত দুটি ভাষাতেই লঘু, গুরু বিন্যাস সংস্কৃত ছন্দের নিয়মেই চলত। কিন্তু, মৈথিলী বা বাংলা এই সব প্রাকৃত ভাষায় লঘু বা গুরু প্রচলন অনুসারে নির্দিষ্ট হয়ে আসছে; এর কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তাই খুব অল্প ক্ষেত্রেই এই দুই ভাষার পদে গণনিয়ম আরোপ করা সম্ভব হয়। লোচন সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে 'গণ'-এর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সাধারণভাবে ছন্দের থিওরি বোঝাবার জন্যই এইসব শাস্ত্রীয় নিয়মের অবতারণা করা হয়েছে।

ছন্দ সম্পর্কীয় সাধারণ বিবরণ প্রদান করবার পর লোচন 'রাগ' বলতে কী বোঝায় সেই আলোচনায় এসেছেন। অল্প কথায় বলতে গেলে যা চিত্তানুরঞ্জক এবং তাল প্রভৃতি রীতি থেকে প্রচ্যুত হয় না, তাকেই রাগ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এটাকে তিনি আর একটু বুঝিয়ে বলেছেন। 'চিত্তের অনুরঞ্জক' বললে, চিত্ত বলতে কী নির্দিষ্ট হচ্ছে সেটা উপলব্ধি করা দরকার। বিদগ্ধ এবং পরিশীলিত যে সচেতনতা, তাকেই তিনি 'চিত্ত' বলতে চেয়েছেন, কারণ উক্ত প্রকার মানসেই রাগের যথার্থ ব্যাপ্তি ঘটতে পারে। পূর্বে যে লঘু-গুরু বর্ণ সংযোগে 'গণ' বা 'দল' (মাত্রাসমষ্টি)-এর কথা বলা হয়েছে, রাগ অবলম্বনে গান করবার সময় এইভাবে ছন্দের প্রয়োগ হবে তাতেই চিত্তরঞ্জন ঘটবে এবং সামগ্রিকভাবে রাগসঙ্গীত রসিক চিত্তে যথাসম্ভব ব্যাপ্তিলাভ করতে সমর্থ হবে। কিন্তু 'পামর' অর্থাৎ মূর্খদের মনে সেই অনুরঞ্জকত্ব ঘটা সম্ভব নয়, কেন-না সেই মন অবিদগ্ধ এবং অপরিশীলিত। শৈলীর দিক থেকে সঙ্গীত যত সম্পূর্ণই হোক না কেন, মন যদি সুপরিণত না হয় তাহলে সেখানে রাগের সর্বাঙ্গীণ ব্যাপ্তি ঘটা অসম্ভব। লোচন রাগসঙ্গ ।তের ক্ষেত্রে রাগ এবং তাল উভয়ের সমন্বিত প্রকাশকে আবশ্যিক বলে মত প্রকাশ করেছেন। অতএব, যদি তাল-বিচ্যুতি ঘটে তাহলে যা ঘটবে তাকে তিনি কুরাগের

অতিব্যাপ্তি বলেছেন। আগে তালগতি, অর্থাৎ—সত্বর, মধ্য এবং বিলম্বিত, এই তিনটি গতি বা লয়ের কথা বলা হয়েছে। রাগের সঙ্গে এই গতিগুলির সম্পর্ক বিদ্যাপতি-প্রবর্তিত মিথিলার সঙ্গীতে অত্যন্ত নিবিড় ছিল। যেখানে গতি সত্বর হওয়া উচিত, সেখানে সেটি শ্লথ হয়ে গেলে আবেদনের গুরুত্ব হ্রাস পাবে এবং তার ফলে সঙ্গীত রসোত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবে না। এর সঙ্গে, লোচন রাগ এবং রাগিণী— এই দুটি শব্দের তাৎপর্য নিয়েও একটি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রচলিত মত অনুযায়ী রাগ এবং রাগিণী এই দুটি ভেদ নির্ণয় করা হয়; কিন্তু 'রাগিণী' আখ্যার যে বিশেষ তাৎপর্য আছে, এমন নয়। রাগিণীগুলিকেও যদি রাগপদে অধিষ্ঠিত করা যায় তাহলে এমন কিছু ইতরবিশেষ হয় না, বরঞ্চ একমাত্র 'রাগ' আখ্যাটি প্রচলিত থাকলেই সেটি তাঁর মতে রীতিসম্মত হত। এই উদ্দেশ্যে তিনি বলছেন—'রাগিণীযপি রাগপদপ্রয়োগঃ সাধুঃ।' অল্পক্ষণ পূর্বেই তিনি বলেছেন যে, রাগ এবং তালের সমাহারেই রঞ্জকত্ব সার্থকতা লাভ করে। এটা যে কেবল রাগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তাই নয়, তথাকথিত রাগিণীর ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। সুতরাং লক্ষণের দিক থেকে কোনো বৈষম্য না পরিলক্ষিত হলে রাগিণীকেও রাগপদবাচ্য করলে কোনো ত্রুটির কারণ ঘটে না।

তাহলে, এযাবৎ সমস্ত আলোচনার সারমর্ম এই হল যে, বিদ্যাপতি যে মিথিলাগীতগতির প্রবর্তন করেছিলেন, তা দেশজ রাগ (গীতগতি), তাল (তালগতি) এবং ছন্দ (ছন্দগতি)—এই তিনটির সমন্বয়ে রূপায়িত হতো। দেশজ রাগ অর্থে এই বোঝায় যে, রাগসমূহ দেশভেদে লক্ষণের ব্যতিক্রম ঘটায়; অর্থাৎ স্বরাদির প্রয়োগে শাস্ত্রনির্দিষ্ট ঠাট যথাযথভাবে অনুসরণ করে চলে না। শাস্ত্রে দেশভেদজনিত এই সব রাগকে ভাষারাগ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। পূর্বে যে ভৈরবী, বরাড়ী প্রভৃতি রাগের উল্লেখ করা হয়েছে, স্বভাবতই সেগুলি মিথিলায় কিছুটা অন্য রূপ ধারণ করেছিল; সেই কারণেই এইগুলিকে মিথিলা অঞ্চলে প্রচলিত রাগ বলে ধরা হয়েছিল।

লোচন এই রাগগুলিকে 'অসংকীর্ণ রাগ'-এর পর্যায়ে ফেলেছেন। এইসব রাগের বিবরণ দেবার পর তিনি আরও কতিপয় রাগের উল্লেখ করেছেন যেগুলি কেবলমাত্র তীরভুক্তিখণ্ডেই প্রসিদ্ধ ছিল। লোচন বলছেন :

বিভাসী চাহিরানিশ্চ গোপীবল্লভ এব চ।
শারঙ্গী চাপি কোড়ারো ধনছী গৌড়মালবৌ।।
রাজবিজয় নাটৌ চ নবৈতে তীরভুক্তিজাঃ।।

বিভাষী, আহিরানি, গোপীবল্লভ, শারঙ্গী, কোডার, ধনছী, গৌড়মালব, রাজবিজয় এবং নাট— এই নটি রাগকে তীরভুক্তিজ বলে স্বীকার করা হয়। পূর্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণতর স্থানে নিবদ্ধ থাকাতে এইগুলিকে সঙ্কীর্ণ রাগের গোষ্ঠীতে ফেলা হয়েছে।

এইগুলির প্রত্যেকটি কিন্তু বাংলাতেও প্রচলিত ছিল। 'গৌড়মালব' রাগটি আদিতে

নিশ্চিতভাবেই তীরভুক্তির রাগ ছিল না, কিন্তু মিথিলাগীতগতির লক্ষণাক্রান্ত হয়ে এটি ক্রমে মিথিলাপ্রসিদ্ধ রাগ বলেই পরিগণিত হয়েছিল। বাংলা এবং মিথিলা শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক থেকে একভাবাপন্ন হওয়াতে তীরভুক্তি প্রদেশের রাগও বাংলার রাগ বলেই চিহ্নিত হয়ে এসেছিল।

এইবার এইসব গানে কীভাবে কবিতার দিকে লক্ষ্য রেখে ছন্দনির্ণয় করা হয়েছে, সে বিষয়ে আসা যাক। পূর্বে যে অসঙ্কীর্ণ রাগগুলির নামের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে 'বরাড়ী' অন্যতম। এই বরাড়ীর একটি প্রকারভেদ হচ্ছে—'রাঘবীয় বরাড়ী'। এই রাগ অবলম্বন করে বিদ্যাপতি একটি গান রচনা করেন এবং সেটি যে ছন্দে তিনি গাইতেন, তাকেও 'রাঘবীবরাড়ীয় ছন্দ' বলা হয়েছে। এর লক্ষণ এই রকম :

পদের প্রথমার্ধের মাত্রা সংখ্যা হবে সপ্তবিংশতি এবং দ্বিতীয়ার্ধে ত্রিংশ মাত্রা যোজিত হবে। ধ্রুবা অংশের প্রথমার্ধে নবসংখ্যক মাত্রা থাকবে এবং অন্তিমাংশে চতুর্দশ মাত্রা প্রযুক্ত হবে। বিরতিতে বহু গুরুবর্ণের সন্নিবেশও ঘটতে পারে। এইরূপ হওয়াতে, গানের সর্বত্র একরূপ মান রক্ষিত নাও হতে পারে। তথাপি গানটি নিয়মদ্বারাই ভূষিত হবে। এই অনিয়ত মানটি কীরূপ সেটি বোঝাতে গ্রন্থকার বলছেন যে এই গানের পদগুলিতে একটি, দুটি বা তিনটি কলা কম হতে পারে, আবার বেশিও হতে পারে।

এর উদাহরণ স্বরূপ বিদ্যাপতির একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে; তার কিয়দংশ ছন্দের প্রয়োগটি বোঝাবার জন্য প্রদান করা হল।

সাঁঝক বেরাঁ জমুনাক তীরাঁ কদবেরি বনতরুতরাঁ,
অকমি কানরা কি কহব কালা
সোঝাঁহি জুঝল সখি কুসুম সরা।।
।। ধ্রু ।। মোহি ভেটল কান্হু, অনতএ কাহিনী কহহ জনূ।।
ইত্যাদি

সন্ধ্যাবেলায়, যমুনার তীরে কদম্ববনের তলা দিয়ে আমি অঙ্কদেশে কলসের গলদেশ বেষ্টন করে আসছিলাম। সখি, কী বলব, কালা সোজাসুজি কুসুমশর যোজনা করল। কানু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। এ যেন এক অন্য কাহিনী বলছি।

ছন্দবিভাগ ঠিক কীরকম করা হয়েছিল বলা সম্ভব নয়। যেহেতু লোচন এটি বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দেননি, সেহেতু অনুমানের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যাই হোক মাত্রাবিভাগটি এইরকম হতে পারে :

পদের প্রথমার্ধ

সাঁ ০ ঝ ক। বে ০ রাঁ ০। জ মু না ক। তী ০ রা ০।
ক দ বে রি। ব ন ত রু। ত রাঁ ০। = মাত্রাসংখ্যা ২৭।

পদের দ্বিতীয়ার্ধ

অ ক মি কা। ০ ন রা ০। কি ক হ ব। কা ০ লা ০।

সো ঝাঁ হি জু। ঝ ল স খি। কু সু ম স। রা ০ = মাত্রাসংখ্যা ৩০।

ধ্রুবার প্রথমার্ধ

মো হি ভে ০। ট ল কা ন্। হূ = মাত্রাসংখ্যা ৯।

ধ্রুবার দ্বিতীয়ার্ধ

অ ন ত এ। কাহিনী ০। ক হ হ জ। নু ০ = মাত্রাসংখ্যা ১৪।

পূর্বেই বলা হয়েছে বাংলার মতো মৈথিলী ভাষাতেও লঘুগুরু বর্ণের বাঁধাবাঁধি নেই, প্রচলিত প্রথা অনুসারেই এই দুটি নির্দিষ্ট হয়। অতএব এই বিন্যাসই যে একমাত্র বিন্যাস এমন কথা জোর করে বলা যাবে না। তথাপি ছন্দ অনুসারে পাঠ করলে বিন্যাসটি এরকম হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক বলে মনে হয়। লোচন এই কারণেই পদবিন্যাসকে 'অমানক' বলেছেন; অর্থাৎ এই পদগুলির মাত্রাবিন্যাসকে একটি বাঁধাবাঁধি ছকে ফেলা যাবে না; কিন্তু তাহলেও কাব্যের ছন্দপতন ঘটতে দেওয়া কোনোক্রমেই উচিত হবে না। সেই নিয়মটিকে রক্ষা করতেই হবে। এও বলা হয়েছে যে, গানের প্রয়োজনে তিনটি পর্যন্ত কলা বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। এখানে মাত্রা এবং কলা,— এই দুটি শব্দের অর্থে যে প্রভেদ আছে সেটিও জানা দরকার। মাত্রা শব্দটি পরিমিতি বা মানবাচক। এটির প্রয়োগ বিশেষভাবেই গাণিতিক; কিন্তু কলা শব্দে ভাগ বা অংশ বোঝায়। যেখানে কোনও বর্ণের অস্তিত্ব থাকে না সেখানেও একটি কলা দ্বারা মাত্রাসংখ্যা পূরণ করা যায়। যাঁরা সঙ্গীতজ্ঞ তাঁরা জানেন আজ কালকার বিলম্বিত একতাল গণনার দিক থেকে বারো মাত্রার হলেও কার্যত আটচল্লিশ মাত্রায় গাওয়া হয়; অর্থাৎ এক-একটি মাত্রাকে সমান চারভাগে ভাগ করে পূরণ করা হয়। এক্ষেত্রে একটি মাত্রাই চতুষ্কল বা চারটি কলায় সংগঠিত হচ্ছে। যাঁরা আট মাত্রায় যৎ তালে ঠুংরি কিংবা টপ্পা গান করেন, তাঁরাও প্রতিটি মাত্রাকে চতুষ্কল করে বত্রিশ মাত্রায় গানটি সম্পাদন করেন। এইভাবে কলাসহযোগে সঙ্গীতকে বিলম্বিত করা যায়, আবার কলার হ্রাস ঘটলে সেটি দ্রুততায় পর্যবসিত হয়। তবে, সাধারণভাবে কলা এবং মাত্রার মধ্যে পার্থক্য করা হয় না; অর্থাৎ 'পঞ্চকল' বললে সাধারণভাবে পঞ্চমাত্রিক বুঝিয়ে থাকে। এই কারণে সঙ্গীতশাস্ত্রে অনেক সময় মাত্রার পরিবর্তে কলা শব্দটিও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

আরও একটি চিত্তাকর্ষক উদাহরণ দেওয়া যাক। এই গানটির রচয়িতা 'বিদ্যাপতি কবিরাজ'। ইনি আসল বিদ্যাপতি কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। এই গানটি 'বিজয়পুরমালব' রাগে এবং উক্ত ছন্দে নিবদ্ধ। এই ছন্দের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এর দুটি পদার্ধই 'ষট্‌কল' বিভাগে রচিত হবে এবং পরবর্তী চারটি পদ 'চতুষ্কল' বিভাগে গাওয়া হবে। এর ইতরবিশেষ যে হতে পারে না এমন নয়; তবে এইটি সাধারণ বৃত্ত লক্ষণ।

কুণ্ডল তিলকেঁ বিরাজ মুখ শোভিত সীদুর বিন্দু।

হেমলতা মেঁ সমারু বিধি কবি রবি তারা ইন্দু।।
ইন্দুবদনি ধনি নয়নবিশালা
কমলকলিত জনি মধুকর মালা।
দেখলি কলাবতি অপরুব রমণী,
জিনএ আইলি সুরপুর গজগমনী।।
ইত্যাদি।

আনুমানিকভাবে ছন্দটি পূর্ববর্ণিত লক্ষণ অনুসারে এইভাবে দেখানো যায়
কু ণ্ ড ল তি ল। কেঁ ০ বি রা ০ জ। মু খ শো ০ ভি ত।
সীদুরবিন্দু। —ষট্‌কল প্রথম পদার্ধ।।
হে ০ ম ল তা মেঁ। স মা ০ রু বি ধি। ক বি রবি তা রা।
ই ন্ দু ০ ০ ০।—ষট্‌কল অপরার্ধ।
ই ন্ দু ব। দ নি ধ নি। ন য় ন বি। শা ০ লা ০।
ক ম ল ক। লি ত জ নি। ম ধু ক র। মা ০ লা ০।
দে ০ খ লি। ক লা ব তি। অ প রু ব। র ম ণী ০।
জি ন এ আ। ই লি সু র। পু র গ জ। গ ম নী ০।
চারটি চতুষ্কল পদ।।

এই গানটির তিনটি কলি সত্বর তালে (লয়ে) গাওয়া হবে। বর্তমান রীতি অনুসারে গানটির প্রথমাংশ একতালে এবং দ্বিতীয়াংশ ত্রিতালে নিবদ্ধ। এই তালফেরতার দরুন গানটি একটি নতুন আকার লাভ করেছে।

এই হচ্ছে বিদ্যাপতি প্রবর্তিত মিথিলাগীতগতির রূপরেখা। সঙ্গীত সম্বন্ধে বিদ্যাপতির সর্বাপেক্ষা স্বকীয় চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর তাল এবং ছন্দের পরিকল্পনায়। আমরা তাল বলতে মোটামুটি ছন্দটাকেই বুঝি; কিন্তু তিনি সত্বর, মধ্য এবং বিলম্বিত,— এই তিনটি লয়কেই তাল বললেন। তাঁর মতে যে গতিতে গানটি নিবদ্ধ হচ্ছে সেটাই হচ্ছে তার তাল। তালকে তিনি মাত্রানুসারে ভাগ-করা ছন্দের ইউনিট হিসাবে দেখেননি, দেখেছেন গতির দিক থেকে; সামগ্রিকভাবে গানের একটা নির্দিষ্ট পরিক্রমা থেকেই তিনি তালের সংজ্ঞাটি নিরূপণ করেছেন। যেটাকে আমরা তাল বলে বুঝে এসেছি, যেমন একতাল, ত্রিতাল, ঝাঁপতাল ইত্যাদি, সেটাকে তিনি আদৌ স্বীকার করেননি। তার কারণ এই তাল মারফৎ কাব্যের উপর অযথা বহুবিধ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। কবিতা যদি কেবলমাত্র ছন্দের প্রয়োগেই তার ভারসাম্যকে পুরোপুরি বজায় রাখতে পারে তাহলে গানের বেলায় সেই উদ্দেশ্য সাধিত না হবার কোনো কারণ তিনি দেখতে পাননি। এই প্রত্যয় তাঁর প্রয়োগের দিক থেকে বিচার করেও দৃঢ় হয়েছিল, কারণ তিনি নিজে শুধু উত্তম গায়কই ছিলেন না, সঙ্গীতবিদ্যাতেও পারঙ্গম ছিলেন। অতএব, তাঁর পদগুলির জন্য তিনি যে যে রাগ নির্বাচিত করতেন, সেগুলি যে যে ছন্দে গাইলে সুর এবং

কাব্যের সর্বোত্তম সমন্বয় ঘটত, সেদিকে লক্ষ রেখেই তিনি পদ এবং ধ্রুবাসমূহের ছন্দ নির্ণয় করতেন। যেহেতু এই ধরনের অনিয়ত মাত্রাসংখ্যা নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট তাল গঠন করা যায় না, সেহেতু তিনি যে রাগে গানটি গেয়েছেন, ছন্দটিও সেই রাগের নামেই নির্দিষ্ট করেছেন। মাত্রাসংখ্যা অনিয়ত বলছি এই কারণে যে, সেগুলি একই নিয়মে নিবদ্ধ হয়নি। প্রথম উদাহরণের ছন্দে দেখা যাবে বিভাগগুলি সর্বত্রই চতুর্মাত্রিক নয়; শেষের দিকে মাত্রাসংখ্যার হ্রাস ঘটেছে। 'সাঁঝক বেরাঁ জমুনাক তীরাঁ' গানটিতে—প্রথম পদার্ধ সাতাশ মাত্রায় এবং দ্বিতীয় পদার্ধ তিরিশ মাত্রায় নিবদ্ধ; আবার ধ্রুবার প্রথমার্ধ নয় মাত্রায় এবং দ্বিতীয়ার্ধ চতুর্দশ মাত্রায় গঠিত। প্রচলিত তালের প্রয়োগ এইভাবে ঘটে না; এটি কবিতার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রয়োগ করা হয়েছে।

বিদ্যাপতির মৃত্যুর প্রায় পাঁচশো বছর পরে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ একই রকম মনোভাব ব্যক্ত করলেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধে তিনি এই ধরনের একাধিক উদাহরণ প্রদান করে বললেন :

"ছন্দের রোজ লইয়া যখন গান লিখিতে বসিলাম, তখন চাঁদ সদাগরের উপর মনসার যেরকম আক্রোশ, আমার রচনার উপর তালের দেবতা তেমনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন। আমার জানা ছিল ছন্দের মধ্যে যে নিয়ম আছে তাহা বিধাতার গড়া নিয়ম, তা কামারের গড়া নিগড় নয়। সুতরাং তার সংযমে সঙ্কীর্ণ করে না, তাহাতে বৈচিত্র্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকে। সেই কথা মনে রাখিয়া বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সঙ্কোচ বোধ করি নাই।

"কাব্যে ছন্দের যে-কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে-নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম। তাহাতে কী উৎপাত ঘটিল একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করা যাক আমার গানের কথাটি এই :

কাঁপিছে দেহলতা থরথর
চোখের জলে আঁখি ভর ভর
        দোদুল তমালেরি বনছায়া
        তোমার নীলবাসে নিল কায়া,
বাদল নিশীথেরি ঝর ঝর
তোমার আঁখিপরে ভর ভর।

"এ ছন্দে আমার পাঠকেরা কিছু আপত্তি করিলেন না। তাই সাহস করিয়া ঐটেই ঐ ছন্দেই সুরে গাহিলাম। তখন দেখি যাঁরা কাব্যের বৈঠকে দিব্য খুশি ছিলেন তাঁরাই গানের বৈঠকে রক্তচক্ষু। তাঁরা বলেন,— এ ছন্দের এক অংশে সাত আর-এক অংশে চার ইহাতে কিছুতেই তাল মেলে না। আমার জবাব এই, তাল যদি না মেলে সেটা তালেরই দোষ। ছন্দটাতে দোষ হয় নাই কেন তাহা বলি। এই ছন্দ তিন এবং চার

মাত্রার যোগে তৈরি। এই জন্যই 'তোমার নীলবাসে' এই সাত মাত্রার পর 'নিল কায়া' এই চার মাত্রায় খাপ খাইল। . . . আমার দৃষ্টান্তগত ছন্দটিতে প্রত্যেক লাইনেই সবসুদ্ধ ১১ মাত্রা আছে। কিন্তু এমন ছন্দ হইতে পারে যার প্রত্যেক লাইনে সমান মাত্রা বিভাগ নাই। যেমন :

বাজিবে সখি, বাঁশি বাজিবে,
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি
অধরে লাজ হাসি সাজিবে।

. . . . . .

'ইহার প্রথম দুই লাইনে মাত্রা ভাগ ৩ + ৪ + ৩ = ১০। তৃতীয় লাইনে ৩ + ৪ + ৩ + ৪ = ১৪। আমার মতে এই বৈচিত্র্যে ছন্দের মিষ্টতা বাড়ে। অতএব উৎসাহ করিয়া গান ধরিলাম, কিন্তু এক ফের ফিরিতেই তালওয়ালা পথ আটক করিয়া বসিল। সে বলিল 'আমার সমের মাশুল চুকাইয়া দাও'। আমি তো বলি এটা বেআইনি আবোয়াব। কান মহারাজার উচ্চ আদালতে দরবার করিয়া খালাস পাই। কিন্তু দরবারের বাহিরে খাড়া আছে মাঝারি শাসনতন্ত্রের দারোগা। সে খপ্ করিয়া হাত চাপিয়া ধরে, নিজের বিশেষ বিধি খাটায়, রাজার দোহাই মানে না।

কবিতায় যেটা ছন্দ, সঙ্গীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে, আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কি গানেই কি এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।"

এই যুক্তির সঙ্গে বিদ্যাপতির মনোভাবের মূলত প্রভেদ নেই, যদিচ এত তত্ত্ব এবং বিশ্লেষণ লোচন ঝাঁ তাঁর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেননি। এই সারল্য এবং স্বকীয় পরিকল্পনার জন্যই বিদ্যাপতি এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর গান লোকে সহজে গাইতে পেরেছিল এবং মিথিলা থেকে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে এমনকি নেপালেও তাঁর গান একটি প্রচণ্ড জনপ্রিয়তার আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বাংলায় চৈতন্যও বিদ্যাপতির এই কাব্যের আবেদনে, উচ্ছল পদাবলী-সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে গরানহাটি পদাবলী কীর্তনে মিথিলার এই গীতগতিকে আর রক্ষা করা হল না, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি গীতকারদের সরল মাধুর্যপূর্ণ পদগুলিকে অন্য সুরে এবং জটিল দীর্ঘ তালে নিবদ্ধ করা হতে লাগল। আজও মনোহরসাই রীতিতে যাঁরা মিথিলার কবিদের গান সম্পাদিত করেন তাঁরা সম্পূর্ণ অন্য পথ অবলম্বন করে থাকেন। পূর্বেই বলেছি, এ রীতি বিদ্যাপতির অনুমোদিত ছিল না; এ বাংলার মহাজনপদ গায়নের বৈশিষ্ট্য হতে পারে কিন্তু বিদ্যাপতির চিন্তাধারায় রচিত মিথিলাগীতগতির পর্যায়ে পড়ে না।

উল্লেখপঞ্জি

লোচন প্রণীত 'রাগতরঙ্গিণী'। সম্পাদক—পণ্ডিত বলদেব মিশ্র, দারভাঙ্গা রাজ প্রেস, দারভাঙ্গা।
Prof, Jayakanta Mishra, A History of Maithili Literature, Tirbhukti Publications, Allahabad.
'রবীন্দ্ররচনাবলী' জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা।
'সঙ্গীত দামোদর', সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা।
'সঙ্গীতদর্পণ', কলকাতা সংস্করণ।
'গীতবিতান বার্ষিকী', মাঘ ১৩৫০, গীতবিতান, কলকাতা।
'বৃত্তরত্নাকর', কলকাতা সংস্করণ।

পিতাপুত্রদ্বৈরথ

একটি সমীক্ষা

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচনা

মহাভারত: 'শান্তিপর্ব' : 'পিতাপুত্রসংবাদ'[১]

শরশয্যায় শয়ান ভীষ্ম পিতামহকে শুধোলেন যুধিষ্ঠির:

'বয়ে যাচ্ছে সময়! দ্রুত অতিক্রান্ত হচ্ছে সর্বভূতহর কাল! আচার্য! এমৎ পরিস্থিতিতে, কোন্ উপায়ে শ্রেয়োলাভ করে মানুষ?'

উত্তরের সূচনামুখে প্রশ্নাকুল জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে ইঙ্গিত দিলেন ভীষ্ম—যুধিষ্ঠিরের এ উতলাভাব নতুন কিছু না; জীবনশেষের অনিবার্য শেষজাগরণ, আসন্ন ইতির নির্ভুল পূর্বাভাস, সংবেদনশীল লোকমাত্রের বুকেই জাগায় মহাবেদনা; অস্ত-আকাশে রক্ত রবির বিধুর রাগে, যুধিষ্ঠিরের আগে, আরো অনেকেই গ্রস্ত হয়েছে অনুত্তর উদ্বেগে।

বললেন প্রাজ্ঞ পিতামহ:

বৎস! আমি এখন প্রাচীন এক ইতিহাস কীর্তন করব। শোনো।

ছিলেন একদা বেদপাঠনিষ্ঠ, স্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণ। মেধাবী নামে মেধাবী এক পুত্র ছিল তাঁর। ছেলেও বেদজ্ঞ। তদুপরি, লোকতত্ত্বে বিশারদ। সেই মেধাবী একদিন, আকস্মিক একদিন, শুধোয় বাবাকে :

—পিতঃ! সত্বর ক্ষইছে পরমায়ু! এ-কথা অবগত হয়ে কোন্ কাজে হাত দেওয়া উচিত ধীমান মানবের?

জবাব দেন ব্রাহ্মণ:

—অনেকগুলি কাজ বৎস। তবে পর পর। সবার আগে: মন দিয়ে বেদ অধ্যয়নের অধ্যায়; তৎপর, পিতৃঋণ শোধ, লোকান্তরিত পূর্বপুরুষ উদ্ধারে পুত্রজননে ইচ্ছুক হওয়ার পর্যায়; তৎপর, শেষবেলায়, মুনি বনবার প্রশস্ত লগ্নে, যথাবিধানে অগ্নিস্থাপন ও যজ্ঞানুষ্ঠান সেরে, বনে প্রবেশ।

প্রত্যুত্তরে তর্ক তোলে মেধাবী :

—ব্যাপ্ত হচ্ছে এক শক্তি লোকসমাজে; অভিভূত হবেই লোকসমাজ আরেক

শক্তিতে; আর, তার গতায়াত তো অনন্তর! এ ত্রিসত্য তো অনুপেক্ষণীয় তাতঃ। তবে এত নিশ্চিন্ত কেন আপনার ভাষ, 'কিং ধীর ইব ভাষসে'? শংকার মেঘ ঘনায় পিতার মুখে :

—কাদের কথা বলছ তুমি? ভয়ই বা দেখাচ্ছ কেন আমায়, 'কিং নু ভীষয়সীব মাম্?'

আরম্ভ হয় এবার তীক্ষ্ণধী মেধাবীর তীব্রোত্তর, লম্বা এক স্বগত-উচ্চার :

ঋতুর বদল চলে:
কৌমার যৌবন গেলে, আসে জরা, শীতসাঁঝে জ্বলে ম্লান দেউটির আলো।
এড়ায় কে মৃত্যুর হিমেল হাত। অবিরল আছড়ায় রাত:
কালোর লহর মোছে দিকচক্রবাল।
দেব!
শোনায় না অহরহ, শোনায় না স্নায়ু-নাড়ী, শেষ শ্বাসপতনের রক্তমেঘনাদ?

পায়ের সঞ্চার তার যদিও নীরব—
সরল মেষের পালে অকস্মাৎ পড়ে বাঘ; চরম সে ক্ষণে
হঠাৎই নামে কোপ, শার্দূল আক্রমে গুপ্তঘাত—
নাথাম ধুয়োয় তবু, খেলে যে শরীরময়, বিদায়ের আগমনী বাজ।

গর্ভের তমস-জলে
পাথারে লালিত ভ্রূণ
বাড়ায় যেই পা
হিরণ্ময় ধরাতলে,
টের পায় হাড়-মাসে নব অবয়বী:
আলো শুধু আবরণ; সরে গেলে পর্দা,
তাঁতঘরে যে আঁধারে কেটেছিল দশ মাস, পিছল সে যামিনীর যমল দোসর নিশীথিনী
জড়াবে সর্পিল কেশে, আলোল চিকুর জাল, কৃষ্ণ ঘন পাশে।

পিতঃ!
শেষ হয় কোন্ কাজ? জানে কোন্ মর্ত্য নর, কর্ম-অধিগম কার নাম?
যায় নিবে অ-কারণ হোমের আগুন,
যায় ভেসে নিমেষেই কুশি হবি তৃণাসন, ধায়
উপবীত উত্তরীয় অজান অকূলে।

নিশান্তে নয় কি ম্লান শমীশাখা বক্ষ চেরা বিমল অনলও?

সাজাও না সমিধে সমিধ—
চড়াও যূপের কাঠে
পোড়াও পাবকদাহে
যত চাও বলি—
মাঝপথে চুপিসারে চুরি যাবে, যাবেই যে যাচক,
কোনভাবে ফলবান হয় বলো সেই
না-নাম না-রূপ কায়, নিঃসীম না-কেউ?
নির্বিচার, নক্ত নিরালোক—
বীর-ভীরু-বিজ্ঞ-বোকা, শরীরী মাংসল কিংবা রোগা,
সকলেই যাবে অন্তে, অফেরত অন্ধকার দেশে।
তবে কেন আয়োজন, যন্ত্রযাগ; পুষ্পবাগে কেন
অন্যমনে মূঢ়সম অত্বর বিহার?
সময় কোথায় দেব! হয় যদি নিষ্প্রদীপ এই!
অদ্যকার প্রভাতেই ঘটে যদি শেষ সূর্যোদয়!
কুসুম চয়নে মত্ত মধুপের মন্ত্রের গুঞ্জর
থামে যদি মধ্যপদে, ছান্দসের যদি সর্বনাশে!

পিতঃ!
কোষে কোষে মশালের ধূমজাল। পাছে ভস্ম তার,
উড়ে এসে ছাইরঙে মস্তাখরে ছেপে যায় আত্ম-প্রলয়ের নান্দীস্তব,
সে ভয়ে কাতর যারা, তারাই বানায় যত নিয়ম -অয়ন।
কাঁপায় যাদের মন সত্যের দক্ষিণ রূপ, তারাই সাধায়
ধারাবাহিকের পাঠ। বলে, অঙ্কভাগে সুকুশলীঃ
আর্যদের মহালোকে ঝঞ্ঝা-ঝড় তোলপাড় আবর্ত কত না,
কবেকার পালা তবু, বাঁধা সেই গৎ তবু, অটোল নিখুঁত;
অতএব, নির্দ্বিধায় সাবলীল, তালে তাল মেলাও পা; ধরো পর পর,
দৃশ্যফেরে সাজঘরে ছাত্র-বেশ, গৃহী-বেশ, মুনির পোশাক; হও তুমি,
গমনে নমিত নম্র, বিশোকে শমিত ভদ্র, শরীরযাত্রায়।
হাঃ!
বড়ই করুণ দেব, বরেণ্য নমস্যদের এ হাস্যকৌতুক।

শেষ-ফুঁয়ে বানচাল হবেই যখন
আজ-কাল-তরশুর যত গল্প-গাল,
সেখানে কিসের দেরি? আত্মার আরাম-জন্য ঊর্দ্ধতন চোদ্দো পুরুষের?
প্রয়াতের প্রীতি হবে, সে-কারণেই কি বিধি, চালু থাক আজীবন স্বস্ত্যয়ন-রীতি?
পিতঃ! বলুন তো বুকে হাত রেখে, পরলোক আছে কোন্ পারে?
জানেন আপনি ঠিক, কোন্ ধামে বিরাজিত আপনার পিতামহ-পিতৃদেব আজ?

দেব!
হয় কী না হয় মুক্তি, সে আতঙ্কে তনয়ের শরণাগত যে,
শিশুর অধম শিশু অসহায় অপারদর্শী সে।
স্বযোগে সবীজ আমি, অনাদি একক আমি, অনন্য অক্ষুর—
আমি কেন, ব্রাহ্মণ হে, জড়াবো বৈতান সমারোহে,
দেখো যাব নিষ্পলক অরণির বহ্নিপাক, নিরুপায় পশুদের সহিংস হনন।

স্বরাট বিরাট আমি, বিকাশে অপরিমেয়। আমি কেন লিপ্ত হব পিতা,
আতুর কাঙাল সম বংশগতি সুহাল রাখার
পুরুষ পিশাচ-ব্রতে। বদলে বরং,
এখনি বেরোবে পথে। এই তো সুযোগঃ
ছিন্ন গৃহপ্রিয়দের মান্য কালগ্রন্থি,
ছেদে ছেদে নয়ছয় বন্ধ আয়ু-নক্সা,
বেরোলাম আমি পথে—চলমান পূর্ণযতি কুমার মেধাবী।

আশ্রমকথা

১

১৯০৭-এ মূল জর্মানে ও ১৯২৭-এ ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশিত *A History of Indian Literature* (১ম-খণ্ড) বইয়ে লেখক Maurice Winternitz *মহাভারত* আলোচনা প্রসঙ্গে একজায়গায় লিখেছেন: 'ব্রাহ্মণ্য নীতিসংকল্প ও ভারতীয় নির্বেদ-এর ভিতরকার টান-টান বিরোধিতা যে উজ্জ্বলতায় মহাভারত-এর "পিতাপুত্রসংবাদ"-এ চিত্রিত আছে, তেমনটি আর কোথাও নেই'।[২] তবে, 'পিতাপুত্রসংবাদ' এর বেশ কিছু বাক্যের অনুরূপ বাক্য অ-ব্রাহ্মণ্য অনেক গ্রন্থেই মেলে। যথা:

ক. জৈনগ্রন্থ: উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, 'ভাষণ১৪'[৩]

জনৈক ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দুই ছেলে যখন তাদের পিতাকে শেষ অভিবাদন জানিয়ে বলে, 'আর সয় না গয়ংগচ্ছ গেরস্থালি—চললাম আমরা', তখন অপত্যদের অকালবিয়োগ রোখবার অন্তিম চেষ্টায় যুক্তি দেন সন্ত্রস্ত পিতা, '[এ কোন্ ছিরিছাড়া কথা!] বেদাধ্যায়ন সাঙ্গ করে, জায়া সহ জীবন উপভোগ সেরে, ঔরসজাত নিজ পুত্রকে গৃহকর্তা পদে স্থাপন করে, তবে তো যাবে বনে'। ধাপে ধাপে অগ্রসরণের পিতৃ-মন্ত্রণাটি একফুঁয়ে উড়িয়ে দেয় দুই উদাসীন। বলে তারা, '[দেখছেন না—] ব্যাপ্ত হচ্ছে এক শক্তি লোকসমাজে; অভিভূত হবেই লোকসমাজ আরেক শক্তিতে; আর, তার গতায়াত তো অনন্তর।' ধাঁধালো এ উক্তিতে হতচকিত, জিগেস করেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত, 'কাদের কথা বলছ তোমরা?' জবাব দেয় পুত্রদ্বয়, 'মৃত্যু দ্বারা অনবরত আপন্ন মানবজীবন; সময় এলেই জরায় আক্রান্ত হয় মানুষ; অরোধ্য রাত্রির যাতায়াত'।

খ. বৌদ্ধগ্রন্থ : 'হস্তিপাল-জাতক', জাতক[৪]

পুরাকালে বারাণসীবাসী জনৈক পুরোহিত দৈববশে লব্ধ হয়েছিলেন চার পুত্র। নাম তাদের হস্তিপাল, অশ্বপাল, গোপাল ও অজপাল। তাদের জন্মাবধিই পিতার ভয়, অসময়ে বিবাগী হবে না তো সন্তানেরা। পুত্ররা যত বড় হয়, তত উচাটন বাড়ে পুরোহিতের। ব্রাহ্মণটি উচ্চকুলোদ্ভবদের জন্য বিরচিত জীবনাখ্যানে সমর্পিত-প্রাণ। পুরুষের প্রথম কর্তব্য বেদশিক্ষা সমাপন, দ্বিতীয় কর্তব্য বিত্ত উপার্জন ও উপযুক্ত পুত্র-হস্তে পরিজন-অর্পণ এবং তৃতীয় কর্তব্য, (হাত পা ঝাড়া হওয়ার পর) বৃদ্ধাবস্থায় মুনির বেশ ধারণ—অতি চেনা এ আখ্যানটি যখন প্রাণপ্রিয় ছেলেদের স্মরণ করান তিনি, তখন না হস্তিপাল অশ্বপাল-গোপাল বা অজপাল, সে-গল্পে বিন্দুমাত্র সাড়া দেয়। উলটে, প্রাণীমাত্রের আয়ুঃসংস্কারের ক্ষণিকতা বোঝাতে চার যুবকই আদালা করে শোনায় পুরোহিত বাপকে:

'আপনি যতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে, কইছেন কথা আমার সঙ্গে, তার মধ্যেই ব্যাধি-জরা-মরণ আমার দিকে তেড়ে আসছে। অতএব, কিসের কী?'

গ. বৌদ্ধগ্রন্থ : ধম্মপদ : 'শ্লোক সংখ্যা ৪৭'[৫]

'পিতাপুত্রসংবাদ'-এ আছে কুসুম চয়নে মগ্ন মধুকরের গুঞ্জর অকস্মাৎ থেমে যাওয়ার ভীতিপ্রদ প্রসঙ্গ। *ধম্মপদ*-এও আছে একই রূপক। পড়ি তার ৪৭-তম শ্লোকে: 'প্লাবন যেমন সুপ্ত গ্রামকে ভাসায়, তেমনি পুষ্পসংগ্রহে ব্যাপৃতদের হরণ করে মরণ'।

একদিকে নির্দিষ্ট নিয়মচক্রের গুণগান, অন্যদিকে নশ্বরতার বোধ-অনুভবে সঞ্জাত দুর্মর ঔদাসীন্য: এ টানাপোড়েন ফিরে ফিরে নাট্যায়িত হয়েছে প্রজন্মগত ব্যবধান-সংঘাতের আঙ্গিকে।

বিশ্বসাহিত্যে 'দুইপুরুষ'র দ্বন্দ্ব-আলেখ্য সংখ্যায় কিছু কম না। গ্রীক *নিউ কমেডি* থেকে তুর্গেনেভ এর *Fathers and Sons*, সফোক্লিস-এর ট্রাজেডি *Oedipus Rex* থেকে শেক্সপিয়র এর *Romeo and Juliet*, (অথবা *Romeo and Juliet* হয়ে বলিউডি ছবি *কয়ামত সে কয়ামত তক*), রবীন্দ্রনাথের *গোরা* থেকে জগদীশ গুপ্তের অনেক গল্প, ফ্রান্‌জ্ কাফকার 'The Judgement' থেকে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড এর (তাঁর আরো বহু মনোবৈজ্ঞানিক তদন্তালোচনার ভেতর) 'The Family Romance', ইত্যাদি অগণ্য রচনাপত্রে, পিতা/পিতৃপ্রতিম অভিভাবক ও ঔরসজাত পুত্র/ দত্তকপুত্রমধ্যে অভীপ্সাগত বিরোধ নানান মাত্রায় রূপায়িত হয়েছে। অভীপ্সারও আছে তারতম্য। 'দুই পুরুষে'র বনামবিদ্ধ সম্পর্কের কেন্দ্রে কখনো আছে 'রিরংসা'/*eros*, কখনো রাজনৈতিক সংকল্প, কখনো বা নিছক শীত বসন্ত, দুই ঋতুর তিথিডোরগত গরমিল। এই মাত্রাবৈচিত্র্যের ভিড়ে 'মৃত্যুর এষণা'/ মৃত্যৈষণা বা *thanatos*-এর মাত্রাও উপেক্ষিত হয়নি; অনেক স্থলে তো মৃত্যৈষণার সঙ্গেই ওতপ্রোত ভিন্নতর ভুবনের জন্য রাজনৈতিক প্রস্তুতি ও তৎসংক্রান্ত ভাষ্য। প্রচলিত বন্দোবস্তে তৃপ্ত-নিশ্চিন্ত বাবাকে নাড়া দিতে দুরাকাঙ্ক্ষী ছেলেরা বহুবারই শুনিয়েছে মৃত্যুর হুমকি। সংকটের সে মুহূর্তে, স্বাভাবিকভাবেই, পিতাপক্ষ থেকে উদ্‌গত আক্ষেপের বাণীরূপ হয়েছে, 'কিং নু ভীষয়সীব মাম্?', 'ভয় দেখাচ্ছ কেন আমায়?' এবং পুত্রপক্ষ থেকে, 'কিং ধীর ইব ভাষসে?', 'কেন এমন ধৈর্যশীল আপনার ভাষণ?'। এ দু-বাক্য যেন *ধ্রুবপদ*—ভাষায়-বিভাষায়, নানান ছাঁদে, ঢেরবার এরা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই যেমন, *মহাভারত* 'শান্তিপর্ব' অন্তর্গত আখ্যায়িকার চাঞ্চল্যজননক্ষমতায় মুগ্ধ মরিস উইন্টার্নিৎজ-এর গ্রন্থে, J. Muir কৃত 'পিতাপুত্রসংবাদ'-এর ইংরেজি তর্জমায় 'কিং নু ভীষয়সীর মাম্?' ও 'কিং ধীর ইব ভাষসে?' যথাক্রমে হয়েছে, 'What means thy dark, alarming speech?' ও 'And art thou then,my father, wise?'।[৬]

লক্ষ না করে উপায় নেই; শ্রেয়োবুদ্ধি নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে দেওয়া ভীষ্ম-বিমর্শে যে 'প্রাচীন ইতিহাস' কীর্তিত, তাতে চার নয়, আছে তিন অধ্যায়ের কথা; মেধাবীর ব্রাহ্মণ পিতা যে ব্যবস্থার পরম পক্ষপাতী, তা চারাঙ্ক নয়, তিনাঙ্ক সম্পন্ন।

প্রশ্ন এখন : তিনাঙ্কের সঙ্গে কবে যুক্ত হল বাড়তি আরেক পরিচ্ছেদ; কেন, (মেধাবী-তুল্য দর্পিতের) *প্রব্রজ্যা* গ্রহণের, *পরিব্রাজক* বা *যতি* বা *সন্ন্যাসী* হওয়ার অঙ্গীকারও, ব্রাহ্মণ্য যাপনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য উপাঙ্গ হয়ে দাঁড়াল?

এ-প্রশ্নের সদুত্তর পেতে আমাদের ফিরতে হবে অনেক পেছনে; জড়াতে হবে নিজেদের চতুরাশ্রমিক ধারণাকল্পের বংশলতিকায়।

২

আশ্রম গণনায় সংখ্যাবদলের অভিযাত্রা যে-সব গ্রন্থে স্পষ্ট উৎকলিত, তাদের কয়েকটি:

ক. বেদ ও প্রাচীন উপনিষদ

বেদসাহিত্যে তিন বা চার কেন, পরমায়ুকে স্কন্ধে-কাণ্ডে-আহ্নিকে ভাগাভাগি-র দাগভাঁজটুকু নেই; বেদের 'মন্ত্র'/ 'সংহিতা' অথবা 'ব্রাহ্মণ' অংশে আশ্রম শব্দখানি ক্ষণতরেও উচ্চারিত হয়নি।[৭]

তবে, চার যে শব্দ—*ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, যতি*—পরে গায়ে-গায়ে জুড়ে যাবে, তাদের কটি বেদসাহিত্যে স্বল্প কয়েক জায়গায়, বিক্ষিপ্তভাবে উঁকি দিয়ে গেছে।

ঋগ্বেদ ২/১/২-এ আছে *গৃহপতি*। *গার্হপত্য* আছে *ঋগ্বেদ* ১০/৮৫/৩৬-এ—'সুমঙ্গলী বধূ' (*ঋগ্বেদ* ১০/৮৫/৩৩) উদ্দেশে ধাবিত, আজও বিবাহোপলক্ষে ব্যবহৃত, পরিণায়কের প্রেম-সম্ভাষে।[৮]

অথর্ববেদ 'একাদশ কাণ্ড'-এর গোটা একটি 'অনুবাক' *ব্রহ্মচারী* ও তস্য আচার্য বিষয়ক।[৯] *শতপথ ব্রাহ্মণ* ১১/৫/৪-এ পাই বর্ণনা, ব্রহ্মচর্য গ্রহণে উৎসুক এক প্রার্থীকে কাছে *টেনে* (উপনয়তি) বরণ করছেন আচার্য।[১০] *শতপথ ব্রাহ্মণ* ৫/১/৫ : ১৭[১১] (ও *তৈত্তিরীয়োপনিষৎ* ১/১১/১-এ[১২]) 'গুরুর নিকট বাস করে যে' অর্থে 'ব্রহ্মচারী'র আরেক নাম *অন্তেবাসী*। এ-বাদে, (পুরাতন) উপনিষদ্‌মালার মধ্যে *কঠ-মুণ্ডক-ছান্দোগ্য-জাবাল* এ আছে *ব্রহ্মচর্য*।[১৩]

বৈদিকসাহিত্যে *বানপ্রস্থ* কোথাও নেই। তবে, অনেকের ধারণা, 'বনবাসী' মানেতে *বৈখানস* বলে যে শব্দ কচিৎ-কদাচিৎ মেলে, তাতেই উপ্ত ছিল *বানপ্রস্থ*-এর ধারণাবীজ।[১৪]

মজা রয়েছে চারের শব্দে—*যতি*-কে নিয়ে দানা বেঁধেছে খাসা এক বৈদিক দেয়ালা। যদি ধরে নিই, যে *মুণ্ডকোপনিষৎ*-এ 'সত্যমেব জয়তে' (৩/১/৬) প্রতিশ্রুতি প্রণাদিত, সেই উপনিষদের ৩/১/৫ ও ৩/২/৬-এ *যতয়ঃ* শব্দটি যদি 'যতনশীল সন্ন্যাসিগণ' বা *যতি*দের জন্য সশ্রদ্ধায় প্রযুক্ত হয়ে থাকে[১৫]—Max Muller-এর তর্জমায় *যতয়ঃ*-এর প্রতিশব্দ 'spotless anchorities' (৩/১/৫) ও দ্বিতীয়বার 'anchorites'(৩/২/৬);

রাধাকৃষ্ণণের অনুবাদে দু-জায়গাতেই সিধেসাপটা 'ascetic' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বঙ্গানুবাদে একবার 'জ্ঞানী' (৩/১/৫), অন্যবার 'ঋষি' (৩/২/৬); রামমোহন রায়ের ইংরেজি অনুবাদে প্রথমবার 'votaries freed from passion'(৩/১/৫) ও দ্বিতীয়বার 'votaries who.....forsake religious rites'(৩/২/৬); কিন্তু রামমোহন রায়ের বঙ্গানুবাদে দু-স্থলেই সেটি 'যত্নশীল ব্যক্তি'[১৬] —তাহলে, যতি শব্দের প্রাচীনতর প্রয়োগের ব্যাখ্যা বেশ দুষ্কর হয়ে ওঠে। কী দেখি আমরা *ঋগ্বেদ* ৮/৩/৯, ৮/৬/১৮, ১০/৭২/৭, *অথর্ববেদ* ২/১/৫ : ৩, *কৌষিতকী উপনিষদ্* ৩/১ ও আরো অনেক বৈদিক সূক্তে? সম্মান-অভিবন্দন দূরস্থান, সে-সবে আছে বরং যতিদের বিরুদ্ধে আস্ফালনের উৎকট প্রদর্শন। সর্বত্রই এই এক খুশখবর: পুরাকালে যতি-সংহারে, যতি-শিকারে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হতেন *ঋগ্বেদ*-এর দেবনায়ক, বলদর্পী সোমপ্রিয় ইন্দ্র। যতি এবং সন্ন্যাসী সমার্থ, অথচ, আর্যগোষ্ঠীপতি ইন্দ্র যতিদের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বিষ্ট—সমন্বয়-অসম্ভব এ পরিস্থিতি বহু পণ্ডিত ঐতিহাসিককেই গভীর অস্বস্তিতে ফেলেছে।[১৭]

প্রামাণ্য উপনিষদাবলি ও *ভগবদ্গীতা* মধ্যে G.A. Jacob সংকলিত, ১৮৯১ সনে প্রথম প্রকাশিত, সামান্যশব্দের সূচি, *Concordance to the Principal Upaniṣads and Bhagavadīgtā*-র পাতা ওল্টালে দেখা যাবে, *গৃহস্থ*[১৮]-*বানপ্রস্থ*[১৯] *ভিক্ষু*[২০] *আশ্রম*[২১] প্রাচীন কোনো উপনিষদে স্থানই পায়নি।

খ. ছান্দোগ্যোপনিষদ : ২/২৩/১[২২]

'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধা' ('২/২৩/১') : 'ধর্মের বিভাগ তিনটি'।

প্রাচীন *ছান্দোগ্যপনিষদ্*-এর এ শ্লোকে ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য -বানপ্রস্থ পর্বাকারে স্পষ্ট নয়; তবে, এদের ছায়াপাত বিলক্ষণ আছে। শ্লোকটির সন্ধি-সমাসগত জটিলতা বা অদ্বৈত বেদান্তের স্তম্ভ, নিরঙ্কুশ মেধাবী আচার্য শংকর (৭৮০-৮১২) প্রণীত *ছান্দোগ্যপনিষদ্-ভাষ্যম্*[২৩] মান্য করা বা না করার দরুণ বিভিন্ন অনুবাদে তিন ধর্মস্কন্ধে করণীয়তার হেরফের ঘটেছে। শাংকর-পথের পথিকদের পদান্বয় অনুয়ায়ী, ধর্মের প্রথম বিভাগে পড়ে 'যজ্ঞ-অধ্যয়ন-দান', দ্বিতীয় বিভাগে 'তপস্যা' ও তৃতীয় বিভাগে 'গুরুগৃহে যাবজ্জীবন বাসপূর্বক দেহপাতী ব্রহ্মচর্য'।[২৪] আবার, বিকল্প পদান্বয় অনুসারে, প্রথম বিভাগের অঙ্গ 'যজ্ঞ অধ্যয়ন-দান-তপস্যা', দ্বিতীয় বিভাগের 'আচার্যগৃহে লেখাপড়া' ও তৃতীয় বিভাগের 'আচার্যগৃহে আমরণ ব্রহ্মচর্য পালন'।[২৫] *ছান্দোগ্যপনিষদ* ২/২৩/১-এ অবশ্য তিন ধর্মস্কন্ধের অতিরিক্ত রয়েছে সাংকেতিকতায় রাহসিক এক পঙ্ক্তি: 'ব্রহ্মস্থিত যে, সেই পায় অমৃতত্ব'।

গ. জাবাল উপনিষদ্: শ্লোক সংখ্যা ৪[২৬]

'ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেদ্, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেদ্, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ': 'ব্রহ্মচর্য সমাপিত হলে গৃহী হও ; গৃহী হওয়ার পর বনে যাও; বনবাসের পর প্রব্রজ্যা নাও'।

জাবাল উপনিষদ্-এর এ শ্লোকটি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির গলায় ধ্বনিত। ঐতিহাসিক মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত মত: প্রাচীন *জাবাল উপনিষদ্*-এই ক্রমিক জীবনচর্যার চতুঃসীমাটি সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ হয়।[২৭]

তাই বলে ভোলা অনুচিত, বিদেহ-রাজ জনকের কোন্ তত্ত্বসন্ধানের প্রতিক্রিয়ায় সূত্রখানি যাজ্ঞবল্ক্য-কণ্ঠ হতে নিঃসৃত হয়েছিল। যাজ্ঞবল্ক্যকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন জনক, 'ভগবন্, সন্ন্যাসম্ (অনু) ব্রুহীতি', 'মহাশয়, আপনি আমায় সন্ন্যাস বিষয়ে কিছু বলুন'। জানবার ইচ্ছে রয়ে গেল: চার পৈঠা-সোপান ধরে পায়ে পায়ে তরে যাবার মন্ত্রণাতেই কি যাজ্ঞবল্ক্যের সন্ন্যাস-পাঠে ইতি পড়েছিল; না-কি তাঁর পাঠে নিযুক্ত-সঞ্চিত আছে 'বিপজ্জনক' কোনো উদ্বৃত্ত?

ঘ. শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ : ৬/২১[২৮]

এই শ্লোকে অত্যাশ্রমিভ্যঃ শব্দটি আছে। অনুবাদকমণ্ডলী *শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ*-এর শাংকরভাষ্য অনুসরণ করে 'অত্যাশ্রমী' শব্দটিকে 'অগ্রসর সন্ন্যাসী'/'advanced ascetics'এ[২৯], অর্থাৎ, 'আশ্রমধর্ম অতিক্রান্ত' পূজনীয়তে[৩০] তর্জমা করেছেন। এ শ্লোক অবশ্য আশ্রমসংখ্যা নির্ধারণে সাহায্যে আসে না।

ঙ. মৈত্রী।/ মৈত্রায়ণীয় উপনিষদ্ : ৪/৩[৩১]

অমীমাংসিত এক তর্কের মৃদু সংকেত যেন লেগে এ শ্লোকে। শুনি, কে যেন বলছে সেখানে: '[যেমন] স্বধর্মাতিক্রমী হয়ে [প্রকৃত] আশ্রমী হওয়া যায় না, [তেমনি] এ-ও বলা উচিত না যে, আদৌ কোনো আশ্রমের সঙ্গে সংসক্তই নয় তপস্বী'।

চ. অন্যান্য উপনিষদ্

G.A. Jacob সংকলিত *Concordance to the Principal Upanisads and Bhagavadgita* থেকে প্রতিভাত, *চতুর্বিধ* শব্দটি যে উপনিষদে ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ-পরিব্রাজক, চার জনের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত, নাম তার *আশ্রম উপনিষদ্*।[৩২] *ছান্দোগ্য-জাবাল-মৈত্রীর* অতিরিক্ত, চতুরাশ্রমিক পরিকল্পনার ছাপ-সাবুদ রয়েছে আশ্রম উপনিষদ্ সহ তুলনায় অর্বাচীন আরো কটি উপনিষদে। G. A. Jacob-এর সংকলন থেকে মেলে খবর: ব্রহ্মচারিন্ শব্দের কোষে আছে *আরুণেয় উপনিষদ্*[৩৩], গৃহস্থ-র কোষে *কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদ্*[৩৪], বানপ্রস্থ-এর কোষে *বাসুদেব উপনিষদ্* ও যতি-র কোষে ফের *কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদ্*[৩৫]।

ছ. কৌটীলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম[৩৬]

খ্রিঃ পূঃ ৪-র্থ শতাব্দী ও ১৫০ খ্রিস্টাব্দের ভেতর যে-কোনো সময়ে গ্রথিত[৩৭] *অর্থশাস্ত্র*-এর 'প্রথম অধিকরণ' 'বিনয়াধিকারিক'-এর তৃতীয় অধ্যায় শুরুই হয় এ সুসংবাদে, সামাজিকদের স্ব স্ব ধর্মে সুযোজিত রাখলে, তবেই সমাজস্বাস্থ্য অটুট থাকে।

কৌটীল্যের ফরমান-সমূহে কিন্তু সন্ন্যাসীদের প্রতি বিরূপতা টলটলে জলের মতো পরিষ্কার। '২/১/৩২'-এ ঢাক গুড় গুড় ছাড়াই আইন জারি করে গেছেন অর্থশাস্ত্রী: 'বানপ্রস্থজন বাদে আর কোনো ধরনের প্রব্রজিত বা সন্ন্যাসী বসত পাবে না রাজ-জনপদে'। (স্ব-বহিষ্কৃত) সন্ন্যাসীকে আবার 'বহিষ্কার' করার পেছনে গূঢ় কোন্ শঙ্কা রয়েছে, তা প্রায় একনিঃশ্বাসেই উচ্চারিত *অর্থশাস্ত্র*-এ। যে বাক্যে (নির্বাস) সন্ন্যাসীদের জন্যে রাষ্ট্র হয়েছে চিরনির্বাসের সরকারি বিধি, সে বাক্যেই বিজ্ঞাপিত: '[রাজানুমোদিত] নয় এমন কোনো সঙ্ঘের কিংবা [রাজদ্রোহের] সংবিতে আবদ্ধ সংহত কোনো দলের আদপে জায়গা হবে না রাজ-জনপদে'। '৩/২০/১৬'-য় সাবধান করে দিয়েছেন কৌটীল্য, 'দেবপিতৃকার্য', (মানে, যজ্ঞশ্রাদ্ধাদিতে), যে-জন শূদ্র, প্রব্রজিত অথবা ব্রাহ্মণ্য আন্দাজে বেনিয়মী সম্প্রদায়ের সদস্যদের খাওয়ায়-দাওয়ায়, দণ্ডস্বরূপ গুণতে হবে তাকে একশো পণ।

এর মানে অবশ্য এ নয় যে, *অর্থশাস্ত্র*-এ বানপ্রস্থ-উত্তর চতুর্থ আশ্রম সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। তবে, কৌটীল্য-র রাষ্ট্রিক নিদানুযায়ী, চাইলেই হুট করে পরিব্রাজক হতে পারে না কোনো সামাজিক: ভিটে ছাড়ার আগে অন্তত দুটি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া তার দরকার। ২/১/২৯-৩১-এ জানিয়েছেন কৌটীল্য: সমাজপতিরা যাচাই করে নেবেন, প্রব্রজ্যা-ইচ্ছুক (ক) স্ত্রীপুত্রের জীবনোপায়-ব্যবস্থা করেছে কিনা ও (খ) মৈথুনশক্তিতে অপ্রভ হয়েছে কিনা। পারিবারিক দায় পালনে শিথিল হলে অথবা যৌন কারুকরণে সতেজ রইলে, উদ্ভট তার খেয়ালিপনার, ফেরার হবার ফেরেববাজির খেসারত হিসেবে বন্দী রইবে সন্ন্যাসকামী।

জ. স্মৃতির জগৎ

ভাষাব্যাকরণের চালচরিত্র, উদ্ধৃতিবিচারে উত্তমর্ণ-অধমর্ণ নির্ণয়, বিদ্বজ্জনমহলে প্রচলিত কিংবদন্তি, ইত্যাদি তথ্য খতিয়ে Max Müller-এর সহযোগী পণ্ডিতবর্গ সিদ্ধান্ত করেছেন :

* লভ্য স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে *গৌতমস্মৃতি* সকলের পুরোনো[৩৮] ;

* *গৌতমস্মৃতি*-পরবর্তী ধর্মশাস্ত্রধারায় আগে আসে *বৌধায়নস্মৃতি*, তারপর *আপস্তম্বস্মৃতি*, এবং তারপর, *বশিষ্ঠস্মৃতি*[৩৯];

* গৌতম ও বশিষ্ঠের মাঝখানে আরো আছে হারীতস্মৃতি, যমস্মৃতি, দক্ষস্মৃতি, *শঙ্খস্মৃতি*, *সংবর্তস্মৃতি*, *নারদস্মৃতি*, *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা*, *বিষ্ণুস্মৃতি*, *পরাশরস্মৃতি* প্রভৃতি।

* লভ্য প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রগুলি খ্রিঃ পূঃ ৬-৪ শতাব্দীর বস্তু[৪০]।

অন্যদিকে, (অতি-পরিচিত, বহু চর্চিত) *মনুসংহিতা* সম্পর্কে পণ্ডিতমহলের রায় :

* *মনুসংহিতা* অতীব প্রাচীন ও অবলুপ্ত মানবধর্মসূত্র-এর সংক্ষিপ্ত ছন্দোবদ্ধ রূপান্তর[৪১];

* খ্রিষ্টাব্দ শুরুর প্রথম দু-শতকে গ্রন্থিত হয় ওই সংহিতা[৪২] ;

* মনুর ধর্মশাস্ত্রের এক তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকাংশ *মহাভারত*-এ শামিল[৪৩]।

এখন যে অবয়বে *মনুসংহিতা* পাই আমরা, যে সংস্করণের আগে সূত্রবদ্ধ অন্যান্য

ধর্মশাস্ত্র রইলেও, অনস্বীকার্য তার গুরুত্ব—বহুযুগ হল স্মৃতিমধ্যে সবার বলবতী বলে নন্দিত মনুর কীর্তি। প্রাগাধুনিক ভারতে তা সর্বথা ও সর্বত্র মানিত হোক না হোক, ঔপনিবেশিক শাসন-জমানায় (ও ইদানীংকার উপনিবেশ-উত্তর পর্বে) *মনুসংহিতা*-র প্রতাপ বিরাট।

দেখা যাক এবার, আশ্রমবিন্যাস বিষয়ে বক্তব্য কী বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের।

গৌতমস্মৃতি[৪৪]:

চোখে পড়বেই,

* গৌতমের বয়ানে আশ্রম শব্দটি প্রবেশ করেছে; আশ্রমের সংখ্যা চার; কিন্তু সেখানে চতুরাশ্রমের এখনকার চেনা ধাঁচটি নেই।

* বদলে আছে: *ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-ভিক্ষু-বৈখানস* (৩/২)। 'বনবাসী একা তপস্বী'[৪৫] অর্থে *বৈখানস*-এর অগ্রে এসেছে *ভিক্ষু*।

* বেদাধ্যয়নের পর কে কোন্ আশ্রমে যাবে সে তার নিজস্ব ব্যাপার—জনৈক পূর্বাচার্যের এ মতটি উদ্ধৃত গৌতমের শাস্ত্রে (৩/১)।

* চার আশ্রমের প্রসঙ্গ পাড়ার অল্প পরেই, পুরো ব্যবস্থাটা নিজেই উড়িয়ে গেছেন শাস্ত্রকার। যুক্তি গৌতমের : 'বলেননি কি পূজ্য [পূর্ব] আচার্য, প্রকৃত প্রস্তাবে গার্হস্থ্যই একম্ আশ্রম, কারণ, প্রত্যক্ষবিধান কেবল গার্হস্থ্য বিষয়েই মেলে' (৩/৩৬)।

বৌধায়নস্মৃতি[৪৬]:

নজরে পড়বেই,

* চার আশ্রম পর পর উল্লিখিত (২/৬/১১:১২)।

* গৌতমের ৩/৩৬ যুগপৎ প্রতিধ্বনিত ও প্রসারিত বৌধায়নের ২/৬/১১:২৭ সূত্রে: 'শ্রদ্ধেয় আচার্যের অভিমত, সত্যিকারের আশ্রম একটিই, গৃহাশ্রম; কেননা, অন্য তিন (তথাকথিত) আশ্রমে প্রজনন অসাধ্য'।

* আর ঠিক এর পরের সূত্রে চতুরাশ্রম তত্ত্বধারণার ওপরেই ক্ষেপে ওঠেন বৌধায়ন। বেশ উষ্মাই প্রকাশ পায় তাঁর এ 'পুরাণ'-তর্পণে : 'কপিল নামের অসুর ছিল প্রহ্লাদের ছেলে। দেবতাদের সঙ্গে লাগবে বলে ওই ব্যাটাই চতুরাশ্রমিক বিভাজন করেছিল। কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তিরই ও তত্ত্বে কর্ণপাত করা উচিত না (২/৬/১১:২৮)'।

আপস্তম্বস্মৃতি[৪৭]:

দেখা যাবে,

* ২/৯/২১ :১ সূত্রে আশ্রম তত্ত্বের গোড়াপত্তন হলেও, আশ্রমনামগুলি খুব কিছু চেনা পরিচিত না। আপস্তবের ধর্মশাস্ত্রে তারা : *গার্হস্থ্যম্-আচার্য্যকুলম্- মৌনম্-বানপ্রস্থম্*। এই একস্থলে গেরস্থ প্রথমাশ্রমভুক্ত বহয়েছে।

* অল্প এগিয়েই জানান আপস্তম্ব : টুকরো কটি শ্রুতি বাক্য দর্শিয়ে কেউ কেউ দাবি করেন, গৃহধর্মবিরোধী সংযমধর্মই সর্বোৎকৃষ্ট; কিন্তু বেদের ওপর কথা চলে না আর, বেদজ্ঞদের অভিমত, যজমান গৃহীর উর্দ্ধে নেই কেউ, কেননা, গৃহীকর্ম-বিরুদ্ধ আচারের পক্ষে সমর্থন-বিধিই নেই (২/৯/২৩ : ৯-১০) কোনো।
* আরো একটু এগিয়ে, প্রজাপতির স্বর ধার করে, বেশ রাগতভাবেই বলেন আপস্তম্বঃ ত্রিবেদের অধ্যয়ন, অপত্য-জনন, যজ্ঞ দান, এই তিনই কর্তব্য; এদের অন্যথা করার মন্ত্রণা যে জোগায়, ধুলোয় মিটিয়ে সর্বনাশ হয় সে অলপ্পেয়ের (২/৯/২৪ :৭-৮)।
* সাধে চারাশ্রম আলোচনার একেবারে অন্তে চারাশ্রম ধারণাটির বিরুদ্ধেই সরব আপস্তম্বঃ 'সব সত্ত্বেও একের আগে অন্য আশ্রমকে বসানোয় ন্যায়সংগতির নামগন্ধ নেই' (২/৯/২৪ : ১৪)।

মোটমাট:

* *হারীতস্মৃতি* চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ অধ্যায়[৪৮], *দক্ষস্মৃতি* ১/৩[৪৯], *শঙ্খস্মৃতি* তৃতীয় থেকে সপ্তম অধ্যায়[৫০], *বশিষ্ঠস্মৃতি* সপ্তম থেকে দশম অধ্যায়[৫১], *সংবর্তস্মৃতি* শ্লোক সংখ্যা ১০৬[৫২] —সবেতেই চতুরাশ্রম বহাল; তবে নামগত সামঞ্জস্য নেই।

* *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা*-র 'প্রায়শ্চিত্যাধ্যায়'-ভুক্ত ৫৬-তম সূত্র 'অথ যতিধর্মপ্রকরণম্'-এ মেলে অনুমতি, গৃহ বা বন, দু-জায়গা থেকেই যতি হওয়া যায়; অর্থাৎ, তেমন ইচ্ছে হলে, তিনের আশ্রম টপকে সরাসরি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে গেরস্থ। কিন্তু তার আগে একই অধ্যায়ের ৬ সংখ্যক সূত্রে পাই দুঃসংবাদ, 'পাখণ্ড্যনাশ্রিতাঃ', পাখণ্ড্য/ পাষণ্ডের আশ্রম নেই।

* *বশিষ্ঠস্মৃতি*-র বিধানঃ রইলেও চার আশ্রম, *ব্রহ্মচর্য* সমাপন করে ব্রহ্মচারী বাকি তিনের যে কোনোটি বেছে নিতে পারে (সপ্তম অধ্যায়)।

* *যমস্মৃতি* সূত্র সংখ্যা ৪-এ শুনি *বানপ্রস্থে* গিয়েও যে ফিরে আসে সে ইহলোক-পরলোক দুই-ই খোয়ায়।

* *নারদস্মৃতি*-র প্রারম্ভেই আছে 'মনুস্মৃতির বিবৃতি'। আছে তাতে বার্তাঃ মানবসৃষ্টির প্রথম যে পর্যায়ে মনু তাঁর সংহিতা প্রণয়ন করেছিলেন, তখন ওই সংহিতার ব্যবহারিক কোনো প্রয়োজন ছিল না, কেননা, সে সময় সকলেই ছিলেন নিষ্কলুষ, বেলমোক্তা শিষ্টাচারী; বর্তমানকাল স্থির-অনুদ্বেল হলেও, মানব-ভবিষ্যৎ বেশ অন্ধকার, এ কথা অনুভব করেই মনু গড়েন তাঁর ধর্মশাস্ত্র; মনুর সে অহৈতুকী হিতৈষণায়, আরো অনেক কিছু সমেত, বর্ণাশ্রম-এর সুচারু বন্ধনে ধন্য হয়েছে মনুষ্যজাতি।

প্রশ্ন এখন। মনুর ধারাবিবৃতি ধরনধারণে কেমন?

মনুসংহিতা : [৫৩]

(হলেও ধর্মশাস্ত্র), মনুর শাস্ত্রে ধর্ম-ই সবচেয়ে সমস্যাজর্জর তত্ত্বকল্প, অর্থভারে

ভাঙো-ভাঙো। একস্তরে, প্রবোধ জোগান মনু, *ধর্ম* অর্থে প্রকৃতি মূলত ভালো, শুভদ-বরদ এবং তা *ধর্ম* অর্থে সমাজ বা সংস্কৃতির সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় খাপসই। আরেক স্তরে, শঙ্কা জাগান মনু, *ধর্ম-প্রকৃতি* মূলত মন্দ, *ধর্ম-সমাজ* রাশ না ধরলে, স্বতই উদগ্র রইবে তার রক্তালু হিংস্র দন্তনখ, চলবেই মৎস্যান্যায়বৎ কারবার, নিরস্ত হবে না আত্মভুকের পরসংহার। এর ফলে, যাঁর কাজ অনেক বেড়ে গেছে, তিনি রাজা। কারণ, সুমঙ্গলী প্রকৃতির শ্রীবর্ধন তথা অমঙ্গলে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ, দুই-ই সুধর্মা রাজার করণীয়। *ধর্ম* জড়িত শাব্দিক টানাবুনায় মনুর বয়ানে তৈরি হয়েছে দুস্তর স্ববিরোধ। একদিকে, *ধর্ম* তাতে বর্ণনাত্মক, অস্যার্থ যার, প্রকৃতি ও সংস্কৃতি সুসমন্বিত, পেট পুরে খাওয়া-দাওয়া ভালো, শৃংগার-শীৎকার ভালো, প্রবৃত্তির আলোড়নে সাড়া দেওয়া ভালো। অন্যদিকে, *ধর্ম* তাতে বিধানত্মক, অস্যার্থ যার, প্রকৃতিকে বাগে আনতে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ নিতান্ত জরুরি, খানা পিনা-রতিবিনোদ, শিশ্নোদরতার যতেক যন্ত্রতন্ত্রই, বিপদগর্ভ। এ দু- প্রবণতার জন্যই মনু-বয়ানে অনুশাসন বা Law অর্থে *ধর্ম* দ্বিমুখী।[৫৪] এই যেমন: *মনুসংহিতা* ৫/৫৬-য় পাই আশ্বাস, মাংসভক্ষণে, মদ্য-পানে, মৈথুন-সেবায় কোনো দোষ নেই, কেননা ও সবে প্রবৃত্ত হয়েই জীবনধারণ করে মানুষ; আবার, ঠিক তার পুরোবর্তী শ্লোকে, pun ধ্বনি চাতুরিতে মাম্ ('আমাকে') ও সঃ ('সে') মিশিয়ে 'মাংস' ('মাম্ + সঃ') শব্দটি বাজিয়ে ভয় দেখান মনু, এখানে যার মাংস খাচ্ছি আমি, সে-ই আমাকে চিবোবে সেখানে, 'He whose meat in this world do I eat will in the other world me eat' (৫/৫৫)[৫৫]। (অবশ্য, এই pun টির উপর স্বত্ব কার, মনুর না মহাভারতকারের, তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। কেননা, *মহাভারত*-এর 'অনুশাসনপর্ব' ১১৬/৩৪-এর 'মাং স ভক্ষয়তে....'[৫৬] বাক্যে ভেঙেই বোঝানো আছে 'মাংস'-এর মানে: 'আমাকে (মাং) সে (সঃ) পূর্বজন্মে খেয়েছে, অতএব আমি তাকে খাব—"মাংস" শব্দের এই তাৎপর্য'[৫৭]। এছাড়া, *শতপথ ব্রাহ্মণ* ১২/৯/১/১-এ বলা আছে, 'ইহলোকে মানুষ যা ভক্ষণ করে, পরলোকে তা-ই তাকে ভক্ষণ করে'।[৫৮])

প্রকৃতি-সংস্কৃতির (অনিবারণীয়) মিতালি-সংঘাতকে 'স্থাণু ভারসাম্য' বা 'Stationary equilibrium'-এর মাত্রাধীন করতে মনু (অনিবার্যত) ফিরে তাকান (অতীত) কল্পদেশকাল 'সত্যযুগ'-এ। ১/৮১-তে মেলে মনুর বরাভয়: সত্যযুগে চতুষ্পাৎ ধর্ম সর্বাঙ্গে বিদ্যমান ছিল। মহত্বে যেমন বিরাট 'সত্যযুগ', আর্থপরিসরে তেমনি ব্যাপক 'চতুষ্পাৎ'। ওই 'চার পা'-র অঙ্কে বিধৃত যজ্ঞ-সম্পাদক চার *ঋত্বিক* (হোতা-ব্রহ্মা-উদ্গাতা-অধ্বর্যু), চার *ধর্মাঙ্গ* (যাগ-দান-তপঃ-জ্ঞান), চার *বর্ণ* (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র) ইত্যাদি আরো হাজারো তত্ত্বাবয়ব।[৫৯]

বলা বাহুল্য, 'শৃঙ্খলা'-র চরম বিধায়ক (ও 'আপৎকালীন বিশৃঙ্খলা' মোকাবিলায় চটব্যবস্থাপক) মনুর 'চতুষ্পাৎ' ফিরিস্তিতে চতুরাশ্রমও আছে। এই তো লিখিত তাঁর সংহিতার ৬-এর অধ্যায়ের ৮৭ তম শ্লোকে: 'ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি—পৃথক পৃথক এই চারি আশ্রম....'।

এই সঙ্গে লক্ষণীয়:

(i) চতুর্থাশ্রমের সচেষ্ট ও সচেতন বিলম্বায়ন:

বারো অধ্যায়ের *মনুসংহিতা*-র গোটা এক অধ্যায়, ষষ্ঠ অধ্যায়, মূলত 'সন্ন্যাস' সংক্রান্ত। লিপিবদ্ধ আছে ৬/১-২ ও ৬/২১-২২ ও ৬/৩৩-এ: অধ্যয়ন-উত্তর স্নাতক গেরস্থ হবে এবং গেরস্থ যখন দেখবে, তার গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে, চুল পেকে গেছে ও তার ছেলেরও ছেলে হয়েছে, [কেবল] তখনই সে অরণ্যে আশ্রয় নেবে; নিজ শরীর 'পর আটবিক প্রৌঢ় নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে: যথা, পুষ্প-মূল-ফল দ্বারা সর্বদা জীবিকা নির্বাহ করবে, এই ভূমিতে গড়াগড়ি দেবে তো ওই সারাদিন একপায়ে বুড়ো আঙুলে খাড়া রইবে; [বানপ্রস্থকালীন নিতান্তই যদি যমের শমন না আসে], তবেই জীবনের তৃতীয় ভাগ-যাপনকারী প্রবেশ করবে সন্ন্যাসাশ্রমে। নিঃসন্দেহে, জীবনের চতুর্থ ভাগ যাপন ব্যাপারটি যত সংকুচিত, যত হ্রস্ব করা যায়, সে দিকে প্রয়োজনেরও অধিক মনোযোগ ছিল মনুর।

মনুসংহিতা-র অন্তিম অধ্যায়ে দ্বাদোশাধ্যায়ে পড়ি বটে, 'বৈদিক কর্ম দ্বিপ্রকার; প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক' (১২/৮৮), 'ইহলোকে বা পরলোকে সুখলাভের ইচ্ছা প্রবৃত্তির চালক আর নিষ্কাম জ্ঞান নিবৃত্তির' (১২/৮৯), 'এমনকী, এ পর্যন্ত বিবরিত সব কর্ম পরিহার করেও আত্মজ্ঞান, শম ও বেদাভ্যাস-এ যত্নবান্ হবেন দ্বিজোত্তম' (১২/৯২) , তবে, বাকি বইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, (কেমন-কেমন, খাপছাড়া শোনালেও), প্রকীর্ণ এই সব পঙ্‌ক্তি থেকে চতুরাশ্রমিক সাংগঠনিকতা বিরোধের সমর্থন আদায় মুশকিলের।

এত সবের ভেতর, *মনুসংহিতার*-র ছয়ের অধ্যায়ের উপান্তে, ৬/৮৬-তে আছে স্ববিরোধে আকীর্ণ, অস্বস্তিকর একটি মন্তব্য। বলা হয়েছে সেখানে : ' বেদসন্ন্যাসিকদের কর্মযোগ কেমন হওয়া উচিত, শোনো'। এ-বাক্যটিতে, ('পিতাপুত্রসংবাদ'-এর মেধাবীর মতো উলটো-গায়েন) কেউ যুক্তিবিভ্রাটের গন্ধে আমোদিত হতেই পারেন। তর্ক উঠতেই পারে : 'বেদসন্ন্যাসিক' যে সে তো বেদবিধির সমুচয় বাঁধন-ছিন্ন মুক্তপুরুষ আর 'কর্মযোগ'-এ নিরত যে সে তো ঠিক ওই বেদবিধির প্রতিই বিশ্বস্ত, নিয়মানুবর্তী কেউ; তাহলে, 'বেদসন্ন্যাসিক'-এর বেলায় 'কর্মযোগ'-এর প্রসঙ্গোত্থাপন কি অযৌক্তিক না? মনুস্মৃতি ৬/৮৬-কে ন্যায়সিদ্ধ করতে টীকাকারবৃন্দ রায় দিয়েছেন: চতুর্থাশ্রমিকের বৈদিক যজ্ঞাদির দায় ঘুচলেও, বেদ-আবৃত্তির দায়িত্ব রয়েই যায় ; সুতরাং, বেদপাঠই 'বেদসন্ন্যাসিক'-এর কর্মযোগ'![৬০]

(ii) চতুরাশ্রমের ভিতর-বাহির:

মনুসংহিতা ১০/৪ মোতাবেক, 'ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য দ্বিজ; চতুর্থ বর্ণ শূদ্র একজাতি; এবং পঞ্চম বর্ণ বলে কিছু নেই'। 'নাস্তি তু পঞ্চমঃ', 'and there is no fifth' (১০/৪) বাক্যাংশটির সিধে তাৎপর্য পরের শ্লোকে খোলসা যেমন তেমনি হেঁয়ালি ভরাও। চতুর্বর্ণের আওতার কে বা কারা নির্ধার করতে অনুলোম বিবাহ-জাত, অর্থাৎ,

উচ্চবর্ণের পুরুষের ঔরসে নিম্নবর্ণের নারীর গর্ভে জাত সন্তানদেরও, গুনতিতে এনেছেন মনু ('আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা': ১০/৫)। এতে মহা বিপাকে পড়েছেন টীকাকারগণ।[৬১] মেধাতিথি, গোবিন্দ ও কুল্লুকভট্ট, (গণ্ডগোলে বিষমবর্ণে-পরিণয় *অনুলোম* শব্দটি সযত্নে পাশ কাটিয়ে), একস্বরে বলেছেন, এখানে মনুর বক্তব্যসার: 'স্বপরিণীতা ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণকর্তৃক সমুৎপাদিত সন্তান ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়কর্তৃক স্বীয় ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভ-সমুৎপাদিত সন্তান ক্ষত্রিয়; বৈশ্যকর্তৃক স্বপরিণীতা বৈশ্যার গর্ভ-সমুৎপাদিত সন্তান বৈশ্য; ও শুদ্র কর্তৃক স্বীয় শূদ্রা পত্নীর গর্ভ-জাত সন্তান শূদ্র'। আরেক টীকাকার নারায়ণ, আরেক ধাপ এগিয়ে জানিয়েছেন: (অনুলোম কেন) পাত্রীর বয়স পাত্রের চেয়ে বেশি হলেই সন্তানরা জাতিপরিচয় হারায়; বৈধ উপায়ে বিবাহ সম্পাদিত হলেও, ব্রাহ্মণ ঘরে বরের চেয়ে বউ বয়সে বড় হলে, তাদের অপত্যরা ব্রাহ্মণ বলে পরিগণিত হয় না![৬২] এতৎসত্ত্বেও, মূলশাস্ত্রের ১০/৫-এ যা-ই উভবলতা থাক, মনুর অন্যান্য বিধানের সঙ্গে টীকাকারগোষ্ঠী প্রদত্ত মনুসংহিতা ১০/৫-এর টীকা পুরো খাপসই। নিষ্কর্ষ : ধর্মশাস্ত্রীয় বিবেচনায়, চতুর্বর্ণের সদস্যবর্গ নির্ধারের মাপকাঠি একটিই : *জন্ম*। ঠিকুজি ঠিকঠাক হলে, তবেই চেনা যায় কে খাঁটি ব্রাহ্মণ/ ক্ষত্রিয়/ বৈশ্য, আর কে-ই বা খাঁটি শূদ্র। সনাক্তিকরণ-এর এ প্রণালী মঞ্জুর হলে, তবেই ওঠে 'গুণ'-এর পরিপ্রশ্ন; মনোনিবেশ করা যায় এমনকী, 'ভালো' ব্রাহ্মণ 'মন্দ' ব্রাহ্মণ নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে। এই যেমন: মনুসংহিতা ১/৯৮-এ সাড়ম্বরে ঘোষিত, 'বিপ্রের উৎপত্তিমাত্রই ধর্মের শাশ্বত মূর্তি'; আর, ১/৯৭-এ গুণের মাপাঙ্কে অবধারিত বিপ্রের থাক-অবস্থান। বিপ্রসমাজে উচ্চাবচতা এইভাবে নিরূপিত : বিদ্বান সেরা ব্রাহ্মণ; বিদ্বানের চেয়ে উঁচু *কৃতবুদ্ধি*; কৃতবুদ্ধির ওপর কৃতবুদ্ধির *প্রয়োগ কর্তা*; প্রায়োগিকবিবেকে ঋদ্ধ ব্রাহ্মণেরও উঁচু *বেদজ্ঞানী* (১/৯৭)।

নবজাতককে তার জন্ম-প্রতিবেশের শর্তে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলার বিরুদ্ধে শ্রুতি ঐতিহ্যে, ইতিহাস বা *মহাভারত*-এ ইতস্তত ও অ-ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে অসংখ্য সমালোচনা আছে, তবু, (মনু সহ সমস্ত) ধর্মশাস্ত্রীই সকল প্রকার উত্তরপক্ষীয় প্রতিবাদ মোটের ওপর অগ্রাহ্য করেছেন। উদাহরণ : *সামবেদ* ভুক্ত ৯ শ্লোকের ছোট্টো *বজ্রসূচিকা উপনিষদ্*।[৬৩]

বজ্রসূচিকা উপনিষদ্-এর ১-ম শ্লোকেই বক্তা ঋষিকে বলতে শুনি আমরা : 'যে শাস্ত্র অজ্ঞানীদের দূষণ ও জ্ঞানীদের ভূষণ, সেই বজ্রসূচি বিবরিত করছি এবার'। অতঃপর শুনি: 'আছে চার বর্ণ : ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র ; বৈদিক শাস্ত্রে উক্ত আছে ব্রাহ্মণ হলেন প্রধান বর্ণ; সমতুল বচন বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থেও রয়েছে; এ সব থেকে অনুসন্ধানযোগ্য চমৎকার এক প্রশ্নের অবতারণা করা যায়; প্রশ্নটি হল, ব্রাহ্মণ কে; সে কি জীব, সে কি দেহ, না কি জাতি মাত্র; সে কি জ্ঞান, সে কি কর্ম, নাকি প্রথামাফিক ধার্মিক মাত্র (শ্লোক ২)? না, ব্রাহ্মণ জীব নয় (শ্লোক ৩)। না, ব্রাহ্মণ দেহ নয় (শ্লোক ৪)। না, জন্মসূত্রে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না (শ্লোক ৫)। না, জ্ঞানের ওজরেও ব্রাহ্মণকে আলাদা করা

যায় না (শ্লোক ৬)। না, কর্ম দিয়ে ব্রাহ্মণকে শনাক্ত করা যায় না (শ্লোক ৭)। না, ধর্মনির্বাহ ব্রাহ্মণের একচেটিয়া কিছু না (শ্লোক ৮)। তাহলে, ব্রাহ্মণ কে? উত্তর : জাতি-গুণ-ক্রিয়াহীন যে, করতলে আমলকিবৎ সাক্ষাৎ আত্ম-দর্শনে সক্ষম যে, সেই ব্রাহ্মণ; এবং, এ-ই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-ইতিহাস এর প্রকৃত অভিপ্রায় (শ্লোক ৯)'।[৬৪] (যদিচ, *বজ্রসূচি উপনিষদ্*-এর নয়ের শ্লোকে, ব্রাহ্মণত্ব নির্ধারণের জন্য জন্মকে মাপকাঠি না করার দরুণ স্মৃতিরও স্তুতি আছে, তা-ও কেমন যেন মনে হয়, ওটি আকাড়াঁ ব্যাজস্তুতি।)

ধর্মশাস্ত্রিক ব্যাকরণে, শূদ্র জনক ও শূদ্র জননীর সন্ততি সুনিশ্চিতভাবে শূদ্র, পিতামাতার সমজাতিকতার প্রসাদে চতুর্বর্ণ-কাঠামোর অন্তর্গত, কিন্তু সে একজাতি, দ্বিজ নয় (*মনুসংহিতা* ১০/৪)। কী গতি হয় দ্বিজত্বে অনধিকারী শূদ্রের?

মনুসংহিতা-র একেবারে গোড়ার অধ্যায়ের ৯১-তম শ্লোকে শুনি, 'শূদ্রের জন্য একটি কাজই নির্দিষ্ট করেছেন প্রভু। সেটি হলঃ অসূয়াশূন্য হয়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সেবা-শুশ্রুষা করে চলা।' *অর্থশাস্ত্র* ১/৩/৮-এ শূদ্রদের জন্য দ্বিজসেবা বরাদ্দ করলেও, শূদ্রদের হাঁফ ফেলার একটা ব্যবস্থাও দিয়েছিলেন কৌটীল্য। 'বার্ত্তা' মানে, কৃষি পশুপালন-বাণিজ্য, 'কারুকর্ম', এবং জনমনোরঞ্জনার্থে গীতবাদ্য সহযোগে কথকতা-ভাটচারে দক্ষ 'কুশীলব' হওয়া—শূদ্রের পক্ষে এ তিন জীবিকা বাছায় কোনো বারণ নেই *অর্থশাস্ত্র*-এ। *মনুসংহিতা*-য় অবশ্য এমন ছাড় নেই। অর্থাৎ কিনা, দ্বিজ-জীবনে কালানুক্রমিক পরিবর্তন গ্রাহ্য, কিন্তু, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি একই ধারায় কালাতিপাত করুক শূদ্র, এই ছিল মনুদেবতার অভিপ্রায়। ১০/৪ মাথায় রেখে ১/৯১-এ উপস্থাপিত 'অসূয়া নিন্দাহীন'[৬৫], 'meck'[৬৬], 'resentment বিহীন'[৬৭] আদর্শ শূদ্রের ভাবমূর্তিতে দৃষ্টি সংহত হলেই বোঝা যায়, স্মার্তকুলগুরু মনুর বিবেচনায়ঃ

এক. চতুরাশ্রমের প্রকল্পটি আদৌ অ-দ্বিজদের নিমিত্ত সংগঠিত নয়; এবং

দুই. চতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই জিইয়ে রাখা যায় দ্বিজাদ্বিজ-এর ভিতরকার ভেদরেখা। হতেও পারে, 'আর্য' ও 'দস্যু' নিয়ে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন যে দ্বণুক বিন্যাসটি ঋগ্বেদ-এর মণ্ডলে-সূক্তে-ঋকে-ঋকে ধুয়োর মতো ফিরে ফিরে আসে, যে মনোদেশে স্বচ্ছন্দেই গর্ব করা যেত, যারাই 'আর্য' নয় তারাই 'দস্যু', যারাই আমাদের, মানে, আর্যদের মতো নয়, তারা-ই 'অকর্মা', 'অন্যব্রতঃ' ও 'অমানুষ' (*ঋগ্বেদঃ* মণ্ডল ১০, সূক্ত ২২, ঋক ৮)[৬৮], সেই নিপুণ বিন্যাস ও দৃঢ় মানসিকতা নিগূঢ় আছে দ্বিজ-অদ্বিজ ফারাকে।

শতপথ ব্রাহ্মণ 'অষ্টম কাণ্ড' জুড়ে আছে 'অগ্নিচয়ন'-এর কার্যবিবরণীঃ ইট পর ইট তুলে, সোপান পর সোপান বেঁধে তৈরি হচ্ছে পবিত্র অগ্নিকুণ্ড; স্তব-অর্চনায় পুনঃসঞ্জীবিত হচ্ছে ব্রাহ্মণ, সপ্তর্ষি, পিতৃকুল, ঋতু-মাস, ক্ষত্র, জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি সৃজনের (রোমাঞ্চক, জাদুময়) পলগুলি ('৮/৪/৩: ৪-১১, ১৩-১৯') ; এরই ভেতর আসে জোড়ায় প্রজাত

দুই প্রাণীর কথা; ৮/৪/৩:১২-র বৃন্দসংগীতে জাগৃত হয় যৌথস্মৃতি, 'সৃষ্ট হল [অতঃপর] শূদ্র ও আর্য', 'দিবসরাত হল তাদের অধিপতি'। (*শতপথ ব্রাহ্মণ* ও অন্যান্য অতিবৃদ্ধ পাঠে নিত্য-আবৃত্ত) 'আর্য'-'শূদ্র'-এর (অপরিমোচনীয়) বনামবিদ্ধতাই *মনুসংহিতা* (ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে) আইনি আকারে রূপায়িত।[৬৯] তাঁর সংহিতায় ২/১৭-য় 'দেবনির্মিত' দেশ ব্রহ্মাবর্ত-র ভূয়ষী প্রশংসা সেরে, ২/১৮-য় বিধান দেন মনু, ব্রহ্মাবর্তে যুগ-পরম্পরায় চার বর্ণ ও সঙ্করজাতি পালিত আচারই *সদাচার*। ২/২৩-এ ভিন্ন এক দেশিক মাত্রা অবলম্বনত দর্শান মনু : দ্বিধায় গ্রস্ত ধরণী—একধারে তার যজ্ঞোপযোগী, *যজ্ঞিয় দেশ*, অন্যধারে, যজ্ঞ-অনুপযোগী, *ম্লেচ্ছদেশ*। আর তারপরই, ২/২৪-এ ভৌগোলিক স্বত্বাধিকার নির্ণয়ত (খোলা মনে) জানান মনু, দ্বিজগণ (ব্রহ্মাবর্তাদি) *যজ্ঞিয় দেশ*-এ সযত্নে বসতি গাড়বেন ও গ্রাসাচ্ছদনে ক্লেশ-অনটন ঘটলে, (*ম্লেচ্ছদেশ* ছেড়ে সাময়িকভাবে), যে কোথাও ঘর বাঁধবে শুদ্দুররা। আর্য লজ্জে মুখ পাকালেও ম্লেচ্ছরা যে জাতে 'উঠবে' না, তা পাকা করতে ১০/৪৫-এ মনু কাজে লাগান *ঋগ্বেদ*-এর (প্রখ্যাত) 'পুরুষসূক্ত' ও *ঋগ্বেদ*-এ অগণ্যবার ব্যবহৃত 'দস্যু' শব্দটি। বলেন: যাদেরই জন্ম '[পুরুষ/ব্রহ্মার]মুখ ব্রাহ্মণ হল, দুই বাহু রাজন্য হল, যা উরু ছিল তা বৈশ্য হল, দু-চরণ হতে শূদ্র হল'-র[৭০] [ঋগ্বেদ, ১০/৯০/১২] প্রতিজ্ঞাকল্প মেনে হয়নি, যারাই মুখ-*বাহু-উরু-পদ* হতে জাত নয়, (অপৌরুষেয়, ম্লেচ্ছ)সেই আর্য-ভাষী হলেও, সব লোক, দস্যু—এ-ই চিরাচরিত'। সব মিলিয়ে ছবি : দ্বিজ সম্প্রদায় ত্রিবিভাজিত; শূদ্র-কে নিয়ে বর্ণ-অঙ্ক চার-এ পৌঁছেছে; তা-ও, 'আমরা-ওরা'য় নিখিলচরাচরকে ভাগাভাগি করার খেউড়ে খেয়োখেয়ির *অমৌল-দ্বন্দ্ব* তথা যাবতীয় *মৌল-দ্বন্দ্ব* রূপায়িত করার আধার সংখ্যা, সহারা-সংখ্যা দুই, চতুর্বর্ণ-কল্পনায় পুরোদস্তুর বহালও।[৭১]

মনুসংহিতা-র (তথা অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থের) এ বিধি ও বিধিতে আভ্যন্তর যা-ই বিসংগতি থাক, শূদ্র সম্বন্ধে একটি অনুসিদ্ধান্তে কোথাও কখনো স্খলন ঘটে না। অনুসিদ্ধান্তটিকে এ-ভাবে সাজানো যায় :

শূদ্র সে, যে বর্ণাশ্রম বন্দেজে একাধারে অন্তর্ভুত বহিঃস্থ ও বহির্ভূত অন্তঃস্থ : চতুবর্ণে শামিল ও চতুরাশ্রমে অ-শামিল হওয়াও বর্ণাশ্রমিক বন্দোবস্তে একইসঙ্গে হাজির এবং গায়েব শূদ্র, না-থেকেও-আছে এবং থেকেও নেই সে।

এ নাহয় গেল সমজাতিক পিতামাতার সন্তান হিসেবে কল্পিত বিমূর্তবর্ণ-এর কথা। কিন্তু যারা 'পঞ্চমবর্ণ'-ও নয়, অথচ দিব্যি চোখের সামনেই নিচ্ছে প্রশ্বাস, ছাড়ছে নিঃশ্বাস, অগণ্য সে মিশ্রজাতের মানুষদের কী হবে? 'জন্মকলঙ্কে' দাগীদের সংখ্যাপ্রাচুর্য সামলাতে, ধর্মব্যাকরণ ফের ধরে বিমূর্ত শ্রেণীকরণের পন্থা—প্রাক-সংজ্ঞায়িত একক অনুযায়ী, অঙ্ক কষে বর্গে বর্গে বিভাজিত সেখানে 'অ-শুদ্ধ' জাতকেরা।

না মেনে জো নেই, *অঞ্চলায়ন* বা *territoriality* সম্বন্ধে মনুর বোধ ছিল প্রখর। তাদ্দরুনই 'বহির্ভাগ' তত্ত্বধারণাটি যাতে বিবিধার্থে অস্বচ্ছ না হয়, সে-ব্যাপারেও অতিসতর্ক

তিনি। এই অতিসতর্কতা থেকেই প্রসূত মনুর দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্ত। সেটি এই:

(অনুলোম বিবাহ নিয়ে প্যাঁচ রইলেও), *নিম্নবর্ণের পুরুষের ঔরসে উচ্চবর্ণের নারীর গর্ভে প্রতিলোম বিবাহে সম্ভূত সন্তানদল একইসঙ্গে চতুর্বর্ণের ও চতুরাশ্রমের বহির্ভাগে, মানে, বর্ণাশ্রমেরই বাইরে অবস্থিত।*

ব্রাহ্মণ্য *অধঃপ্লায়ন*-এর খাতিরেই (ঘেন্নার) প্রতিলোমদের—এই যেমন, শূদ্র পিতার ঔরসে ক্ষত্রিয়া মাতার গর্ভে উৎপাদিত *পৌল্কস* কিংবা শূদ্র পিতার ঔরসে ব্রাহ্মণ মাতার গর্ভে উৎপাদিত, নীচস্য নীচ, হীনস্য হীন, *চণ্ডাল*—বাসযোগ্য তল্লাট খোঁজার কাজে শ্লোকের পর শ্লোক অকাতরে ব্যয় করেছেন মনু।

'বর্ণসংকর' (১০/১২) বা 'Confusion of the castes / classes'[৭২] অভিধায় বিদিত সমাজস্বাস্থ্যের পক্ষে ঘোর অহিতকর ঘটনাটির সবচাইতে সমূর্ত সাক্ষী *চণ্ডাল*; শূদ্র-স্পৃশ্য ব্রাহ্মণকন্যার উদরজাত মনুষ্যরা, মনুর ভাষায় তাই, 'নরাধম' (১০/১২), 'the lowest of men'/'the worst of men'[৭৩]। বর্ণাশ্রমের বার, ওই অস্পৃশ্য অন্ত্যজরা কোন্ মহল্লায় কোন্‌ভাবে কাল-গুজরান করলে স্বস্তিতে থাকে শুদ্ধবর্ণের মানুষ, তা নিয়ে ঢের ভেবেচিন্তেই দশম অধ্যায়ের ৫১-৫৬-তম শ্লোকে আজ্ঞপ্তি দিয়েছেন মনু: চণ্ডাল থাকবে গ্রামের বাইরে; লজ্জানিবারণহেতু ধারণ করবে মৃতের আচ্ছাদন; পরান্নজীবিতার সাক্ষ্যস্বরূপ খাবে ভাঙা থালায়; গাধাধন কুকুরধন বই আর কোনো ধনে সবিত্ত হবে না; নিষিদ্ধ তার নিশাচারিতা; দিবালোকে কেবল অনাথ-শব বহনে হাত লাগাবে, তবে, রাজনির্দিষ্ট চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে; রাজাজ্ঞায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতকে বধ করবে ও বধ্যব্যক্তির পোশাকআশাক ও শয্যার হকদার হবে—ইত্যাদি প্রভৃতি; (কিন্তু , প্রধান বক্তব্য হল), কোথাও স্থায়ী ঠাঁই পাবে না চণ্ডাল; যার কোনো দেশেই সাকিন নেই, তার ক্ষেত্রে, "পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ" (১০/৫২), নিত্য পরিভ্রমণ অবশ্যকর্তব্য।

ধর্মশাস্ত্রীয় যুক্তিপ্যাঁচের এ এক অনবদ্য নজির: 'নিত্য পরিব্রজ্যা' বা 'always wandering from place to place'/ 'wandering constantly'-র[৭৪] পরিপ্রশ্নে নরাধম চণ্ডাল হয়ে গেল পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর সগোত্র, জাতভাই-ই একরকম! এবং, সে সুবাদে, হলেও তলায় তলায়, চণ্ডালের প্রতি ব্রাহ্মণ্য মজ্জায় সঞ্চিত ঘৃণার কিছুটা অন্তত পুনঃপ্রেরিত ও প্রক্ষিপ্ত হল (বিশেষ করে চতুরাশ্রম-ছুট) যতির দিকে! কৌটীল্যর *অর্থশাস্ত্র* 'দ্বিতীয় অধিকরণ, চতুর্থ অধ্যায়, ২২ প্রকরণ: দুর্গনিবেশঃ' এও কি বলা হয়নি, 'পাষণ্ডচণ্ডালানাং শ্মশানান্তে বাসঃ', বাঁধতে হলে ডেরা, চণ্ডাল ও (আর্য পরিমণ্ডলে অ-সুখী পরিব্রাজক অর্থে) পাষণ্ড, বাঁধবে ডেরা শ্মশানের সীমান্তপ্রদেশে।

ধর্মশাস্ত্রীয় বয়ানের আদ্যপর্যায়ে চতুরাশ্রমিক নামাখ্যায় যে কত বৈচিত্র্য (ও সে সুবাদে পারিভাষিক দৃঢ়তার অভাব), তা হয়তো নিচের সারনি থেকে খানিক স্পষ্ট হবে :

	প্রথমাশ্রম	দ্বিতীয়াশ্রম	তৃতীয়াশ্রম	চতুর্থাশ্রম
গৌতমস্মৃতি	ব্রহ্মচারী	গৃহস্থ	ভিক্ষু	বৈখানস
আপস্তম্বস্মৃতি	গার্হস্থ্যম্	আচার্য্যকুলম্	মৌনম্	বানপ্রস্থম্
হারীতস্মৃতি	ব্রহ্মচারী	গৃহস্থ	বানপ্রস্থ	সন্ন্যাসী
শঙ্খস্মৃতি	ব্রহ্মচারী	গৃহস্থ	বানপ্রস্থ	যোগী/ব্রহ্মাশ্রমী/ যতি[৭৫]
সংবর্তস্মৃতি	ব্রহ্মচারী	গৃহস্থ	[বানপ্রস্থ][৭৬]	যতি/মুনি/প্রব্রজিত[৭৭]
দক্ষস্মৃতি	ব্রহ্মচারী	গৃহস্থ	বানপ্রস্থ	যতি
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা	[অধীতবেদ][৭৮]	গৃহস্থ	বানপ্রস্থ	যতি/ ভিক্ষু[৭৯]
বিষ্ণুস্মৃতি	ব্রহ্মচারী	গৃহস্থ	বানপ্রস্থ	যতি/ভিক্ষু/ যোগী[৮০]
বশিষ্ঠস্মৃতি	ব্রহ্মচারী	গৃহস্থ	বানপ্রস্থ	পরিব্রাজক
মনুসংহিতা	ব্রহ্মচারী	গৃহস্থ	বানপ্রস্থ	যতি

'ব্রহ্মচারী' ও 'গৃহস্থ' অবিকারে নিশ্চল ; উল্টোদিকে, নামাখ্যার নানাত্বে আবঝা 'চতুরাশ্রমিক'-এর প্রকাশলক্ষণ—ধর্মশাস্ত্রীয় বয়ানে স্থিতি-অস্থিতির এই অসমবন্টন নিশ্চিত তাৎপর্যময়।

ঝ. 'ইতিহাস'-এর জগৎ

মহাভারত-এই বা আশ্রম বিষয়ে বিপরীতবিহারী বিধানের কম ছড়াছড়ি!

'শান্তিপর্ব'-এর 'রাজধর্ম' অংশে রাজপদে সদ্য-অভিষিক্ত যুধিষ্ঠির দিকে ধাবিত হয় পিতামহ ভীষ্মের বাণী: ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ে স্রেফ ব্রাহ্মণের অধিকার (১২/৬২/২)[৮১]; সবার আগে *ব্রহ্মচর্য*, তারপর *গার্হস্থ্য*, তারপর *বানপ্রস্থ*, তারপর *ভৈক্ষচর্যা* (১২/৬২/৩-৬)[৮২] ; তবে, (সচ্চরিত্র) ব্রহ্মচারীর ক্ষেত্রে (মাঝের দু-আশ্রম ছেড়ে) ভৈক্ষচর্যা গ্রহণে আপত্তি নেই (১২/৬২/৭)[৮৩] ; (যদিও চতুরাশ্রমের খাঁটি হকদার শুধুই স্বস্তিমুখ দেবশর্মারা), তা-ও, রাজানুমতি পেলে, স্বধর্মনিরত ক্ষত্রিয় কিংবা কৃতকৃত্য, পরিণতবয়ঃ বৈশ্য কিংবা দ্বিজনিষ্ঠ পরিশ্রমী শূদ্র, তিন অধোবর্ণই ভেক পালটে ধরতে পারে *ভৈক্ষচর্যা* (১২/৬৩/১২-১৫)[৮৪]।

আবার 'শান্তিপর্ব'-এ অন্যত্র, (গাঢ়) গার্হস্থ্য-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ স্যুমরশ্মি ঋষি, খানিক বেবল্লা হয়েই যেন, স্তান দেন মহাত্মা কপিলকে: মূর্খ, সূক্ষ্মদৃষ্টিরহিত, অস্থির, অলস, ক্লান্ত, নিজ কার্যদোষে দুখী, তথা নাস্তিক গৃহস্থাশ্রমে শান্তিসুখ পায় না—ওরাই ধরে প্রব্রজ্যার পথ।[৮৫] 'আশ্বমেধিক পর্ব'-এর 'অনুগীতা' অংশে এই যদি ব্রহ্মা সমবেত ঋষিদের বলেন, ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ-ভিক্ষু, এই তোমার চার আশ্রম (১৪/৩৫/৩০; ১৪/৪৫/১৩)[৮৬], তাহলে, ফের লোকপিতামহের কাছ থেকেই শুনি, সংস্কৃত (নির্মলচিত্ত) ব্রহ্মচারীর প্রব্রজ্যা নিয়ে মুনি হওয়ায় বন্ধকতা নেই কোনো (১৪/৪৬/৯)[৮৭] ।

৩

স্মৃতিগ্রন্থাবলির অবিসংবাদী আদর্শ নায়ক : আত্মীয়-বন্ধু, দারা-পুত্র বেষ্টিত (লেখাপড়া-জানা) সংসারী। গৃহাশ্রমই যে শ্রেষ্ঠাশ্রম তা খোলা মুখে, উচ্চনাদেই প্রচারিত সে-সমস্তে। যেমন:

* *মনুসংহিতা* : মনুর গৃহী-কেন্দ্রিক বীক্ষণে, 'চার আশ্রমিকের মধ্যে বেদ-স্মৃতির বিধান অনুবর্তী গৃহাশ্রমীই শ্রেষ্ঠ; কারণ, সে-ই অপর তিনের ধারক-পোষক' (৬/৮৯)। প্রস্তাবটি প্রতিপাদিত হল কী হল না, কাব্যের রস-রূপকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল পরের শ্লোক: 'যেমন সব নদনদী, ছোটোবড় সব জলধারা, সাগরে গিয়ে স্থিতি পায়, তেমনি অন্য তিন আশ্রমবাসীরও গৃহাশ্রমীতে চূড়ান্ত হয়' (৬/৯০)। এতেও ক্ষান্তি নেই। গৃহগত প্রাণবেদনার তীব্রতায় ৩/৭৭-এ গেয়ে ওঠেন মনু: 'যেমন প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করে সকল প্রাণী জীবনধারণ করে, সেইরকম গৃহীকে আশ্রয় করে অন্য সমস্ত আশ্রমের লোকেরা বাঁচে'। গৃহীর বন্দনা যে এত সহজে জল-বাতাসের অনুষঙ্গে করা যাচ্ছে, তার মূলে আছে সহজ এক বস্তুবাদী বীক্ষা। সেটি এই: এক তো সন্তান উৎপাদন কেবল দ্বিতীয়াশ্রমই সম্ভব, তদুপরি, ব্রহ্মচারী, বনবাসী বা সন্ন্যাসী, প্রত্যেকেই তাদের পঞ্চভৌতিক দেহপিঞ্জর বজায় রাখার মামলায় গৃহস্থের উপর আপাদমস্তক নির্ভরশীল। ৩/৭৮-এ গৃহীভিন্ন আশ্রমিকদের ক্ষুন্নিবৃত্তির অর্থনৈতিকতা খুবই প্রাঞ্জল: 'ব্রহ্মচারী-বানপ্রস্থ-ভিক্ষু, তিন আশ্রমীই গৃহস্থ-বিতরিত জ্ঞান ও অন্ন দ্বারা প্রতিপালিত'। তীক্ষ্ণ এই বস্তুবিবেকের দরুনই মনুর (দিব্য) চোখে, অন্য আশ্রমিকদের পক্ষে গৃহাশ্রমী *একযোগে পরিণতি* ও *উৎস*। *পরিণতি* বা *telos* এর মহনীয়তা ৬/৯০-এ উদ্‌গীত; আর, *উৎস* বা *origin* এর মহনীয়তা ৬/৮৭-তে সম্প্রচারিত। ৬/৮৭-এর বার্তা: 'ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা যতি—পৃথক পৃথক এই চারি আশ্রমই গৃহস্থ হতে সম্ভূত'। ৬/৮৭ ও ৬/৯০ মিলে নিটোল যে বৃত্তটি রূপায়িত হয়, তা সর্বতোভদ্র রইত যদি না তাদের গায়ে গায়েই থাকত ৬/৯৪-৯৬। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যখন জপানো হচ্ছে, কেন কারো চারের আশ্রম গ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয়, তখন কিনা শেষের ওই শ্লোকে যতির বিবিক্ততা ও বিচ্ছিত্তি মানপত্র পেয়ে গেল[৮৮]! শুনতে হল আমাদের, 'সর্বকর্মবর্জক নিজ-লক্ষ্য-নিবিষ্ট যতি পরমা গতি প্রাপ্ত হয়'!

* অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্র :

ব্যাসস্মৃতি চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় শ্লোকটিই পুনরুক্তিপরায়ণ। বলা হচ্ছে তাতে: 'বারংবার বলা হয়েছে, নেই, নেই, গৃহাশ্রমের চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই', 'গৃহাশ্রমাত্ পরো ধর্মো নাস্তি নাস্তি পুনঃ পুনঃ'।[৮৯]

অতি পুরাতন *গৌতমস্মৃতি*-র গৃহীমঙ্গলসূত্র, 'একাশ্রমং ত্যাচার্যাঃ—আচার্য তো বলেন, আশ্রম একটিই, গৃহাশ্রম'[৯০]। বৌধায়নস্মৃতি-তেও, প্রজনন স্বার্থে, গৃহীরা সাদরে গৃহীত (২, ৬।১১:২৭)।[৯১]

মনুসংহিতা ৬/৯০ (প্রায়) অবিকল উদ্ধৃত *বশিষ্ঠস্মৃতি* ৮/৭-এ। অর্থাৎ, মনুর মতোই বশিষ্ঠের ধারণা: সব নদনদী যেমন সাগরে মেশে তেমনিই গৃহাশ্রমেই গতি পায় বাকি তিন আশ্রম। *বিষ্ণুস্মৃতি* ৫৯ অধ্যায় ২৭-২৯ শ্লোকে উক্ত, 'ব্রহ্মচারী-যতি-ভিক্ষু, ঋষি-দেবগণ-পশু-অতিথি, সক্কলের ভরসা গেরস্ত'[৯২]। অতঃপর, ৩০ তম শ্লোকে, এমন উঁচু গ্রামে চড়ে গৃহস্থ -স্তুতি যে খোদ দেবরাজের, প্রবল পরাক্রমী ইন্দ্রের আসন টলমলে হবার জোগাড় হয়: '[আদর্শ গৃহী] উন্নীত হন ইন্দ্র-পদে'।[৯৩]

নিঃসন্দেহে, যে তত্ত্ববিশ্বে গৃহীর প্রাধান্য প্রায় নিরঙ্কুশ, সেখানে সন্ন্যাসী চক্ষুশূলবৎ গণ্য হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তা-ও সন্ন্যাসীর জন্য জায়গা ছাড়তে হল কেন তত্ত্বকারদের?

৪

স্মৃতিশাস্ত্রের মহা-ঐতিহাসিক Pandurang Vaman Kane স্মৃতিশাস্ত্রীদের তিন উপদলে পৃথক করেছেন। তাঁর সংজ্ঞানুসারে [৯৪]: প্রথম উপদল *বাধা*-র পক্ষপাতী। এর সদস্যেরা দুই-তিন-চার নয়, সংখ্যা একের পক্ষপাতী; *গার্হস্থ্য* বাদে আর কোনো অবস্থাকেই 'আশ্রম' বলে মানতে রাজি নন। যথা: গৌতম, বৌধায়ন।

দ্বিতীয় উপদল *বিকল্প*-এর পক্ষপাতী। এর সদস্যদের ব্রহ্মচারীর আশ্রম-নির্বাচনের স্বাধীনতা মানতে অসুবিধে নেই। যথা : বশিষ্ঠ। তৃতীয় উপদল *সমুচ্চয়*-এর পক্ষপাতী। এর অনুগামীরা আশ্রম-পারম্পর্যের নিখুঁত অনুবৃত্তিতে কঠিনভাবে বিশ্বাসী। এ উপদলের শিরোমণি আচার্য মনু।

কানের নিজের অভিমত[৯৫] :

* বেদের 'সংহিতা' বা 'ব্রাহ্মণ' অংশে 'আশ্রম' শব্দের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও, বলা যায় না যে, বৈদিক যুগে আশ্রম-ব্যবস্থা অজানা ছিল। এর সবচেয়ে জোরদার প্রমাণ : *জাবাল উপনিষদ্*।
* বাস্তবে রূপ পেয়ে থাক না থাক, চতুরাশ্রমের (সমুচ্চয়বাদী) ধারণাটি সত্যই কিন্তু অপরূপ। ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির ও ব্যাকরণ আধুনিক যুগে কেন, প্রাচীন যুগেও যদি তেমন কার্যকর না হয়ে থাকে, তার দায় তাত্ত্বিকপ্রবরদের নয়।
* ব্রাহ্মণ্য ধারান্তর্গত *ভিক্ষু*-কে ধার করেই বৌদ্ধরা গড়ে তাদের *পরিব্রাজক*-এর ভাবমূর্তি।

এ মতের প্রধান অসুবিধে এই যে, বাধাবাদী তো বটেই, সমুচ্চয়বাদী ধর্মশাস্ত্রীর বিধানপত্রেও, বিশেষ মনুর, 'সন্ন্যাস' সম্বন্ধে রয়েছে অশেষ অস্বস্তি। এবং, বশিষ্ঠের মতো বিকল্পবাদীও গৃহাভিমুখীই।

চতুরাশ্রমের বজ্রআঁটুনি ও তৎসংক্রান্ত বয়ঃবাদী মতাদর্শের সফলতম তত্ত্ববিদ মনুও যে অন্তত একবার স্পষ্টত নস্যাৎ করে গেছেন 'সন্ন্যাস'-কে, তা কিন্তু অনেকেই, যেমন

T.W. Rhys Davids, লক্ষ করেছেন।[৯৬] চারের আশ্রমের গুরুত্বলাঘবের চাপেই হয়তো *মনুসংহিতা* ২/২৩০-এ পিতামাতা-শিক্ষক, এই ত্রিঅভিভাবকের যত্নসেবা ব্যাপারটিকে আকাশচুম্বী, মহিমা আরোপের মুহূর্তে, সংখ্যা তিন-এর অনুষঙ্গে উঠেছে ত্রিলোক-ত্রিবেদ-ত্রিআশ্রমের উপমা। ২/২৩০-এ পড়ি আমরা : '[পিতা-মাতা-আচার্য] তিন লোকস্বরূপ, তিন আশ্রমস্বরূপ, তিন বেদস্বরূপ'। (এই বাক্য বিশেষ বিপদে ফেলেছিল মনুর টীকাকারদের। 'তিন আশ্রম'-এর এ খতিয়ানে 'সন্ন্যাস' পরিগণ্য কিনা তা নিয়ে তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত। কুল্লুকভট্ট, নারায়ণ ও নন্দনের মতে, 'প্রথম তিন'[৯৭] ; আর মেধাতিথির মতে, দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ মিলেই ওই তিন আশ্রম'[৯৮])।

এত গোলযোগের পরিপ্রেক্ষিতে T.W. Rhys Davids-এর বক্তব্য[৯৯] :

* (সরলশাদা 'তাপস' নয়), 'ভিক্ষু'ও যে একটা সময়ের পর ধর্মশাস্ত্রীয় বয়ানে স্বীকৃতি পায়, তার কারণ তদ্দিনে বেশ শক্তিশালী ভিক্ষুসমাজ তৈরি হয়ে গেছে।

* এবং, সে ভিক্ষুরা নিত্য পরিব্রাজক, নেই আদপে তাদের ঘরগেরস্থালির প্রতি পিছুটান। হুটহাট, যখন-তখন বাড়ি ছাড়ে তারা, বিনা বাক্যে ভাসিয়ে দেয় (ব্রাহ্মণ্য) যত প্রথা-প্রচল।

* 'এই বেরিয়ে পড়লাম' ভাবটি ব্যাপক না হতে দেওয়ার পক্ষে, সে-পথে বিঘ্ন সৃষ্টির পক্ষে, বিপ্রকূল প্রবর্তিত (সমুচ্চয়ী) চতুরাশ্রম প্রতিষেধকটি না-জবাব ছিল।

'অরাজকতা'র হাঙ্গাম সামলাতেই, গৃহীকেন্দ্রিক-সন্ন্যাসীবৈরী ধর্মশাস্ত্রীরা 'সন্ন্যাসী'কে তাঁদের তত্ত্বভুবনে 'সম্মানজনক' স্থান দিতে বাধ্য হন। কিন্তু, সম্মানিত হওয়ার মাশুল বাবদ, সমুচ্চয়ের সমঝোতা অনুযায়ী, সংকুচিত হয় 'সন্ন্যাসী'র বিহার-পরিধি: বলবৎ হয় কড়া নিয়ম, কড়ায় গণ্ডায় মেটাইনি যে 'সামাজিক' হওয়ার দায়, সন্ন্যাসগ্রহণের অনুপযুক্ত সে ব্যক্তি; অর্থাৎ, লাগামখোল 'সন্ন্যাস' অ-নৈতিক। ক্রমান্বয়ে যত সুষ্ঠু হয় চতুরাশ্রমিক বিন্যাস, দৃঢ়সংহত হয় স্মার্ত ঋষি-পণ্ডিতদের গৃহী-কেন্দ্রিক মনোভঙ্গি, তত কমে 'সন্ন্যাস' মাধ্যমে ঝঞ্ঝাট পাকাবার সম্ভাবনা। 'সন্ন্যাস'কে নিয়মতন্ত্রের অধীনে আনলে ঝুঁকি কমে, বেরোয় সম্ভাব্য সংকট মোকাবিলা করার ভালো এক পন্থা—তখন আর 'পিতাপুত্রসংবাদ'-এর মেধাবী ন্যায় হুংকার তোলা, *পরিবার*, ব্যক্তি-মালিকানা ও *রাষ্ট্র / সমাজ* নামধেয় ত্রিপ্রতিষ্ঠানের সমূহ অস্বীকার অত সোজা হয় না; কেননা, উপ্ত যাতে প্রথা ভাঙার আহ্বান, তা-ই যে প্রথাসিদ্ধ তখন, *ছেদ*-এর চিহ্নটিই অন্বয়-সম্মত প্রবহমান বাক্যের অংশভাক, *rupture* ও *continuity* দ্বারা অধিগ্রস্ত।

নির্বেদ-এর মনস্তত্ত্বকে সামাল দিতে, ঘরছোড় সন্ন্যাসীকে পোষমানা ঘরেলু জীবে বদলাতে, 'আত্তীকরণ' বা 'appropriation'-এর যে প্রক্রিয়া লাগু করেন ভারতের রক্ষণশীল বর্গ, সে সম্বন্ধে, (T. W. Rhys Davids-এর মন্তব্যের সমতুল্য) তিতকুটে এক মন্তব্য আছে মরিস উইন্টার্নিৎজ-এর *A History of Indian Literature* এ।

মূল জার্মান গ্রন্থের ১৯২৭-এ প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদটি আবার রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত। ১৯২২-২৩এ বিশ্বভারতীর অতিথি অধ্যাপক উইন্টার্নিৎজ লিখেছেন তাঁর উৎসর্গপত্রে : '*A History of Indian Literature*-এর ইংরেজি তর্জমা হল মহৎ কবি,

শিক্ষক ও মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের প্রতি লেখকের সপ্রেম সম্ভ্রম ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-র অভিজ্ঞান'।[১০০] রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত সে বইয়েই আছে মর্মন্তুদ আক্ষেপ: 'ব্রাহ্মণরা যে তাদের মতবিরোধী বিপরীতধর্মী ভাবনাকেও নিজেদের কৌলিক ধারণা ও গোঁড়ামির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সাতিশয় দক্ষ ছিল, ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে তার ভূরিপরিমাণ নজির আছে। চতুরাশ্রমিক তত্ত্বকাঠামোই তাদের সাফল্যের চাবিকাঠি। চতুরাশ্রমের দৌলতেই কালে কালে ব্রাহ্মণ্যব্যবস্থায় সাঙ্গীভূত হয় সন্ন্যাস।'[১০১]

ধর্মশাস্ত্রকাররা বারংবার স্মরণ করিয়েছেন, ধর্মশাস্ত্রের বিধান অর্থশাস্ত্রের বিধানের চাইতে বেশি বলবান।[১০২] তবে, বলবত্তার তুলাধারে মুলুক পর যার জোর-ই অধিক বলে সাব্যস্ত হোক, 'সন্ন্যাস' প্রসঙ্গে ধর্মশাস্ত্রে-অর্থশাস্ত্রে কাজিয়া লাগবার সম্ভাবনা নেহাত নগণ্য। কৌটিল্য-র রাষ্ট্রনৈতিক বিচারে সন্ন্যাসীরা কেন বর্জ্যপদার্থের চেয়েও বেশি সাংঘাতিক, সে-সম্বন্ধে *অর্থশাস্ত্র*-এর বঙ্গানুবাদক রাধাগোবিন্দ বসাকের অনুমান ছিল : 'সম্ভবত তাৎকালিক [বিশেষ এক গোষ্ঠীর, অর্থাৎ, বৌদ্ধদের] উপদিষ্ঠ সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যাগ্রহণনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযান[ই]' ছিল কৌটিল্যের অভিপ্রায়'[১০৩] যদিও অর্থশাস্ত্র 'তৃতীয় অধিকরণ, ষোড়শ অধ্যায়, ৭০-ম প্রকরণ: স্বস্বামীসম্বর্দ্ধ'-এর দু জায়গায় কৌটিল্য শান্তিরক্ষার খাতিরে বলেছেন, 'শ্রৌত্রিয়, অর্থাৎ শ্রৌতক্রিয়া বা যাগবলিতে নিয়োজিত জন ও ভিন্নমতাবলম্বীরা একে অপরের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না'[১০৪] এবং 'পরস্পরের মধ্যে অল্পসল্প বাধা-বিরোধ উপস্থিত হলেও, অরণ্যনিবাসী আশ্রমিক ও অনাশ্রমিক স্বীয় স্বীয় অঞ্চলে নির্দ্বন্দ্বে বাস করবেন', তাঁর পক্ষপাত যে ভব্য আর্য জীবনবেদের অনুগতদের দিকেই সে ব্যাপারে কানাকড়ির সংশয় নেই।[১০৫]

ফেরা যাক আবার *জাবাল উপনিষদ*-এ।

তর্কাতীত যে, নির্দিষ্ট পর্ব-পর্বান্তরে আয়ুষ্কাল কাটানোর কথা, *জাবাল উপনিষদ*-এর বাইরে, প্রাচীন উপনিষদ নেই। এর ওপর, এমনই ব্যতিক্রমী *অথর্ববেদ* শাখাভুক্ত ৬-শ্লোকের *জাবাল উপনিষদ*, যে ঠিক ও শ্রুতিগ্রন্থের সহায়তাতেই তাঁদের প্রতিরোধের তত্ত্বজমিকে উর্বরতর করতে পারতেন, বিকল্পবাদী ধর্মশাস্ত্রীরা নন, বরং কূল ভাসানো ভিক্ষুরা। কেননা, 'ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত করে গৃহী হও; গৃহী হওয়ার পর বনে যাও; বনবাসের পর প্রব্রজ্যা নাও', কেবল এটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি *জাবাল উপনিষদ্* এর যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি। যাজ্ঞবল্ক্যের সন্ন্যাস-সমাচার তারপর— জনককে ৪এর শ্লোকে ও অত্রিকে ৫ ও ৬ এর শ্লোকে— ধেয়ে গিয়েছিল অকূল পানে। বলেছিলেন তিনি: '[হয় ধাপে ধাপে এগোও, নতুবা] যখন প্রাণ চায়, ব্রহ্মচর্য কিংবা গার্হস্থ্য কিংবা বানপ্রস্থ, যে সোপান থেকে খুশি, সন্ন্যাসী হও, এলেই বৈরাগ্য প্রব্রজ্যা নাও—যদহরেব বিরজেৎ তদহরে প্রব্রজেৎ (শ্লোক ৪); সংসার হতে ব্যুত্থিত হতে চায় যে সে হয় বীরের মতো বা প্রায়োপবেশনে বা জল কিংবা আগুনে প্রবেশ করে মরুক নয় ধরুক মহাপ্রস্থানের পথ (শ্লোক ৫); সন্ন্যাসী (পরমহংসদের) *দেখে ধাঁধা লেগে ভাবতেই পারে লোকে ওরা বুঝি বাতুল; কিন্তু মোটেও* ওরা পাগল-টাগল না (শ্লোক ৬)'।

এছাড়া শ্রুতিসাহিত্যে প্রথম,[১০৭] অর্বাচীন উপনিষদ্ *মৈত্রী উপনিষদ্*-এর ৭/৮-এ, নগরনিবাসী অ-বৈদিক ভিখারী পুর-যাচক সম্পর্কে যা খবর মেলে, তাতে সেকেলে কট্টররা ভুরু কুঁচকালেও, ভিক্ষুরা নিশ্চয় আত্মশ্লাঘায় ভরে উঠতেন। কেননা, বলা আছে সেখানে, 'পুর যাচকরা শূদ্র-শিষ্য; নিজেরাও শূদ্র; তত্রাপি তারা শাস্ত্রজ্ঞ'।[১০৮]

এর মানে: যে তত্ত্ব অতি-পুরনো স্মৃতিগ্রন্থে বড়জোর ভ্রূণাকারে ছিল এবং পরে যা বশিষ্ঠর 'ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ- পরিব্রাজক' ফর্মুলায় সর্বজনমান্য চতুরাশ্রমিক কাঠামোরূপে পরিগণিত, বহন করছে তা মস্ত উপদ্রবময় সামাজিক কোনো ঘটনার দাগসাক্ষর; হয়ে এলেও ম্লান, লেগে আছে তাতে রীতিমতো এক 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহে'র স্মৃতিলক্ষণ।

সন্দেহ নেই, একটু তীব্র হলেই সে 'স্মৃতি', আজ যাঁকে আমাদের প্রথমেই মনে পড়বে, তিনি, আড়াই হাজার বছর আগের কপিলাবস্তুর সিদ্ধার্থ (খ্রিঃ পূঃ ৫৬৩-৪৮৩/ খ্রিঃ পূঃ ৫৫৮-৪৭৮[১০৯])।

৫

১৮৯০-এ নেপালে ই. বি. কাওয়েল দ্বারা আবিষ্কৃত এক পুঁথি ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত একই পাঠের আরেক প্রতিলিপি মিলিয়ে ১৮৯৩-এ কাওয়াল-এর সৌজন্যে প্রথম ছাপা হয় সম্ভবত খ্রিস্টিয় ১-ম/২-য় শতাব্দীর মানুষ অশ্বঘোষ-এর মূল *বুদ্ধচরিত*। তাৎপর বহু পণ্ডিতের যৌথ সম্পাদনায় *বুদ্ধচরিত* ক্রমশ পৌঁছয় (মোটামুটি) অভ্রান্ত, গ্রহণযোগ্য সংস্করণে। এর আগেই, ১৮৭০-এ, বেরিয়েছে Edwin Amolu-এর জনমোহিনী বুদ্ধজীবনী *The Light of Asia*। ই. বি.কাওয়েল সম্পাদিত *বুদ্ধচরিত* প্রকাশের বাইশ বছরের মাথায়, ১৯০৫-এ, (ভঙ্গ বঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাবর্ষে), রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬১) আরম্ভ করেন বইটির তর্জমা।[১১০] ষোলো-সতেরো বৎসরের কিশোর পুত্র রথীন্দ্রনাথের তর্জমার প্রথম তিন সর্গে কলম বোলান পিতা রবীন্দ্রনাথ।[১১১] *বুদ্ধচরিত*-এর রথীন্দ্র-অনুবাদ অবশ্য বিশ্বভারতীর চীনভবন-এর অধ্যাপক সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়-এর (১৯০৫-৭৮) সম্পাদনায় ছাপাক্ষরে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪৬-এ।[১১২]

বুদ্ধচর্চায় নবজোয়ার আনায় দেশ-বিদেশেরি অনেক কৃতীপুরুষের গবেষণাধর্মী সন্দর্ভের তো বটেই, নাট্যসংবেদন, কাব্যউচ্ছ্বাস ও বহুজনহিতায় রচিত বুদ্ধ বিষয়ে সাধারণ পরিচিতিজ্ঞাপক পুস্তকের অবদানও প্রচুর। যথা : Friedrich Max Müller (১৮২৩-১৯০০) ও তস্য পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধশাস্ত্র তর্জমা, রাজেন্দ্রলাল মিত্র-এর (১৮২২-১৮৯১) *The Sanskrit Buddhism Literature in Nepal* [১৮৮২], বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় সর্বপ্রথম বই [১১৩] অঘোরনাথ গুপ্ত-র (১৮৪১-১৮৮১) *শাক্যমুনিচরিত* ও *নির্বাণতত্ত্ব* [১৮৮২ মরণোত্তর প্রকাশ], কৃষ্ণকুমার মিত্র-এর (১৮৫২-১৯৩৬) *বুদ্ধচরিত* ও *বৌদ্ধধর্মের সংক্ষেপ বিবরণ* [১৮৮৩], গিরিশচন্দ্র ঘোষ-এর (১৮৪৪-১৯১২) নাটক *বুদ্ধচরিত* [অভিনয় : ১৮৮৫; মুদ্রণ : ১৮৮৭], দ্বিজেন্দ্রনাথ

ঠাকুর-এর (১৮৪০-১৯২৬) দীর্ঘ নিবন্ধ 'আর্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত' [১৮৯৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর (১৮৬১-১৯৪১) *কথা* [১৯০০], সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর (১৮৪২-১৯২৩) *বৌদ্ধধর্ম্ম* [১৯০১; ১৯২৩], শরৎকুমার রায়-এর (১৮৭৮-১৯৩৫) *বৌদ্ধ ভারত* [১৯২৩], ঈশানচন্দ্র ঘোষ-এর (১৮৬০-১৯৩৫) সম্পূর্ণ *জাতক* বঙ্গানুবাদ [১৯১৬-৩০], হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-র (১৮৫৩-১৯৩১) *বিষয়: বৌদ্ধধর্ম* [১৯৪৮], 'মহাবোধি সোসাইটি'র প্রকাশনা ইত্যাদি।

যদিও (সতত অভিমানী) রবীন্দ্রনাথ, মৃত্যুর অল্প আগে, ২৪ মে ১৯৪১-এ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার অন্যতম ভগীরথ-সংগঠক ও *মহাভারতের কথা*-র [রচনা:১৯৭১-৭৪; প্রকাশ: ১৯৭৫], প্রণেতা বুদ্ধদেব বসুকে (১৯০৮-৭৪) একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, '[উনিশ শতকের শেষ নাগাদ বৌদ্ধ] ইতিবৃত্ত জানবার অবকাশ [তৈরি হলেও], বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে [ধরো, *কথা*-র], সন্ন্যাসী উপগুপ্ত—একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায়, এ কী করুণায় প্রকাশ পেয়েছিল'[১১৪], ভাবলে ভুল হয় না যে, (না হোক মাহাত্ম্য বা কারুণ্যের দাঁড়িপাল্লায় তেমন উল্লেখযোগ্য), বুদ্ধ-ইতিবৃত্তের নিদেন ভগ্নাংশ শিক্ষিত সাধারণের চৈতন্যে ভালোমতোই প্রবিষ্ট হয়েছিল। অনুসন্ধান-পরিগ্রহণ-ভাষান্তর-মঞ্চায়ন-কাব্যায়ন, আঙাভাঙা যে ঘুরপথেই হোক, উনিশ শতকের শেষাশেষি থেকে, অশ্বঘোষ এর *বুদ্ধচরিত* ও অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত—যেমন, *মহাবস্তু-অবদান* বা *ললিতবিস্তর*—বুদ্ধজীবনীর নকশা-বিশেষ, পশ্চিম তথা ভারতে শুধু প্রচারই পায় না, অত্যন্ত উজ্জ্বল রেখারঙে অঙ্কিত হয় আধুনিক মানবের মানসপটে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত *বৌদ্ধধর্ম*-এর পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ-এর [১৯২৩], 'মুখপত্র'-এ এ ছকটি সম্পর্কেই স্মৃতিক্ষয়িত বর্তমানদের উদ্দেশ করে লিখেছিলেন সত্যেন্দ্র-জামাতা প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬): 'বুদ্ধচরিতের তুল্য চমৎকার ও সুন্দর গল্প পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।...অতীতে যে বুদ্ধচরিত কোটী কোটী মানবকে মুগ্ধ করেছে, ভবিষ্যতেও তা কোটী কোটী মানবকে মুগ্ধ করবে'।[১১৫]

মনোহরণ সে গল্পের আদিভাগটি এই[১১৬]:

সিদ্ধার্থের আবির্ভাব-মুহূর্তে সিদ্ধার্থ-পিতা শুদ্ধোদনকে ভবিষ্যবাণী শুনিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীবৃন্দ: এ ছেলে হয় জগতের চক্রবর্তী সম্রাট নয় মহামুনি হবে। ফলে, পিতা হওয়া ইস্তক পিতার ভয়, দোরের আগল টুটে সহসা একদিন বেরিয়ে যাবে না তো পুত্র। সিদ্ধার্থ যাতে প্রমোদে ঢেলে দিতে পারে মন, সে দিকে তাই দরকারেরও বেশি মনোযোগী হন শুদ্ধোদন। উলটো-পালটা নানান লক্ষণ সত্ত্বেও, শুদ্ধোদন আঁকড়ে থাকেন বিশ্বাস, ছেলে শেষমেশ রাজ-চক্রবর্তীই হবে এবং পাকলে কেশ, তবেই কেবল বানপ্রস্থে যাবে।

সম্পদশ্রী, যৌবন-বৈভব, দাম্পত্যসুখ-কিছুরই অভাব নেই সিদ্ধার্থের। তবু এমনই ঘটনার চক্র যে, সোনালি অশ্বাভরণে সজ্জিত, শান্ত চার তুরঙ্গম-বাহিত, বিদ্বান সারথি নিয়ন্ত্রিত হিরন্ময় রথে আরোহণ করে বিহারযাত্রায় বেরিয়ে পরপর তিনখানি মারাত্মক

দৃশ্য চাক্ষুষ করেন সিদ্ধার্থ। দর্শন হয় তাঁর: এক. আনতঅঙ্গ, দণ্ডধারী একাকী বৃদ্ধ; দুই. শারীরিক যন্ত্রণায় কাতর জনৈক পুরুষ; তিন. চার বাহক দ্বারা বাহিত শয্যায় শায়িত অসাড় এক দেহ। এতকাল অন্তর্গৃহে অবরুদ্ধ, বিলাসলীন থাকার দরুন যা তাঁর অজানা ছিল, এবার তা অবগত হন সিদ্ধার্থ। শেখেন তিনি বিদ্বান তাঁর সারথির কাছ থেকে: এক. জরার প্রকোপে আনতঅঙ্গ হয়েছেন বৃদ্ধ, ব্যাধির প্রতাপে কাতরাচ্ছে একদা শক্তিমান পুরুষটি এবং চার বাহকের কাঁধে চড়ে যাচ্ছে যে তাকে কেড়ে নিয়েছে মৃত্যু; দুই. না, *জরা-ব্যাধি মৃত্যু* ওই তিন *ব্যক্তি-সাপেক্ষ* কোনো দুর্ঘটনা নয়, *জরা-ব্যাধি-মৃত্যু* নিতান্তই নির্বিশেষ, হরেকে, হলেও *আলাদা* করে পড়বেই অজেয় ওই তিন রিপুর কবলে।

নিদারুণ এ *নির্বিশেষীকরণ* হরণ করে সিদ্ধার্থের ঘুম। জন্ম নেয় তাঁর হৃদয়ে নতুন এক বোধ। সে বোধে নেই হাড়হাভাতের গ্লানি বা বেদনার শীতে কেঁপে ওঠার মতো দুঃসহ কোনো অভিজ্ঞতার রেশ। বরং আছে, নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশুতে স্বত্ববান হয়েও, অর্থ-কীর্তি সচ্ছলতা পেয়েও, সামাজিক অর্থে পরিপূর্ণ গৃহী নর-এর যুক্তিহীন অথচ অপার এক ব্যথার অনুভব। এই যখন সিদ্ধার্থের মনোদশা, তখন তাঁর চতুর্থ এক দৃশ্য দর্শন হয়। দেখেন তিনি: ভিক্ষুবেশী এক পুরুষকে। অবাক হন শুনে: জরা-ব্যাধি-মৃত্যু সত্যি অনতিক্রম্য কিনা, তা পরখ করতেই প্রব্রজ্যায় বেরিয়েছেন ভিক্ষু।

আর আটকানো যায় না সিদ্ধার্থকে; ঘর-পরিজন ছাড়তে বদ্ধপরিকর হন তিনি। যার ক্ষোভের কোনোই কারণ নেই সেই পুত্রকে দখল করেছে ব্যাখ্যাতীত ক্ষোভ, শোচনীয় এ বিপর্যাসে স্নেহাকুল শুদ্ধোদন, *মহাভারত* শান্তিপর্ব-এর 'পিতাপুত্রসংবাদ'-এর মেধাবী-পিতার ভাষাতেই বলে ওঠেন, 'তুমি গৃহস্থধর্মে রত হও। যৌবনের সুখসম্ভোগের পর, পুরুষের নিকট তপোবন প্রবেশ রমণীয় হয়।' কিন্তু, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে— আগত তখন ২৯ বৎসর বয়সী সিদ্ধার্থের লোকাচার-অসিদ্ধ অভিনিষ্ক্রমণের পর্ব।

অশ্বঘোষ-কথিত উপাখ্যানে একটি জিনিস কিন্তু সাফ। ভারতে অসময়ে গৃহত্যাগের সংস্কারটি আদৌ গৌতম বুদ্ধের আবিষ্কার না। সে সংস্কারকে ন্যায়সংগত আদল দিতে তাঁর যত বড়ই ভূমিকা থাক, তিনি মোটেও তার উদ্ভাবক নন। কপিলাবস্তুর শাক্যবংশীয় দুলালের নিষ্ক্রমণের পূর্বেই আরো অনেকে ঘরের আঙিনা ডিঙিয়ে নেমেছেন সড়কে। সাধারণ খেলাত তাঁদের: *শ্রমণ*। শ্রমণমাত্রেই সংসারীদের মতন অনেক দিনের সঞ্চয় আগলে বসে কাল কাটাতে গররাজি। নানান ছাঁদে হলেও, তাঁদের প্রত্যেকেরই আওয়াজ, সাবধানী নন, অসাবধানী পথিক তাঁরা—খসবে যদি সঞ্চয়, ঝড়ের রাতের ফুলের মত ঝরুক পড়ুক খসে। সকল শ্রমণের শিরেই তাই অহোরাত্র ঝলমলায় সব-হারাবার জয়-মালা।

৬

বেদ-উপনিষদের শ্রুতিসাহিত্যে *শ্রমণ* শব্দের শুভোদয় *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্*-এ। গহীন অরণ্য-প্রতিম, তর্ক কুটিল সে উপনিষদের 'চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় ব্রাহ্মণ,

২২তম' শ্লোকে বিদেহ-রাজ জনককে আত্মানুশীলনে রপ্ত করাতে নিঃস্বপ্ন-প্রতিম, গভীর নিদ্রার উপমায় বলেন যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি: '*নির্বাধ* সুপ্তির সময় পিতা অ-পিতা হন, মাতা অ-মাতা, লোকসমূহ অ-লোক, বেদ অ-বেদ। তখন ভ্রূণঘাতকও অ-ঘাতক, তস্কর অ-তস্কর, চণ্ডাল অ-চণ্ডাল, পৌল্কস অ-পৌল্কস শ্রমণ অ-শ্রমণ, তাপস অ-তাপস। ঘোর সুষুপ্তির প্রহরে, পুণ্য ও পাপ দুয়ের সাথেই অসম্পৃক্ত জীব।'[১১৭]

ঘুমের ঘন গহনে নামপদবীলোপে স্বাতিক্রমণ প্রসঙ্গে আচার্য শংকর তাঁর *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাষ্যম্*-এ যা লিখেছেন, তার মর্ম: আত্মা কামাদি ধর্মের আশয় নয়, এটি প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই স্বপ্নসময়ে দ্রষ্টার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপত্ব সমর্থিত এখানে। আত্মা স্বভাবত অসঙ্গ, অবিদ্যা-কাম-কর্ম-বিনির্মুক্ত, এবং এ-জন্যই জীব ও পরমাত্মা অভিন্ন—এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই এসেছে নিদ্রার উপমা। মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন নামরূপের ভিত্তি যে যে কর্ম, ঘুমের অতল তমসে সে-সকল কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধে ছিন্ন হয় বিষয়ীগণ। অর্থাৎ, চূড়ান্ত যে উপলব্ধি, অনাত্ম অদ্বৈত যে উত্তরণ, তার কাছাকাছি অভিজ্ঞতার শরিক হয় জীব, 'প্রসুপ্তি' নামক নিত্যপ্রলয়ের লগ্নে। তাতেই বোঝা যায়, পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব, স্বর্গাদি লোকের লোকত্ব, অথবা বেদ, অর্থাৎ কিনা, অমুক কর্ম দ্বারা তমুক ফল লাভ নিয়ে বিরচিত সমুদয় ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রের মহত্ব, আসলে কত অসার। এমনকী, স্তেন বা ব্রাহ্মণের সুবর্ণ অপহরকের মতো ঘৃণ্য চোরও, ভ্রূণহত্যাকারীর মতো মহাপাতকীও, নিদ্রাবেশে তাদের অশুভ কর্মের গ্রন্থিপাক থেকে কয়েক দণ্ডের তরে নিষ্কৃতি পায়। শুভাশুভের এই যে একই গতি এথেকেই হৃদয়ঙ্গম হয়, নিকৃষ্ট যোনিভূত চণ্ডাল-পৌল্কস-ও, সমাজ-দত্ত তকমা সত্ত্বেও, আদতে চণ্ডাল বা পৌল্কস নয়। বিনিশ্চয়ের এ ধারাতেই ক্রমে উপলব্ধ হয়, যে পরিব্রাজন শ্রমণের এবং যে বানপ্রস্থ তাপসের কর্ম, সে দু-কর্ম ক্ষান্ত হলেই চোকে শ্রমণের শ্রমণের-পরিচয় তাপসের তাপস-পরিচয়।[১১৮]

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪/৩/২২-এর ভাষ্যে শংকর কর্তৃক সংযুক্ত বাড়তি দুই মন্তব্য কিছুতেই কারো দৃষ্টি এড়াতে পারে না। সে-দুটি

(i) এই যে বলা হল, নিদ্রাবস্থায় পিতা অ-পিতা হন, এর থেকে বেশ বোঝা যায়, পুত্রও তখন পিতার অ-পুত্র হয়। (মানে, আর কখনো যদি না-ও পায়, নিদেন ঘুমন্ত বাপের হাত থেকে নিস্তার পায় জাগন্ত ছেলে)।[১১৯]

(ii) বর্ণশ্রমাদি-বিভাগ নিয়ে যেহেতু নানান জল্পনা আছে, তাই *শ্রমণ* ও *তাপস* *পৃথকভাবে* উল্লিখিত হয়েছে শ্লোকে।[১২০]

তথাকথিত মূলধারায় 'শ্রমণ'-সাক্ষাতের আরো কয়েকটি উদাহরণ:

(i) *শুক্লযজুর্বেদ-সংহিতা*-র ২৩শ অধ্যায় আছে অশ্বমেধ মন্ত্রসকল। সেখানে 'হে বর্ষণকারী অশ্ব, তুমি বীর্য ধারণ কর, যা রমণীগণের জীবন ও ভোজন স্বরূপ (২৩/২১)[১২১] গোছের কথাবার্তা এতই প্রতুল ও প্রকট যে, যজ্ঞের ঋত্বিকদেরই ঠাট্টা

করতে আসে ২৫-এর মন্ত্র, 'তোমার মুখ যেন আরও বলতে চায়, হে ব্রাহ্মণ, আর বহু কথা বলো না' [২৩/২৫]।[১২২]

(আদিকবি) বাল্মীকির *রামায়ণ* এর 'আদিকাণ্ড'-এ সুচারুভাবে পালিত হয় এই অশ্বমেধ যজ্ঞ। রাজা দশরথ বসান সেটি ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির পৌরহিত্যে। রাজমহিষী কৌশল্যা খড়্গের তিন কোপে অশ্বকে বধপূর্বক ধর্মকামনায় সুস্থিরচিত্তে ঘোড়ার সঙ্গে এক রজনী যাপন করেন ও পরদিন দশরথের অন্যান্য পত্নী সহ অশ্ব-সহিত যোজিত হন (*রামায়ণম্*, 'আদিকাণ্ড: ১৪/৩৩-৩৫'১২৩)—চমৎকার এ আয়োজনের বিশদ অভিবর্ণণায় রামায়ণ অদিকাণ্ডে মেলে 'শ্রমণ' এর ক্ষণিক সাক্ষাৎ। অন্নব্যঞ্জনের সুপক্কতায়, ভোজ্যদ্রব্যের পারিপাট্যে, যাদের ভোজনস্পৃহা কিছুতেই মিটছিল না, নিমন্ত্রণের পাত ছেড়ে উঠতেই চাইছিল না যারা, তাদের ভেতর ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণরা যেমন, বৃদ্ধ-স্ত্রী-বালক আতুররা যেমন, তেমনি তাপস ও শ্রমণরাও ছিল ('আদিকাণ্ড:১৪/১২')।[১২৪]

(ii) পাণিনি-ব্যাকরণ *অষ্টাধ্যায়ী*-র ২/১/৭০ সূত্র হল 'কুমার শ্রমণাদিভিঃ'।[১২৫] নিদেন বৈয়াকরণ দৃষ্টিতে 'কুমারী শ্রমণা'র অস্তিত্ব স্বীকৃত।

(iii) *তৈত্তিরীয় আরণ্যক*-এর দ্বিতীয় প্রপাঠকের সপ্তম অনুবাকে 'শ্রমণগণ ঋষিদের শ্রদ্ধাস্পদ ও মন্ত্রোপদেষ্টা'[১২৬]।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় এর (১-ম ভাগ:১৮৭০, ২-য় ভাগ: ১৮৮৩) লেখক, দেবেন্দ্র ঠাকুর উদ্‌গীত শ্রুতিধারাবর্তী শ্লোকসমূহের সংকলন *ব্রাহ্মধর্মঃ* এর 'উপনিষৎ' অঙ্গের (১৮৪৮) অনুলেখক, অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষায়, 'সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠে যে প্রথমে শ্রমণ শব্দটি সাধারণ সন্ন্যাসী বাচকই ছিল, পরে বৌদ্ধ ও জৈনরা নিজ নিজ সম্প্রদায়কে ঐ নামে বিখ্যাত করেন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে ঐ উপাধির প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, হিন্দুরা তাহা পরিত্যাগ করেন।'[১২৭] এবং (বোধহয়) এ-জন্যেই *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্* ৪/৩/২২-এ *শ্রমণ* এর হাজিরি সত্ত্বেও, পরবর্তী উপনিষদ্‌সমূহে ও চতুরাশ্রমের ধ্বজাধারী ধর্মশাস্ত্রে *শ্রমণ* শব্দটি একেবারেই বেহাজির।[১২৮]

তবে, নামপদ যার 'শ্রম্+অন' সমন্বয়ে গঠিত, বুৎপত্তি যার 'শ্রম্' বা 'ক্লান্তি' থেকে[১২৯], সেই 'শ্রমী', শ্রুতি-স্মৃতির ঐতিহ্যে দমিত-উপেক্ষিত হলেও, অব্রাহ্মণ্য গ্রন্থসমূহে, গুরু-গৌরবে গরীয়ান। পালি শমণ-এর সংস্কৃত চেহারা *শ্রমণ*।

একদা শ্রমণের খুব ছিল বোলবোলা। এবং সেই বোলবোলার সঙ্গেই সম্পৃক্ত (সমুচ্চয়বাদী) 'আ+শ্রম্' বা effort- এর ক্লান্তিকর ইতিবৃত্ত।

৭

সময়কাল: খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দী; অঞ্চল: গাঙ্গেয় উপত্যকা। গঙ্গার ধারে পাড়ে, নগরে-অরণ্যে, অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছেন পারিবারিক দায়-মোচিত বহু জন—কোথাও যূথবদ্ধ তাঁরা, কোথাও একাকী। এই ভিড়ে বা নিরিবিলিতে গৌতম বুদ্ধ যেমন

আছেন, তেমনি আছেন মহাবীর, আছেন পুরণ কশ্যপ-মক্ষসি গোসাল-অজিত কেশকম্বলী-পকুধ কচ্চায়ন-সঞ্জয় বেলট্‌ঠি-এ পুত্ত ও আরো অনেক।

হঠাৎই যেন ধরেছে ভাঙন। সে ভাঙনকে প্রতীকী ভাষায় অনূদিত করলে ছবি দাঁড়ায়: *Law* বা অনুশাসন-এর বিগ্রহ *পিতা*-র বিপ্রতীপে নানা রঙের নিশান হাতে সমবেত হয়েছে নবযুগভাষ্য রচনাতে উদগ্রীব *পুত্রগণ*। এই লড়াইজোরেই পৌঁছই আমরা, metanomy বা *অনুষঙ্গ-সম্পর্কে* গ্রথিত এ ধরনের সমীকরণে :

১-ম—*পিতা* = *ব্রাহ্মণ*; *পুত্র* = *শ্রমণ*
২-য়—*পিতা* = *গৃহী*; *পুত্র* = *পরিব্রাজক*
৩-য়—*পিতা* = *যজ্ঞ*; *পুত্র* = *দান*

পুত্র-সমবায় সংগঠিত অমান্য আন্দোলনে, আন্দোলনের নিজস্ব জিগির-যুক্তিতে, পিতার ভাষিক ভাঁড়ারও আক্রান্ত। পিতৃশব্দকোষ থেকে সমীহ জাগানো, লোকমান্য তত্ত্বকল্পগুলি চুনে-বেছে, তাদের পরেই রোপণ করছে ছেলেরা অন্য জাতের দ্যোতনা। সজ্ঞান এ বিপর্যাসে পিতৃভাষার বহু শব্দে লাগছে ধ্বনি-বিকারের রাহু—সংজ্ঞামূল-ধ্বসনের ক্রিয়াবিক্রিয়ায়, পুরোনো চিহ্নকদের সঙ্গে ধ্বনি-সমীপতা অক্ষুণ্ণ রেখেই ক্রম-বিসারিত হচ্ছে নতুন নতুন চিহ্নের দিগন্ত।

বৌদ্ধ বাকচতুরতার পরিণামে যেমন : দ্বিজসমাজের সদস্য থেকে বুদ্ধশরণাগতের ঘরে স্থানান্তরিত *আর্য*; বেদের ঋকসমষ্টি পরমপূত সূক্ত বৌদ্ধ পাঠ-সঞ্চয়নে সুক্ত-এ 'অপভ্রষ্ট'; *বিদ্যাত্রয়* বা ঋক-সাম-যজুরবেদ—যাতে দুরস্তদের দূর-স্মৃতির রেশ আজও লেগে ত্রিবেদী-ত্রিপাঠী-তিয়ারি গোছের ব্রাহ্মণ-উপাধিতে[১৩০] —পরিবর্তিত (অন্য ধাতুর) তিন *বিজ্জা*-য়; ব্রাহ্মণ সেবাব দাম যে *দক্ষিণা* পর্যবসিত তা *দান* বাবদ স্বোপার্জিত পুণ্যে; বেদের ঋষিদের মৌরসিপাট্টা-পাওয়া বিশেষণ *আর্য* প্রযুক্ত শ্রমণ গৌতমের উপর; স্নাতক বলতে প্রাচীনপন্থীরা যদি বোঝে, 'প্রথামাফিক জলে ডুব দেয় যে', তবে, নবীন অভিধানে মানে তার, 'অষ্টাআর্যমার্গ অনুসরণত ধুয়ে মুছে মুখে সম্যক সাফ হয় যে'; বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের ভর *আত্মন্/আত্মা* হতে উপজাত তার সম্যক বিপরীত-পদ *অন-আত্তা/ অন-আত্মা*; এবং, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের পারিভাষিক পদ *কর্ম*-কে রুখতে, নেতির ভাটায় মন্থিত স্বপ্রণোদিত *কম্ম*।[১৩১]

এত সমস্তের মধ্যে একটি জোড়া আছে যা, বৌদ্ধ কেন, প্রত্যেক শ্রমণ দল-উপদলের সমান প্রিয়। বনামবিদ্ধ সে-জোড় : *যজ্ঞ-দান*।

যজ্ঞ বনাম দান

ব্রাহ্মণ্য বিশ্ববীক্ষায় তুঙ্গস্পর্শী *যজ্ঞ*-এর মহিমা—প্রসরে বিরাট তার প্রায়োগিক ক্ষেত্র, অপরিমেয় তার লৌকিক-অতিলৌকিক মূল্য। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এর ভাষায়: পশুমানবের মানবিকতার, অনন্য তার *প্রজাতি-সত্তা* বা species-being-এর সনদই যজ্ঞ; অন্য জন্তুদের থেকে মানুষের তফাত এখানেই যে, এক মানুষই পারে উৎসর্গের বলি চড়াতে,

'sacrifice is offering.....man alone among animals performs sacrifice' (৭/৫/২:২৩)।[১৩২] স্বভাবতই, যজ্ঞরহস্য দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময় যজমানের মনস্তত্ত্ব। যে যজমানি 'মানব-সার' বা 'human abstract'এর নামান্তর, শাস্ত্রে তার ব্যাখ্যাদৃষ্টান্তও অঢেল। একটি (বহু উদ্ধৃত) দৃষ্টান্ত বাছা যাক।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-র তৃতীয় অধ্যায় 'কর্মযোগ'-এ ৯-১৫ শ্লোকে অর্জুনকে বলেন তাঁর সারথি-সখা শ্রীকৃষ্ণ: পুরাকালে যজ্ঞের সঙ্গেই প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন প্রজাপতি (শ্লোক ১০); অন্ন থেকে প্রাণী উৎপন্ন হয়, জলবর্ষী মেঘ থেকে অন্ন; আর, যজ্ঞ থেকে জলবর্ষী মেঘ উদ্ভূত হয়, কর্ম থেকে যজ্ঞ (শ্লোক ১৪); আবার, ব্রহ্ম অর্থে বেদ হতে (যজ্ঞাদি বিহিত) কর্ম উৎসারিত ও ব্রহ্ম অর্থে অক্ষর হতে বেদ উদ্ভূত— অতএব, যজ্ঞে সর্বগত ব্রহ্ম/ বেদ নিয়ত প্রতিষ্ঠিত (শ্লোক১৫); যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদের তৃপ্ত করো, দেবতারা তোমাদের তৃপ্ত করুন (শ্লোক১১); দেবতাদের বঞ্চিত করে তাঁদের নিমিত্ত প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু যে ভোগ করে সে চোর (শ্লোক ১২); আত্মকারণে, অর্থাৎ কেবল নিজ তৃপ্তির জন্য, অন্নাদি পাক করে যে, সে পাপই ভোজন করে (শ্লোক ১৩); অপরদিকে, দেবতাদের পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়ে, যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করে যে, সে-ই সাধু (শ্লোক ১৩); যজ্ঞার্থ কর্ম যে না সাধে, কর্মপাকে জড়িয়ে-মড়িয়ে মরে সে (শ্লোক ৯)।[১৩৩]

যজ্ঞ-ভিত্তিক ব্যাপক প্রকল্পের সা-জবাব হিসেবে শ্রমণরা অবলম্বন করেন শাদাসিধে *দান* শব্দটি। *দান*-এ নিঃশর্ত 'উপহার-আর্থবিদ্যা' বা 'gift-economy'র নিরিখে নির্ধারিত হয় দায়ক-গ্রাহক সম্পর্ক— নেই তাতে দেবতাদের তুষ্টিবিধায় দেওয়া-থোয়ার হাঙ্গাম, (ব্রাহ্মণবিদায় হেতু) *দক্ষিণা* চোকানোর হ্যাপা, নেই (যজ্ঞ-এর আবশ্যিক শর্ত) 'পশুঘাতম্' জড়িত *হিংসা*-র নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন।[১৩৪] বরং আছে *দান*-এ দেবতা-ব্রাহ্মণের মধ্যস্থতা অস্বীকার করার বিদ্রোহী ইন্ধন।

বৌদ্ধগ্রন্থ *দীঘ নিকায়*-এর 'কূটদন্ত সূত্র'-এ গৌতম বুদ্ধ পেশ করেন যজ্ঞ বিষয়ক (শ্লেষাত্মক) বক্তৃতা। বক্তৃতাটি বর্ষিত হয় কূটদন্ত নামধেয় (গোবেচারা) এক বামুনের উপর। সে মহাযজ্ঞের বর্ণনা দেন বুদ্ধ, তা সুক্ত-পাঠক হোতা, সূক্ত-গায়ক উদ্‌গাতা, অগ্নিতে আহুতি-দায়ক অধ্বর্যু, বিভিন্ন স্তরের ঋত্বিকে পরিবেষ্টিত, স্তব-স্তোত্র-মন্ত্রে মন্দ্রিত, ষোড়শাঙ্গ যজ্ঞের ফাজিল নকশা, parody একরকম। বর্ণিত তাঁর যাগবাটে কোথাও নেই রক্তের দাগ। (হতভম্ব) কূটদন্তকে জানান তথাগত : 'হে ব্রাহ্মণ, সেই যজ্ঞে গোহনন হল না, অজ-মেষ-মোরগ-শুয়োর, কোনো প্রাণীরই বিনাশ হল না, তোমার যূপকাষ্ঠ বা হাড়িকাঠের তরে গাছ কাটা হল না, হোমযাগের তরে একগুচ্ছ ঘাসও বরবাদ গেল না।'[১৩৫] এরপর ব্রাহ্মণ্য যজ্ঞের চেয়ে মহত্তর যজ্ঞের নামখানি জানান বুদ্ধ। বলেন: সর্বনিকৃষ্ট হল রক্তফেনার ঘটাপটায় সারা যজ্ঞ—দুষ্কর যেমন তেমনি মোটের অপর অকারী ওটি; ওর চাইতে, (যে কোনোদিন), শীলবান প্রব্রজিতকে নিবেদিত *নিত্য দান* ('perpetual gifts [১৩৬]) অপেক্ষাকৃত সুকর এবং উপকারী।

যজ্ঞ-কাণ্ডের জুতসই জবান যদি হয় ছান্দস/সংস্কৃত, তবে দান-কাণ্ডের মানানসই জবান লৌকিক। অতএব, আশ্চর্যের কিছু নেই যে, 'ব্রাহ্মণ-সেব্য' বুলি, ক্ষমতার ভাষা **power-language** 'সাধুভাষা'-র প্রতি, বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন শ্রমণদল থেকে বারেবারেই উদ্‌গত হয় প্রগাঢ় তাচ্ছিল্য।

ভাষা

(i) *বিনয়পিটক* 'চুল্লবগ্গ' ৫/৩৩/১-এ আছে 'ভাষা-প্রশ্ন'-এর শ্রামণ্য-মীমাংসার অসামান্য এক নিদর্শন।[১৩৭]

বুদ্ধের দুই শিষ্য—ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত দুই ভ্রাতা তারা, পরিচ্ছন্ন তাদের ভাষাজ্ঞান, উচ্চারণ পরিশীলিত—তথাগতকে জানায় তাদের মনোকষ্ট: 'এক্ষণে তথাগত, নাম-গোত্র-বংশ-পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন কত লোকে প্রব্রজ্যা নিচ্ছে। নিজ নিজ কথ্যভাষায় (*সকায় নিরুত্তিয়া*) আলাপ-প্রচারে রত হয়ে বিকৃতি ঘটাচ্ছে বুদ্ধবাণীতে। অনুমতি দিন তথাগত, আপরা আপনার বচনাবলি বৈদিক সংস্কৃত-এ আরোপ করি (*ছন্দস আরোপেম*)'। প্রস্তাব শুনে বুদ্ধ তো চটেমটে লাল। তেমনই মুখতোড় ওঁর প্রত্যুত্তর : 'ওরে মুখ্যুরা, ওতে যে হিতে বিপরীত হবে রে! শুনলে সে ভাষা, যাদের এখনও মতি ফেরেনি তাদের আর ফিরবে না মতি, আর যাদের ফিরেছে, সঙ্গে সঙ্গে পাততাড়ি গুটিয়ে পিঠটান দেবে'। এরপর, ভিক্ষুসমাজে জারি করেন আইন বুদ্ধ : 'বুদ্ধের কথা (দেব)-ভাষায় কক্ষনো আরোপ করবে না কোনো ভিক্ষু। যে করবে, পাতক হবে সে। ভিক্ষুগণ ! প্রত্যেকে নিজের নিজের আঞ্চলিক ভাষায় চর্চা করুন বুদ্ধবাণী'।

(ii) বুদ্ধপ্রয়াণের অনেক পর, খ্রিস্টাব্দ ২-য় শতাব্দী নাগাদ, সংস্কৃতে বৌদ্ধশাস্ত্র লেখালেখি রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেলেও, জৈনরা কিন্তু ব্রাহ্মণ-ভাষা বিসর্জন দেওয়ায় প্রায় কোনোকালে বিরত হন না। লৌকিক ভাষায় উচ্চমানের চিন্তা-গবেষণায় নিযুক্ত হওয়াটাই বোকামি; ওতে যশ নয়, জোটে কেবল অপযশ—এ ধরনের দুর্ভাবনায় কখনই কাতর হননি জৈনরা। পূর্বি প্রাকৃতে লেখাপড়া করার ব্যাপারে মহাবীরের চেলা প্র-:চলাদের অন্তরে হীনম্মন্যতার মালিন্য স্পর্শও করেনি। ১২ শতকের এক গল্প-সংকলনে আছে: (*বিনয়পিটক* 'চুল্লবগ্গ'-এর দেবভাষাজ্ঞ দু-ভায়ের মতোই) জৈন ভিক্ষু সিদ্ধসেন জৈনশাস্ত্রের সংস্কৃতে তর্জমা করার সাধুপ্রস্তাব ফর্মান; ফল হয়, ভাষাদ্রোহিতার অভিযোগে জৈনসমাজ হতেই বহিষ্কৃত হন সিদ্ধসেন।[১৩৮]

(iii) চার্বাক নামের অ-বৈদিক গোষ্ঠী ইতিহাসে খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁদের আর কিছু রক্ষা না পেলেও, চার্বাক বাগ্‌দৃকভঙ্গিটি কিন্তু আজও জলজ্যান্ত। মাধবাচার্য (খ্রিস্টাব্দ ১৪ শতক) রচিত (ও ১৯ শতকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক সম্পাদিত) *সর্বদর্শনসংগ্রহ*-এ রয়েছে (অননুকরণীয়) চার্বাক মতের (স্বকল্পনায় অনুকরণমূলক) এক বিবৃতি। তাথেকে জ্ঞাত হই আমরা : চার্বাকদের নিশ্চিত-বিশ্বাস ছিল, বেদকর্তারা ভণ্ড, মাংসলোলুপ নিশাচর; তাদের মন্তর-টন্তরও নৈশনেশায় মত্তদের বিড়বিড়ানির বেশি কিছু না; (*ঋগ্বেদ*

১০/১০৬/৬-এ যেমন[১৩৯]) 'জর্ভরী-তুর্ফরী-পর্ফরী' ধ্বনিজোট পাই, তেমনই অর্থহীন প্রলাপে ভরভরতি সমগ্র বেদসাহিত্য।[১৪০] লক্ষণীয়: মাধবাচার্যের বিবৃতি অনুসারে চার্বাকপন্থীরা অশ্বমেধ যজ্ঞের যেমন, তেমনি সমুচ্চয়বাদী ধর্মশাস্ত্রী মনুর নিন্দায় পঞ্চমুখ। (প্রায় একালের *সর্বদর্শনসংগ্রহ* থেকে কিন্তু মোটেও প্রমাণ হয় না যে, আদি চার্বাকরাও মনু-উত্তর যুগের লোকজন।)

হঠাৎই যেন উঠেছে আওয়াজ: ঢের হল যাগ-হোম-বলির তথাকথিত সনাতনী রেওয়াজ, প্রচুর হল বৈদিক ভাবাদর্শের নামে দক্ষিণা আদায়, ভয়াবহ সওয়া হল 'জর্ভরী-তুর্ফরী-পর্ফরী'-র ঝালাপালা, যথেষ্ট হল গড্ডল হেন নিস্তরঙ্গ জীবনপাত, আর নয়—এবার এসেছে স্ব-জোরে নিজের মুখোমুখি দাঁড়াবার প্রহর। ভালোমানুষ পিতাদের চমকাতেই যেন পুত্রেরা তুলেছে স্পর্ধিত নারা: ভালোমানুষ নই মোরা; রটুক দেশে দেশে নিন্দে, ঘটুক পদে পদে বিপদ, আমরা তবু পুঁথির কথা ফেলে কইব উলটো কথা; আর যা কাড়ুক বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে, আমাদের পাগলামি কেউ কাড়বে না; আমাদের নেই ঝুলি, নেই থলি, আমরা চাই না আরাম, চাই না বিরাম; দেখছ না—আমাদেরই চলার বেগে পায়ের তলায় জাগছে রাস্তা!

ফল হয়েছে : 'যাজ্ঞিক-গৃহী-ব্রাহ্মণ' *পিতা* ও 'দাননির্ভর-পরিব্রাজক-শ্রমণ' *পুত্র*-এর মতাদর্শীয় টক্করে নবীন বয়ানের চাবি শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে *অহিংসা* এবং সে-বয়ানের চাপে উত্তরোত্তর সংকটময় হচ্ছে *পরিবার* নামক প্রতিষ্ঠান।

সাধে কী আর, শ্রমণ নেতাদের অন্যতম গৌতম বুদ্ধের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও মগধের জনতা তাঁকে ঘর-সংসারের অশেষ ক্ষতিসাধকও জ্ঞান করত। লেখা আছে বৌদ্ধ *ত্রিপিটক*-এর পয়লা পিটক *বিনয়পিটক*-এর 'মহাবগ্গ' ১/২৪/৫-এ : গজগজ করে মগধবাসী, বাপেরা যে ছেলে পয়দা করে না তার কারণ ওই শমণ গোতম, বউগুলো যে রাঁড় হচ্ছে তার কারণ ওই শমণ গোতম, কুল-পরিবার যে গোলে যাচ্ছে, ধুয়েমুছে ধসছে, তার কারণ ওই শমণ গোতম।[১৪১] পরিস্থিতি এতই করুণ যে, মগধের সীমান্তে উত্তেজনা উপস্থিত হলে, সৈন্যরা কোথায় রাজধর্মের খাতিরে আত্মবলিদানে অগ্রসর হবে, তা না, তারাও বিষণ্ণচিত্তে ভাবতে লেগেছে, 'আমরা মহাপাপী—আমরা যারা যুদ্ধে যাই, হানাহানি কাটাকাটিতে মজা পাই। দরকার নেই আর: চলো ভাইসব, যাই শমণ গোতমের কাছে, নিই গে প্রব্রজ্যা'![১৪২]

৮

ঐতিহাসিক A.L. Basham-এর ভাষায়, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীতে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় তুমুল যে তত্ত্ব-বিগ্রহ শুরু হয়, তার একধারে ছিল ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামি, 'orthodox Brahmanism', অন্যধারে, 'দার্শনিক বিক্ষোভ', 'philosophical fer-

ment'।[১৪৩] সন্ধিৎসার তাড়নাতেই ভ্রামণিক শ্রমণরা একে অপরের সঙ্গে তর্ক-জল্প-আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন, চলন্ত দার্শনিকদের মিলনমঞ্চ হিসেবে নগরী বা বর্ধিষ্ণু গ্রামের (কৌতূহলী) বাসিন্দারা গড়ে দিচ্ছেন *কুতূহল-শালা*। বাদ-বিসংবাদের পরিণামেই শ্রমণরা জড়িয়ে যাচ্ছেন ক্রমবর্ধমান অন্তর্কলহে। সকলেই পথান্বেষক তীর্থিক; সেই সহ, সকলেরই চোখে ভিন-গোষ্ঠীর তীর্থিকরা *অন্যতীর্থিক* বা *অনুত্থিয়া*। ফলত, একে অপরের পার্থক্য দর্শাতে প্রত্যেক শ্রমণদলকে রপ্ত করতে হচ্ছে নিজস্ব কিছু কায়দা, উদ্ভাবন করতে হচ্ছে বিশিষ্ট কিছু মুদ্রা, পারস্পরিক তথা পরিবর্তনশীল যোঝাযুঝির মারফত রোজ রোজই লাগতে হচ্ছে স্বপরিচয়বোধক চিহ্নবিজ্ঞান নির্মাণে।

নিঃসন্দেহে, শ্রমণাদর্শে, বিবিধ ঝুটঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত অথচ থিতু, জড়াপট্টির সংসারে ডুবে অথচ সাজ-অলংকারে আবরিত গেরস্থ ও সন্ন্যাসীর মধ্যে দৃশ্যগত *ব্যবধান* রচনার পক্ষে *নগ্নত্ব*-ই মোক্ষমতম *উর্দি*। নিরাবরণতা ন্যায় স্বচ্ছ পোশাক আর আছেই বা কী—বাজারে দুনিয়ার গ্রন্থিতে যাঁরা বাঁধা নন, তাঁরা তো সংজ্ঞাতই নির্গ্রন্থ। মুশকিল কেবল, একবার যদি কোনো শ্রমণদল নগ্নাট ভঙ্গিটি আপনে নেয়, তবে অপরাপর সম্প্রদায়কে বাধ্যতই নামতে হয় ভিন্ন ধরনের সমাকার পরিচ্ছদ আবিষ্কারে— সৃষ্টি করতে হয় তাঁদের নিরাবরণতার পরিবর্তে নিরাভরণতায় *নিরাবরণ-মুখী*, নগ্নত্বের পরিবর্তে নগ্নত্বের ইঙ্গিতবহ বেশ; সারল্যে অনুপম সেরা উর্দিটি হাতছাড়া হলে, অন্য-তীর্থিকদের ভাবতেই হয় সন্ন্যাসীর স্বাভাবিক দিশ্বাস-ভূষা ও সংসারী-উপযোগী সামাজিক বসনের *মাঝামাঝি*, নগ্নত্বে *আনুমানিক* কোনো সজ্জার কথা। এই যেমন, গৌতম বুদ্ধ। আমরা তাঁকে বিনয়পিটক-এর 'মহাবগ্গ'-এ বলতে শুনি: '[গৃহী কর্তৃক পরিত্যক্ত], জঞ্জালে ফেলে দেওয়া ন্যাকড়া হয়ে-যাওয়া, কাপড়ের টুকরো জুড়ে জুড়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু বানাবে তার পরিধেয়'।[১৪৪] এতে অবাকের কিছু নেই যে, (আঢাকা-র ঢাকা, কৌপীন সম্বলেও শূন্য, অচেলক-এর প্রতি চোরাটান সত্ত্বেও), দিগম্বর অন্য-তীর্থিকের উর্দি-চয়ন সম্বন্ধে (চোরা) কটাক্ষ করতে ছাড়বেন না অ-নগ্নিক তীর্থিকই। *দীঘ নিকায়*-এর 'কস্‌সপ-সীহনাদ সূত্র'-এ বি-বস্ত্র সন্ন্যাসী কাশ্যপ-সহিত দার্শনিক আলোচনায় নিরত তথাগত পোশাকআশাক নিয়ে বেশ ক-বার যা বলেন, তার সারমর্ম: উলঙ্গতা বাহ্য প্রচ্ছদ মাত্র; অচেলক অথচ বদ্ধমন যে, সে আর যাই হোক শ্রমণ নামের উপযুক্ত নয়।[১৪৫]

নগ্নতা-অনগ্নতাই সবটুকু নয়। শুচি-অশুচি নিয়ে বামানাই বাই-কে আক্রমণ না করলে কি শ্রমণত্ব অর্জন করা যায়? *দীঘ নিকায়* 'কস্‌সপ-সীহনাদ সূত্র'-এ তথাগত সমীপে অ-বৌদ্ধ তীর্থিকদের মান্য আচারের একখানি ফর্দ দাখিল করেন নাঙ্গা সন্ন্যাসী কাশ্যপ। ফর্দে ছিল: 'নগ্ন উপস্থিতি, মুক্তাচরত্ব, অর্থাৎ, ভোজন ও শৌচ ক্রিয়াদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সম্পন্ন করা, হস্তাবলেহন, অর্থাৎ, আহারান্তে হাত না ধুয়ে হাত চাটা, দেহকে ধূলধূলিময় করা, খোলা জায়গায় শোওয়া, বিকট আহার ভোজন, যথা, গোবিষ্ঠা-গোমূত্র-ভস্ম-মাটি, ইত্যাদি।'[১৪৬] নিঃসন্দেহে, অতি উৎকটপনায় সায় ছিল না তথাগত গৌতমের। তা-বলে,

শুদ্ধি-অশুদ্ধি নিয়ে প্রচলিত সংস্কারাবলিকে সমস্যাময় করার শ্রামাণ্য দায় এড়িয়ে যাবেন তিনি, তাও তো অসম্ভব। বিনয়পিটক 'মহাবগ্গ'-এর বসন-সংক্রান্ত বুদ্ধাজ্ঞার পাশাপাশিই কি নেই অশন অবস্থান ও ঔষধ সম্বন্ধে বুদ্ধের এ তিন আজ্ঞা: '[গৃহীর দান] অন্নই ভিক্ষুর খাদ্য; বৃক্ষতলই ভিক্ষুর বিরামস্থল; ফেনা-কাটা প্রস্রাবই ভিক্ষুর ওষধি-সম্ভার'।[১৪৭]

৯

আড়াই হাজার বছর আগের গাঙ্গেয় উপত্যকা যেন এক নাটমঞ্চ: শ্রমণ কোলাহলে মুখর, নানা চাপান-উতোরে সংলাপময় যেমন, তেমনি বিচিত্র সাজপোশাকে বর্ণময়।

জমজমাট সে নাটকে কারো মনে হতেই পারত, *ঋগ্বেদ*-এর 'কেশী সূক্ত' নামে খ্যাত, ঋগ্বেদ মণ্ডল১০, সূক্ত ১৩৬-র ২-য় ও ৩-য় ঋকে বর্ণিত মুনিরা বুঝি প্রত্যাবর্তন করলেন ধরাধামে। যে বিস্ময়ত্রাস 'মুনিরা পিঙ্গলবর্ণ মলিন বস্ত্র ধারণ করেন, তপস্যা-রসের রসিক উন্মত্তবৎ [তাঁরা]'[১৪৮] বেদোচ্চারণে ধৃত, তা যেন ফের অনুভূত হচ্ছে। হয়তো-বা ওই বিস্ময়ত্রাস আবেশে কারো চিত্তে পুনঃজাগরুক হয়েছিল *অথর্ববেদ* '২-য় কাণ্ড, ১-ম অনুবাদক, ৫-ম সূক্ত'-এর তৃতীয় ঋকটি। কেননা, ও ঋকেই ইন্দ্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে স্মরণ করেছিলেন বেদের ঋষি, 'দ্রুত শত্রুর পরাভবকারী [এবং] সকল প্রাণীর মিত্ররূপ [ইন্দ্র] যতির মতো বৃত্রবধ করেছিল'।[১৪৯] (*ঋগ্বেদ* ৮/৩/৯, ৮/৬/১৮, ১০/৭২/৭, *অথর্ববেদ* ২/১/৫:৩, *কৌষিতকী* উপনিষদ্ ৩/১-এর সাক্ষ্যে মনে হয়) শ্রমণদের হাব-ব্যাভারে ব্রাহ্মণ-হৃদয়ে 'মুনি'-কে ঘিরে বৈদিক ঋষির বিপন্নতার নবোদয় ও তৎসূত্রে সুপ্রাচীন আর্য-অনার্য সংগ্রামের রেশবাহী 'যতি'-হত্যার ইন্দ্র-বৃত্তান্তে পুনঃ আস্থাপেশ আদৌ অসংগত ছিল না। ভাবতেই পারতেন খ্রিঃ পূঃ ৬-৫ শতাব্দীর দ্বিজোত্তমরা, শ্রমণ উৎপাতে কি 'প্রব্রজ্যা'র মতো অ-বৈদিক অনার্য (বর্বরোচিত) সংস্কৃতিই নবীন কলেবরে ফিরে এল?[১৫০]

১০

শ্রমণে শ্রমণে ভেদবিভেদের অন্ত নেই; কিন্তু, বলাই যায় 'বাক্য'-এর উপমায়, ভেদবাবদ যতই অজস্র হোক উদ্দেশ্য, প্রতি কটা বিভেদ-ই অদ্বিতীয় এক বিধেয়-এর উপর ন্যস্ত। অদ্বিতীয় সে বিধেয়: ব্রাহ্মণ্য-বিরোধিতা। তা-ও, এখানেও জটিলতা আছে। কারণ, শ্রমণবিপ্লবে যদি, (বিশেষ, চংক্রমণের উপর গুরুত্ব আরোপে), লুপ্তপ্রায় তা-ও দুর্মর অনার্য অভ্যাসের আংশিক পুনরুজ্জীবন হয়েও থাকে, সে বিপ্লবের কয়েক নায়কের চিন্তন-আঙ্গিক তবু, জায়গায় জায়গায় সরাসরি ঔপনিষদিক রীতির কাছে ঋণী।

ঢাকঢোল সহকারে সম্পন্ন আরক্তিম যজ্ঞের শ্রামণ্য সমালোচনাতেই ফেরা যাক। বামন পিতারা যা-ই তার কদর্থ করুক, এ-ও সত্য যে, *যজ্ঞ* শব্দের অন্যতর কিন্তু ব্যাপ্ত মহৎ অর্থ শ্রুতির ঐতিহ্যেও রণিত-নন্দিত। নিঃসংশয়ে প্রাক-বৌদ্ধ উপনিষদ সুপ্রাচীন

ছান্দোগ্যোপনিষদ্-এর তৃতীয় অধ্যায় ষোড়শ খণ্ড প্রথম শ্লোক আরম্ভই হয় এই ঘোষণায়; 'পুরুষোবাব যজ্ঞঃ'[১৫১], 'পুরুষই যজ্ঞ'[১৫২] , 'Man is sacrifice'[১৫৩] 'Verily, a person is a sacrifice'।[১৫৪] এ নয় ফলাশায় সাধিত যজ্ঞ; বরং তার বিপরীত, স্বনির্মাণের যজ্ঞ, আত্মহোমের বহ্নি জ্বালার প্রয়াস। এ প্রয়াস সূত্রেই *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* ৩/১৭/৪-এ বসেছে *দক্ষিণা* শব্দটি। এবং, সে শব্দে চলিত মানের 'দক্ষিণা' নয়, আছে বরং *দান-এর* অভিভব। ৩/১৭/৪-এর পূর্ণরূপ: 'তপস্যা, দান, সরলতা, অহিংসা ও সত্যভাষণ—এ-ই [পুরুষযজ্ঞের] দক্ষিণাসমূহ'।[১৫৫] *যজ্ঞ* বৃহদায়তন পেতেই শ্লোকে অমোঘত প্রবেশ করেছে *অহিংসা*। হয়তো, শ্রুতির ঐতিহ্যে যজ্ঞ-এর বড় প্রতীকী মানে ও *অহিংসা* স্থান পেয়েছে বলেই, যে যে শ্রমণদল *অহিংসা*-কে মাত্রাতিরিক্ত মূল্য দেবে—যেমন, জৈন-বৌদ্ধ—তারা আবার ব্রাহ্মণ সম্পর্কেও বাঁচিয়ে রাখবে গহীন, এক মমতা।[১৫৬]

আরেক প্রাকবৌদ্ধ উপনিষদ্, *বৃহদারণ্যোকোপনিষদ্* ৩/৫/১ এবং ৪/৪/২২-এ যে ব্রাহ্মণ সংবর্ধিত হয়েছেন, তাঁকে অন্তত সমীহ্ জানাতে সাংঘাতিক কোনো তাত্ত্বিক অসুবিধেয় পড়তেন না বৌদ্ধ-জৈনরা। ও দুই শ্লোকে ব্রাহ্মণ-এর যে ছবি এঁকেছেন যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি, তা-এ-রকম : আত্মলাভের উদ্দেশ্যে পুত্রৈষণা-বিত্তৈষণা-লোকৈষণা ছেড়ে *ভিক্ষাচর্য* গ্রহণ করেন ব্রাহ্মণ (৩/৫/১); এই একই কারণে *পূর্বের বিদ্বানরা* বলতেন সন্তান দিয়ে হবেটা কী এবং সব ছেড়েছুড়ে বেরোতেন তাঁরা *প্রব্রজ্যায়* (৪/৪/২২); পণ্ডিতির পর্ব চুকলে ব্রাহ্মণ হন বালক-সুলভ নিরভিমানী, সরল; তারপর, পাণ্ডিত্য-বাল্য দুই-ই সমাপন করে ব্রাহ্মণ হন *মুনি*; তৎপর, মৌন-অমৌন উভয়ই তাঁর পরিসমাপিত হয়; এই যে ব্রাহ্মণের এষণাবিনির্মুক্ত আত্মবোধ, এর বাইরে আর যা, তা আর্ত, বিনাশশীল (৩/৫/১)।[১৫৭] ভাবা কঠিন, প্রায় একই স্থলে *ভিক্ষাচর্য-পূর্বের বিদ্বান-প্রব্রজ্যা-মুনি-আর্ত*-এর মতন উত্তেজক পারিভাষিক পেয়ে, সে তীর্থসংগমে সুস্নাত হতে বাধত কোনো বৌদ্ধ কিংবা জৈনের। তাঁরা নিশ্চয়ই পূর্বের বিদ্বান বা *the people of old* [১৫৮] বাক্যাংশ থেকে পরিব্রাজকের জন্য আদায় করে নিতেন ইতিহাসের ছাড়পত্র।[১৫৯] আচারভীরু বামুনদের শুনিয়ে শুনিয়ে গাইছেন যে শ্রমণরা, 'যাবার হাওয়া ঐ-যে উঠেছে—কোনো কালে হয়নি যারে দেখা— ওগো তারি বিরহে এমন করে ডাক দিয়েছে, ঘরে কে রহে', এ তো সে উজানি গানেরই উলটো দিক থেকে বয়ে আসা প্রতিধ্বনি!

বৌদ্ধ লেখাপত্রে *ব্রাহ্মণ* দ্ব্যর্থবোধক। এক মানেতে ব্রাহ্মণ সে, যে জাত-জন্মের অহংকারে উদ্ধত উন্নাসিক, গতানুগতিকতায় স্থবির, অবক্ষয়ী সংস্কারের পরিপালক, বদ্ধমূল আকাট। তির্যক এ অনুকম্পার চমৎকার নিদর্শন *দীঘ নিকায়*-এর 'অগ্‌গঞ্‌ঞ সুত্রান্ত'।

সুত্রান্তটি 'সৃষ্টিরহস্য'-বিষয়ক, 'A Book of Genesis'। বক্তা : বুদ্ধ; আর শ্রোতা :

কুলীন হয়েও কুলাঙ্গার বলে ব্রাহ্মণসমাজের অকৃপণ নিন্দা-ভর্ৎসনার পাত্র, প্রব্রজ্যা আশ্রয় করা স্বেচ্ছা-ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ বাসেট্‌ঠ। 'অগ্‌গঞ্‌ঞ সুত্রান্ত'-এ বুদ্ধ কথিত 'সৃষ্টিরহস্য' এরূপ: আজ না হোক তরশু, জগতের লয় হবেই, এবং ফের তৈরি হবে জগৎ; (স্রেফ জায়মানতার খাতিরেই ঘুরন্ত এ চক্র); (এক্ষণে বিবর্ত) যে জগৎ, (আর সব প্রারম্ভিক মুহূর্তের মতনই), গোড়ায় ছিল আলোজ্জ্বল সত্ত্ব বা *being*-এর আবাস; মনোময়, প্রীতিময়, শুভময়, আভস্বর, নভচর সত্ত্বরা তখন শুধুই *being*; এরপর আবির্ভূত হল বর্ণ-গন্ধ-রূপময় পৃথিবী; মাটির পানে আকৃষ্ট হল কিছু সত্ত্ব; সরস সে মাটির আস্বাদ নেওয়ামাত্র তাদের মধ্যে জাগল *তৃষ্ণা* বা *craving*; সত্ত্বদের যে দল সত্ত্ব সরসমৃত্তিকা খেলে সবয়ব হলে তারা; ভক্ষণের পরিমাণ তারতম্যে কঠিনশরীব সত্ত্বদের মধ্যে এল রং-পুষ্টি বলিষ্ঠতার তারতম্য; সবলরা তুলনায় নির্বলদের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলতে লাগলে, আমরা সুরূপ, তোরা কুরূপ; এরপর এল সত্ত্বদের ভেতর লিঙ্গভাগ; কেউ পেলে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়, কেউ পুং; একে অপরের দিকে অত্যধিক দৃষ্টিপাতের ফলে উৎপত্তি হল রাগের, স্ত্রী-পুরুষ উভয় জীবের দেহ পর্যবসিত হল প্রদাহ-আগারে; ধুম পড়ল মৈথুন ব্যায়ামের; এরপর ধরাবক্ষে সালিধান্য দেখা দিলে, লোকে জমিতে সীমানা টানাটানি আরম্ভ করলে; যখন, (বলবত্তা-নারীভোগস্পৃহা-মালিকানা ও তৎপ্রসূত নানা দৌরাত্ম্যে) পাপধর্মে ছারেখারে যায়-যায় সব, তখন লোকেরাই শলাশালিশি করে একজনকে সমাজের চূড়োয় বসালে; (সামাজিক ওই চুক্তির) প্রসাদে সর্বাগ্রে এল, মহাজন-নির্বাচিত 'মহা সম্মত'; তারপর এল 'ক্ষত্রিয়'—*ক্ষেত্তানাম* বা ক্ষেত্রপতি শব্দটির মূল; তারপর 'রাজা'—ধর্মদ্বারা অপরের প্রীতি উৎপাদন বা *রঞ্জেতি* থেকে উৎপন্ন ও শব্দ; আর যারা ভাবলে, বড়ই দুর্বহ হয়েছে পাপের ভার, আমরা অকুশল ক্রিয়া বর্জন করে অরণ্যে যাব তারাই হল 'ব্রাহ্মণ'—বর্জন করা অর্থে *বাহেত্তি থেকেই* 'ব্রাহ্মণ' শব্দের উৎপত্তি; অঙ্গার নেই, ধুম নেই, মুষল নেই, দিবারাত্র তারা কেবল পর্ণকুটীরে *ধ্যায়ন্তি* বা ধ্যান করে দেখে আরণ্যক সত্ত্বগণের আরেক নাম হল *ধ্যায়ী*; আর যারা মৈথুন-ধর্মে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন *বিস্‌সা* বা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হল, তারা 'বৈশ্য' আখ্যাত হল; বাকি সত্ত্বদের নাম হল 'শূদ্র'—*ক্ষুদ্দা* বা ক্ষুদ্র সে শব্দের মূল; এখনি হল কী, ব্রাহ্মণদের একাংশের আরণ্যকজীবন বেশিদিন পোষালো না; ধ্যানাসন ছেড়ে গ্রাম-নিগমের প্রান্তে গিয়ে বই লিখতে বসলে তারা—আর 'ধ্যান করে না' বলে তাদের নতুন নাম হল 'অধ্যায়ক'; সেযুগে, বুঝলে বাসেট্‌ঠ, লোকে 'অধ্যায়ক' শ্রেণীর মানুষজনদের সবচাইতে হীন জ্ঞান করত; আর এখন, (ধিক! কী কুটিল কালের গতি), তারাই কিনা সর্বাধিক মানখাতির পায়![১৬০]

'সৃষ্টিরহস্য' শোনাবার আগে ব্রাহ্মণদের আত্মস্তবের ভিত্তিসূক্তটি কায়দা করে ঝালিয়ে নেন তথাগত। ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ জাতি, অন্য জাতি হীন; ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ, অন্যে কৃষ্ণ; ব্রাহ্মণ শুদ্ধ, অন্যে নয়—এ সব দাবির যথাযথতা দাঁড় করাবার উদ্দেশে লাখোবার উদ্ধৃত *ঋগ্বেদ* ১০-ম মণ্ডলের ৯০-তম সূক্ত, 'পুরুষসূক্ত'-এর ১২ তম ঋকের ('[পুরুষ/ব্রহ্মার]

মুখ ব্রাহ্মণ হল, দুই বাহু রাজন্য হল, যা উরু ছিল তা বৈশ্য হল, দু-চরণ হতে শূদ্র হল'[১৬১]), প্রথম ও শেষাংশটি বাসেট্ঠ্ কে দিয়ে পুনঃআবৃত্তি করান বুদ্ধ।[১৬২]

'পুরুষসূক্ত'-এর প্রত্যুত্তরে শমন গোতমের খাড়া করা 'সৃষ্টিরহস্য'-এ চতুর্বর্ণের থাকবন্দি বা *hierarchy* এলোমেলো, ভরতি তা 'ক্ষত্রিয়'-'রাজা'-'ব্রাহ্মণ'-'বৈশ্য'-'শূদ্র' ইত্যাদি শব্দের গাঁজাখুরে ছদ্ম-ব্যুৎপত্তিতে। তবে যে সরস বিদ্রূপময় বুৎক্রম বা reversal-এর জন্য আখ্যানটি একেবারেই অবিস্মরণীয় সেটি এই : 'অগ্‌গঞ্‌ঞ সূত্রান্ত' মতে স্বাধ্যায়রত ব্রাহ্মণরাই 'অধ্যায়ক', 'শ্রম্' বা ক্লান্তি দ্বারা অধিকৃত, ধ্যানচ্যুত ব্রাহ্মণরাই বেদরচক!

বৌদ্ধশাস্ত্রে আবার ভিনধাতুতে গড়া 'ব্রাহ্মণ'-মূর্তির নিদর্শও প্রচুর। তার অনেকস্থলেই জঙ্গম শ্রমণদের মতনই আরোহণ-উৎসুক, বিপুল বিশ্বকে তার বিপুলতায় মানতে প্রস্তুত, স্বাধীন এক তত্ত্বকল্প *ব্রাহ্মণ*।[১৬৩]

বর্ণজ্যেষ্ঠ বা (স্বঘোষিত) অগ্রজাতককে নিয়ে বৌদ্ধ দ্বিচারণ লীলা খুবই ভালো খুলেছে *দীঘ নিকায়* 'কস্‌সপ-সীহনাদ সূত্র'-এ। নগ্ন সন্ন্যাসী কাশ্যপ যেখানে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটিকে অন্যার্থে ব্যবহার করেন, গৌতম বুদ্ধ সেখানে অন্তঃসংগতি বিসর্জন না দিয়েও নাগাড়ে শব্দতাৎপর্যে মাত্রান্তর ঘটিয়ে চলেন—এতদূর যে শেষ অব্দি 'ব্রাহ্মণ'কে পুরো গ্রাসই করে ফেলে 'শ্রমণ'।[১৬৪] 'কোন্ উপায়ে চিনি কে ব্রাহ্মণ, কে শ্রমণ'[১৬৫] — কাশ্যপের এ সদ্‌জিজ্ঞাসা যে উপায়ে মেটান গৌতম, তাতে আরোই দুরূহ হয় শ্রামণ্য চিহ্নবিজ্ঞান। সে দুরূহতার জের এমনকী *ধম্মপদ*-এও অব্যাহত।

ধম্মপদ—সুত্তপিটক-এ'র পাঁচের নিকায় খুদ্দকনিকায়-এর দুয়ের বই—বহুজন সমাদৃত, পরিচিতির পরিসংখ্যানে বৌদ্ধসাহিত্যের মস্তকমণি। সুরেলা, সাবলীল, প্রসাদগুণে অনুপম, ছাব্বিশ বর্গে বিন্যস্ত *ধম্মপদ*-এর শেষ বর্গের শিরোনাম 'ব্রাহ্মণবগ্‌গো'। 'কে ব্রাহ্মণ' আর 'কে ব্রাহ্মণ নয়', এ দু-প্রশ্নই বিবেচিত সেখানে। ব্রাহ্মণ-শনাক্তির পক্ষে কোন্ সব লক্ষণ অ-যথেষ্ট, *ধম্মপদ* এ তার তালিকা: 'জটা, গোত্র, জাতি (সংখ্যা ৩৯৩)[১৬৬]; জটা-ধারণ, অজিনসাটিয়া বা মৃগচর্মের পরিধান (সংখ্যা ৩৯৪)[১৬৭]; ব্রাহ্মণী যোনিজ হওয়া, "ভো! আমি বামুন" চেঁচাতে ওস্তাদ দাম্ভিকের ভোবাদি-পনা (সংখ্যা ৩৯৬)'[১৬৮]। সংখ্যা ৩৮৮-এ তিনটি পদ আলাদা করে সংস্তায়িত: 'অপগতপাপ যে সে ব্রাহ্মণ, শমিত ধীরচরণে হাঁটে যে সে শ্রমণ, স্বস্য পাপ-মল যে প্রব্রাজয়ন করে, (অর্থাৎ কিনা, দূর করে), সে প্রব্রজিত'।[১৬৯] খানিকপরেই অবশ্য এ পদত্রয় একদেহে সমীভূত: 'অভিলাষহীন, কামভবপরিহারী অনালয় পরিব্রাজকই ব্রাহ্মণ' (সংখ্যা ৪১৫)[১৭০]; 'তৃষ্ণারহিত গৃহকোলছিন্ন পরিব্রাজক যিনি, তৃষ্ণা ও ভবস্রোতকে ক্ষীণ করেন যিনি, তিনিই ব্রাহ্মণ' (সংখ্যা ৪১৬)[১৭১]। মোদ্দাকথা : যেহেতু আভিজাত্যের গর্ব-মলে দূষিত, দুর্গন্ধযুক্ত নয় পরিব্রাজক, সেহেতু শ্রমণই (যথাযথ) ব্রাহ্মণ; ('এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন' নিমন্ত্রণে উদ্বোধিত-চিত্ত পুণ্য তীর্থগামীমাত্রেই দীক্ষিত শ্রামণ্যব্রতে!)

কেজো অথচ অকম্মার ধাড়ি বামুনদের কোন্ নজরে দেখতেন শমণরা তা বিপরীতের নজির-রূপকেও উপস্থাপিত শমণ গৌতমের মতাবলম্বী বা নিগণ্ঠ নাথপুত্ত ওরফে নিগ্রন্থ নাথপুত্র ওরফে মহবীরের মতাবলম্বীদের শাস্ত্রে।

উদাহরণ: *দীঘ নিকায়*-এর *'অম্বট্‌ঠ সূত্র'*-এ ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি-র তরুণ শিষ্য অম্বট্‌ঠ ও গৌতম বুদ্ধের লম্বা এক তর্কের বিবরণ আছে। অম্বট্‌ঠ অতিশয় জাত্যাভিমানী, গোত্র-বংশের মহিমাধ্যানে চুর। বুদ্ধ অবশ্যই তার সে ঘোর ভাঙতে সমর্থ হন। কিন্তু, তার পূর্বে, যে ভাষায় অম্বট্‌ঠ শাক্যমুনিকে গালি দেয়, তাথেকে শ্রমণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্য প্রেক্ষিতের ভালো আন্দাজ মেলে। অম্বট্‌ঠ বলে বুদ্ধকে : 'হে গৌতম, শাক্যজাতি কোপনস্বভাব, পুরুষভাষী, অব্যবস্থিতচিত্ত এবং দুর্দ্দান্ত। ঐ নীচ জাতি ব্রাহ্মণের সৎকার করে না, ব্রাহ্মণের গুরুত্ব স্বীকার করে না; ব্রাহ্মণকে সম্মান করে না, পুজো করে না, সম্ভ্রম করে না। এইরূপ ব্যবহার অযোগ্য, বিসদৃশ'।[১৭২] শ্রমণ-অভিলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ্য বিদ্বেষের তুলনীয় চিত্রায়ন আছে জৈনগ্রন্থ *উত্তরাধ্যান* সূত্র-এ। এর ১২তম অভিভাষণে আছে শ্রমণ-হেনস্থার নিষ্করুণ এক আখ্যান: 'একদা এক শ্রমণ ভিক্ষা সংগ্রহে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে গেসল এক যজ্ঞবাটে। কৃচ্ছ্র সাধনে কৃশ, স্বল্পবেশী শ্রমণকে হেরে পুরোহিতরা তো আর হেসে বাঁচে না। জাত-জাঁকে ভরপুর, পশুঘাতকগুলো টিটকিরি কাটে, "ইনি কোন্ ছিরিকান্ত! রোগাত্তে তা-ও নাক উঁচু! আহারে, কী বাহার! জঘন্য পোশাক, গলায় ময়লা ফালি! কোথাকার পিশেচ হেন নোংরাটে মানুষ গো!"[১৭৩]

১১

পরে যখন দুর্বল হবে শ্লোগানের জোর, নির্বিকারে শান্ত হবে উগ্রপন্থীরা, স্তিমিত হবে দ্রোহকালের আবেগ, তখনও কিন্তু, ব্রাহ্মণ-শ্রমণ বৈরিতা স্মৃতিতে বেঁচে বর্তে রইবে। মহাবৈয়াকরণ পাণিনির সূত্রসংগ্রহ *অষ্টাধ্যায়ী*-কে কেন্দ্র করে বিরচিত আচার্য পতঞ্জলি-র (খ্রিঃ পূঃ ২-য় শতাব্দী) মহাভাষ্য-এ যে 'সমহার দ্বন্দ্ব' বোঝাতে বিরুদ্ধ যুগ্মপদের উদাহরণ হয়েছে 'শ্রমণ-ব্রাহ্মণ', বলা হয়েছে সেখানে, এ-দুয়ের 'বিরোধ-শাশ্বত', সে কি এমনি এমনি?[১৭৪]

সে বিরোধ যে কতদূর চিরায়ত তার এক মাপ আভাস আছে বৌদ্ধ *শবক জাতক*-এ।

গল্পটি এই : বারাণসীরাজাকে শাস্ত্রশিক্ষা দিচ্ছেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত, এমনসময় সেখানে উপস্থিত হলেন বিগত কোনো জন্মের বুদ্ধ। শিক্ষাক্রমে বাধা দিয়ে ব্রাহ্মণকে শোনালেন আগন্তুক, শ্রমণদের উদাত্ত সেই ডাক: '[ঘরে বসে কী হবে], বিপুল এ ধরাতল, যেথা সাধ [যাও][১৭৫], Brahmin, go range the length and breadth of earth'[১৭৬]! *জাতক* গল্পটিতে প্রচ্ছন্ন একটি রসিকতা আছে : যে জন্মে ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে খোলা পথের পথিক, পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হওয়ার পরামর্শ দেন বুদ্ধ, সে জন্মে নিজে তিনি ছিলেন চণ্ডাল, সামান্য pariah![১৭৭]

সন্দেহ নেই তবু, ভারতের ঔপনিবেশিক আধুনিকতায় সমুচ্চয়ী চতুরাশ্রমেরই জয়জয়কার। জাতীয়তাবাদের উন্মেষলগ্নে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে তাঁর *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থের আদিভাগ 'অনুশীলন'-এর সূচনা অধ্যায়ে (১৮৮৫) গুরু শিষ্যের সংলাপ-কাঠামোয়, সাহেবি অহংম্মন্যতা উপযুক্ত জবাব হিসেবে, গুরু-শিষ্যের সংলাপ-কাঠামোয় নিম্ন উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলি লিখেছিলেন, তা সত্যই গুরুত্বময়[১৭৮]

গুরু। দ্বিজবর্ণের চতুরাশ্রম কি মনে কর?

শিষ্য। System of Culture?

গুরু। এমন যে তোমার Matthew Arnold প্রভৃতি বিলাতী অনুশীলনবাদীদিগের বুঝিবার সাধ্য আছে কি না সন্দেহ।

এতৎসত্ত্বেও, সন্দেহ নেই যে, ব্রাহ্মণ-শ্রমণের 'শাশ্বত বিরোধ' ও শ্রমণ-উৎপাতকে সামলাবার ব্রাহ্মণ্য পদ্ধতির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগের নমুনা ঔপনিবেশিক (ও উত্তর-ঔপনিবেশিক) ভারতে ঢের মিলবে। আর তা যদি হয়, তাহলে কি সে-সব আধুনিক সাহিত্যে রূপায়িতও হবে না?

উ প স ং হা র

পুতুলনাচের ইতিকথা[১৭৯]

গাওদিয়ার ডাক্তার শশী। জন্মও তার গাওদিয়ায়। প্রথম যৌবনে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়তে না গেলে হয়তো, শশীর চিত্ত 'গ্রাম্য গৃহস্থের' 'স্বকেন্দ্রীয় সংকীর্ণতা'র বিরুদ্ধে স্পন্দিতই হত না। কিন্তু, শহরের ভিন-আবহ, বই এবং বিশেষ যে সতীর্থের চুলে ছিল 'অন্যমনস্ক বিদ্রোহ', যে বন্ধু তাকে 'শেলির দুর্বোধ্য কবিতা' বোঝাত, 'মোনালিসার [দুরূহ] হাসির ব্যাখ্যা' দিত, 'মেয়েদের মতোই [যার] প্রেমে [পড়েছিল]' শশী, তার নিবিড় সাহচর্য, শশীর 'অনুভূতির জগৎ'কে মার্জিত সংস্কৃত করে।

গাওদিয়ার চিকিৎসক তবু সত্তায় বিশ্লিষ্ট, দ্বি-খণ্ডিত। তার চরিত্রের 'সুস্পষ্ট' দু বিরোধী 'ভাগে' রফা কিছুতেই হয় না। রেশারেশি সত্ত্বেও, একদিকে, 'ভাবাবেগ-রসবোধ', অন্যদিকে, 'ধনসম্পত্তির প্রতি মমতা', দু বৃত্তিই শশীর অন্তরে দাপিয়ে বিরাজ করে। (যৌবনে কলকাত্তাই-সংসর্গের উপসর্গ-বশত), গাওদিয়ার পল্লীসীমানার মধ্যে দিনগত পাপক্ষয় করেও, 'বিদ্যুতের আলোর মতো উজ্জ্বল জীবনে'র কামনায় উদ্দীপিত হতে ভালোবাসে শশী।

তবে, 'শশীর নীড়প্রেম সীমাহীন'। শশীর 'ভাবুকতা উদভ্রান্ত [হতে] জানে না'। আলোর আলা যে জীবন 'কল্পনা' করে শশী, সে জীবন 'যাযাবরের নয়'। এসত্ত্বেও, মাঝেমধ্যে যখনই গ্রাম্য মন্থরতা নিরতিশয় পীড়া দেয় তাকে, তখনই ভাবে গাওদিয়ার ডাক্তার, নাঃ! এবার ছাড়বেই গাঁ, চলে যাবে আর-কোনখানে।

জন্ম ইস্তক জানাশোনা পরিবেশের প্রতি বিতৃষ্ণার পারা চড়লেই টের পায় শশী: 'যে বিপুল ও মনোরম সমারোহে' সে ভরাতে চায় জীবন, 'শিক্ষা, সভ্যতা ও আভিজাত্যের' যে প্রতিবেশ তার ঈপ্সিত, সে-সব ফলাতে শুধু 'মশকদষ্ট মৃত্তিকালীন' গাওদিয়া কেন, ভুলতে হবে তাকে 'আত্মীয়বন্ধু'দের সঙ্গে 'মনের সম্পর্কও'; যে 'বিপ্লবে' সৃষ্ট হবে নতুন জীবন তার হোতা সে একা; বিপ্লব-উত্তর তার 'নবসৃষ্ট' জগৎটিও, 'উজ্জ্বল কোলাহলমুখরতা' সত্ত্বেও, হবে একাময়।

নিঃসংশয়ে, শশীকে সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে চেনে, শশীর জন্মদাতা গোপাল দাস। দালালি-মহাজনিতে, (এমনকী, 'জীবন্ত মানুষের কেনাবেচার দালালি'তেও), নিযুক্ত বলেই বোধহয় লোকচরিত্রে অত্যন্ত দড় গোপাল। দুরাত্মারা যদিও রটায়, 'গোপাল দাসের আসল কারবার [লোকের] গলায় ছুরি দেওয়া', গোপালের অন্তঃস্থলে কোমল ব্যথার একটি দিকও আছে।

'জগতে একটা মানুষকে স্নেহ' অব্দি করেনি যে, সে-ই তারই নিজের জ্যেষ্ঠ আত্মজ

সম্বন্ধে রয়েছে ব্যাখ্যাহীন ছেলেমানুষি দুর্বলতা—'শুধু শশীর জন্য একা শশীর জন্য, উন্মাদ বাৎসল্য' নিত্য খেলা করে গোপালের হৃদয়ে। মনের অবতল থেকে উঠে আসা শিরশিরে এক ভয়ের অসরেই ছেলের সঙ্গে থেকে থেকে মনান্তর ঘটে গোপালের। কখনও রেগে শাপ ছাড়ে, 'তোমার যা সব কীর্তি—যে সব কীর্তি তোমার;—তুই উচ্ছন্নে যাবি শশী'; কখনও, ডাক্তারবাবুর 'ন্যায়বান' ভঙ্গিভাব সহ্যের সীমা ছাড়ালে সক্ষোভে চেঁচায়, 'জানিস শশী, অনেক পাপে ভগবান আমাকে তোর মতো ছেলে দিয়েছেন।....মহত্ত্ব! বাপ পাপিষ্ঠ, উনি মহৎ! লজ্জা করে না তোর?'; কখনও-বা, অভিমানে কথা-বন্ধ, আড়িই করে দেয়। তবে, শশীর সঙ্গে মনান্তরের প্রতি পর্ব 'গোপালের বাৎসল্যের জগতে মন্বন্তরের সমান'। মাথা খাটিয়ে অনেককে ঠেকিয়ে ঠকিয়ে প্রচুর জিৎ তার সঞ্চিত হলেও, গোপালের খালি ভয়, 'বয়স্ক উপযুক্ত সন্তানকে বশ করা, [যার তুল্য] বড়ো জয় আর নেই জগতে', সবচেয়ে লোভনীয় সে জয়খানিই বুঝি হাতছাড়া হয় তার। 'বয়স্ক ছেলে' 'বন্ধু নয়, খাতক নয়, উপরওয়ালা নয়'— কোন্ উপায়ে যে ধরে রাখা যায় তাকে, তা ভেবে ভেবে 'রাত্রে ঘুম হয় না' গোপালের ; (মোটের ওপর, *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্* 'চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় ব্রাহ্মণ, ২২তম' শ্লোকের প্রতিশ্রুতি, 'নিদ্রাবেশে পিতা অ-পিতা হন'[১৮০], বেকারই যায় বৎসল-পরায়ণ সুদখোর মহাজনের বেলায়।) একসময় ঠিকই করে ফেলে শশী: আর 'দ্বিধা গাফিলতি' না; এবার ছাড়বেই 'অশান্তির হিমালয়'; আর 'বাতিল' যাবে না তার 'গ্রামত্যাগের কল্পনা'। সামনে আছে 'বিপুলা পৃথিবী'। কেন সে, তাদের বাপ-বেটার 'বিরোধী ব্যক্তিত্ব[এ-র] অর্থহীন অব্যবহার্য স্নেহের মোহে' মজে 'ক্ষুদ্র গৃহকোণে' পচবে অকারণ? ছেলের উড়ু উড়ু ভাবে গোপালের হাড়-পাঁজরে জাগে রিনরিনে ঝংকার। বহুদিন যাবৎ তার হৃদয়কোণে লালিত ত্রাস যেন এদ্দিনে সত্যি সত্যি কংক্রিটে রূপ নেয়:—শশীকে আর বুঝি বাঁধা গেল না; ফন্দি এঁটে, খেটেখুটে, মামলা ঠুকে, মকদ্দমা জিতে, ভগবদ্দত্ত তার 'অপরূপ হীনতা' ধাত-জোরে, 'কর্মঠ নিষ্ঠুর প্রকৃতি'র আশীর্বাদে, 'ঘরে বাইরে আদর্শ [যে] বাঙালি জীবনের বিস্তার' গোপাল গড়ে তুলেছে, স-ফলতার সেই আদলকেই ঝাড়েমূলে বরবাদ করতে উদ্যোগী গুণের ছেলে।

এই উপলব্ধির পর গোপাল যা কাণ্ড বাধায়, তার জুড়ি-দৃষ্টান্ত বিশ্বসাহিত্যে বিরল: শশী যাতে গাঁয়ের প্রান্তটুকুও না পেরোয়, গ্রামের 'সংকীর্ণ আবেষ্টনী'তে, পল্লীসামাজিকতার খুচরো তুচ্ছ দৈনন্দিনতায় কয়েদ থাকে আমরণ, সে অভিসন্ধিতে, গোপালই পাড়ি জমায় বানপ্রস্থের স্বর্গদ্বার কাশীতে।

'পাকা রাজনীতিকের মতো চালে' দানই উলটে দেয় গোপাল।

(*জাবাল উপনিষদ্*-এর *যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ* মন্ত্রোপম আন্তর-ডাকে আকুল) বিবাগীমনা পুত্র আটকা থাকে গাওদিয়ায়; 'খালের ধারের শুকনো ডালপালা মেলা বজ্রাহত বটগাছ'বৎ নিষ্কারণে একঠাঁই হয়ে নিষ্প্রাণ জড়ে বদলে যায় সে ক্রমশ।

আর জবরদস্ত বিষয়ী পিতা, 'ফল পুষ্প শস্যদাত্রী ভূমিখণ্ড, সিন্দুক ভরা সোনা রূপা' ও 'পারিবারিক-সামাজিক বাধ্য-বাধকতা'-র সংস্রব চুকিয়ে, সদ্-পরিব্রাজকবৎ দেশেই ফেরে না আর।

প্রস্থান তো নয়, প্রস্থানযাত্রা। বাপের প্রস্থানযাত্রা-বন্ধনেই আর নড়তে চড়তে পারে না বেটা। নিজে উধাও হয়ে শশীর পর সোপর্দ করে যায় গোপাল, 'কাজ আর দায়িত্বে জীবনটা আবার ভরপুর' করবার দায়। ওই *ভরপূরণ*-এই জেতে বিষয়ী-নিরপেক্ষ গঠনতন্ত্র বা *structure*—ওতেই টেকে 'আদর্শ বাঙালি জীবনের বিস্তার', বজায় থাকে স্থিতাবস্থা, বাপের হাত থেকে ছেলের হাতে পৌঁছয় কর্তালির দণ্ড, পরের প্রজন্মের ওপর বর্তায় অচলায়তন-সম সমাজ-কাঠামোকে ধরে রাখার ধর্মভার।

পিতাপুত্রসংবাদ-এর নয়া-আলেখ্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) যেন শ্রামণ্য অভীপ্সা রোধ-বাসনায় ব্রাহ্মণ্য চালিয়াতির আধুনিক রূপকোপন্যাস। ছেলে যা করতে পারে, তাতে বাবার বিষম আপত্তি *বলেই*, ছেলে বেচাল পদক্ষেপটি নেওয়ার আগে, বাবা নিজেই সে অনভিপ্রেত কাজটি করে বসে। *Pre-emption* বা আগ বাড়িয়ে-রোখা, *অগ্র-আয়ত্তি*-র অনবদ্য এ কৃৎকৌশলে, শত্রুপক্ষের বাতাসি পাল হতে হাওয়ার সন্তর্পণ অপহরণেই তো, *সন্ন্যাস*।/ *ভৈক্ষচর্যা*-নির্ভর শ্রমণ-ইস্তেহারকে হাতিয়ে, নিহিত তাতে *সমালোচ্যতা*-র প্রৈতিকে দুর্বল করতে সমর্থ হয়েছিলেন 'চতুরাশ্রম'-এর প্রাচীন বিধায়করা।

বিরুদ্ধশক্তিকে *deter* বা *স্তম্ভন* জন্য লাগে *উপযাজকতা*—উপযাজকতার বদান্যতায় নেই (পিতৃদেবস্য *super-ago* বা *অতি-অহং* চাপানো) *repression* বা *অবদমন*, বরং আছে তাতে *আগ্রহণ*-এর উদারতা, (পুত্রের বদখেয়ালকে) মেনে, মানিয়ে নিয়েই (পুত্রকে) জব্দ করার মুনশিয়ানা। (এবং, হয়তো এ-জন্যই ভারতীয় গড় অহং এত দুর্বল; ফ্রয়েডিয় মনঃবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলিও পুরো খাটে না সে বিষয়ীর উপর)।

কাশীযাত্রার শুভলগ্নে, বিদায়-মুহূর্তে, শশীকে চরম একখানি আপ্তবচন শোনায় গোপাল: 'অদৃষ্টের লেখা কে খণ্ডাবে'। *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসে এ কথাতেই পিতাপুত্রসংবাদ-এর ইতি। গোপালের ব্যথা-বিধুর ও উচ্চারণের পিছনে ছিল বোধহয় তারই ব্যর্থ এক পরীক্ষার স্মৃতি। কাশীতে যাঁর ধামে যাচ্ছে গোপাল, তার সেই মন্ত্রগুরু ভোলা ব্রহ্মচারীকেই একবার বাড়িতে ডেকে এনেছিল সে, ছেলেকে ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে। বিশ্বাস ছিল গোপালের, 'বাপকে ভক্তিশ্রদ্ধা করার চেয়ে বড়ো কর্তব্য ছেলের আর কী আছে?', ব্রহ্মচারীর এ সওয়ালের সামনাসামনি হলে বাপকে ছোবলাতে শশীর উদ্যতফণা আপনা হতেই নিস্তেজ নম্র হবে। কিন্তু কোথায় কী। শশীর বুদ্ধিদীপ্তি , তাঁর 'জ্ঞানগর্ভ' ভাষণে শশীর 'জ্ঞানগর্ভ' কাটান এতই ভালো লাগে ভোলা ব্রহ্মচারীর যে, পুত্র সম্পর্কে পিতার সব 'অভিযোগ' ভুলে, 'অনেক কালের সঞ্চিত বাঁধাধরা উপদেশগুলি নেপথ্যে' রেখে, 'ধর্মের কথা, ইহকাল পরকাল পাপপুণ্য সম্বন্ধে [যত] প্রশ্নোত্তর' সব শিকেয় তুলে,

শশীর সঙ্গে 'অসমবয়সী বন্ধুর মতো' আলাপে জমে ওঠেন তিনি। ফল দাঁড়ায়, 'ঘটনাচক্রে' ব্রহ্মচারী-হওয়া, 'আপনভোলা সদাশিব' ভোলা ব্রহ্মচারীর 'প্রথম-যৌবনে প্রথম সন্ন্যাসী জীবন', 'ঘরে যা মেলে[নি]তারই অন্বেষণে দেশে দেশে যাযাবর বৃত্তি', 'অনিশ্চিতের সন্ধান'-কাহিনী, শশীর 'ঘর ছাড়ার প্রবৃত্তিকেই উসকাইয়া' দেয়।

আত্মশাসিত হতে চেয়ে রয়ে গেলাম কি সেই ক্রীড়নক[৮১] —গাওদিয়ার ডাক্তারের চির-অমীমাংস্য এ প্রশ্ন বেদনা যাঁর সান্নিধ্যে আরোই ঘনায়, তিনি, বৃদ্ধ যাদব। 'বিবাগি হতে [যে] বিরাগ' লাগে, সে-ই বিরাগের কেন্দ্রাতিগ প্রতিবাতে 'বাড়িঘর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব' ছেড়ে বাইশ বছর বয়সে ডেরা বাঁধেন তিনি গাওদিয়ায়। (গেঁয়ো যুগির ভিখ মেলে না, প্রবাদটিকে মিথ্যে করে), 'গৃহস্থ যোগী' হিসেবে যথেষ্টই মানসম্মান তাঁর। এমনকী, প্রতীচ্যের চিকিৎসাবিদ্যায় ধন্য হওয়ার অহংকারে যে শশী বৃদ্ধব্যবহারে লব্ধ শব্দার্থের পোক্ততা সম্পর্কে সন্দিহান, যে শশী না যাদবের 'অলৌকিক শক্তি' না যাদবের 'সূর্যবিজ্ঞান' মানে, সে-ও, যাদবকে খাতির করে—(চরিত্রে দ্বি-বিশ্লিষ্ট বলেই নিশ্চয়), 'গ্রাম্য মনের অপরিত্যাজ্য সংস্কারে' যাদবের প্রতি 'ভক্তি'-শীলও শশী। সূর্যবিজ্ঞানী 'সংসারী সাধক'ও কম স্নেহ করেন না গাওদিয়ার ডাক্তারকে। পশ্চিমি শাস্ত্রের চক্রান্তে আপাতত দিঙ্মূঢ় হলেও, শশী-ই যে (আদ্যিকালের) সূর্যবিজ্ঞান বইবার যোগ্য আধার, তা বহুবারই বলেন তাকে যাদব পণ্ডিত : ' যে বিজ্ঞানের ভিত্তিই মিথ্যে তাই নিয়ে মেতে রইলে।....সবটা নয়....[সূর্যবিজ্ঞানের] ভূমিকাটুকু অন্তত শেখো......কায়মনোবাক্যে আজও তুমি ব্রহ্মচারী—'।

এই যাদবই, (ভীষ্মের মতো) স্বমৃত্যুর দিন ঘোষণা করবার পর, সে ঘোষণা (শশীর মারফতই) চারধারে রটলে, (আবার প্রায় শরশয়ান ভীষ্মের মতো) পরিবৃত জনসাধারণকে 'ধর্ম ও দর্শন, যোগ ও সাধনা' বিষয়ে অনর্গল 'অধ্যাত্ম উপদেশে' তাক লাগাবার পর, শশীর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচান, 'দুপাতা ইংরেজি পড়ে সবজান্তা হয়ে উঠেছ....কী তুমি জান যোগসাধনের? তুমি তো ম্লেচ্ছাচারী নাস্তিক! মুখ [দেখলে] পাপ হয়—'

'দপ করে' 'আগুনের মতো' জ্বলে উঠে, শশী অভিমুখে *নাস্তিক* নাম্নী যে গাল-বাণটি ছোঁড়েন সৌরবৈজ্ঞানিক কায়দায় 'ধবধবে সাদা' করা উপবীতধারী ব্রাহ্মণ, তার সঞ্চারপথ অতিশয় দীর্ঘ; রাগে কাঁপতে কাঁপতে, ফিরিঙ্গি-দীক্ষায় অশুচি, 'ম্লেচ্ছাচারী' শশীকে ভর্ৎসনা-যোগে নাস্তিক্য-এর যে তত্ত্বমণ্ডলটি বিদ্যুৎ-ঝলকে উদ্ভাসিত করেন 'গৃহস্থ যোগী', তার কালিক পরিসরও বিরাট.....

'নাস্তিক' কে, কেই-বা 'আস্তিক', সে সম্বন্ধে কঠোপনিষদ্ ১/১/২১-এর[১৮২] উক্তি 'ইহলোক'-উত্তর "পরলোক" আদৌ আকাশকুসুম কল্পনা নয়; কেননা, যার *অস্তি ইতি* বা *ন অস্তি ইতি* নিয়ে লোকে তর্ক-জল্প করে, (যার বস্তু ভিত্তি নিয়ে এমনকী দেবগণও আগে নিঃসংশয় ছিলেন না [তার সদুত্তর আছে]' থেকে পাণিনি *অষ্টাধ্যায়ী* ৪/৪/৬০ সূত্র 'অস্তি-নাস্তি-দিষ্টং মতিঃ'[১৮৩], ব্রাহ্মণ্য ঘরানা থেকে শ্রামণ্য ঘরানায় বিস্তর প্যাঁচ আছে। সুতরাং, (ব্যাহত-শ্রমণ) শশী ঠিক কী অর্থে 'নাস্তিক' সে সম্পর্কেও সহজ কোনো মীমাংসা নেই। শশীর (ও সেই সুবাদে আমাদের) 'নাস্তিক্য' নিয়ে কথা বারান্তরে...

উল্লেখপঞ্জি

১. *The Mahabharata* এরপর মভা, 'The Santiparvan: 169/1-37'. critically edited by Shripad Krishna Belvalkar. *The Mahabharata*, Volume 15, Poona : Bhandarkar Oriental Research Institute. 1954. pp. 960-969.
মহাভারতম্ (বঙ্গানুবাদ : হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ; এরপর মভ-হ), 'শান্তিপর্ব্ব : উনসপ্তত্যধিকশততমোধ্যায়ঃ/ ১-৩৯: পিতাপুত্রসংবাদ',
মহাভারতম্, খণ্ড ৩৪, কলিকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৪০০, মূলপাঠ ও অনুবাদ: পৃ ১৬৩১-১৬৪২
মহাভারত (বঙ্গানুবাদ: কালীপ্রসন্ন সিংহ; এরপর মভ-কা), 'শান্তিপর্ব্ব: পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম: পিতাপুত্রসংবাদ', মহাভারত, খণ্ড ৪, কলিকাতা: বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ ৪০০-৪০২
মহাভারত-এর পুনা-ভিন্ন সংস্করণে (সামান্য অদলবদল সহ) 'পিতাপুত্রসংবাদ' দু-জায়গায় আছে। দ্র:
মহাভারতম্, খণ্ড ৩৬, 'শান্তিপর্ব্ব : সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোধ্যায়ঃ/১-৩৮', *মহাভারতম্*, খণ্ড ৩৬, কলিকাতা : বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৪০০, মূলপাঠ ও অনুবাদ : পৃ ২৭৬৩-২৭৭১
মহাভারতম, 'শান্তিপর্ব্ব : সপ্তত্যধিকদ্বিশততম', *মভ-কা*, পৃ ৫৩৬-৫৩৭
এই নাট্য-নিবন্ধে মেধাবীর ভাষণটি মূলানুগ হলেও অক্ষরশ অনুবাদ নয়।

২. Maurice Winernitz. *A History of Indian Literature* (এরপর থেকে *HIL*). tr. S. Ketkar. Volume 1. New Delhi . Oriental Book Repnnt Corporation. 1972. p. 417

৩. *The Uttaradhyayana Sutras*. tr. Hermann Jacobi, *The Sacred Books of the East* (এরপর থেকে *SBE*). ed. F. Max Muller. Volume 45: 'Jaina Sutras· Part II', Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited. 2004. pp. 64-65

৪. 'সংখ্যা ৫০৯: হস্তিপাল-জাতক', *জাতক* (এরপর *জা*, ৬ খণ্ডে বিভক্ত; প্রথম প্রকাশ: ১৯১৬-১৯৩২), অনুবাদ: ঈশানচন্দ্র ঘোষ, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, খণ্ড ৪, ১৪১১, পৃ ২৯৬-২৯৯;
'No. 509: Hathi-pala Jataka'. *The Jatāka or Stories of the Buddha's Former Births* (৬ খণ্ডে বিভক্ত; প্রথম প্রকাশ· ১৮৯৫), tr. W. H. D. Rouse. Volume IV. Delhi: Motilal Banarsidass, 2005, pp. 296-299

৫. *ধম্মপদ* (এরপর *ধ-প্র-অ*), 'সংখ্যা: ৪৭', অনুবাদ: মহাস্থবির প্রজ্ঞালোক ও ভিক্ষু অনোমদর্শ, কলিকাতা: প্রজ্ঞালোক প্রকাশনী, ১৯৫৩, পৃ ৩৮ *ধম্মপদ* (এরপর *ধ-শী*), 'সংখ্যা: ৪৭', অনুবাদ: ভিক্ষু শীলভদ্র, কলিকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী, ১৯৯৯, মূলপাঠ ও অনুবাদ: পৃ ১৫
ধম্মপদ (এরপর *ধ-চা*), 'সংখ্যা ৪৭', অনুবাদ: চারুচন্দ্র বসু, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী,

১৯৯৯, মূলপাঠ ও অনুবাদ: পৃ ১৯

The Dhammapada: A Collection of Verses (এরপর D-M), 'No. 47, tr. F. Max Müller, SBE. Volume 10. 2004.p.17:

The Dhammapada (এরপর D-E). 'No. 47'. tr Eknath Easwaran. New Delhi : penguin Books. 1996. p. 89:

৬. HIL, 418

৭. 'The word ásrama does not occur in the Samhitás of Bráhmapas' : Pandurang Vaman Kane, 'Chapter VIII : Asrama'. History of Dharmásastra (এরপর HoD), Volume II. part I. Poona :Bhandarkar Oriental Research Institute. 1974. p. 418

৮. *ঋগ্বেদ* (এরপর ঋ), 'মণ্ডল২, সূক্ত১, ঋক২', ঋগ্বেদ-সংহিতা, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬ মূলপাঠ: পৃ ৩৩৫

ঋগ্বেদ (এরপর ঋ), 'মণ্ডল ১০, সূক্ত ৮৫, ঋক ৩৬', *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬, মূলপাঠ: পৃ ৫৭২ বঙ্গানুবাদ: রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋগ্বেদ-সংহিতা (এরপর ঋ-র), '২/১/২' ও '১০/৮৫/৩৬', সম্পাদনা: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি চক্রবর্তী, কলিকাতা: জ্ঞান-ভারতী, ১৯৬৩, পৃ ১২৫, ৫৭৮

ইংরাজি অনুবাদ: H.H Wilson *Rgveda Samhitá* (এরপর R-W) ' 2/1/2 & '10/85/36', *Rgveda Samhitá*. Volume 2 & 4, edited and revised by Ravi prakash Arya & K.L.Joshi, Delhi : Parimal Publications in collaboration with Indica Book. 2000, p. 1, 402

৯. *অথর্ববেদ* (এরপর অ-বে) 'একাদশ কাণ্ড, তৃতীয় অনুবাক, সূক্ত ১-৫', কলিকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৯২, মূলপাঠ: পৃ ২৮৮-২৯৩ বঙ্গানুবাদ: বিজনবিহারী গোস্বামী, অথর্ববেদ (এরপর *অ-বে-বি*), 'একাদশ কাণ্ড, তৃতীয় অনুবাক, সূক্ত ১-৫', কলিকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ ২৮৮-২৯৩

ইংরাজী অনুবাদ: William Dwight Whitney. *Atharva-Veda-Samhitá* (A-V-W), 'XI 5. 1-26', *The Atharva Veda-Samhta*. Volume II, Delhi: Motilal Banarsidass publishers, 1996. pp. 636-640

১০. *The Satpatha-Bráhmana*, 'XI Kánda. 5 Adhyáya. 4 Brahmana : 1-18. tr. Julius Eggeling. SBE, Vloume 44. pp. 86-90.

১১. *The Satpatha-Bráhmana*. 'V kanda. 1 Adhyáya. 5 Bráhmana : 17'. SBE. 41. P. 26

১২. (ক) স্বামী গম্ভীরানন্দ, *তৈত্তিরীয়োপনিষৎ*, '১/১১/১', কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৭৯, মূলপাঠ ও বঙ্গানুবাদ: পৃ ২৭

(খ) S. Radhakrishna. *Taittriya Upanisad*, 'I.II.I'. *The Principal Upanisads* (এরপর P-U), New Delhi : Harper Collins Publishers India. 1998. মূলপাঠ ও ইংরেজি অনুবাদ: pp. ৫৩৫-৫৩৮

১৩. G.A. Jacob. 'ব্রহ্মচর্য', *A Concordance to the Principal Upanisads and Bhagavadgita* (এরপর থেকে CPU), Delhi : Motilal Banarsidass. 1999. P. 642

বৈদিক-সাহিত্যে 'ব্রহ্মচারী'/'ব্রহ্মচর্য' শব্দপ্রয়োগ বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য:
P.V.Kane. 'Chapter VII : Upanayana, HoD, Volume II part I, P. 268-274

১৪. P.V. Kane, 'Chapter VIII : Asrama', HoD, Volume II, Part I. p. 418

১৫. স্বামী গম্ভীরানন্দ, *মুণ্ডকোপনিষৎ*, '৩/১/৫' ও '৩/২/৬', কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৭৯, মূলপাঠ ও বঙ্গানুবাদ: পৃ ২২৮ ও পৃ ২৩৭

১৬. F. Max Müller. The Mundaka-Upanishad, '3/1/5' & '3/2/6' SBE, 15. 39 & 41

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মুণ্ডকোপনিষৎ*, '৩/১/৫' ও '৩/২/৬', উপনিষৎ সংগ্রহ, সম্পাদনা: নিমাইচন্দ্র পাল, কলকাতা: সারস্বতকুঞ্জ, ২০০৮, পৃ ১৯৬ ও ২০৩

S. Radhakrishnan, *Mundaka Upanisad*. 'III.1.5' & 'III.2.6', P-U, মূলপাঠ ও ইংরেজি অনুবাদ : p.687 & pp. 690-691.

রামমোহন রায়, *মুণ্ডকোপনিষৎ*, '৩/১/৫' ও '৩/২/৬', রামমোহন গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ ২৬৬ ও ২৬৮

Rammohun Roy. *Moonduk Opunishad*. '3/1/5' & '3/2/6'. *The English Works of Raja Rammohun Roy*, Part II, ed. Kalidas Nag & Debjyoti Burman, Calcutta : Sadharan Brahmo Samaj, 1995, p. 7&7

১৭. ' "Yati" used in the sutras and smrtis to indicate the fourth ásrama of samnyasa does occur in the oldest Vedic texts. But there the meaning is different....So originally [the yatis] were probably beyond the pale of the Vedic Aryans. If there is any connection between yati and yátu (sorcery) which seems possible, the yatis were probably non-vedic sorcerers':
P.V. Kane, 'Chapter VIII : Astrama', HoD, Volume II, Part I, pp. 418-419.
এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : CPU. 'যতি', 765

১৮. CPU, 'গৃহস্থ', 336

১৯. CPU, 'বানপ্রস্থ', 834

২০. CPU, 'ভিক্ষু', 676

২১. CPU, 'আশ্রম', 201

২২. বঙ্গানুবাদ : (ক) দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, *ছান্দোগ্যপনিষদ্* (এরপর ছা-দু), কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর, ২০০২, মূলপাঠ সহ: পৃ. ১-৪৭৯

(খ) স্বামী গম্ভীরানন্দ, *ছান্দোগ্যপনিষদ্* (এরপর ছা-গ), *উপনিষৎ গ্রন্থাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৩, মূলপাঠ সহ: পৃ ২৫-৪৪১

(গ) মহেশচন্দ্র ঘোষ ও প্রফুল্লকান্ত বসু, *ছান্দোগ্যপনিষদ্* (এরপর ছা-ম-প্র), *উপনিষদ ত্রয়ী*, সম্পাদনা : সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৭, মূলপাঠ সহ: পৃ ৩-২৬৫

ইংরেজি অনুবাদ: ক) F. Max Müller. *Khánogya-Upanisad* (এরপর Kh-M). SBE, 1,1-144

খ) S. Radhakrishnan, *Chándogya Upanisad* (এরপর C-R). P-U, মূলপাঠ সহ : pp.335-512

২৩. শংকরাচার্য, মূলপাঠ : *ছান্দোগ্যপনিষদ্-ভাষ্যম্*, '২/২৩/১', কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটির, ২০০২, ২২৩
বঙ্গানুবাদ : দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, '২/২৩/১', *ছান্দোগ্যপনিষদ্* কলকাতা : দেবসাহিত্য কুটীর, ২০০২, পৃ. ২৩১
ইংরেজি অনুবাদ : Som Raj Gupta, 'Chándogya Upanisad', '2/23/1', *The Word Speaks to the Faustian Man: Wisdom of Sankara*, Volume IV, Delhi : Motilal Banarsidass Pvt. Ltd., 1991. pp. 182-183.

২৪. দ্রষ্টব্য: F. Max Müller, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, মহেশচন্দ্র ঘোষ-প্রফুল্লকান্ত বসু কৃত *ছান্দোগ্যপনিষদ্* '২/২৩/১'-এর অনুবাদ

২৫. দ্রষ্টব্য: S. Radhakrishnan কৃত *ছান্দোগ্যপনিষদ্* '২/২৩/১'-এর অনুবাদ

২৬. *Jábála Upanisad*, tr. S. Radhakrishnan. 'Verse No. 4', *P-U*. মূলপাঠ ও অনুবাদ : p.896

২৭. 'The Brahminical theory of the four *ásramas* [was] first propounded in full in the *Jábála Upanisad*.'.

২৮. বঙ্গানুবাদ : ক) স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ*, '৬/২১', *উপনিষৎ গ্রন্থাবলী*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৬, মূলপাঠ সহ: পৃ ৪৩৬।
খ) অতুলচন্দ্র সেন, *শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ*, '৬/২১', *উপনিষদ্ নবক*, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৫, মূলপাঠ সহ : পৃ. ৫৬১-৫৬২।
ইংরেজি অনুবাদ : ক) F. Max Müller. *Svetásvatara-Upanishad*, *SBE*, 1.266
খ) S. Radhakrishnan, *Svetásvatara Upanisad*, *P-U*, মূলপাঠ সহ : 749।

২৯. শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, '৬/২১'-এর শাংকরভাষ্যের উপর মন্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য:
ক) F. Max Müller, *Svetásvatara-Upanishad*, SBE, 1, 266
খ) S. Radhakrishnan, *Svetásvatara Upanisad*, P-U, 749

৩০. ' "atyásramibhyah" [means those who have]...risen above the mere observances of asramas':
P. V. Kane. 'Chapter VIII: Asrama', HoD, Volume II, Part 1, p. 422

৩১. *Maitri Upanisad*, 'IV.3', tr. S. Radhakrishnan. P-U. p. 810

৩২. CPU 'চতুর্বিধ', 351

৩৩. 'ব্রহ্মচারিন্', CPU, 643

৩৪. 'গৃহস্থ', CPU, 336

৩৫. 'যতি', CPU, 765

৩৬. বঙ্গানুবাদ : ক) রাধাগোবিন্দ বসাক, *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স, ১৯৮৯, মূলপাঠ সহ অনুবাদ : ১-ম খণ্ড : pp.

1-112 ও পৃ ১-৩০৬; ২-য় খণ্ড : pp. 1-130 ও পৃ. ১-৩৩২ পৃ. ৬৬
খ) মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্* (এরপর অ-মা), '১/৩/১', প্রথম খণ্ড, কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০২, পৃ. ৬১
ইংরেজি অনুবাদ : ক) R.P. Kangle, The Kautilya Arthashastra, Delhi: Motilal Banarsidass Pvt, Litd., মূলপাঠ : Part 1 (2006): pp. 1-283: অনুবাদ : Part II (2003): pp. 1-516
খ) L.N. Rangarajan, *The Arthashastra* (A-L), New Delhi: Penguin Books, 1992, pp. 100-744

৩৭. L. N. Rangarajan. 'Introduction', A-L, 21

৩৮. 'The Gautama Dharmasástra may be safely declared to be the oldest of the existing works on the sacred law':
George Bühler. 'Introduction: Gautama's Institutes of the Sacred Law', SBE, 2, lix

৩৯. George Bühler. 'Introduction: Gautama's Institutes of the Sacred Law', SBE, 2, xxxviii
George Bühler, 'Introduction: Vasishtha Dharmasastra'.SBE, 14, xxi

৪০. T. W. Rhys Davids. 'Introduction to "Kassapa-Sihanáda Sutta"'. Dialogue of Buddha, Volume 1, Delhi· Motilal Banarsidass Publishers Private Limited: 2000, pp. 212-213

৪১. George Buhler. 'Introducion: Vásishtha Dharmasástra'. SbL, 14, xx

৪২. ক) Wendy Doniger & Brian K. Smith, 'Introduction'. *The Laws of Manu* (এরপর M-W-B), Delhi: Penguin Books. 1991, p. xviii
খ) L.N. Rangarajan, 'Introduction', A-L. 32

৪৩. Wendy Doniger & Brian K. Smith, 'Introduction', M-W-B, xviii

৪৪. ক) Gautama. Institutes of the Sacred Law, 'Chapter III, 2'. translated into English by George Bühler, SBE, Volume 2, pp. 192-196 এরপর
খ) *Gautama Smrti*, 'Chapter 3', translated into English by Manmatha Nath Dutt, *Sixteen Minor Smrtis* (এরপর SMS). Volume 2, মূলপাঠ ও অনুবাদ : 225-256

৪৫. বৈখানস : 'hermit in the woods (Bühler: SBE, 2. 192)\ 'forest dwelling hermits' (Dutt. SMS 2. 255)

৪৬. *Baudhayána Dharmasástra*. tr. George Bühler. SBE. 14. pp. 143-336

৪৭. *Apastamba*. Aphorisms on the Sacred Law. tr. George Bühler. SBE. 2, pp. 1-161

৪৮. *Hárita Smrti*. 'Chapters 4. 5, 6'. tr. Manmatha Nath. SMS, 2, মূলপাঠ ও অনুবাদ : 12-31

৪৯. *Daksa Smrti*, '1/3'. Manmatha Nath Dutt, SMS, 2 মূলপাঠ ও অনুবাদ : 49

৫০. Sankha Smrti, 'Chapters 3 to 7'. tr Manmatha Nath Dutt. SMS, 2. মূলপাঠ

ও অনুবাদ : 130-145

৫১. ক) *Vásishtha Dharmasástra*, Chapters VII to X. tr. George Bühler, SBE, 14. 40-49

খ) *Vaita Smrti*, Chapters 7 to 10' trm Manmatha Nath Dutt, SMS, 2 মূলপাঠ ও অনুবাদ : 347-354

৫২. *Samvarta Smrti* 'No. 106.' tr Manmatha Nath Dutt. SMS. 1. মূলপাঠ ও অনুবাদ : 263

৫৩. বঙ্গানুবাদ: পঞ্চানন তর্করত্ন, *মনুসংহিতা* (এরপর ম-প), সম্পাদনা: মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০০, ১ম-৩-য় অধ্যায় : পৃ ৩-২৭৫; ৪র্থ অধ্যায় থেকে ১২-তম অধ্যায় : পৃ. ৯০-৩৪৪।

ইংরেজি অনুবাদ : ক) G Bühler, *The Laws of Manu* (M-B). SBE. 25, 1-513

খ) Wendy Doniger & Brian K. Smith, M-W-B. 3-290

৫৪. এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Wendy Doniger & Brian K. Smith, 'Introduction, Part II. Section 3: Contradictions in Manu'. M-W-B, liv-liii

৫৫. M-W-B, '5/55', 104

প্রখ্যাত এ শ্লোকের তর্জমাটি Charles Lanman-এর তর্জমার কাছে ঋণী। দ্রষ্টব্য : Wendy Doniger & Brian K. Smith, 'Footnote: 5/55, M-W-B, 104

৫৬. মভা, *The Ásvamedhikaparvan*: 13.117.34, critically edited by Ramachandra Narayan Dandekar. 1966. volume 17-Part II, 638

৫৭. রাজশেখর বসু, 'অনুশাসনপর্ব : ১৮ : মাংসাহার', মহাভারত সারানুবাদ, কলিকাতা: এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৩৯৪, পৃ. ৬২৫

৫৮. 'whatever food a man consumes in this world, that (food). in return, consumes him in yonder world':*The Satpatha-Bráhmana*. 'XII Kánda, 9 Adhyáya, I Brahmana: 8', tr. Julius Eggeling. SBE. 44. 260

৫৯. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'টিপ্পনী: ১/৮১', ম-প, ৩৭

৬০. '[6/86] is a troubling verse. The commentators take pains to specify that 'renunciation of the Veda' (vedasannyásikas) no longer perform the Vedic sacrifices but continue to recite the Veda. which is the 'activity they should engage in' (karmayoga, which might also refer to the performance of Vedic rituals!)':

দ্র. কুল্লুকভট্ট, 'টীকা: ৬/৮৬', ম-প, মূলপাঠ : ১৫৯

৬১. G. Bühler, 'Footnote on 10/5'. M-B, 402-403:

১০/৫-এর উপর কুল্লুকভট্ট-এর টীকার জন্য দ্রষ্টব্য: ম, ২৮০

৬২. G. Bühler, 'Footnote on 10/5'. M-B, 402-403

৬৩. বঙ্গানুবাদ: রামমোহন রায়, 'বজ্রসূচী', *রামমোহন-গ্রন্থাবলী* (এরপর রা গ্র), চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৮০, মূলসহ: পৃ. ৪৩-৪৮

ইংরেজি অনুবাদ : Vajrasucika Upanisad. tr. S. Radhakrishnan. P-U. মূলসহ :

৯৩৫-৯৩৮ রামমোহন রায় ও রাধাকৃষ্ণণ প্রদত্ত মূলপাঠে পার্থক্য আছে।

৬৪. *বজ্রসূচিকা উপনিষদ্* সম্পর্কে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মন্তব্য করেছেন:

ক) [Vajrasucika] Upanisad is valuable in that it undermines caste distinctions based on birth', P-U. 933

খ) 'It is valuable to recall the teaching of [Vajrasucika] Upanisad which repudiates the system that consecrates inequalities and hardens contigent differences into inviolable divisions': P-U, 938

৬৫. ম-প, '১/৯১', ৪০

৬৬. M-B, '1/91', 24

৬৭. M-W-B. '1/91', 13

৬৮. ঋ, 'মণ্ডল ১০, সূক্ত ২২, ঋক ৮', *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, ২, মূলপাঠ : ৪৮৩
ঋ-র, 'মণ্ডল ১০, সূক্ত ২২, ঋক ৮', ৫২৮; R-W. '10. 22, 8'. Rgveda Samhitá. 4,

৬৯. [The tension between the Aryan and the Sudra] would create among the [priestly order] that tendency towards regulating the mutual relations of all classes of the community which ultimately found its legal expression. towards the close of the period [characterized by the Satpatha-Bráhmana] in the Dharma-sutras':
Julius Eggeling, 'Introduction'. *the Satpatha-Bráhmana*. SBE. 12. xiii

৭০. ঋ, 'মণ্ডল ১০, সূক্ত ২২, ঋক ৮', *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, ২, মূলপাঠ . ৪৮৩
ঋ-র, 'মণ্ডল ১০, সূক্ত ২২, ঋক ৮', ৫২৮; R-W, '10,22.8'.4.

৭১. এ-প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য :
শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, আবার মদির-মেদুর', *মধ্যরেখা : একটি (বি-চিত্র) সমাবেশ*, কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০০৯, পৃ. ২২৩-২৬১।

৭২. ম, '১০/১২', ২৮১
'বর্ণসংকর' শব্দের G. Bühler-কৃত অনুবাদ 'confusion of the castes' (M-B. 404) এবং Wendy Doniger-Brian K, Smith -কৃত অনুবাদ 'confusion of the classes' (M-W-B, 235-236)

৭৩. ম, '১০/১২', ২৮১
'নরাধম' শব্দের G. Bühler-কৃত অনুবাদ 'the lowest of men' (M-B, 404) এবং Wendy Doniger-Brian K. Smith -কৃত অনুবাদ 'the worst of men' (M-W-B. 236)

৭৪. ম, '১০/৫২', ২৮৭
ম-প, ২৮৭; M-B 414; M-W-B, 242

৭৫. *শঙ্খস্মৃতি*-র ৫/১১-য় 'যোগী', ৬/৭ ও ৭/১-এ 'ব্রহ্মাশ্রমী', ৭/৪-এ 'যতি' আছে:
Śankha Smrti '5/11, 6/7 & 7/1, 7/4', SMS, 2, মূলপাঠ ও অনুবাদ: 137. 139, 140

৭৬. *সংবর্তস্মৃতি*-তে 'বানপ্রস্থ' শব্দটি ঠিক নেই। তার ৯৮-তম সূত্রে বলা আছে: 'গচ্ছদেবং বনং

প্রাজ্ঞঃ': Samvarta Smrti '98', SMS, 1, মূলপাঠ ও অনুবাদ : 262

৭৭. *সংবর্তস্মৃতি*-র ৯২-তম সূত্রে 'যতি', ১০২-এ 'প্রব্রজিত' ও ১০৩-এ 'মুনি' আছে : *Samvarta Smrti* '92, 102, 103, SMS, 1, মূলপাঠ ও অনুবাদ : 261, 263, 263

৭৮. *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা*-য় আশ্রমিকাধিকারীর সাধারণ সংজ্ঞা 'অধীতবেদ' : *Yájnavalkayasmrti*, 'Chapter III: *Práyascittádhyáyah*: No. 57', translated into English by Manmatha Nath Dutta, edited and revised by K. L. Joshi, Delhi : Parimal Publications, 2005 মূলপাঠ ও অনুবাদ : p. 179

৭৯. *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা*-র ৩/৬০-এ 'যতি' ও ৩/৬২-তে 'ভিক্ষু' আছে: *Yájnávalkayasmrti*, 'Chapter III: Práyascittádhyáyah: No. 60, 62', মূলপাঠ ও অনুবাদ : p. 180, 181

৮০. *বিষ্ণুস্মৃতি*-র ৫৯/২৭-এ 'যতি' ও 'ভিক্ষু', ৯৭/১৬-এ 'যোগী' আছে : *Visnusmrti*. 'Chapter 59, No. 27; Chapter 97, No. 16', translated into Engish by Manmatha Nath Dutt, edited by K.L. Joshi, Delhi : Parimal Publication, 2006, মূলপাঠ ও অনুবাদ : p. 201, p. 294

৮১. মভা, 'Thr Santiparvan: 12.62.2', 15. 289]

৮২. মভা, 'Thr Santiparvan: 12.63,12-15', 15, 292-293]

৮৩. মভা, 'The Santiparvan: 12.62,3', 15. 289

৮৪. মভা, 'The Santiparvan: 12.63,12-15', 15, 292-293

৮৫. মভা, 'The Santiparvan: 12.261. 9-10', 15, 1425; ম-হ, 'শান্তিপর্ব্ব; ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়', ৩৬,২৬৮১ ; ম-কা, 'শান্তিপর্ব্ব; একোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়', ৫২৪ Bhandar kar Oriental Research Institute প্রকাশিত, মহাভারত-এর critically edited-এর গৃহীত পাঠ: 'প্রব্রজ্যা নাম পণ্ডিতৈঃ'। সঙ্গে, টীকায় পাঠভেদ হিসেবে আছে : 'প্রব্রজ্যায়ামপণ্ডিতৈঃ'। দ্র. মভা, 15, 1425।
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মহাভারত-এ বিকল্প পাঠটি প্রযুক্ত। তাঁর অনুবাদ: 'প্রব্রজ্যায় অসমর্থ লোকেরাই গৃহাস্থাশ্রমে শান্তিসুখ পায় না'। দ্র. ম-হ, ৩৬, ২৬৮১)

৮৬. মভা, 'The Ásvamedhikaparvan: 14.35.30 & 14. 45. 13, *critically edited by* Raghunath Damodar Karmakar, 1960, 18, 131 & 166;
ম-হ, 'আশ্বমেধিক পর্ব্বঃ ', ৪১, ;
ম-কা, 'আশ্বমেধিক পর্ব্বঃ পঞ্চত্রিংশত্তম ও পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়', ৫, ৪১০ ও ৪১৮

৮৭. মভা, 'The Asvamedhikaparvan: 14.46.9', 18, 169;
মভা-হ, 'আশ্বমেধিক পর্ব্বঃ ',৪১, ;
মভা-কা, 'আশ্বমেধিক পর্ব্বঃ ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়', ৫, ৪১৮।

৮৮. 'In any case, only in 6. 94-6 is the [rite-renouncing ascetic described; the intervening verses seem to suggest why one should not take this path but should, rather, remain a non-renouncing householder': Wendy Doniger & Brian K. Smith, 'Footnote to Verse 6/86'. M-W-B.126

৮৯. *Vyása Smrti*. '4/2'. SMS. 2. মূলপাঠ ও অনুবাদ : 235

৯০. Gautama, *Institutes of the Sacred Law*. 'Chapter III. 36'. SBE, 2, 196: Gautama Smrti, 'Chapter 3'. SMS. 2. 256-257

৯১. *Baudháyana Dharmasástra*, 'II. 6. 11 : 27'. translated into English by George Bühler, SBE, 14. 260

৯২. *Visnusmrti*, 'Chapter 59m Nos. 27-29'. মূলপাঠ ও অনুবাদ : p. 201

৯৩. *Visnusmrti*, 'Chapter 59, No. 30'. মূলপাঠ ও অনুবাদ : p. 201

৯৪. V.P. Kane, 'Chapter VIII : Asram'. HoD. Volume II. Part 1. p. 424

৯৫. P.V. Kane. 'Chapter VIII: Asrama', HoD. Volume 11. Part 1, p. 422-423 P. V. Kane, 'chapter XXXVIII : Sannjasa. Hod. Volume II. Part II, p. 930-932

৯৬. T. W. Rhys Davids, 'Introduction to "Kassapa-Sihanád Sutta"'. *Dialogues of Buddha*, Volume 1, p. 216

৯৭. G. Buhler, 'Footnote to Verse No. 2/230', M-B, 71 কুল্লুকভট্ট, টীকা: ২/২৩০', ম-প, মূলপাঠ : ১৪৭

৯৮. 'মেধাতিথির মতে, ব্রহ্মাচর্যাশ্রম ছাড়া অন্য তিন আশ্রমস্বরূপ' : মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ম-প, ১৪৭।

৯৯. T. W. Rhys Davids. 'Introduction to "Kassapa-Sihanada Sutta". *Dialogues of Buddha*, Volume 1, pp. 211-217

১০০. 'To Rabindranath Tagore: The Great Poet. Education. and Lover of Man This English Version of the "History of Indian Literature" is dedicated as a token of loving admiration and sincere gratitude by the Author': 'উৎসর্গ পত্র', HIL

১০১. HIL, 'Section I : The Veda or the Vedic Literature : Áranyakas and Upanisads'. pp. 232-233

আরো দ্রষ্টব্য : T. W. Rhys Davids, 'Introduction to " The Naked Ascetic". Dialogues of Buddha, Volume 1, pp. 216

একই ধরনের কথা বহু জায়গায় প্রতিধ্বনিত। যথা :

ক) 'New tenets, turning Vedic doctrines on their head. were soon appropriated and brought back into the world of social hierarchy by the very "orthodox" class of priests originally responsible for the Veda. The dharma sutras. the earliest of which date to circa the fourth century B.C. E. and were produced by the ritualists, assume that world-renunciatory values should guide a moral life in the world. Such a trick was no easily carried out, but it was to have enormous ramifications for the history of religion in India': Wendy Doniger & Brian K. Smith, 'Introduction', M-W-B. xxxiv-xxxv

খ) 'The brahamanical theory of the four ásramas.....brought asceticism into conventional custom by making in the last stage of a man's curriculum and accessible to the upper castes' : Romila Thapar. 'Renunciation : A Counter-culture?'. Ancient Indian Social History. (first published : 1978). New Delhi.

2003. p. 65.

গ) আপস্তম্ব-এর মতো গোড়ার দিকের স্মৃতিকারদের 'চতুর্থাশ্রম' সম্পর্কে যতই আন্তরিক বিরাগ থাক, 'ভিক্ষু' শব্দটি ততদিনে এতই মর্যাদাসম্পন্ন, যে তার খোলাখুলি বর্জনও তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। । 'Bhikshus do not gain salvation at all. "They become dust and perish" [Ápastamba's Aphorisms on the Sacred Law. 'II. 9, 24: 7-8. SBE, 2. 160]–this was no doubt the real inmost opinion of the more narrow-minded priests [like Ápastamba]. But the first maker of the phrase [of 'Four Ásrama] did not quite like to put this forward in his own name–the idea of the Bhikshu as a man worthy of special esteem had already become too strong for that' : T. W. Rhys Davids. 'Introduction to the Kassapa-Sihanánda Sutta'. *D N*,216

১০২. এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, *দণ্ডনীতি: প্রাচীন ভারতীয় রাজশাস্ত্র*, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৮, পৃ. ২৭-২৮

১০৩. রাধাগোবিন্দ বসাক, 'অবতরণিকা', *অর্থশাস্ত্র*, প্রথম খণ্ড, ১৯৮৯, পৃ [একুশ] কৌটিল্য-র সন্ন্যাসী বিদ্বেষ প্রসঙ্গে R.P. Kangle মন্তব্য করেছেন : 'It is possible to see [in the Artháshastra. especially in 2.1.29-30] a desire to check a once fashionable tendency to quit the householder's life on the slightest Pretext and become a samnyasin without making any Provision for dependents': R.P. Kangle. 'Chapter 6: Society and Social Life'. *A Study : The Kautilya Arthashastra.* A-K. Part III. 2006. p. 154.

১০৪. শ্রৌতধর্মের একবাক্য একটি সংজ্ঞা : 'The Srauta religion [is] the institution of sacrifice' T.N. Dharamadhikari. 'Srauta religion : Purvamimamsá from an Interdisciplinary Point of View. edited by K. T. Pandurangi. *History* of *Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization*, Volume II Part 6. Centre for Studies in Civilization, Delhi : Motilal Banarsidass. 2006. p. 285.

১০৫. L.N. Rangarajan *অর্থশাস্ত্র*-এর 'দ্বিতীয় অধিকরণ, প্রথম অধ্যায়, ১৯শ প্রকরণ: জনপদনিবেশ'-ভুক্ত প্রাসঙ্গিক অংশের (2.1.32) অনুবাদে 'heretical sects' পদটি বিস্তারকরত বন্ধনীতে যুক্ত করেছেন বাড়টি এই টীকা: (i.e.. other than Brahmin vanaprasthas)': *A-L.* 180 *অর্থশাস্ত্র*-এর বঙ্গানুবাদক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-ও একই পদ্ধতিতে ঠিক ওই জায়গাতেই লিখেছেন : '(বানপ্রস্থ অন্তর্ভুক্ত ছাড়া অন্য কোনও প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী অর্থাৎ সন্ন্যাসী.....জনপদনিবেশের সময় থেকেই সেই জনপদে বাসস্থান লাভ করতে পারত না'): অ-মা, প্রথম খণ্ড, ১৬৩

১০৬. 'সন্ন্যাসের সময় নির্ণয়ে জাবাল উপনিষদ যে স্বাধীনতা দিয়েছে তা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আশ্রমতত্ত্বের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ....সন্ন্যাসতত্ত্ব প্রাধান্য [পেলে]....চতুর বেদপন্থী ব্রাহ্মণেরা নব্য মতবাদের সঙ্গে আপোশ করলেন। ফলে বিখ্যাত আশ্রম-পদ্ধতি প্রবর্তিত হল। ব্রাহ্মণ তাত্ত্বিকেরা ভান করলেন যে, তপস্যা ও সন্ন্যাস এই দুটিই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শাশ্বত অঙ্গ': চিত্রভানু সেন, 'আশ্রমধর্ম ও তপস্যা', প্রথম প্রকাশ: বারোমাস, সম্পাদনা : অশোক সেন, শারদীয় ১৯৯৭; পুনঃপ্রকাশ: অবভাস, সম্পাদক: শিবাশিস দত্ত ও পার্থ চক্রবর্তী, জানুয়ারি মার্চ ২০০৮, পৃ. ১৪৭-১৬২।

১০৭. T. W. Rhys Davids, 'Introduction to the Kassapa-Sihananda Sutta'. Dialogues of Buddha, Volume I, p. 215.

১০৮. *Maitri Upanisad*. 'VII. 8', tr. S. Radhakrishnan, P-U, মূলপাঠ ও অনুবাদ : । pp. 854-855

১০৯. 'Chronology'. *Sources of Indian Tradition*, Volume One, edited by Ainslie T. Embree, New Delhi : Penguin Books, 1992. p. xxvii

১১০. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নিবেদন', *অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত* (এরপর বুচ-র), কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৭, পৃ. ৯

১১১. তদেব, পৃ. ৯

১১২. তদেব, পৃ ৯-১০

১১৩. অঞ্জলি বসু সম্পাদিত, 'অঘোরনাথ গুপ্ত', সংসদ বাঙালি চরিত্রাভিধান, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২০০২, পৃ. ৩।

১১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বুদ্ধদেব বসুকে রবীন্দ্রনাথ: পত্র সংখ্যা: ৩৫', *চিঠিপত্র*, ষোড়শ খণ্ড, সম্পাদনা : সুতপা ভট্টাচার্য, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০২, পৃ. ১৫৮। এ পত্রটিই—পত্রের গোড়ায় কয়েক লাইন ও শেষ বাক্য বাদে—রবীন্দ্রনাথ-এর *সাহিত্যের স্বরূপ* (১৯৫৫) অন্তর্গত সুবিখ্যাত প্রবন্ধ 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা'। দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা', *সাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (সুলভ সংস্করণ), চতুর্দশ খণ্ড, কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪০২, পৃ. ১৯৮-২০০

এই প্রবন্ধটিরই আলোচনাক্রমে রণজিৎ গুহ 'ঐতিহাসিকতা'-র ইংরেজি তর্জমা করেছেন 'historicality'। দ্র. Ranajit Guha, 'Epilogue : The Poverty of Historiography– a Poet's Reproach', *History at the Limit of World-History*, New Delhi : Oxford University Press, 2002, p. 76.

১১৫. প্রমথ চৌধুরী, 'মুখপত্র', *বৌদ্ধধর্ম : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর*, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৪০৫, পৃ. ১২

১১৬. অশ্বঘোষ, *বুদ্ধচরিত*, অনুবাদ: রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৭, পৃ. ২০-৬৭ তুলনীয় অংশের জন্য আরো দ্রষ্টব্য:

ক) Edwin Arnold, *The Light of Asia*, New Delhi : Srishti Publishers & Distributors, 1999, p.p. 12-13, 59-73

খ) অঘোরনাথ গুপ্ত, *শাক্যমুনিচরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব*, সম্পাদনা : বারিদবরণ ঘোষ, কলিকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ.৪৫-৫০

গ) কৃষ্ণকুমার মিত্র, *বুদ্ধচরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষেপ বিবরণ*, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ২১-২৩

১১৭. *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্* (এরপর বৃ), '৪/৩/২২'

বঙ্গানুবাদ : ক) দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, '৪/৩/২২', *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্* (এরপর বৃ-দু), তৃতীয় ভাগ, কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর, ২০০৩, পৃ. ১১৩১

খ) স্বামী গম্ভীরানন্দ, '৪/৩/২২', *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্* (এরপর বৃ-গ), উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, তৃতীয় ভাগ, কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৩,

পৃ.৩১১-৩১২

গ) মহেশচন্দ্র ঘোষ ও প্রফুল্লকান্ত বসু, *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্* (এরপর বৃ-ম-প), '৪/৩/২২', উ.ত্র, ৪১৪

ইংরেজি অনুবাদ : ক) F. Max Muller. '4/3/22' (এরপর *B-M*). *SBE*, Volume 15: 'The Upanishads : Part II'. 2003. p. 169

খ) S. Radhakrishnan. ' ...

১১৮. শংকরাচার্য, মূলপাঠ : *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাষ্যম্*, '৪/৩/২২', *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্*, তৃতীয় ভাগ, কলকাতা: দেবসাহিত্য কুটীর, ২০০০, প. ১১৩১-১১৩৬
বঙ্গানুবাদ: দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্*, তৃতীয় ভাগ, কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর,

১১৯. তদেব, ১১৩২
তদেব, ১১৩৭

১২০. তদেব, '৪/৩/২২', ১১৩৩
তদেব, ১১৩৮

১২১. *শুক্লযজুর্বেদ-সংহিতা*, '২৩শ অধ্যায়, মন্ত্র ২১', অনুবাদ ও সম্পাদনা : বিজনবিহারী গোস্বামী, *বেদ*, কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৩৯৬, মূলপাঠ ও অনুবাদ : পৃ. ১৮০

১২২. *শুক্লযজুর্বেদ-সংহিতা*, '২৩শ অধ্যায়, মন্ত্র ২৫', মূলপাঠ ও অনুবাদ : ১৮০
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ছিছিৎকারে একই মনোভাব ব্যক্ত: '[শুক্লযর্জুবেদ-সংহিতা, ২৩শ অধ্যায়ে] রাজার মহিষী, অধ্বর্যু, উদগাতা, ব্রহ্মা, হোতা প্রটিতি কথোপকথোনচ্ছলে যে-সব মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, [তাহাদের] ভদ্র সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করাই কঠিন, ধর্মসাহিত্যের কথা তো পরে'।
দ্র. উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতদর্শনসার* (এরপর ভা) কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯১, পৃ.৮০
অবশ্য এ-ব্যাপারে *শুক্লযজুর্বেদ-সংহিতা*-র বঙ্গানুবাদক বিজনবিহারী গোস্বামীর দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে বিপরীত। *শুক্লযজুর্বেদ* ২৩শ অধ্যায়ের মন্ত্র ২০-৩১-এর অপপাঠের বিরুদ্ধে তাঁর মত: 'আধ্যাত্মিক পবিত্র বৈদিক মন্ত্রে অশ্লীল অর্থ কেন, তা আমাদের বোধগম্য হয় না।' দ্র. বিজনবিহারী গোস্বামী, 'টীকা: শুক্লযজুর্বেদ, ২৩শ অধ্যায়, মন্ত্র ২০', *বেদ*, কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৩৯৬, পৃ. ১৮০

১২৩. বাল্মীকি, *রামায়ণম্*, 'আদিকাণ্ড : সর্গ ১৪: শ্লোক ৩৩-৩৫', সম্পাদনা : পঞ্চানন তর্করত্ন, কলিকাতা : বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, ১৪০৭, পৃ. ৩০
বাল্মীকি, *রামায়ণ*, 'আদিকাণ্ড : চতুর্দশ সর্গ', রামায়ণ, বঙ্গানুবাদ: হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য (প্রথম প্রকাশ: ১৮৬৯-১৮৮৪), কলকাতা : ভারবি, ১৯৭৮, পৃ. ৫৪
বাল্মীকি, *রামায়ণম্*, 'আদিকাণ্ড: সর্গ ১৪: শ্লোক ৩৩-৩৫', বঙ্গানুবাদ : পঞ্চানন তর্করত্ন, কলিকাতা: বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, ১৪০৭, পৃ. ৩০
বাল্মীকি-রামায়ণ : 'বালকাণ্ড': সর্গ ১৪-১৭', সারানুবাদ: রাজশেখর বসু, কলকাতা : এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, পৃ. ১৪

১২৪. বাল্মীকি, *রামায়ণম্*, 'আদিকাণ্ড: সর্গ ১৪: শ্লোক ১২', সম্পাদনা : পঞ্চানন তর্করত্ন, ২৮
বাল্মীকি, *রামায়ণ*, 'আদিকাণ্ড : চতুর্দশ সর্গ', রামায়ণ, বঙ্গানুবাদ : হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৫৪
বাল্মীকি, *রামায়ণম্*, 'আদিকাণ্ড : সর্গ ১৪: শ্লোক ১২', বঙ্গানুবাদ : পঞ্চানন তর্করত্ন, ২৮-২৯ (হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুবাদে 'শ্রমণ' পরিবর্তিত 'সন্ন্যাসী'তে।)

১২৫. Pānini. Astadhyāyā, '2.1.70'. tr. Sumitra M. Katre. Delhi : Motilal Banarsidass : 1989. p. 125।

১২৬. অক্ষয়কুমার দত্ত, 'উপক্রমণিকা', *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*, দ্বিতীয় ভাগ, সম্পাদনা : বারিদবরণ ঘোষ, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৪১৩, পৃ. ১৩১-১৩২

১২৭. তদেব, পৃ. ১৩৪

১২৮. Uma Chakravarti. *The Social Dimensions of Early Buddhism*, New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1996. p. 39

১২৯. 'শ্রমণ : শ্রম্ (ক্লান্ত হওয়া) + অন্'; জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*, দ্বিতীয় ভাগ, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২০০৪ পৃ. ১৯৬২ 'শ্রম্ (Srama) : fatigue. weariness. exhaustion':
Monier Monier-Williams. *A Sanskrit-English Dictionary*. Delhi : Sharada Publishing House. 2005. p. 1096.

১৩০. Richard F. Gombrich. 'Chapter II : How. not what : Kamma as a Reaction to Brahminism'. *How Buddhism Began : The Conditioned Genesis of the Early Teachings*. London : Athlone Press, 1996. pp. 50-51।

১৩১. Sheldon Pollock. *The Language of the Gods in the World of Men*. Delhi : Permanent Black, 2006. P. 52.

১৩২. *Satapath Brahman*. 'VII Kanda, 5 Adhyáya, 2 Bráhmana 23'. SBE. 41, 407

১৩৩. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, '৩/৯-১৫'
বঙ্গানুবাদ : ক) প্রমথনাথ তর্কভূষণ, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, '৩/৯-১৫', কলিকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর, ২০০১, মূলপাঠ ও অনুবাদ · ১৯৭-২০৩
খ) রাজশেখর বসু, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, '৩/৯-১৫', কলিকাতা : এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৩৯৫, মূলপাঠ ও অনুবাদ : ৩৩-৩৪
বি. দ্র. সাতিশয় জটিল ৩/১৫-এর অনুবাদ-ভিত্তি গীতা-র উপর লিখিত শংকরাচার্যের ভাষ্য। দ্রষ্টব্য: শংকরাচার্য, *গীতাভাষ্য*, '৩/১৫', বঙ্গানুবাদ : প্রমথনাথ তর্কভূষণ, *শ্রীমদভগ্বদ্গীতা*, কলিকাতা : দেবসাহিত্য কুটীর, ২০০১, মূলপাঠ : ২০৩; অনুবাদ: ২০৪

১৩৪. গৃহী বনাম পরিব্রাজক, ব্রাহ্মণ বনাম শ্রমণ, দান বনাম যজ্ঞ বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Uma Chakravarti, *The Social Dimensions of Early Buddhism*. 38-39, 39-44, 59-62.

১৩৫. *দীঘ নিকায়*, (এরপর দী-নি-শী; বঙ্গানুবাদ : ভিক্ষু শীলভদ্র), 'কূটদন্ত সূত্র', কলিকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, ১৯৯৭, পৃ. ১১৩
দীঘ নিকায় (এরপর দী নি-সা; বঙ্গানুবাদ: সাধনকমল চৌধুরী), 'কূটদন্ত সূত্র', *বিশুদ্ধ দীঘ নিকায়*, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০০২, পৃ.১১১

Dialogues of the Buddha (এরপর D N: tr. T. W. Rhys Davids). 'Kutadanta Sutta', Delhi : Motilal Banarsidass Publishers. 2007. p. 180

১৩৬. দী নি-শ্রী, 'কূটদন্ত সূত্র', ১১৫; দী নি-সা, 'কূটদন্ত সূত্র', ১১২; D N. 'Kutadanta Sutta'. 181 'কূটদন্ত সূত্র'-এ নিহিত হাস্যরসের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: T. W. Rhys Davids, 'Introduction to the Kutadanta Sutta'. D N, 160-164.

১৩৭. *Vinaya Texts*. 'Kullavagga : V, 331'. translated by T. W. Rhys Davids & Hermann Oldenberg. SBE, 20, 149-151.
বুদ্ধের এই নির্দেশ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Sheldon Pollock, *The language of the Gods in the World of Men,* 54-55.

১৩৮. Sheldon Pollock. *The Language of the Gods in the World of Men, 58-59*

১৩৯. ঋ, 'মণ্ডল ১০, সূক্ত ১০৬, ঋক ৬', দ্বিতীয় খণ্ড, ৬১৩
বঙ্গানুবাদ : এরপর ঋ-র, 'মণ্ডল ১০, সূক্ত ১০৬, ঋক ৬', ৫৯৮
ইংরেজি অনুবাদ : R-W. '10. 106,6'. *Rgveda Samhita*. Volume 4,

১৪০. Mádhavacharya. 'Chapter I : The Charvaka System'. Sarva-Darśana-sangraha. tr. E.B. Cowell & A. E. Gough. Delhi : Motilal Banarsidass. 2000, p. 10
এ প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য . উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারতদর্শনসার (এরপর ভা) কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯১, পৃ. ৭৯

১৪১. *Vinaya Texts*. 'Mahavágga : I. 24. 5'. *SBE*. 13. 150

১৪২. *Vinaya Texts*. 'Mahávagga : I. 40. 1-3'. *SBE*. 13. 194-195

১৪৩. A.L. Basham. *History and Doctrines of the Ájivikas : A Vanished Indian Religion* (এরপর HDA). [প্রথম প্রকাশ: ১৯৫১]. Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited. 2002. p. 100. p. 278।

১৪৪. Vinaya Texts. 'Mahávagga : I. 30. 4'. SBE, 13. 173

১৪৫. দী-নি-শ্রী, 'কস্‌সপ সীহনাদ সূত্র', ১২৯-১৩২; দী নি-সা, 'কসস্‌প সীহনাদ সূত্র', ১২৫-১২৬; D N. 'Kassapa-Sihanáda Sutta'. 232।

১৪৬. দী নি-শ্রী, 'কস্‌সপ সীহনাদ সূত্র', ১৩০; দী নি-সা, 'কস্‌সপ সীহনাদ সূত্র', ১২৫; D N. 'Kassapa-Sihanánda Sutta'. I. 231-232

১৪৭. *Vinaya Texts*. 'Mahávagga : I, 30. 4'. *SBE*. 13. 173-174

১৪৮. ঋ, 'মণ্ডল ১০, সূক্ত ১৩৬, ঋক ২-৩' ঋগ্বেদ-সংহিতা, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৮৩
ঋ-র, 'মণ্ডল ১০, সূক্ত ১৩৬, ঋক ২-৩', ৬১৬; 136. 2-3. 4. 529

১৪৯. অ-বে, 'দ্বিতীয় কাণ্ড, প্রথম অনুবাক, পঞ্চম সূক্ত, তৃতীয় ঋক', মূলপাঠ : ৩৫
অ-বে-বি, 'দ্বিতীয় কাণ্ড, প্রথম অনুবাক, পঞ্চম সূক্ত, তৃতীয় ঋক', ৩৬ A-V-W. 'II.5.3'. Volume I. 44

১৫০. এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : Uma Chakravarti. *The Social Dimensions of Early Buddhism*, 36-38

১৫১. ছা, '৩/১৬/১'

১৫২. ছা-গ, ১৮০
১৫৩. *Kh-M, 50*
১৫৪. C-R, 394
১৫৫. ছা, '৩/১৭/৪'
ছা-দু ৩৫১; ছা-গ, ১৮৭; ছ-ম-প্র, ১০১-১০২
Max Muller ও Radhakrishnan দুজনেই 'দক্ষিণা' কে যথাক্রমে 'gifts bestowed on priests etc.'ও 'gifts for the priest' হিসেবে তর্জমা করেছেন। পুরোহিতের (অকারণ ও অবাঞ্ছিত) অনুপ্রবেশের জন্য দ্রষ্টব্য: Kh-M. 51; C-R, 396
ছান্দোগ্যোপনিষদ্ '৩/১৭/৪'-এর বাংলা তর্জমায় অধিকন্তু 'পুরুষযজ্ঞ' শব্দটি শংকরভাষ্যর উপর আনন্দগিরির টীকা মারফত প্রাপ্ত। দ্র. আনন্দগিরি, 'টীকা: ৩/১৭/৪', ছা-শ, ৩৫১
১৫৬. ঔপনিষদিক ও বৌদ্ধ চিন্তায় কতদূর সাযুজ্য আছে সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: T.W. Rhys Davids, 'Introduction to the Kutadanta Sutta', *D N*, 164-165।
১৫৭. বৃ, '৩/৫/১' ও '৪/৪/২২'
বৃ-দু, ৪, ১২৭২-১২৭৩ ; বৃ-গ, ২২৪-২২৫ ও ৩৪৫; বৃ-ম-প্র, ৩৬৩ ও ৩৬৪ ও ৪৩১; B- M, SBE : 15, 131 ও 179-180; B-R, P-U : 221 ও 279
১৫৮. B-M, '4/4/22', *SBE*, 15. 179
১৫৯. *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্* '৩/৫/১' ও '৪/৪/২২'-এর উপর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : T.W. Rhys Davids, 'Introduction to the Kassapa-Sihanada Sutta', D N, 214-215।
১৬০. দী নি-শী, 'অগ্‌গঞ্‌ঞ সুত্রান্ত', ৪৮৮-৪৯৯; D N. 'Agganna Suttanta (A Book of Genesis'), I, 77-91
১৬১. ঋ, 'মণ্ডল ১০, সূক্ত ৯০, ঋক ১২', ঋগ্বেদ-সংহিতা, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৮৬
ঋ-র, 'মণ্ডল ১০, সূক্ত ৯০, ঋক ১২', ৫৮৪; R-W.'10. 90.12'. 4. 425
১৬২. দী নি-শী, 'অগ্‌গঞ্‌ঞ সুত্রান্ত', ৪৮৯; D N, 'Agganna Suttanta (A Book of Genesis'), 1, 78
১৬৩. বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ তত্ত্বকল্প নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Uma Chakravarti, The *Social Dimensions of Early Buddhism*, 'Brahmana as a normative term'. 44-49
১৬৪. T. W. Rhys Davids, 'Footnote No. 3 : pp. 232-233: Kassapa-Sihanáda Sutta', D N, 232-233।
১৬৫. দী নি-শী, 'কসস্‌প সীহনাদ সূত্র', ১৩২; দী নি-সা, 'কস্‌সপ সীহনাদ সূত্র', ১২৬; DN, 'Kassapa- Sihanáda Sutta', 234
১৬৬. *ধম্মপদ*, 'সংখ্যা ৩৯৩';
ধ-শী, ১০৫; ধ-চা, ১৬৯-১৭০; Dh-M,91, Dh-E. 196।
১৬৭. *ধম্মপদ*, 'সংখ্যা ৩৯৪';
ধ-শী, ১০৫; ধ-চা, ১৭০; Dh-M, 91. Dh-E. 196।
১৬৮. *ধম্মপদ*, 'সংখ্যা ৩৯৬':

ধ-শী ১০৫-১০৬; ধ-চা, ১৭১ ; Dh-M. 92. Dh-E. 196।

১৬৯. *ধম্মপদ*, 'সংখ্যা ৩৮৮':
ধ-শী, ১০৩-১০৪; ধ-চা, ১৬৭; । Dh-M. 90. Dh-E.195।

১৭০. *ধম্মপদ*, 'সংখ্যা ৪১৫':
ধ-শী, ১০৯-১১০; ধ-চা, ১৭৯; Dh-M. 94-95. Dh-E, 198-199।

১৭১. *ধম্মপদ*, 'সংখ্যা ৪১৬' :
ধ-শী, ১১০; ধ-চা, ১৭৯ ; Dh-M, 95, Dh-E. 199

১৭২. দী নি-শী, 'অম্বট্‌ঠ সূত্র', ৭৪-৭৫; দী নি-সা, 'অম্বট্‌ঠ সূত্র', ৮৭ ; D.N. 'Ambattha Sutta'. I,112-113]

১৭৩. *The Uttáradhyayana Sutra*, 'Twelfth Lecture'. translated into English by Herman Jacobi, *SBE*, 45,51

১৭৪. *The Vyákarana Mahábhásya of Patanjali*. ed. F. Kielhorn. Volume I,

১৭৫. জাতক, 'সংখ্যা ৩০৯; শবক-জাতক', ৩, ১৯;

১৭৬. *Jataka*. 'No. 309 : Chavaka-Játaka', tr. H.T. Francis. III, 19

১৭৭. জাতক, 'সংখ্যা ৩০৯: শবক-জাতক', ৩, ১৯; *Jataka*. 'No. 309: Chavaka-játaka'. III. 20

১৭৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'অনুশীলন: প্রথম অধ্যায়—দুঃখ কি?', *ধর্ম্মতত্ত্ব, বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা : যোগেশচন্দ্র বাগল, কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৪০১, পৃ. ৫২৬

১৭৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *পুতুলনাচের ইতিকথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি,

১৮০. *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্*, '৫/৩/২২'
বৃ-দু, ১১৩১; বৃ-গ, ৩১১-৩১২; বৃ-ম-প্র, ৪১৪; B-M. 169; B-R. 263।

১৮১. শশীর 'আত্মশাসন'-এর খণ্ডতা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: অনিরুদ্ধ লাহিড়ী, 'টিলায় সূর্যাস্ত ও অন্যান্য শশীরা', *তত্ত্বতালাশ*, কলকাতা :

১৮২. *কঠোপনিষৎ*
বঙ্গানুবাদ : ক) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *উপনিষৎ সংগ্রহ* (এরপর উ সং), সম্পাদনা : নিমাইচন্দ্র পাল, কলকাতা: সারস্বতকুঞ্জ, ২০০৮, পৃ. ৩৯-১১৩

খ) দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, *উপনিষদ্ : ঈশ, কেন, কঠ*, কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর, ২০০২, পৃ ১-১৯৬

গ) স্বামী গম্ভীরানন্দ, *উপনিষৎগ্রন্থাবলী*, প্রথম ভাগ, কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৬, পৃ.৪৫-১২৮

ঘ) স্বামী জুষ্টানন্দ, *কঠোপনিষৎ*, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়,

ঙ) স্বামী ভূতেশানন্দ, *কঠোপনিষদ্*, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়.

ইংরেজি অনুবাদ:

ক) F. Max Müller, SBE. Volume 15 : 'The Upanishads : Part II'. 2003, p. 1-42

খ) Juan Mascaro. The Upanishads. New Delhi : Penguin Books, 1965. p. 55-66

গ) S. Radhakrishnan, *P-U.* 595-648।

ছত্রে ছত্রে শংকর ভাষ্য-সম্মত কঠোপনিষৎ অনুবাদ পেতে হলে, অতি অবশ্য দ্রষ্টব্য:

ক) Rammohun Roy, 'Translation of the Kuth-Oupnishud of the Ujoor-Ved according to the gloss of the celebrated Sunkuracharyu'. (first published : 1819). *The English Works of Raja Rammohun* Roy. Part II. edited by Kalidas Nag & Debajyoti Burman, Calcutta : Sadharan Bhahmo Samaj, 1995. pp-25-38

খ) রামমোহন রায়, *কঠোপনিষৎ*, রামমোহন গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, ১৩৬৪, ২১২-২৩৬

১৮৩. Pāṇini. Astádhyáyī. '4.4.60'. tr. Sumitra M. Kate. Delhi : Motilal Banarsidass. 1989. p. 494

আখ্যানের বাক্য

শিশিরকুমার দাশ

যে কোনো আখ্যানে আমরা দুধরনের বাক্য দেখতে পাই। এক ধরনের বাক্য হল কথনের বাক্য। সেই বাক্যগুলির কাজ হল আখ্যানের বিবরণ দেওয়া। ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোগসূত্র ধরিয়ে দেওয়া, তাদের কালানুক্রমিক উপস্থিত করা, অনেক সময় চরিত্রদের শারীরিক-মানসিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়া, কিংবা বস্তুজগতের বর্ণনা করা।

> বৈদ্যবাটির বাবুরামবাবু বড় বৈষয়িক ছিলেন। তিনি মাল ও ফৌজদারি আদালতে অনেক কর্ম করিয়া বিখ্যাত হন। কর্মকাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া উৎকোচাদি গ্রহণ না করিয়া যথার্থ পথে চলা বড় প্রাচীন প্রথা ছিল না— বাবুরাম সেই প্রথানুসারেই চলিতেন।

'আলালের ঘরের দুলাল' আখ্যানে এই বাক্যগুলি কথকের। আখ্যানে আরএক ধরনের বাক্য আছে। সেগুলি চরিত্রদের কথোপকথন।

> গুরুমহাশয় কর্তার নিকট গিয়া বলিতেন, 'মহাশয়! আপনার পুত্রকে শিক্ষা করান আমার কর্ম নয়।' কর্তা প্রত্যুত্তর দিতেন, 'ও আমার সবে ধন নীলমণি— ভুলাইয়া টুলাইয়া গায় হাত বুলাইয়া শেখাও।' পরে বিস্তর কৌশলে মতিলাল পাঠশালায় আসিতে আরম্ভ করিল।

এই অনুচ্ছেদে আমরা দুই শ্রেণির বাক্যই দেখতে পাই এবং তাদের সহজেই চিহ্নিত করে নিতে পারি। এই দুই শ্রেণির বাক্য শুধু উপন্যাসের নয়, যে কোনো আখ্যানেরই লক্ষণ। উপন্যাস যেহেতু আধুনিক কালের শিল্প, সেখানে সমস্ত রকম বর্ণনামূলক ও বিবরণমূলক রচনার সব কৌশলই ব্যবহার করা হয়ে থাকে; ইতিহাস, জীবনী, আত্মজীবনী, চিঠিপত্র, ডায়েরি, প্রবন্ধ তো বটেই, নাটকের সংলাপ নির্ভরতাও উপন্যাসের স্বীকৃত কৌশলগুলির অন্তর্ভুক্ত। কাজেই উপন্যাসের আখ্যান কৌশল শুধু সমস্ত বিবরণমূলক ও বর্ণনামূলক এবং নাটকের কৌশলের মিশ্রণই নয়, সবচেয়ে জটিলও বটে। এই জটিলতার সবচেয়ে বড়ো প্রকাশ তার বাক্যনির্মাণে ও বাক্যসজ্জায়।

বাংলা উপন্যাস যখন লেখা শুরু হল তখন সাহিত্যিক গদ্যের উদ্ভব খুব বেশিদিন হয়নি। পুরোনো বাংলায় সমস্ত বর্ণনামূলক ও বিবরণমূলক, সমস্ত আখ্যান কবিতায় লেখা হয়েছে। তার মধ্যে কথকের বাক্য এবং চরিত্রের সংলাপ দুই-ই আছে। কিন্তু বাংলা পদ্যে জটিল বাক্য এবং সংযুক্ত বাক্যের সংখ্যা কম, দীর্ঘবাক্যের সংখ্যাও কম, আখ্যান বর্ণনায় প্রত্যক্ষ উক্তির প্রাধান্য, প্রায় সর্বাধিপত্য। অর্থাৎ আখ্যান বর্ণনার রীতি সরল। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

বান্যা বড় দুঃশীল নাম মুরারি শীল
লেখা জোখা করে টাকাকড়ি।
পাইয়া বীরের সাড়া প্রবেশে ভিতর বেড়া
মাংসের ধারিএ দেড় কুড়ি।।
'খুড়া, খুড়া'
ডাকে কালকেতু।
'কোথা হে বণিক রাজ, আছয়ে বিশেষ কাজ
আমি আইলাম তার হেতু।।'
শুনিয়া বীরের বাণী বলে আসি বান্যানী,
'ঘরেত নাহিক পোতদার।
প্রভাতে তোমার খুড়া গেল খাতকের পাড়া
কালি লইহ মাংসের ধার।।
আজি কালকেতু যাহ ঘর।
কাষ্ঠ আন একভার কাল বাকি দিব ধার
মিঠা কিছু আনিহ বদর।।'
'শুন গ শুন গ খুড়ী কিছু কার্য ছিল ডেড়ি
অঙ্গুরী ভাঙ্গায়্যা লব কড়ি।
আমার জোহার খুড়ী কালি দিহ বাকি কড়ি
অন্য বণিকের যাই বাড়ি।।'
'দণ্ড দুই কর বিলম্বন।'
সহাস করিয়া বাণী আসি বলে বান্যানী,
'দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন।'
পাইয়া ধনের আশ আসিতে বীরের পাশ
ধায় বান্যা খড়কীর পথে।
মনে বড় কুতুহলী কান্ধে কড়ির থলি
হড়পী তরাজু লৈয়া হাথে।।
করে বীর বণিকে জোহার।।
বান্যা বলে
'ভাইপোএ ইবে নাহি দেখি তোএ
তোমার কেমন ব্যবহার।।'
'আসিয়া প্রভাত কালে কাননে আরিএ জালে
হাথে শরে চারি পর ভ্রমি।
ফুল্লরা পসার করে সন্ধ্যাকালে আসি ঘরে
এই হেতু নাহি দেখ তুমি।।'

উদ্ধৃত অংশটিকে আমি প্রচলিত প্রথা থেকে পৃথক ভাবে সাজিয়েছি। পাশাপাশি

পড়লে বাক্যগুলির সম্পর্ক এবং পুরো আখ্যানের ক্রম বোঝা যাবে। আর লম্বালম্বি ভাবে দেখলে এই বাক্যগুলির শ্রেণিবিভাগ স্পষ্ট হবে। দ্বিতীয় স্তম্ভের বাক্যগুলি সবই কথকের। প্রথম স্তম্ভের বাক্যগুলি সবই চরিত্রগুলির সংলাপ। সংলাপগুলির ক্রম নির্ধারণ করার জন্য কখনো কখনো কথক 'ডাকে কালকেতু,' 'বলে বান্যানী,' 'বান্যা বলে' ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করেছেন; কখনো কখনো বক্তার নাম উহ্য আছে, যেমন শেষ অংশটিতে, কিন্তু এই বাক্য দুটির বক্তা যে কালকেতু তা আমরা বুঝি। এখানে যে ধরনের আখ্যানপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, তাকে বলতে পারি সরলতম আখ্যান বর্ণনার রীতি। এখানে কথকের বাক্যগুলি বা বাক্যরীতি নাট্যকারের নির্দেশের সমগোত্রীয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা উপন্যাসের আদিপর্বে এই রীতির প্রাধান্যই চোখে পড়বে। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ অনেকক্ষেত্রেই সোজাসুজি নাটকের পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন

বেণীবাবু।	মহাশয়, একবার উঠে একটা পান খেলে ভাল হয় না?
বাবুরামবাবু।	সন্ধ্যা হল আর জল খাওয়া থাকুক— এ আমার ঘর আমাকে বলতে
হবে	কেন?...অল্প স্বল্প মাহিনাতে একজন মাস্টার দিতে পার?
বেণীবাবু।	মাস্টার অনেক আছে, কিন্তু ২০/২৫ টাকা মাসে দিলে একজন
মাঝারি	গোছের লোক পাওয়া যায়
বাবুরামবাবু।	...যদি এত টাকা দিব, তবে তোমার নিকট নৌকা ভাড়া করিয়া কেন এলাম? এই বলিয়া বেণীবাবুর গায়ে হাত দিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

শেষের এই লাইনটি ছেড়ে দিলে কথকের বর্ণনাত্মক বাক্য নেই সমগ্র অংশটিতে এবং এই বাক্যটিও নাট্যকারের নির্দেশের সমগোত্র। পুরোনো বাংলা আখ্যানে এই পদ্ধতি— নাটকীয় সংলাপের মধ্য দিয়ে আখ্যান রচনার পদ্ধতি বিরল নয়। চণ্ডীমঙ্গলেই দেখা যাবে এই পদ্ধতি

[বান্যা]।	সোনারূপা নহে বাপা বেঙ্গা পিত্তল।
	ঘসিয়া মাজিয়া কিবা কর্য্যাছ উজ্জ্বল।।...
কালকেতু (বলে)	খুড়া মূল্য নাহি পাই
	যেজন দিয়াছে দ্রব্য তার ঠাঁই যাই।।
বান্যা (বলে)	দরে বাড়াইল সঙ্কট
	আমা সনে সওদা কর্য্যা না পাবে কপট।।...
কালকেতু (বলে)	খুড়া না কর ঝগড়া।
	অঙ্গুরী লইয়া আমি যাব অন্য পাড়া।।

[বান্যা] অংশটি আমার যোজনা; আর 'বলে' ক্রিয়াপদটি আমি প্রথম বন্ধনীভুক্ত করে দিয়েছি, শুধু নাটকীয় সংলাপপদ্ধতিটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। কবিকঙ্কণ 'বলে' ক্রিয়াপদটি বার বার ব্যবহার করে সংলাপ ও কথকের বাক্যে মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, টেকচাঁদ 'বলে' ক্রিয়াপদটি পরিত্যাগ করে সোজাসুজি নাটকীয় পদ্ধতি নিয়েছেন। কিন্তু

গঠনের দিক থেকে দুটি অংশই মোটামুটি অভিন্ন। শুধু আলালের ঘরের দুলালই নয়, অনেক দিন পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে 'বলা' 'কওয়া' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের ব্যবহার কমানোর জন্য নাটকের ভঙ্গিতেই সংলাপ সজ্জার প্রাধান্য দেখা গেছে, এখনও এই রীতি সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়নি। বঙ্কিম বেশ কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন

১. ক্ষণ পরে রাজপুত্র পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?'

'আমি আয়েষা।'

'আয়েষা কে ?'

'কতলু খাঁর কন্যা।'

২. জগৎ সিংহ অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, 'আয়েষা, তুমি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিবে?'

আয়েষা কহিলেন, 'এই দণ্ডে।'

রা। তোমার পিতার অজ্ঞাতে?

আ। সেজন্য চিন্তা করিও না, তুমি শিবিরে গেলে— আমি তাঁহাকে জানাইব।

'প্রহরীরা যাইতে দিবে কেন?'

৩. বীরেন্দ্র...উত্তর করিলেন, 'আর কিছুই চাহিনা, কেবল এই ভিক্ষা যে, আমার বধকার্য শীঘ্র সমাপ্ত কর।'

ক। তাহাই হইবে, আর কিছু?

উত্তর। 'এ জন্মে আর কিছু না।'

ক। মৃত্যুকালে তোমার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না?

কহিল, বলিল, উত্তর দিল ইত্যাদি ক্রিয়াপদের সচেতন অবলুপ্তি এই অনুচ্ছেদগুলির বৈশিষ্ট্য এবং তিনটি অংশ তিনরকম পরীক্ষা আছে। প্রথম অংশের তিনটি বাক্যে বক্তার নাম নেই। এই অংশটির একটি সম্ভাব্য রূপ ছিল এই রকম

* আয়েষা উত্তর করিলেন, 'আমি আয়েষা।'

* রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আয়েষা কে?'

* আয়েষা উত্তর দিলেন, 'কতলু খাঁর কন্যা।'

বঙ্কিমচন্দ্র তারকাচিহ্নিত বাক্যাংশগুলি পরিহার করেছেন। দ্বিতীয় অংশে প্রথম দুটি বাক্যেই বক্তার নাম এবং 'কহিলেন' ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করেছেন। তৃতীয় এবং চতুর্থ বাক্যে ক্রিয়াপদটি লুপ্ত করেছেন, বক্তার নামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করেছেন, নাটকের পদ্ধতি। শেষ বাক্যে ক্রিয়া এবং বক্তার নাম দুই-ই লুপ্ত করেছেন।

তৃতীয় অংশে, তৃতীয় বাক্যটি আরও কৌতূহলজনক। এখানে 'বীরেন্দ্র' বা 'বী' ব্যবহারই ছিল প্রত্যাশিত (ক কতলু খাঁর সংক্ষিপ্ত রূপ) কিন্তু বঙ্কিম * 'বীরেন্দ্র উত্তর দিলেন' বা * 'বীরেন্দ্র উত্তর করিলেন' বাক্যটির সংক্ষিপ্ত রূপ 'উত্তর' ব্যবহার করলেন।

এই ধরনের উদাহরণ যে বঙ্কিমেই বেশি বা এগুলি তাঁর আখ্যান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

তা বলব না, বাংলা উপন্যাসের সাধারণ লক্ষণই এই। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'-তে দুরকম পদ্ধতি (মূলত পদ্ধতিটি এক, তাদের দৃশ্যমান রূপ দু-ধরনের) ব্যবহার করেছেন

১. মহেন্দ্র। আজ বাদলার দিনটাতে—
বিনোদিনী। না সে হইবে না— তোমার গাড়ি তৈরি হইয়া আছে— কালেজে যাইতে হইবে।
মহেন্দ্র। আমি তো গাড়ি বারণ করিয়া দিয়াছিলাম।
বিনোদিনী। আমি বলিয়া দিয়াছি— বলিয়া মহেন্দ্রের কালেজে যাইবার কাগজ আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিল।

২. মহেন্দ্র কহিল, 'থাক্ চুনি। তোমার চোখের বালির সঙ্গে আলাপ করিবার সময় কই। পড়িবার সময় ডাক্তারি বই পড়িব, অবকাশের সময় তুমি আছ, ইহার মধ্যে সখীকে কোথায় আনিবে।'
আশা কহিল, 'আচ্ছা তোমার ডাক্তারিতে ভাগ বসাইব না, আমারই অংশ আমি বালিকে দিব।'
মহেন্দ্র কহিল, 'তুমি তো দিবে, আমি দিতে দিব কেন?'

এই দুটি অংশের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য কোথাও নেই। প্রথম অংশে 'মহেন্দ্র' বা 'বিনোদিনী'র পর পূর্ণচ্ছেদ চিহ্নটি 'কহিল' ক্রিয়ার প্রতীক, অথবা ওই বাক্যগুলিতে 'কহিল' ক্রিয়া উহ্য। সজ্জারীতি নাটকের। অন্যভাবে বলা চলে, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি যেন নাটকীয় পদ্ধতির বিবরণাত্মক পদ্ধতিতে পরিবর্তন। বলাই বাহুল্য, এই পদ্ধতির বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি, শুধু কখনো কখনো ঔপন্যাসিকেরা সংলাপ এবং বিবরণ ও বর্ণনামূলক বাক্য ও বাক্যখণ্ড মিলিয়ে একটা জটিল নক্সা তৈরি করেছেন মাত্র। তার সূচনা বঙ্কিমের উপন্যাসেই হয়ে গিয়েছিল।

ওসমান পূর্ববৎ ভঙ্গিতে কহিলেন, 'নিশীথে একাকিনী বন্দীসহবাস নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম। বন্দীর জন্য নিশীথে কারাগারে অনিয়ম প্রবেশও উত্তম।'
আয়েষার পবিত্র চিত্তে এ তিরস্কার সহনাতীত হইল। ওসমানের মুখপানে চাহিয়া উত্তর করিলেন। সেরূপ গর্বিত স্বর ওসমান কখন আয়েষার কণ্ঠে শুনেন নাই। আয়েষা কহিলেন, 'এ নিশীথে একাকিনী কারাগার মধ্যে আসিয়া এ বন্দীর সহিত আলাপ করা, আমার ইচ্ছা। আমার কর্ম উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।'
ওসমান বিস্মিত হইলেন, বিস্মিতের অধিক ক্রুদ্ধ হইলেন, কহিলেন, 'প্রয়োজন আছে কি না, কাল প্রাতে নবাবের মুখে শুনিবে।'
আয়েষা পূর্ববৎ কহিলেন, 'যখন পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তখন তাহার উত্তর দিব। তোমার চিন্তা নাই।'
ওসমান পূর্ববৎ ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, 'আর যদি আমি জিজ্ঞাসা করি?'

নাটকে ব্যবহৃত সংলাপরীতির সঙ্গে বর্ণনামূলক এবং বিবরণাত্মক রীতির মিশ্রণই এই ধরনের অনুচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য। 'চোখের বালি' থেকে উদ্ধৃত দ্বিতীয় অংশটির সঙ্গে এই অংশের গঠনের একটা স্পষ্ট পার্থক্য আছে। আগেই বলেছি 'চোখের বালি' থেকে উদ্ধৃত দ্বিতীয় অংশটি

প্রথম অংশের বিবরণাত্মক রূপ। প্রথম অংশটিতে 'কহিল' ক্রিয়া পদটি অবলুপ্ত মাত্র। 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে উদ্ধৃত অংশটিতে কথকের বাক্যগুলি শুধু 'কহিলেন' ক্রিয়া সম্বলিত নয়। কথকের বাক্যগুলিতে চরিত্রের নানা আচরণের ইঙ্গিত আছে। নাটকীয় সংলাপরীতিকে কোনো আখ্যানকার-ই অবহেলা করতে পারেন না, কিন্তু তাকে বিবরণাত্মক রচনার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য কতকগুলি কৌশল অবলম্বন করেন। সেই কৌশল আর কিছুই নয়, আখ্যানের ঘটমানতার সঙ্গে সংলাপকে মিশিয়ে দেওয়া, কথকের বর্ণনা ও চরিত্রের উক্তি দুটিই সেখানে পরস্পর-নির্ভর। যেমন

> বাঁ হাতে প্রদীপ লইয়া প্রিয় মুখুজ্যে কি কয়েকটা বস্তু বাক্স হইতে বাছিয়া বাছিয়া একটুকরা কাপড়ে রাখিতেছিলেন, হঠাৎ পিছনে ডাক শুনিলেন, বাবা?
> কাজটা প্রিয় গোপনেই করিতেছিলেন, শশব্যস্তে হাতের প্রদীপটা রাখিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া সাড়া দিলেন, কে, সন্ধ্যা? এই যে মা চল আর দেরি হবে না—
> সন্ধ্যা কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিল, কি করছিলে বাবা? (বামুনের মেয়ে : শরৎচন্দ্র)

২

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত কথকের উক্তি ও চরিত্রের উক্তির পারস্পরিক নির্ভরতার উদাহরণ দিয়েছি। আখ্যানে অসংখ্য অংশ আছে যা শুধু কথকেরই উক্তি, তার সঙ্গে কোনো চরিত্রের উক্তির সম্পর্ক নেই। আবার এমন অসংখ্য অংশ থাকে যার সঙ্গে কথকের উক্তির কোনো অব্যবহিত সম্পর্ক নেই। বিবরণাত্মক আখ্যানের মূল বৈশিষ্ট্য সেখানেই।

আখ্যানে আমরা একটি কৌশল বহুদিন ধরে লক্ষ করে আসছি যেগুলিকে আমরা 'স্বগতোক্তি' জাতীয় বলতে পারি। অর্থাৎ তারও উৎস নাটক। 'ভাবিল', 'চিন্তা করিল', 'মনে মনে বলিল' ইত্যাদি ক্রিয়ার পর ওই উক্তিগুলিকে পাই

১. শিশুটির প্রতি এক একবার দৃষ্টিপাত করিয়া গৃহিণী মনে মনে বলিতেছেন, জাদু! তুমি আবার কেমন হবে বলিতে পারিনা। ছেলে না হবার এক জ্বালা, হবার আরেক জ্বালা। (আলালের ঘরের দুলাল)
২. একবার মনে করিতেছিলেন, 'এই রস পান করিয়া এখনই সকল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারি।' আবার ভাবিতেছিলেন, 'এই কাজের জন্য কি বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন!' (দুর্গেশনন্দিনী)
৩. আশা ভাবিল, 'এখনও কি বাগ আছে। আমার উপর বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছেন?' (চোখের বালি)

গঠনের দিক থেকে এইগুলি সবই প্রত্যক্ষ উক্তি এবং নাটকের 'স্বগতোক্তি'-র সঙ্গে মিল। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ উক্তি থেকেই একধরনের নতুন বাক্যের সৃষ্টি হল। বর্ণনার বা আখ্যানের যে কাঠামোর সঙ্গে আমরা সাধারণত পরিচিত তাতে একজন কথক থাকেন, তিনি পাঠক শ্রোতাকে আখ্যানের বিবরণ দেন। ওপরের যে বাক্যগুলি তা ব্যাকরণগত দিক থেকে প্রত্যক্ষ উক্তি মনে হলেও, তা কিন্তু কারও উক্তি নয়। চরিত্রগুলির চিন্তামাত্র। সেই চিন্তার বিবরণ দিচ্ছেন কথক। সেই বিবরণ তিনি প্রত্যক্ষ উক্তিতে দিচ্ছেন এই পর্যন্ত বলতে পারি। এই উদ্ধৃতিগুলি যেসব

আখ্যান থেকে নেওয়া হয়েছে, তার কথক সর্বজ্ঞ, তিনি পাত্রপাত্রীর মনের সব খবর জানেন এবং তাদের চিন্তাকে ভাষায় প্রতিবিম্বিত করেন। তিনি প্রত্যক্ষ উক্তিতে প্রতিবিম্বিত না করে পরোক্ষ উক্তিতেও করতে পারেন। অন্য একটি উদাহরণ নেওয়া যাক

> দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্বসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর, কি জানি যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে।

এই যে অংশ তার প্রথম বাক্য নিঃসন্দেহে আখ্যানের কথকের। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটি কার? 'কেননা' শব্দগুচ্ছ অবশ্যই ইঙ্গিত করছে যে অশ্বারোহীর দ্রুতবেগে অশ্বচালনার একটি কারণ ছিল এবং সে কারণ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। এক অর্থে এই বাক্যটিও কথকের, যদিও তাতে সন্দেহ থাকতে পারে। যদি 'তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে (তাঁহাকে) যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে'— লিখিত হত, তাহলে 'তাঁহাকে' পদটির সাহায্যে বুঝতাম যে বাক্যটি নিঃসন্দেহে কথকের। কিন্তু এই সর্বনাম পদটি না থাকার ফলে একটি দ্ব্যর্থতার সৃষ্টি হয়েছে, এবং এমন হওয়া আদৌ অসম্ভব নয় যে বাক্যটি প্রকৃতপক্ষে অশ্বারোহীর চিন্তার প্রতিবেদন বা representation। আর লক্ষণীয় যে প্রতিবেদনটি প্রত্যক্ষ উক্তিতে নয়, পরোক্ষ উক্তিতে। অর্থাৎ এই বিবরণাত্মক বাক্যটির দুটি সম্ভাব্য রূপ হতে পারত

* অশ্বারোহী ভাবিলেন, 'কি জানি যদি ... বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে...যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে।'
* অশ্বারোহী ভাবিলেন, 'কি জানি যদি ... বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে (আমি) ... যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইব।'

আরেকটি উদাহরণ নেওয়া যাক

> অকস্মাৎ বহুদূরে একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। পাছে ভ্রম জন্মিয়া থাকে, এজন্য নবকুমার মনোভিনিবেশপূর্বক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ... আগ্নেয় আলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মাইল। প্রতীতি মাত্র নবকুমারের জীবনাশা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। মনুষ্য সমাগম ব্যতীত এ আলোকের উৎপত্তি সম্ভবে না, কেননা, এ দাবানলের সময় নহে। নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন। যথায় আলোক, সেইদিকে ধাবিত হইলেন। একবার মনে ভাবিলেন, 'এ আলোক ভৌতিক? হইতেও পারে, কিন্তু শঙ্কায় নিরস্ত থাকিলেই কোন্ জীবন রক্ষা হয়?' এই ভাবিয়া নির্ভীক চিত্তে আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন।

এই অংশে নিম্নরেখ বাক্যগুলি কার? কথকের? কথক যে ধরনের বাক্যের সাহায্যে চরিত্রগুলির মানসিক অবস্থার প্রতিবেদন করেন তাকে আমরা চিন্তামূলক বাক্য বলতে পারি এবং অনেকক্ষেত্রে সেগুলি ব্যবহারিক দিক থেকে স্বগতোক্তির সগোত্র। এখানে নবকুমার ভাবছেন, 'এ আলোক ভৌতিক' ইত্যাদি। এখানে কথক স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এই বাক্যটি নবকুমারের চিন্তার প্রতিবেদন। কিন্তু 'মনুষ্য সমাগম ব্যতীত এ আলোকের উৎপত্তি সম্ভবে না' এই বাক্যটি কোন শ্রেণির? যিনি-ই এই বাক্যের বক্তা হোন না কেন, তিনি বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে চাচ্ছেন। এই বিচার করছেন কে? স্বাভাবিকভাবেই মনে

হয় নবকুমার অর্থাৎ আখ্যানের একটি চরিত্র। অর্থাৎ এখানেও কথক চরিত্রের চিন্তা-ভাবনার প্রতিবেদন দিচ্ছেন। এই ধরনের বাক্য আমরা পুরোনো আখ্যানে পাই না। এই ধরনের বাক্যই আধুনিক আখ্যানের বর্ণনার নিজস্ব আবিষ্কার। বলা যেতে পারে এই ধরনের বাক্য বিশেষভাবে আধুনিক আখ্যানের বাক্য। বাংলা আখ্যানের বা উপন্যাসের প্রথম যুগ থেকেই লেখকেরা এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করছেন

> ঠকচাচা দেখিলেন গতিক বড় ভাল নয়— পা পিছলে যাইতে পারে—মকদ্দমা করিতে গেলে প্রায় লোকের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকেনা,— সত্যের সহিত ফারখতাখতি করিয়া আদালতে ঢুকতে হয়— কি প্রকারে জয়ী হইব তাহাতেই কেবল একিদা থাকে। এই কারণে তিনি সম্মুখে আসিয়া স্বয়ং সাক্ষ্য দিলেন।

এই অংশ স্বগতোক্তি নয়, এমনকী কোনো উক্তিই নয়, একটি চরিত্রের চিন্তার প্রতিবেদন। একেই আধুনিক উপন্যাসতত্ত্ববিদেরা Point of view বা দৃষ্টিভঙ্গি নাম দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি কার? কথকের, চরিত্রের, পাঠকের? দৃষ্টিভঙ্গির কথা সাহিত্য সমালোচনায় এসেছিল চিত্র সমালোচনা থেকে। প্রত্যেক বস্তুকে যে স্থান থেকে আমরা দেখছি তার একটা গুরুত্ব আছে। সকলেই একভাবে এক বস্তুকে দেখে না। কোনো দৃষ্টিভঙ্গিই সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া কোনো বস্তুকেই আমরা দেখতে পাই না। এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিষয়ী নির্ভর বা subjective, এবং তার প্রতিফলন ঘটে ভাষাতে। কতকগুলি শব্দ, বিশেষ করে বিশেষণ, অনেক ক্ষেত্রে নামের ব্যবহার, বিষয়ীনির্ভর, আত্মগত। অনেক বিশেষণ বা বিশেষ্য বক্তার মানসিক অবস্থা বা ব্যক্তিগত মনোভঙ্গি প্রকাশ করে, সেই মনোভঙ্গি কথকের না হতেও পারে।* আবার কখনো বিশেষভাবে তা কথকেরই।

৩

আজ থেকে তেষট্টি বছর আগে Jespersen তাঁর *The Philosophy of Grammar* (1924) গ্রন্থে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে তৃতীয় ধরনের এক উক্তির কথা বলেছিলেন, বা দু-ধরনের পরোক্ষ উক্তির কথা বলে ছিলেন। যে ধরনের পরোক্ষ উক্তির সঙ্গে আমরা সাধারণত পরিচিত তা অন্য নির্ভর, আগের ক্রিয়াপদ নির্ভর।

* দুয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :
সুধা বলল, 'মাসিমণি তুমি এবার খাও' একে যদি পরোক্ষ বাক্যে পরিবর্তিত করি, 'সুধা এবার মাসিমণিকে খেতে বলল', এই বাক্য কথকের ঠিকই, কিন্তু কথক যে সুধার মতোই 'মাসি'-কে 'মাসিমণি' সম্বোধন করেন, এমন প্রমাণ নেই। পরোক্ষ বাক্য হওয়া সত্ত্বেও বাক্যটি প্রকৃতপক্ষে অন্য ধরনের পরোক্ষ বাক্য, বক্তার মানসিক অবস্থার বা মনোভঙ্গিরই প্রতিবেদন। কৃষ্ণকান্তের উইলের এই বাক্যে : 'বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল' ইত্যাদি—বা মহাপাপিষ্ঠা কথকের মনোভঙ্গির দ্যোতক, কোনো চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গির নয়। কিংবা '(ভৃত্যগণ) দেখিল, বালক-নখর বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিনীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে' এই বাক্যে যাঁরা রোহিনীকে দেখলেন এ তাঁদের 'দৃষ্টিভঙ্গি' নয়, কথকের 'দৃষ্টিভঙ্গি'।

যেমন ইংরেজিতে *He said that he would come, John hoped that it would rain,* কিংবা বাংলায় রাম বলল যে সে আসবে না, সে বলেছিল যে তাঁর মা কাশী গেছেন ইত্যাদি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'বাঙ্গালা ভাষা প্রত্যক্ষ উক্তিরই অনুকূল। পরোক্ষ উক্তি বাঙ্গালাতে তেমন ব্যবহৃত হয় না। ইংরেজির প্রভাবে বাঙ্গালাতে সাহিত্যের ভাষায় ইহা কিছু ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখনও ইহা সর্বতোভাবে বাঙ্গালা ভাষার উপযোগী হইয়া উঠে নাই।' (*সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ,* ১৯৭১, পৃ. ২৯৬)। সুনীতিকুমারের কথা ঠিকই, বাংলা উপন্যাসে পরোক্ষ উক্তির ব্যবহার সত্যিই যৎসামান্য, প্রায় উপেক্ষণীয় বলা চলে। লেখকেরা প্রত্যক্ষ উক্তি ব্যবহারের অনুরাগী।

> বাসুদেব লজ্জা পাইয়া বলেন, শশীর টাকা কালই পৌঁছিয়া দিয়া আসিবেন শশীর বাড়িতে, নিজে যাইবেন।
>
> কুসুম বলিল, চাররাত সে ভাল করিয়া ঘুমায় নাই।...
>
> কুসুম আরও বলিল, কয়েকদিনের মধ্যেই সে বাপের বাড়ি চলিয়া যাইবে। তার বাবা ভুবনেশ্বর পত্র দিয়াছে।

এই ধরনের বাক্য যে বাংলা উপন্যাসে একেবারেই পাওয়া যাবে না তা বলব না, কিন্তু এদের সংখ্যা বিরল। তার প্রধান কারণ, সুনীতিকুমার ঠিকই বলেছেন যে পরোক্ষ উক্তি বাংলা ভাষার স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায়না। কিন্তু য়েসপেরসন যাকে তৃতীয় ধরনের উক্তি বলেছেন, তাকে আমরা বাংলায় খুঁজে পাব। য়েসপেরসন যে উক্তির কথা বলেছেন তা একটি বাক্যসমষ্টির সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই বাক্যকে কেউ বলেছেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তির সংমিশ্রণ, কেউ নাম দিয়েছেন অবগুণ্ঠিত উক্তি, শার্ল বালি বলেছিলেন *style indirect libre,* স্বচ্ছন্দ পরোক্ষ উক্তি, য়েসপেরসন নাম দিয়েছেন *represented speech;* সম্প্রতি Ann Banfield নামে এক লেখিকা তাঁর *Unspeakabl Sentences* (1982) গ্রন্থে এদের নাম দিয়েছেন *the sentence of represented speech and thought.* আমি এদের নাম দিতে চাই 'প্রতিবেদন বাক্য'।

'প্রতিবেদন বাক্য' যে কোনো আধুনিক আখ্যানের বৈশিষ্ট্য প্রাচীন আখ্যানে এদের সন্ধানও পাওয়া গেছে, কিন্তু এদের প্রাধান্য আধুনিক আখ্যানেই। এই বাক্যের পরিচয় দিতে গিয়ে য়েসপেরসন বলেছিলেন—*It is chiefly used in long connected narratives where the relation of happenings in the exterior world is interrupted— very often without any transition like 'the said' or 'the thought'— by a report of what the person mentioned was saying or thinking at the time as if these sayings or thought were the immediate continuation of the outward happenings. The writer does not experience or 'live' (erleben) these thoughts or speeches, but represnts them to us...(P 291-92)*

দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম অনুচ্ছেদের (আগে উদ্ধৃত হয়েছে) বাক্যটি : 'কেননা, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর, কি জানি যদি কালধর্ম' ইত্যাদি এই রকম একটি 'প্রতিবেদন বাক্য'। এই

চিন্তা চরিত্রের চিন্তা। লেখক-কথক লিখতে পারতেন, * অশ্বারোহী চিন্তা করিলেন, 'সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর, কি জানি যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে (এই) প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত (হইব)'। এই প্রত্যক্ষ বাক্য উক্তিটিকে কথক পরোক্ষ বাক্য/উক্তিতে পরিণত করেছেন। এটি কথকের উক্তি নয়, চরিত্রের চিন্তার প্রতিবেদন। এই ধরনের বাক্য বঙ্কিমের আগে বাংলা আখ্যানে ব্যবহার হয়েছে কি না, এবং হলেও তাদের সংখ্যাগত *frequency* কত সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারব না, বাংলা গদ্যের ঐতিহাসিকেরা এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারবেন। কিন্তু একটি বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে বঙ্কিমের রচনায় এবং তাঁর পরবর্তী লেখকদের রচনায় এই ধরনের বাক্যের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। 'প্রতিবেদন বাক্য'-এর আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, যেটি বঙ্কিম-ব্যবহৃত বাক্যের চেয়ে বেশি জটিল

> ১) অপু সেই বৈকাল বেলা হইতে মনের মধ্যে যে তাসের ঘর নির্মাণ করিতেছিল, এক ফুঁয়ে কে তাহা একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিল। ২) এই তাহার মা তাহাকে ভালবাসে! ৩) সে বৈকাল বেলা বাটীর বাইরে যাওয়ার পর হইতে অনবরত ভাবিতেছে— মা না জানি কত দুঃখই করিতেছে তাহার জন্য! ৪) অপু আমার এখনও কেন যে এলোনা, তার জন্যে এত করে ঘাট থেকে এসে ভাজা ভাজলাম, আহা সে দুটো খেলেনা— ৫) হাঁ, দায় পড়িয়াছে, তাহার জন্য ভাবিয়া তো মায়ের ঘুম নাই— মা দিব্যি সেগুলি দিদিকে খাওয়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে— ৬) সেই শুধু এতক্ষণ মিছামিছি ভাবিয়া মরিতেছিল।
>
> (পথের পাঁচালী : ১৫)

প্রথম বাক্যটি নিঃসন্দেহে কথকের উক্তি। দ্বিতীয় বাক্যটি চরিত্রের, কিন্তু এখানে কথক পরোক্ষ উক্তির সাহায্য নিয়েছেন। এই বাক্যের অন্তর্লীন প্রত্যক্ষ উক্তিটি হল

* অপু ভাবিল, 'এই আমার মা আমাকে ভালবাসে'
  অথবা 'আমার মা আমাকে এই ভালবাসে।'
  চতুর্থ বাক্যটি মা-র প্রত্যক্ষ উক্তি
* (মা দুঃখ করিয়া বলিতেছে), 'অপু আমার এখনও যে এলোনা, তার জন্যে এত কষ্ট করে ঘাট থেকে এসে ভাজা ভাজলাম, আহা সে দুটো খেলেনা।'
  পঞ্চম ও ষষ্ঠ বাক্যটি আবার পরোক্ষ উক্তি; তার অন্তর্লীন প্রত্যক্ষ উক্তিটি এইরকম
* (অপু ভাবিল) 'হ্যাঁ, (মায়ের) দায় পড়িয়াছে, আমার জন্য ভাবিয়া তো মায়ের ঘুম নাই— মা দিব্যি সেগুলি দিদিকে খাওয়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে— আমিই শুধু এতক্ষণ মিছামিছি ভাবিয়া মরিতেছিলাম।'

সমস্ত অনুচ্ছেদটিতে যে আবেগ, অভিমান, বেদনাবোধ তা কথকের নয়, তা চরিত্রের চিন্তা ও অভিমান বেদনা-আবেগের প্রতিবেদন করা হয়েছে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উক্তির সীমারেখা ভেঙে দিয়ে। কখনও পরোক্ষ উক্তির ব্যবহার (যেমন ২, ৫, ৬ সংখ্যক

বাক্যে), কখনও প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহার (৪ সংখ্যক বাক্য) এবং উভয়ের মিশ্রণে ৪ এবং ৫ সংখ্যক বাক্যদুটি একই বিবৃতির অংশ)। য়েসপেরসন বলেছিলেন, প্রচলিত পরোক্ষ উক্তির তুলনায় প্রতিবেদন উক্তি অনেক বেশি জীবন্ত, কারণ তা প্রত্যক্ষ উক্তির কাছাকাছি; কারণ তা প্রত্যক্ষ উক্তির অনেক উপাদান অপরিবর্তিত রাখতে পারে। যেমন ধরা যাক, প্রত্যক্ষ উক্তিতে যেসব বিস্ময়সূচক অব্যয় করা হয় (হায়, হায়: দুত্তোর, ছি ছি) বা অনেক প্রয়োগবিধি (যেমন কী যে বলেন মশাই, আরে রাখুন, শুনুন তো আমার কথা) পরোক্ষ উক্তিতে তাদের পরিবর্তন অসম্ভব। দু-একটা উদাহরণই যথেষ্ট।

প্রত্যক্ষ : রামবাবু বললেন, 'আরে রাখুন, ঐ ছোঁড়াটার কথা তো—'

পরোক্ষ : *রামবাবু বললেন যে, সেই ছোঁড়াটার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় (কিংবা রামবাবু বিরক্তির সঙ্গে এবং অবহেলার সঙ্গে বললেন যে সেই ছোঁড়াটার কথা শোনার যোগ্য নয়)।

প্রত্যক্ষ : পিসিমা বললেন, 'মাগো, এমন কথাও লোকে বলে, ছি ছি।

পরোক্ষ : * পিসিমা বিস্ময় এবং ঘৃণার সঙ্গে বললেন যে এই ধরনের কথা লোকের পক্ষে বলা সম্ভব তা তিনি ভাবেন নি।

তারকাচিহ্নিত বাক্যগুলি বাঙালির মুখে বা লেখায় পাওয়া যাবে না এমন কথা বলব না, কিন্তু এগুলি প্রত্যক্ষ উক্তির রূপান্তর হিসেবে যে নিতান্তই ব্যর্থ তা দৃঢ়ভাবেই বলতে পারি। সমস্ত প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় না বলেই সম্ভবত সাহিত্যিক বর্ণনা এবং বিবরণ-রীতিতে আবির্ভূত হয়েছে প্রতিবেদন উক্তির, প্রতিবেদন উক্তিতে প্রত্যক্ষ উক্তির প্রত্যক্ষতা বজায় রাখা যেমন সম্ভব, তেমনই পরোক্ষ উক্তির পরোক্ষতা। এই জন্যই শার্ল বালি (রীতিশাস্ত্র বা স্টাইল্‌স্‌টিক্‌স-এর জন্মদাতা) একে 'স্বাধীন পরোক্ষ রীতি' নাম দিয়েছিলেন। একদিকে যেমন এই রীতিতে বক্তার বা চরিত্রের সমস্ত আত্মগতবোধ বা subjectivity এতে অক্ষুণ্ণ থাকছে, অন্যদিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রীতিতে বর্ণনা করার স্বাধীনতা বজায় থাকছে কথকের।

দুর্গার জিনিসগুলা সে প্রত্যাখ্যান করিল না, লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল না। রাঙা দিদিকে সে বলিল—কামার বউ তাহাকে জংশন শহর হইতে বাজার করিয়া আনিতে টাকা দিয়াছিল— এই সেই জিনিস। (গণদেবতা)

এখানে 'রাঙা দিদিকে সে বলিল' বাক্যের পর আমাদের প্রত্যাশা ছিল প্রত্যক্ষ উক্তি : 'কামার বউ আমাকে জংশন শহর হইতে বাজার করিয়া আনিতে টাকা দিয়াছিল— এই সেই জিনিস।' কিন্তু কথক এখানে ব্যবহার করলেন প্রতিবেদন উক্তি। সেই রকমই

শশী তাহাকে ক্ষমা করিয়া ফেলিল— সমস্ত অপরাধ। আজ পর্যন্ত কুসুম তাহার কাছে যত অপরাধ করিয়াছে সব। কুসুম বলিল, চার রাত সে ভাল করিয়া ঘুমায় নাই। কথাটা শশী বিশ্বাস করিল। কুসুম অম্লান বদনে আরও বলিল, কয়েক দিনের মধ্যেই সে বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবে। তার বাবা ভুবনেশ্বর পত্র দিয়াছে। ছোটবাবুকে রাগাইয়া চলিয়া যাইবার কথাটা ভাবিতে তাহার এমন খারাপ লাগিতেছিল। তাই ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছে।
(পুতুল নাচের ইতিকথা)

এই অংশের যে পরোক্ষ উক্তিগুলি সেগুলিও প্রতিবেদন উক্তি, সেগুলি শুধু চরিত্রের কথা মাত্র নয়, চরিত্রের মনোভঙ্গি ও চিন্তার প্রতিবেদন। * সুনীতিকুমার বলেছিলেন, পরোক্ষ উক্তি 'এখনও...সর্বতোভাবে বাঙ্গালাভাষার উপযোগী হইয়া উঠে নাই', কিন্তু দেখা যাচ্ছে আখ্যানবর্ণনায় কীভাবে পরোক্ষ উক্তি উপযোগী হয়ে উঠেছে। সমস্ত আখ্যানই এক ধরনের 'বলা' বা 'কথন'। এই কথন কখনো উত্তম পুরুষ ভিত্তিক, কখনো প্রথম পুরুষ ভিত্তিক। যেমন

'সন্ধ্যার পর আমার স্বামী কাগজপত্র লইয়া রমণবাবুর কাছে আসিলেন।' (ইন্দিরা)

বিবাহান্তে ধনদাস স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। (যুগলাঙ্গুরীয়)

দ্বিতীয় ধরনের বাক্য বা দ্বিতীয় ধরনের 'কথন' প্রতিবেদন বাক্যের নিকটবর্তী। উপন্যাস-সমালোচকেরা 'কথন'-এর পদ্ধতি নিয়ে চিন্তিত। শুধু উত্তম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ ভিত্তিক 'কথন'-এর ভাগ করাই যথেষ্ট নয়। তাঁরা 'কথন' এবং 'প্রদর্শন'-এর মধ্যে পার্থক্য করতে চান। লুকাচ বলেছিলেন বিবরণ ও বর্ণনা। একটি চরিত্র কী করে, কী বলে, কী ভাবে সে সম্বন্ধে 'বলতে' পারেন, অথবা চরিত্রের সব কাজ, সব কথা 'দেখাতে' পারেন। আর 'দেখানো' (বা 'প্রদর্শন')-এর জন্য চাই প্রতিবেদন বাক্য। পার্সি লাবক্ তাঁর The Craft of Fiction (New York 1957) গ্রন্থে লিখেছিলেন the art of fiction does not begin untill the novelist thinks of his story as a matter to be shown, to be so exhibited that will tell itself, কিন্তু এই যে প্রতিবেদন করা হচ্ছে সেই সমগ্র ক্রিয়াটি কার? সে কি কথকের? না তা চরিত্রের?

হরিমোহিনী তখন রন্ধনের উদ্‌যোগ করিতেছিলেন। বিনয় সেখানে রন্ধনশালার দ্বারা ব্রাহ্মণতনয়ের মধ্যাহ্ন-ভোজনের দাবি মঞ্জুর করাইয়া উপরে চলিয়া গেল। (গোরা)

বাক্যটি তো কথকেরই। এ তো শুধু কথন। কিন্তু 'ব্রাহ্মণতনয়ের মধ্যাহ্নভোজনের দাবি মঞ্জুর' করানোর মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়ার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, লক্ষণ আছে। এ শুধু কথকের সংবাদ পরিবেশন মাত্র নয়। হরিমোহিনী ও বিনয়ের সম্পর্ক এর মধ্যে নিহিত আছে। আখ্যান কথনে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এখানে প্রকাশ পাচ্ছে যাকে আমরা এই আখ্যানের সর্বজ্ঞ কথকের দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। যদিনা অবশ্য বলি যে আখ্যান ভাষার অন্যান্য সমস্ত discourse-এর মতোই সংবাদ বিনিময় বা সংবাদ সঞ্চারণ কাঠামোর অন্তর্গত। সংবাদ সঞ্চারণ কাঠামোয় আমরা ধরে নিয়েছি একজন আছে বক্তা, একজন শ্রোতা। আখ্যানেও আছে এক কথক, আর আছে শ্রোতা বা পাঠক। কথক শ্রোতা বা পাঠকের সঙ্গে কথা বলছেন, তিনিই চরিত্রগুলি সম্বন্ধে বলছেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর ব্যবহৃত বাক্যপুঞ্জে।* কিন্তু এও আমরা

* কেউ কেউ অবশ্য বলতে পারেন এখানে দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মিলন ঘটেছে। কথন এখানে চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। একে কেউ কেউ 'dual voice' theory নাম দিয়েছেন।

দেখি আখ্যানে কথন যখন শুধু আখ্যান 'বলা'-র চেয়ে 'প্রদর্শন'-এর ওপর জোর দিতে চান, যখন তিনি প্রতিবেদন বাক্যের সাহায্য নেন, তখন তাঁর চেষ্টা হল আখ্যানের প্রবাহে প্রবেশ না করা। বর্তমান উপন্যাসসমালোচনায় প্রকৃতপক্ষে 'কথকের কণ্ঠস্বর' এবং 'দৃষ্টিভঙ্গি'কে নির্ভর করে দুটো স্পষ্ট ধারা তৈরি হয়েছে। প্রথম ধারায় মনে করা হচ্ছে প্রত্যেকটি বাক্যই উক্তি, অর্থাৎ প্রত্যেক বাক্যেরই একটি বক্তা আছেন, এই বক্তাই আখ্যানের ভাষাকে তার বৈশিষ্ট্য দান করছে। অন্য পক্ষে মনে করা হচ্ছে যে 'দৃষ্টিভঙ্গি' বক্তার ভূমিকা থেকে স্বতন্ত্র, বা অন্যভাবে বললে আত্মগত ভাবনা বা ভাষার subjectivity সংবাদবিনিময় উপযোগিতা বা ক্রিয়ার অধীন নয়। আত্মগত ভাবনা বা subjectivity উদ্ভাসিত হচ্ছে প্রতিবেদন বাক্যের ভেতর দিয়ে, এই বাক্যগুলিতে বিবৃত অতীত ঘটনা এবং বর্তমান চৈতন্যের ক্রিয়া উভয়ের একত্রিত রূপকে আমরা দেখতে পাই। অন্যান্য আখ্যানমূলক বাক্য অতীত ক্রিয়া এবং প্রথম পুরুষকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। এই বাক্যগুলির সঙ্গে প্রতিবেদন বাক্যের এইখানে একটা বড়ো পার্থক্য। অ্যান ব্যানফিল্ড তাঁর Unspeakable Sentences (London, 1982) গ্রন্থে বলছেন যে প্রতিবেদন বাক্য একটি পরোক্ষ উক্তির বিস্তারিত রূপ নয়, (পরোক্ষ উক্তি মাত্রেই একজন মূল্যনির্ণায়ক বা evaluating বক্তা থাকেন)। কিংবা কোনো উদ্ধৃত বক্তার কণ্ঠস্বরের প্রতিবেদনও নয়, অনুকরণও নয়। বরং তা চরিত্রের সমস্ত আবেগ, উদ্বেগ, চিন্তা বা তার প্রকাশময়তার সমগ্রতাকে রক্ষা করতে সমর্থ। অথচ সেইসঙ্গে ভাষাগত বা ব্যাকরণগত দিক থেকে এ কথা দাবি করা চলে না যে এই বাক্যগুলি কোনো একজন বক্তার দ্বারাই উচ্চারিত। এগুলি অনুচ্চারিত বাক্য।

এক অর্থে কথকের বাক্য এবং প্রতিবেদন বাক্য দুইটি অনুচ্চারিত। অনুচ্চারিত এই অর্থে যে এই বাক্যগুলি কারো জন্যে উচ্চারিত নয়। আখ্যানে বক্তা এবং শ্রোতা থাকবেই আমরা ধরে নিয়েছি। বক্তা-শ্রোতার কথোপকথন বা শ্রোতার উদ্দেশে বক্তার উক্তিকে আমরা সাধারণত discourse বলে থাকি। কিন্তু অন্য discourse থেকে আখ্যান এইখানে পৃথক যে সেখানে উত্তম পুরুষ থাকতে পারে, নাও পারে; কিন্তু শ্রোতা থাকা আবশ্যিক নয়। আখ্যানের কথনরীতিতে আধুনিক সমালোচকেরা দুটি ভাগ করেছেন, বিশেষ করে উত্তম পুরুষের কথনরীতিতে। ডেভিড কপারফিল্ড কিংবা শ্রীকান্ত উপন্যাসের উত্তম পুরুষের কথনরীতি ছাড়া আর এক ধরনের কথনরীতি আছে, তাদের সাধারণত রুশ শব্দ Skaz দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। রুশ শব্দটির অর্থ speech, আমরা বাংলায় 'বচন' বলতে পারি। Skaz অবশ্য শুধু মৌখিক আখ্যানকেই বোঝায় না, তা মৌখিক আখ্যান এবং সংবাদ বিনিময়মূলক কাঠামোর মধ্যে লেখা গল্পকেও বোঝায়; তা যেন মুখের কথাবার্তার অনুকরণ, শিল্পসৃষ্টির একটি পদ্ধতি। এখানে কথক (তিনি উত্তম পুরুষ বক্তা) অথবা চিঠি লেখক, বিশেষ একজন বা একদল শ্রোতাকে লক্ষ্য করে বলছেন বা

লিখছেন। অর্থাৎ শ্রোতার উপস্থিতি আখ্যান বর্ণনার একটি বিশেষ দাবি। চিঠির আকারে যে কথন, সেখানে অবশ্যই শ্রোতা / পাঠকের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, সেই ভূমিকা দেখতে পাই কথনরীতিকে প্রভাবিত করে। সেখানে কথক তাঁর নির্দিষ্ট শ্রোতাকে প্রশ্ন করেন, তার উত্তর অনুমান করেন। Skaz-এও শ্রোতার ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট। অনেকে বলেছেন এ হল discourse-এর অনুকরণ। আর এখানেই 'আখ্যান'-এর সঙ্গে তার মূল পার্থক্য। ব্যানফিল্ডের ভাষায় ঃ In narration, the story is created by a descriptive language which is in some sense disembodied. It recounts the events which make up the story in a language where no first person need interve ne; if one does, this narrator is not experiencing qua narrator the events related, because narration does not take place in the Now of the events narrated. Nor is this narrator speaking to anyone. (P : 178)

আখ্যানের যে সমস্ত লক্ষণ আছে তার অন্যতম লক্ষণ হল তার বাক্যের কাল। ফরাসিতে একটি বিশেষ কাল, *Passe Simple,* আখ্যানের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, কিংবা ইংরেজিতে *historical present,* বাংলা আখ্যানে বাক্যগুলি সবই অতীত। কিন্তু কথকের চেষ্টা হল অতীতে ও বর্তমানে মেলবন্ধন ঘটানো। প্রথম বাংলা উপন্যাসে আমরা দেখব কথক চেষ্টা করছেন অতীত থেকে কাহিনিকে বর্তমানে আনার।

> পরে বিস্তর কৌশলে মতিলাল পাঠশালায় আসিতে আরম্ভ করিল। গুরুমহাশয় পায়ের উপর পা, বেত হাতে, দিয়ালে ঠেসান দিয়া ঢুলছেন ও বলছেন, 'ল্যাখরে ল্যাখ্।' মতিলাল ঐ অবকাশে উঠিয়া তাঁহার মুখের নিকট কলা দেখাচ্ছে আর নাচ্ছে—গুরুমশায়ের নাক ডাকিতেছে—শিশ্য কি করিতেছে তা কিছুই জানেননা। তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত হইলেই আপম পাততাড়ির কাছে বসিয়া কাগের ছা বগের ছা লিখিত।

কথক 'অতীতের' ঘটনা বলছেন, কিন্তু কখনো কখনো চেষ্টা করছেন তাকে বর্তমানের কাঠামোয় বর্ণনা করতে, যদিও বর্তমানকালের বাক্যগুলিও প্রকৃতপক্ষে অতীতেরই ঘটনা। এই যে বাক্যগুলি তাকে সাধারণ *discourse* থেকে আমরা স্বতন্ত্র করে চিহ্নিত করতে পারি এবং বিশেষভাবেই আখ্যানের বাক্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। উত্তম পুরুষের কথনরীতিতে এটি আরও স্পষ্ট। আমি যখন আমার জীবনের কথা মনে করছি, তার কতকগুলি ঘটনা অনেকদিন আগের, কতকগুলি ঘটনা নিকট অতীতের, কিন্তু তার কোনোটাই বর্তমানের নয়, সব অতীতের। কিন্তু এই 'অতীতত্ব-এর বোধ আত্মগত, বিষয়ীগত। আমি ভাবছি এবং আমি যা ভাবছি, যা মনে করার চেষ্টা করছি তা এখন ভাবছি, আমার ভাবা ক্রিয়াটি বর্তমান কালের ঘটনা। এই যে 'এখন'-এর কথা বলছি তার ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক প্রকাশ আছে, একটি যুক্ত সোজাসুজি অতীতের সঙ্গে আর

একটি যুক্ত বর্তমানের সঙ্গে বা আরও সূক্ষ্মভাবে বললে 'এখন'-এর সঙ্গে। উত্তম পুরুষের কথনে তাই প্রায়ই দ্বন্দ্ব চলে 'অতীতের আমি' আর 'এখনকার আমি'-তে।

'এখন' আর 'বর্তমান' ঠিক সমার্থক নয়। ধরা যাক ঐতিহাসিক বর্তমান কাল। এখানে 'বর্তমান' আছে কিন্তু 'এখন' নেই। কখনও কখনও আখ্যানে 'অতীত' এবং 'এখন' সমকালস্থিত ঃ যেমন 'আজ ৭ই আষাঢ়। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন।' 'গল্পটা এইমাত্র পড়িয়া সে ভারী খুশি হইয়াছে।' (পথের পাঁচালী : ৩৪) এই 'আজ', 'এইমাত্র' অবশ্যই 'এখন' দ্যোতক, কিন্তু সমস্ত ঘটনার কাল অতীত। আখ্যানের মধ্যে আমরা পাচ্ছি দু ধরনের বাক্য। এক, সেই বাক্য যার কাজ শুধু বিবরণ দেওয়া। অতীতকালের সঙ্গে এই বাক্যগুলির গাঁটছড়া বাঁধা, অর্থাৎ এদের সঙ্গে 'এখন'-এর কোনো যোগ নেই, যদিও এদের কথক 'এখনকার আমি'। আর প্রথম পুরুষের কথনে যে কাহিনি বলা হয়, সেখানে ঘটনাগুলি যে কালানুক্রমে ঘটেছিল সেই ভাবেই সাজানো হয়, কেউ সেখানে বলছে না, ঘটনাগুলি নিজেরাই যেন বর্ণিত হয়ে চলেছে। তাই Beneveniste বলতে চান এখানে কোনো কথকই নেই।

আর এক ধরনের বাক্য পাচ্ছি আখ্যানে, যে বাক্যের কাজ হল চেতনার প্রতিবেদন। সেগুলিও কারোর উচ্চারিত বাক্য নয়, সেগুলির জন্য আমাদের কল্পনা করতে হয় না কোনো বক্তা শ্রোতার কাঠামো। অর্থাৎ আখ্যানে প্রথম পুরুষের কথনকে বলতে পারি কথকহীন কথন, বিবরণ নিজেই বিকশিত হয়ে উঠছে, কোনো বক্তা শ্রোতার উপস্থিতির প্রয়োজনই নেই; আর উত্তম পুরুষের কথনে 'আমি' কাউকে কিছু বলছে না, সে শুধু বিবরণ দিচ্ছে (*ডেভিড কপারফিল্ড**, *ইন্দিরা*, *শ্রীকান্ত*, *ঘরে বাইরে* তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ)। সোজা কথায়, বিবরণ কোনো শ্রোতার উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয়। তা স্বয়ংনির্ভর। বহুদিন আগে জন স্টুয়ার্ট মিল কবিতা এবং বাগ্মিতার পার্থক্য করতে গিয়ে বলেছিলেন বাগ্মিতার উদ্দেশ্য অন্য মনে প্রভাব বিস্তার, অন্যকে স্বমতের অধীন করা, নিজের আবেগ অন্যমনে সঞ্চারিত করা; কবিতা নিজের সঙ্গে নিজের কথা, স্বগতোক্তি; কবিতা যখন অন্যের প্রতি উক্তি তখন তা পরিণত হয় বাগ্মিতায়। আমরা বলতে পারি আখ্যান এবং কথোপকথন বক্তৃতা বা যে কোনো ধরনের discourse-এর মধ্যেও এই পার্থক্য। আখ্যানের বাক্য তাই বক্তা-শ্রোতা কাঠামোর বাইরে।

আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক-সাহিত্যসমালোচকদের মধ্যে অনেকে, যেমন Emile Beneveniste (Problems of General Linguistics, 1971) K. Hamburger (the logic of literature, 1973) বা Ann Banfield (Unspeakable Sentences, 1982) আখ্যানে কথকের ভূমিকাকেই উড়িয়ে দিয়েছেন। আখ্যানের 'লেখক'-কে অবশ্য ইদানীংকার সাহিত্য-সমালোচকেরা বর্জন করেছেন, তার জায়গায় এসেছেন 'কথক'। তিনিই প্রত্যেকটি বাক্যের জন্য দায়ী, তিনি লেখকের সৃষ্টি নন, কিন্তু তিনিই সমগ্র

আখ্যানের ভাষা, রীতি, সংগঠনের স্রষ্টা। তিনি চরিত্রগুলির চিন্তায় আনছেন পারম্পর্য এবং সংহতি, তাদের গতিপথকে তিনি চালিত করছেন, কখনও কখনও কথকের একটি কণ্ঠস্বর নয়, একাধিক কণ্ঠস্বর শোনা যায় আখ্যানে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই নিয়ে সাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যে নানা মতভেদ। আমি এই কলহের মধ্যে যেতে চাই না। যে ধরনের বাক্য নিয়ে এই মতভেদের উৎপত্তি সেই বাক্যগুলির প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আমরা লক্ষ করি যে আখ্যানে চরিত্রের চিন্তার প্রতিবেদন করা হয় কতকগুলি বাক্যের সাহায্যে। কতকগুলি ক্ষেত্রে এই চিন্তা 'স্বগতোক্তি'-র সগোত্র। চরিত্রের চিন্তার ভাষাগত প্রতিবেদন করা হয় এই বাক্যে। কিন্তু কতকগুলি বাক্য আছে যেগুলি চরিত্রের চিন্তার প্রতিবেদন নয়, তাদের অ-চিন্তামূলক চৈতন্যের (non-reflective consciousness) প্রতিবেদন। এবং তাদের বর্ণনারীতি স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র এই অর্থে যে, চরিত্রের চিন্তার যে ভাষাগত প্রতিবেদন, তা চরিত্রের স্বাভাবিক ভাষারীতির সগোত্র; কিন্তু যা চরিত্রের অ-চিন্তামূলক চৈতন্যের প্রতিবেদন (অর্থাৎ তার এমন মানসিক অবস্থা যার সম্বন্ধে সে সচেতনভাবে চিন্তিত নয়) তার ভাষাগত প্রকাশ চরিত্রের নিজস্ব ভাষারীতি থেকে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। সেখানে আমরা পুরোনো সমালোচনার পরিভাষা ব্যবহার করে বলতে পারি, লেখকের ভাষাতেই তার মানসিক অবস্থার প্রকাশ।

> ঐ পথের ও ধারে অনেক দূরে কোথায় সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ-পর্বত! বনঝোপের স্নিগ্ধ গন্ধে, নাজানার ছায়া নামিয়া আসা ঝিকিমিকি সন্ধ্যায়, সেই স্বপ্নলোকের ছবি তাহাকে অবাক করিয়া দিল। কতদূরে সে প্রস্রবণ গিরির উন্নত শিখর, আকাশপথে সতত সঞ্চরমান মেঘমালায় যাহার প্রশান্ত, নীল সৌন্দর্য সর্বদা আবৃত থাকে?
>
> (পথের পাঁচালী)

> শশীর একটা দুর্বোধ্য কষ্ট হয়। যা ছিল শুধু জীবনসীমার বহিঃপ্রাচীর, হঠাৎ তার মধ্যে একটা চোরা দরজা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ওপাশে কত বিস্মৃতি, কত সম্ভাবনা, কত বিস্ময়। কেন চোখ ছল ছল করিল না কুসুমের? (পুতুলনাচের ইতিকথা)

এই উদ্ধৃতিগুলি 'অপু' বা 'শশী'-র চেতনার সরল প্রতিবেদন মাত্র নয়, অপু বা শশী কী অনুভব করছে এবং তাদের অনুভবক্রিয়ার প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনের ভাষা লেখকের, অপুর বা শশীর নয়। *Erich Averbach* 'মাদাম বোভারি'-র একটি অনুচ্ছেদ আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাই বলেছেন, এমা-র প্রসঙ্গে : *Though the light which illuminates the picture proceeds from her, she is yet herself part of the picture, she is situated within it...to be sure, there is nothing of Flaubert's life in these words, but only Emma's; Flaubert does nothing but be stow*

the power of mature of expression upon the material which she affords, in its complete subjectivity.

(Mimesis, Princeton, 1968, P. 484)

আমরা অন্যভাবে বলতে পারি, দার্শনিকেরা যেমন চিন্তা (দেকার্তের *Cogito*) এবং চিন্তার অন্তঃশায়ী অন্যান্য সচেতন ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য করেন, ভাষাতেও আমরা এই দু ধরনের ক্রিয়ার উপযোগী বাক্য রচনা করতে পারি।* এবং এদের ভাষাগত পার্থক্য আমরা আখ্যানের মধ্যেই দেখতে পাই। চৈতন্যের যে দুটি স্তর আমরা ভাগ করতে পারি, একটি চিন্তামূলক, আর একটি অভিজ্ঞতা (বা জ্ঞানভিত্তিক) তাদের জন্যই দুই ধরনের বাক্য। ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকেও এদের লক্ষণ নির্দিষ্ট করা সম্ভব। অ্যানফিল্ড তার চেষ্টা করেছেনও। শুধু এইটুকু বলা দরকার যে চিন্তাকে যদি একধরনের 'আভ্যন্তরীণ ভাষা'-ও বলি, অভিজ্ঞতা ভাষা-স্বতন্ত্র, অ-চিন্তামূলক। আখ্যানে তাহলে আমরা পাই তিন ধরনের বাক্য ঃ নিছক বিবরণমূলক, আর দু-ধরনের প্রতিবেদনমূলক বাক্য, এদের একটি চরিত্রের চিন্তার প্রতিবেদন, আর একটি অভিজ্ঞতার প্রতিবেদন; আর প্রতিবেদনমূলক বাক্য। কখনো স্বচ্ছন্দ পরোক্ষ উক্তি, কখনো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তির সংমিশ্রণ। এই সমস্ত উক্তির মধ্যে একটি 'কথক'-এর উপস্থিতি আবশ্যক কিনা সে তর্ক আপাতত অপ্রয়োজনীয়।

* দুয়ের তফাৎ বোঝাবার জন্য ব্যানফিল্ড, রাসের-এর An Inquiry onto Meaning and Truth (New York, 1947)-এর যে উদাহরণ দিয়েছেন তা আমরাও ব্যবহার করতে পারি। মনে করুন, আপনি বাদলার দিনে রাস্তায় বেরিয়ে দেখলেন এক জায়গায় জল জমেছে, আপনি সেই জায়গাটা এড়িয়ে গেলেন। আপনি কি মনে মনে বলেন, 'এখানে জল জমেছে, এর মধ্যে দিয়ে যাওয়া বিবেচনার কাজ নয়, কাজেই অন্য রাস্তায় যাওয়া যাক।' কিন্তু যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'হঠাৎ অন্যদিকে গেলেন কেন', তখন আপনি অবশ্য বলবেন, 'অন্যদিকে গেলাম, কারণ আমি জলের মধ্যে পড়ে যেতে চাইনি।' আপনি এখন জানেন যে আপনার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা, আপনার সেই 'জানা'-কে এখন আপনি ভাষায় প্রকাশ করছেন। কিন্তু যদি আপনাকে এই প্রশ্ন কেউ না করত তাহলে আপনি কী জানতেন? আপনি জেনেছিলেন বলেই সেই জানাকে স্মরণ করতেন পারছেন। যা আমরা জানিনা, তাকে কি আমার স্মরণ করতে পারি? প্রশ্ন করার ফলেই স্মৃতি সক্রিয় হল, স্মৃতির সাহায্যে পূর্ববর্তী একটি সচেতন ক্রিয়ার অস্তিত্ব পরীক্ষিত হল। বহু 'জ্ঞান' মানুষের কাছে আসে নানা পথে, সেই 'জ্ঞান' সম্বন্ধে মানুষ নাও বলতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ভাষায় সেই 'জ্ঞান' প্রকাশ করা যায় না। আখ্যানের চরিত্রের বহু জ্ঞান, বহু অভিজ্ঞতা চরিত্রগুলি প্রকাশ করেন না, কিন্তু কথক / লেখক সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, বা যাকে আমরা চৈতন্য বলেছি তাকে প্রকাশ করেন। এদের প্রকাশের জন্য যে বাক্য তা আখ্যানের অন্যতম বিশিষ্ট বাক্য।

৪

প্রতিবেদন বাক্য সম্বন্ধে শার্ল বালির ধারণা ছিল যে তা ফরাসি ভাষারই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিকেরা জর্মান থেকে উদাহরণ দিয়েছিলেন যথেষ্ট, যদিও কেউ কেউ মনে করেছিলেন তা জোলার রচনার প্রভাবমাত্র। কিন্তু জোলার রচনার অনেক আগে, যেমন জেন অস্টিনের লেখায়, তার নিদর্শন পাওয়া গেছে ইংরেজিতে। য়েসপেরসন লিখেছেন যে ইউরোপের অন্যান্য ভাষাতেও এর নিদর্শনের অভাব নেই। বাংলায় উপন্যাস রচনার প্রথম পর্ব থেকেই তার নিদর্শন পাওয়া গেছে, যদিও তা ইংরেজি প্রভাবজাত হতে পারে। আজকের দিনে জানা গেছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাতেই, বিশেষ করে আখ্যানের ভাষাতে, প্রতিবেদন বাক্য অবিরল। আধুনিক কালের আগে এই ধরনের বাক্য মহাকাব্যে কিংবা আখ্যানকাব্যে কোথাও পাওয়া যায় না, এমন কথা জোর করে বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না, কিন্তু আধুনিক কালে, ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এবং বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী থেকে যে এই ধরনের বাক্যের প্রাচুর্য দেখা গেছে তাতেও বিশেষ সন্দেহ নেই। এই ধরনের উক্তির বিকাশ ও উপন্যাসের বিকাশ সমকালের ঘটনা, ফ্লবেয়ার এবং জোলা বিশেষ করে এই উক্তির সমস্ত সাহিত্যিক সম্ভাবনার ব্যবহার করেছেন। এই উক্তিগুলির যে বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করি তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হল 'অতীত' এবং 'এখন'-এর সমকালত্ব। ঘটনা অতীতকালের, কিন্তু চরিত্রগুলির কথাবার্তা, চিন্তাভাবনায় প্রকাশিত হচ্ছে 'এখনত্ব'। 'জগৎ সিংহ দেখিলেন, আয়েষার বিরাম নাই, শ্রান্তিবোধ নাই, অবহেলা নাই। রাত্রিদিন রোগীর শুশ্রূষা কারতেছেন।'

দ্বিতীয় যে ব্যাপারটি লক্ষ করার মতো তা এই উক্তিগুলি বিশেষভাবে লিখিত সাহিত্যের, লিখিত সাহিত্যের মধ্যেও আবার বিশেষ করে উপন্যাসের বা ছোটো গল্পের, এক কথায় 'কথাসাহিত্য'-এর। ব্যানফিল্ড আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন : নাটক, পত্রাকারে লেখা আখ্যান, *Skaz* জাতীয় আখ্যানে প্রতিবেদন-বাক্যের স্থান নেই (বা থাকলেও অত্যন্ত কম) অর্থাৎ...*What all the forms which exclude represented thought and in which represented speech have share in their communicative form. If some are written, they are written forms of discourse. None belong to the category of narration. Speech entails communication, but communication does not entail speech. (P. 241-42)*। লেখা বা লিখিত সাহিত্যই ভাষাকে তার সংবাদ-বিনিময়ের কাঠামো থেকে মুক্তি দিতে পারে। বাংলাতে ফরাসির মত Passé simple (যা শুধু আখ্যান কথনে ব্যবহৃত হয়) Passé compose (যা কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়) এর মতো স্পষ্ট, কথাবার্তা ও শুধুই আখ্যানের

জন্য আলাদা আলাদা কালবিভাগ নেই ঠিকই, কিন্তু পরোক্ষ উক্তি এবং প্রতিবেদন উক্তি দুই-ই যে কথাবার্তায় অব্যবহৃত তাতেও সন্দেহ নেই। অর্থাৎ আখ্যান তার নিজের প্রয়োজনে এমন বাক্য সৃষ্টি করে নিয়েছে যা কথোপকথনের বাক্য থেকে আলাদা, সংবাদ-বিনিময়ী ভাষা থেকে আলাদা। বচন সেই মুহূর্তে ভাষাগত রূপ অর্জন করে সেখানে বক্তা এবং শ্রোতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, আর সেই মুহূর্ত হল বর্তমান। আখ্যানের ভাষা এই 'বর্তমান' থেকে ভাষাকে মুক্ত করে, সে সৃষ্টি করে ঔপন্যাসিক 'বর্তমান' যাকে বলছি 'এখন'। পাস্‌কাল তাই প্রতিবেদন বাক্য সম্বন্ধে বলছেন, *it can Occur in literature only because an auhor, in the act of writing, can be alone with his imagined characters in the seclusion of his study, and only in this privacy—which the presence of a second person shatters. (Roy Pascel, The Dual Voice, Manchester, 177, p. 14)* আধুনিক একটি উপন্যাস থেকে উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে কেন বলতে চাচ্ছি এই বাক্যগুলি বক্তা-শ্রোতার সংবাদ বিনিময়ের কাঠামো থেকে আলাদা, কেন এরা 'বচন'-এর অন্তর্গত নয়, কেন বিশেষভাবেই এরা সাহিত্যিক কৌশল, আখ্যান বর্ণনার নিজস্ব রীতিমাত্র।

> পড়ার টেবিলে কোমর ঘেঁষে নির্বাক দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণা। এলোমেলো বুদবুদগুলোকেই যেন গোছাতে চাইল সঠিক সংখ্যায়। সঙ্গোপনে কড়ে আঙুলের গায়ে বুড়ো আঙুলটা বাঁকিয়ে এনে মনে মনে একক দশক শতক সহস্র...এক আঙুলের কড়ের মধ্যেই ফুরিয়ে যেতে পারত হিসেবটা...কিন্তু হবে না। আশি হাজারের আট চলে যাবে অযুতের ঘরে। ইস্‌। তিনটে শূন্যের মধ্যেই যদি থাকত ব্যাপারটা। কিছু না কিচ্ছু না। অনায়াসেই ঝামেলাটা চুকিয়ে দেওয়া যেত। বাবা হয়তো একাই পারতেন দিদির বিয়ে হয়ে যাবার পরও মায়ের আড়াই প্যাঁচ মাপের আর্মলেট একটা। খালি সোনার চারগাছা চুড়ি আদ্যিকালের। কিন্তু বুদবুদগুলোই কাতারে কাতারে লাখে লাখে বিন্দু বিন্দু হয়ে শরীরে ঘাম হয়ে জমতে শুরু করে। কণ্ঠনালীটা কামড়ে ধরে ভয়—দশটা একশ টাকার নোটে একহাজার। আশিটা একশ-এ আটহাজার। আশি হাজারের জন্য এরকম কটা একশ। ওরে বাপ্‌স্‌। ছোট খালের এপার ওপার নদী হলো, নদী সমুদ্দুর। পুরো একটা সমুদ্রের জল আঁজলায় তুলে নিয়ে জীবনের খেসারত। (যাবজ্জীবন : অমলেন্দু চক্রবর্তী)

এ কারোর স্বাভাবিক কথা নয়। স্বাভাবিক কথার অনুকরণ সংলাপ। এ সংলাপ নয়, প্রত্যক্ষ উক্তি নয়। এ পরোক্ষ উক্তিও নয়। এর মধ্যে চরিত্রের চিন্তা আছে যত, তার চেয়ে বেশি তার উদ্বেগ, অবসাদ ভয়। আবার উক্তি নেই, তাও নয়। 'ইস্‌' 'ওরে' 'বাপ্‌স্‌' অব্যয়গুলিও মধ্যে মধ্যে নিঃসরিত হচ্ছে। কিন্তু তারাও সমস্ত বাক্যের থেকে

স্বতন্ত্র নয়। সমস্তটাই একটা নির্মাণ। এই নির্মাণ বিশেষভাবে লিখিত সাহিত্যের।

উপন্যাস তার আখ্যান বর্ণনার জন্য ইতিহাস এবং মহাকাব্য এবং নাটক তিনটি সাহিত্যরূপ থেকে শিক্ষা নিয়েছে, কিন্তু তার নিজস্ব আবিষ্কার এইখানে। এই ধরনের বাক্য বা বাক্যধারার উদ্ভবের একটি কারণ কি এই যে উপন্যাস বিশেষভাবে লিখিত সাহিত্যরূপ? নাটকের প্রত্যেকটি বাক্য উচ্চারিত হবার অপেক্ষায়। কবিতা তার লিখিত এবং মুদ্রিত রূপ সত্ত্বেও এখনও তা শ্রাব্যতানির্ভর। প্রাচীন মহাকাব্য সঞ্চারিত হয়েছে মৌখিক ধারার মধ্য দিয়ে। উপন্যাস এবং আধুনিক আখ্যান সম্পূর্ণভাবে লিখিত সাহিত্য। সেই জন্যই কি এর মধ্যে এই নতুন বাক্যের সম্ভাবনা দেখা দিল, এমন বাক্য ও বাক্যধারার সৃষ্টি হলা যা বলার জন্য নয়, যা বচনের অন্তর্গত নয়? লিখিত সাহিত্যের নিজস্ব একটা প্রক্রিয়া আছে, যার ফলে সে বচন থেকে ক্রমশই দূরে সরে যায়। যেমন ধরা যাক, দীর্ঘ বাক্য নির্মাণে। প্রাচীন সাহিত্যেও তার প্রমাণ যথেষ্ট। আধুনিক কালে যখন থেকে গদ্যে আখ্যান নির্মাণ শুরু হল, তখনও দেখেছি দীর্ঘ বাক্য রচনার প্রবণতা, যা বচনের স্বভাবের বিরোধী। কিন্তু দীর্ঘ বাক্য শুধু আখ্যানেরই লক্ষণ নয়, লিখিত গদ্যেরই বৈশিষ্ট্য; আমাদের দেশে যখন সাহিত্যিক গদ্যের সূত্রপাত হল, তখন ফারসি এবং সংস্কৃত এবং ইংরেজি তিনটি ভাষার আদর্শই ছিল গদ্যলেখকদের সামনে, তাঁরা তিনটি ভাষার গদ্য থেকেই শিক্ষা নিয়েছেন। কিন্তু ফারসি এবং সংস্কৃতে তাঁরা যেটি পাননি, তা এই পরোক্ষ উক্তি এবং প্রতিবেদন উক্তি। আমাদের নিজস্ব মৌখিক আখ্যানরীতিও ছিল, ব্রতকথা রূপকথা এবং অন্যান্য কথাসাহিত্যে। উপন্যাস সেই মৌখিক আখ্যানরীতির মধ্যে নতুন একটি পদ্ধতি নিয়ে দেখা দিল। যে প্রশ্নটা গুরুতর তা হল একটি মৌখিক রীতি যখন ধীরে ধীরে বিদায় নেয়, যখন একটি সমাজ ধীরে ধীরে লেখ্য সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তার আখ্যানরীতিতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয় কিনা? আমাদের মনে হয় এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এবং এই অনুমানের পেছনে তথ্যের সমর্থন আছে। যদি 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকে আরম্ভ করে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসের প্রথম পঞ্চাশ ষাট বছরের উপন্যাসের বাক্যগুলি লক্ষ করা যায়, দেখা যাবে ঔপন্যাসিকেরা ক্রমশই এই ধরনের বাক্য ব্যবহারেই যে শুধু অভ্যস্ত হচ্ছেন তাই নয়, তাঁরা চেষ্টা করছেন কীভাবে নিছক বিবরণাত্মক বাক্য ও সংলাপের প্রত্যক্ষ উক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। সংলাপের প্রত্যক্ষ উক্তি ও বিবরণাত্মক বাক্যের সংমিশ্রণ ঘটানোর চেষ্টা অবশ্য যে কোনো আখ্যান বর্ণনার প্রাথমিক শর্ত। প্রথম দিকের উপন্যাসে (*আলালের ঘরের দুলাল** একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ) বিবরণাত্মক বাক্যের অধিকাংশই ঘটনার বর্ণনা, সেই ঘটনাগুলি চরিত্রের আচরণের সঙ্গে সবসময় স্পষ্টভাবে জড়িত নয়। এই বর্ণনা কখনো স্থানের, কখনো

বস্তুর, কখনো অন্যান্য মানুষের। পরবর্তীকালের উপন্যাসে এই বর্ণনার বড়ো অংশটি প্রকৃতির। ঔপন্যাসিকেরা চেষ্টা করেছেন এই বর্ণনাকে আখ্যানের বিবরণের অঙ্গীভূত করতে।* যেটি সবচেয়ে বড়ো চেষ্টা তা হল চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের, চরিত্রের সঙ্গে বিশেষ অবস্থার, চরিত্রের সঙ্গে বাইরের ঘটনার সংঘাত। আর সেই সংঘাতের (কখনো কখনো টানাপোড়েনের) ভাষা সন্ধান। তার প্রকাশ হয়েছে দুটি পথে : এক সংলাপে, দুই প্রতিবেদনে।

মনে রাখতে হবে উপন্যাসের সংলাপও (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ উক্তি) শেষ পর্যন্ত নাটকের রীতিকেই সম্পূর্ণ অনুসরণ করেনি। নাটকের সংলাপে প্রত্যক্ষ উক্তিগুলি বচনের সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ সেগুলি বলার জন্য, উচ্চারিত হবার জন্য। তাদের ভাষাগত পরিপূর্ণতা বা চরিতার্থতা নির্ভর করছে তাদের উচ্চারিত হবার ক্ষমতায় এবং শেষ পর্যন্ত উচ্চারণে। উপন্যাসের সংলাপ লিখিত সাহিত্যের অন্তর্গত। এই সংলাপগুলি আদর্শায়িত বচনের ঔপন্যাসিক অনুকরণ—যাকে ইংরেজ সমালোচক বলছেন, *fictionalized imitations of idealized speach.* এর মধ্যে স্বাভাবিক বচনের দ্বিধা, অসংগতি, অসম্পূর্ণতা, ব্যাকরণের নিয়মলঙঘন কোনোটিই পাওয়া যাবে না। আবার উপন্যাসের সংলাপে, প্রত্যক্ষ উক্তিতে উপভাষা দেখা দিতে পারে, 'বিদেশি' ভাষাও আবির্ভূত হতে

* অনেক পাঠক আখ্যানের বিবরণাত্মক অংশে আগ্রহী হয়ে বর্ণনা অংশ বাদ দিয়ে পড়তে অভ্যস্ত, অর্থাৎ তাঁদের ধারণা বর্ণনা অংশ বিবরণের সঙ্গে জৈবিক ঐক্যে জড়ানো নয়। কিন্তু উৎকৃষ্ট উপন্যাসের বা আখ্যানের একটি বড়ো শর্তই এই যে বিবরণ ও বর্ণনার মধ্যে শুধু যে নিবিড় সম্পর্ক আছে তাই নয়, বিবরণ ও বর্ণনা ও সংলাপ তিনটি পরস্পর-নির্ভর, এবং উপন্যাসের সামগ্রিক অর্থের জন্য কোনো একটিকেই আর একটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। সেই জন্যই বর্ণনামূলক বাক্যগুলিকে আমি স্বতন্ত্র শ্রেণি হিসেবে না দেখে বিবরণাত্মক বাক্যের অন্তর্গত করে দেখেছি। বলাই বাহুল্য, কোনো ব্যাকরণাত্মক লক্ষণায় তাদের আলাদা করা যাবে না।

রাত্রি গভীর অন্ধকারময়, মেঘশূন্য নভস্তল তারায় আচ্ছন্ন, তীরে তরুশ্রেণী নিশীথ-আকাশের কালিমাঘন নিবিড় ভিত্তির মতো স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, নিম্নে প্রশস্ত নদীর প্রবল ধারা নিঃশব্দে চলিয়াছে, ইহার মাঝখানে ললিতা নিদ্রিত। আর কিছু নয়, এই সুন্দর, বিশ্বাসপূর্ণ নিদ্রাটুকুকে ললিতা আজ বিনয়ের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে।

এবং স্টীমার কলিকাতায় আসিল। বিনয় ঘাটে একটা গাড়ি ভাড়া করিয়া ললিতাকে ভিতরে বসাইয়া নিজে গাড়োয়ানের পাশে গিয়া বসিল। এই দিনের বেলাকার কলিকাতার পথে গাড়ি চলিতে চলিতে কেন যে ললিতার মনে উল্টা হাওয়া বহিতে লাগিল তাহা কে বলিবে।

সাধারণত প্রথম অংশটি বর্ণনাত্মক এবং দ্বিতীয় অংশটিকে বিবরণাত্মক নামে চিহ্নিত করতে আমরা অভ্যস্ত হলেও, দুটিরই প্রকৃতি এক। দুটি বর্ণনায়ই (বা দুটি বিবরণই) চরিত্রের চিন্তা ও আচরণের অন্তরে প্রবেশ করছে অথবা ওই বাইরের ঘটনা বা অবস্থান চরিত্রের চিন্তা ও আচরণকে তার বিশেষ রূপ নিতে সাহায্য করছে।

পারে। (কখনো মূলে, *কখনো পরিচ্ছন্ন অনুবাদে, কখনও ভাঙা 'পিড্‌জিন'-এ) এবং তার মূল কারণ অবশ্যই বচনের কাছাকাছি যাওয়া। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ উক্তি যেখানে ব্যবহার করতে ঔপন্যাসিক বাধ্য, সেখানেই লিখিত সাহিত্য ও মৌখিক সাহিত্যের (এবং বচনের) টানাপোড়েন দেখা গেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে লেখক সংলাপে বচনকে অনুসরণ করছেন** (বেশির ভাগে ক্ষেত্রে তাই) কিন্তু উপন্যাসে লেখক সংলাপে সম্পূর্ণভাবে লিখিত সাহিত্যের রীতি অবলম্বন করেছেন এমন দৃষ্টান্তও হয়। রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ তার প্রমাণ। চোখের বালি কিংবা গোরা লেখার পর রবীন্দ্রনাথ যখন এই ধরনের সংলাপ রচনা করেন।

দামিনী বলিল, যেখান হইতে ব্যথা বহিয়া আনিয়াছি
আমাকে সেই সমুদ্রের ধারে লইয়া যাও...

তখন কি বলতে পারি না যে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন উপন্যাসের বিবরণাত্মক বাক্যগুলি যেমন বচনের থেকে স্বতন্ত্র, সংলাপের সঙ্গেও বচনের কোনো সম্পর্ক নেই। অন্তত চতুরঙ্গ প্রমাণ করে যে প্রত্যক্ষ উক্তি হলেই তা বচনভিত্তিক, ভাষাতাত্ত্বিক সব বৈশিষ্ট্য (যা একটি সংবাদ-বিনিময়ের কাঠামোর মধ্যে অবশ্যই প্রতিফলিত) নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। এই একই চেষ্টা আছে ঘরে বাইরের মধ্যে। চতুরঙ্গের সঙ্গে তার তফাৎ শুধু সাধুভাষা ও চলিতভাষার। নইলে বিবরণাত্মক বাক্য ও সংলাপের বাক্যে ভাষাগত পার্থক্য সৃষ্টির চেষ্টা সেখানে নেই। সেখানে বিবরণাত্মক বাক্যগুলিও এক এক চরিত্রের উক্তি—সমস্ত উপন্যাসটিই দীর্ঘ উদ্ধৃত উক্তির সমষ্টি। অথবা অন্যভাবে বলতে পারি চতুরঙ্গ এবং ঘরে-বাইরে দুটি উপন্যাসেই যাকে সংলাপ বলছি, তা প্রকৃতপক্ষে চিন্তারই প্রতিবেদন, শুধু সংলাপ আকারে রচিত। প্রত্যেকটি 'সংলাপ' যখন একই ভাষাতাত্ত্বিক

* ১...কাপালিক...নবকুমারকে পূর্ব্ববৎ সংস্কৃতে কহিল, 'মামনুসর'।
২ 'বিবিজান! ও ব্যক্তি কে?' যবনবালা উত্তর করিলেন, 'মেরা শৌহর'।
৩ এমন সময় গোরা 'গুড ইভনিং সার' বলিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

** উপভাষার ক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে লেখক কিন্তু বচনকে, প্রকৃত উপভাষাকে সম্পূর্ণ অনুকরণ করেন না পারেন না (লিখন পদ্ধতির একটা অসামর্থ্য আছে)। টমাস হার্ডি তাঁর The Mayor of Casterbridge-র একটি চরিত্রের মুখে যে স্কচ্ ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন, তার শুদ্ধতা সম্বন্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'It must be remembered that the Scotchman if the tale is represented not as he would appear to other Scotchman. but as he would appear to people of outer regions. *পদ্মানদীর মাঝি*-তে ব্যবহৃত 'উপভাষা' প্রসঙ্গেও তাই ওই উপভাষা কোন্ বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা, বা তা যথার্থভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে কিনা এ প্রশ্ন অবান্তর। ওই উপভাষা কৃত্রিম, নির্মিত, সাহিত্যিক ভাষা। এর সঙ্গে বচনের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই।

লক্ষণাক্রান্ত, সব 'সংলাপ'-ই যখন ব্যক্তিগত উচ্চারণ বা অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণমুক্ত, তখন বলা চলে সেখানে কোনো চরিত্রই কিছু 'বলছে না'। বিবরণাত্মক বাক্যের মতোই এগুলি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। ভাষার এই স্বচ্ছতা, এই নৈরাত্ম্য সম্ভব লিখিত গদ্যে। লিখিত গদ্যের এই স্বচ্ছতার সঙ্গে বচনের বর্ণময়তার এই টানাপোড়েন দেখা যায় উপন্যাসে, আর এই টানাপোড়েন শুরু হয়েছে বাংলা উপন্যাসের প্রথমকাল থেকে।

কিন্তু অন্য সমস্ত সাহিত্যিক রচনার থেকে আখ্যানবর্ণনার যেখানে মূল স্বাতন্ত্র্য তা অবশ্যই প্রতিবেদন বাক্যে। চরিত্রের চিন্তা এবং চরিত্রের অভিজ্ঞতাকে যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় সেই...ভাষাই..আখ্যানের..প্রধান...অংশ। উপন্যাস যতই কাহিনির কালানুক্রমিক বিবরণকে অতিক্রম করে চরিত্র ও কাহিনির টানাপোড়েনকে তার মূল বিষয় করতে চেয়েছে ততই প্রয়োজন হয়েছে প্রতিবেদন বাক্যের। তাই একেই বলব আখ্যান বর্ণনার মৌলিক রহস্য।

কথোপকথনের নানা মাত্রা

শেফালী মৈত্র

কথোপকথন এক ধরনের কমিউনিকেশন বা পারস্পরিক ভাব-বিনিময় যা মূলত ভাষানির্ভর। কথোপকথন সামনাসামনি বসে চলতে পারে, আবার কোনো-না-কোনো যন্ত্রের মাধ্যমেও তা সম্ভব। ভাষা তার প্রধান মাধ্যম হলেও তার আরও অনেক অনুষঙ্গ থাকতে পারে। যেমন দেহভঙ্গিমায়, ঠারে-ঠোরে এবং সংলাপের অন্তর্নিহিত মৌন অবসরেও ভাব-বিনিময় হয়। যান্ত্রিক, নিষ্প্রাণ, অনুষঙ্গ-অনপেক্ষ কথোপকথন এগোয় না, অ্যাবস্ট্র্যাক্ট বা বিমূর্ত আলাপন সম্ভবপর নয়। কথোপকথনে যে বক্তব্য সঞ্চারিত হচ্ছে তার তাৎপর্য, তার দ্যোতনা, তার অভিঘাত, ইত্যাদি অনুধাবন করতে হলে কথোপকথনের প্রেক্ষাপটটি ভালো করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

একই কথাটি কে বলছে, কাকে বলছে এবং কখন বলছে ভেদে ভিন্ন মানে পরিবেশন করতে পারে। 'মারব কিন্তু'— এই কথাটি একটি শিশু বললে যে দ্যোতনা পাই, শিশুটির বাবা একই কথা উচ্চারণ করলে তা পাই না। শিশু এবং তার বাবার ক্ষমতার তারতম্য তাদের উচ্চারণের অভিঘাতে প্রতিফলিত হয়। কোনো উচ্চারণের তাৎপর্য বিচারের সময় তা কখন বলা হচ্ছে তাও জানা জরুরি। খেলতে খেলতে 'মারব কিন্তু' বলাটা একটি শিশুর পক্ষে যতটা স্বাভাবিক, চকলেট উপহার পেয়ে একই উচ্চারণ করা ততটা স্বাভাবিক নয়। বক্তার এবং কালের মতো উদ্দিষ্ট জনকেও জেনে নিতে হবে। কোনো শিশু তার ঠাকুরমাকে 'মারব কিন্তু' বললে হয়তো মমতার সঙ্গে গ্রহণ করা হবে, কিন্তু নার্সারি স্কুলের দিদিমণিকে একই কথা বললে ফল নির্মম হওয়ার আশঙ্কা আছে।

কথোপকথনের ঢঙে ব্যবহৃত ভাষা সব সময় অপরের কাছে ভাব পৌঁছোনোর জন্য করা হয় না, স্বগতোক্তি যেমন শ্রবণের জন্য নয়, তেমনি কখনো কখনো কারও উদ্দেশে বাক্য নিক্ষিপ্ত হয় অথচ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তা শুনবে এবং শুনে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে আশা করা হয় না। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হল নিজের কথাটাকে জনসমক্ষে ব্যক্ত করা, যাকে বলা হচ্ছে সে যদি নাও শুনতে চায় আরও দশজন যেন জানতে পারে যে তাকে কী বলা হয়েছে। যেমন এই বছর বাগদাদে আমেরিকান সৈন্য পৌঁছে যাওয়ার পরেও যখন কলকাতার রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল বেরুল তখন নিশ্চয় আমেরিকান প্রশাসনকে লক্ষ্য করে প্রতিবাদ করলেও তাদের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া আশা করা হয়নি, চাপ তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। অনেক সময় বক্তা আর শ্রোতার সম্পর্কের

এমনই হয় যে একজন কথা বললেই আর-একজন তৎকালে কর্ণপাতে বিরত থাকে। দীর্ঘদিনের পরিচয়ে সাধারণত এমন শিবির ভাগ হয়ে যায়।

সার্থক কথোপকথনের জন্য শ্রোতার সক্রিয় ভূমিকা অনস্বীকার্য। এক তরফা বলে গেলে তা হবে অপূর্ণ কথোপকথন, যেমন স্বগতোক্তির ক্ষেত্রে ঘটে অথবা নিষ্ফল প্রতিবাদের মতন বিপন্ন কথোপকথনেরও একই পরিণাম। যখন একই কথা বারবার বলা হয়, একই সুরে বলা হয়, তখন আর ভাষার শরীরে সজীবতা থাকে না, রেল স্টেশনের ঘোষণার মতো, পৌনঃপুনিক উচ্চারণের ফলে বাক্যগুলি অনেক দুর্বল হয়ে যায়। অবশ্য পৌনঃপুনিকতাটাই দুর্বলতার একমাত্র কারণ নয়, বক্তব্য দুর্বল হওয়া বা না-হওয়া অনেকাংশে বক্তা ও শ্রোতার মানসিকতা, প্রয়োজন ও সামাজিক অবস্থার ওপরও নির্ভর করে। খুব ছোটো শিশু যেমন একই রূপকথা বারবার শুনতে চায়, একই মন্তব্য অহরহ শোনার ফলে মনের মধ্যে একটা সংস্কারও জন্মে যেতে পারে। তখন উচ্চারণের বৈধতা নিয়ে আর প্রশ্ন জাগে না। যেমন একটি বাঙালি মেয়েকে যখন কেবলি বলা হয় 'তুমি কালো তাই তোমাকে কোনো রং মানায় না', তখন তার মনে এই বিশ্বাস ক্রমশ দৃঢ় হতে থাকে যে কথাটা সত্যি। আফ্রিকার মেয়েরা সানন্দে রঙিন পোশাক পরে কারণ তাদের এমন কথা বলা হয় না।

পরস্পরের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় জানলে কথোপকথন নিবিড় হয়। পরিচয়ের অংশ হিসেবে বক্তা ও শ্রোতার ঐতিহাসিক অবস্থান, সামাজিক অবস্থান ও লিঙ্গ-পরিচয় সবই জানা জরুরি, এই সঙ্গে ভাষা সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। ভাষার সাহায্য নিয়ে মনের ভাব স্পষ্ট করা যায় আবার ভাষাই পারে মনের ভাব লুকোনোর কৌশল জোগাতে, ভাষা সরস হতে পারে আবার নীরসও হতে পারে, ভাষা ঋজু ও স্পষ্ট হতে পারে অথবা প্রহেলিকাময় হতে পারে। ভাষা দিয়ে এত কিছু করা যায় বলেই সম্ভবত মানুষ কথা বলতে এত ভালোবাসে। নিপুণভাবে ভাষা ব্যবহার করতে পারার মধ্যে তৃপ্তি ও শ্লাঘা দুই-ই আছে। ভাষার ওপর যাদের দখল কম বা ভাষা ব্যবহারে যাদের মুন্সিয়ানা নেই এবং শব্দভান্ডার যাদের সীমিত তাদের প্রতি ভাষা-কুশলীদের একটা অনুকম্পা অথবা তাচ্ছিল্য প্রকাশের প্রবণতা দেখা যায়। মহিলা, শিশু এবং অন্যান্য প্রান্তিক সমাজের সদস্যদের প্রতি এমন করুণা বা তাচ্ছিল্য প্রায়শ দেখা যায়। জাত্যাভিমানের মতো ভাষা নিয়েও বিভিন্ন ভাষা-ভাষী লোকেদের মধ্যে তুল্যমূল্য বিচার করা হয়ে থাকে।

অনেকে মনে করে পুরুষালি ভাষা ও মেয়েলি ভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে। এটা শুধু পুরাকালের কথা নয় যখন কালিদাসের দুষ্মন্ত সংস্কৃতে কথা বলত আর শকুন্তলা ব্যবহার করত অনার্য প্রাকৃত ভাষা। মার্কিন মুলুকে একটি সাম্প্রতিক গবেষণায়ও এই সিদ্ধান্তের অভিন্নতা লক্ষণীয়। গবেষকরা মনে করেছেন ছেলেদের ভাষা ও মেয়েদের ভাষা এক নয়। বলা হয়েছে যে ছেলেরা ভাষা ব্যবহার করে তথ্য পরিবেশনের জন্য, আর মেয়েরা

ভাষাকে পারস্পরিক সম্বন্ধের একটি সেতুরূপে দেখে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ভাষা নিছক তথ্য-বাহক নয়, সংবেদনাত্মকও বটে। তারা তথ্যকে নিছক তথ্য-রূপে পেশ না করে মনের মাধুরী মিশিয়ে পরিবেশন করে। ছেলেরা যদি বলে 'ইঁদুরটা বড়ো ছিল' মেয়েরা বলবে 'ইস, কত বড়ো ইঁদুর ছিল'। দ্বিতীয় উক্তিটিতে বিস্ময় ও ভয়ের ব্যঞ্জনার সঙ্গে তথ্য-পরিবেশন করা হচ্ছে। মেয়েলি কথা বলার এই ভঙ্গিটিকে বলা হয়েছে 'র‍্যাপো টক' বা সম্পর্ক স্থাপনকারী বাচনভঙ্গি। এ ক্ষেত্রে বক্তা তার বক্তব্যের সঙ্গে সংলিপ্ত হয়ে থাকে এবং সে তার শ্রোতাকেও তার সংবেদনের অংশীদার করতে চেষ্টা করে। এইভাবে কথা বলাটা কখনোই রিপোর্ট-এর মতো নৈর্ব্যক্তিক ও নিছক বিষয়নিষ্ঠ নয়।

ভাষার রূপ, তার বৈশিষ্ট্য, তার সম্ভাবনা এবং তার সীমাবদ্ধতা নিয়ে অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে। এই তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে পরিশীলিত হয়েছে তর্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ, শব্দার্থতত্ত্ব, 'সিন্ট্যাক্স' বা পদবিন্যাসতত্ত্ব এবং 'প্র্যাগম্যাটিক্স' বা ভাষার প্রয়োগতত্ত্ব। লক্ষ করলে দেখা যাবে নারীবাদী ভাষা-তাত্ত্বিকদের লেখা বাদ দিলে, ভাষা-দার্শনিকরা যে তত্ত্ব রচনা করেছেন তার মধ্যে ভাষার রাজনীতি এবং ভাষার লিঙ্গ -পক্ষপাতিত্বের কোনো উল্লেখ নেই।

এই তাত্ত্বিকরা দাবি করেন যে তত্ত্ব ভর করে আছে ভাষার বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক রূপের ওপর, তাঁদের মতে ভাষার নিজের কোনো পক্ষপাত নেই। পক্ষপাত উৎপন্ন হয় কোনো একটি পক্ষের প্রতি অনুরাগ থেকে, ভাষার অনুরাগও নেই, বিরাগও নেই ভাষা একটি নিরপেক্ষ ভাব পরিবহনের মাধ্যম মাত্র। যারা ভাষা ব্যবহার করে তাদের মধ্যে পক্ষপাত থাকতে পারে, বক্তা বা শ্রোতা একদেশদর্শী হতে পারে। ভাষা যে সমাজে ব্যবহার হয় সেখানে বিবিধ বৈষম্য থাকতে পারে এবং সেখান থেকে ভাষা সংক্রমিত হতে পারে।

তাত্ত্বিকদের মতে ভাষার প্রকৃত কাজ হল জগতের প্রতিরূপ বা রিপ্রেজেন্টেশন তুলে ধরা। সেই জগৎ বাহ্যজগৎ হতে পারে, মনোজগৎ হতে পারে, চিন্তনের জগৎ হতে পারে অথবা ভাবের জগৎ কিংবা আদর্শের জগৎ হতে পারে। মনে করা হয় যে বিদ্যুতের তারের মতো ভাষা, জগৎ ও চিন্তনের মধ্যে একটি 'সার্কিট' বা পরিবহন মাধ্যম স্থাপন করে। ভাষাই পারে অভিজ্ঞতা ও মননের মধ্যে সেতু রচনা করতে। একইভাবে ভাষা আদর্শের ধারণার সঙ্গে আদেশ, পরামর্শ, অনুজ্ঞাকেও যুক্ত করে। অভিজ্ঞতার একটি মাধ্যমের সঙ্গে আর-একটি মাধ্যমকে যুক্ত করে। এই ব্যাপারে ভাষা যত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হবে প্রতিরূপের চিত্রটি ততই মূলানুগ হবে। মূলানুগ চিত্র পরিবেশনের মাধ্যমে ভাষা হবে নৈর্ব্যক্তিক, বিষয়-নিষ্ঠ এবং সত্যাশ্রয়ী। এই ব্যাখ্যা অনুসারে ভাষা একটি সাধনমাত্র যা আর পাঁচটি টুল বা সাধনের মতো পক্ষপাত রহিত। ভাষা নিজে সান্ত্বনা দেয় না, আঘাত করে না, ভয় দেখায় না, এ বড়ো অদ্ভুত কথা। একটি সাধন বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয় অথচ কোনো সময়, কোনো প্রয়োজনে বা উদ্দেশ্যে তা নির্মিত হয়নি এমন তো নয়। ভাষার ইতিহাস-অনক্ষেপ রূপটি তার স্বাভাবিক রূপ নয়, এটা

তার 'আর্টিফিশিয়াল' বা নির্মিত রূপ। ইতিহাস অজন্য স্বরূপ ভাষায় কতটা আনা যাবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

কথোপকথনে একটি পদের দ্যোতনা অপরাপর অনেক পদের দ্যোতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাৎপর্যের একটি ঠাস-বুনট তৈরি করে। দ্যোতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে আমাদের ইতিহাস-চেতনা, বিজ্ঞান-চেতনা এবং লিঙ্গ-চেতনা। অর্থাৎ পুরুষালি গুণ বলতে কী বোঝায়, মেয়েলি গুণ বলতেই বা কী বোঝায় আর তাদের আদর্শ আচরণ কোনগুলি, ইত্যাদি ধারণাও তাদের তাৎপর্যব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন বিষয়কে কীভাবে বুঝি তা ধরা পড়ে আমাদের ভাষাব্যবহারে। উল্টোদিকে আবার ভাষার বিশেষ বিশেষ ব্যবহারের দরুন ধারণার আদল তৈরি হয়। যদিও কোনো পদের তাৎপর্য ধ্রুব নয় তবু একটি তাৎপর্যের বহুল স্বীকৃতির ফলে তা স্বাভাবিক এবং চিরন্তন মনে হয়। এর ফলে অনেক 'প্রেজুডিস' বা বিরূপতা আমাদের ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। এই ব্যবহারগুলি নিয়ে আমরা আর প্রশ্ন তুলি না কারণ এগুলিকে সঙ্গত মনে করি। যেমন অনেক ভাষায় 'কালো' পদটি কদর্থে ব্যবহার করা হয় অথচ এই ব্যবহার কতটা সঙ্গত তা নিয়ে আর কেউ প্রশ্ন তোলে না। ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষায় ব্যবহার হয় ব্ল্যাক ডে/কালা দিবস, ব্ল্যাক মার্কেট/কালো বাজার, ব্ল্যাক মানি/কালো টাকা, ইত্যাদি। কিছু ক্ষেত্রে মূল ইংরেজি পদটা বাংলায় চলে এসেছে যেমন ব্ল্যাক মেল। এই সমস্ত পদ ভাষান্তরের মধ্যে দিয়েই আসুক বা অন্যভাবে অনুপ্রবেশ করে আসুক এগুলি যে বর্ণ-বিদ্বেষ-প্রসূত তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। অনুরূপভাবে লিঙ্গভাবনালাঞ্ছিত অনেক পদও ভাষায় স্থান পেয়েছে, এই সংযোজনগুলির কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই।

নারীবাদীরা মোটামুটি ১৯৭০ সাল থেকে মনে করতে আরম্ভ করলেন যে ভাষাকে লিঙ্গ-বৈষম্য প্রকাশকারী উচ্চারণ থেকে মুক্ত করতে হবে। পাশ্চাত্যের নারীবাদীরা এক দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করে দেখাতে চাইলেন ভাষা কতরকমভাবে লিঙ্গ-বৈষম্যকে কায়েম রাখে। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত অনেক নির্দেশ আমাদের জানা, যেমন 'চেয়ারম্যান'—'হিজস্টোরি'র মতো পদ। সুপারিশ হল 'চেয়ারম্যান'-এর পরিবর্তে লিঙ্গ-অনপেক্ষ 'চেয়ারপারসন' পদটি ব্যবহার করার, আর 'হিজস্টোরি'-র পাশাপাশি 'হারস্টোরি' ব্যবহার করার। মনে করা হল যেহেতু ভাষা ও চিন্তন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত সেহেতু ভাষা বদল করলে চিন্তনও বদল হবে। কার্যত দেখা যাচ্ছে তা হয়নি। চিন্তন তো বদল হয়ইনি, একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে চেয়ারপারসন শব্দটি আমদানি করে ভাষাও লিঙ্গ-অনপেক্ষ হয়নি, যেমন হয়নি 'হারস্টোরি'-র মতো নতুন শব্দ সৃষ্টি করে। অধুনা 'চেয়ারপারসন' একমাত্র মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়, পুরুষদের এখনও 'চেয়ারম্যান' বলা হয়। ফলে 'চেয়ারপারসন' পদটি লিঙ্গ-সূচক হয়ে থেকে গেল, 'হারস্টোরি'ও তাই। ইতিহাসের বড়ো মাপের ঘটনাগুলি এখনও 'হিজস্টোরি', পাশাপাশি কিছু মেয়েলি উপকথা, ব্রতকথা, ছড়া, ইত্যাদি 'হারস্টোরি' রূপে গ্রাহ্য হলেও হতে পারে। চোখে

আঙুল দিয়ে লিঙ্গ-বৈষম্য সূচক ব্যবহারগুলি ধরিয়ে দিয়ে তা সংস্কার করার পরেও আমরা সেই শুরুর জায়গায় পিছলে ফিরে যাই।

ভাষায় যে শুধু লিঙ্গ-বৈষম্যসূচক পদ ব্যবহার করা হয় তা নয়। প্রায়শ দেখা যায় যে লিঙ্গ-পরিচয় আর যৌন-পরিচয়কে এক করে দেখা হচ্ছে যদিও প্রথম পদটি সৃজিত ধর্মের সূচক। যেমন মেয়েদের পরনিন্দা পরচর্চায় রুচি থাকা আর ছেলেদের শেয়ার মার্কেটের আলোচনায় আগ্রহ থাকা, এগুলি লিঙ্গ-সূচক ধর্ম, প্রতিতুলনায় যৌন ধর্মগুলি জৈবিক অভিব্যক্তির দ্যোতক। ইলেকট্রিকের দোকানে 'দুটো তার জোড়ার জন্য প্লাগ আর সকেট চাই' বললে যত সহজে বোঝানো যাবে 'দুটো তারের সঙ্গে মেল ফিমেল চাই' বললে চাহিদাটা আরও সহজে বোঝানো যাবে। জানলায় নেটলন লাগানোর জন্য ভেলক্রো কিনতে গেলে দোকানদার পরামর্শ দেবেন 'ভেলক্রোর ফিমেলটা জানলায় লাগাবেন আর মেলটা নেটলনে লাগাবেন।' যে কোনো যন্ত্রাংশে একটা নিটোল গোল উঁচু জায়গাকে নিপল বলে চিহ্নিত করার রেওয়াজ আছে। এইগুলি ভাষার লবজ হয়ে গেছে। যে কারিগর এই ভাষা ব্যবহার করে সে ইংরেজি নাও জানতে পারে। মনে মনে প্রশ্ন জাগে ভাষায় লিঙ্গ পরিচয়কে যৌন পরিচয়ে পর্যবসিত করার কারণ কী? এর কারণ কি আমাদের ভাষার পটভূমিকা পিতৃতান্ত্রিক বলে?

একটু তলিয়ে ভাবলে কারণটা তাই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের মূলে হল প্রজননভিত্তিক যৌন সম্পর্ক। ফলে নারী ও পুরুষকে চিহ্নিত করা হয় যৌনাঙ্গ দিয়ে, এরই প্রতিফলন দেখি ইলেকট্রিকের দোকানে চলতি ভাষায়। ভাষায় লিঙ্গ-সাম্য আনতে গেলে একমাত্র ভাষার পরিবর্তন ঘটালে চলবে না। এমনিতে শব্দকোষে মেল ফিমেল শব্দ-দ্বয় থাকাটা জরুরি কিন্তু শব্দগুলি কীভাবে প্রয়োগ করা হবে তা একমাত্র ব্যাকরণের নিয়ম দিয়ে ঠিক করা যায় না। ভাষায় বিচ্ছিন্নভাবে বদল আনা যায় না, ভাষার সঙ্গে অনুস্যূত হয়ে থাকে ভাষা ব্যবহারকারীর বিশ্বাসের পরিমণ্ডল ও ক্রিয়াকলাপ। ভাষার তাৎপর্য ব্যাখ্যা, বিশ্বাসের পরিমণ্ডল ও প্রায়োগিক চর্যা এই তিনটি স্বতন্ত্র কোটি বা স্তর নয়, এরা একে অপরের সঙ্গে সংবদ্ধ, তিনটি একত্রে একটি অখণ্ড পরিমণ্ডল তৈরি করে। এর ফলে বিশ্বাসের পরিমণ্ডলে ও প্রায়োগিক স্তরে পরিবর্তন না এনে ভাষার তাৎপর্য ব্যাখ্যায় এককভাবে পরিবর্তন আনার চেষ্টা বৃথা। 'চেয়ারম্যান' থেকে 'চেয়ারপারসন' এইরকম একটা অসম্পর্কিত পরিবর্তনের চেষ্টা ছিল।

নারীবাদের প্রথম পর্বে কেবল সামাজিক অনৈক্য নিয়ে প্রতিবাদ করা হয়েছিল, সে প্রতিবাদ এখনও অব্যাহত আছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রতিবাদের আর একটা মাত্রা, এবারে বিশ্বাসের জগৎ ও ধারণার জগৎকেও লিঙ্গ-অনৈক্যের জন্য দায়ী করা হল। মনে করা হল শুধু বাহ্যিক বদল আনাটা যথেষ্ট নয়, চর্যার পরিবর্তনের সঙ্গে ভাষার তাৎপর্য-ব্যাখ্যার এবং দর্শনেও পরিবর্তন আনতে হবে; আমাদের একটা পুরুষতান্ত্রিক 'ইন্টারপ্রিটেশনাল বায়াস' বা তাৎপর্য-ব্যাখ্যার একপেশে ভাব রয়েছে যা আমাদের ভাষায় ও কথোপকথনে প্রতিফলিত হয়।

একমাত্র পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটলেই কি ভাষা লিঙ্গ-বৈষম্য থেকে মুক্ত হবে? এ কথা ঠিক যে একমাত্র ভাষা-বিপ্লবের মাধ্যমে লিঙ্গ-সাম্য আসবে না তবে এটাও ঠিক যে ভাষাকে বাদ দিয়েও পরিবর্তন আসবে না। ভাষাগত পরিবর্তন মানে যদি 'সিনট্যাক্স' বা পদবিন্যাসের বদল বোঝায় তাহলে হয়তো তেমন কোনো মেয়েলি অভিজ্ঞতা থেকে উঠে-আসা বাক্য গঠনের বিধির কথা ভাবা যায় না। আবার বাক্য-গঠনের পদবিন্যাস বিধি থাকাটাই দোষের মনে করে 'সিনট্যাক্স' বাতিল করলেও চলবে না। সিনট্যাক্সকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করলে কথোপকথন প্রলাপে পর্যবসিত হবে। তবে কি শব্দবিন্যাস নয়, শব্দকোষের দিকে নজর দিতে হবে, শব্দভাণ্ডার বাড়াতে হবে? অনেকে মনে করেছে যে মেয়েরা যে শব্দ বেশি প্রয়োগ করে তার সঙ্গে তাদের লিঙ্গ-পরিচয়ের সবিশেষ সম্বন্ধ নেই। মেয়েলি ভাষা বলে যে প্রয়োগ সিদ্ধ তা প্রধানত তাদের ক্ষমতার প্রান্তিক অবস্থানে থাকার কারণে প্রচলিত হয়েছে, মেয়েলিপনার জন্য নয়।

ভাষায় লিঙ্গ-সাম্য আনতে হলে মেয়েদের সিম্যান্টিক অথরিটি পেতে হবে অর্থাৎ তাৎপর্য প্রণয়নে তাদের কর্তৃত্ব অর্জন করতে হবে। পিতৃতন্ত্রে ভাষা প্রয়োগ ও তাৎপর্য-ব্যাখ্যার মধ্যে রয়েছে একটি প্রতীক-কেন্দ্রিক আঁতাত, যাকে ঘিরে থাকে ক্ষমতার বিশেষ বিন্যাস। বর্তমানে সব কথোপকথন চলে সেই বিন্যস্ত ক্ষমতার মধ্যে। অর্থান্তর রচনার মধ্যে দিয়ে এই আঁতাত ভাঙা যায়, সিম্যান্টিক-অথরিটি অর্থান্তর রূপায়ণের অধিকার দেয়। এই অধিকার পেয়ে গেলেই যে লিঙ্গ-সাম্য এসে যাবে তা নয়, এটা পরিবর্তনের আবশ্যিক শর্ত, পর্যাপ্ত শর্ত নয়।

সম্প্রতি *জলপ্রপাত সাহিত্য* থেকে প্রকাশিত হল একটি বিশেষ সংখ্যা 'আমার বালিকা বেলা'। এই সংখ্যায় প্রখ্যাত লেখিকারা তাঁদের নিজেদের বাল্যাবস্থার কথা লিখেছেন। মনে পড়ে কিছুদিন আগে তসলিমা নাসরিন তাঁর বাল্যকালকে চিহ্নিত করেছেন 'মেয়েবেলা' বলে। সত্যিই তো আমাদের সমাজে শিশু কন্যা ও শিশুপুত্রের অভিজ্ঞতা এক নয়। তাই ছেলেবেলা থেকে পৃথক করার জন্য 'মেয়েবেলা', 'বালিকাবেলা' জাতীয় উচ্চারণ জরুরি হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও উচ্চারণের এই বদলগুলির বিশেষ দ্যোতনা, বিশ্বাসের প্রেক্ষাপট, কর্মের অনুষঙ্গ এবং তাদের ঐতিহাসিক কার্যকারণ সূত্র জনমানসে দাগ কাটছে না। মেয়েরা সিম্যান্টিক অথরশিপ পাচ্ছে না। তসলিমার ভাষা সৃষ্টির কৃতিত্ব বা শব্দার্থ রচনার কর্তৃত্ব অস্বীকৃত হবার কারণ হিসেবে বলা হয় যে তিনি বা তাঁর মতো অন্য লেখিকারা, যথেষ্ট সার্বজনীন বা তন্নিষ্ঠভাবে ভাষা ব্যবহার করেন না। তাঁরা যে ভাষার কথা বলেন তা তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা, একান্ত ব্যক্তিগত ঢঙে বলা যা কবি প্রয়োগ বা আর্ষ প্রয়োগের সঙ্গে তুলনীয়।

জনমানসে রেখাপাত করতে হলে, বা বিকল্প স্বর হিসেবে বিবেচিত হতে গেলে ব্যক্তি-চেতনার ওপরে উঠে সকলের হয়ে কথা বলতে হবে। যে কোনো প্রান্তিক অবস্থাকে ভাষায় প্রকাশ করার এটাই সমস্যা, নিজের মতো করে বললে সেই কথাটা হয় ব্যতিক্রমী

ও গুরুত্বহীন। গুরুত্ব পেতে গেলে তথাকথিত নৈর্ব্যক্তিক মূলধারার ভাষার আশ্রয় নিতে হয় কিন্তু তখন আর নিজেদের কথা বলা হয় না, সেটা হয়ে যায় একটা নিষ্প্রাণ রিপোর্ট যার মধ্যে থেকে জ্বালা-যন্ত্রণা, আনন্দ-বিষাদ ও সর্বোপরি বৈষম্যের দ্যোতনা সবই বাদ পড়ে যায়, ফলে 'সিম্যান্টিক অথরশিপ' পেতে গেলে নিজের কথা আর বলা হয় না, 'র‍্যাপো টক'-ও হয় না। এ এক ধরনের উভয় সঙ্কট। লিঙ্গ-সাম্য আনার উদ্দেশ্যে সিনট্যাক্স বা বাক্যান্বয় উপেক্ষিত হলে তা প্রলাপে পরিণত হয় আর সিম্যান্টিক্স বা শব্দের তাৎপর্যকে চ্যালেঞ্জ করলে প্রচলিত কথোপকথনে বিপর্যয় ঘটে। বক্তার অবস্থা তখন রবীন্দ্রনাথের নাতনি পুপে-দিদির সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে, যার কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'অনেক কথা যাও যে ব'লে কোনো কথা না বলি/তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।' এই হল সমস্যা, নিজের কথা বললে লোকে বোঝে না আর লোকে যা বোঝে তা নিজের কথা নয়।

বিকল্প স্বরে কথা বললে তা যদি কেউ গ্রহণ না করে তবে তার কারণ কিন্তু অবহেলা নয় অন্তত প্রত্যক্ষভাবে তা নয়। যে ভাবনার ছকে আমরা অভ্যস্ত তার বাইরে যেতে আমাদের অসুবিধে হয়। পিতৃতন্ত্রের ভাবনার পরিমণ্ডল এমনই সকলকে আচ্ছন্ন করে রাখে যে তার প্রেক্ষিতটাই মনে হয় সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। অন্যান্য বিকল্পগুলি হয়ে যায় তখন গ্রহণের অযোগ্য। পিতৃতন্ত্রের পরিবেশে মানুষ হলে তাৎপর্য-ব্যাখ্যা, বিশ্বাস এবং প্রয়োগও সেই মতো গড়ে ওঠে। এরপরে এই প্রেক্ষিতের সপক্ষে যেন নিজের ভেতর থেকে সাড়া পাওয়া যায়, আমরা যেখানেই যাই আর যাই ভাবি বা করি তা ওই পরিমণ্ডলের চৌহদ্দির মধ্যেই থাকে, বেরুনোর জন্য চেষ্টা করলেও যেন ফিরে ফিরে ওইখানেই আসি।

অনেকে মনে করে যে মেয়েদের যদি শব্দার্থ নির্মাণে কর্তৃত্ব পেতে হয় তাহলে এমন মরমী শ্রোতা পেতে হবে যে তাদের অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দেবে। কারণ এই কর্তৃত্ব অর্জনের কৃতিত্ব ব্যক্তির প্রত্যয়ের ফসল নয়, এই কর্তৃত্ব ভর করে আছে 'স্বীকৃত গ্রহণ'-এর ওপর ('স্বীকৃত গ্রহণ'-এর ব্যবহার প্রথম পেয়েছি কালিদাস ভট্টাচার্যের লেখা 'অনেকান্ত বেদান্ত' গ্রন্থে)।

স্বীকৃত গ্রহণ বা অস্বীকৃত গ্রহণ প্রসঙ্গ ওঠার আগে নিজের স্বর খুঁজে পাওয়া চাই। নিজের স্বরের উপস্থাপনা কোনো স্বয়ম্ভু ঘটনা নয়। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, আদান-প্রদান, চাপান-উতোর-এর ভেতর দিয়ে নিজের স্বর গড়ে ওঠে। এই কাজে আর যারা সচেতনভাবে নিজের স্বর সৃজনের চেষ্টা করছে তাদের সাহায্য প্রয়োজন হয়। তার সঙ্গে অতীতের যে সব নির্ভীক উচ্চারণ করা হয়েছে তা স্মরণ করে দিকনির্দেশ পাওয়া যেতে পারে, এই অদৃশ্য, অশ্রুত, প্রান্তিক অবস্থান থেকে শ্রুত এবং দৃশ্য অবস্থানে আসা যেতে পারে, তাতে অক্ষমতা থেকে ক্ষমতার দিকে কিছুটা অগ্রসর হওয়া যায়। সেই দিক থেকে নিজের স্বর ব্যক্ত করাটা একটা রাজনৈতিক পদক্ষেপ। এই প্রক্রিয়ায় নৈর্ব্যক্তিক

সাধারণীকরণের চাপে হারিয়ে না গিয়ে নিজের এবং নিজের মতো ভুক্তভোগীদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়।

প্রান্তিক অবস্থান-হেতু কারোর স্বর গ্রহণযোগ্য বা ন্যায্য হবে তা নয়। কেন্দ্র বা প্রান্ত সকলেরই বক্তব্য বিচারযোগ্য, মূল্যায়ন না করে কোনো বক্তব্যই গ্রহণ করা যায় না। প্রান্তবাসীরা যেহেতু ক্ষমতা থেকে দূরে অবস্থিত এবং তারা নির্বল তাই আশা করা যায় যে ক্ষমতাবানের কৌশলগুলি তারা সহজে চিহ্নিত করতে পারবে। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য কীভাবে দ্বিচারিতার সাহায্য নেওয়া হয়, কোন প্রক্রিয়ায় প্রতিবাদী স্বর রুদ্ধ করা হয় বা রুদ্ধ করার পরিকল্পনা করা হয় তা হয়তো প্রান্তিক প্রেক্ষিত থেকে চেনা আরও সহজ। কারণ যে নিজে ক্ষমতার আস্ফালনে লিপ্ত সে হয়তো ভাবের ঘরে চুরিও করে। যাঁরা সারস্বত সমাজে একটা বিশেষ আসন দখল করে আছেন তাঁরা নিজের শব্দের তাৎপর্য-ব্যাখ্যা, বিশ্বাস ও প্রয়োগের মিলিত পরিমণ্ডলটি চিনতে পারেন না, অন্তত প্রান্তবাসিনীটি যেভাবে চেনে এঁরা সেভাবে চেনেন না। প্রান্তিক সমাজে যারা আছে তারা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত, সকলের সমস্যাও এক নয়, ফলে প্রান্তিক সমাজ বলে কোনো সমরূপী সমাজ নেই, এই সমাজের কোনো একটি স্বরও নেই।

কথোপকথনে অভিজ্ঞতার এই বৈচিত্র মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। কথোপকথনের উদ্দেশ্য সব সময় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা ঐকমত্যে পৌঁছোনো নয়। সমস্যা যেখানে পৃথক পৃথক সমাধানের পদ্ধতিও বিবিধ হবে, সেক্ষেত্রে সকলকে একসুরে কথা বলাতে গেলেই কর্তৃত্ব ফলাতে হবে, পিতৃতন্ত্রে যেভাবে জোর খাটানো হয়ে থাকে। মেয়েদের সিম্যান্টিক অথরিটির ক্ষেত্রেও মেয়েদের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যকে তাদের সম্মান দিতে হবে। অথরিটি বা কর্তৃত্ব বলতেই বুঝি সকলের ওপর ছড়ি ঘোরানোর অধিকার 'সিম্যান্টিক অথরিটি', যেন ব্যক্তি নিজস্ব তাৎপর্য ব্যাখ্যা-কে সকলের ওপর চাপানোর এক্তিয়ার। মেয়েদের প্রত্যাশিত 'সিম্যান্টিক অথরিটি' কিন্তু ভিন্ন। উপযুক্ত শব্দের অভাবে 'অথরিটি', 'কর্তৃত্ব', ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করতে হলেও এখানে বিশেষ এক ধরনের অধিকার বা এক্তিয়ারের কথা বলা হচ্ছে। অন্যের ওপর কিছু চাপানোর এক্তিয়ার নয়, নিজের কথা নিজের মতো করে বলার অধিকার এবং সেই মতো অপরের কাছে গ্রাহ্য হওয়ার এক্তিয়ার, তাদের দাবি হল মেয়েদের বিশ্বাসের জগৎ ও তদনুস্যূত প্রয়োগ স্বীকৃত গ্রহণ যেন পায়।

বারবার নিজের স্বর খোঁজার, নিজের স্বর সৃজনের কথা উঠছে কেন? মেয়েরা তো কেউই নির্বাক অথবা নির্ভাষ নয়। সমস্যা হল পিতৃতন্ত্রে যে স্বরে কথা বলা হয় তার বিশেষ একটা আদল আছে। 'রিপোর্ট টক' বা তথ্য-জ্ঞাপক কথোপকথনের জন্য তা উপযুক্ত। মানুষের অভিজ্ঞতার গভীরতা ও তার বিস্তারের সবটা এই আদলে ধরতে গেলে তা সঙ্কুচিত হয়, অভিজ্ঞতার রস ও মাধুরী, ব্যথা বেদনা হয়ে খণ্ডিতভাবে ধরা পড়ে, নতুবা আদৌ ধরা পড়ে না। প্রচলিত কথোপকথনের একটা ঝোঁক আছে ঠিক/ভুল,

ভালো/মন্দ, সুন্দর/অসুন্দরের খুব মোটা দাগে বিচার করার, যার ফলে এই কথোপকথনে 'ওভারল্যাপ' বা অধিক্রমণগুলি নজর এড়িয়ে যায়। এই কারণে এই কথোপকথনে বিকল্প প্রেক্ষিতের সূক্ষ্মতা ব্যতিক্রমগুলিতে গ্রাহ্য হয় না। এর দরুন স্বীকৃত গ্রহণ প্রতিহত হয়। এই ভিন্ন স্বর, ভিন্ন অভিজ্ঞতাকে মর্যাদার আসনে বসানোর প্রক্রিয়া স্থির করাটা একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ।

অপরিচিত স্বর, অপরিচিত বাণী শুনলে প্রথমেই প্রবণতা জাগে নিজের বিশ্বাসের ছাঁচে তাকে ঢেলে সাজাতে। এটা না পারলে বিকল্প স্বরটি ভয়ের উদ্রেক করতে পারে, বা ঘৃণা জাগাতে পারে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিকল্প স্বরটি এলেবেলে মনে হয়। অচেনা স্বরের প্রতি মায়া, মমতা, ভালোবাসা, সমাদর কদাচিত থাকে। বিদ্বেষ ও অবজ্ঞাটাই বেশি চোখে পড়ে, অনেকেই পরামর্শ দেন বিদ্বেষের স্বরাঘাত কানে না তুলতে। প্রায় শোনা যায় যে কান বন্ধ রাখলে বা কথাগুলিকে মূল্য না দিলে সে কথা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তা আর লজ্জা দিতে পারে না। সাধারণভাবে বলা হয় যে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় সবই এক একটি প্রতিক্রিয়া, ইচ্ছা করলেই এগুলিকে সংবরণ করা যায় এবং এই সংবরণের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শ্রোতার মধ্যে প্রতিক্রিয়া না হলে ধরে নেওয়া হয় যে নিক্ষিপ্ত উচ্চারণটি ক্রিয়াশীল হয়নি। তা নিছক উচ্চারণের স্তরে থেকে গেছে। এইভাবে বাচনিক ক্রিয়াকে নিষ্ক্রিয় করে নিছক বচন বা উচ্চারণে রূপান্তরিত করতে পারলে পুনরায় সেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যে ভাষা নৈর্ব্যক্তিক তার বাচনিক ক্রিয়ার সবটাই নির্ভর করে বাহ্যিক অবলম্বনের ওপর।

একটি বাক্যকে অগ্রাহ্য করলেই যে তার বাচনিক ক্রিয়া থাকে না তা নয়। মেয়েদের অহরহ অনেক অশালীন উচ্চারণ, অশোভন ইঙ্গিত, লজ্জাজনক প্রস্তাব শুনতে হয়। ইলেকট্রিকের দোকানের মালিক যদি আমার সামনে এবং আরও অনেক ক্রেতার সামনে তাঁর কর্মচারীকে হেঁকে বলেন 'দিদিকে একটা মেল ফিমেল দাও, ভাল কোম্পানির দেবে', তখন উক্তিটি শুনে মনে হতেই পারে মেল-ফিমেলের এই ব্যঞ্জনায় নিজেকে কখনো ভাবিনি, আমি কি এই ফিমেল? সেই সঙ্গে শঙ্খ ঘোষের কবিতার লাইন মনে পড়তে পারে 'আরও কত ছোট হব ঈশ্বর ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে'। দোকানে দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণেন্দ্রিয় রুদ্ধ করি, দোকানের সব লোক তাই করে, লজ্জায় নয়, এ এক মজাদার অনবধান। মেয়েরা ভেতরে ভেতরে মরমে মরে গেলেও বাইরে তাদের দেখাতে হবে যে 'কানে কথা তারা নেয়নি'। এটা এক ধরনের 'কনস্পিরেসি অব সাইলেন্স' বা নীরবতার ষড়যন্ত্র, এর শিকার আমরা সবাই।

অনেকের কাছে দোকানদারের উক্তির এই ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হবে না, বিশেষ করে যে ভাষা-দার্শনিকরা ভাষার নৈর্ব্যক্তিক ব্যাখ্যা দেন তাঁরা এটাকে অপমানকর প্রয়োগ মনে করবেন না, তাঁদের মতে ভাষার উচ্চারণ আর প্রয়োগের মধ্যে যে পার্থক্য তা মনে রাখতে হবে। বিশ্লেষণী দর্শনের পরিভাষায় এই পার্থক্যকে মেনশন বা উচ্চারণ এবং

ইউজ বা প্রয়োগ-এর পার্থক্য বলা হয়। এঁদের ব্যাখ্যা ঠিক হলে বলতে হয় যে দোকানদার 'মেল ফিমেল' উচ্চারণ করেছে ঠিকই কিন্তু উচ্চারণটি প্রয়োগ করেনি। একটা উদাহরণের সাহায্যে এই পার্থক্য বোঝানো যেতে পারে। লজিকের প্রশ্নপত্রে এমন একটা প্রশ্ন থাকতে পারে, 'নিম্নলিখিত অনুমানটি অবরোহ অনুমান না আরোহ অনুমান যুক্তিসহ উত্তর দাও,

সব মেয়েই স্পর্শকাতর।
শেফালী একটি মেয়ে।
অতএব শেফালী স্পর্শকাতর।

এই স্থলে বলা যায় যে 'শেফালী' নামটি উচ্চারণ করা হয়েছে ব্যবহার করা হয়নি; এখানে ব্যক্তি শেফালী সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। শেফালীর বদলে মিতালি, পিয়ালী, কাকলি যে কোনো নাম ব্যবহার করে বাক্যের অর্থ এক রাখা যেত কারণ এখানে বাক্য-সমষ্টির আকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, তার তথ্যের উপর নয়। অনেক নারীবাদী ভাষা-দার্শনিক এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হবেন না। একটি বাক্য উচ্চারণমাত্র করে ব্যবহার না করলেও সেটি লিঙ্গ-বৈষম্যকারী কিনা তা বিচার্য।

শ্রোতা বক্তার চেয়ে শক্তিশালী হলে কথোপকথনের একরৈখিক অভিমুখটি ঘুরে যেতে পারে। শব্দের বাণ লক্ষ্যচ্যুত হলে অর্থাৎ শ্রোতা কথা কানে না নিলে বাণ বক্তার দিকে ফিরে আসতে পারে। অপরপক্ষে এমন হতে পারে যে শ্রোতা নির্বোধ তাই বাক্যটি যে অপমানসূচক তা সে বুঝতে পারেনি। তাই বলে কি বলা যায় যে এই উক্তির মাধ্যমে তাকে অপমান করা হয়নি যেহেতু সে কথাটা বোঝেনি? যারা ওই ভাষা-ভাষী তারা অপমানটা বুঝবে, তারাই তখন শ্রোতা। এই জন্যেই আইনের চোখে থার্ডপাটি বা তৃতীয় শরিকের অভিযোগ গ্রাহ্য হয়।

কথোপকথনের আর একটি পট ভাবা যায় যেখানে বাচনিক ক্রিয়ার আঘাত থেকে বাঁচার জন্য শ্রোতা নিজেকে নতুন করে সাজায়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের গোড়ায় অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে বলছেন, 'হাহাহাহা হাহাহাহা বালকের দল, /মা'র কোলে যাও চলে—নাই ভয়/অহো, কী অদ্ভুত কৌতুক'। এই কৌতুককে নিষ্ক্রিয় করার জন্য চিত্রাঙ্গদা যে বালক নন নারী তাই প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। এর জন্য নিজেকে তিনি কতভাবে বদল করলেন, কখনো 'নব লাবণ্য ধন' প্রার্থনা করে, কখনো নিজের 'নীরব ভঙ্গীর সঙ্গীত লীলার' উল্লেখ করে আবার কখনো নিজের পরিচয় 'নারী এ যে মায়াময়ী' বলে ঘোষণা করে।

শ্রোতা আর বক্তার মধ্যে বিবিধ সম্পর্ক থাকতে পারে। কখনো বাচনিক ক্রিয়ার ফলে শ্রোতা সরাসরি লজ্জা পাবে, কখনো আরও জটিল প্রক্রিয়ার ফলে বরঞ্চ বক্তা লজ্জা পায়। শ্রোতা যেখানে নির্বোধ সেখানে আপাতভাবে তাকে অনুপস্থিত মনে হলেও সেখানে ভাষার সম্পাদনাশক্তি আছে বলে স্বীকার করতে হয় কারণ অননুভূত অপমানও

অপমান। কখনো কখনো আবার গোটা শ্রোতৃমণ্ডলী নিজেকে বদলে ফেলে একটা বাচনিক ক্রিয়াকে সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্য।

বক্তা, বচন আর শ্রোতা কথোপকথনের এই তিন মাত্রাকে তিনটি অসম্পর্কিত পৃথক স্তম্ভ হিসেবে দেখার গভীরে এক ধরনের 'ইনডিভিজুয়ালিজম'-এর প্রেক্ষিত কাজ করে। এভাবে ভাষাকে দেখলে মুখ্য ভূমিকায় থাকে কথক এবং তার কথা, তখন শ্রোতা এবং সঞ্চারকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেও কিছু এসে যায় না। ভাষার সামর্থ্য নিয়ে মূল স্রোতে যে কাজ হয়েছে তা সবই 'ইনডিভিজুয়ালিজম' বা ব্যক্তিতা কেন্দ্রিক তাই 'সিম্যান্টিক অথরশিপ' একমাত্র বক্তাই দাবি করতে পারে বলে মনে করা হয়েছে। বক্তার আসন অধিকার না করতে পারা পর্যন্ত, অর্থাৎ শ্রোতা না পাওয়া অবধি, মনে করা হয় যে প্রতিবাদী স্বরের কোনো ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা যেন সবসময় কেন্দ্রীভূত থাকে এবং কেন্দ্র থেকে প্রান্তে চুয়ে-চুয়ে নামে। 'সিম্যান্টিক অথরশিপ' বক্তার, শ্রোতার এবং বচন এই তিনেরই থাকে, তফাতটা এমফাসিস বা ঝোঁকের। কোনো একটা কথোপকথনের মুহূর্তে কেবল একটা কোটিতে মনোযোগ দেওয়ার ফলে বাকি কোটিগুলির প্রতি নজর থাকে না। বক্তা, বচন ও শ্রোতা মিলে যে পরিমণ্ডল তৈরি হয় তাকে ঘিরেই গড়ে ওঠে কথোপকথনের নানা মাত্রা এবং ক্ষমতার বিবিধ বিন্যাস। ক্ষমতার এই ভুলভুলাইয়ার ভেতরে থেকে নারী কীভাবে তার স্বর খুঁজে পাবে, আর কীভাবে শব্দার্থ নির্মাণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে, তার কোনো পূর্ণাঙ্গ ছক তৈরি হয়নি, সমস্যাটিকে শনাক্ত করবার প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়েছে মাত্র।

সায়েন্স ফিকশন

সিদ্ধার্থ ঘোষ

একটি পরিভাষার জন্ম

বিশ্বের প্রথম নিছক সায়েন্স ফিকশন বিষয়ক পত্রিকাটি আমেরিকার পত্রিকা-বিপণিতে আত্মপ্রকাশ করে ১৯২৬-এর ৫ এপ্রিল। যদিও 'সায়েন্স ফিকশন' পরিভাষাটি তখনো তৈরি হয়নি। 'অ্যামেজিং স্টোরিজ' নামে এই পত্রিকার সম্পাদক হিউগো গার্নসব্যাক-এর কলমেই তিন বছর পরে পরিভাষাটির জন্ম। 'অ্যামেজিং স্টোরিজ'-এর প্রবর্তন সূত্রেই প্রকাশনার একটি শাখা ও সাহিত্যের একটি 'ঘরানা' রূপে সায়েন্স ফিকশন স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে।

১৮৮৪-তে লুক্সেমবার্গে জন্ম গার্নসব্যাকের। কিন্তু ১৯০৪-এর পর থেকে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা। প্রযুক্তিবিদ্ এই মানুষটি নতুন ধরনের এক ব্যাটারি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব অর্জন করার পর বিশ্বের প্রথম রেডিও ম্যাগাজিন *'মডার্ন ইলেকট্রিক্স'* প্রকাশ করেন ১৯০৮-এ এবং রেডিও সম্প্রচার বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ *'দা ওয়্যারলেস টেলিফোন'* (১৯১০) রচনা করেন। পারিবারিক ব্যবহারের উপযোগী প্রথম 'রেডিও সেট'ও ডিজাইন করেছিলেন তিনি। ১৯১১-য় 'মডার্ন ইলেকট্রিক্স'-এর পাতা ভরানোর জন্য তিনি প্রথম সায়েন্স ফিকশন চর্চায় উৎসাহী হন। 'র‍্যাল্ফ 124C 41 +' নামে একটি উপন্যাস বারোটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

সাহিত্যের সঙ্গে কণামাত্র সম্পর্ক-রহিত এই উপন্যাসে গতিসঞ্চারের জন্য প্রযুক্তি-বিষয়ক পূর্বাভাসের বন্যা বইয়েছিলেন লেখক— আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ, প্লাস্টিক দ্রব্য, টেপ রেকর্ডার, টেলিভিশন, মাইক্রোফিল্ম, নিদ্রারতকে প্রশিক্ষণের যন্ত্র ইত্যাদি। এক মঙ্গলবাসী কর্তৃক নায়িকাকে অপহরণের পর মহাকাশে এক ভয়ানক যুদ্ধকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল উপন্যাসের প্লট। গার্নসব্যাকের এই রচনাই জানিয়ে দিচ্ছে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা কী জাতীয় সৃষ্টিকে অনুমোদিত ও উৎসাহিত করেছিল। পরবর্তী কালে এই জাতীয় রচনাকে 'সোপ অপেরা'-র আদর্শ জুটি হিসাবে 'স্পেস অপেরা' আখ্যা দিয়েছিলেন উইলসন টাকার নামে এক সমালোচক।

'অ্যামেজিং স্টোরিজ'-এর পরে গার্নসব্যাক একের পর এক 'সায়েন্স ওয়ান্ডার স্টোরিজ', 'এয়ার ওয়ান্ডার স্টোরিজ', 'সায়েন্স ওয়ান্ডার কোয়ার্টারলি' ইত্যাদি সম্পাদনা করেন। ১৯৫২-য় তাঁর শেষ প্রয়াস 'সায়েন্স ফিকশন প্লাস' পত্রিকা। কিন্তু ততদিনে

সায়েন্স ফিকশনের কাছে পাঠকের চাহিদা গার্নসব্যাকের প্রযুক্তি বিষয়ক অতি-আশাবাদী পূর্বাভাসের গণ্ডি অতিক্রম করেছে, 'গার্নসব্যাকের ডিলিউশন' নামে পরিহাসের বিষয় হয়েছে। সাত সংখ্যার পর পত্রিকাটি উঠে যায়।

গার্নসব্যাকের সময় থেকে সায়েন্স ফিকশন একটি মূলত মার্কিনী উপ-সংস্কৃতি রূপে পত্রিকা-কেন্দ্রিক সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এবং গার্নসব্যাকের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে 'অ্যাস্টাউন্ডিং স্টোরিজ'— যার সম্পাদক জন ডব্লিউ ক্যাম্পবেল জুনিয়র অভিহিত হতেন 'দা গুরু অফ ইন্‌জিনিয়ারিং মাইন্ড' হিসাবে। সম্পাদক হিসাবে তিনি কিছু তরুণ লেখককে অবশ্য সুযোগ দিয়েছিলেন যাঁরা পরবর্তী কালে 'সায়েন্স ফিকশন' লিখে নাম করেছেন। যেমন, আইজ্যাক অ্যাসিমভ, থিওডোর স্টার্জন প্রমুখ। তিনের দশকের এই গার্নসব্যাক ও ক্যাম্পবেল পর্বটিকে 'এস. এফ.' ভক্তকুল তাঁদের 'গোল্ডেন এজ' বলে থাকেন।

গার্নসব্যাক ও ক্যাম্পবেলের হাতে পরিভাষাটির জন্ম ও প্রাথমিক প্রচারলাভ সত্ত্বেও, ধর্মীয় উপগোষ্ঠীভুক্ত উৎকট এক জাতীয় ভক্তকুল সৃষ্টি হলেও, এই ধারা পরিণতিতে 'কমিক স্ট্রিপ'-এর বেনোজলে ভেসে গেছে। সায়েন্স ফিকশন শব্দদ্বয় উচ্চারিত হওয়া মাত্র দীর্ঘকাল আমরা তটস্থ হয়ে উঠেছি এই ভেবে যে এইবার উদগত চক্ষু অপার্থিব দানব অথবা সুপারম্যানের লড়াই দেখতে হবে। সায়েন্স ফিকশন-কে আমরা 'বাক্ রজার্স' বা 'ব্যাটম্যান' জাতীয় গাঁজাখুরি কল্পনা বলে বাতিল করতে বাধ্য হয়েছি। এর পিছনেও গার্নসব্যাক তথা 'গোল্ডেন এজ'-এরই সর্বাধিক অবদান।

১৯২৮-এ প্রথম এস. এফ. কমিক স্ট্রিপ 'বাক্ রজার্স' প্রকাশিত হয়, তারপরে ১৯৩৮-এ আবির্ভাব 'সুপারম্যান'-এর। এই জাতীয় এস. এফ. চিত্রকাহিনি সমেত 'ডোনাল্ড ডাক্', 'দা লোন রেঞ্জার', কী 'বাবর' ইত্যাদি স্ট্রিপের মধ্যেও ইয়াংকি সংস্কৃতির প্রচ্ছন্ন প্রলোভন ও বিশ্বকে মার্কিনী ছাঁচে রূপান্তরিত করার বিষয়টি বহু সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আলেন্দে-র আমলে চিলির গবেষক ও অধ্যাপক এবং বর্তমানে নির্বাসিত অ্যারিয়েল ডর্ফম্যান। তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থ *'দা এম্পায়ার্‌স ওল্ড ক্লোদস'* এবং *'হাউ টু রিড ডোনাল্ড ডাক্'* (সতেরোটি ভাষায় অনূদিত) নিরীহদর্শন কমিক স্ট্রিপের রাজনৈতিক ও সামাজিক নিহিতার্থ নিয়ে অত্যন্ত মননশীল আলোচনা।

এই জাতীয় এস. এফ. রচনায় আসলে চটুল মার্কিনী ছাঁচের 'ওয়েস্টার্ন কাহিনি'কেই ('রেড' ইন্ডিয়ানদের ধ্বংস করার কাহিনিকেই) ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক প্রগতির মুখোশ এঁটে পরিবেশন করা হয়। ঘোড়ার জায়গায় দেখা দেয় স্পেসশিপ আর তীর-ধনুকের বদলে তুলে নেওয়া হয় 'লেসার গান্'। ফলে সামরিকবাদ, জাতিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং আতঙ্ক ও সংঘর্ষ ইত্যাদি তথাকথিত 'পপুলার কালচার'-এর যাবতীয় ক্ষত এস. এফ.-এর দৌলতে পৃথিবীর দেশ কাল ছাড়িয়ে গ্রহান্তরের অতীত ও ভবিষ্যৎকেও অমানবিক রক্তপাতে সিঞ্চিত করেছে।

বিজ্ঞানের প্রশ্রয়ে 'সুপারম্যান' বা অতিমানবের কাহিনি সম্বন্ধে সায়েন্স ফিকশন রচয়িত্রী উরসুলা কে. লেগুঁই লিখেছেন[৭] :

> সুপারম্যান একটি 'সাব্-মিথ'। তার পিতা নীৎসে এবং মাতা কমিক-পুস্তক। সুপারম্যান প্রতিটি দশ বছরের বালক বালিকা এবং আরও লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে বেঁচে আছে এবং আছে বহাল তবিয়তে। সায়েন্স ফিকশনের অন্যান্য সাব্-মিথ হল অভিনব সব অস্ত্র সংবলিত প্রাক্তন 'তরোয়াল ও ইন্দ্রজাল' জগতের যত শ্বেত-কেশী নায়ক, উন্মাদ অথবা ঈশ্বর রূপে নিজেকে কল্পনাকারী কম্পিউটার, বিকৃত মস্তিষ্ক বিজ্ঞানী, সহৃদয় স্বৈরাচারী, অপরাধীর সন্ধান লাভে সফল গোয়েন্দা, সেই সব পুঁজিপতি যারা গ্যালাক্সি কেনা-বেচা করে, মহাশূন্যযানের দুঃসাহসী ক্যাপ্টেন বা সৈন্য, দুষ্কৃতকারী এলিয়েন, সুমতি সম্পন্ন এলিয়েন এবং প্রতিটি উদ্ভিন্ন যৌবনা মস্তিষ্কহীন তরুণী যাদের দানবের হাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, যাদের সান্ত্বনা প্রদান করে উপদেশ দেওয়া হয়েছে বা অধুনা যারা উপরোক্ত নায়কদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে।

সায়েন্স ফিকশন নয়, শুধু এই নামের পরিভাষাটি প্রণয়নের জন্য গার্নসব্যাকের যেটুকু কৃতিত্ব। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে, স্বয়ং গার্নসব্যাক ও তাঁর অনুগামীরা শেলি, ভার্ন ও ওয়েল্‌স প্রমুখের সাহিত্যকর্ম নিয়মিত পুনর্মুদ্রণ করেছেন এবং 'এস. এফ.' তক্‌মা জুড়ে তাঁদের নিজেদের পূর্বসূরি বলে দাবি করেছেন। কাজেই শুধু সমসাময়িক রচনা নয়, 'সায়েন্স ফিকশন' পরিভাষাটি তার জন্ম-পূর্বের সাহিত্যকর্মকেও ঘরানা ভুক্ত করে নিয়েছিল।

পরিভাষাটির জন্মদান ও তাকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং তিনের দশক 'গোল্ডেন এজ' নামে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও গার্নসব্যাক-রা মার্কিনী পাঠশালা খোলার বহু পূর্বে এবং পাঠশালা বন্ধ হওয়ার পরে পঞ্চাশের দশক থেকে রচিত সায়েন্স ফিকশনই প্রণিধানযোগ্য। সায়েন্স ফিকশনের তাৎপর্য, সার্থকতা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনায় গার্নসব্যাকদের কোনো ঠাঁই নেই।

কয়েকটি অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা

ব্যক্তিগত সাহিত্যিকের কীর্তি নয়, সামগ্রিকভাবে 'সায়েন্স ফিকশন'-কে নিয়ে সাহিত্য সমালোচকরা প্রথম বিশ্লেষণ শুরু করেন এই শতাব্দীর পাঁচের দশক থেকে। একটি 'ঘরানা' হিসাবে বুদ্ধিজীবীদের এই প্রথম স্বীকৃতি সত্ত্বেও 'ঘরানা'-টির সংজ্ঞা নিরূপণে কিন্তু আজও কোনো ঐকমত্যে উপনীত হওয়া যায়নি। এমন কথাও আলোচিত হয়েছে যে সায়েন্স ফিকশনের যত লেখক তত তার সংজ্ঞা এবং কোনো বিশেষ বন্ধনীর মধ্যে 'ঘরানা'-কে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও এখানে বিশিষ্ট লেখক ও সমালোচকের

প্রদত্ত কয়েকটি সংজ্ঞা পেশ করা হচ্ছে, কারণ এই সংজ্ঞা-ভেদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সংজ্ঞা-নিরূপণের অসুবিধা এবং সার্থক সায়েন্স ফিকশনের ব্যাপ্তিরও পরিচয়।

ক. সায়েন্স ফিকশন কাহিনীতে কল্পনা করে নেওয়া হয় একটি প্রকৌশলকে, বা একটি প্রকৌশলের প্রভবকে, বা প্রাকৃতিক পারম্পর্যের একটি বিশৃঙ্খলাকে, যার অভিজ্ঞতা মানুষ এই রচনাটির পূর্বে লাভ করেনি। (— এডমান্ড ক্রিস্‌পিন, *বেস্ট এস এফ স্টোরিজ,* ১৯৫৫)।

খ. সায়েন্স ফিকশন সেই শ্রেণির আখ্যান যেখানে এমন একটি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয় যার উদ্ভব আমাদের পরিচিত জগতে সম্ভব নয়, কিন্তু প্রকল্পটির উৎস মানবিকই হোক বা অপার্থিব, সেটি গড়ে ওঠে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের কোনো উদ্ভাবনকে বা ছদ্ম-প্রকৌশলকে ভিত্তি করে। (— কিংস্‌লি অ্যামিস, *নিউ ম্যাপ্‌স অফ হেল্‌,* ১৯৬০)।

গ. এস. এফ. কাহিনি গড়ে ওঠে মানুষকে ঘিরে, যা একটি মানবিক সমস্যা এবং একটি মানবিক সমাধান সম্পন্ন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক মর্মবস্তু ভিন্ন এই কাহিনি কখনোই রচিত হতে পারত না। (— থিওডোর স্টার্জন, দ্র. জেমস ব্লিশ প্রণীত *'দা ইসু অ্যাট হ্যান্ড',* ১৯৬৪)।

ঘ. সায়েন্স ফিকশন ফ্যান্টাসিরই একটি স্বতন্ত্র ধারা যেখানে পাঠকের পক্ষে 'অবিশ্বাসকে ইচ্ছাকৃতভাবে সংহত রাখার' প্রক্রিয়াটি অনেক সহজসাধ্য। কারণ, ভৌত বিজ্ঞান, স্থান, কাল, সমাজ-বিজ্ঞান এবং দর্শনকে ঘিরে তার কাল্পনিক পূর্বাভাসগুলি লালিত হয় এক বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার আবহাওয়ায়। (— স্যাম মস্‌কোউইৎজ্‌, *সিকার্স অফ টুমরো,* ১৯৬৬)।

প্রাত্যহিক জীবনে যা সম্ভব তার সীমানায় আবদ্ধ থাকতে মানুষ নারাজ। মানুষের আকাঙ্ক্ষা— বিচিত্র অদ্ভুত অজানা ও অশ্রুতের অভিজ্ঞতা লাভের আকাঙ্ক্ষা (শুধু কল্পনায় হলেও)। খোলা মন নিয়ে একেবারে অপ্রত্যাশিতকে গ্রহণ করা বা প্রত্যাশিত পরিচিতকেই, অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে ভিন্ন দৃষ্টিতে সমীক্ষা করা, তাকে আশ্চর্য অভিনব কিছুতে পরিণত করা এস. এফ.-এর একচেটিয়া চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। পুরাণ, রূপকথা ও রোমাঞ্চ কাহিনিতেও এই সব উপাদানের প্রাচুর্য। বিজ্ঞানের কোনো প্রশ্রয় ছাড়াই মানুষের কল্পনা কতটা প্রসারিত হতে পারে সেটা স্পষ্ট বোঝা যায় ধর্মীয় বহু উপাখ্যান, পুরাণ ও কিংবদন্তি থেকে। স্থলচারী মানুষের শুধু একটি আকাঙ্ক্ষার কথাও যদি বিবেচনা করা হয়— গগন বিহারের স্বপ্ন— তা হলেই বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

আকাশ ছাড়িয়ে মহাশূন্যে হানা দেওয়ার, চান্দ্র অভিযানের বাসনা পূর্ণ হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত লুসিয়েন-এর Menippus উপন্যাসে। জ্যোতির্বিদ কেপ্‌লার রচিত Somnium-এর ও ফ্রান্সিস গডউইনের একটি উপন্যাসেরও উপজীব্য মহাকাশে পাড়ি। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যারিস-বাসী Cyrano de Bergerac (Rostand-

এর কমেডির চরিত্র হিসাবেই এখন অধিক পরিচিত) তাঁর পূর্বসূরিদের চন্দ্রাভিযানের যাবতীয় কল্পনাকে প্যারডি করে দু-টি ভিন্ন মেজাজের উপন্যাস লিখেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জুল্ ভার্নকেই কেন আমরা মহাকাশযাত্রা বিষয়ক প্রথম এস. এফ. রচনাকারের আসনটি দিই?

কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট 'গোলেম্' ইত্যাদি কাল্পনিক দানবের অস্তিত্ব সত্ত্বেও মেরি শেলির ফ্রাংকেনস্টাইনের দানব, কারেল চাপেকের রোবট বা ওয়েল্সের ডক্টর মোরো-র গবেষণাজাতদেরই শুধু সায়েন্স ফিকশনের তক্‌মা লাগাবার পিছনে কি বিচারধারা অনুসৃত হয়?

ইউটোপিয়া বা ডিস্‌টোপিয়া— স্বপ্নরাষ্ট্র বা ভগ্নস্বপ্নের রাষ্ট্র বিষয়ক সাহিত্যের সঙ্গে সায়েন্স ফিকশনের সম্পর্কই বা কী? ডার্কো সুভিন নামক এক সমালোচক বলেছেন : 'অ্যাডভেঞ্চার, রোমান্স, জনপ্রিয়তা বা অভিনবত্ব, সব কিছু সত্ত্বেও এস. এফ. শুধু ইউটোপিয়া এবং অ্যান্টি-ইউটোপিয়ার দুই দিগন্তের মধ্যেই লেখা সম্ভব।' কিন্তু কোন সূত্রে এডওয়ার্ড বেলামি-র *'লুকিং ব্যাকওয়ার্ড'* (১৮৮৮), উইলিয়াম মরিসের *'নিউজ ফ্রম নো হোয়ার'* (১৮৯০), জ্যাক লন্ডনের *'আয়রন হিল্'*, কী অল্‌ডাস হাক্সলির *'ব্রেভ নিউ ওয়ার্লড'* ইত্যাদিকে এস. এফ. বলে অভিহিত করতে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু ওয়েল্সের 'টাইম মেশিন', কী জামিয়াতিনের 'উই'-এর ক্ষেত্রে তা নয়!

এই পরিচ্ছেদের শুরুতে উদ্ধৃত সংজ্ঞাগুলির সাহায্যে এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। এমনকী সব বাদ দিলেও, বিশুদ্ধ 'ফ্যান্টাসি' ও সায়েন্স ফিকশনের মধ্যেও ভেদরেখা নির্ণয়ে অসমর্থ এই অসম্পূর্ণ সংজ্ঞাগুলি।

কিন্তু বিভিন্ন সংজ্ঞার ও এই পরিভাষার জন্মের ইতিহাস ছাড়িয়ে আমরা যদি পিছিয়ে যাই ১৮১৮-য়, মেরি শেলির কালে এবং তারপরে জুল ভার্ন ও এইচ. জি. ওয়েল্সের রচনার বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের চেষ্টা করি— কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের হদিশ পাওয়া সম্ভব।

মেরি শেলি, জুল্ ভার্ন ও এইচ. জি. ওয়েল্স

প্রথম সায়েন্স ফিকশন অ্যাখ্যা দিতে সাহিত্য সমালোচকরা যদি দ্বিধাগ্রস্ত হনও, কবি-পত্নী মেরি উলস্টোনক্র্যাফ্ট গডউইন শেলি-র (১৭৯৭-১৮৫১) সুপরিচিত 'ফ্র্যাংকেনস্টাইন' যে সায়েন্স ফিকশনের যাবতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সংবলিত তাতে কোনো দ্বিমত নেই। এই উপন্যাসটির উল্লেখ মাত্র মানুষের হাতে-গড়া দানবের কীর্তিকলাপের কথাই যদি শুধু আমরা স্মরণ করি তা হলে এই দানবের সঙ্গীলাভের জন্য আর্তনাদ বা তার সৃষ্টিকর্তার পত্নীকে বিয়ের রাত্রে হত্যা ইত্যাদি উপন্যাসটিকে গথিক ফিকশনের অতিরিক্ত কোনো মর্যাদা দিতে অক্ষম। বস্তুতপক্ষে, উপন্যাসটির নাম যে ফ্র্যাংকেনস্টাইন নয়— ফ্র্যাংকেনস্টাইন, অর্ দা মডার্ন প্রমিথিউস, সেটাও বিশেষভাবে খেয়ালে রাখা দরকার।

আমেরিকা ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিপ্লবের অল্পদিন বাদে জন্ম মেরি শেলির। নেপোলিয়নের যুদ্ধের রক্তাক্ত স্মৃতিও মিলোয়নি উপন্যাসটি প্রণয়নের কালে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতেও চলেছে তখন পালাবদলের তুমুল কাণ্ড। শিল্পবিপ্লবের এক চূড়ান্ত পর্বে কারখানার অঙ্গন ছেড়ে জল ও স্থল বিজয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাষ্পীয় শক্তি ঔপনিবেশিকদের হাতে আরও কিছু তুরুপের তাস তুলে দিতে চলেছে। অন্য দিকে বার্জেলিয়াস ও লামার্ক বায়োকেমিস্ট্রি ও বিবর্তনবাদ নিয়ে অভিনব গবেষণায় সিদ্ধি লাভ করছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের অন্বেষণ যে- বিজ্ঞানকে একদিন রাজশক্তি ও ধর্মের প্রতিপক্ষ করেছিল, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা দূরে থাক তখন তা রাজনৈতিক ক্ষমতার সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করতে শুরু করেছে। ইতিহাসের তৎকালীন পটভূমিতে বিজ্ঞানের সামগ্রিক ভূমিকার চেয়েও অবশ্য বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সংকটই উদ্বুদ্ধ করেছিল মেরি শেলি-কে। প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব জারির শুভ-অশুভ বিবেচনা-নির্ভর সীমা নির্ধারণের বিষয়টিও লেখিকার বিবেচনাধীন ছিল। এবং এই বিবেচনা ব্যতীত আজ অবধি সায়েন্স ফিকশনের অস্তিত্ব অর্থবহ, সার্থক হয়ে উঠতে পারে না।

বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞানের সাধনা এবং মানব প্রজাতির উন্নতি সাধনের জন্য গবেষণা সূত্রে ভিক্টর ফ্র্যাংকেনস্টাইন সৃষ্টি করেছিল একটি দানব। কুৎসিত-দর্শন সত্যি, কিন্তু সত্যিই কি দানব? 'সভ্যতার' সংস্পর্শে না আসায় অকলুষিত একটি সরল বন্য প্রাণী। কিন্তু বুদ্ধিমত্তা ও মানবিকতার পরিচয়ই তো বহন করছে তার এই উক্তি : 'আমি আমেরিকান ভূখণ্ড আবিষ্কারের কথা শুনেছি এবং তার আদিম বাসিন্দাদের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে কেঁদেছি..'

ভিক্টরের এই সৃষ্টি সায়েন্স ফিকশনের অসংখ্য এলিয়েনদের প্রথম পুরুষ যাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই মানুষ আক্রমণ করেছে, কারণ সে ভিন্ন, অন্যরকম। উপনিবেশের আদিবাসীদের সভ্যতাকে তুচ্ছ জ্ঞানে ধ্বংস করার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তো রয়েইছে দানবের উক্তিতে। দানবের কাহিনি বিবৃত করতে গিয়ে মেরি শেলি প্রকৃতপক্ষে সমাজের পরিত্যক্তদের মানবিক আবেগকে বিশ্লেষণ করেছেন। আর আধুনিক প্রমিথিউস ভিক্টর মূলত একটি 'ফাউস্ত' চরিত্র। জ্ঞান অন্বেষণের হিতাহিতের দ্বৈরথে পীড়িত। বিজ্ঞান-চর্চার ভালো-মন্দ নয়, এই চর্চা যে নৈতিক উভয়সংকট সৃষ্টি করে, তারই প্রবক্তা ভিক্টর।

উপন্যাসটি প্রকাশের কালে 'সায়েন্টিফিক রোমান্স' এই গোত্রভুক্ত করার বা 'গথিক' ধারায় সঙ্গে তার আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা সত্ত্বেও রচয়িতা তাঁর সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে গ্রন্থটির ভূমিকা (যদিও অনেকের অনুমান পত্নীর হয়ে ভূমিকাটি লিখেছিলেন কবি শেলি) :

> আমি অতিপ্রাকৃত আতঙ্কের এক মালা বুনেছি বলে মনে করি না।... ঘটনাটি থেকে সঞ্জাত পরিস্থিতির অভিনবত্বই প্রণোদিত করেছিল [রচনাটিকে] এবং

পার্থিব জগতের তথ্য হিসাবে যতই অসম্ভব হোক, কল্পনাকে তা এমন একটি দৃষ্টিকোণ অর্পণ করে যার ফলে মানবিক আবেগকে যেভাবে চিত্রণ করা যায়, বাস্তবগ্রাহ্য ঘটনার আটপৌরে সম্পর্ক থেকে ততখানি সামগ্রিক ও কর্তৃত্বব্যঞ্জকভাবে তা প্রসূত হয় না।

১৮১৮-তে 'ফ্র্যাংকেনস্টাইন' প্রকাশের পর সেই বছরেই বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ওয়াল্টার স্কট 'ব্ল্যাকউড্স এডিনবরা ম্যাগাজিনে'র মার্চ সংখ্যায় গ্রন্থটি সমালোচনা করেন। লক্ষণীয়, স্কটও সায়েন্স ফিকশনের স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনা স্পষ্ট অনুধাবন করেছিলেন[৭] :

[এই গ্রন্থে] কল্পনার উদ্দাম সব বেনিয়মের মধ্যেও সম্ভাব্যতাকে কিন্তু মোটেই দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে রাখা হয়নি, বরং লেখিকা তাঁর আখ্যানের ভিত্তিরূপে যে অ-সাধারণ স্বীকার্য (postulates)-গুলি মেনে নিতে বলেন তাও আমরা অনুমোদন করি শুধু এই শর্তে যে অতঃপর তিনি তার ফলাফল নির্ভুল যুক্তি-নির্ভর পথেই নির্ধারিত করবেন।

'ফ্র্যাংকেনস্টাইন' শুধু সায়েন্স ফিকশনের পথিকৃৎ নয়, উপরোক্ত ভূমিকা ও সমালোচনার সুবাদে তা 'সায়েন্স ফিকশন' নামটি জন্মের পূর্বেই তার দু-টি সম্ভাব্য সংজ্ঞাও দিয়ে গেছে আমাদের।

সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানহীন ভিক্টরের নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে অহেতুক আস্থার পার্সোনিফিকেশন্ হিসাবে, ভিক্টরের দ্বৈত সত্তারূপেও তার তৈরি দানবটিকে ব্যাখ্যা করা যায় নিশ্চয়। কিন্তু শুধু এই দ্বৈতসত্তারূপে দানবটির অস্তিত্ব উপন্যাসটিকে সায়েন্স ফিকশনের স্বাতন্ত্র্য দিতে পারে না। নিজের ক্ষমতার বাইরে হস্তক্ষেপের অশুভ কারণে জন্ম যে মেফিস্টোফিলিসের সে-ও ফাউস্টেরই দ্বৈত সত্তা। দ্বৈত সত্তা দানবই হোক কী অশরীরী, তাকে একই ব্যক্তিত্বের দু'টি বিরোধী সত্তা রূপে কল্পনা করা যায়। তারই অন্যতম সেরা সাহিত্যিক উদাহরণ রবার্ট লুই স্টিভেনসনের 'ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড'। সমাজের শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর হাইড নিজের তৈরি একটি ওষুধ খেয়ে নিজেকে পরিণত করেছিলেন দানবে। ভিক্টোরিয়ান যুগের ভণ্ডামি ও বিভাজিত ব্যক্তিত্বকে উদঘাটন করার জন্য স্টিভেনসনের এই রূপক। উপন্যাসের মূল সমস্যা অবশ্য বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীর সামাজিক ভূমিকা ঘিরে গড়ে ওঠেনি।

সায়েন্স ফিকশনের ইতিহাসে মেরি শেলির পরবর্তী অধ্যায়ের দুই জ্যোতিষ্ক জুল ভার্ন (১৮২৮-১৯০৫) এবং এইচ. জি. ওয়েল্স (১৮৬৬-১৯৪৬)। সায়েন্স ফিকশনের দুই পূর্বপুরুষ রূপে এক নিশ্বাসে নাম দু-টি উচ্চারণ করতেই অভ্যস্ত আমরা। কিন্তু কী সাহিত্যিক প্রকরণের বিচারে, কী ইতিহাসে বিজ্ঞানের ভূমিকার ব্যাখ্যায় দুজনের মেজাজ, ভঙ্গি ও উদ্দিষ্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন। মূলত তাঁদের হাতে গঠিত সায়েন্স ফিকশনের দুই শিবিরের অস্তিত্ব আজও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। বিশেষ করে বাংলায় সায়েন্স ফিকশন-চর্চাকে তা কীভাবে প্রভাবিত করেছে সে-প্রসঙ্গে আমরা পরেও আবার ফিরে যাব।

ভার্ন ও ওয়েল্‌সের বহুপঠিত উপন্যাসের আখ্যান বর্ণনা অপ্রয়োজনীয়। এখানে আমরা তাঁদের ভিন্নতার কয়েকটি সূত্র সন্ধানের চেষ্টা করব।

বাণিজ্যিক উৎসাহে ভৌগোলিক অভিযান যখন পৃথিবীতে আর কোনো অজ্ঞাত জগতের সন্ধান লাভের রোমাঞ্চকর বাসনাকে প্রায় নির্বাসিত করেছে, জুল ভার্ন হাজির হলেন তাঁর কাল্পনিক দুনিয়া নিয়ে। বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অজানা নতুন রাজ্যে পদার্পণের সুযোগ দিল— জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, এমনকী মহাকাশে অ্যাডভেঞ্চারের প্রতিশ্রুতি। মহাকাশ যাত্রাকে খুঁটিনাটি বর্ণনার গুণে একটি বিজ্ঞান-সমর্থিত ঘটনার ইলিউশন হিসাবে সৃষ্টি করলেন ভার্ন ১৮৬৫-তে তাঁর *'ফ্রম দা আর্থ টু দা মুন'* উপন্যাসে। ভার্ন তাঁর উপন্যাসরাজির নাম দিয়েছিলেন, 'ফ্যান্টাস্টিক ভয়েজেস'।

কিশোর থেকে বৃদ্ধ শতাধিক বছর ধরে আজ অবধি ভার্নের অ্যাডভেঞ্চারে নিজেরা অংশগ্রহণ করে আসছে। বর্ষীয়ান তলস্তয়কেও শিহরিত করেছিলেন ভার্ন। খেলার ছলে ভার্নের উপন্যাসের জন্য বহু ইলাসট্রেশন করেছেন তিনি। ঠাকুরদা কুলদারঞ্জন রায়ের অনূদিত *'মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড'* পড়ে দশ বছরের কিশোর সত্যজিৎ রায়ও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, ভার্নের গল্পের প্রাণ-মাতানো নিখুঁত বর্ণনার অঢেল প্রাচুর্য আজও তাঁকে বিস্মিত করে।

শ্রীমতী কার্ল মার্কসের নিকট বন্ধু, প্যারি কমিউনে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবী ও বিজ্ঞানী Gustave Flourens-এর আদলে ভার্ন সৃষ্টি করেছিলেন *'টোয়েণ্টি থাউজেন্ড লিগ্‌স আন্ডার দা সি'*-র রহস্যময় নায়ক ক্যাপ্টেন নেমো-কে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের এবং ভারতের সিপাহি অভ্যুত্থানের প্রতিও ভার্নের সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রচনায়। কিন্তু 'বিজ্ঞান'কে তিনি বিশুদ্ধভাবে সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি নিরপেক্ষ হাতিয়ার রূপে কল্পনা করেছিলেন। তাঁর রোমাণ্টিক কল্পনায় সাম্য ও স্বাধীনতা অর্জনের বাসনা পূর্ণ করেছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হস্তক্ষেপ।

ভার্ন তাঁর 'ফ্যান্টাস্টিক ভয়েজ' সমূহে বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বস্ততা সম্বন্ধেও সচেতন ও গর্বিত ছিলেন। সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তত্ত্বকে নিকট ভবিষ্যতের চেয়ে দূরে প্রক্ষেপ করেননি সতর্ক ভার্ন। অদ্ভুত নিয়ে তাঁর কারবারে অসম্ভবকে পরিহার করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টার কসুর ছিল না। আর তাই ওয়েল্‌সের রচিত গ্রহান্তরে ভ্রমণের কাহিনি পড়ে তিনি বিদ্রূপ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন : 'আমি [যেখানে] পদার্থবিদ্যাকে কাজে লাগাই, উনি বিশেষ এক ধাতুতে তৈরি উড়োজাহাজে ক'রে হাজির হন মঙ্গলগ্রহে। দেখান তো সেই ধাতুটি আমাকে! '

কিন্তু পরিহাস এখানেই যে এই পিউরিটান মনোভাব সত্ত্বেও ওয়েল্‌সের ওই অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি ধাতুর মতো ভার্নের বারুদ-ঠাসা মহাকাশে ক্ষেপণের কামানটিকেও বিজ্ঞান সমান অসম্ভব বলে সহাস্যে খারিজ করেছে। ওয়েল্‌সের কল্পনার অদৃশ্য মানুষের অবশ্যম্ভাবী ইত্যাদি স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক বিচ্যুতি লক্ষ করা যায় ঠিকই, কিন্তু শুধু সেই সুবাদে এস. এফ.

রাজ্যে উচ্চতর সম্মানের আসনটি ভার্ন অধিকার করতে পারবেন না। সার্থক পূর্বাভাসই যদি খাঁটি এস. এফ.-এর লক্ষণ হয়, তবে ভার্নের ক্ষেত্রেও লক্ষ্যভেদের গুটিকতক সাফল্য বাদে অধিকাংশই আজ প্রলাপ।

ভার্নের পূর্ববর্তী শেলি এবং পরবর্তী ওয়েল্‌সের রচনায় প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল ইতিহাসে বিজ্ঞানের ভূমিকাকে ঘিরে তাঁদের সপ্রশ্ন অনুসন্ধান থেকে। বৈজ্ঞানিক প্রগতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যজাত শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব ও নীতিবোধ রহিত বিজ্ঞানের গল্পে সামাজিক-জীব বিজ্ঞানীর দ্বন্দ্ব যে-সাহিত্যকে প্রণোদিত করে বা এই সচেতনতা সঞ্চারিত করাই যার অভীষ্ট—বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠার জন্য সমকালীন বিজ্ঞানের শুধু অনুমোদিত ক্ষেত্রের সীমা তাকে আবদ্ধ করতে পারবে না— এ শুধু প্রত্যাশিতই নয়, এই জাতীয় সৃষ্টির জৈবিক নিয়মেরই অধীন।

বিপরীতে ইতিহাসে বিজ্ঞানের সদর্থক ভূমিকা সম্বন্ধে আশাবাদী ভার্নের রচনায় প্রকৌশলের রোমান্টিক রূপটি আজ শুধু যন্ত্রবিপ্লবের যুগের এক আত্মতুষ্ট ইঞ্জিনিয়ারের খর্বদৃষ্টির পরিচায়ক। উপরন্তু বিজ্ঞানের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রতিটি কল্পনাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য উপন্যাসের দেহের অধিকাংশ জুড়ে ভার্নের 'ন্যাচারালিস্টিক' বিবরণ যখনই অসম্ভব বা অবাস্তব প্রমাণিত হয়েছে, সম্পর্কিত সৃষ্টিটি তার একমাত্র অবলম্বন বা গর্বটিকেও খুইয়েছে। আজ ফিকশন হিসাবে যত না তার চেয়ে অভিযান কাহিনি রূপেই গুটিকতক ভার্নের উপন্যাসের সমাদর এবং কিশোরোপযোগী এস. এফ.-এর মডেল জ্ঞানেই কিছু লেখক তাঁকে অনুসরণ করেন।

বিপরীতে ওয়েল্‌সের মহাকাশ-যান, টাইম মেশিন ইত্যাদি তার আবির্ভাব কালেও যা ছিল আজও ততটাই অবাস্তব। বিভিন্ন 'গ্যাজেট'কে যন্ত্রসম্ভব বা প্রকল্পকে বিজ্ঞান-সমর্থিত করে তোলার জন্য কারিগরি খুঁটিনাটির অশেষ জটিলতার মধ্যে যাননি ওয়েল্‌স, কারণ সেটা তাঁর উদ্দিষ্টই নয়।

ওয়েল্‌সের টাইম মেশিনের সঙ্গে সত্যিই সত্যজিৎ রায়ের গল্প *'টেরোড্যাক্টিলের ডিম'*-এর পরিহাসমূলক উক্তির বিশেষ অমিল নেই, 'সেই যে একটা সাইকেলের মতো জিনিস চেপে হ্যান্ডেল টানলেই অতীত যুগে, আর আরেকটা টানলেই ভবিষ্যতে চলে যায়।' কিন্তু 'অবিশ্বাসকে স্বেচ্ছায় সংহত করার' সাহিত্যিক পদ্ধতি এই যন্ত্রযোগেই আমাদের পৌঁছে দিতে পারে ভিন্ন দুনিয়ায়। ভিত্তিতে একটি অনুমান— হাইপথেসিস থাকলেও এই ভিন্ন দুনিয়ায় কিন্তু অন্বেষণ চালায় যুক্তিগ্রাহী বাস্তবতা। টাইম মেশিন বা সমগোত্রীয় অসম্ভব যন্ত্র বা কৌশল, বিবিধ কাল্পনিক ও ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক প্রকল্প ইত্যাদির প্রাথমিক অঙ্গনটি এস. এফ.-রচয়িতাদের (এবং পাঠকেরও কাছে) সাহিত্য-প্রকরণ স্বীকৃত এক ধরনের জাম্পিং-বোর্ড মাত্র। গল্পের রাজ্যে (সত্যান্বেষণের ক্ষেত্রে পৌঁছে দিয়েই এই সিঁড়িটির কাজ ফুরোয়।) জগৎ ও জীবনকে পর্যালোচনার অভিনব একটি মাত্রা যোজনা করেই যা নিজেকে সরিয়ে নেয়।

ফ্যান্টাসির সঙ্গে সায়েন্স ফিকশনের স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটিও এই সূত্রেই উত্থাপিত হতে পারে। বিশুদ্ধ ফ্যান্টাসি একটি মাত্র মূল কল্পনাকে ঘিরে দানা বাঁধে না। অসম্ভব কল্পনা থেকে অসম্ভবতর কল্পনা পল্লবিত হতে থাকে সেখানে। বিপরীতে, এস. এফ.-এর মূল প্রকল্পটি যতই অবিশ্বাস্য হোক, বিজ্ঞানের ইতিহাস তাকে এক ধরনের দার্শনিক বিশ্বাসযোগ্যতা দেয় (সার্থকতার সেটাও একটি বিচার নিশ্চয়)। স্থলবন্দী প্রস্তরযুগের মানুষের কাছে জলচর, নভোচর যন্ত্র যতটা দুরূহ কল্পনা, আমাদের কাছে সময়চর যন্ত্র (বিজ্ঞানসিদ্ধ না হোক তবু) ততটা বোধ হয় না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারা যে-হারে পুষ্টি লাভ করে চলেছে, বিস্ময়কর চিন্তা বা কল্পনাকে তার চেয়ে দ্রুত হারে পরিচালিত করতে না পারলে তাই নিকট আত্মীয় ফ্যান্টাসির আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে এস. এফ. স্বতন্ত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। মানুষ ও পশুর কথোপকথনের কোনো বাধা নেই রূপকথায়। এবার স্যামুয়েল আর. ডিলানি-র উপন্যাস *'ব্যাবেল-১৭'*-য় কী ঘটছে দেখা যাক। গ্রহান্তরের আগন্তুক সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষীর সঙ্গে সেখানে ভাব বিনিময় হচ্ছে কম্পিউটারের মধ্যস্থতায়, কিন্তু সেটি সম্ভব হয়েছে 'লিঙ্গুইস্টিক' ও 'সেমিওটিক্স' বিদ্যার উপর আধুনিক দখলদারির সুবাদেই। আরও খেয়াল করা দরকার, ভাষা ও ভাববিনিময়ের সমস্যাকেন্দ্রিক এই উপন্যাসে বিষয়টি যতটা গুরুত্বপূর্ণ, অন্যান্য এস. এফ. রচনায় যেখানে তা নয়, এলিয়েনদের সঙ্গে কথা চালানোরও দরকার হয় না, টেলিপ্যাথিই সুযোগ করে দেয়।

ভার্নের এস. এফ. বিজ্ঞানের ক্ষমতায় ও মহাবিশ্বের বৈচিত্র্যে মুগ্ধ, আশ্চর্যের সেখানে আশ্চর্য হিসাবেই সমাদর, কিন্তু ওয়েল্‌স এবং তাঁর পরবর্তী রচয়িতাদের হাতে পরিশীলিত এস. এফ. সুনির্দিষ্ট দ্বিধা, বিজ্ঞানের রীতি-পদ্ধতির ভিত্তি নিয়ে, সমাজ ও জীবনের উপরে প্রযুক্তির প্রতিঘাত নিয়ে চিন্তা ও মননের অবকাশ দেয়।

ওয়েল্‌সের গড়া টাইম মেশিন, ভিন্নগ্রহীদের সঙ্গে যুদ্ধ (প্রত্যক্ষ এবং বায়োলজিকাল), অদৃশ্য মানুষ ইত্যাদি কালক্রমে এস. এফ.-এর বাঁধাধরা বহু ব্যবহৃত উপকরণে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যোগ্য হাতে 'ক্লিশে'-তে পরিণত টাইম মেশিন যে আজও তার উপযোগিতা হারায়নি, তার নিদর্শন একদিকে সায়েন্স ফিকশনের বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত করে আর অন্য দিকে সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যেই সন্ধান নিতে নির্দেশ দেয় তার সার্থকতার।

কারেল চাপেক

ওয়েল্‌সের পরে ও দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী পর্বের অন্তর্ভুক্ত এস. এফ.-এর তথাকথিত 'গোল্ডেন এজ' ও মার্কিনিয়ানার প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেই আলোচিত। ডেভিড লিন্ডসের *'এ ভয়েজ টু আর্ক্টুরাস'* (১৯২০) এবং ওলাফ স্টেপ্‌লডনের *'স্টার মেকার'* (১৯৩৭) ইত্যাদি অত্যন্ত গম্ভীর মেজাজের ও তাৎপর্যময় সায়েন্স ফিকশন রচিত হয়েছে এই

পর্বে। কিন্তু বর্তমানে বিশেষ করে আমাদের দেশে দুর্লভ এই সব গ্রন্থ এবং যে-কোনো দুর্লভ গ্রন্থের আলোচনার পূর্বশর্ত রূপে কাহিনির সারসংক্ষেপ ও কাঠামো পেশ করার পরিসর এই প্রবন্ধে নেই।

এই পর্বের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাই কারেল চাপেককেই শুধু উপস্থিত করা হচ্ছে। তবে তার আগে আরেকটা কথা বলে নেওয়া দরকার। ১৮৮৮-তে এডওয়ার্ড বেলামি-র 'লুকিং ব্যাকওয়ার্ড, ২০০০-১৮৮৭' নামে উপন্যাসে ইউটোপিয়ার বৈজ্ঞানিক প্রগতিতে আস্থা রেখেই রচিত হয়েছিল ভবিষ্যতের আদর্শ সমাজতান্ত্রিক সমাজ। ১৯০৭-এ জ্যাক লন্ডনের 'আয়রন হিল' প্রোলিতেরিয়ান বিপ্লবের সম্মুখীন এক ভবিষ্যতের ফ্যাসিবাদী আমেরিকাকে উপস্থিত করেছিল। কিন্তু ১৯১৮-র রুশ বিপ্লবের পর কমিউনিজমের বিরোধিতা থেকে জন্ম নিল ভিন্ন জাতের ডিস্‌টোপিয়া। কমিউনিস্ট দুনিয়ায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থান নেই এই প্রোপাগান্ডার সমর্থনে রচিত হল প্রযুক্তির অপব্যবহারের কালো ছবি জামিয়াতিনের 'উই' (১৯২০) গ্রন্থে। সায়েন্স ফিকশনের কিছু বৈশিষ্ট্য সংবলিত হলেও বর্তমান প্রবন্ধে এই জাতীয় প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক চরিত্রের ইউটোপিয়া-কে আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে।

১৯২২-এর ৯ অক্টোবর কারেল চাপেকের নাটক R. U. R. নিউ ইয়র্কে প্রথম মঞ্চস্থ হওয়ার পর 'নিউ ইয়র্ক আমেরিকান' লিখেছিল, 'বার্নাড শ' সম্ভবত R.U.R. লেখেননি, কিন্তু সম্ভবত লিখবেন। শ'-এর লেখা R.U.R.-এর একটি পাঠান্তর আমরা পাব এবং তখন কাল রাতে যাকে আমরা অত্যন্ত উপভোগ্য ও উদ্দীপ্ত কল্পনার ফ্যান্টাসি হিসাবে গ্রহণ করেছি তা পরিণত হবে একটি নীরস তিক্ত সমালোচনায়। কারণ R. U. R. শেভিয়ান হলেও মনোরঞ্জক।'[১০] নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক চেকোস্লোভাকিয়ার কারেল চাপেক-এর (১৮৯০-১৯৩৮) পূর্বোক্ত R. U. R. নাটকটি আসলে Rossums Universal Robots-এর আদ্যক্ষর সংগ্রহ। মূল নাটকটি পড়ার সৌভাগ্য না হোক, 'রোবট' শব্দটির সৃষ্টিকর্তা হিসাবে চাপেকের নাম সুবিদিত। সায়েন্স ফিকশনের দুনিয়ায় রোবট আজ অবধি বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ একটি অত্যন্ত উপযোগী ও সফল অভিনেতা। বর্তমানে যান্ত্রিক চেহারাবিশিষ্ট কৃত্রিম জীবকে সাধারণত 'রোবট' আখ্যা দেওয়া হয়, আর মানুষের দেহধারীকে 'হিউম্যানয়েড'। কিন্তু মূলে সেই চাপেকেরই 'রোবট'। শুধু তাই নয়, আধুনিক আখ্যা অনুসারে চাপেকের রোবটকে 'হিউম্যানয়েড'-ই বলা উচিত। কারণ, দেখতে তারা মানুষের মতোই ছিল।

অজস্র অবিকল উৎপাদনের (ইন্টারচেঞ্জেব্‌ল মাস্‌ প্রোডাকশন) যুগে পণ্যনির্মাতারা রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম মানুষ উৎপাদন শুরু করে R. U. R.-এ। গৃহভৃত্যের কাজ করার উপযোগী ও খুব সস্তা দামের এই রোবটদের কিছুকাল পরেই অপব্যবহার করা হয়— নিযুক্ত করা হয় সৈন্যরূপে। প্রথমে বাধ্য ক্রীতদাস ছিল তারা, কিন্তু একজন রাসায়নিক উৎপাদনের একটি ফর্মুলা পরিবর্তন করার পর তাদের মনে সঞ্চারিত হয়

আবেগ এবং স্বাধীনতা অর্জনের বাসনা। রোবটদের মুক্তি আন্দোলনের পরিণতি ঘটে এক বিদ্রোহে, যার ফলে মানবজাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে অযৌন রোবটদের মধ্যে একটি আদম ও একটি ইভের আবির্ভাব নির্দেশ করে যে এই প্রজাতি অবলুপ্ত হবে না।

R. U. R. ব্যতীত আরও একটি এস. এফ. নাটক *'দা ইন্‌সেক্ট প্লে'* (১৯২১) ও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস *'দা অ্যাবসোলিউট অ্যাট লার্জ'* (১৯২২), *'কারাক্রিট'* (১৯২৪) এবং *'ওয়ার উইথ দা নিউট্‌স'* (১৯৩৬) রচনা করেছিলেন চাপেক। তাঁর সেরা কীর্তি অবশ্য শেষোক্ত উপন্যাসটি। একাধারে হাস্যমধুর ও আশঙ্কার শিহরনময় এই রাজনৈতিক ব্যঙ্গদীপ্ত উপন্যাস সায়েন্স ফিকশনের স্বাধিকারের ক্ষেত্র ও তার সিদ্ধির একটি বিশিষ্ট উদাহরণ।

তিনটি খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থটি। প্রথম খণ্ডে মুক্তো-সন্ধানী এক জাহাজের ক্যাপ্টেন প্রাচ্যের একটি দ্বীপের সামুদ্রিক সরোবরে নিউট্ নামক জলচরদের একটি প্রজাতির সন্ধান পায়। আকারে তারা মানুষের চেয়ে কিঞ্চিৎ ছোট। জলে বাস করলেও মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য তারা ডাঙায় বাস করতে পারে। ক্যাপ্টেনের ধারণা হয় এদের মানুষের মতো কথা বলতে এবং যন্ত্রাংশ বা হাতিয়ার ব্যবহার করতে শেখানো সম্ভব। ক্যাপ্টেন চেক ব্যবসায়ী-সম্রাট বণ্ডিকে উৎসাহিত করে নিউট্‌দের উন্নয়নে বিনিয়োগের জন্য। যাতে প্রথমে মুক্তো-সংগ্রহের ও পরে অন্য কাজেও ব্যবহার করা যায় তাদের। হাঙরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অস্ত্রলাভ মাত্র নিউট্‌রা অত্যন্ত দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি শুরু করে এবং দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ছড়িয়ে পড়ে তারা। মানুষ ব্যাপারীরা তখন তাদের শিকার গ্রেপ্তার ও কেনাবেচা আরম্ভ করে। নিউট্‌রা মানুষের অফুরন্ত এক ক্রীতদাস-শ্রমশক্তির ভাণ্ডারে পরিণত হয়।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে নিউট্‌দের বিশ্বজোড়া শোষণ বঞ্চনার কাহিনি। পৃথিবীর যাবতীয় সমুদ্র ও নদীতটে তাদের আমদানি করা হয়, ব্যবহার করা হয় সম্ভাব্য সকল উদ্দেশ্যে। চিড়িয়াখানায় ভরা হয়, ব্যবচ্ছেদ-সমেত বৈজ্ঞানিক গবেষণার বস্তুতে পরিণত করা হয় এবং শেষে মানবতাবাদী বিভিন্ন গোষ্ঠীর খপ্পরেও পড়ে। তারা নিউট্‌দের বস্ত্র ভূষিত করে, তাদের নাগরিক অধিকার প্রদান করে এবং বিভিন্ন ধর্মে দীক্ষা দেয়। এই খণ্ডের অন্তিম পর্বে দেখা যায় নিউট্‌রা বৈজ্ঞানিক সমাবেশে গবেষণা পত্র পাঠ করছে এবং নিজ নিজ ধর্মে মানুষকে ধর্মান্তরিত করছে। বিশ্বের উন্নত যাবতীয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তখন তাদের উপর নির্ভরশীল এবং নিউট্‌রাও বিস্ফোরক ও অন্যান্য অস্ত্র-সমেত প্রভূত পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় করেছে।

তৃতীয় খণ্ডে নিউট্‌রা যুদ্ধ জারি করে মানুষের বিরুদ্ধে। তাদের বসবাসের জন্য নির্ধারিত অঞ্চলের সম্প্রসারণের দাবিতে। প্রজননের জন্য তাদের তটভূমি প্রয়োজন এবং সেই অনুসারে পৃথিবীর কন্টিনেন্টাল ভূভাগকে তারা নতুনভাবে সজ্জিত করার

পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যাতে তটভূমির পরিমাণ সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। বোঝা যায় আমাদের পরিচিত বহু দেশের অস্তিত্ব নির্মূল হয়ে যাবে অদূর ভবিষ্যতে। নিউট্‌দের প্রতিহত করার কি কোনো উপায় নেই? উপন্যাসের এই অংশে, শেষ অধ্যায়ে লেখকের 'অন্তর কণ্ঠ' ধ্বনিত হয়। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সংবাদপত্র ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি মারফত রিপোর্ট-ধর্মী একটি স্টাইলে আখ্যান রচিত হয়েছিল। লেখক এইসব নথির সংকলকের অতিরিক্ত কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। 'অন্তর কণ্ঠ'-র সঙ্গে লেখকের আলোচনাসূত্রে বেরিয়ে আসে আশাপ্রদ (?) উপলব্ধি : নিউট্‌রা মানুষের কাছ থেকে এত শিক্ষা গ্রহণ করেছে যে লোভ আর উচ্চাশার তাড়নায় পরিণতিতে তারাও নিজেদের মধ্যে আত্মক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তারপর

মেরি শেলির কালে বিজ্ঞানের অনৈতিক প্রয়োগের জন্য ব্যক্তিগতভাবে তলব পড়ত বিজ্ঞানীদের। অসামাজিক অমানবিক উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ রোধ করার জন্য তাই খুনে বৈজ্ঞানিকের বিকল্পরূপে উপস্থাপিত আদর্শবাদী বিজ্ঞানীর প্রতিষেধকও ছিল একটা। কিন্তু কালক্রমে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গবেষণাগারের প্রাচীরটিও সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য হয়ে উঠতে লাগল। বিজ্ঞানের ভাষা ক্রমেই সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্যতর প্রাচীন চীনা ব্যাকরণে পরিণত হতে লাগল। অন্যদিকে বিজ্ঞান থেকে জন্ম নিল এক মহাবিজ্ঞান। মহাবিজ্ঞানের রাজ্যে ব্যক্তিগত প্রতিভার স্ফুরণের পক্ষেও তখন অপরিহার্য হয়ে উঠল প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা। গ্যালিলিও-কোপার্নিকাসের যুগে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার মধ্য দিয়ে যে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম তার সঙ্গে ক্ষীণ সম্পর্ক মহাবিজ্ঞানের। বার্নাল, হ্যাল্‌ডেন, পিয়ের-জোলিও কুরি, পাউলিং প্রমুখের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হবে বর্তমান যুগে নিজস্ব কক্ষে বসে কম্পিউটার বা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের তোয়াক্কা না করে কোনো নিউটনের আর স্বাধীনভাবে যুগান্তকারী আবিষ্কারের সুযোগ নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির মুহূর্তে বিশেষ করে মহাবিজ্ঞানের উপরোক্ত স্বরূপ আর হৃদয়ঙ্গম না করার কোনো উপায় রইল না। হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে কবরস্থ হল বিজ্ঞানের যাবতীয় অবশিষ্ট 'মিথ্'। এবং জড়কে শক্তিতে পরিণত করার অনিয়ন্ত্রিত সাফল্যের সেই অসভ্য আলোকে নিজের শক্তিমত্তা নতুন করে উপলব্ধি করল সায়েন্স ফিকশন। সহজবোধ্য ভাষায় সায়েন্স ফিকশন ফলাফল ও পরিণতির বিচারে সাধারণ মানুষকেও দুর্জ্ঞেয় বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ সমালোচনার অধিকার প্রদান করল। একই সঙ্গে সায়েন্স ফিকশন শুধু সাহিত্যাভিলাষী বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদ্‌দের একচেটিয়া চারণক্ষেত্র রইল না।

ঘরানা রূপে সায়েন্স ফিকশন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালেই প্রথম সিরিয়াস সাহিত্যের

মর্যাদা অর্জন করেছে। শুধু তাই নয়, ইতিপূর্বে শেলি, ওয়েল্‌স বা চাপেক্‌ প্রমুখ সাহিত্যের মূলধারার মধ্যেই যে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, যার গায়ে গার্নসব্যাক ও তাঁর অনুগামীরা প্রথম 'এস. এফ.' তক্‌মা লাগিয়েছিল, সেই রচনাগুলি নতুনভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠল পারমাণবিক যুগে। এস. এফ.-এর ঐতিহ্য সন্ধানের ক্ষেত্রে এই পারমাণবিক যুগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রোমাঞ্চকর গথিক নভেলের কুলে জন্মেও 'ফ্র্যাংকেনস্টাইন' বিজ্ঞান-চর্চার নৈতিকতার প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টির বলে স্বতন্ত্র হতে পেরেছিল। আর উত্তর-পারমাণবিক যুগে তেজস্ক্রিয়তার বলি-স্বরূপ (মিউটেশন-ঘটিত) যে অসহায় ও করুণ সব দানবের জন্ম বা ক্লোনিঙের আশ্রয়ে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ঘাতক প্রাক্তন এস.-এস. বাহিনী প্রধানের কোনো বীজ জাত অসংখ্য অবিকল নৃশংস নাৎসিদের বাহিনী— আধুনিক সায়েন্স ফিকশনের এই সব চরিত্রদের পূর্বপুরুষরূপে ফ্র্যাংকেনস্টাইনের দানবকে নতুনভাবে চিনলাম আমরা। চাপেকের 'রোবট' ও 'নিউট্‌' বিদ্রোহ বা ওয়েল্‌সের 'টাইম মেশিন' নতুন পরিস্থিতিতে নতুনভাবে অর্থবহ হয়ে উঠল এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে শুরু করল তারা। সায়েন্স ফিকশনে একই 'থিম' অথবা 'ফর্ম' বারংবার ব্যবহারেও জীর্ণ না হয়ে বাস্তবতার স্বরূপ উপলব্ধিতে সাহায্য করে— এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ল উত্তর-পারমাণবিক যুগেই।

পারমাণবিক আতঙ্কের জনক বিজ্ঞান তার হৃতসম্মান কিছুটা উদ্ধার করল মহাকাশে পদার্পণ ক'রে। ১৯৫৭-য় ছোট্ট স্পুৎনিকের ব্লিপ ব্লিপ ধ্বনি, চার বছর পরে গ্যাগারিনের চোখ দিয়ে মহাকাশে ভাসমান নীল পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করা, আর ১৯৬৯-এ চাঁদের মাটিতে নীল আর্মস্ট্রঙের পদক্ষেপ— এইসব কীর্তির পরে মহাকাশ বিজয়ের স্বপ্ন হিরোশিমার স্মৃতিকে নির্বাসিত করবে ভাবা গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, মহাকাশযুগের 'মিথ্‌' বিজ্ঞান নামক দেবতার পবিত্র মন্দির গড়ে তুলবে। সায়েন্স ফিকশনের কল্পিত আতঙ্ককে যেমন ম্লান করে দিয়েছিল হিরোশিমার বাস্তব, তেমনই সায়েন্স ফিকশনের স্বপ্নের চেয়েও মোহময় হয়ে উঠবে মহাকাশ অভিযান— এই আশা সম্পূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল ১৯৮৬-তে চ্যালেঞ্জারের বিস্ফোরনের সঙ্গে। ওয়াশিংটন্‌ থেকে সাংবাদিক ওয়ারেন উন্না চ্যালেঞ্জার ধ্বংসের প্রসঙ্গে লিখলেন : 'a terrifying SF scenario which, alas, was the real thing.'[১৩]

টি. ভি. স্ক্রিনের সম্মুখে উপবিষ্ট আমেরিকার চোখের সামনে স্পেস শাট্‌ল চ্যালেঞ্জার যাত্রা শুরুর পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। চ্যালেঞ্জারের সাত যাত্রীর মধ্যে ছিলেন প্রথম অসামরিক মহাকাশযাত্রী ইতিহাসের শিক্ষিকা ক্রিস্টা ম্যাক্‌অলিফ। নিউ হ্যাম্পশায়ারে তাঁর নিজস্ব স্কুলের যাবতীয় ছাত্রছাত্রী সহ আমেরিকা ও কানাডার পঁচিশ লক্ষ ছাত্রছাত্রী লাইভ শো দেখছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই টি. ভি. যোগে ইতিহাসের পাঠ গ্রহণের কথা তাদের।

নিঃসন্দেহে দুর্ঘটনা, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বলে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কোনো

আদর্শবাদী বৈজ্ঞানিক অভিযানে পাড়ি দেয়নি চ্যালেঞ্জার। জন্মসূত্রেই সামরিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্ট এই স্পেসশিপ শক্তির স্থূল আস্ফালন আর পাবলিসিটির স্বার্থে অকারণ নরমেধ ঘটাল। বস্তুতপক্ষে, এই দুর্ঘটনার বহু পূর্বেই মহাকাশ অভিযান তার প্রতিশ্রুত মূল লক্ষ্য, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান থেকে বিচ্যুত হয়েছে। বিশ্বসৃষ্টি ও প্রাণের রহস্যভেদের পথ ত্যাগ করে তা একদিকে সামরিক শক্তিমত্তার সূচক হয়ে উঠেছে; আর অন্য দিকে কৃত্রিম স্যাটেলাইটের ব্যবসায় (টি. ভি. অনুষ্ঠান প্রচার ইত্যাদির দৌলতে) 'নিকট মহাকাশ' নামে এক খনি থেকে রত্ন সঞ্চয়ে আত্মহারা।

চ্যালেঞ্জারের ঘটনা অবশ্য বিবেকবান এস. এফ.-রচয়িতাদের নতুন কোনো অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মহাশক্তিদের ঠাণ্ডা লড়াই, টেকনোলজির প্রশ্রয়ে একদিকে তৃতীয় বিশ্বে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী অভিযান ও অন্য দিকে 'উন্নত' রাষ্ট্রের বৈভব-মুগ্ধ সামাজিক জীবন— এই সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল লেখকের পক্ষে মহাকাশ-বিজয়ের ক্ষণিক রূপকথায় বিভ্রান্ত হওয়া দুষ্কর। সিরিয়াস সায়েন্স ফিকশন লেখকের পক্ষে বোধহয় দুঃসাধ্যই।

রূপকথা, নীতিকথা, মহাকাব্য, ব্যঙ্গ, কৌতুক, সমালোচনা, আতঙ্ক-সঞ্চার, বিশ্লেষণ— নানা পথে বিচিত্র মতে, বিভিন্ন ফর্ম, থিম্ ও সাহিত্যিক প্রকরণের আশ্রয়ে সায়েন্স ফিকশন নামক সাহিত্যের গবেষণাগারে বিভিন্ন কল্পিত পরিস্থিতিতে মানুষ আর মানবিকতাকে বারবার যাচাই করা হয়েছে। স্বল্প পরিসরে এখানে প্রথমে ইংলন্ড ও আমেরিকায় রচিত এস. এফ.-এর বৈচিত্র্যের দিকেই শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

'সায়েন্স ফিকশনের নব্বই শতাংশই জঞ্জাল।' বলেছিলেন এক সমালোচক। কথাটা সাধারণভাবে 'সাহিত্য'র ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। তবে সায়েন্স ফিকশনের দশ শতাংশের মধ্যেও প্রবল জনপ্রিয় বহু লেখক রয়েছেন যাঁরা প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে জঙ্গি ফ্যাসিস্ট মতাদর্শ প্রচার করেন। যেমন রবার্ট এ. হাইনলাইন। যাঁকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'সোশাল ডারউইনিস্ট' হিসাবে। এই জাতীয় রচনাকারও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

ফ্র্যাংকেনস্টাইনের রচয়িতা মেরি শেলির খুব স্বল্প পরিচিত আরেকটি উপন্যাস 'দা লাস্ট ম্যান' (১৮২৬)। 'প্লেগ'-এর দুরন্ত প্রকোপে মানব সভ্যতা সম্পূর্ণ মুছে যাওয়ার এই কাহিনি সমসাময়িক সমালোচকদের কাছে অসুস্থ চিন্তার ও দূষিত রুচির পরিচায়ক মনে হয়েছিল। পরবর্তীকালে জ্যাক লন্ডনের *'দা স্কার্লেট প্লেগ'* (১৯১৫), ওয়েল্‌সের *'ইন দা ডেজ অফ দা কমেট'* (১৯০৬), ম্যাথু ফিলিপ্‌স শিল-এর *'দা পার্পল্ ক্লাউড'* (১৯০১) ইত্যাদি উপন্যাসে বারবার বিভিন্ন প্রলয়ে মানবজাতির বিলুপ্তিকে ঘিরে কল্প-কাহিনি গড়ে উঠেছে। কিন্তু ১৯৪৫-এর ৮ অগাস্ট-এর পর এই প্রলয়ের সাহিত্য, পৃথিবীর শেষ মানবের কাহিনি যেমন নতুন তাৎপর্য পেল তেমনই জন ক্রিস্টোফার-এর *'দা ডেথ অফ গ্রাস'* (১৯৫৬) বা জন ওয়াইণ্ডহ্যামের *'দা ডে অফ দা ট্রিফিড্‌স'* (১৯৫১)-এর প্রলয়ের কারণ যাই ঘোষিত হোক তার মর্ম অনুধাবনে কোনোই বাধা

ছিল না। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে পারমাণবিক আতঙ্ক-প্রসূত সৃষ্টি, যেমন নেভিল স্যুট-এর *'অন দা বিচ্'* (১৯৫৭) ইত্যাদি সায়েন্স ফিকশন সাহিত্যের চেয়ে চলচ্চিত্রকেই তার প্রধান বাহন হিসাবে লাভ করেছে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরবর্তী দুনিয়ায় সায়েন্স ফিকশন একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নিল। এস. এফ.-এর নিহিত সম্ভাবনা প্রকট হল মানুষের ব্যক্তিগত জগতে, তার মনোজগতে অবগাহনের সুবাদে। ব্যক্তিমানসের উপর দ্রুত, অতি দ্রুত পরিবর্তন এই জগতের প্রতিক্রিয়ার খতিয়ান নেওয়ার কাজে সায়েন্স ফিকশনের কিছু নিজস্ব পদ্ধতির উপযোগিতা সম্বন্ধে দ্বিমত রইল না। শুধু ভিন্ন স্থান ও কালের দৃষ্টিকোণে হাই-টেক্ দৈনন্দিন জীবনের টানাপোড়েন আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শীতল প্রস্তুতির বিকল্প অতিরঞ্জিত চিত্র নয়। শুধু 'মেসেজ' হিসাবে নয়, এই আতঙ্কিত যুগের 'প্রোডাক্ট' রূপেও এস. এফ. পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যের যত গহনে পাড়ি দিতে লাগল, ততই চেনা পৃথিবীকে আর পরিচিত ব্যক্তি মানসকে বারংবার পরখ আর আবিষ্কার করতে লাগল নতুন দৃষ্টিতে। অপার্থিব বুদ্ধিমানদের সঙ্গে স্বদেশের বা নেই-দেশের সাক্ষাৎকারের পর তাদের সম্বন্ধে সংগৃহীত অভিনব তথ্যের চেয়ে সেখানে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থিবদের মনঃসমীক্ষণ।

ফ্রেডারিক পোল এবং *সি. এম. কর্ণব্লুথ* রচিত *'দা স্পেস মার্চেন্ট'* (১৯৫৩) উপন্যাস আধুনিক মূল্যবোধ নিয়ে উদ্দাম কৌতুক আর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ। বিজ্ঞাপন এই কল্পিত জগতের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। প্রচার-মাধ্যম নিজেদের পণ্যের বিক্রি বাড়াতে যেখানে নির্দয়ভাবে গণ-মগজ ধোলাইয়ের সব রকম কৌশল প্রয়োগ করে অভ্যাস-সৃষ্টির জন্য। হালকা চালে লেখা এই সামাজিক সমালোচনামূলক গ্রন্থটির যেমন দংশন তেমনই আবেদন।

ওয়াল্টার মিলার-এর সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের *'এ ক্যান্টিক্ল ফর লাইবোউইৎজ্'* (১৯৫৯) -এর কাহিনি শুরু হচ্ছে একটি পারমাণবিক ধ্বংসকাণ্ডের পরে এবং কয়েক শতাব্দী ধরে মূল্যবোধ-রহিত বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ হয়েছে সেখানে।

ছয়ের দশকের যাঁরা সায়েন্স ফিকশন রচয়িতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁদের মধ্যে আমেরিকার ফিলিপ কে. ডিক্ ও উরসুলা কে. লেগুঁই (LeGuin), এবং ইংলন্ডের জন বানার ও ডি. জি. কম্পটন উল্লেখযোগ্য। ডিক্ সম্বন্ধে ১৯৬৯-এ টাইম্স লিটেরারি সাপ্লিমেন্ট লিখেছিল[৫] :

Of all SF writers prolific Mr. Dick has proved to take all the somewhat shopsoiled props—spaceship, mutants, robots, nuclear bombs, drugs, plane, colonization—and create something of a poetic significance for them.

আসলে ডিক্ প্রচলিত এস. এফ.-এর কথনশৈলির ও সামাজিক মূল্য নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তাঁর এস. এফ.-রচনায়। এস. এফ.-এর গৎ ব্যবহার করেই এস. এফ.-কে সমালোচনা।

ডিকের উপন্যাস 'দা ম্যান ইন দা হাই ক্যাসেল'-এর চরিত্ররা এক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাস্ত। বিদায়ী জার্মান ও জাপানিরা বিভক্ত আমেরিকাকে শাসন করছে। এই সাহিত্য-জগৎ অবশ্য ঠিক আমাদের 'বাস্তব'-এর মতো নয়। একই সঙ্গে একাধিক সময়স্রোত ও বাস্তবতা নিয়ে এই জটিল ও মননশীল উপন্যাসের আখ্যান বর্ণনা করে তার স্বাদ সঞ্চারিত করা সম্ভব নয়। তবে ডিকের কল্পনা থেকে জারিত চরিত্র ও পরিস্থিতি উপন্যাসটির সজীবতার অন্যতম কারণ। জাপানিরা যেখানে কোল্ট রিভলভার, মিকি মাউস ঘড়ি ইত্যাদি মার্কিন অ্যান্টিক সংগ্রহ করে, আমেরিকানরা জাপানিদের সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক আচার-অনুষ্ঠান আয়ত্ত করতে ব্যস্ত, আর জার্মানরা তখনো হিটলারের আদর্শ অনুসরণ করছে, কিন্তু জাপানিরা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিপক্ষ।

ডিক্-এর আরেকটি উপন্যাস 'ইউবিক' (Ubik)-এ মর্গে সুরক্ষিত কয়েকটি জীবন্মৃত মানুষের মন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তবতাকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। 'এলিয়েনেশন', 'এক্সিসটেন্শিয়ালিজম' ইত্যাদি প্রসঙ্গ ডিকের রচনায় স্বাভাবিকভাবেই উত্থাপিত হয়। সম্ভবত ডিক্ তাঁর সেরা স্বীকৃতি পেয়েছেন পোলিশ সাহিত্যিক স্তানিসোয়াভ লেম্-এর কাছ থেকে। 'সায়েন্স ফিকশন স্টাডিজ' পত্রে (মার্চ, ১৯৭৫) 'এ ভিশনারি অ্যামং শার্লাটান্' শীর্ষকে লেম্-এর রচনাটি প্রকাশিত হয়[৫] :

> Dick subjects ordinary people to test terrible under pressure and in his fantastic experiment. Only the psychology of characters remain non-fantastic; he sacrifices order and convention for the sake of vision leading to the same difficulty about genre replacement that we meet within the writings of Kafka.

ইংলন্ডের জন ব্রানার দু-টি উপন্যাসের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'স্ট্যান্ড অন জানজিবার' (১৯৬৮) ও 'দা শিপ লুক্ আপ (১৯৭২)। 'জানা' বলতে এখন আমরা যা বুঝি তা তো আসলে টুকরো টুকরো ভাবে সংগ্রহ করা হয় স্কুলের শিক্ষা, সংবাদপত্র, রেডিও ও টি. ভি.-র খবর বা প্রচার ইত্যাদি থেকেই। এর থেকেই একটা ছাঁচ গড়ে ওঠে আমাদের মনে যার থেকে বিংশ শতাব্দীর বিভ্রান্তিকর পরিবর্তনশীল পরিবেশে মানুষ তার অবস্থান নির্দিষ্ট করে। ঠিক এই টেক্‌নিকেই রচনা করেছেন ব্রানার তাঁর উপন্যাস। ব্রানারের দ্বিতীয় উপন্যাসটিতে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সদ্য পরিবেশ দূষণের প্রাথমিক কুফল লাভ করতে শুরু করেছে। শনাক্ত করতে অসুবিধা হয় এমন কোনো দূর ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্ন নয়। বিক্ষিপ্তভাবে স্থানবিশেষে যা ইতিপূর্বেই ঘটে গেছে বা এখন ঘটছে তাকেই সামান্য প্রসারিত করে লেখক সাবধান করতে চেয়েছেন।

ব্রানারেরই প্রায় সমসাময়িক আরেক ব্রিটিশ লেখক ডি. জি. কম্পটন-এর তিনটি উপন্যাস, *'ফেয়ারওয়েল আর্থস্ ব্লিস্'* (১৯৬৬), *'সিন্থাজয়'* (১৯৬৮) এবং বিশেষ করে *'দা আন্স্লিপিং আই'* (১৯৭৪) চূড়ান্ত সামাজিক ও মানসিক চাপের মধ্যে মানস-

জীবনকে অধ্যয়ন করেছে বিরল দক্ষতায়। শেষোক্ত উপন্যাস এমন একটি সমাজের কাহিনী যেখানে নাগরিকরা সবাই সুখী, প্রত্যেকের জীবন পুরোপুরি সুরক্ষিত। তবু ব্যক্তিজীবনে উত্তেজনার প্রয়োজন থেকেই যায় এবং টি. ভি. সেখানে সেই প্রয়োজন মেটায়। এক মহিলা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পর কাহিনি শুরু হয়। তারপরেই একজন সাংবাদিকের চোখে একটি অস্ত্রোপচার করা হয় যাতে দর্শন সূত্রে তার যাবতীয় অনুভব সরাসরি প্রেরণ করা যায় টি. ভি. স্টুডিও-য়। এই সাংবাদিকের অসুস্থ মহিলাটিকে অনুসরণ, তাঁর বিশ্বাস অর্জন এবং এই মহিলার ব্যক্তিগত জীবনকে পর্যবেক্ষণ—এ সবই সম্প্রচারিত হয়। উত্তেজনার খোরাক যোগাতে মানুষের নিতান্ত ব্যক্তিগত যন্ত্রণার মধ্যেও গোপনে অভিসার চলে।

১৯৬৪-তে মাইকেল মুরকক্ ইংলন্ডের 'নিউ ওয়ার্লডস' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করার পর সায়েন্স ফিকশনের রাজ্যে একটি নতুন আন্দোলনের জন্ম নেয়। মূলত সাহিত্য সচেতনতার আন্দোলন। এই আন্দোলনের আদি প্রবক্তা জে. জি. ব্যালার্ড। তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন (লেখকদের), এস. এফ. ভবিষ্যতের সূত্র ধরে ঠিকই, কিন্তু চিন্তা তার বর্তমানকে নিয়েই। প্রচলিত সাহিত্যকে (মেইন স্ট্রিম-কে) তিনি আখ্যা দিলেন 'রেট্রোস্পেকটিভ ফিকশন', আর এস. এফ.-কে বিশিষ্ট করলেন 'প্রস্পেক্টিভ' হিসাবে। ফলে শুধু নৈতিকতার প্রশ্ন নয়, অধীত বিষয়ের অভিনবত্বও নয়, এস. এফ.-এর আখ্যানরচনা শৈলিরও স্বতন্ত্র একটি দাবির কথা উঠল। ব্যালার্ড মনে করেন গদ্য সাহিত্যে সুররিয়ালিজ্‌মের সেরা বাহন এস. এফ.। ঘন প্রতীকী দুনিয়া, বহু কাল-স্রোত, বিকল্প বিশ্ব, মরুভূমি, সমুদ্র আর স্ফটিকের প্রতিমা, মনোবিশ্লেষণ ও ভাষার প্রতি আকর্ষণ চিহ্নিত করে 'নিউ ওয়েভ'-এর লেখকদের। আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে 'নিউ ওয়েভ'-পন্থীদের। তাঁরা কোকিলের পন্থায় অন্যের বাসায় সাহিত্য প্রসব করার পরীক্ষা চালিয়েছেন। জেম্‌স জয়েস বা রোব্ গ্রিয়ে প্রমুখের বিশিষ্ট স্টাইল অনুসরণই নয়, খোদ এস. এফ.-সাহিত্যের প্যারডি রচনাতেও সিদ্ধহস্ত তাঁরা। এই 'মেটা—এস. এফ.-এর দু'টি উদাহরণ দিচ্ছি।

মার্কিন লেখক নর্মান স্পিনার্ড *'দা আয়রন ড্রিম'* (১৯৭২) নামক উপন্যাসের মধ্যে আরেকটি উপন্যাস পেশ করেন। দ্বিতীয় উপন্যাসটি হল জনৈক অ্যাডলফ হিটলার রচিত ও ১৯৫২-য় 'হিউগো' পুরস্কার প্রাপ্ত * *'দা লর্ড অফ দা স্বস্তিকা'*। এই লেখক রূপী হিটলারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তার রচনার পর একটি পরিশিষ্ট সংবলিত স্পিনার্ডের এই উপন্যাসে আমরা দেখি ইতিহাসের সামান্য একটু বিচ্যুতির ফলে এস. এফ. লেখক হিটলার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই প্রবাসী হয়েছে আমেরিকায়, যদিও তার রচিত উপন্যাসের নায়ককে নাৎসি হিসাবে চিনতে অসুবিধা হয় না। এই নাৎসি-নায়ক পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর তেজস্ক্রিয়তার যত বলি, পঙ্গু বিকৃতদের নিয়ে গড়ে তোলে 'বিশুদ্ধ'

---

* এস. এফ. সাহিত্য পুরস্কারের মধ্যে 'হিউগো' অন্যতম। এ ছাড়া আছে 'নেবুলা অ্যাওয়ার্ড'।

নাগরিকদের এক ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র। স্পিনার্ড এই উপন্যাসে চটুল জনপ্রিয় সায়েন্স ফিকশনের ফ্যাসিস্ট ও মিলিটারি প্রবণতাকে অনুকরণ সূত্রেই তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন।

ফিলিপ জোসে ফার্মার প্রধানত এস. এফ.-এ যৌনতার প্রসঙ্গ অবতারণার কারণেই একটি বিতর্কিত নাম। এ-কথা অনস্বীকার্য যে 'সায়েন্স ফিকশনে কেন যৌনতা নেই?' বা 'সায়েন্স ফিকশনে কি পর্নোগ্রাফি লেখা সম্ভব?' ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর সরবরাহ করার জন্যই সচেতনভাবে ফার্মার এই স্বল্প-ব্যবহৃত রাস্তায় পরিক্রমাকে অভিনবত্ব ও জনপ্রিয়তা উভয়ই অর্জনের পক্ষে সেরা বিবেচনা করেছিলেন। তাঁর 'ফ্লেশ' (১৯৬০) উপন্যাসের সিগনেট সংস্করণের প্রচ্ছদে উল্লিখিত হয়েছিল : 'New Earth—where lust is religion, and love is a violent public spectacle! A startling experience in science fiction!'। কিন্তু তাঁর এস. এফ. রচনা বিতর্কিত হয়েও যৌন-উত্তেজক রূপে সাফল্য অর্জন করে নি। ফার্মার-এর 'লর্ড টাইগার' (Lord Tyger) এর সার্থকতা ওই গতে-বাঁধা এস. এফ.-এর প্যারডি রচনারই সূত্রে। ১৯৭০-এ প্রকাশিত এই উপন্যাসে এডগার রাইস বারোস্‌-এর এক গোঁড়া ভক্ত বাস্তবে টারজানের গল্পটিকে নকল করতে চেয়েছিল। প্রথম পরীক্ষায় ইংলন্ডের এক লর্ডের পুত্রকে অপহরণ করে বাঁদরের হাতে সমর্পণ করা হয়। সে কিন্তু কোনো ভাষাই শিখতে পারে না শেষ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পরীক্ষায় আরেক লর্ড-পুত্রকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। কপট বাঁদর রূপে সার্কাসের বামনরা প্রতিপালিত করে তাকে। এই দ্বিতীয় টারজান কী ভাবে সারা জঙ্গলের যৌন-যন্ত্রণা হয়ে উঠল তারই এক প্রমত্ত কাহিনি এই উপন্যাস।

'নিউ ওয়েভ' মুভমেন্টের পাশাপাশি 'ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট'-এর র‍্যাডিকাল সমাজ-সচেতন অংশ সায়েন্স ফিকশন-কে তাঁদের অন্যতম বাহন সাব্যস্ত করেছেন। ইংলন্ডের উইমেন্‌স প্রেস থেকে একটি সায়েন্স ফিকশন সিরিজে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বহুদূর আর ভবিষ্যৎ থেকে এখন ও এখানের এই সব রচনায় নারীজীবনের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচিত—আক্রান্ত নারীসমাজ, ক্ষমতাসীন মহিলা, একক মহিলা বা যূথবদ্ধ মহিলা। 'ফেমিনিস্ট' লেখিকাদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতি জোয়ানা রাস্‌ (জন্ম ১৯৩৭)। 'দা ফিমেল ম্যান' উপন্যাস বা 'এক্সট্রা (অর্ডিনারি) পিপ্‌ল' গল্পগ্রন্থ বিষয়ের গুরুত্ব ছাড়াও সমৃদ্ধ ভাষা ও বলিষ্ঠ গদ্যের গুণেও বিশিষ্ট। ১৯৮৪-তে প্রকাশিত ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা সুজেট হ্যাডেন এল্‌গিন-এর 'নেটিভ টাঙ্‌' (Native Tongue) একটি অভিনব কীর্তি। ভবিষ্যতের এই পৃথিবীতে পুরুষরা সর্বশক্তিমান, নারী আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং ভিন্‌গ্রহের সভ্যতার সঙ্গে তখন সংযোগ সাধিত হয়েছে। নক্ষত্রলোকে উপনিবেশ বিস্তারের এই যুগে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা এলিয়েনদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর দায়িত্ব লাভ করার সূত্রে অর্জন করেছে প্রভূত ক্ষমতা। বংশ পরম্পরায় প্রভুত্ব চালিয়ে যাচ্ছে তারা। লেখিকা এই উপন্যাসে এমন একটি সমাজ তৈরি করেছেন যেখানে আন্তঃনাক্ষত্রিক বাণিজ্য ভাষা-শিক্ষাকে একটি মূল্যবান পণ্যে পরিণত করেছে। এরই বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র একটি

নারীগোষ্ঠী লাডেন্ নামে নিজেদের মধ্যে একটি গুপ্ত ভাষা বিকশিত করে সংগঠিত করছে প্রতিরোধ। ভাষা-অস্ত্রকে তারাও ব্যবহার করতে পারে মুক্তি অর্জনের স্বার্থে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সায়েন্স ফিকশনের বিচিত্র সম্ভারের মধ্যে খুবই বিবর্ণ আইজ্যাক অ্যাসিমভ ও আর্থার সি. ক্লার্ক-এর সৃজনধর্মী রচনা। কিন্তু প্রচার-মাধ্যম ও পণ্য-বিক্রেতা সমাজের মধ্যে কোনো গূঢ় সাধারণ স্বার্থরক্ষার সুবাদেই নিশ্চয় এই দুই লেখকের রচনা ছাড়া বিদেশি সায়েন্স ফিকশন বর্তমানে কলকাতায় অন্তত রীতিমতো দুষ্প্রাপ্য। সাধারণভাবে এই দুই লেখকের সাহিত্যকর্মে সমকালীন বিশ্বের কোনো সমস্যার আঁচ পড়েনি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর অন্ধ আস্থা বজায় রাখার জন্য তাঁরা ইতিহাসের শিক্ষাকে উপেক্ষা করে রোমান্সের জাল বুনেছেন। বিজ্ঞান ও মিস্টিসিজম জড়িয়ে এক ধরনের ছদ্ম-দার্শনিকতারও ভাণ আছে ক্লার্কের রচনায়। অন্য দিকে অ্যাসিমভ গার্নসব্যাক-মার্কা স্পেস অ্যাডভেঞ্চার রচনা করেছেন। রোবট-কাহিনি রচনায় অ্যাসিমভের সাফল্য আসলে এক ধরনের ধাঁধা জাতীয় খেলা নির্মাণের কুশলতা-নির্ভর। প্রত্যেক রোবটের অবশ্য পালনীয় তিনটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন তিনি। তারপর তারই ফাঁক-ফোকর দিয়ে কত রকম পরিস্থিতি ও সমস্যা সৃষ্টি ও সমাধান করা যায় তার পরীক্ষা চালানো হয় গল্পে। গল্পের কাঠামো নির্দিষ্ট করে দিয়ে তারপর রচনা দাঁড় করানোয় সিদ্ধহস্ত অ্যাসিমভ অনেক বেশি সফল গোয়েন্দা কাহিনিকার হিসাবে। অবশ্য দুই লেখকেরই জনপ্রিয়তার স্বতন্ত্র কিছু কারণ আছে। দু-জনেই 'পপুলার সায়েন্স' রচনায় কৃতী।

রে ব্র্যাডবেরি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের লেখকদের মধ্যে সায়েন্স ফিকশন এলাকার বাইরে সর্বাধিক পরিচিত ও সম্মানিত এস. এফ.-রচয়িতা রে ব্র্যাডবেরি। আমেরিকার ইলিনয়েসের Waukegan-এ তাঁর জন্ম ১৯২০-র ২২ অগাস্ট। 'বিশ্বের সেরা' নামধারী 'ভৌতিক', 'রোমাঞ্চ', 'রহস্য', 'ফ্যান্টাসি' ও 'সায়েন্স ফিকশন' গল্পের যেকোনো সুপ্রচলিত সংকলনেই ব্র্যাডবেরি অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, সেরা আমেরিকান গল্পের বহু সংকলনেও ব্র্যাডবেরি উপস্থিত। 'ও হেনরি মেমোরিয়াল' পুরস্কারও পেয়েছেন। সোভিয়েত রাশিয়ার এক সমালোচক লিখেছেন যে ইংরেজি ভাষার আধুনিক এস. এফ.-রচয়িতাদের মধ্যে রাশিয়ায় সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্র্যাডবেরি। 'ব্র্যাডবেরি মার্কিন মুলুকের বিবেক।'

গথিক আতঙ্ক কাহিনিই লিখুন, অথবা সায়েন্স ফিকশনই লিখুন, লেখকের নিজস্ব ছোঁয়া ও মেজাজের দীপ্তি তাকে ব্র্যাডবেরির নিজস্ব চরিত্রের ছাপে চিহ্নিত করে রাখে। শুধু তাই নয়, ব্র্যাডবেরির উপন্যাস বা গল্পের মধ্যে 'রোমাঞ্চ', 'অপ্রাকৃত' ও 'সায়েন্স ফিকশন' এমনই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে যে সমালোচকরা তাকে কোন নামে ডাকবেন, কোন সংজ্ঞার ভিত্তিতে কী আখ্যা দেবেন নির্ধারণ করতে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন।

'An extreme elegiac sentiment and gentle fantasy, touched with the

eerie and uncanny. It is a special preserve, very much his own...' ব্র্যাডবেরি সম্পর্কে দুই সাহিত্য সমালোচকের মন্তব্য[৮]। ব্র্যাডবেরির দুনিয়া রুক্ষতা, আতঙ্ক, অতিপ্রাকৃত ও রোমাঞ্চকর ঘটনার উপর পরিব্যাপ্ত ভাষা ও স্টাইলের প্রসাদে বোনা কাব্যময় কুয়াশা। পরিবেশিত ঘটনা বা চিন্তার সঙ্গে পরিবেশনের ভঙ্গির এই দ্বান্দ্বিকতা তাঁর রচনাকে আন্দোলিত করে আশা আর হতাশার মধ্যে।

বিজ্ঞানের ভাষা আন্তর্জাতিক হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের সাধারণ চরিত্র অনুসারে সায়েন্স ফিকশনেরও জন্ম ও পুষ্টি নিজের দেশের জল মাটি আর হাওয়াতেই। ইয়াংকি সভ্যতার নয়, আমেরিকাবাসীর দেশ যে আমেরিকা, তার এবং বিশেষ করে নিজের প্রাদেশিক জন্মভূমিরই স্বাদ আর গন্ধে ভরা ব্র্যাডবেরি।

১৯৫০-এ প্রকাশিত হয় ব্র্যাডবেরির উপন্যাস 'দা মার্শিয়ান ক্রনিক্‌লস'। 'টুমরো' পত্রিকার সমালোচনায় ক্রিস্টোফার ইশারউড আত্মহারা প্রশংসা করেন, 'the sheer lift and power of a truly original imagination'-এর। ব্র্যাডবেরিকে 'আবিষ্কার' করার জন্য গর্বিত বোধ করেন তিনি। ইশারউডের এই সমালোচনা সূত্রেই ব্র্যাডবেরি প্রথম জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেন।[৫] চারের দশকে লেখা কিছু ছোটো গল্পের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে রচিত এই উপন্যাসটি প্রথমে প্রকাশিত হয় *'দা সিল্‌ভার লোকাস্টস'* (১৯৫০) নামে।

মঙ্গলগ্রহে মানুষদের হানা দেওয়ার এই উপাখ্যান শুরু হচ্ছে ১৯৯৯-এর অগাস্ট মাসে একটি গ্রীষ্মের রাতে। অদ্ভুত সব চিন্তা অকস্মাৎ উদিত হল মঙ্গলবাসীদের মধ্যে। সম্পূর্ণ পরদেশি এক ভাষায়— ইংরেজিতে— মঙ্গলবাসী এক মহিলা নিজের অজান্তে হঠাৎ আবৃত্তি করলেন : 'She walks in beauty, like the night/of cloudless climes and starry skies...' সারা গ্রহ জুড়েই সে রাতে শিশু, মহিলা ও পুরুষরা এইরকম অপরিচিত ভাষায় কবিতা, ছড়া বা সংলাপ ইত্যাদি উচ্চারণ করে স্বয়ং নিজেরা স্তম্ভিত হচ্ছিল। একটা অশুভ কিছু ঘটতে চলেছে তারই অবশ্যম্ভাবী ইঙ্গিত, কারণ এই গ্রহের বাসিন্দারা টেলিপ্যাথি শক্তিধর। মানুষ সশরীরে আবির্ভূত হওয়ার আগেই তাদের চিন্তাজগৎ মঙ্গলবাসীদের মনে হানা দিয়েছে।

এই উপন্যাসে প্রযুক্তিগতভাবে মঙ্গল কতখানি অগ্রসর সেটা খুব স্পষ্ট নয়। কিছুটা প্রাচীন গ্রিকদের মতো মার্বেল অ্যাম্ফিথিয়েটারে তারা কনসার্টের আসর বসায়, তাদের সন্তানরা খেলা করে মশাল-প্রজ্বলিত পথে পথে। আবার খাল দিয়ে 'ব্রোঞ্জের ফুলের মতো পেলব' নৌকার চলাচল আর রুপালি নীরব লাভা-র বুদবুদ-ওঠা টেবিলে রান্নার কাজ সারার উল্লেখও রয়েছে। কিন্তু মনে হয় মঙ্গলবাসীরা সচেতনভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে সমাজে কলকব্জাকে একটি বিনীত ভূমিকা অর্পণ করেছে। যন্ত্রপাতির সমাদর সেখানে শিল্প-মাধ্যম হিসাবে, খেলনা হিসাবে, গ্রামীণ জীবনধারার অনুগ্র সমর্থন হিসাবে। গল্পে দেখা না দিলেও, পৃথিবী থেকে মঙ্গলের পথে ধাবমান রকেট-যানের অস্তিত্বই এমন

এক প্রযুক্তিকে নির্দিষ্ট করে যা মঙ্গলবাসীদের জীবনধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান ও তাকে ধ্বংস করার শক্তি ধরে।

একক যাত্রীবাহী রকেটে একে একে মানুষ এসে নামে মঙ্গলে। বিভিন্ন মঙ্গলবাসীর সঙ্গে মানুষের এই একাধিক প্রথম সংযোগের বিবিধ ফলাফল থেকে আমরা জানতে পারি মঙ্গলের সভ্যতার ও ব্যক্তি হিসাবে মঙ্গলবাসীদের বৈচিত্র্যের কথা। ভুবন-বিদারী গর্জনে একটি রকেট অবতরণের পর এক ঈর্ষাকাতর মঙ্গলবাসী সঙ্গে সঙ্গে তার চালককে হত্যা করে, কারণ সে ভয় পেয়েছিল তার স্ত্রী এই পৃথিবীবাসীর প্রেমে পড়তে পারে। পরবর্তী পর্বে অভিযাত্রীদের একটি পুরো দল যে-জায়গায় নামে, দেখে মনে হয় বুঝি ছোট্ট কোনো আমেরিকান নগরীরই উপকণ্ঠ। অভিযাত্রীদের স্বাগত জানায় তাদেরই পিতা, মাতা, আত্মীয় আর বন্ধুরা। যাদের মধ্যে অনেকেই মৃত বলে জানা ছিল এত দিন। টেলিপ্যাথি ক্ষমতাবলে অভিযাত্রীদের মন পড়ে নিয়ে মঙ্গলবাসীরাই পুনঃসৃজন করেছিল এই শহর আর তার বাসিন্দাদের। অভিযাত্রীরা দল ভেঙে যে-যার নিজের পুরোনো গৃহের আকর্ষণে বিভিন্ন পথ ধরে এবং সবাই নিহত হয়।

কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ ও মঙ্গলবাসী পরস্পর নিধনে সম্মুখীন হয় না। প্রথম বিফলতার পর মানুষ যখন দলবদ্ধভাবে পুরো প্রস্তুতি নিয়ে হাজির হল, তত দিনে অধিকাংশ মঙ্গলবাসী উজাড় হয়ে গেছে মহামারিতে। পৃথিবী থেকে সংক্রামিত রোগের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিষেধক ছিল না। গুটিকতক ভাগ্যবান মঙ্গলবাসী শহর ত্যাগ করে আশ্রয় নেয় পর্বতদেশে। মঙ্গলের আগ্রাসন এবার পুরোদমে শুরু হয়। রকেট বোঝাই করে কাঠকুটো ও নির্মাণ সামগ্রী আসে। শহর তৈরি হয়, রাস্তা গড়া হয়, পোঁতা হয় পৃথিবী থেকে আনা গাছ-গাছালি। উপত্যকা পাহাড় আর খালবিলের নামকরণ করা হয় রকেট-পাইলট ও অভিযাত্রীদের নাম ধরে, পৃথিবীর চেনা জায়গার নামে। হানাদাররা উপনিবেশকে তাদের ফেলে-আসা বাসস্থানের চেহারা দিতে সর্বদাই উৎসুক। 'দা অফ সিজ্‌ন' নামে অধ্যায়ে রাস্তার ধারে স্যাম পার্কহিল একটি 'হট্ ডগ' স্ট্যান্ড খোলে। নিওন লাইট থেকে আলো, মিউজ্কি বক্স থেকে সংগীত বর্ষিত হয়। এই রাস্তা অবিলম্বে সরগরম হয়ে উঠবে বলে তার ধারণা। কিন্তু মঙ্গলে পুরোপুরি গুছিয়ে বসার আগেই খবর এল পৃথিবীতে পারমাণবিক মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। বেশির ভাগ মানুষই মঙ্গল ছেড়ে পাড়ি দিল পৃথিবীতে। মঙ্গলের পরিত্যক্ত প্রায় ভৌতিক শহরে কিছু পড়ে-থাকা মানুষের পরিণতির কাহিনি শুনিয়ে শেষ গল্প, 'দা মিলিয়ন ইয়ার পিকনিক্'-এ ব্র্যাডবেরি পৃথিবী থেকে শেষ দু-টি রকেটের যাত্রীদের নিয়ে এলেন আবার মঙ্গলে। ছুটি কাটাবার নামে টিমোথি, মাইকেল আর রবার্টকে নিয়ে তার পিতা মাতা মঙ্গলে এসে মাছ ধরতে বেরোলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পিতা তাদের বাহক রকেটটিকে ধ্বংস করে প্রত্যাবর্তনের পথটি রুদ্ধ করে দিলেন। পারমাণবিক যুদ্ধে বিধ্বস্ত পৃথিবী থেকে আবার যদি হানাদার আসে, তাহলে রকেটটিই তাদের উপস্থিতির জানান দেবে। পুত্রদের মঙ্গলবাসী দেখার

কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পিতা তাদের নিয়ে আসেন একটি খালের ধারে। জলে পরিবারের সব সদস্যদের প্রতিফলন দেখিয়ে তিনি বলেন, 'মঙ্গলবাসীদের এবার দেখলে তো?'

বিষাদময় ও কাব্যিক, শান্ত ও গভীরভাবে মানবিক, ছেলেবেলার খেলনার মতো অকিঞ্চিৎকর অথচ তাৎপর্যময় খুঁটিনাটির কবিতায় ভরা ব্র্যাডবেরির এই জগৎ, যেখানে মানুষকে পিছনে ফেলে বিজ্ঞান তার আত্মহারা দৌড়ে বিরাট এক ব্যবধান তৈরি করেছে। ব্র্যাডবেরির আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস 'ফারেনহাইট ৪৫১' বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক ত্রুফো চলচ্চিত্রায়িত করেন। (চিত্রনাট্য রচনা করেন ব্র্যাডবেরি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ব্র্যাডবেরি 'মবি ডিক', 'দা ড্রিমার্স' ও 'দা রক ক্রায়েড আউট' ইত্যাদি চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন।) ফারেনহাইট ৪৫১ সেই তাপমাত্রা যাতে কাগজে আগুন ধরে। ভবিষ্যতের এক প্রযুক্তি-উন্নত সমাজের কাহিনি, যেখানে বই-পড়া নিষিদ্ধ। টি. ভি.-কেন্দ্রিক অডোভিশুয়াল দুনিয়ায় অপসংস্কৃতি রোধ করার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনি নিয়মিত গ্রন্থ-দহনের অভিযান চালায়। এই নৈরাশ্যময় পরিস্থিতির সমান্তরালে পরিবেশিত হয় এক অদ্ভুত প্রতিরোধ। স্বেচ্ছা-নির্বাসিত কিছু মানুষ গোপনে এক স্থানে মিলিত হয়। তারা প্রত্যেকে এক একটি গ্রন্থ নির্বাচন করে তার আদ্যোপান্ত মুখস্থ করতে শুরু করে। বইয়ের পাতা পড়তে থাকে আর মনের পাতা ভরে ওঠে। উত্তরপুরুষদের জন্য ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি।

ব্র্যাডবেরির রচনায় প্লট অপেক্ষা ভাষা, আবহ ও মেজাজ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে তাঁর ছোটগল্পের আলোচনা করার সময়ে কাহিনির সার-সংক্ষেপ পেশ করাটা বাঞ্ছনীয় নয়। এখানে শুধু বিভিন্ন গল্পে এস. এফ.-এরই বহু ব্যবহৃত নানা উপকরণ ও প্রকরণ, যেমন পৃথিবীর শেষ মানুষ, মনস্টার, মহাকাশে পাড়ি, টাইম মেশিন, কী অদৃশ্য মানুষ ইত্যাদিকে তিনি কত অসাধারণ দক্ষতায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকা অর্পণ করেছেন—তারই কিছু উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

'দা পেডেস্ট্রিয়ান' গল্পে একটি ছোট্ট শহরে টি. ভি. স্ক্রিনের সামনে বিহ্বল পতঙ্গের মতো সকলে যখন গৃহবন্দী, একটি মানুষ শুধু পথে পথে পায়ে হেঁটে বেড়ায়। রাত্রির আর সমুদ্রের ঘ্রাণ নেয়। পায়ে হেঁটে বেড়াতে সে ভালোবাসে। পুলিশ ফৌজের দূর-নিয়ন্ত্রিত চালক-বিহীন একটি গাড়ি (পুলিশের একমাত্র গাড়ি) মাতালের মতো টহল দিতে দিতে আকস্মিকভাবে পথচারীকে আবিষ্কার করে। এবং দীর্ঘ জেরার পর তাকে গ্রেপ্তার করে। কারণ 'বেড়াতে ভালো লাগে' এই দুর্বোধ্য কৈফিয়তের কোনো মীমাংসা করতে পারে না যন্ত্র-মগজ। প্রতিবন্ধী-সুলভ আচরণ সংক্রান্ত গবেষণার 'সাইকিয়াট্রিক সেন্টার'-এ পথচারীকে প্রেরণ করার কথা জানিয়ে গল্পটি শেষ হয়।

'দা ফগ হর্ন' গল্পে নিঃসঙ্গ প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী লাইটহাউসের বিপদ সংকেত শুনে হারানো সঙ্গীর আহ্বান বলে ভুল করে।

'এ সাউন্ড অফ থান্ডার'-এ TIME SAFARI INC. নামে সংস্থার টাইম মেশিনে

চড়ার টিকিট কিনে এক জন অতীতে পাড়ি দেয়। অসতর্ক যাত্রীর পদপিষ্ট হয়ে কয়েক কোটি বছর পূর্বে মারা যায় একটি প্রজাপতি। বর্তমানে প্রত্যাবর্তনের পর যাত্রীর চোখে পড়ে সাইনবোর্ডে কালান্তরে পাড়ি দেওয়ার এই সংস্থাটির নামের বানানে কিছু গরমিল : TYME SEFARI INO.। খোঁজ নিয়ে জানতে পারে সে পাড়ি দেওয়ার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের যে-ফল বেরিয়েছিল তাও পাল্টে গেছে। নির্বাচিত হয়েছেন স্বৈরাচারী এক ভিন্ন শাসক। সুদূর অতীতে সামান্য একটি প্রজাপতির নিধনের ফলে পুরো ইকোলজিকাল সিস্টেম এতটাই বিপর্যস্ত।

'দা ইনভিজিব্‌ল বয়' গল্পের নিঃসঙ্গ ডাইনি মানুষকে অদৃশ্য করে দেওয়ার মন্ত্র জানে বলে ভাণ করে। উদ্দেশ্য, এই লোভ দেখিয়ে একটি বালককে তার কাছে আটকে রাখা। ডাইনির মুখ থেকেই ছেলেটি শুনতে পায় কীভাবে তার হাত-পা থেকে সমস্ত শরীর আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সে বিশ্বাস করে। তারপর ডাইনি আবার মন্ত্র পড়ে তাকে দৃশ্য করে দেয়। ছেলেটি ছুটে পালায়। তারপর নিঃসঙ্গ ডাইনি একা খাওয়ার টেবিলে বসে সত্যিকারের অদৃশ্য এক বালকের সঙ্গে গল্প জোড়ে।

শুক্র, মঙ্গল ও শনিগ্রহে তখন নিয়মিত যাত্রীবাহী রকেট সার্ভিস শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু 'দা রকেট' গল্পের নায়ক ফিওরেল্লো বোদোনি সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়েও সপরিবারে মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করতে পারেনি। মহাকাশ ভ্রমণের একটি টিকিট সে কাটতে পারে, কিন্তু কে যাবে? লটারি করা হয়, কিন্তু ভাগ্যবান অন্যদের বঞ্চিত করতে চায় না। একে একে পরিবারের সবাই অস্বীকার করে একা সুযোগ নিতে। বোদোনি তারপরে এক দিন দু-হাজার ডলার দিয়ে কিনে আনে বাতিল রকেটের এক খোল। স্বয়ং মহাকাশযানের চালকের দায়িত্ব নিয়ে উঠে বসে সেই রকেটে। তারপর বাড়ির উঠোনের সেই লঞ্চিং প্যাড থেকেই নিশ্চল মহাকাশযানে করে সপরিবারে যাত্রা করে তারা। রোমাঞ্চকর মঙ্গল পরিক্রমা সেরে নিরাপদে অবতরণও করে সেই স্থানে, যেখান থেকে রকেট নড়েনি এক বিন্দু।

'দা স্মাইল' গল্পে আবার আমাদেরই চেনা পৃথিবীর এক বিধ্বস্ত রূপ। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনকে ধ্বংস করার সুযোগ পেলে তখন অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় উৎসব। এমনই এক উৎসবে মোনালিসার ছবি ছিন্ন করা হল তুমুল উদ্দীপনায়। উৎসবের পর বাড়ি ফিরে এসেছে টম, রাত্রে বিছানায় তার গায়ে যখন চাঁদের একফালি আলো, শ্বাস বন্ধ করে সন্তর্পণে মুঠো খুলল। সারা বিশ্ব তখন ঘুমোচ্ছে, জেগে আছে শুধু ছেঁড়া ক্যানভাসের দোমড়ানো ফালিতে একটি হাসি। টম চোখ বোজার পরে অন্ধকারেও জেগে থাকে সেই হাসি। টম ঘুমিয়ে পড়ার পরেও থাকে। পৃথিবী জুড়িয়ে আসে, শীতল আকাশ বেয়ে চাঁদ উঠল, আবার নেমেও এলো—প্রভাত সমাগত—হাসিটি তবু অমলিন, উষ্ণ আর শান্ত।

এই নমুনাস্বরূপ গল্পগুলি ব্র্যাডবেরির যে গল্পসংকলনগুলি থেকে আহৃত—'দা

ইলাস্‌ট্রেটেড ম্যান' (১৯৫২), *'দা গোল্ডেন অ্যাপেল্‌স অফ দা সান্‌'* (১৯৫৩), *'দা ডে ইট রেন্‌ড্‌ ফর এভার'* (১৯৫৯) বা *'দা মেশিনারিজ অফ জয়'* (১৯৬৬)—সাহিত্যরসিক মানুষ প্রত্যেকে উপভোগ করবেন।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ও স্ত্রুগার্ৎস্কি ভ্রাতৃদ্বয়

ব্র্যাডবেরির সূত্র ধরেই সোভিয়েত রাশিয়ায় সায়েন্স ফিকশন-চর্চার প্রসঙ্গে প্রবেশ করা যায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ব্র্যাডবেরি সম্বন্ধে রুশ সমালোচকের মন্তব্য। রাশিয়ায় ব্র্যাডবেরির সমাদর রুশ এস. এফ.-এর বৈশিষ্ট্যেরও ইঙ্গিত বহন করে।

ইংলন্ড ও আমেরিকার তুলনায় সোভিয়েত রাশিয়ায় অনেক বেশি সমাদর সায়েন্স ফিকশনের। এবং তা শুধু মনোরঞ্জক হালকা সাহিত্য হিসাবেই নয়। বর্তমানে প্রতি বছর প্রকাশিত এস. এফ. গ্রন্থের শিরোনামের সংখ্যা বা শিরোনাম-পিছু মুদ্রিত গ্রন্থসংখ্যার বিচারেও রাশিয়া পশ্চিমি যেকোনো দেশের চেয়ে এগিয়ে আছে।

মহাকাশ দখলের মার্কিন-সোভিয়েত প্রতিযোগিতা পরিভাষার মধ্যেও প্রতিফলিত। মহাকাশচারী মার্কিন মুলুকে অ্যাস্ট্রোনট আর রাশিয়ায় 'কস্‌মোনট'। দুই বৃহৎ শক্তির এই সংঘাতের একটি পক্ষ হিসাবে সোভিয়েত সায়েন্স ফিকশনের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা আমাদের অভিপ্রেত নয়, কারণ এই জাতীয় মার্কিন রচনাকেও বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

রুশ সায়েন্স ফিকশনের সেই চারিত্রিক লক্ষণই আমাদের আকর্ষণ করে যা গড়ে উঠেছে তাদের জাতীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্য অনুসারে। এক ঐতিহাসিক ঘটনা ১৯১৮-য় পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। আর সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের স্পর্শেই সজীব সোভিয়েত এস. এফ.।

ভোগ্যপণ্য বিক্রেতাদের কোলাহলমুখর ইঁদুর-দৌড়ে উন্মত্ত বিভ্রান্ত ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় অবাধ বাণিজ্যের সুবিধাভোগী সমাজে সিরিয়াস এস. এফ.-এর মূল সুরে দার্শনিক আশঙ্কা আর বিষণ্ণতা। প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সামাজিক উন্নয়নের তাল কেটে যাওয়ার যন্ত্রণা। অপ্রতিহত বর্তমানকে ভবিষ্যতের পর্দায় প্রক্ষেপ করে আতঙ্কচিত্র দর্শন।

বিপরীতে, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় বিজ্ঞানকে রাজনীতি ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে রাখার স্বীকৃত আদর্শ থেকে জন্ম নিতে পেরেছে কিছু আলোকিত ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন-দুনিয়া। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ভবিষ্যতের ইতিহাস রচনায় সোভিয়েত সায়েন্স ফিকশনের মুখ্য প্রতিপক্ষ স্বয়ং প্রকৃতি। একথাও মনে করার কারণ নেই যে আশাবাদী এই জাতীয় রচনা সর্বদাই সমতল, নিরুত্তাপ, একমাত্রিক। প্রকৃতিকে বিজয়ের পথে সেখানে সম্মুখীন হতে হয় পরিবেশদূষণ ও ইকোলজিকাল সিস্টেমের সমস্যার, অনগ্রসর 'এলিয়েন' সভ্যতায় হস্তক্ষেপের নৈতিক অধিকার (উদ্দেশ্য মহৎ হলেও) ইত্যাদি জটিলতার।

মহাকাশে স্পুৎনিকের ব্লিপ ব্লিপ ধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ১৯৫৭-য় আধুনিক সোভিয়েত এস. এফ.-এর ভিত্তিস্বরূপ আইভান ইয়েফ্রেমভের 'অ্যান্দ্রোমিদা নেবুলা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ২৮০ আলোকবর্ষ দূরে ৩০০০ সালের এক আদর্শবাদী শ্রেণিহীন কমিউনিস্ট সমাজের ইউটোপিয়া। অদূর ভবিষ্যতে এস. এফ.-এর ধারা কোনো সার্থকতার পথ নেবে অনুধাবন করে ইয়েফ্রেমভ লিখেছিলেন : 'এস. এফ.-এর উদ্দেশ্যকে শুধু বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার মধ্যে অবনমিত করা যায় না। মানুষের জীবন ও মনোজগতের উপর বিজ্ঞানের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিঘাত— এই নিয়েই এস. এফ.-এর আদত কারবার।'[২]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশ্রয়ে কল্পিত বিচিত্র দুনিয়ায় মানুষের প্রতিক্রিয়া কী হবে— যুক্তি-নির্ভর মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষা, মানবিক সম্পর্কের নতুন নকশা, নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে নতুন উপলব্ধি, ভবিষ্যৎ ইতিহাসের বিভিন্ন প্রকল্প, অনুসন্ধানের কার্য-কারণ তাড়িত যান্ত্রিকতা বর্জন করে শিল্পের নিজস্ব যুক্তিধারার আশ্রয় এবং সবার উপরে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির তথা সমাজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দানের সুবাদে সোভিয়েত এস. এফ. বহু স্তরের আবেদনে সমৃদ্ধ।

সোভিয়েত এস. এফ.-এর স্বাতন্ত্র্য-উজ্জ্বল, প্রতিনিধিত্ব করার মতো একটি কাহিনি লিওনিদ পানাসেংকোর 'দা ডায়ালগ'। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ। ভিন্ন এক গ্যালাক্সির উন্নততর সভ্যতার একজন অপার্থিব যাত্রী মহাকাশযানে করে টহলে বেরিয়ে পৃথিবীর কাছে পৌঁছেছে। সেদিন ১৭ ফেব্রুয়ারি। ধর্মান্ধরা একটি মানুষকে টেনে নিয়ে চলেছে ভেনিসের Campo di Fiori চত্বরে। জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করা হবে নোলা-র বাসিন্দা এই বিধর্মীকে। মানুষটির নাম জিওর্দানো ব্রুনো। সত্যান্বেষী মহাজ্ঞানী এই মানুষটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষণশীলতা, ভণ্ডামি ও সাধারণভাবে অনগ্রসর সমাজের হাত থেকে রক্ষা ও উদ্ধার করা নৈতিক দায়িত্ব মনে করে ভিন্‌গ্রহী আগন্তুক। অশরীরী এই এলিয়েনের আগমন শুধু ব্রুনোই উপলব্ধি করেন। কিন্তু ভিন্‌গ্রহীকে হস্তক্ষেপ না করতে অনুরোধ করেন ব্রুনো, 'আগন্তুক এ কাজ করো না তুমি। তা হলে এটা হবে আরেকটা অলৌকিক ঘটনা, পুরোহিতদের আরেকটা বিজয়। তারা সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করবে শয়তান রক্ষা করেছে আমায়। ...এমনিতেই বহু অলৌকিক কাণ্ড বানিয়ে রেখেছে ধর্মীয় মন্দির। আমি আমার নিজের পথ ধরেই এগিয়েছি এবং এইটাই তার যুক্তিপূর্ণ প্রান্ত। আমি জানতাম যে জীবন্ত দগ্ধ হওয়া এড়াতে পারবো না। ... তা হোক। অলৌকিক কাণ্ড নয়, ওদের প্রয়োজন একটি বলি...।' ইতিহাসের দাবি, ব্রুনোকে শহিদ হয়েই নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে।

এস. এফ. তার অলৌকিক সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের মধ্যস্থতায় এইভাবে গড়ে তোলে বাস্তবের অলৌকিকের বিরুদ্ধে সচেতনতা। অনুন্নত সমাজের বা রাষ্ট্রের উপর হস্তক্ষেপ না-করা— নন-ইন্টারভেন্‌শন— গল্পের এই থিম্‌টিও লক্ষণীয়। এই থিম্‌ প্ররোচিত করেছে সোভিয়েত এস. এফ.-লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় আর্কাদি ও বোরিস্‌ স্ত্রুগার্ৎস্‌কি ভ্রাতৃদ্বয়কে।

এই লেখক-জুটির মধ্যে আর্কাদি (জন্ম ১৯২৫) জাপানি ভাষা ও সাহিত্যবিদ্, আর বোরিস (জন্ম ১৯৩৩) মেকানিক্স ও গণিতবিদ্যার স্নাতক। ১৯৫৭ থেকে তাঁরা সায়েন্স ফিকশন রচনা শুরু করেন। তাঁদের প্রথম দিকের উপন্যাস ও গল্প, 'দা ল্যান্ড অফ দা পার্পল ক্লাউড', 'রিটার্ন নুন : টোয়েন্টি সেকেন্ড সেঞ্চুরি' ইত্যাদি মহাকাশ-অভিযাত্রী একটি দলের নিত্য-নতুন অ্যাডভেঞ্চারে ভরপুর। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী দুঃসাহসিক সব মহাকাশযাত্রীদের কাহিনি এক দিক থেকে খুবই গতানুগতিক, কিন্তু এই অভিযান-কাহিনির মধ্যেও নৈতিক ও দার্শনিক কিছু স্পর্শ আছে যা লেখকদ্বয়ের ভবিষ্যৎ সাহিত্যকর্মে পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হয়েছে।

'দা প্রিডেটরি থিংস অফ দা এজ' (*'দা ফাইনাল সার্কল অফ প্যারাডাইস'* নামে ইংরাজিতে অনূদিত) প্রকাশিত হয় ১৯৬৫-তে। স্পেস পাইলট জিলিন-কে ইউনাইটেড নেশন্স-এর সিকিউরিটি কাউন্সিল তাদের এজেন্ট হিসাবে মধ্য ইয়োরোপের একটি কাল্পনিক রাজ্যে প্রেরণ করে। সময় : বিংশ শতাব্দীর অন্ত ভাগ। জিলিনের কাজ অতীতের যত বিষাক্ত জিনিসের মোকাবিলা—রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী, ফ্যাসিস্ট আর গ্যাংস্টারদের দমন। কৃতকার্য জিলিন-কে তারপরে পাঠানো হয় 'মূর্খদের দেশে'। সেখানে বৈষয়িক উন্নতি একটি উচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছে, কিন্তু দেশের মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা প্রায় লুপ্ত। যেন এক দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপে তারা চিন্তা করতে একেবারেই নারাজ। এই দেশ থেকে ভীতিপ্রদ রিপোর্ট আসতে শুরু করে 'স্লেগ' নামক এক নতুন মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে। 'স্লেগ' সেখানেই প্রথম তৈরি হয়েছিল আর তারপর থেকেই কেনাবেচা চলছে চোরাবাজারে। এই মাদক দ্রব্যের প্রভাবে মানুষ পরিণত হয় গবেষণাগারের ইঁদুরে। সুইচ টিপে যে-ইঁদুর তার মস্তিষ্কের 'সুখ'-এর কেন্দ্রকে এক নাগাড়ে উত্তেজিত করে চলে। জিলিনের পূর্ববর্তী অনুসন্ধানকারীরা নিজেরাই আসক্ত হয়ে পড়েছিল এই মাদকদ্রব্যে।

স্ত্রুগার্ৎস্কিদের *'দা রোডসাইড পিক্‌নিক'* (১৯৭২) অবলম্বনে বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার তার্কোভস্কি তুলেছিলেন 'দা স্টকার'। উপন্যাসের কাহিনিটি ই. টি. (এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল) সংক্রান্ত হয়েও সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। কে কেন এবং কখন পৃথিবীতে এসেছিল গ্রহান্তর থেকে তা জানা যায় না। শুধু দেখা যায় তারা ফেলে রেখে গেছে একটি রহস্যময় 'অঞ্চল'। ভিন্ন এক সভ্যতার বহু দুর্জ্ঞেয় নিদর্শন বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে আছে এই অঞ্চলে। যার অর্থ বা লিপিভেদ করার যাবতীয় প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। পৃথিবীর মানুষের নৈতিকতাকে ভিত্তি করে লেখকদ্বয় অপার্থিবদের সঙ্গে এই সংস্পর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। এবং এই 'অঞ্চলে' পা দিয়েই চোরাচালানকারী জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত রোডেরিক, যে তার পথের প্রান্তে এসে পৌঁছেছে, জীবনে প্রথম চিন্তা করার অবসর পায় সারা জীবন ধরে কী খুঁজছে সে, জীবনের কাছ থেকে কী তার প্রত্যাশা!

'হাউ টু বি এ গড' (১৯৬৪), *'দা ইনহিবিটেড আইল্যান্ড'* (১৯৭০) ও *'এ বিট্‌ল*

ইন দা অ্যান্টহিল' (১৯৮০)— এই তিনটি উপন্যাসে স্ত্রুগার্ৎস্‌কিরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নন-ইন্টারভেন্‌শনের বিষয়টিকে ঘিরে গড়ে তুলেছেন বিবেকবান মানুষের প্রশ্ন, সমস্যা, মানসিক যন্ত্রণা। কোনো সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পথ নেই ভবিষ্যতের এই জটিল কাহিনিগুলিতে। আন্তনকে একটি গ্রহে পর্যবেক্ষক হিসাবে পাঠানো হয়। শুধু চেয়ে দেখা, নথিবদ্ধ আর বিশ্লেষণ করাই তার কাজ। কিন্তু মধ্যযুগীয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন সেই গ্রহে যখন ফ্যাসিবাদের আরও নৃশংস এক রূপ দানা বেধে ওঠে, কোনো বিবেকবান মানুষ কি শুধু পর্যবেক্ষক হিসাবে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে? কিন্তু ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে হস্তক্ষেপ সমর্থনযোগ্য হলেও মানব সমাজের পক্ষে নিজেদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে অন্য গ্রহে রোপণ করার কি কোনো অধিকার আছে? প্রথম উপন্যাসের এই প্রশ্ন পরবর্তী দু-টি উপন্যাসে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে (পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর এক দুনিয়ায় এবং পৃথিবীতে গ্রহান্তরের এক অশুভশক্তি সম্পন্ন আগন্তুককে ঘিরে) আরও বিশদে আলোচিত। বিনা কারণে এক রুশ সমালোচক স্ত্রুগার্ৎস্‌কি-বিষয়ক তঁর প্রবন্ধের নামকরণ করেননি 'A Test For Humanity'।[৩]

স্তানিসোয়াভ লেম

অস্ট্রিয়ান সমালোচক রোটেন্‌স্টাইনার *'দা সায়েন্স ফিকশান বুক'* গ্রন্থে 'সেরা সমকালীন সায়েন্স ফিকশন লেখক' শিরোনামে একটি অধ্যায়ে স্তানিসোয়াভ লেম-এর কৃতিত্ব বর্ণনা করেছেন।[১০] জোরাল্ড জোনাস নামক এক সমালোচক বলেছেন যে, লেম-ই একমাত্র সায়েন্স ফিকশন লেখক যিনি নোবেল পুরস্কার অর্জনে সমর্থ।[১২]

১৯২১-এর ১২ সেপ্টেম্বর পোলান্ডের লুভ (Lvov) শহরে স্তানিসোয়াভ লেম-এর জন্ম। পিতা-মাতা দু-জনেই ছিলেন চিকিৎসক। লেম-ও ডাক্তারি ছাত্র হিসাবে পাঠগ্রহণ শুরু করেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পোলান্ডের সমস্ত শিক্ষায়তন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ১৯৪১-এ পাঠক্রমে ছেদ পড়ে। যুদ্ধ বিরতির পূর্বাবধি তিনি একটি জার্মান ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে মোটরগাড়ি মেরামতির ও ঝালাই শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। একটি সাক্ষাৎকারের সময় তিনি রসিকতা করে বলেছিলেন যে, মিস্ত্রি হিসাবে এতই অপটু তিনি যে একটি অন্তর্ঘাতমূলক কাজের জন্য প্রায় ফাঁসতে বসেছিলেন একবার। যুদ্ধের পর পিতা-মাতার সঙ্গে ক্র্যাকাও চলে আসেন ও ১৯৪৮-এ চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ শেষ করেন। কিন্তু ডিপ্লোমা গ্রহণ করেননি, কারণ সে সময়ে ডাক্তারি ডিপ্লোমাধারীদের বাধ্যতামূলকভাবে আজীবনের কড়ারে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে হচ্ছিল।

লেম এক অর্থে একটি আধুনিক রেনেশাঁস ব্যক্তিত্ব। 'ম্যাথেমেটিকাল লিঙ্গুইস্টিক্‌স্‌', 'স্ট্রাকচারাল লিটারেচার' থেকে বিজ্ঞানের ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানের পদ্ধতি (methodology) এবং সাইবারনেটিক্স বিদ্যায় (সিদ্ধান্ত গ্রহণের বুদ্ধিসম্পন্ন যন্ত্র নির্মাণ বিদ্যায়) তাঁর অবাধ অধিকার। এই বহুগামী অনুসন্ধিৎসু মনের ছোঁয়ায় উজ্জ্বল তাঁর সাহিত্যকর্মও।

সাহিত্যের বিবিধ শাখায় তিনি চালিয়েছেন পরীক্ষা—কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, সায়েন্স ফিকশন, গোয়েন্দা কাহিনি, ফ্যান্টাসি, বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ, সাহিত্য সমালোচনা, সাইবারনেটিক তত্ত্ব, অপ্রকাশিত গ্রন্থের সমালোচনা, দার্শনিক প্রবন্ধ ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, তাঁর বহু একক সাহিত্যকর্মও বহুস্তর বিশিষ্ট, যার মধ্যে জড়িয়ে আছে পূর্বোক্ত বিবিধ ফর্ম বা ফর্মের উপাদান।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বৈষয়িক সাফল্য স্বীকার করেও তিনি জ্ঞান ও সত্যের অন্বেষণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কৃতকার্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান। অত্যন্ত নিকট ও পরিচিত জগতেরও ক্ষুদ্র একটি চৌহদ্দির বাইরে বিজ্ঞান আমাদের বিমূর্ত উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষাকে কতদূর চরিতার্থ করতে সক্ষম— এই বিষয়টি তাঁকে বার বার প্ররোচিত করেছে। থিম্, ফর্ম, প্লট, কী স্টাইল—গোয়েন্দা কাহিনির ঘরানা, কী সায়েন্স ফিকশন— সবই তাঁর এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের কাজে নিযুক্ত।

চমক ও তিক্ততা, ভীতি ও আস্থা, ব্যঙ্গ আর কৌতুকে বোনা তাঁর জগৎ। গ্রন্থভেদে তাঁর বিষয় ও স্টাইলও এত ভিন্ন যে বিশেষ কোনো রচনাকে প্রতিনিধিমূলক বিবেচনা করা এবং সেই সূত্রে লেম-এর স্বকীয়তার আভাস দেওয়া দুঃসাধ্য। তাঁর সাহিত্যকৃতির বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার জন্য কখনো তাঁর সঙ্গে পাউন্ড বা ইলিয়টের তুলনা করা হয়েছে, কখনো একটি গল্পে খুঁজে পাওয়া গেছে কাফ্‌কাকে, 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' উপন্যাসের বিবরণধর্মিতাকে 'মবি ডিক' জাতীয় সাফল্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে, আবার দর্শনতত্ত্বকে সাহিত্যের ছটায় উদ্ভাসিত করার জন্য টমাস মান্‌কে স্মরণ করা হয়েছে। ('...who brings a marvellous flair to the philosophical novel and who renders ideas provocatively in literary guise. In this respect his work is reminiscent of Thomas Mann's—learned and interesting, although not startling.')[১৩]

রোটেন্‌স্টাইনারের পূর্বোক্ত রচনায় উদ্ধৃত হয়েছে অজ্ঞাতনামা এক ব্রিটিশ সমালোচকের উক্তি : ' "সোলারিস" যেন ফ্রয়েড ও এইচ. জি. ওয়েল্‌স জুটির উদ্দীপ্ত যৌথকর্ম'।'

'সোলারিস' উপন্যাসটি (বা তাঁর অন্য কোনো গ্রন্থকেই স্বতন্ত্রভাবে) লেম-এর সেরা কীর্তি বলা বাতুলতা। তবে স্বীকার করতেই হয় এটি তাঁর সর্বাধিক পঠিত ও আলোচিত গ্রন্থ এবং এই উপন্যাসের সুবাদেই তাঁর নাম ইংলন্ড ও আমেরিকায় রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ে। রাশিয়ায় ও ইস্টার্ন ব্লকে লেম-এর জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও কান্ ও কারলোভি ভ্যারিতে উচ্চ-প্রশংসিত আন্দ্রেই তার্‌কোভ্‌স্কি-র 'সোলারিস' নামে রুশ চলচ্চিত্রের কাহিনিকার হিসাবেই তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯৭০-এ প্রথম 'সোলারিশ'-এর ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, যদিও পোলিশ ভাষায় সেটি ১৯৬১-তে প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সোলারিস-এর ফরাসি অনুবাদ থেকে পুনরনূদিত ইংরেজি সংস্করণটি)।

ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এস. এফ. বিষয়ক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও শিক্ষণের সহায়ক-গ্রন্থ হিসাবে রচিত প্যাট্রিক প্যারিণ্ডার-এর 'সায়েন্স ফিকশন : ইট্‌স্ ক্রিটিসিজ্‌ম অ্যাণ্ড

টিচিং'।[৭] প্যারিন্ডার একটি ঘরানা (genre) রূপে সায়েন্স ফিকশনের স্বরূপ উদঘাটনের জন্য চারটি অক্ষে বিভক্ত করেছেন তাঁর আলোচনা— উপকথা (ফেব্‌ল), এপিক, রোমান্স এবং প্যারডি। তিনি মনে করেন সায়েন্স ফিকশনের কোনো গ্রন্থকে তখনই 'ক্ল্যাসিক' আখ্যা দেওয়া যায়, যখন তার মধ্যে এই চারটি অক্ষের সার্থক সংশ্লেষণ ঘটে। 'The intensive reading of such a work will, in effect, be a rehearsal of all that the genre is and might be.')। এবং 'সোলারিস' তাঁর বিবেচনায় এই চারটি অক্ষ ঘিরেই সৃজনশীল মৌলিকতায় উজ্জ্বল।

'সোলারিস' একটি গ্রহের নাম। দু-টি সূর্য বিশিষ্ট এই গ্রহকে আচ্ছাদিত করে আছে এক মহাসমুদ্র। এক ধরনের ঘন আঠালো তরল বা জেলি জাতীয় পদার্থে যা পূর্ণ। অবিরাম স্পন্দ্যমান এই সমুদ্র বিচিত্র সব আকৃতি গ্রহণ করে চলেছে প্রতি মুহূর্তে, যার কখনো পুনরাবৃত্তি ঘটে না। বংশ পরম্পরায় বিজ্ঞানীর দল এই সমুদ্রকে পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন করে চলেছেন। তাঁদের মতে এই সমুদ্র এক অবিচ্ছিন্ন মহা-প্রাণ (bio-mass)। মহাজ্ঞানী এক সমুদ্র। বিজ্ঞানীরা এই জীবন্ত সমুদ্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মানবিব আকাঙ্ক্ষায় পীড়িত। 'সোলারিস'-কে নিয়ে গবেষণা 'সোলারিস্টিক' বিদ্যার জন্ম দিয়েছে, কিন্তু আজও কোনো সংযোগ স্থাপিত হয়নি। ইতিমধ্যে কিছু বিজ্ঞানী ও অভিযাত্রী এমন পরিস্থিতির মধ্যে উধাও হয়ে গেছে যার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। এই অবস্থায় উপন্যাসের নায়ক কেল্‌ভিন এসে পৌঁছোয় সোলারিস-এর আকাশে ভাসমান স্পেস-স্টেশনে, গবেষণা কেন্দ্রে। এই গবেষণা কেন্দ্রে কেল্‌ভিনের কয়েক মাসের অভিজ্ঞতার বিবরণ 'সোলারিস'-এর আখ্যানভাগ। মনস্তত্ত্ববিদ কেল্‌ভিন গবেষণাকেন্দ্রে পৌঁছাবার কিছু পূর্বে তার এক বিজ্ঞানী সহকর্মী গিবারিয়ান সেখানে আত্মহত্যা করেছে। কেল্‌ভিন দেখল তার সহকর্মী পদার্থবিদ্ সার্‌টোরিয়াস ও সাইবারনেটিক-বিশারদ স্নো, দু-জনেই মানসিক রোগাক্রান্ত। কাল্পনিক দৃশ্যকে তারা চাক্ষুষ করছে। স্পেস-স্টেশনের এই তোলপাড় অবস্থার জন্য দায়ী 'আগন্তুক'রা। মানুষ মহাসমুদ্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে না পারুক, মহাসমুদ্র মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াসেই সম্ভবত সৃষ্টি করেছে এই 'আগন্তুক'-দের। তাদের প্রেরণ করেছে স্টেশনে। এই 'আগন্তুক'রা মানুষের দেহধারী। এবং স্টেশনের বাসিন্দাদেরই স্মৃতি ও গোপন আকাঙ্খাকে ব্রেন-স্ক্যানিং মারফত মহাজ্ঞানী সমুদ্র এমন 'আগন্তুক'দেরই সংশ্লেষণ করেছে যারা স্টেশনের বাসিন্দাদের অতীত কালের সুপরিচিত বা নিকটজন। আগন্তুকরা মুহূর্তের জন্য তাদের পার্থিব আত্মীয়ের সঙ্গ ত্যাগ করতে নারাজ। জোর করে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করলে তারা উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তারা এমন উপাদানে গঠিত যে আঘাত ও ক্ষত আপনা থেকে নিরাময় হয়। এমনকি কাউকে রকেটে চড়িয়ে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করে দিলেও কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এক বিকল্প তার স্থান পূরণ করে। স্বাভাবিক মানুষের মতোই বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন তারা এবং নিজেদের অপার্থিব অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিকভাবেই অসচেতন।

এখানে 'আগন্তুক'দের আমরা সুপ্ত ব্যক্তিগত যৌনবাসনার বা শৈশবের আকাঙখার শরীরী প্রতিমূর্তি হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। যার সঙ্গে হয়তো অপরাধবোধও জড়িত। এক নিগ্রো মহিলা-রূপী আগন্তুক তাই গিবারিয়ানকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে, এক বামন বসবাস করে সার্টোরিয়াসের সঙ্গে। কেল্‌ভিনের সমস্যা আরও দ্বিধাপীড়িত। তার 'আগন্তুক'— রেয়া (মূল পোলিশে 'হরে') নামে একটি মেয়ের প্রতিমূর্তি যার সঙ্গে কেল্‌ভিন সত্যিই এক কালে মর্মন্তুদ প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। আগন্তুক 'রেয়া'র সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপন অসম্ভব এটা কেল্‌ভিন 'বিজ্ঞান'-এর ব্যাখ্যা অনুসারে উপলব্ধি করেও তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি। (এখানে উল্লেখযোগ্য, আগন্তুকদের রক্ত পরীক্ষা করেও কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়নি তাদের পার্থিব আদত মডেলের সঙ্গে)। স্নো এবং সারটোরিয়াস 'আগন্তুক'দের দেহের 'নিউট্রিনো কাঠামো'-কে বিপর্যস্ত করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করার পর রেয়া আত্মহত্যা করে। কেল্‌ভিন-রেয়ার প্রেমের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। কিন্তু পার্থিব রেয়াও আত্মহত্যা করেছিল একদিন। কাজেই আগন্তুক রেয়া-কে আপাতদৃষ্টিতে যদিও আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করেছে দুই বৈজ্ঞানিক, কিন্তু সেটা কি তাদেরই স্বাধীন চিন্তাজাত? যাই হোক্, রেয়া-র প্রস্থান (বাস্তবের রেয়া-র মতোই) কেল্‌ভিনকে সোলারিস রহস্যে অবগাহনে আরও উৎসাহিত করে। এবং তার এই উৎসাহ প্রধানত আবেগজাত।

কেল্‌ভিন তার পূর্বসুরি বিজ্ঞানীদের আহৃত তথ্য ও তত্ত্ব ইত্যাদি অধ্যয়ন করতে শুরু করে। জানা যায় 'সোলারিস্টিক' বিদ্যার চর্চা আটাত্তর বছরে মূল সমস্যার কাছে এতটুকু অগ্রসর হতে পারেনি। কেন পারেনি তা শুধু 'সোলারিস' উপন্যাস নয়, লেম-এর সৃজনশীল রচনার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে সেই 'এপিস্টেমোলজি' সংক্রান্ত দার্শনিক ভাবনা। 'এপিস্টেমোলজি' শব্দটিকে পরিহার করে লেম স্বয়ং এক সাক্ষাৎকারে বুঝিয়ে বলেছিলেন '[এই নাটকের] ফোকাল্ পয়েন্ট হল জ্ঞান আহরণের জন্য মানুষের অক্ষম যন্ত্রপাতির ট্রাজেডি।' ('...whose focal point is the tragedy of man's imperfect machinery for gaining knowledge.')।[১৩]

কেল্‌ভিনের মতে পূর্ব-নির্ধারিত ছকের সঙ্গে খাপ খায় না এমন সব তথ্যকে বর্জন করতে বলে যে-বিজ্ঞান তা আসলে জ্ঞান-অর্জনের বা উপলব্ধির সহায়ক নয়।

অন্যদিকে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞাত ও বিচিত্রের সম্মুখীন মানুষ যখন জ্ঞান আহরণের উপকরণযোগে তার মর্মভেদ করতে পারে না— তখন কী ঘটে— বা বিভিন্ন ব্যক্তির উপর তার প্রতিক্রিয়া কী— এই অনুসন্ধানও 'সোলারিস' তথা লেম-এর বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের এক বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। এবং এই সূত্রেই 'মেটাফিজিক্স-'এর অতিরিক্ত তাঁর সামাজিক উদ্বেগ এবং মানবিকতারও প্রকাশ। 'সোলারিস'-এর তিন বিজ্ঞানীর কথা ধরা যাক।

সার্টোরিয়াস বিজ্ঞানীকুলের সেই গোষ্ঠীর প্রতিনিধি যিনি 'ফলপ্রসূ' কাজ করেন।

তাঁর মতে সোলারিস স্পেস-স্টেশনের একটিই তাৎপর্য— মহাজাগতিক সম্প্রসারণ এবং ব্যক্তিস্বার্থহীন আত্ম-ত্যাগের যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি তারই প্রতীক এটি। পৃথিবীর মানুষের বৈষয়িক প্রয়োজন উপেক্ষা করে বিমূর্ত জ্ঞান অন্বেষণের এই কর্মকাণ্ডে বিপুল সম্পদ বিনিয়োগ করা হয়েছে। তার 'নৈতিক' দায়িত্বই সারটোরিয়াসকে আর কিছু না হোক 'আগন্তুক'দের নিহত করার যন্ত্র নির্মাণে উৎসাহিত করে, ইউনাইটেড নেশন্‌স-এর চিঠি লঙ্ঘন করেও সোলারিসের সমুদ্রকে তিনি এক্স-রে দিয়ে আঘাত করেন। এবং 'অস্ত্রবিদ বিজ্ঞানী'র মতো কিছু 'ফল' অবশ্যই পান। বিজ্ঞানী স্নো উদারপন্থী হয়েও কিন্তু শেষ অবধি এক অসহায় হতাশাবাদী। সহকর্মীদের কর্মধারা তিনি পরিবর্তন করতে পারেন না, শুধু ইঙ্গিত দেন যে মহাকাশ অভিযানের এই উন্মত্ততা আসলে মানুষের বাস্তব সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে যাওয়ারই নামান্তর। অন্যদের ধ্বংসাত্মক সমালোচনা কিন্তু তাঁর নিজস্ব মননশীলতার ও নৈতিকতার পরাজয়কে গোপন করতে পারে না। এই দু-জনের বিপরীতে কেল্‌ভিন এক রোমান্টিক আদর্শবাদী, কল্পনাপ্রবণ— নতুন অভিজ্ঞতাকে খোলামনে গ্রহণ করতে সক্ষম। তার দৃঢ় বিশ্বাস সোলারিস-এর রহস্যের সম্মুখীন হওয়া তার পক্ষে এক ব্যক্তিগত অন্বেষণ। অন্য দুই সহকর্মীর সঙ্গে কেল্‌ভিনের স্বাতন্ত্র্যের অন্যতম কারণ নিশ্চয় রেয়া-র প্রতি তার অন্ধ ভালোবাসা। অচরিতার্থ হলেও এই প্রেমের মূল্য তার জীবনে যতখানি দুর্জ্ঞেয়, রহস্যভেদে অসমর্থ হলেও তার 'সোলারিস' ত্যাগ না করার বাসনার গুরুত্বও ততটা। কিংবা উপন্যাসের শেষাংশে যখন দেখি জ্ঞানী সমুদ্র খেলাচ্ছলে হলেও কেল্‌ভিনকে স্পর্শ করছে, মনে হয় হয়ত সে জানতে পারবে। কিন্তু কেল্‌ভিনের সেই জানা হবে তার নিতান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধি। মানুষ হিসাবে সেই জানাকে সে সঞ্চারিত করতে পারবে কিনা—'সোলারিস'-এর মহাপ্রাণের মধ্যে তার মানবসত্তার বিলুপ্তি ঘটিয়েই একমাত্র এই জানা সম্ভব কিনা—এই সব প্রশ্ন নিরুত্তর থেকে যায়।

বাঙালি পাঠকদের পক্ষে সুখবর লেম-এর দু-টি গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। *'পৃথিবী কী করে বাঁচলো'* এবং *'মুখোশ ও মৃগয়া'*। অনুবাদ সহজসাধ্য নয়, বলাই বাহুল্য। প্রথম গ্রন্থটি রোবটদের জন্য লেখা রূপকথার সংকলন। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে ট্রুর্ল আর ক্লাপাউৎসিউশ নামে বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ দুই বন্ধুর প্রাণ মাতানো কীর্তিকাহিনি আর দুরন্ত অ্যাডভেঞ্চার। এরা দু-জন যারা রোবট বানাতে সিদ্ধহস্ত, তারা নিজেরাও রোবট। পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চলে তাদের অদ্ভুত সব যন্ত্র নির্মাণের। আর সেই সুবাদেই ঘটে যায় নানা কেলেংকারি, সৃষ্টি হয় উদ্ভট সব সমস্যা। একটি উদাহরণ : একবার তারা বানিয়ে ফেলল এমন যন্ত্র, যা 'ন' দিয়ে সুরু হয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন সব জিনিসই বানাতে পারে। কার্যকালে দেখা গেল তার অর্থ তারা সবকিছুই বানাতে পারে, এমনকি 'নাস্তি'ও (অনস্তিত্ব)। আবার রোবটদের ভিন্ন এক জগতে প্রযুক্তির প্রবল আস্ফালন সত্ত্বেও, অ্যাটম বোমাও যখন হার মেনেছে এক আপদকে বিদায় করতে, মহাবিজ্ঞানী

মুস্কিল আসান করলেন সব যন্ত্রের সেরা যন্ত্র 'আমলা যন্ত্র' বা 'আপিস যন্ত্র' তৈরি করে, যার বিশাল 'আ'-কে কেউ ঘায়েল করতে পারেনি। 'মুখোশ ও মৃগয়া'-ও রোবটদের দু-টি কাহিনি। তবে এখানে কৌতুক আর রঙ্গব্যঙ্গ নয়। 'মৃগয়া'-য় নভোযাত্রী পিরক্স বেরোয় এক বিপজ্জনক অভিযানে এক বেপথু রোবটকে গ্রেপ্তার করতে। আর 'মুখোশ'-এ দেখি রোবট খুঁজে বেড়াচ্ছে তার স্রষ্টা মানুষকে। মানুষেরই আত্মানুসন্ধানের দু-টি কাহিনি— কল্পিত অবস্থানের মেরু বিপর্যয় ঘটিয়ে রচিত।

'সোলারিস, দা ইনভিনসিব্‌ল, মেমোয়ার্স ফাউন্ড ইন এ বাথ্ টাব, সাইবিরিয়াদ, ফিউচারোলজিকাল কংগ্রেস, স্টার ডায়েজি, মরটাল এনজিন্‌স, চেন অফ চান্স, পারফেক্ট ভ্যাকুয়াম, টেল্‌স অফ পিৰ্ক্স দা পাইলট ইত্যাদি লেম-এর ষোলটি গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে ইংরাজিতে।

ইংলন্ড ও আমেরিকায় প্রভূত স্বীকৃতি পেয়েছেন লেম। ১৯৭৬-এ নিউইয়র্ক টাইম্‌স বুক রিভিউ ও ১৯৭৮-এর নিউ ইয়র্কার-এ প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছেন তিনি। এর গুরুত্ব বোঝা যায় যখন দেখি আমেরিকায় মাত্র জনা দশেক বিদেশী লেখক এই সম্মান উপভোগ করেন—গ্রাস্, ব্যোল্, বর্হেস, ফুয়েন্তেস ও ক্যালভিনো প্রমুখ। কিন্তু তার মধ্যে লেম ভিন্ন দ্বিতীয় সায়েন্স ফিকশন লেখক নেই।

লেম-এর উদ্ভাবনী শক্তি ও সৃজনশীলতা এস. এফ.-এর প্রচলিত ধারা ত্যাগ করে অর্জন করেছে নতুন শক্তি। মানুষের গড়া (অতিবিজ্ঞানের) দানবকে বীভৎসরূপে উপস্থাপিত করেও তার ধ্বংসলীলার বর্ণনা দিয়ে সমাজের স্বার্থরক্ষার মহান কর্তব্য পালন করার চেষ্টা নেই তাঁর। বরং যন্ত্রমানুষকে জ্ঞান ও চেতনা প্রদান করে তাদের দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত করেছেন আবিষ্কারক মানুষের স্বরূপ। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাধনাকে একাধারে সমর্থিত ও তার সাধকদের সমালোচিত করার এই দৃষ্টিকোণ শুধু সাহিত্যিকের প্রকৌশল নয়, দার্শনিক অবলম্বন।

বাংলা সায়েন্স ফিকশনের ঐতিহ্য

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে শাসনের জন্য ভাগ্নে এইচ. বোসের (হেমেন্দ্রমোহন বসুর) তৈরি এক শিশি 'কুন্তলীন' তেল ঢেলে অদ্ভুত ফল পেয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। একটি অনবদ্য এস. এফ. কাহিনি। বাংলা ছোটোগল্পের জন্য প্রতি বছর 'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রবর্তনের প্রথম বর্ষেই, ১৩০৩ সালে 'কুন্তলীন পুরস্কার' গ্রন্থে 'নিরুদ্দেশের কাহিনি' মুদ্রিত হয়। অবশ্য সে সময়ে লেখকের নামোল্লেখ করা হয়নি। ১৩২৮-এ প্রকাশিত 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সংকলিত করার পূর্বে জগদীশচন্দ্র লেখাটি মার্জনা করেন এবং নতুন নাম দেন : 'পলাতক তুফান'।

'নিরুদ্দেশের কাহিনি' শিরোনামের সঙ্গে সাব-টাইটেল যুক্ত করেছিলেন জগদীশচন্দ্র : 'বৈজ্ঞানিক রহস্য'। সায়েন্স-এর সঙ্গে ফিকশন অথবা ফ্যান্টাসিকে যুক্ত করে জোড়কলম শব্দ দু-টি ইংরেজিতে আবির্ভূত হওয়ার বহু পূর্বেই জগদীশচন্দ্র স্বাধীন ও সচেতনভাবে

এই বাংলা পরিভাষা নির্মাণ করেছেন। সায়েন্স ফিকশনের বাংলা পরিভাষা কী হবে, বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প না কল্প-বিজ্ঞানের গল্প অথবা এই দুই প্রতিশব্দের এক্তিয়ার সংক্রান্ত বিতর্কের নিষ্পত্তি ঘটাতে পারে 'বৈজ্ঞানিক রহস্য'। বাংলায় 'রহস্য' শব্দটি ইংরেজি 'mystery'-র নিছক প্রতিশব্দ নয়। mystery প্রধানত 'গোপনীয়' ও 'দুর্জ্ঞেয়' অর্থবাচক। কিন্তু 'রহস্য'-র মধ্যে প্রয়োগসিদ্ধ অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা রয়েছে পরিহাস, বিস্ময়জনক বিষয় ও রঙ্গরস ইত্যাদির। এমনকি 'গূঢ় ভবিষ্যৎ বিষয়' অর্থে রহস্যজাত 'রহস' শব্দকে ব্যাখ্যা করেছেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিধানে।

প্রচলিত ধারণা অনুসারে জগদীশচন্দ্রের এই লেখাটি অবশ্য বাংলা ভাষার প্রথম এস. এফ. নয়। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে (১৮৮২-তে) 'শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু কর্তৃক যোড়াসাঁকো ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি হইতে প্রকাশিত' ও 'সচিত্র বিজ্ঞান দর্পণ' পত্রিকায় দুই কিস্তিতে মুদ্রিত হেমলাল দত্ত রচিত 'রহস্য' গল্পটি শুধু প্রাচীনত্বেই নয়, বিষয়গৌরবে ও লিপিকুশলতায় একাধারে বাংলা এস. এফ.-এর প্রথম ও প্রতিনিধিত্বমূলক নিদর্শন।[২৪]

'একদা বিজ্ঞান আমাকে অজ্ঞান বাঙালি পাইয়া কিরূপ দুর্গতি করিয়াছিল তাহা বলিতেছি, শুনিয়া আপনাকে কাঁদিতে হইবে।'— প্রথম পরিচ্ছেদে লন্ডন প্রবাসী নগেন্দ্রের এই উক্তি সত্ত্বেও এটি হাস্যরসাত্মক কাহিনি। শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক উন্মাদনা কমে আসার পরে জীবনযাত্রার অতিযান্ত্রিকারণের উৎপাত নিয়ে হিথ রোবিনসনের উদ্ভট কলকব্জার বিচিত্র দৃশ্য জগতেরই যেন সাহিত্যিক প্রতিচ্ছবি এই গল্পটি। গ্যালভানিক ব্যাটারি ও বহু যন্ত্রকৌশল সমৃদ্ধ সাহেব বন্ধু হার্বি-র স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ভরপুর বাড়িতে এক দিনের অতিথি এই বঙ্গ-সন্তানের ভুল করে পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধাকে তার শয্যাসঙ্গী হিসাবে আমন্ত্রণ এবং বহু বিঘ্ন পার হয়ে অব্যাহতি লাভের এই সরস ও উপভোগ্য কাহিনির মধ্যে নিহিত কটাক্ষ অসতর্ক পাঠকের পক্ষেও লক্ষ না করে উপায় নেই।

জগদীশচন্দ্রের পূর্বে জগদানন্দ রায়-ও এস. এফ. কাহিনি লিখেছিলেন। বাঙালি পাঠকের গ্রহান্তরে ভ্রমণের এবং বুদ্ধিমান ভিন্‌গ্রহীদের সাক্ষাৎ লাভের প্রথম সুযোগ। বাংলায় 'পপুলার সায়েন্স' গ্রন্থমালার প্রবর্তক, বিজ্ঞান-লেখক ও শান্তিনিকেতনের শিক্ষক জগদানন্দ রায় সম্ভবত এই একটিই এস. এফ. কাহিনি লিখেছেন। 'শুক্র ভ্রমণ' গল্পটি সংকলিত হয় ১৩২১-এ- প্রকাশিত 'প্রাকৃতিকী' গ্রন্থে। কিন্তু লেখকের নিবেদন থেকে জানা যায়, এটি গ্রন্থ-প্রকাশের প্রায় বাইশ বছর পূর্বের রচনা, যখন তিনি সদ্য সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেছেন।

প্রাথমিক সাফল্যের এই তিনটি উদাহরণের পর কিন্তু বাংলা এস. এফ. রচনায় বেশ কয়েক বছরের ভাঁটা পড়ে। তার মধ্যে অবশ্য জুল ভার্নকে বাঙালির দরবারে হাজির করেছেন রাজেন্দ্রলাল আচার্য। ১৯১৪-য় তিনি অনুবাদ করেন 'আশি দিনে ভূপ্রদক্ষিণ'। তারপর একাদিক্রমে 'বেলুন পাঁচ সপ্তাহ' (প্রকাশকাল অজ্ঞাত), ১৯১৬-য় 'পাতালে' (*জার্নি টু দা সেন্টার অফ দা আর্থ*) এবং ১৯২৪-এ প্রকাশিত হয় 'চন্দ্রলোকে যাত্রা'।

শেষোক্ত গ্রন্থটির ভূমিকায় অনুবাদক লিখেছেন : 'প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী জুল ভার্নেকে আমি প্রথমে বাঙ্গালা পোষাকে বাঙ্গালীর ঘরে বরণ করিয়া আনিয়াছিলাম। তখন ভাবিয়াছিলাম যে, আরও সহকর্মী পাইব। ক্রমে ক্রমে জুল ভার্নের তিনখানি পুস্তক বাঙ্গালায় প্রকাশ করিলাম। 'চন্দ্রলোকে যাত্রা' চতুর্থ। আজিও সহকর্মী মিলে নাই...।'

এইচ. জি. ওয়েল্‌স-কে কিন্তু প্রথম বাঙালি অনুবাদক সংগ্রহ করার জন্য ভার্নের চেয়ে আরও পঁয়ত্রিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। ১৩৫৬-য় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ওয়েল্‌সের প্রথম গ্রন্থ—গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়। অনুবাদকের মধ্যে ছিলেন বিনয় ঘোষ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। গ্রন্থটির প্রকাশক অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির থেকে অবশ্য পরবর্তী সাত আট বছরের মধ্যে নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুবাদে ওয়েল্‌সের *'ওয়ার অফ দা ওয়ার্ল্ডস'*, *'দা ফার্স্ট মেন ইন দা মুন'* ও *'ফুড অফ দা গড্‌স'* ইত্যাদি আরও পাঁচটি গ্রন্থের ঈষৎ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে সুকুমার রায়ের কোনো জুড়ি নেই। এস. এফ.-এর ক্ষেত্রেও তিনি অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলায় এস. এফ. জাতীয় রচনা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করার পূর্বেই আর্থার কোনান ডয়েলের *'লস্ট ওয়ার্লড'* তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে এস. এফ. নিয়ে প্যারডি রচনায়—'হেশোরাম হুঁশিয়রের ডায়ারি'। কোনান ডয়েলের বিজ্ঞানী প্রোফেসার চ্যালেঞ্জার আর তাঁর দলবল পৃথিবীর এক উপান্তে 'সত্যিকার' সব প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের সাক্ষাৎ পেয়েছিল, আর প্রোফেসর হেশোরাম আবিষ্কার করেছিলেন 'কাল্পনিক' প্রাণীদের। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শার্লক হোম্‌সের ক্রিয়াকাণ্ড অনুকরণে একটি ডিটেকটিভ গল্পের প্যারডিও রচনা করেছিলেন তিনি—যার নাম 'ডিটেকটিভ'।

বাংলায় প্রথম নিয়মিত এস. এফ.-চর্চা শুরু করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও, তাঁর এস. এফ. রচনায় হাত দেওয়ার পূর্বেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পিঁপড়ে পুরাণ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩১-এ। তারও কয়েক বছর পূর্বে সেটি 'রামধনু' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল।

'সে অনেক কাল আগের কথা। তখন সবই ছিল আশ্চর্য রকমের। তখন ঠিক ভোরের বেলা সূর্য উঠতো; আর এমন মজা যে, ঠিক রাত হওয়ার আগেই সূর্য অস্ত যেতো।'—'পিঁপড়ে পুরাণ' শুরু হয় এইভাবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কোনো লেখক যেন কাহিনীটি পরিবেশন করছেন। পিঁপড়েদের আকার ও বুদ্ধি অতিরঞ্জিত হওয়ার পর এই সমাজবদ্ধ জীবদের মানবসমাজের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণার বৃত্তান্ত 'পিঁপড়ে পুরাণ'।

রকেটে শুক্রগ্রহে পাড়ি দেওয়ার কাহিনি 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' (১৯৩৯), রোবট সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার দুরভিসন্ধির ক্ষেত্র 'ময়দানবের দ্বীপ', সমুদ্রের অতলের বাসিন্দা বিচিত্র বুদ্ধিমান জীবদের দুই গোষ্ঠির তথা সভ্যতার সংকট নিয়ে *'পাতালে পাঁচ বছর'* বা মন্‌স্টার-কাহিনি *'আকাশের আতঙ্ক'*, *'দুঃস্বপ্নের দ্বীপ'* বা *'অবিশ্বাস্য'* ইত্যাদি বহু এস. এফ. রচনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

নিদ্রাটাকে যিনি চারুকলা হিসাবে চর্চা করেছেন, ভোজনরসিক, গোল-গাল টাকমাথা সেই মামাবাবু নির্ভেজাল বাঙালি। এ-হেন মামাবাবু প্রেমেন্দ্র মিত্রের এক হিরো। 'কুহকের দেশে', 'ড্রাগনের নিশ্বাস', 'পাহাড়ের নাম করালী' বা 'অতলের গুপ্তধন'-এ আমরা সিরিজ-ক্যারেক্টার হিসাবে মামাবাবুর অভিযান কাহিনি পড়ি। পরবর্তী কালে মামাবাবুকে অবশ্য টেক্কা মারেন ঘনাদা। ত্রৈলোক্যনাথের ডম্বরুধরের মন্ত্রশিষ্য বীরদর্পী ঘনাদা। কিন্তু ঘনাদার গুলগল্পের বৈজ্ঞানিক তথ্য বা তত্ত্বগুলি তিনি নির্ভেজাল পেশ করেছেন।

প্রথম থেকেই বাংলা এস. এফ. কিশোরোপযোগী অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনি পরিবেশনের মধ্যেই তার মোক্ষ সন্ধান করেছে। জুল ভার্নের অনুরাগী প্রেমেন্দ্র মিত্রও এই ধারা অনুসরণ করেছেন। তাঁর উক্তিকেই সাক্ষী মানছি : 'বিজ্ঞান-নির্ভর বা বিজ্ঞান-ভিত্তিক কাহিনি বলতে আমরা যা বুঝি গত শতাব্দীতে তার জন্ম। ফরাসি লেখক জুল ভার্নই এ জাতীয় কাহিনীর প্রবর্তক। .... বিজ্ঞানের অক্লান্ত সন্ধান নিত্য যে নতুন জগৎ আমাদের কাছে উদঘাটিত করে তুলছে তার বিস্ময়-বিহ্বলতা পাঠক-মনে সঞ্চারিত করে দেওয়াই এ কাহিনির আসল লক্ষ্য।

প্রথম ইংরেজি পড়তে শিখে স্কুলের লাইব্রেরিতে জুল ভার্নের একটি উপন্যাস পেয়ে তার মধ্যে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে সেই ছেলেবেলার স্বপ্নতাই এই ধরনের কাহিনি লেখার চেষ্টায় আমায় উৎসাহিত করেছে।' (ভূমিকা, বিজ্ঞান-নির্ভর গল্প, ১৯৬৪)।

বাংলা এস. এফ.-এর বিবর্তন ও পুষ্টি ব্যাহত হওয়ার প্রধান কারণের ইঙ্গিত রয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই বক্তব্যের মধ্যে। শুধু কিশোরোপযোগী অ্যাডভেঞ্চার রচনাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে এস. এফ. যে অতিরিক্ত কিছু অবলম্বন সরবরাহ করে না তার সেরা প্রমাণ বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়'। মৌলিক বাংলা অ্যাড্‌ভেঞ্চার কাহিনি হিসাবে আজও কেউ তাকে অতিক্রম করতে পারেনি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের যাবতীয় এস. এফ. অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে সেরা 'পাতালে পাঁচ বছর-'এ জুল ভার্ন-এর কিছুটা স্বাদ পাওয়া যায়।

'জাত গল্প যাকে বলি, মানুষের হৃদয়ের ভাবাবেগ নিয়েই তার প্রধান কারবার। বিজ্ঞান-নির্ভর কাহিনি মনের সেসব সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ নিয়ে মাথা ঘামায় না।' লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'মনু-দ্বাদশ' উপন্যাসটি রচনা না করলে এই উক্তিই সাক্ষ্য হয়ে থাকত যে তিনি এস. এফ.-এর মর্ম উপলব্ধি করেননি। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রথম এবং সম্ভবত আজ অবধি একমাত্র সিরিয়াস নিছক বয়স্কপাঠ্য এস. এফ. 'মনু-দ্বাদশ' পূর্বোক্ত উক্তিকেই স্ববিরোধী অসতর্ক মন্তব্য হিসাবে উপেক্ষা করার অনুমতি দেয়।

এক পারমাণবিক প্রলয়ের পরের কথা। দূর ভবিষ্যতের মনু-দ্বাদশ কালে এই পৃথিবীর যৎসামান্য বস্ত্রাবৃত দ্বিপদ কিছু জীবকে প্রথমে সনাক্ত করতে হয় মানুষ রূপে। দশটি

উল্লাসে বিভক্ত প্রাচীনগন্ধী ভাষায় পরিবেশিত ভবিষ্যতের এক আদিম সমাজের এই কাহিনির মধ্যে একটি মাত্র বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন লেখক—গামা-ঘা। ভল্ল, নিক্ষেপ-রজ্জু, হ্রস্ব-কৃপাণ ইত্যাদি হাতিয়ার সম্বল হলেও, তিন শিবিরে বিভক্ত প্রজনন শক্তিহীন মানবসমাজের শেষ বিংশ বিংশতি প্রতিনিধিদের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ ও রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান ঘটেনি। তারই মধ্যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গুটিকয়েক মানুষ মুক্তির সন্ধানে লুপ্ত ইতিহাস ও সভ্যতার বিবরণ সংগ্রহসূত্রে জানতে পারে গামা-ঘা ও প্রজন্ম ক্ষমতা বিলুপ্তির কারণ। সুদূর অতীতে শক্তি ও সমৃদ্ধির শীর্ষাসীন তাদের ঋষিতাপস-প্রতিম পূর্বপুরুষরা ভ্রষ্ট হয়েছিলেন স্বধর্ম থেকে। 'ধূলিকণাকেও সূর্য প্রমাণ করার বিদ্যা তাদের আয়ত্ত। কিন্তু সেই বিদ্যাই সমস্ত ধরণীর চরম সর্বনাশ ডেকে আনে। সূর্যস্ফূরণ বিদ্যা কাফ্রামদের মতো আরও বহু মানবসম্প্রদায় তখন অর্জন করেছে। ব্যোম বিজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও তারা অগ্রসর।'

পৌরাণিক কাহিনির স্বাদ বিশিষ্ট অথচ ভবিষ্যতের ভিন্ন মানুষ ও ভিন্ন সমাজের এই 'ডিস্‌টোপিয়া' খাঁটি বাংলা এস. এফ.-এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে।

কিশোর মহলে চার ও পাঁচের দশকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের এস. এফ.-এর চেয়ে অধিক জনপ্রিয় হয়েছিল হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'অমানুষিক মানুষ', 'অসম্ভবের দেশে', 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন' ও 'ময়নামতীর মায়াকানন'। বিশেষ করে শেষ বই দু-টি। মঙ্গলগ্রহীদের আগমন ও তাদের কীর্তিকলাপের চেয়েও আকর্ষণীয় হেমেন্দ্রকুমারের বর্ণনার ভাষা। মঙ্গলগ্রহের উড়োজাহাজ নামার সময় সেই বিচিত্র শব্দ ভোলার নয় : যেন হাজার হাজার স্লেটের উপরে কারা হাজার হাজার পেন্সিল টানছে আর টানছে।

চারের দশক থেকে এস. এফ. লিখে চলেছেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য এক একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে গল্পের মোড়কে পরিবেশন করা—বিজ্ঞান শিক্ষাদানই যার মূল উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করতে তাই আগ্রহী নন তিনি। কিন্তু ১৩৫০-এ তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ 'ধূমকেতু', যেখানে নির্দিষ্ট কালের জন্য মানুষকে শক্তিকণায় রূপান্তরিত করে বাঁচিয়ে রাখার উপযোগী মৃত্যু-কিরণ উদ্ভাবন করেছেন তিনি, কিংবা 'আমার বন্ধু সুধাবিন্দু'র দর্শনলাভে টাইম-টাইট দরিয়া-মঞ্জিলে প্রবেশ করেছেন, তাঁর এস. এফ.-কাহিনি নতুন মাত্রা পেয়েছে।

সত্যজিৎ রায়

১৯৬১ বাঙালির কাছে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ রূপে। রবীন্দ্রনাথের কাহিনি অবলম্বনে এই বছরের মে মাসে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র 'তিন কন্যা' ও ডকুমেন্টারি 'রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রদর্শিত হয়। সত্যজিৎ রায়ের জীবনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাও এই বছরের মে মাসেই ঘটে যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় সত্যজিৎ রায় তাঁর পারিবারিক পত্রিকা 'সন্দেশ'কে নবরূপে আবার প্রকাশ করলেন। 'সন্দেশ'-এর

সম্পাদনা সূত্রে সাহিত্যকর্মেও প্রবৃত্ত হলেন তিনি। মে থেকে সেপ্টেম্বর, নতুন 'সন্দেশ'-এর প্রথম পাঁচটি সংখ্যায় তিনি লিয়র ও ক্যারলের ননসেন্স রাইমের কয়েকটি অনবদ্য রূপান্তর উপহার দেন। (পরবর্তীকালে 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত)। তাঁর প্রথম মৌলিক গল্প প্রকাশিত হয় এই পত্রিকারই ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম সংখ্যা জুড়ে— 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'। নবম সংখ্যায় মৌলিক কবিতা 'মেছো গান'। দশম ও একাদশ সংখ্যায় যথাক্রমে দু'টি গল্প 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' ও 'টোরোড্যাক্টিলের ডিম'।

'সন্দেশ'-এর দাবি মেটাতে লেখনী তুলে নিয়েছিলেন তিনি। প্রথম বছরে ছড়া, কবিতা ও গল্প-হয়ত পরীক্ষামূলক ভাবেই বিবিধ ফর্ম নিয়ে নাড়াচাড়াও করেছেন। কিন্তু প্রথম মৌলিক গল্প 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'র পর আর তাঁকে ফিরে তাকাতে হয়নি। আত্মপ্রকাশের নতুন জগতের দরজা খুলে নিয়েছেন তিনি অনায়াসে। বাংলার স্বীকৃত লেখকদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ই জীবনের প্রথম গল্প হিসাবে সায়েন্স ফিকশন রচনা করেছেন। শুধু প্রথমই নয়, প্রথম তিনটি গল্পই।

প্রথম গল্পের 'শঙ্কু'— প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু— সিরিজ-চরিত্র হিসাবে পরবর্তীকালে উপহার দিয়েছে শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক অ্যাডভেঞ্চারের গল্পমালা। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের যাবতীয় গোয়েন্দা কাহিনি যেমন ফেলুদা-সিরিজের অন্তর্ভুক্ত, সায়েন্স ফিকশন তা নয়। শঙ্কুর শরণাপন্ন না হয়েও তিনি বহু সার্থক সায়েন্স ফিকশন রচনা করেছেন এবং তাঁর পূর্বোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্পটিও এই গোত্রভুক্ত।

শঙ্কু সিরিজের ছ-টি গ্রন্থের ২৯টি গল্প ছাড়াও 'এক ডজন গপ্‌পো', 'আরো এক ডজন', 'আরো বারো', 'এবারো বারো' ও 'একের পিঠে দুই' নামক পাঁচটি সংকলনের দশটি গল্প এবং 'পিকুর ডায়েরি ও অন্যান্য'-র অন্তর্ভুক্ত বড়দের জন্য লেখা দু-টি গল্প 'সবুজ মানুষ' ও 'ময়ূরকণ্ঠী জেলি' সত্যজিৎ রায়ের সায়েন্স ফিকশন-চর্চার নিদর্শন। আর আছে অপ্রকাশিত 'এলিয়েন'-এর ইংরেজি চিত্রনাট্য।

সায়েন্স ফিকশনের উপকরণ বিচারে গল্পগুলির একটি শ্রেণিবিভাগ করা যায়। (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কোনো কোনো গল্প একাধিক শ্রেণিভুক্ত হয়েছে।)

[ক] মহাকাশ অভিযান ও গ্রহান্তরের আগন্তুক :

১. ব্যোমযাত্রীর ডায়রি ২. বঙ্কুবাবুর বন্ধু ৩. প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য ৪. প্রোফেসর শঙ্কু ও রক্তমৎস্য রহস্য ৫. অঙ্ক স্যার গোলাপী বাবু ও টিপু ৬. সবুজ মানুষ ৭. এলিয়েন (চিত্রনাট্য)।

[খ] রোবট ও চেতনাসম্পন্ন যন্ত্র :

১. প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু ২. শঙ্কুর শনির দশা ৩. কম্পু ৪. অনুকূল।

[গ] আশ্চর্য প্রাণী ও উদ্ভিদ (কৃত্রিম অথবা প্রাকৃতিক) :

১. প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড় ২. প্রোফেসর শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল ৩. প্রোফেসর শঙ্কু ও চী-চিং ৪. প্রোফেসর শঙ্কু ও ভূত ৫. সেপ্টোপাসের ক্ষিদে ৬. আশ্চর্য প্রাণী ৭.

স্বপ্নদ্বীপ ৮. মরুরহস্য ৯. কর্ভাস ১০. প্রোফেসর হিজিবিজবিজ ১১. শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান।

[ঘ] পরশপাথর ও অমৃত :

১. প্রোফেসর শঙ্কু ও কোচাবাম্বার গুহা ২. শঙ্কুর সুবর্ণ সুযোগ ৩. হিপনোজেন ৪. মানরো দ্বীপের রহস্য ৫. ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট ৬. ময়ূরকণ্ঠী জেলি।

[ঙ] টাইম মেশিন :

১. টেরোড্যাক্‌টিলের ডিম।

[চ] অদৃশ্য প্রাণী :

১. প্রোফেসর শঙ্কু ও ম্যাকাও।

[ছ] অমীমাংসিত বিস্ময়কর রহস্য (ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক বা প্রাণী বিষয়ক) :

১. প্রোফেসর শঙ্কু ও ইজিপ্সীয় আতঙ্ক ২. প্রোফেসর শঙ্কু ও চী-চিং ৩. প্রোফেসর শঙ্কু ও খোকা ৪. প্রোফেসর শঙ্কু ও কোচাবাম্বার গুহা ৫. প্রোফেসর শঙ্কু ও বাগদাদের বাক্স ৬. মানরো দ্বীপের রহস্য ৭. কম্পু ৮. একশৃঙ্গ অভিযান।

[জ] অসৎ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তির অপব্যবহার :

১. প্রোফেসর শঙ্কু ও ম্যাকাও ২. প্রোফেসর শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল ৩. প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু ৪. প্রোফেসর শঙ্কু ও গোরিলা ৫. মরু রহস্য ৬. কর্ভাস ৭. ডাঃ শেরিং-এর স্মরণশক্তি ৮. শঙ্কুর শনির দশা ৯. শঙ্কুর সুবর্ণ সুযোগ ১০. হিপনোজেন ১১. মহাকাশের দূত ১২. নকুড়বাবু ও এল ডোরাডো ১৩. প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ. এফ. ও. ১৪. শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান ১৫. সেপ্টোপাসের ক্ষিদে ১৬. ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট ১৭. ময়ূরকণ্ঠী জেলি।

[ঝ] বিবিধ :

১. টেরোড্যাক্‌টিলের ডিম ২. ভূতো (অপরাধবোধ সঞ্জাত বিভ্রম?) ৩. অসমঞ্জবাবুর কুকুর (ব্যঙ্গ) ৪. প্রোফেসর শঙ্কু ও খোকা (শিশু প্রতিভাধর)।

(এই শ্রেণিবিভাগে কাহিনির মুখ্য প্রবণতাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই, উদাহরণ স্বরূপ, 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' গল্পটিতে একটি রোবট চরিত্র থাকলেও সেটি 'রোবট'-শ্রেণিভুক্ত হয়নি।)

ভিন্ন দৃষ্টিকোণেও সত্যজিৎ রায়ের সায়েন্স ফিকশনের শ্রেণিবিভাগ করা যায়, বিশেষত শঙ্কু-কাহিনির। ভৌগোলিক অভিযান ও ঐতিহাসিক অভিযান। লেখক স্বয়ং শঙ্কুর গল্পকে সায়েন্স ফিকশন অভিহিত করেননি, 'শঙ্কু কাহিনি' বা 'প্রোফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার' বলে অভিহিত করেছেন। যদিও একটি শঙ্কু-কাহিনি (প্রোফেসর শঙ্কু ও ভূত) প্রকাশিত হয়েছিল সায়েন্স ফিকশন পত্রিকা 'আশ্চর্য'-য়। অন্যান্য লেখার ক্ষেত্রেও, বয়স্কপাঠ্য রচনা বাদ দিলে লেখক স্বয়ং কখনো 'সায়েন্স ফিকশন' তকমাটি লাগাননি। 'অনুকূল' অবশ্য প্রকাশিত হয়েছিল 'আনন্দমেলা'র বিশেষ সায়েন্স ফিকশন সংখ্যায়।

ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অভিযানের ও ভ্রমণের উপাদান শঙ্কু-কাহিনির একটি বিশেষ আকর্ষণ হলেও সত্যজিৎ রায়ের সায়েন্স ফিকশনের মুখ্য আবেদন নয়। কিশোরপাঠ্য হিসাবে রচিত হয়েও তার স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভের ও নিহিতার্থের হদিশ এই 'অ্যাডভেঞ্চার'-এর উপাদান থেকে সংগ্রহ করা যাবে না। সত্যজিৎ রায় ছোটোবেলা থেকেই জুল ভার্নের প্রতি আকৃষ্ট। তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছেন : 'আমি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, এখনও হই, ভার্নের গল্পের মধ্যে প্রাণ মাতানো নিখুঁত বর্ণনার অঢেল প্রাচুর্যের মধ্য দিয়ে পাঠককে আকর্ষণ করে স্তম্ভিত করে রাখার ক্ষমতা দেখে।' একই প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি বলছেন : 'ভার্ন যেসব কায়দায় গল্প ফাঁদতেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হলো, তিনি কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে সুকৌশলে নতুন ধাঁচে সাজিয়ে গল্পের চরিত্রগুলিকে তারই মধ্যে বসাতেন এবং সেই সাজানো কাহিনিটিকে চমৎকারভাবে কল্পনা রঙীন ফ্যানটাসি গল্পের প্যাটার্নে বুনে যেতেন।' ('এস. এফ.'—'নাউ' পত্রিকা থেকে অনূদিত)[২৩]। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, শঙ্কু-কাহিনির ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অভিযান-সংক্রান্ত পর্বগুলির পিছনে ভার্ন-এর অনুপ্রেরণা কাজ করেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সত্যজিৎ যদি ভার্নকেই মডেল করতেন, তা হলে তাঁর সায়েন্স ফিকশন তাঁর পূর্বসূরিদের বালখিল্যতা অতিক্রম করে যেটুকু অগ্রসর হতো সে শুধু পরিবেশনের গুণে— আর্দ্র আবেগ-বর্জিত ঋজু ভাষা, মরচে পড়া বিশেষণের প্রতি বিরাগ, চলচ্চিত্রধর্মী এপিসোডের ধারা নির্মাণ ও শঙ্কু কাহিনিতে ডায়েরি ফর্মের সুচিন্তিত প্রয়োগ তাঁর রচনার নির্মিতি ও লিপি-কুশলতার নিঃসংশয় প্রমাণ।

ভূগোল অথবা ইতিহাস, ভাষা অথবা অ্যাডভেঞ্চারের অতিরিক্ত যে-সুর যোজনা করেছেন সত্যজিৎ, এখানে সেই দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে চাই। তাই কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় রচনার সংক্ষিপ্তসার বর্জন করার উপায় নেই।

'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' গল্পে প্রথম প্রোফেসর শঙ্কুর আবির্ভাব তাঁর ডায়রিটি আবিষ্কারের সূত্রে। একটি উল্কার গর্তের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল নিরুদ্দিষ্ট বিজ্ঞানীর এই ডায়রি যার কালির রং ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, যার কাগজ ছেঁড়ে না বা পোড়ে না। রকেট নির্মাণ পর্বের বিবরণ থেকে ডায়রি শুরু হয়। পরীক্ষামূলক প্রথম রকেটটি প্রতিবেশী অবিনাশবাবুর মূলোর ক্ষেত ধ্বংস করলেও অচিরে শঙ্কু দ্বিতীয় রকেট যোগে মঙ্গলপুরে পাড়ি দেন। তাঁর সঙ্গী পুরাতন ভৃত্য প্রহ্লাদ, বেড়াল নিউটন আর যন্ত্রমানুষ বিধুশেখর। অভিযান কালে প্রহ্লাদ রামায়ণ পড়ে সময় কাটায়, বিধুশেখর বাংলা শিক্ষা করে তার নির্মাতা শঙ্কুর কাছে এবং অবিলম্বে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দ্বিজু রায়ের গান জোড়ে 'ঘঙো ঘাংঙ কুঁক্ক ঘঙা আগাঁকেকেই কক্কুং ঘঙা'। মঙ্গলে অবতরণের পর, বিধুশেখরের উচ্চারণে 'ভীবং বিভং' অর্থাৎ ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হয় তারা। মঙ্গলীয় সৈন্যদের আক্রমণ এড়িয়ে কোনোক্রমে রকেটে চড়ে পিঠটান দেয় তারা এবং অজানা এক গ্রহ টাফায় এসে পৌঁছায়। পৃথিবীর চেয়েও প্রাচীন এক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে সেখানে। 'তাদের প্রত্যেকটি

লোকই বিজ্ঞানী এবং এত বুদ্ধিমান একত্র হওয়ায় সেখানে নাকি নানা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। তারা এখন অন্যান্য গ্রহ থেকে কমবুদ্ধি লোক আনিয়ে টাফায় বসবাস করাচ্ছে। বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা করতে নারাজ হওয়ায় ক্রুদ্ধ শঙ্কু তাদের ওপর নিজস্ব উদ্ভাবন নস্যাস্ত্র প্রয়োগ করে। কিন্তু কিছু লাভ হয় না। তারা তখনো হাঁচতেই শেখেনি। ডায়রি এখানেই শেষ। আর গল্পের শেষে জানা যায় অমন অমূল্য ডায়রিটি শ'খানেক বুভুক্ষু পিঁপড়ে হজম করে ফেলেছে।

সায়েন্স ফিকশনের প্রচলিত মালমশলা ব্যবহার করে রচিত এই প্যারডির মধ্যে সুকুমার রায়ের স্পষ্ট ছায়াপাত। প্রোফেসর শঙ্কু 'হেশোরাম হুঁশিয়ারে'র আদলেই গঠিত। ডায়রির পাতা থেকে উদ্ধার করে গল্প পরিবেশনের ঢঙটিও এক। কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় ১৯৬১-তে ইউরি গাগারিনের মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার সুবাদে স্ফীতগর্ব 'বিজ্ঞান' কিন্তু সেই বছরেই রচিত এই গল্পে কোনো আবেগময় আশাবাদ সঞ্চারিত করতে পারেনি। বরং বিধুশেখরের কণ্ঠে দেশ-প্রেমের গান মহাকাশ অভিযানের পিছনে জাতীয়তাবাদী অহমিকার ইঙ্গিত বহন করে! মনে পড়ে যায় প্রায় দশ বছর পরে 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র চাকুরিপ্রার্থী সিদ্ধার্থ এ-যুগের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা কী, এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল ভিয়েতনামের যুদ্ধ। প্রশ্নকর্তার প্রত্যাশিত মহাকাশ বিজয় বা মানুষের চন্দ্রাবতরণের উল্লেখ করেনি সে।

এস. এফ. নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের আরেকটি অনবদ্য প্যারডি 'টেরোড্যাক্টিলের ডিম'। বদনবাবু অফিস ছুটির পর আউটরাম ঘাটের কাছে একা বেঞ্চিতে বসেছিলেন। পাশে এসে বসল এক নতুন টাইম মেশিনের উদ্ভাবক। এই যন্ত্রের নল দু-টো কানে ঢুকিয়ে বাঁ দিকে টিপলে অতীতে আর ডান দিকে টিপলে ভবিষ্যতে যাত্রা করা যায়। উদ্ভাবকের মুখে আশ্চর্য সব কাল পর্যটনের কাহিনি শুনলেন বদনবাবু, কিন্তু নিজে যন্ত্রটিকে ব্যবহার করতে পারলেন না। কারণ উদ্ভাবক ও বদনবাবু উভয়েরই মাথায় চুলের সংখ্যা এক হলে তবেই তা সম্ভব হতো! বাড়ি ফেরার পথে বদনবাবু দেখলেন তাঁর মানিব্যাগটি খোয়া গেছে। কিন্তু পঞ্চান্ন টাকা বত্রিশ নয়া পয়সার চেয়ে অনেক বড়ো প্রাপ্তি ঘটেছে তাঁর। বদনবাবুর সাত বছরের ছেলে বিলটু পঙ্গু। তাকে তিনি রোজ গল্প শোনান। আজ বিলটুর সত্যিকার খুশির খোরাক সংগ্রহ করেছেন তিনি।

শুধু সায়েন্স ফিকশন নয়, সত্যজিৎ রায়ের অন্যতম সেরা কাহিনি 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'। কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি স্কুলে বাইশ বছর ধরে ভূগোল আর বাংলা পড়াচ্ছেন বঙ্কুবাবু। তাঁকে কেউ কখনো রাগতে দেখেনি। ছাত্ররা তো পিছনে লাগেই, এমনকী শনি-রবিবারে গ্রামের মান্যগণ্য উকিলের বাড়িতে যে আড্ডা বসে সেখানে বুড়োরাও তাঁক অপদস্থ করে আসর জমায়। ক্রেনিয়াস গ্রহ থেকে একটি মহাকাশযান যখন পথ ভুলে পঞ্চা ঘোষের বাঁশবাগানে অবতরণ করল, ভিন্‌গ্রহী অ্যাং-এর দেখা পেলেন বঙ্কুবাবু। 'আই অ্যাম বঙ্কুবিহারী দত্ত স্যার, বেঙ্গলি কায়স্থ স্যার' বলে নিজের পরিচয় দেন তিনি। এই

নির্ভেজাল ছাপোষা সরল মানুষটি ভূগোল পড়ান, কিন্তু হিমালয়ের বরফ দেখেননি, দীঘার সমুদ্র, সুন্দরবনের জঙ্গল, কী শিবপুরের বাগানের বটগাছটি পর্যন্ত নয়। বিচিত্র শক্তিধর অ্যাং তাঁর পৃথিবী ভ্রমণের অপূর্ণ সাধ পূরণ করে এক বিচিত্র যন্ত্রের সাহায্যে এবং ফিরে যাওয়ার আগে একটি উপদেশ দিয়ে যায়, 'তোমার দোষ হচ্ছে যে তুমি অতিরিক্ত নিরীহ; তাই তুমি জীবনে উন্নতি করনি।' পরের দিন উকিল বাড়ির বৈঠকে বৈশাখী ঝড়ের মতো উদয় হন বঙ্কুবাবু। আমরা একটি নতুন মানুষকে আবিষ্কার করি যে আর নীরবে অপমান বরদাস্ত করতে রাজি নয়।

বঙ্কুবাবুকে হীনমন্যতা থেকে মুক্তি দিতেই পঁচিশটা গ্রহের ভ্রমণকারীর যে পৃথিবীতে আগমন তাতে কোনো সন্দেহ থাকার কারণ নেই। মানবিক ও হিতকর উদ্দেশ্য বিনা সত্যজিৎ রায়ের কোনো গল্পেই গ্রহান্তরের আগন্তুকদের উদয় হয়নি। যেমন 'মহাকাশের দূত' গল্পের আগন্তুকরা মানবসমাজের খাদ্য, পরিবেশ দূষণ, শক্তি সমস্যা ও প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। কিন্তু সেখানে লক্ষ করার মতো, কোনো তৈরি সমাধান তারা উপহার দিয়ে যায়নি। তাদের প্রদত্ত একটি আশ্চর্য প্রস্তরখণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত নীলাভ আলো শুধু উদ্বুদ্ধ করে অক্লান্ত গবেষণাকে, মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার প্রেরণা যোগায়। কিংবা 'অঙ্ক স্যার গোলাপী বাবু ও টিপু' গল্পে মাস্টারমশাই যখন সমস্ত রূপকথার কাহিনিকে কুসংস্কারের জনক বিবেচনা করেন, টিপুর দুঃখ দূর করতেই হামলাটুনির মাঠে ট্রিডিঙ্গিপিডি রেখে নেমে আসেন গোলাপীবাবু'

সত্যজিতের গল্পে গ্রহান্তরের আগন্তুকের এই নিহিতার্থ যে কষ্ট-কল্পনা নয় তার সাক্ষী 'দা এলিয়েন'-এর চিত্রনাট্য। চলচ্চিত্রটি গৃহীত না হওয়ার বৃত্তান্ত পরে আলোচিত হয়েছে, এখানে শুধু তার কাহিনিটি আমাদের বিবেচ্য।

১৯৬৬-র ফ্রেব্রুয়ারিতে জীবনীকার মারি সিটন-কে একটি চিঠিতে সত্যজিৎ লিখছেন :[১১]

> I am already at work on 2 more stories— both original. One, a science-fiction story involving a spaceship with only one supremely intelligent Martian occupant-landing on the outskirts of a remote village with as little contact with 'civilization' as possible. Martian first taken for a monster, then for a God— and so on.

এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ধৃতি চিহ্নের বন্ধনীর মধ্যে 'সভ্যতা'। এই 'সভ্যতা'র সঙ্গে ন্যূনতম সংস্পর্শে এসেছে যে উপান্তবর্তী গ্রামটি তারই সবচেয়ে লাঞ্ছিত অসহায় একটি বালকের ['হাবা'] সঙ্গেই শুধু গড়ে ওঠে পরম বুদ্ধিমান ও অলৌকিক ক্ষমতাধর এলিয়েন'-এর বন্ধুত্ব। হাবা-র সঙ্গে এলিয়েন লুকোচুরি খেলে, ব্যাং সাপ জোনাকি পোকা পদ্মফুল কাঠবিড়ালি আর বুলবুলি উপহার পেয়ে খুশি হয় এলিয়েন। ফেরার সময়ে হাবার কাছে শেখা ফুল-নদী-ধানক্ষেত নিয়ে সহজ একটি লোকগীতির সুর ভাঁজে।

এলিয়েন আর হাবা, সদর্থক সভ্যতার দুই প্রতিনিধি, তাদের মধ্যে প্রযুক্তিগত সুবিধাভোগের স্তরভেদ ব্যতীত কোনো ব্যবধান নেই। এক দিকে এদের দু-জনের সম্পর্ক যত বিকশিত হয় তার প্রেক্ষাপটে স্পষ্টতর হয়ে ফুটে ওঠে আমাদের তথাকথিত 'সভ্যতা'র স্বরূপ। এই 'সভ্যতা'র প্রতিনিধি বাজোরিয়া ফোটোগ্রাফারদের সাক্ষী রেখে গ্রামোন্নয়নের ব্রত নেয় (গরিব দেশে ধনীর 'ইমেজ' রক্ষা বড় কঠিন)। ডেভলিন নামক এক ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়োগের সুবাদে মার্কিন প্রযুক্তি এই ব্যবসায়ীর তুরুপের তাস। আর সাংবাদিক মোহন সেখানে সত্যদ্রষ্টা কিন্তু নিষ্ক্রিয়।

গ্রহান্তরের আগন্তুকদের অলৌকিক ক্ষমতা যেমন বঙ্কুবাবু বা হাবার মতো সরল অথচ পর্যুদস্ত মানুষেরই হিতার্থে নিয়োজিত হয় তেমনই সত্যজিতের বিভিন্ন গল্পে অত্যন্ত সাদামাটা মানুষই শুধু অর্জন করে কিছু কিছু অলৌকিক ক্ষমতা। প্রোফেসর শঙ্কু গিরিডিতে বসে অদ্ভুত যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেন খাঁটি দিশি উপকরণ কাজে লাগিয়ে। তেত্রিশ টাকা সাড়ে সাত আনার মধ্যে কাজ সারতে হয় বলে তাঁর রোবটের চোখ ট্যারা হয়। শুধু তাই নয় তাঁর উদ্ভাবনগুলির মধ্যে কোনোটারই কারখানায় অধিকসংখ্যায় উৎপাদন সম্ভব নয়। এগুলি মানুষের হাতের কাজ— এক ধরনের শিল্পকর্ম। কিন্তু প্রোফেসর শঙ্কু অলৌকিক ক্ষমতাধর নন। তিনি বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ। তাঁর বিচিত্র কার্যকলাপের বা অভিযানের সাফল্যের পিছনের কারণ সর্বদাই যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু শঙ্কু এমন অনেক অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী যার শেষ পর্যন্ত কোনো সমাধান হয় না। শুধু তাই নয়, এমন পরিস্থিতিরও প্রায়ই উদ্ভব হতে দেখা যায় যেখানে শঙ্কু নীরব দর্শক, মূল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সমাজের চোখে অতি নগণ্য কোনো ব্যক্তি। যেমন নকুড়বাবু।

মাকড়দার অধিবাসী নকুড়বাবুকে 'কেয়ার অফ হরগোপাল বিশ্বাস' চিঠি গ্রহণ করতে হয়। অতি গোবেচারা ও নিরীহ এই ব্যক্তিটি শঙ্কুর সামনে চেয়ারের ডগা ছুঁয়ে বসেন যখন, মুঠোয় ধুতির কোঁচা, ঘাড়ের হেলানো ভঙ্গিটিতেও কৃতার্থতা আর অফুরন্ত বিনয়। 'নকুড়বাবু ও এল ডোরাডো' গল্পে তাঁরই হস্তক্ষেপে শঙ্কু তাঁর অপহৃত গবেষণাপত্র ফিরে পান। নকুড়বাবু সব অর্থেই সাধারণ হলেও তাঁর অদ্ভুত একটি ক্ষমতা, তিনি অন্যের মন পড়তে পারেন। ভূত-ভবিষ্যৎ দেখতে পান, এমন কি নিজে যা কল্পনা করেন অন্যাকে দেখাতে পারেন। শঙ্কু ও নকুড়বাবু কুচক্রী বিজ্ঞানীর খপ্পরে পড়লে নকুড়বাবু সোনার শহর এল ডোরাডোর লোভ দেখিয়ে ব্রেজিলের গহন জঙ্গলের মধ্যে টেনে আনেন দুর্বৃত্তকে। এবার তাঁর কাজে লাগে বহুদিন আগে পড়া শ্রীগুরু লাইব্রেরির বরদা বাঁড়ুজ্জের ব্রেজিল বিষয়ক একটি বই। যাতে ছবি এঁকেছিলেন মদন পাল। সোনার শহর এল ডোরাডোর বাড়িগুলো অবশ্য ছবিতে দেখতে হয়েছিল টোল-খাওয়া টোপরের মতো— তাও সিধে নয় ট্যারচা। কিন্তু সাহেব ব্রাজিলের জঙ্গলের মধ্যে তাই দেখেই বলল, এল ডোরাডো ইজ ব্রেথ-টেকিং! সাহেবদের ঠকিয়ে তিনি শেযপর্যন্ত ঠাকুমার জন্য

তিরিশ টাকা দামের একটি বিলিতি ওষুধ সংগ্রহ করতে পেরেই সবচেয়ে খুশি।

নকুড়বাবুর তাও অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, কিন্তু পাপাডোপুলসের তো তাও নয়। ফ্রান্সের রাস্তায় পকেট মারতে সিদ্ধহস্ত সে— এইমাত্র। কিন্তু 'হিপনোজেন' গল্পে তারই দৌলতে রক্ষা পেয়েছিল শঙ্কু ও বিজ্ঞানী সামারভিল্। অস্‌লোর উপকণ্ঠে এক মধ্যযুগীয় কেল্লার ঢং-এর বাড়িতে ধনকুবের ক্রাগের আমন্ত্রণে এসে ফাঁদে পড়েছিল তারা। ক্রাগ বিজ্ঞানী, স্বয়ং আয়ুবৃদ্ধির উপায় বার করে ইতিমধ্যে তিনবার অবধারিত মৃত্যুকে ঠেকিয়েছে। কিন্তু এবার তার মৃত্যু আসন্ন জেনে বিজ্ঞানীদের ডেকে এনেছে। ক্রাগের মৃত্যুর পর তারা যাতে ক্রাগের নির্দেশ অনুসারে আবার তাকে বাঁচিয়ে তোলে। ক্রাগের দুই রোবটের প্রহরা এড়িয়ে স্বাধীনভাবে কিছু করারও উপায় নেই। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা ক্রাগ পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিকারী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার বৈজ্ঞানিক দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছে হিপ্‌নোজেন নামে মারাত্মক এক রাসায়নিক দ্রব্য। পাপাডোপুলস শেষে রোবটের পকেট মেরে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ছিঁচকে চোরের কীর্তির পাশে বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রতিভাও ম্লান প্রতিপন্ন হয় নৈতিকতার কারণে।

আয়ুবৃদ্ধির তৃষ্ণা (আর পরশপাথরের সন্ধান)— এই থিম্ নিয়ে বেশ কিছু গল্প লিখেছেন সত্যজিৎ— যাতে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে অনেক ধরনের ক্রাগকে আবিষ্কার করা যায়! কিন্তু তার মধ্যে 'ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট' গল্পটির মেজাজ একেবারেই আলাদা। রিটায়ার্ড স্কুল মাস্টার নিশিকান্তবাবু বাতের চিকিৎসা করাতে করিমগঞ্জে মাধব ডাক্তারের কাছে এসে ঘটনাচক্রেই ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগানে আবিষ্কার করেন প্রায় অমৃত-সম একটি অচেনা ফল। বহু ভিটামিন ও অচেনা রাসায়নিক সমৃদ্ধ, স্বাদগন্ধে ও উপকারিতায় যার জুড়ি নেই। নিশিকান্তবাবু প্রথমে নিজেই বিশ্বাস করতে পারেননি এত বড় একটা আবিষ্কারের গৌরব তাঁর প্রাপ্য! তারপর অবশ্য তাঁর মনে হয়, এই যে মানুষ এত রকম শাকসব্জি ফলমূল শস্যকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করছে, তার শুরু কীভাবে হল তাও কি জানি আমরা? আম জাম কলা কমলা ইত্যাদি কে বা কারা প্রথম খেয়ে সেটাকে খাদ্য হিসাবে প্রমাণ করল, ইতিহাসে তার কি কোনো উল্লেখ আছে? গল্পের শেষে পৌঁছে আমরা দেখি সাধারণ ইতিহাসের এই রেওয়াজের সঙ্গেই সংগতি রেখে ম্যাকেঞ্জি ফ্রুটের আবিষ্কারক নিশিকান্তবাবুর নামটিও আর কোনোদিন নথিবদ্ধ হবে না। এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিশিকান্তবাবুর আবিষ্কারটিকে কুক্ষিগত করেছে, ফলের চাষ শুরু করেছে ও কারখানা খুলেছে সংরক্ষক রসে ভরা টিনে পুরে ফলটি বেচবার জন্য। একদিকে নিম্নবিত্ত আবিষ্কারক যেমন স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হলেন, অন্যদিকে আকাশছোঁয়া দাম ফলটিকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে গেল।

আটপৌরে মানুষরাই শুধু সত্যজিতের জগতে আশ্চর্য বা অলৌকিক মানবিক ক্ষমতাবলে উজ্জ্বল নয়, অমানুষ রোবটও কখনো কখনো মানুষের অমানবিক আচরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'অনুকূল' একই নামধারী একটি রোবটের কাহিনি। রোবট সাপ্লাই এজেন্সির

দোকান থেকে নিকুঞ্জবাবু তাকে ভাড়া করে আনেন। সাধারণ গৃহভৃত্যের সব কাজই করে সে, শুধু রান্না ছাড়া। প্রথমেই নিকুঞ্জবাবুকে সতর্ক করে দেওয়া হয়, বাড়ির বাইরে কোনো কাজে যাতে তাকে পাঠানো না হয়, যেমন পান-সিগারেট ইত্যাদি আনাতে। 'তুই' বলে সম্বোধনটাও তার পছন্দ নয়, আর গায়ে হাত তোলা তো মোটেই বরদাস্ত করবে না— প্রতিশোধ নেবেই এবং তার ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। নিকুঞ্জবাবুর এক কাকা কিছুদিনের জন্য বাড়িতে আসেন অতিথি হিসাবে। তাঁকে সতর্ক করা সত্ত্বেও হঠাৎ একদিন ক্ষেপে গিয়ে তিনি অনুকূলকে চড় মারেন। কারণ, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে তিনি যখন রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান গাইছিলেন, অনুকূল তাঁর কথার ভুল ধরেছিল। যথা প্রত্যাশিত, অনুকূলের শক্-এ তাঁর মৃত্যু ঘটে। পরে জানা যায়, আরও একটি কারণ প্ররোচিত করেছিল অনুকূলকে। আর্থিক অনটনে পড়েছিলেন নিকুঞ্জবাবু, এবার কাকার মৃত্যুতে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনিই লাভ করবেন। অনুকূল আমাদের ঘরে চিরাচরিত প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটিকে বেজায় অস্বস্তিকর করে তোলে! অনুকূলের কীর্তি আমাদের সত্যজিতের সেই অনবদ্য লিমেরিক-টিকেও স্মরণ করিয়ে দেয় :

রামফাঁকিবাজ চাকর জোটে সাধনবাবুর ভাগ্যে,
বাবু বলেন, 'রোবট রাখি। চাকরগুলো যাক্‌গে।'
রোবট হল কাজে বহাল
তার ফলে আজ বাবুর কি হাল?
রোবট বলে, 'কই রে ব্যাটা!' বাবু বলেন, 'আজ্ঞে?'

—কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯০।

সত্যজিতের সায়েন্স ফিকশন নির্ভেজাল বাঙালি ঘরের সন্তান। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা ৭২ নং-এর মেসবাড়ি ছেড়ে বেরোবার পরে বাঙালির খোলস পুরো ত্যাগ করেন। অভিযান কালে অলস নিদ্রাপ্রিয় মামাবাবুর বাঙালিয়ানাও আর গল্পের স্বার্থরক্ষায় জরুরি নয়। সত্যজিতের কাহিনিতে শুধু বাঙালি পোশাকে ও কিছু বিশেষ ভোজ্যের প্রতি আসক্তিসম্পন্ন চরিত্র আন্তর্জাতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হয় না। বাঙালি মন ও মানুষ সেখানে কাহিনি-কাঠামো বা মূল্যবোধের সংঘাত কেন্দ্রিক সমস্যা ইত্যাদির অরগ্যানিক দাবি পূর্ণ করে।

আমাদের অত্যন্ত পরিচিত চেনাজানা মানুষ; মাঝারি মানুষ অতি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবর্তিত হয় যাদের দৈনন্দিন ছকে বাঁধা জীবন, সত্যজিতের দুনিয়ায় কল্পনার দুঃসাহস বা অলৌকিক কিছু ক্ষমতা অর্জনের সূত্রে তাদের রূপান্তর ঘটে যায়। এক অর্থে ইচ্ছাপূরণের কাহিনি নিশ্চয়ই, কিন্তু বিশেষ মূল্যবোধেরও পরিচায়ক। রোবট, কম্পিউটার, উড়ন্ত চাকি, এলিয়েন, টেলিপ্যাথি— সায়েন্স ফিকশনের সব উপকরণই ব্যবহার করেছেন তিনি। কিন্তু যন্ত্রমানুষ ভিনগ্রহী বা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর জৈবিক বা যন্ত্রকৌশলের ব্যাখ্যা নয়, এই পৃথিবীরই চেনা মানুষের উপর অচেনা আলো ফেলে তিনি সাহিত্য নামক গবেষণাগারে মূল্যবোধ নিয়ে পরীক্ষণ চালান।

সত্যজিতের সায়েন্স ফিকশনে অলৌকিক ও ব্যাখ্যাতীত নানা প্রসঙ্গের উত্থাপন বহু সমালোচককে বিভ্রান্ত করেছে এবং তাঁর এই জাতীয় কাহিনিকে 'সায়েন্স ফিকশন'-এর পরিবর্তে 'সায়েন্স ফ্যান্টাসি' অভিহিত করে তাঁরা স্বস্তি লাভ করেছেন। এর পিছনে বলাই বাহুল্য ভার্নকে সায়েন্স ফিকশনের ও ওয়েল্‌স-কে সায়েন্স ফ্যান্টাসির আদর্শ প্রতিনিধি রূপে কল্পনা করে নেওয়ার একটি ভ্রান্ত যুক্তির সমর্থন আছে। সাহিত্যে ফ্যান্টাসির সঙ্গে বাস্তবতার কোনো বিরোধ নেই। ফ্যান্টাসি (যেমন সত্যজিতের গল্পের অলৌকিক পরিমণ্ডল বা ব্যক্তিবিশেষের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা) আসলে সত্য অন্বেষণের হাতিয়ার। ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বা অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নিয়ে মানুষ, মানুষের সম্পর্ক ও সমাজকেই যা পরখ করে। বঙ্কু, নকুড় বা নিশিকান্তবাবুর মতো ছাপোষা মাঝারি মানুষদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড আসলে আরও বিস্ময়কর ও অলৌকিক একটা ঘটনাকেই পরিস্ফুট করে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। শুধু বিষয়-বৈভবের দাপটেই দুনিয়াদারী চালাবার ছাড়পত্র সংগ্রহ করা যায় আমাদের সমাজে। এবং প্রোফেসর শঙ্কু সাধারণ মানুষ না হয়েও সে বিষয়ে সচেতন বলেই সম্ভবত তাঁর বিস্ময়কর সব উদ্ভাবন কখনোই বৈষয়িক কাজে লাগে না। ব্যবসায়ীদের কারখানায় যার ভুরি ভুরি উৎপাদনও সম্ভব নয়।

'আশ্চর্য' ও এস. এফ. সিনে ক্লাব

বাংলা ভাষার এবং ভারতের প্রথম সায়েন্স ফিকশন পত্রিকা 'আশ্চর্য' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩-র জানুয়ারি মাসে। আকাশ সেন ছদ্মনামে অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এস. এফ.-কে জনপ্রিয় করার আন্দোলন। 'আশ্চর্য'র প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

'আশ্চর্য'র প্রথম সংখ্যাতেই ওয়েল্‌স-এর 'টাইম মেশিন' উপন্যাস ও ব্র্যাডবেরির গল্প 'সার্সাপেরিলার গন্ধ'-র অনুবাদ প্রকাশিত হয়, যা সম্পাদকের সুবিবেচনার পরিচয় বহন করে। তাছাড়া এই সংখ্যাতে ফ্রেডরিক ব্রাউনের গল্প 'ব্রহ্মাস্ত্র', সমরজিৎ কর ও ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের দু-টি মৌলিক কাহিনি এবং আর্থার সি. ক্লার্ক-এর পরিচিতি সহ কৌতুক-চিত্র ও কমিক স্ট্রিপও প্রকাশিত হয়েছিল।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত কিছু সাহিত্যিককে এস. এফ.-চর্চায় উৎসাহিত করেছিল 'আশ্চর্য', সত্যজিৎ রায়কে লাভ করেছিল উৎসাহী পরামর্শদাতা ও লেখক হিসাবে। তা ছাড়া 'আশ্চর্য'র লেখককুলের মধ্যে সম্পাদক সহ এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, সমরজিৎ কর, রণেন ঘোষ ও মনোরঞ্জন দে প্রমুখ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু 'আশ্চর্য'র বড় আবিষ্কার গুরনেক সিং ও দিলীপ রায়চৌধুরী।

ব্র্যাডবেরির ভক্ত গুরুনেক সিং-এর 'হারানো ছেলে', 'মৃত্যুদূত', 'খাচ্ছিল তাঁতি

তাঁত বুনে' ইত্যাদি গল্প পড়লে বিশ্বাস করা শক্ত লেখক বঙ্গসন্তান নন। অসাধারণ মুন্সিয়ানায় তিনি ব্র্যাডবেরির কাহিনি অবলম্বনে রচনা করেছিলেন 'মঙ্গল স্বর্গ'।

রাবার-টেক্‌নোলজিস্ট রসায়নবিদ দিলীপ রায়চৌধুরীর ভারতে পারমাণবিক গবেষণার ভিত্তিতে রচিত 'অগ্নির দেবতা হেফেস্‌টাস' বা সেযুগে সাধারণ মানুষের প্রায় অশ্রুত প্লাজ্‌মা বা লেসার্‌-কেন্দ্রিক কাহিনি *'ক্লুগেল ব্লিৎস্‌'*, *'প্লুটোর অভিশাপ'*, কী *'টিথোনাস'*-এর আবেদন আজও অমলিন। ১৯৬৬-তে এই তরুণ প্রতিভাধরের অকাল প্রয়াণে সত্যজিৎ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অদ্রীশ বর্ধনের শোক-বার্তা প্রকাশিত হয়েছিল আশ্চর্য-র পাতায়[১১]। আমেরিকায় প্রবাসী হওয়ার পর জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন কর্মী গুরনেক সিং-কেও হারিয়েছি আমরা।

এস. এফ.-এর পালে হাওয়া লাগাতে বদ্ধপরিকর 'আশ্চর্য'-র কর্তাদের আরেক কীর্তি—আকাশবাণী থেকে বারোয়ারি সায়েন্স ফিকশন গল্প সম্প্রচার। ১৯৬৬-র ১৬ ফেব্রুয়ারি 'সবুজ মানুষ' নামে গল্পপাঠের আসরে হাজির হয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অদ্রীশ বর্ধন, দিলীপ রায়চৌধুরী ও সত্যজিৎ রায়।

'আশ্চর্য'য় সত্যজিৎ রায়ের কাহিনি 'প্রোফেসর শঙ্কু ও ভূত' ও 'ময়ূরকণ্ঠী জেলি' ছাড়া প্রকাশিত হয়েছিল 'নাউ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'SF' প্রবন্ধের অনুবাদ। সায়েন্স ফিকশন ফিল্ম সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকারও প্রকাশিত হয়েছিল, যা এস. এফ. সিনে ক্লাব সূত্রে স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হবে।

পাঁচ বছর চলার পর 'আশ্চর্য' বন্ধ হয়ে যায়। অদ্রীশ বর্ধনের সম্পাদনায় আবার নতুন এস. এফ. পত্রিকা 'ফ্যানটাসটিক' প্রকাশিত হয় ১৯৭৫-এ। সত্যজিৎ রায় এই পত্রিকার নামাঙ্কন (Logo) করে দেন।

'আশ্চর্য' প্রকাশের দু'-বছরের মধ্যে এই পত্রিকাকে ঘিরে স্থাপিত হয় 'এস. এফ. সিনে ক্লাব' যার প্রাণপুরুষ ছিলেন সক্রিয় সভাপতি সত্যজিৎ রায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অদ্রীশ বর্ধন যথাক্রমে সহ-সভাপতি ও সেক্রেটারি।

১৯৬৫-র ২৬ জানুয়ারি ক্লাবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ 'ভিলেজ অফ দা ড্যাম্‌ড্‌' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। স্মরণী-পুস্তিকায় সত্যজিৎ রায় লিখেছিলেন : 'প্রায় তিরিশ বছর ধরে আমি সায়েন্স-ফিকশনের ভক্ত; তাই এস. এফ. সিনে ক্লাব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আমায় এতখানি নাড়া দিয়েছে। এ ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পেরে আমি আনন্দিত; এ ধরনের ক্লাব বোধ করি শুধু এদেশেই সর্ব প্রথম নয়, বিদেশেও আর নেই। ক্লাবের উদ্বোধন উপলক্ষে এই কামনাই করছি সারা পৃথিবী থেকে বাছাই করা সেরা এস. এফ. ফিল্মের বহু মনোগ্রাহী এবং চিন্তা-উন্মেষক প্রদর্শনী যেন সভ্যরা দেখতে পান্‌।' (...আশ্চর্য, ফেব্রুয়ারি ১৯৬১, ইংরেজি থেকে অনূদিত)।

এস. এফ. সিনে ক্লাব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সত্যজিৎ রায়কে প্রেরিত ওয়াল্ট ডিজনি, রে ব্র্যাডবেরি, আর্থার সি ক্লার্ক ও কিংসলি অ্যামিসের অভিনন্দন পত্রগুলি স্মরণী-পুস্তিকায়

এবং পরে তার অনুবাদ 'আশ্চর্য'য় (১৯৬৬-র ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়েছিল।

স্মরণী-পুস্তিকার প্রচ্ছদ থেকে ক্লাবের লোগো-সহ মেম্বারশিপ কার্ড, পোস্টকার্ড ইত্যাদি সবই ডিজাইন করেন সত্যজিৎ রায়। প্রদর্শিত প্রতিটি চিত্রও নির্বাচন বা অনুমোদন করতেন তিনি। মান সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে কোনো ছবি প্রদর্শিত হত না। অজানা ছবির ক্ষেত্রে synopsis দেখে প্রাথমিক নির্বাচনের পর সত্যজিৎ রায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিন্ডসে স্ট্রিটের প্যাটেল ইন্ডিয়ার প্রোজেক্শন রুমে কাটিয়েছেন। দিল্লি, বম্বে, এমনকী বিদেশ সফরকালেও ক্লাবের জন্য ছবি সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। জাপানে চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত সত্যজিৎ রায় জাপানি এস. এফ. ফিল্ম সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করলে উৎসবের উদ্যোক্তারা দ্বিধাগ্রস্তভাবে জানিয়েছিল, জাপানে এখনো মনস্টার জাতীয় ফিল্মেরই প্রাধান্য, সত্যজিৎ রায়ের ক্লাবে দেখানোর উপযুক্ত কিছু নেই। এই ধরনের নানা সংবাদ সহ ক্লাবের নানা ক্রিয়াকলাপের কথা নিয়মিত প্রকাশিত হত 'আশ্চর্য'র 'এস. এফ. সিনে ক্লাবের টুকরো খবর' বিভাগে। প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের কাহিনির সারাংশ বা পূর্ণাঙ্গ অনুবাদও প্রতি সংখ্যাতেই থাকত। 'আশ্চর্য' ও 'এস. এফ. সিনে ক্লাব' ছিল পরস্পরের সম্পূরক।

১৯৬৫ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম—'দা ইনক্রেডিব্‌ল শ্রিংকিং ম্যান', 'দা ফেবুলাস ওয়ার্লড অফ জুল ভার্ন', 'দা ম্যান ফ্রম দা ফার্স্ট সেঞ্চুরি' ও 'এ জেস্টার্স টেল' (চেক্), 'দা গোলেম' (নির্বাক, ১৯১৫), ডিজনি-র 'দা সন অফ ফ্লাবার', ব্র্যাডবেরির কাহিনি অবলম্বনে 'দা ইলাস্‌ট্রেটেড ম্যান' ও 'ফারেনহাইট ৪৫১', কুবরিকের 'ডক্টর স্ট্রেঞ্জলাভ' ও '২০০১—এ স্পেস ওডিসি' ইত্যাদি।

১৯৭৬-এর মার্চ সংখ্যা 'আশ্চর্য'র পাঠক ও 'এস. এফ. ক্লাব'-এর সদস্যদের কাছে বহন করে আনে প্রায় অবিশ্বাস্য এক সুখবর। সত্যজিৎ রায় এস. এফ. চলচ্চিত্র তুলতে যাচ্ছেন। ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ। ছবিটি প্রযোজনায় আগ্রহী বিদেশী কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছে।

সত্যজিতের এই অভিশপ্ত 'এলিয়েন'-এর কাহিনিতে প্রবেশ করার আগে চলচ্চিত্রে এস. এফ. সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

চলচ্চিত্র তার শৈশবেই আকৃষ্ট হয়েছিল এস. এফ. থিমের প্রতি। বাক্‌স্ফূর্তির পূর্বেই এস. এফ.-এর বিচিত্র কল্পনার দৃশ্য আবেদনের মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন চলচ্চিত্র-নির্মাতারা। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ১৯৩২-এ গৃহীত জর্জ মেলিয়ে-র ১৬ মিনিটের ব্যঙ্গ রসাত্মক ফ্যান্টাসি 'এ ট্রিপ টু দা মুন' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। নির্বাক যুগের সেরা চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে রাশিয়ার লিও কুলেশভ প্রথম এস. এফ.-এর প্রতি আকৃষ্ট হন। আলেক্সি তলস্তয়ের 'দা হাইপার্‌বলয়েড অফ ইঞ্জিনিয়ার গ্যারিন' অবলম্বনে তিনি

১৯২৫-এ সৃষ্টি করেন 'লুচ্ স্মিয়েরচি' (মৃত্যু-রশ্মি)। সমালোচক জন ব্যাক্সটার ফিল্মটি সম্বন্ধে লিখেছেন[১] :

> Leo Kuleshov, one of the Soviet's greatest directors of the period, used this melodrama set in an unnamed Western country as a means of dramatising to the Russian people the sophistication of Soviet film-making, then equal to the world's best...'The Death Ray's degree of commitment was to remain unchallenged until the polemical onslaughts of 'On the Beach' near to our time.

(নেভিল শ্যুট-এর কাহিনি অবলম্বনে গৃহীত 'অন দা বিচ্' পারমাণবিক বিস্ফোরণঘটিত বিভীষিকার এক আধুনিক এস. এফ. চলচ্চিত্র)।

কুলেশভের পরেই নির্বাক যুগের আরেক পরিচালককে আকৃষ্ট করেছিল এস. এফ.। ফ্রিৎজ ল্যাং। ডিক্টেটর-শাসিত ভবিষ্যতের হাই-টেক্ শহরের সেই বৃত্তান্ত, 'মেট্রোপলিস' (১৯২৭) চলচ্চিত্রের ভাষার নিপুণ প্রয়োগে যেমন 'ক্ল্যাসিক' রূপে বিবেচিত, তেমনই আজও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। কিন্তু এস. এফ. চলচ্চিত্রের ইতিহাসের আদ্যোপান্ত বিবরণ এই প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট নয়। সত্যজিৎ রায়ের 'এলিয়েন' প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তনের আগে এখানে 'আশ্চর্য' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'কুবরিক, ক্রুফো ও SF'-এর প্রাসঙ্গিক অংশটির প্রতি শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সত্যজিৎ লিখছেন[২১] :

> কিন্তু এতকাল পৃথিবীর মধ্যে যারা সেরা পরিচালকের পর্যায়ভুক্ত তাদের কেউই এদিকে [SF-এর] এগোননি। সম্প্রতি এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। গত বছরের বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে Godard-এর Alphaville ছবি পেয়েছিল প্রথম পুরস্কার। এ সম্মান SF ছবির ভাগ্যে এর আগে কখনো জোটেনি। Alphaville ছবির পরিচালকের প্রধান কৃতিত্ব ছিল, একটিও কৃত্রিম সেট তৈরি না করে, আজকের দিনের প্যারিস শহরের রাস্তাঘাটে হোটেল আপিস ইত্যাদিতে ছবি তুলে, কেবলমাত্র আলো ও ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ নির্বাচনের চাতুরির জোরে ভবিষ্যতের বিজ্ঞান-শাসিত এক প্যারিসের চেহারা ছবিতে এনে ফেলেছিলেন। কলাকৌশলের দিক থেকে এ ছবি অবিস্মরণীয় সে কথা বলতে দ্বিধা নেই।
>
> ফ্রান্সের ফ্রাঁসোয়া ক্রুফো ও আমেরিকার স্ট্যানলি কুবরিকের আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় আমরা একাধিক মার্কিন ও ফরাসি ছবিতে পেয়েছি। সম্প্রতি এঁরা দুজনেই এল্‌স্ট্রি স্টুডিওতে পাশাপাশি ফ্লোরে কাজ করে দু-জন নামকরা SF লেখকের কাহিনির উপর ভিত্তি করে দু-টি ছবি তুলেছেন। ক্রুফো তুলেছেন রে ব্র্যাডবেরির Fahrenheit 451, ও কুবরিক তুলেছেন তাঁরই অনুরোধে এবং সহযোগিতায় আর্থার ক্লার্ক রচিত 2001 : A Space Odyssey. আমি

> এবার লন্ডনে গিয়ে আর্থার ক্লার্কের সঙ্গে যোগাযোগ করে এল্‌স্ট্রি-তে উঁকি দিই। ক্রফোর ছবি শুনলাম তোলা শেষ, কিন্তু কুবরিক তখনও তুলে চলেছেন A Space Odyssey. ফ্লোরে গিয়ে মহাকাশযানের অভ্যন্তরের সেট দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কুবরিকের সঙ্গে দু-মিনিট কথা বলে যিনি এই রকেটের নকশা করেছেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম। শুনে অবাক হলাম তিনি নাকি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রকেট ডিজাইনার। এবং তাঁর পরিকল্পিত রকেট নাকি এর আগেই মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে! সিনেমার কাজ কেন করছেন জিগ্যেস করতে হেসে বললেন, এতে পয়সা অনেক বেশি।

কুবরিক ও তাঁর সহকর্মীদের কাজের বহর ও উৎসাহ দেখে Space Odyssey নির্মাতাদের দাবি মানতে অসুবিধা হয় না। এঁদের মতে এত বড় SF ছবি নাকি এর আগে কখনো হয় নি, এবং এ ছবি আত্মপ্রকাশ করার পর অন্তত দশ বছর নাকি অন্য কোন প্রযোজক মহাকাশ নিয়ে ছবি করার সাহস পাবেন না।

সত্যজিৎ কিন্তু এই নিবন্ধ লেখার কয়েক মাস পূর্বেই 'এলিয়েন'-এর চিত্রনাট্য রচনায় হাত দিয়েছেন সে-কথা আমরা মারি সিটন-কে লেখা তাঁর চিঠি থেকে আগেই জানতে পেরেছি। বিশাল ব্যয়বহুল 'স্পেশাল এফেক্ট'-এর চোখ-ধাঁধানো আড়ম্বরের কথা ধরলে সত্যিই স্পেস ওডিসি-র পর এ-ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণে সত্যজিতের মতো ভারতীয় পরিচালকের পক্ষেও ব্রতী হওয়া দুঃসাহসের কাজ ছিল। কিন্তু মহাকাশ-বিষয়ক এস. এফ. চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সত্যজিতের কল্পনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। 'এলিয়েন'-এর কাহিনি সূত্রে তার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। তবু স্পেস ওডিসি-র বাজেটের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও 'এলিয়েন' প্রযোজনা করার জন্যও বিদেশি সহযোগিতা অপরিহার্য ছিল। কাজেই সাহস নয়, সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন সত্যজিৎ।

১৯৬৭-র মার্চ সংখ্যা 'আশ্চর্য'-য় লেখা হল, সত্যজিতের এই সায়েন্স ফিকশন গৃহীত হবে বাংলাতেই, অভিনেতাদের মধ্যে থাকবেন একজন খ্যাতনামা আমেরিকান এবং চলচ্চিত্র গ্রহণের কাজ শেষ হওয়ার পরে সত্যজিতের কাহিনি অবলম্বনে আর্থার সি. ক্লার্ক রচনা করবেন একটি উপন্যাস। প্রসঙ্গক্রমে, আর. ডি. বনশলের 'গুপী গায়েন'-সহ এই এস. এফ. ফিল্মের প্রযোজনার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আসার কথাও জানানো হয়।

'আশ্চর্য'র পরবর্তী সংখ্যার ঘোষণা, ইংরেজিতে চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়া রচনার কাজ সম্পূর্ণ। সত্যজিৎ রায়ের মুখে কাহিনিটিও শুনেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অদ্রীশ বর্ধন। বাংলাদেশের বীরভূম বা বাঁকুড়ার কোনো গ্রামে ছবিটির বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে। টড-অ্যাও স্ক্রিনে প্রদর্শনের উপযোগী চিত্রটি বিদেশি ক্যামেরায় তোলা হবে। আর্ট ডিরেক্টর ভারতীয় হলেও মেক্-আপ ম্যান আসবেন বাইরে থেকে। আসবেন স্পেসশিপ তৈরির এক্সপার্ট-ও। ছবির আমেরিকান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য মার্লোন ব্রান্ডো ও স্টিভ ম্যাকুইন উভয়েই আগ্রহী।

১৯৬৭-র মে সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'সত্যজিৎ রায়ের সায়েন্স ফিকশন ফিল্ম

'অবতার'' প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার'। সত্যজিৎ রায় জানান, মাড়োয়ারির ভূমিকায় অভিনয়ে পিটার সেলার্স রাজি হয়েছেন। আগাগোড়াই আমেরিকান ইংরেজিতে কথা বলবেন কিন্তু সেলার্সের বাংলাতে বলার খুব ইচ্ছা, তাই হয়তো তাঁকে কিছু সুযোগ দেওয়া হতে পারে। আমেরিকানের চরিত্রাভিনয়ে মার্লোন ব্রান্ডো আগ্রহী, কিন্তু সত্যজিৎবাবুর ইচ্ছা স্টিভ ম্যাকুইনকে নেওয়ার। ম্যাকুইন-কে না পেলে পল নিউম্যান। কাহিনির নামকরণ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ বলেন, ইংরাজিতে The Alien—বাংলায় সম্ভবত 'অবতার'। গল্পের একটি ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছিল এই সাক্ষাৎকারে। সত্যজিৎ রায়ের মূল কাহিনি অবলম্বনে আর্থার সি. ক্লার্ক একটি উপন্যাস রচনা করবেন— এই বক্তব্য আবার সমর্থিত হয়। ১৯৬৮-র ফেব্রুয়ারিতে ছবির কাজ শুরু হওয়ার কথা প্রসঙ্গে বিদেশী এজেন্ট মাইক উইলসনের নামও উল্লিখিত হয়।

মাইক উইলসনের সঙ্গে সত্যজিতের হলিউড ও ইংলন্ড সফরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, 'এলিয়েন'-এর চিত্রনাট্যে সত্যজিতের নামের সঙ্গে মাইকের নিজের নাম যুক্ত করা, বিদেশী প্রযোজক প্রদত্ত অগ্রিম টাকা উধাও হওয়া ইত্যাদি ঘটনার কথা অত্যন্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে কৌতুক কাহিনির মতো সত্যজিৎ রায় ১৯৮০ তে লিপিবদ্ধ করেছেন স্টেটস ম্যান পত্রিকায়। 'Ordeals of the Alien' নামে দুই কিস্তিতে সেটি প্রকাশিত হয়েছে।[৯] মাইক উইলসন সত্যজিতের ভাষায় 'সীতা হরণ' করেছিলেন। কিন্তু অভিশপ্ত 'এলিয়েন' এর অধ্যায়ে তাও যবনিকাপাত হয়নি। সেটি ঘটল 'এলিয়েন'-এর চিত্রনাট্যের মিমিওগ্রাফ-করা কপি থেকে অনেক আইডিয়া আত্মসাৎ করে স্পিল্‌বার্গের ই. টি. আবির্ভূত হওয়ার পর। 'আজকাল' দৈনিকপত্রে দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন 'সত্যজিৎ, এলিয়েন ও স্পিলবার্গ'-এ তার পূর্ণ বিবরণ আছে।[১৭] মারি সিটনের 'সত্যজিৎ রায়' গ্রন্থে 'এলিয়েন' বিষয়ক দীর্ঘ আলোচনা চিত্রনাট্যের অংশ ও সত্যজিতের আঁকা গ্রহান্তরের অপার্থিব আগন্তুকের দু-টি স্কেচ সাক্ষী যে স্পিল্‌বার্গের ই. টি. 'এলিয়েন'-এর অপভ্রংশ।

উপসংহার

তিনের দশকে 'সায়েন্স ফিকশন' পরিভাষার জন্মের পর একটি ঘরানা গড়ে উঠেছিল মূলত মার্কিন একটি উপাচার রূপেই। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো 'ভৌতিক কাহিনি', 'গোয়েন্দা কাহিনি' ইত্যাদির সঙ্গে পাল্লা দেবে মনে হয়েছিল মনোরঞ্জক লঘু সাহিত্যের এই নতুন শাখা। প্রযুক্তি বিলাসে মত্ত অ্যাফলুয়েন্ট সোসাইটির পলাতক মনোবৃত্তির দৌলতে জনপ্রিয়তাও অর্জন করবে বলে আশা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে সায়েন্স ফিকশন 'পত্রিকা' বা 'গোষ্ঠীকেন্দ্রিক' উন্মাদনার সঙ্গে সঙ্গে মনোরঞ্জক সাহিত্য হিসাবেও তার আবেদন হারিয়েছে। 'সায়েন্স ফিকশন' পরিভাষাটি জন্মের পূর্বেই যারা এই শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন যেমন শেলি, ভার্ন, ওয়েল্‌স কী চাপেক— তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ব্র্যাডবেরি, স্ত্রুগার্ৎস্কি, লেম বা সত্যজিতের মতো মননশীল মানবতাবাদী সাহিত্যিকরা।

নীতি ও মূল্যবোধ নিরপেক্ষ প্রবল পরাক্রান্ত বিজ্ঞানের জগতের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জগতের একটি বিবেক-বন্ধন রচনাসূত্রেই এস. এফ. চর্চায় ব্রতী তাঁরা। এমনকী এস. এফ. যেখানে এই সেতুবন্ধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে সেখানে এস. এফ.-এর আশ্রয়েই এস. এফ.-কে সমালোচনা করতে দ্বিধাগ্রস্ত নন সাহিত্যিকরা।

বিদেশে সায়েন্স ফিকশন আজ সিরিয়াস অধ্যয়নের বিষয়। ওহিও-র উস্টার কলেজের 'Extrapolation' পত্রিকা ১৯৫৯ থেকে এস. এফ. বিষয়ক অ্যাকাডেমিক আলোচনায় ব্রতী। মননশীল পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরও দু-টি নাম 'Foundation' (নর্থ-ইস্ট লন্ডন পলিটেক্‌নিক) ও 'Science Fiction Studies' (ইন্ডিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটি)। কয়েক শো পাঠক্রম আছে সায়েন্স ফিকশন বিষয়ে ইয়োরোপ ও আমেরিকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'সাইকোলজি'র ছাত্রদের অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে এস. এফ. কাহিনির অভিনব সংকলন 'Introductory Psychology Through Science Fiction'। নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্স। যার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ক্ল্যারিওন রাইটার্স ওয়ার্কশপ, সায়েন্স ফিকশন রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন ও মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আন্তর্জাতিক সায়েন্স ফিকশন সিম্পোশিয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে রায়ো ডি জেনিরোয় (১৯৬৯), টোকিও-য় (১৯৭০) এবং সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সায়েন্স ফিকশন মহলের জন্য বুদাপেস্তে (১৯৭১)।

বাংলায় সায়েন্স ফিকশন নিয়ে সিরিয়াস কোনো গবেষণা হয়নি। বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় সায়েন্স ফিকশন আজও অচ্ছুৎ। 'অন্বেষা' নামে বিজ্ঞান পত্রিকার একটি কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৭-তে।[১৬] আর এ-বছর 'শব্দ-শাব্দিক' প্রকাশ করেছে কল্পসমাজ ও কল্পবিজ্ঞানের একটি বিশেষ সংখ্যা।[২০] ১৯৮৭-র 'দেশ' পত্রিকার একটি সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছে তিনটি কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি।[১৯] কিন্তু এ ফর্দ ব্যতিক্রমেরই।

এই অবস্থার জন্য বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। শিশু ও কিশোরদের জন্যই শুধু সায়েন্স ফিকশন লেখা হবে, এটাই এখনো অবধি রেওয়াজ। আর সেই সঙ্গে সায়েন্স ফিকশনের দু-টি বাংলা পবিভাষা 'বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পে'র সঙ্গে 'কল্পবিজ্ঞানের গল্প'র ঠাণ্ডা লড়াই জারি করেছেন কিছু স্পর্শকাতর পণ্ডিতমন্য ব্যক্তি। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কিছু সমালোচক মনে করেন কল্প বিজ্ঞানের গল্প কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট জাতের, সেখানে ফ্যান্টাসির দাপট বেশি এবং বিজ্ঞানের অপলাপের সুযোগ আছে। এর থেকে আরও একটি ভ্রান্ত অনুমানের হদিশ পাই আমরা, যা সায়েন্স ফিকশনের প্রকৃত তাৎপর্য ও সুপ্ত ক্ষমতা উপলব্ধি করতে না পেরে তাকে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজে নিযুক্ত করার পথনির্দেশ মনে করে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মনু দ্বাদশ', অথবা এই প্রবন্ধে আলোচিত সত্যজিৎ রায়ের রচনাগুলিকে আমরা 'কল্পবিজ্ঞানের গল্প' আখ্যা দিই বা

'বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প',— সায়েন্স ফিকশনের চর্চা এই আদর্শ অনুসরণ করেই সার্থক হতে পারে।

উল্লেখপঞ্জি

১. John Baxter. *Science Fiction in the Cinema*. 1970.

২. Evgeni Brandis. 'The Horizons of Science Fiction'. *Soviet Literature*, January. 1983.

৩. Vladimir Gaskov. 'A Test of Humanity'. Soviet Literature. January. 1983.

৪. Harry A. Katz. et al. *Introductory Psychology Through Science Fiction*. 2nd, ed.. 1977.

৫. P. S. Krishnamoorthy. *A Scholar's Guide to Modern American Science Fiction*, 1983.

৬. V. S. Muraviov. 'Invitation to the Strange Land' (in Russian). *Science Fiction . English & American Science Fiction*. Moscow. 1979.

৭. Patrick Parrinder. *Science Fiction : Its Criticism & Teaching*. 1980.

৮. Rabikin. E. S. & Scholes. R.. *SF : History, Science, Vision*. 1977.

৯. Satyajit Ray. 'Ordeals of the Alien' I & II. *The Statesman*. Oct. 4 & 5. 1980.

১০. Franz Rottensteiner. *The Science Fiction Book*. 1975.

১১. Marie Seton. *Satyajit Ray*, 1972 (Vikas).

১২. Philip Strick. *Science Fiction Movies*. 1976.

১৩. Richard E. Ziegfeld. *Stanislaw Lem*, 1985.

১৪ *The Statesman*, ৩০ জানুয়ারি, ১৯৮৬।

১৫. অদ্রীশ বর্ধন, 'বাংলায় কল্পবিজ্ঞান', যুগান্তর, ১১ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩।

১৬. অন্বেষা, বিশেষ কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৮৭।

১৭. আজকাল, ২৫ মে, ১৯৮৭।

১৮. আশ্চর্য (সম্পাদক : আকাশ সেন) ১৯৬৩-১৯৬৮।

১৯. দেশ, ২৮ নভেম্বর, ১৯৮৭।

২০. শব্দ-শাব্দিক, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৮৮।

২১. সত্যজিৎ রায়, 'কুবরিক ক্রুফো ও SF'. আশ্চর্য, অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৬৬।

২২. সত্যজিৎ রায়, 'শোকবার্তা' (দিলীপ রায়চৌধুরী), তদেব।

২৩. সত্যজিৎ রায়, 'এস. এফ.' ('নাউ' পত্রিকা থেকে অনুবাদ : অসীম বর্ধন), আশ্চর্য, জানুয়ারি, ১৯৮৭।

২৪. সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'বাংলা সায়েন্স ফিকশনের ঐতিহ্য', তৃতীয় নয়ন (১৮৮২ থেকে আধুনিক কাল অবধি বাংলা সায়েন্স ফিকশন গল্পের সংকলন), ১৯৮৬।

২৫. স্তানিসোয়াভ লেম, পৃথিবী কী করে বাঁচলো (অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), ১৯৭৯।

২৬ স্তানিসোয়াভ লেম, মুখোশ ও মৃগয়া (অনুবাদ : ওই), ১৯৮৫।

ও মূল্যবোধ নিরপেক্ষ প্রবল পরাক্রান্ত বিজ্ঞানের জগতের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জগতের একটি বিবেক-বন্ধন রচনাসূত্রেই এস. এফ. চর্চায় ব্রতী তাঁরা। এমনকী এস. এফ. যেখানে এই সেতুবন্ধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে সেখানে এস. এফ.-এর আশ্রয়েই এস. এফ.-কে সমালোচনা করতে দ্বিধাগ্রস্ত নন সাহিত্যিকরা।

বিদেশে সায়েন্স ফিকশন আজ সিরিয়াস অধ্যয়নের বিষয়। ওহিও-র উস্টার কলেজের 'Extrapolation' পত্রিকা ১৯৫৯ থেকে এস. এফ. বিষয়ক অ্যাকাডেমিক আলোচনায় ব্রতী। মননশীল পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরও দু-টি নাম 'Foundation' (নর্থ-ইস্ট লন্ডন পলিটেক্‌নিক) ও 'Science Fiction Studies' (ইন্ডিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটি)। কয়েক শো পাঠক্রম আছে সায়েন্স ফিকশন বিষয়ে ইয়োরোপ ও আমেরিকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'সাইকোলজি'র ছাত্রদের অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে এস. এফ. কাহিনির অভিনব সংকলন 'Introductory Psychology Through Science Fiction'। নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্স। যার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ক্ল্যারিওন রাইটার্স ওয়ার্কশপ, সায়েন্স ফিকশন রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন ও মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আন্তর্জাতিক সায়েন্স ফিকশন সিম্পোশিয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে রায়ো ডি জেনিরোয় (১৯৬৯), টোকিও-য় (১৯৭০) এবং সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সায়েন্স ফিকশন মহলের জন্য বুদাপেস্তে (১৯৭১)।

বাংলায় সায়েন্স ফিকশন নিয়ে সিরিয়াস কোনো গবেষণা হয়নি। বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় সায়েন্স ফিকশন আজও অচ্ছুৎ। 'অন্বেষা' নামে বিজ্ঞান পত্রিকার একটি কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৭-তে।[১৮] আর এ-বছর 'শব্দ-শাব্দিক' প্রকাশ করেছে কল্পসমাজ ও কল্পবিজ্ঞানের একটি বিশেষ সংখ্যা।[২০] ১৯৮৭-র 'দেশ' পত্রিকার একটি সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছে তিনটি কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি।[১৯] কিন্তু এ ফর্দ ব্যতিক্রমেরই।

এই অবস্থার জন্য বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। শিশু ও কিশোরদের জন্যই শুধু সায়েন্স ফিকশন লেখা হবে, এটাই এখনো অবধি রেওয়াজ। আর সেই সঙ্গে সায়েন্স ফিকশনের দু-টি বাংলা পরিভাষা 'বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পে'র সঙ্গে 'কল্পবিজ্ঞানের গল্প'র ঠাণ্ডা লড়াই জারি করেছেন কিছু স্পর্শকাতর পণ্ডিতমন্য ব্যক্তি। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কিছু সমালোচক মনে করেন কল্প বিজ্ঞানের গল্প কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট জাতের, সেখানে ফ্যান্টাসির দাপট বেশি এবং বিজ্ঞানের অপলাপের সুযোগ আছে। এর থেকে আরও একটি ভ্রান্ত অনুমানের হদিশ পাই আমরা, যা সায়েন্স ফিকশনের প্রকৃত তাৎপর্য ও সুপ্ত ক্ষমতা উপলব্ধি করতে না পেরে তাকে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজে নিযুক্ত করার পথনির্দেশ মনে করে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মনু দ্বাদশ', অথবা এই প্রবন্ধে আলোচিত সত্যজিৎ রায়ের রচনাগুলিকে আমরা 'কল্পবিজ্ঞানের গল্প' আখ্যা দিই বা

'বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প',— সায়েন্স ফিকশনের চর্চা এই আদর্শ অনুসরণ করেই সার্থক হতে পারে।

উল্লেখপঞ্জি

১. John Baxter. *Science Fiction in the Cinema.* 1970.
২. Evgeni Brandis. 'The Horizons of Science Fiction'. *Soviet Literature*, January. 1983.
৩. Vladimir Gaskov. 'A Test of Humanity'. Soviet Literature. January. 1983.
৪. Harry A. Katz. et al. *Introductory Psychology Through Science Fiction.* 2nd, ed.. 1977.
৫. P. S. Krishnamoorthy. *A Scholar's Guide to Modern American Science Fiction,* 1983.
৬. V. S. Muraviov. 'Invitation to the Strange Land' (in Russian), *Science Fiction : English & American Science Fiction.* Moscow. 1979.
৭. Patrick Parrinder. *Science Fiction : Its Criticism & Teaching.* 1980.
৮. Rabikin. E. S. & Scholes. R.. *SF : History, Science, Vision,* 1977.
৯ Satyajit Ray. 'Ordeals of the Alien' I & II. *The Statesman,* Oct. 4 & 5. 1980.
১০. Franz Rottensteiner. *The Science Fiction Book,* 1975.
১১. Marie Seton. *Satyajit Ray,* 1972 (Vikas).
১২. Philip Strick. *Science Fiction Movies.* 1976.
১৩. Richard E. Ziegfeld. *Stanislaw Lem,* 1985.
১৪ *The Statesman,* ৩০ জানুয়ারি, ১৯৮৬।
১৫. অদ্রীশ বর্ধন, 'বাংলায় কল্পবিজ্ঞান', যুগান্তর, ১১ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩।
১৬. অন্বেষা, বিশেষ কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৮৭।
১৭. আজকাল, ২৫ মে, ১৯৮৭।
১৮. আশ্চর্য (সম্পাদক : আকাশ সেন) ১৯৬৩-১৯৬৮।
১৯. দেশ, ২৮ নভেম্বর, ১৯৮৭।
২০. শব্দ-শাব্দিক, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৮৮।
২১. সত্যজিৎ রায়, 'কুবরিক ক্রফো ও SF'. আশ্চর্য, অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৬৬।
২২. সত্যজিৎ রায়, 'শোকবার্তা' (দিলীপ রায়চৌধুরী), তদেব।
২৩. সত্যজিৎ রায়, 'এস. এফ.' ('নাউ' পত্রিকা থেকে অনুবাদ : অসীম বর্ধন), আশ্চর্য, জানুয়ারি, ১৯৮৭।
২৪. সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'বাংলা সায়েন্স ফিকশনের ঐতিহ্য', তৃতীয় নয়ন (১৮৮২ থেকে আধুনিক কাল অবধি বাংলা সায়েন্স ফিকশন গল্পের সংকলন), ১৯৮৬।
২৫. স্তানিসোয়াভ লেম, পৃথিবী কী করে বাঁচলো (অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), ১৯৭৯।
২৬. স্তানিসোয়াভ লেম, মুখোশ ও মৃগয়া (অনুবাদ : ওই), ১৯৮৫।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'আশ্চর্য'-র কপি ও 'এস. এফ. সিনে ক্লাব' সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র দেখার সুযোগ পেয়েছি শ্রী অদ্রীশ বর্ধনের সৌজন্যে। অন্যান্য গ্রন্থ, পত্রিকা ইত্যাদি পাঠের সুযোগ ও এই বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও উৎসাহ লাভ করেছি শ্রী সন্দীপ রায়, শ্রী দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, শ্রী শংকর ঘটক, শ্রী নীহার ভট্টাচার্য ও শ্রী ধরণী ঘোষ-এর কাছে। গ্রন্থপঞ্জিভুক্ত মুরাভিওভ-এর মূল রুশ রচনাটির ইংরেজি সার-সংক্ষেপ করে দিয়েছেন সুমিতা ঘোষ।

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের মোহন জ্ঞান ও বঙ্গীয় নবজাগরণের স্বরূপ

সুকান্ত চৌধুরী

এই প্রবন্ধ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসকে নিয়ে নয়, এমনকী তাঁর কোনো বিশেষ রচনা বা কীর্তি সম্বন্ধেও নয়। আমার উদ্দেশ্য, তাঁর সবচেয়ে প্রখ্যাত কীর্তি বাঙ্গালা ভাষার অভিধান-এর শিরোনামপত্রটুকু অবলম্বন করে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কিছু তত্ত্বতালাশ।

শিরোনামপত্রে লেখকের পরিচিতি কৌতূহলের উদ্রেক করতে পারে :

> 'মেঘনাদবধকাব্য' এর টীকাকার, 'চরিত্রগঠন', 'ঋদ্ধি', 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী', 'ছাত্রপাঠ'— ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ভাগ, 'শিক্ষা ও সুনীতি', 'সাহিত্য-প্রবেশিকা', 'প্রাণীদের অন্তরের কথা', 'জন্তুদের বন্ধু নন্তবাবু ও শ্বেতপরির গল্প', 'বাঘ ভালুকের গল্প', 'ইব্রিয় ধর্ম', 'সৃষ্টতত্ত্বে পুরাণ ও বিজ্ঞান' প্রভৃতি প্রণেতা।[১]

এত বিষয়ে লিখেছেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন, এটাই কৌতূহলের একমাত্র কারণ নয়। ওই যুগে বহু মনীষীর রচনাবৈচিত্র্য সমান মাত্রায় বা আরও বেশি চাঞ্চল্যকর। বলার কথা এই যে, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান-এর মতো পাণ্ডিত্যপূর্ণ পথপ্রদর্শক গ্রন্থের প্রণেতা (বা নিদেনপক্ষে তাঁর প্রকাশক) এই পাঁচমিশেলি ফিরিস্তি দেবার প্রয়োজন বোধ করেছেন— যেন সবগুলিই সমানভাবে তাঁর মেধা ও যশের পরিচায়ক। পাঠ্যপুস্তকগুলির উল্লেখ ভাবার মতো, কিন্তু নন্তবাবু ও শ্বেতপরির উপস্থিতিই সবচেয়ে মনোগ্রাহী। প্রশ্ন জাগে, চার্লস লাট্‌উইজ ডজ্‌সন যে গুরুগম্ভীর অঙ্কশাস্ত্রের বই লিখেছিলেন, তাতে কি উল্লেখ ছিল যে তিনি Alice in Wonderland-এর রচয়িতা।

তুলনাটা অবশ্য জুতসই হল না। সময়ের দিক দিয়ে ডজ্‌সনের অপেক্ষাকৃত কাছে হলেও, জ্ঞানেন্দ্রমোহনের মানসিক ও মানবিক অবস্থানের খোঁজে আমাদের ফিরে যেতে হবে আরও তিন-চারশ বছর আগে। 'বাংলার নবজাগরণ'-এর জুড়ি মিলতে পারে ইউরোপের নবজাগরণে।

কিন্তু ফিরে যাবার কথা আবার তোলা কেন? এভাবে চোরাপথে কথার খেলায় দুই দেশের দুই স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক পর্যায় একাকার করে দেবার বিরুদ্ধে বহু সতর্কবার্তা কি আমরা শুনিনি? 'রেনেসাঁস' বা 'নবজাগরণ' গোছের শব্দ সাধারণভাবে যে কোনো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উত্থানের ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে পারে, হয়-ও। ইউরোপের আদত রেনেসাঁস (মোটামুটি ১৪ শতকের শেষ থেকে ১৭ শতকের শুরু পর্যন্ত) ছাড়া পাশ্চাত্যের ইতিহাসে আরও বেশ কয়েকটি যুগের ক্ষেত্রে 'রেনেসাঁস' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

আদত রেনেসাঁস থেকে পৃথক করার জন্য এরউইন পানোফ্স্কি এগুলিকে (ভিন্ন বানানে) Renascence আখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন।[২]

এভাবে কিছুটা লঘু প্রয়োগে যে কোনো সাংস্কৃতিক বিকাশের যুগকে 'রেনেসাঁস' অভিহিত করা যায়। ইউরোপের ধ্রুপদি ইতিহাসচর্চার ধারায় কিন্তু 'রেনেসাঁস' আখ্যাটির পেছনে সবসময়েই একটা বিশেষ ইঙ্গিত আছে। কোনো যুগকে তখনই ওই আখ্যা দেওয়া হয়, যখন কোনো-না-কোনো ভাবে প্রাচীন গ্রিক ও রোমক সভ্যতায় ফিরে যাওয়া বা তার উদ্রেক করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। ''রেনেসাঁস' নামাঙ্কিত যুগগুলির একটা সাধারণ লক্ষণ— বলা যায় সংজ্ঞাবাচক লক্ষণ— এই, যে সেগুলি সমান্তরালভাবে দুটি কালে বা মুহূর্তে বিচরণ করে।' বলা বাহুল্য, এই প্রক্রিয়া দ্বিবিধ, দ্বিমুখী হতে বাধ্য। এতে বর্তমান নির্মিত হয় অতীতের আদলে; আবার অতীত ধারা বা ঐতিহ্য নির্ণীত হয় বর্তমানের আদলে বা প্রভাবে। কোনো যুগই তো নিজেকে ধ্রুপদি বা ক্ল্যাসিকাল ভাবতে পারে না। শব্দটির মধ্যেই প্রাচীনত্বের একটা আমেজ আছে। পরবর্তী কোনো যুগই পূর্ববর্তী যুগকে ধ্রুপদি আখ্যা দেয়, সেই আখ্যার দ্বারা তার ধ্রুপদি চরিত্র ফুটিয়ে তোলে— যা হয়ত সেই যুগের নিজের মানুষের কাছে স্পষ্ট ছিল না।

ইতিহাসধর্মিতার এই বিশেষ ছকটা সবচেয়ে স্পষ্ট ও বিশদভাবে দেখা যায় পশ্চিম ইউরোপের প্রধান রেনেসাঁসে। তার প্রথম ও মুখ্য প্রকাশ দুটি প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ধারে: গ্রিক ও লাটিন। লাটিন ভাষা 'উদ্ধার' হল বলা এক অর্থে অসমীচীন, কারণ গোটা মধ্যযুগ ধরে লাটিন সর্বত্র চর্চা হত; কিন্তু ধ্রুপদি লাটিন, অর্থাৎ রোমক সাম্রাজ্যের উচ্চকোটির আনুষ্ঠানিক ও সাহিত্যিক ভাষা, সত্যিই হারিয়ে গিয়েছিল, এখন নতুন করে তার চর্চা হতে লাগল। আধুনিক ইউরোপের অনেকগুলি ভাষাই লাটিনপ্রসূত, এবং সে যুগে সেগুলির নতুন (এমনকী প্রথম) সাহিত্যিক বিকাশ দেখা দিল; সুতরাং পুরোনো ও নতুন, ধ্রুপদি ও আধুনিকের সম্পর্কটাও হয়ে উঠল জটিল ও বহুমুখী। যে ভাষাগুলি লাটিন থেকে উৎসারিত নয় (যেমন ইংরেজি বা জার্মান) সেগুলির উৎসভাষা নিয়েও অনুরূপ চর্চা শুরু হল; সেই সঙ্গে ওই ভাষাগুলি কীভাবে ও কতটা গ্রিক-লাটিনের আদর্শে সংগঠিত করা যায় তাও বিবেচিত হতে লাগল।

কোনো দুটি ঐতিহাসিক পরিস্থিতিই কখনো হুবহু এক হয় না। তবু ইউরোপীয় নবজাগরণের প্রাগুক্ত ভাষাগত অবস্থানের সঙ্গে ১৯ শতকের বঙ্গসংস্কৃতির মিল টানার একটা ঝোঁক দুই শতক ধরে চলে আসছে। সম্প্রতি শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়[৪] দুই যুগের অনুপুঙ্খ তুলনা করে বহু মিল পেয়েছেন যা আমার আলোচনাতেও উঠে আসবে। শক্তিসাধনের আলোচনা মূল্যবান, কিন্তু কিছুটা খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত, তাছাড়া ইতালীয় রেনেসাঁসের খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রায়ই বিভ্রান্তিকর। আরও সমন্বিতভাবে দুই যুগের ধারা, এমনকী সাধারণভাবে রেনেসাঁসের কোনো সংজ্ঞাবাচক চিত্র ফুটিয়ে তোলা আমার উদ্দেশ্য।

দুটি যুগের মিল যে কেবল পশ্চাদ্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে তাই নয়; ১৯ শতকেও লক্ষিত হয়েছিল, এমনকী আদর্শ হিসাবে রূপায়ণের চেষ্টা হয়েছিল। হয়তো ঔপনিবেশিক যুগে স্বজাতির সম্মানরক্ষার্থেই জাতীয় ইতিহাসে একটা 'রেনেসাঁস'-এর অবতারণা করার দরকার ছিল। সে চাহিদা মেটাতে চৈতন্যযুগের তুলনা টেনেছিলেন স্বয়ং বঙ্কিম।[৫] তবে ইংরেজ ও ইংরেজির প্রভাবে তুলনাটা অতীতের চেয়ে বর্তমানে এবং ইংল্যান্ড ও ইউরোপের নিরিখেই টানা স্বাভাবিক ছিল; তার উদাহরণ দেখা যায় আরও আগে থেকেই।

কিছু সাহেব যে এমন মিল খুঁজতে চাইবেন সেটা স্বাভাবিক। তাঁদের ব্যাখ্যা স্বভাবতই সরলীকৃত তবু তাৎপর্যপূর্ণ, এবং বঙ্গসমাজেও তা গৃহীত ও প্রসারিত হয়েছিল। ১৮৭২-এ বীম্‌স সাহেব ১৬ শতকের ইউরোপের আদলে বাংলার বিকাশের উদ্দেশ্যে একটি 'সাহিত্য সমাজ' বা আকাদেমির প্রস্তাব রচনা করেছিলেন। বঙ্কিম প্রস্তাবটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন ও তার অনুবাদ *বঙ্গদর্শন*-এ সম্পাদকীয় মর্যাদায় ছাপিয়েছিলেন।[৬] তার অনেক আগে ১৮৪৯-এ কৃষ্ণনগর কলেজে এক বক্তৃতায় বীটন (বেথুন) বলেন, 'the English language will become in Bengal what, long ago, Greek and Latin were to England' বীটনের বাচনভঙ্গি অপ্রীতিকর : এই শুভফল হবে 'if you [ইংরেজিনবিশ ছাত্রবৃন্দ] do your duty... the language of Bengal is now as rude and uncultivated as that of England was five hundred years ago.'[৭] কিন্তু এমন বক্তব্য সমকালীন অগ্রণী বাংলা লেখক ও ভাষাকারদের থেকে পৃথক নয়। ১৮৭১-এ Calcutta Review-এ একটি প্রবন্ধে (যা বঙ্কিমের রচনা বলে ভাবা হয়) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এমনকী বাঙালি জাতির আরও তীব্র নিন্দা করা হয়েছে, কিন্তু এও বলা হয়েছে :

> ... it was chiefly among the supple and pliant Italians that the revival of learning in Europe began; and it is possible to imagine that the Bengalis— the Italians of Asia, as the *Spectator* has called them— are now doing— great work by, so to speak, acclimatising European ideas...[৮]

১৯ শতকের বাংলায় গ্রিক-লাটিনের আধিপত্যের স্থান অবশ্যই বহুলাংশে নিল ইংরেজি—প্রাচীন ভাষা নয়, একটি বলশালী সমসাময়িক ভাষা; কিন্তু মূল কথা, সনাতন সাংস্কৃতিক গণ্ডির বাইরে থেকে একটা প্রবল ভাষাবাহিত প্রভাব সমাজের উপর উৎক্ষেপিত হল। এবং বহুলাংশে ইংরেজির মাধ্যমে, নবলব্ধ পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে, দেশের যথার্থ প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের দিকে তাকানো হল নতুন আলোয়।

এই প্রক্রিয়ার আরেকটি দিক আছে, যার কথা রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন।[৯] ১৯ শতকে সংস্কৃত 'আবিষ্কার'-এর ফলে ইউরোপীয়রা নিজেরদের ভাষার দিকেও নতুন করে তাকাল, পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ব একটা নতুন মাত্রা পেল। কিন্তু যে

ধারায় এই মাত্রা সংযোজিত হল, তা ১৫/১৬ শতক থেকে প্রবাহিত হিউমানিজ্‌মের ধারা। তার সবচেয়ে দর্শনীয় প্রকাশ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধার, প্রকাশ, পাঠশুদ্ধি, সম্পাদনা ও মুদ্রণে। এশিয়াটিক সোসাইটির সাহেব সদস্যেরা কাজটা শুরু করেন; ক্রমে পতাকা তুলে নেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ— যেমন আরও স্বকীয় ও বিস্ময়করভাবে নেন বিদ্যাসাগর, মেলবন্ধন করেন সনাতন সংস্কৃতচর্চার ঐতিহ্যের সঙ্গে নবলব্ধ ইউরোপীয় পাঠচর্চার।

১৮/১৯ শতকের ওরিয়েন্টালিজ্‌ম ইউরোপীয় হিউমানিজ্‌মের একটা বিশেষ প্রকাশ বা প্রসার। তার ক্রটিবিকৃতি নিয়ে আজ আমরা সঙ্গতভাবেই সন্দিগ্ধ, কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার এই ওরিয়েন্টালিস্ট প্রভাব ইউরোপ তথা ভারতের সামনে একদা উপস্থিত করেছিল প্রাচ্য ভাষা ও সভ্যতা সংক্রান্ত এক বৈপ্লবিক নতুন উপলব্ধি। তৎকালীন শিক্ষা-বিতর্কে ওরিয়েন্টালিস্ট শিবির প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার প্রসারেই ভারতে নবজাগরণ আসতে পারে এমন মত পোষণ করতেন। ডেভিড কপ্‌ফ প্রমুখ কোনো কোনো আধুনিক গবেষক তো মনে করেন সত্যিই এমনটা ঘটেছিল।[১০]

এই নতুন প্রভাবের ফলে অবশ্যই ১৯ শতকের বাংলায় এমন কিছু লক্ষণ দেখা যায়, তা ১৫ বা ১৬ শতকের ইউরোপে উপস্থিত ছিল না। আপাতত সাদৃশ্যে ফিরে যাই। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, নতুন প্রভাবের ফলে সংস্কৃতের সনাতন নৈকট্য ছাপিয়ে বাংলা ভাষা ও দেশজ সংস্কৃতি একটা পৃথক সত্তার সম্ভাবনা প্রথম খুঁজে পেল; এবং একদিকে সংস্কৃত অন্যদিকে ইংরেজি তথা ইউরোপীয়, এই দুই পৃথকের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে নিজত্বের উন্মেষ ঘটাল। এ যেন

আমার মুখ চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।[১১]

১৯ শতকের মাঝামাঝি এদেশে প্রাচ্যবিদ্যার একটা আধুনিক যুগোপযোগী সামগ্রিক নকশা বিদ্যাসাগর ছকে ফেলেছিলেন, বৃহত্তর সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে। তার পিছনে ছিল ইউরোপীয় হিউমানিজমের সাধারণ ধারা, ও সেই ধারার বিশেষ অভিব্যক্তি ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যার উত্তরাধিকার। আবার বলছি, বহু শতাব্দীব্যাপী এই প্রক্রিয়ার আদি-অন্তে সম্যক মিল খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক; কিন্তু চিন্তা ও কর্মসূচির একটা মৌলিক সংহতি অতি স্পষ্ট। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের যোগে মূল উপাদান তিনটি : এক, মধ্যযুগ থেকে প্রবাহিত খ্রিস্টান চিন্তা ও সমাজধারা; দুই, প্রাচীন গ্রিক-লাটিন (অর্থাৎ অখ্রিস্টান বা প্রাক্-খ্রিস্টান) যুগ থেকে বহুলাংশে নবলব্ধ চিন্তা ও জীবনদর্শন; তিন, পশ্চিম ইউরোপের আধুনিক ভাষাসমূহ ও অজস্র নতুন অর্থনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় প্রক্রিয়া ও অবস্থান। আমার এই দুই-তিনের ছকে নানা গুরুতর বিকৃতি ও সরলীকরণ লুকিয়ে আছে বলাই বাহুল্য; তবু ছকটার একটা কার্যকারিতা আছে।

১৯ শতকের বাংলায়, বিশেষত বিদ্যাসাগরের ক্রান্তিকারী চিন্তা ও কর্মসূচিতে, আমরা কী পাচ্ছি? এখানেও, প্রথমে, একটি সনাতন জীবনপ্রক্রিয়া ও তার বাহক ভাষা ও শাস্ত্র; দ্বিতীয়, একটি বিশাল ও সম্পূর্ণ নতুন বিজাতীয় চিন্তা ও জীবনদর্শনের সূত্র; তৃতীয়, সমসাময়িক বাঙালি সমাজ ও তার সঞ্চালক একটি নব্য ভাষা, যা প্রথম দুটি শক্তির লীলাভূমি কিন্তু স্বতন্ত্র, স্বকীয় ও আত্মচালিত। এই তিনটি উপাদান অবলম্বন করে সৃষ্ট হয়েছিল সেযুগের তিনটি প্রধান সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থান, যথাক্রমে orientalist, anglicist ও vernacularist। কীভাবে বিদ্যাসাগর দেখলেন এই তিনের সমন্বয়?

১৮৫২-য় Notes on the Sanscrit College-এ তিনি লিখেলেন :

1. The creation of an enlightened Bengali literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendence of Education in Bengal.
2. Such a Literature cannot be formed by the exertion of those who are not competent to collect the materials from European sources and to dress them in elegant expressive idiomatic Bengali.
3. An elegant expressive and idiomatic Bengali style cannot be at the command of those who are not good Sanscrit scholars. Hence the necessity of making Sanscrit scholars well-versed in the English language and literature...
4. It is very clear then that if the students of the Sanscrit College be made familiar with English Literature, they will prove the best and ablest contributors to an enlightened Bengali literature.[১২]

বলা বাহুল্য, literature বলতে বিদ্যাসাগর শুধু কবিতা-গল্প-নাটক ইত্যাদি রসসাহিত্য বোঝাচ্ছেন না। Literature এখানে ব্যাপক অর্থে letters ভাষার সবরকম আনুষ্ঠানিক প্রয়োগ ও রচনা। লাটিন litterae শব্দ, ও বিভিন্ন আধুনিক ভাষায় তার প্রতিশব্দ, রেনেসাঁসের রচনায় ক্রমাগত পাওয়া যায়। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুখ্যত সিসেরো থেকে লব্ধ oratoria-র এক ব্যাপক আদর্শ। Oratoria বা rhertoric এখানে কেবল বাগ্‌কৌশল নয়, যেকোনো রচনাসৃষ্টির কৌশল। পূর্ণাঙ্গ বিদ্বান ও নাগরিক গঠনের উপকরণ এই rhetoric চর্চার মধ্যে নিহিত বলে ভাবা হত। ভাষাচর্চা অতএব শুধু জ্ঞানচর্চা নয়, আদর্শ জীবনধারার চর্চা।

যুগের গোড়ার দিকেই শিক্ষাগুরু লেওনার্দো ব্রুনি সাহিত্য বলতে বোঝাচ্ছেন তিনটি প্রধান চর্চা : ইতিহাস, বাগ্মিতা ও কাব্য।[১৩] ক্রমে এর সঙ্গে যোগ হল দর্শন— সম্পূর্ণ হল litterae humaniores বা মানবিকীবিদ্যার সাবেক পরিধি। আর খ্রিস্টীয় হিউমানিজ্‌মে এই মানবিকচর্চায় লব্ধ বিদ্যা ও প্রয়োগকৌশল আরোপিত হল ধর্মবিদ্যা (theology বা divinity)-তে পর্যন্ত। এরাসমুস একাধিক জায়গায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছেন, ভাষায় সুপণ্ডিত না হলে কেউ ধর্মবিদ্যায়ও পণ্ডিত হতে পারে না— ধর্মশাস্ত্রগুলি সে ঠিক করে পড়বে কী করে?

যেমন ১৬ শতকের ইউরোপে এরাসমুস, তেমন ১৯ শতকের বাংলায় বিদ্যাসাগর তৎকালীন ভাষাভিত্তিক মানবিকবিদ্যার তত্ত্ব ও আদর্শের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটিয়েছিলেন তাঁদের মননে ও সামাজিক আবস্থানে। এবং সেই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন বলেই একদিকে যেমন তাঁরা নিজ-নিজ যুগে মুখ্য চিন্তানায়ক ও পথপ্রদর্শকের স্বীকৃতি পেয়েছেন, তেমনি তাঁদের মননের সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে গিয়েছে অস্বীকৃত, অনাদৃত। যুগচিন্তার হিমালয়শিখরে তাঁরা একা। সমতলভূমিতে ফিরে আসি। সেখানকার মানসিক জীবনে, উভয় দেশে ও যুগে, কয়েকটি লক্ষণ বিশেষভাবে চোখে পড়ে। তার প্রথম ও উজ্জ্বলতম অবশ্যই ছাপাখানার উদ্ভাবন। ভাষা নিয়ে এত চর্চা ও চিন্তা, সাহিত্যের মাধ্যমে সার্বিক মানবিক বিকাশের কর্মসূচি, উভয় যুগেই বিশেষভাবে প্রত্যয়িত হতে পেরেছে এই কারণে যে ভাষায়িত মননের স্থায়িত্ব ও বহুল প্রচারের মাধ্যম মুদ্রণযন্ত্র সে যুগে সে সমাজে উদিত হয়েছিল। মুদ্রণযন্ত্রের সঙ্গে ইউরোপীয় হিউমানিস্টদের যোগ কত নিবিড় ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁদের একটা উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী ছিলেন একাধারে সম্পাদক, টীকাকার, মুদ্রাকর— এমনকী হরফ-নির্মাতা— ও পুস্তকবিক্রেতা। 'বই' বলতে আমরা যে বস্তু বা সামগ্রী বুঝি, অন্যান্য নানা বিস্মৃত ও অসৃষ্ট বিকল্পের মধ্যে তার গঠন, বিন্যাস ও সামগ্রিক রূপ বিশ্বকে উপহার দেবার পিছনে এই গোষ্ঠীর বৃহত্তম অবদান।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও পরে অক্ষয়কুমার দত্তের সহযোগিতায় বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত প্রেস ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি স্থাপন করেন, চাকরি ছাড়ার পর মুদ্রণ ও পুস্তকব্যবসাই প্রধান জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন, টাইপ সাজাবার 'বিদ্যাসাগর সাট'-এর উদ্ভাবন করেন, বা নতুন ধাঁচের হরফের খোঁজে শ্রীরামপুর ছোটেন, তখন এই ধারাই তিনি স্বদেশে মাতৃভাষায় প্রবর্তন করেন। একক না হলেও সমবেত প্রচেষ্টায় ছাপাখানার মাধ্যমে বিদ্যাপ্রচারে তার আগেই ব্রতী হয়েছিলেন ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটির উদ্যোক্তারা। রামমোহন এককভাবেও ছাপাখানা স্থাপন করেছিলেন, যেমন পরে করেছিলেন বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানগুলির মূল উপজীব্য বিদ্যাগ্রন্থ বা পাঠ্যপুস্তক ছিল না। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ— সকলেই 'ছাপাখানার সঙ্গে জীবনের কোনো এক সময়ে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত ছিলেন।'[১৪]

মুদ্রণপ্রণালীর গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত জ্ঞানেন্দ্রমোহনের উভয় সংস্করণের ভূমিকায়। ব্যবহারের সুবিধার জন্য প্রথম সংস্করণের তুলনায় দ্বিতীয়টি 'অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনে' দুই খণ্ডে ছাপা হয়। লেখকের মন্তব্য, এটা সম্ভব হয়েছে 'বর্ণ, শব্দ ও পঙ্ক্তি-বিন্যাসের অভিনব পন্থা উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিয়া' : 'প্রচলিত বাঙ্গালা অভিধানের সাধারণ মুদ্রণ-প্রণালীতে' লাগত চার-পাঁচ খণ্ড (পৃ. ১)। প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতেও লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বইটির 'আকার (size) এবং টাইপ'-এর প্রতি (পৃ. ৪৬)। অভিধানটির সম্পূর্ণ পরিকল্পনায় তার ছাপা-বাঁধাই ছিল একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ— যেমন থাকে সব বৈজ্ঞানিক অভিধান-প্রণয়নের কাজে।

ভাষার এই সর্বব্যাপী বোধ প্রতিষ্ঠিত করতে বিদ্বদ্‌সমাজের আরেকটি বিশেষ কর্তব্যের কথা জ্ঞানেন্দ্রমোহন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন :

> কত বাঙ্গালা গ্রন্থরাশির পাণ্ডুলিপি যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক স্বনামপ্রসিদ্ধ ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাহার আভাসও দিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র দেশময় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রাচীনতম ও প্রাচীনতর বাঙ্গালী হস্তলিখিত পুঁথি যাহা অশিক্ষিত দরিদ্র পল্লীগৃহে আত্মগোপন করিয়া আজিও ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইয়া আছে, এখন তাহার সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিস্তৃত অনুসন্ধান করিবার একান্ত প্রয়োজন বোধ হইতেছে। (২য় সংস্করণের ভূমিকা, পৃ. ১১)

বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় রেনেসাঁসে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ছিল হিউমানিস্ট বিদ্যাপ্রকল্পের একটা প্রধান অঙ্গ। কিছু প্রখ্যাত হিউমানিস্ট এটাই তাঁদের প্রধান কাজ বলে বেছে নিয়েছিলেন বহু মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ এভাবে ওই যুগে উদ্ধার হয়েছে। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রাজেন্দ্রলাল-হরপ্রসাদ ও তাঁদের সমসাময়িক পণ্ডিতকুল প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার ও সম্পাদনা করেছেন অনুরূপভাবে। এই কাজটি অবশ্যই বাংলা পুঁথি সংগ্রহ বা মৌখিক লোকসাহিত্য সংগ্রহের থেকে আলাদা। প্রথমটিতে হিউমানিস্টদের আদলে প্রাচীন ভাষার রচনা উদ্ধার হচ্ছে বোদ্ধা পাঠককুলের জন্য, হয়তো কখনো সমাজে একটা বৃহত্তর প্রতিক্রিয়ার আশায়। আর বাংলা পুঁথি ও লোকসাহিত্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য জীবন্ত ভাষার গণপর্যায়ের নিদর্শন সংগ্রহ।

এক্ষেত্রেও কিন্তু ইউরোপীয় হিউমানিজ্‌মের স্বদেশমুখী ধারায় অনুরূপ একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। গ্রিক-লাটিন-হিব্রু পাঠের নতুন পদ্ধতির আদলে এই যুগেই গড়ে উঠল আঞ্চলিক ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতিচর্চার ধারা, যার নিবিড় চর্চা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির একটা বিশেষ প্রশংসনীয় অঙ্গ। এই পুরাতত্ত্বচর্চা (antiquarianism) ও আঞ্চলিক ইতিহাস (local history)-র চর্চা আমাদের সমাজে এখনও বিক্ষিপ্ত ও উপেক্ষিত। রাজেন্দ্রলালের গবেষণা থেকে রবীন্দ্রনাথের ছড়াসংগ্রহ পর্যন্ত বঙ্গীয় নবজাগরণের নায়কেরা কিন্তু নানাভাবে এই কাজে নিজেদের সামিল করেছেন ও দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন এমন উপাদানের একটি চিত্তাকর্ষক তালিকা দিয়েছেন : 'প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গালা গ্রন্থ-পত্রাদি, প্রবাদ, দলীল, নথিপত্র, গীত, পদাবলী, গ্রাম্যছড়া, গাথা ও দোহাদি...প্রচলন-বাহুল্যে-বঙ্গীভূত বৈদেশিক শব্দাদি...' (২য় সংস্করণের ভূমিকা, পৃ. ২)।

এই সংগ্রহ ও সম্পাদনার মৌলিক ঝোঁকটা উপলব্ধি করার মতো। সেটা হল, প্রয়োগে অবধারিতভাবে এলিটকেন্দ্রিক হলেও সারমর্মে সার্বজনিক, প্রাচীন ঐতিহ্যের সূত্রে গ্রন্থিত হলেও সমসাময়িক ভাষা ও জনজীবনের একটা সার্বিক আখ্যান (narrative) ফুটিয়ে তোলা— যার একটি পর্যায় থেকে আরেকটিতে যুক্তি ও তথ্যের পরম্পরায় অগ্রসর হওয়া যায়, যে কোনো অংশ অনুধাবন করা যায়। একটি সংহত বাচন ও

বাগ্‌ধারার অন্যতম প্রকাশ হিসাবে। একটি জাতির সম্পূর্ণ জীবন ও মনন এমন মাধ্যমে রূপায়িত হতে লাগল যা বলতে গেলে 'পড়া' যায়।

আজকের দিনে আমরা বলি না যে পাঠ (text) বা আখ্যান (narrative)-এর একমাত্র মাধ্যম হবে ভাষা। অন্য কোনো প্রকাশমাধ্যম, এমনকী আচার, কীর্তি, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস— যেকোনো অর্থসূচক চিহ্নপ্রণালী (sign system)-এর প্রয়োগকে পাঠ বলতে আমরা অভ্যস্ত। এই ব্যাপক বহুমাধ্যম পাঠের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে কোনো যুগ, জাতি, গোষ্ঠী প্রভৃতির সার্বিক বয়ান (discourse)। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটার সংজ্ঞাবাচক শব্দগুলি সবই বিশেষভাবে ভাষাসূচক— পাঠ, আখ্যান, বয়ান ইত্যাদি। এর মূলে আছে রেনেসাঁসের ক্রান্তিকারী অবদান। প্রাচীন গ্রিস-রোমে, বা আরও বেশি মাত্রায় ইউরোপের মধ্যযুগে, যতই পুঁথিপাটির প্রচলন ও সুদীর্ঘ রচনার চর্চা হোক না কেন, তাত্ত্বিক বা আদর্শগতভাবে ভাষার এই মৌলিক ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হয় রেনেসাঁসে। মধ্যযুগের ইউরোপে খ্রিস্টীয় তত্ত্বের অঙ্গ হিসাবে 'শব্দ' বা 'উচ্চারণ' (logos)-এর তাৎপর্য মিস্টিক, বা এক অর্থে রূপকধর্মী : সাধারণ ভাষাপ্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ নয়, বরং সাধারণ ভাষাকে সংসারের অতীত স্তরে নিয়ে গিয়ে তার সহজাত ধর্ম ও যুক্তির রূপান্তর ঘটাচ্ছে। তুলনায় রেনেসাঁসে অন্য সব প্রকাশপদ্ধতির অন্তিম ব্যাখ্যা ও সার্থকতা খোঁজা হচ্ছে ভাষার মাধ্যমে, ভাষার পরিমণ্ডলে; এবং সে ভাষা ঈশ্বরদত্ত দৈবিক ভাষা (revelation) নয়, মনুষ্যসৃষ্ট জাগতিক প্রক্রিয়া। পরিপূর্ণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক আখ্যান রচনায় ভাষার এই একচ্ছত্র প্রাধান্য ইউরোপীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা নতুন সংযোজন। মনন ও সংস্কৃতির ভাষায়িত 'পাঠ্য' রূপ (textualisation of culture)-এর এই ধারণাটাই ইউরোপীয় রেনেসাঁসের দান। ভাষার প্রক্রিয়াটাকে করে তোলা হচ্ছে সমস্ত জীবনবোধ ও জীবনধারণের মৌলিক প্রক্রিয়া।

The Renaissance Computer নামক কৌতূহলোদ্দীপক বইটির ভূমিকায় নীল রোড্‌স ও জনাথান সডে উদ্ধৃত করছেন স্পেনসরের *The Faerie Queene*-এর House of Alma উপাখ্যানটি। Alma হচ্ছে মানুষের আত্মা, এখানে বিশেষভাবে মানুষের মন। সেই মন ও তার মননক্রিয়া এখানে স্পেনসর কল্পনা করছেন আদ্যিকালের এক গ্রন্থাগার হিসাবে, যার ছাদ থেকেও ঝুলছে লম্বা লম্বা পুঁথির দিস্তা। দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন Anamnestes 'অবিস্মৃতি', ও Eumnestes, 'শুভস্মৃতি'। রোড্‌স ও সডে মন্তব্য করছেন : 'This motheaten libray, in which the two librarians toil ceaselessly, is an image of the human mind, endlessly turning over fragments of experience, imagined as gatherings of books and manuscripts.'[১৫] উপমায় আরেকটি মাত্রাও আছে : দুই গ্রন্থাগারিকের নাম থেকেই স্পষ্ট, অতীতের উপাদান উদ্ধার এই মনন ও জ্ঞানাহরণের কত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

এমন উপমা কবির একক কল্পনার ফসল নয়, যুগের সৃষ্টি। এর পেছনে আছে জটিল তাত্ত্বিক বা দার্শনিক অবস্থান। রেনেসাঁসের আরেকটি উদ্ভাবন, এ যুগেই ইউরোপের

মানুষ প্রথম ভাষা বা শব্দকে ভাবতে শিখল, বস্তু বা বহির্জগতের অঙ্গাঙ্গী উপসর্গ হিসাবে নয়, বহির্বস্তুকে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করার জন্য এক মনোনিঃসৃত প্রণালী হিসাবে : অর্থাৎ ভাষার সঙ্গে বহির্বস্তুর কোনো ধ্রুব প্রকৃতিলব্ধ যোগ নেই, মানুষই বহির্বস্তুকে বোঝাবার জন্য নিজের মন থেকে ভাষা সৃষ্টি করে।

ওই যুগে এই বোধ প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে ১৫ শতকের হিউমানিস্ট লোরেঞ্জো ভাল্লার একটা বড়ো অবদান ছিল। অবদানটা ঠিক কী, তা নিয়ে অনেক পণ্ডিতি তর্ক আছে; কিন্তু নিঃসন্দেহে ভাষার সঙ্গে বহির্জগৎ ও ভাবজগতের আপেক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে তিনি ভেবেছিলেন ও যুগটাকে ভাবতে শিখিয়েছিলেন। আদম নন্দনকাননে সব জীব ও বস্তুর নামকরণ করেন। অনুরূপভাবে ভাষার মাধ্যমে নামকরণই অর্থ (meaning) সৃষ্টির একমাত্র উপায় : এই উপায়েই আমরা কিছু জানি, বুঝি, জগতের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপন করি।[১৬] ভাল্লার একশ বছর পরে সরল করে এই কথাগুলি বলেছেন ইংরেজ বৈয়াকরণ রিচার্ড মালক্যাস্টর, যেমন বলেছেন আরও অনেকে :

> For even God himself, who brought the creatures which he had made unto that first man, whom he had also made, that he might name them according to their properties, doth plainly declare by his so doing, what a cunning thing it is to give right names, and how the necessary it is to know their forces, which be already given, because the word being known which implieth the property, the thing itself is half known whose property is implied.[১৭] [cunning শব্দের আদি অর্থ জ্ঞানী বা জ্ঞানসম্পর্কীয়]। আরও দুই দশক বাদে উইলিয়ম ক্যামডেন লিখছেন : '...it is a greater glory now to be a Linguist than a Realist.'[১৮] অর্থাৎ আজকাল ভাষার নিহিত বাস্তবায়িত সত্যতার চেয়ে তার স্বকীয় স্বনিঃসৃত সত্তাতে বিশ্বাস করাটাই রেওয়াজ।

উত্তর-আধুনিক যুগে এই সব প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে একটা চিন্তা হিসাবে রাখতে হয়। সেটা হল দেরিদার 'লেখন' (writing)-এর তত্ত্ব, ও সেই প্রসঙ্গে ইউরোপের সাংস্কৃতিক ধারা সম্বন্ধে তাঁর কিছু উক্তি। দেরিদার আপশোস, 'কথন' (speech)-কেই বরাবর ভাষার মৌলিক প্রক্রিয়া বলে ধরা হয়, 'লেখন' হয়ে পড়ে তার বাহ্যিক অনুষঙ্গ মাত্র। এই প্রক্রিয়াটা এক প্রেক্ষিতে তিনি দেখেছেন তিন সহস্রাব্দ ধরে সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশকালে; কিন্তু বেশি প্রকটভাবে বই বা পুস্তকের বিবর্তনে (বলা যেতে পারে, 'পুস্তক'-এর বস্তুময় বোধ বা ধারণার বিবর্তনে), অতএব অবধারিতভাবেই মুদ্রিত গ্রন্থের যুগে। এখন অবশেষে 'পুস্তকসভ্যতার মৃত্যু' আসন্ন হওয়ায় 'কথন'-এর এই আধিপত্য শেষ হতে চলেছে— শেষ হচ্ছে শব্দকেন্দ্রিকতা (logocentrism)-এর যুগ, যখন উচ্চারিত শব্দই ভাষার মূল প্রেরণা বলে স্বীকৃত হয়েছে। অতএব এতদিনে উচ্চারণের আগে যে লেখন— যা কোনো বাহ্যিক বস্তুভিত্তিক ক্রিয়া নয়, একটা মানসিক অস্তিত্ব বা উপলব্ধি— তার আদি অবস্থান স্বীকার করার সুযোগ এসেছে।[১৯]

দেরিদার সূক্ষ্ম ও দুরূহ চিন্তা সম্যক বোঝা দুষ্কর; তবে বলতে ইচ্ছা হয়, রেনেসাঁসে যে ক্রান্তিকারী ভাষায়িত সভ্যতার সৃষ্টি হল, তার মূলে কি এই 'লেখন'-এর অনুরূপ কোনো উপলব্ধি কাজ করছিল না? এটা কেবল উপর-উপর বিচারে, ছাপা বই আর পঠিত গ্রন্থের নিরিখে বলছি না— তাহলে তো মধ্যযুগের পুঁথিপাঠ সম্বন্ধেও বলা যেত। কিন্তু মধ্যযুগে ভাষার সঙ্গে বাস্তবের, শব্দের সঙ্গে নির্দিষ্ট বস্তুর, চিহ্নের সঙ্গে চিহ্নিতের একটা প্রকৃতিদত্ত অঙ্গাঙ্গি যোগ ধরে নেওয়া হত। রেনেসাঁসে উপস্থাপিত হল ভাষার একটা স্বনিবদ্ধ স্বপ্রণোদিত অস্তিত্ব— নীট্‌শের ভাষায় যাকে দেরিদা বলছেন originary। দেরিদা প্রস্তাব করছেন এক আদিলেখন (arche-writing)-এর, যার মধ্যে নিহিত আছে অর্থের আদি অবিশেষিত তাৎপর্য বা উপলব্ধির ভাণ্ডার। সেই ভাণ্ডারের বিশেষ-বিশেষ সম্ভাবনা প্রকাশ পাচ্ছে এক-একটি ভাষায় এক-একটি শব্দ বা কথন ও তার মামুলি লিপিবদ্ধ রূপে— সেই মূল তাৎপর্যপুঞ্জ থেকে অশেষ পৃথকীকরণ (differance)-এর প্রক্রিয়ায়, অতএব তাৎপর্যের একটা অনির্দিষ্ট অপ্রকাশিত আভাস (trace)-এর দ্বারা তাৎপর্যের দুর্জ্ঞেয় সম্পূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিতমাত্রের মাধ্যমে।[২০]

এত সূক্ষ্মভাবে এই চিত্রটি রেনেসাঁসে কেউ তুলে ধরেনি সত্য; আগে কে কবেই বা করেছেন? কিন্তু এমন একটা বোধ ওই যুগে প্রথম প্রবর্তিত হয়ে যুগচেতনার অঙ্গ হয়ে ওঠে, যে এক অশেষ অর্থপুঞ্জ বিভিন্ন ভাষায় নিজ নিজ পদ্ধতিতে ফুটে উঠছে; ফলে প্রত্যেকটি ভাষা নির্দেশ করছে এক মৌলিক মানসিক ভাষায়িত চেতনাকে। অথচ প্রত্যেকটির প্রকাশ কেবল স্বকীয় নয়, দ্বিধাব্যাপৃত ও নিত্যপরিবর্তনশীল।

হয়তো আমরা আরেকটু এগোতে পারি। এই লেখনচেতনাকে দেরিদা যুক্ত করেছেন সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতা আয়ত্তের, ক্ষমতা ভোগের অবিচ্ছেদ্য বাহক হিসাবে। তিনি প্রস্তাবনা করছেন এক বহুমাত্রিক, সুদূরপ্রসারী তথ্য (fact)-এর, যার উপাদান হল নিম্নরূপ :

> লেখ্য চিহ্ন আয়ত্ত হলেই সুনিশ্চিত হয় সেই পুণ্য ক্ষমতা, যাতে কোনো আভাস (trace)-এর গণ্ডির মধ্যেই অস্তিত্ব চালু রাখা যায় ও বিশ্বের সার্বিক গঠন উপলব্ধি করা যায়। সব ধর্মীয় পরিচালকগোষ্ঠী— তাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক— গঠিত হয়েছিল লেখন-প্রতিষ্ঠার সমকালে ও লেখনশক্তির সঞ্চারণে। সমরনীতি ক্ষেপণাস্ত্রবিজ্ঞান, কূটনীতি, কৃষি, রাজস্বনীতি ও দণ্ডনীতি— এ সবই গঠনে ও বিবর্তনে লেখন-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত। বহু অতি-ভিন্ন সমাজেও আখ্যান-পরম্পরা ও পৌরাণিক আখ্যানকণায় লেখনের উৎপত্তি অনেকটা একইভাবে বর্ণিত হয়েছে, এবং তার জটিল অথচ নিয়ন্ত্রিত সংযোগ থেকেছে একদিকে শাসনক্ষমতার বিস্তার, অপরদিকে পরিবারতন্ত্র গঠনের সঙ্গে। পুঁজিগঠনের সম্পাদ্যতা এবং রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সর্বদাই প্রবাহিত হয়েছে লিপিকারদের হাত দিয়ে। বৈসাদৃশ্য, অসম বিকাশ,

> স্থায়িত্ব-বিলম্ব-সম্প্রচারের বিচিত্র আন্তঃক্রিয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন আদর্শগত, ধর্মগত ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিগত প্রণালীর মধ্যে সাযুজ্য রয়ে গেছে অটুট— যেমন অটুটভাবে রয়ে গেছে বিভিন্ন লেখন-প্রণালীর সঙ্গে, কেবল 'সংযোগের মাধ্যম' বা 'অর্থের বাহন' হিসাবে তাদের ভূমিকা অতিক্রম করে। এমনকী ক্ষমতা ও কার্যাকারিতার মৌলিক বোধটা— যা একমাত্র প্রতীকি উপায়ে, একটা আদর্শায়িত অর্থজ্ঞাপন ও প্রভুত্ববোধ হিসাবেই উন্মেষিত হতে পারে— সর্বদাই লেখন-সঞ্চারণের সঙ্গে যুক্ত। অর্থনীতি (মুদ্রার আবির্ভাবের পূর্বেকার বা পরেকার) আর লেখ্য হিসাবপ্রণালীর উদ্ভাবন ঘটেছে একই সঙ্গে। আভাসের সম্ভাবনা অস্বীকার করে কোনো ন্যায়বিধান প্রণীত হতে পারে না।

অতএব সিদ্ধান্ত : 'এই সব লক্ষণই নির্দেশ করছে একটি সার্বিক ও মৌলিক সম্ভাবনা, যা কোনো নির্দিষ্ট বিজ্ঞান বা বিমূর্ত জ্ঞানপ্রণালী নিজবলে ধারণা করতে পারে না।'[২২]

দেরিদার উপস্থাপিত সব 'fact' সত্যিই তথ্যভিত্তিক কিনা সে প্রশ্নে যাচ্ছি না; কিন্তু 'লেখন'-এর যে সার্বভৌমিতার কথা তিনি বলছেন, তা নিঃসন্দেহে নিরঙ্কুশ হল রেনেসাঁসে। একদিকে এক বিরাট প্রাচীন রচনাভাণ্ডার পুনরুদ্ধারের ফলে, অপরদিকে ছাপাখানার আবির্ভাবে প্রাচীন-নব্য সব পাঠ্যবস্তুর বিস্ফোরক প্রচারের ফলে, ভাষা, পাঠ বা লেখনের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক হয়ে উঠল নিবিড়। লুথারের ধর্মবিপ্লব সম্ভব হয়েছিল ছাপাখানার সহায়তায় : তাঁর ধর্মবিপ্লবের পথ ধরেই ক্ষুদ্র শহর উইটেনবের্গ হয়ে উঠল বিরাট মুদ্রণকেন্দ্র। এরাসমুসের মহাদেশজোড়া খ্যাতির রাজনৈতিক মাত্রা কোনো পণ্ডিতের পক্ষে বিশ্বে অভূতপূর্ব।

সৃষ্টিকারী ঈশ্বরীয় উচ্চারণ (logos) বা দৈবনিসৃত কোনো বিশেষ পাঠ (revelation) নয়, মানুষের ভাষার সার্বিক লিপ্যয়িত প্রকাশের উপর এমন ঐতিহাসিক মূল্য আগে কোনো যুগ আরোপ করেনি। এর জেরে বাইবেলের দেবভাষাকেও মানবভাষার পর্যায়ে নিয়ে এসে তার পাঠভিত্তিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ শুরু হল, যেমন হল চিরপ্রচলিত লাটিন অনুবাদ ছেড়ে মূল হিব্রু ও গ্রিক পাঠের উৎসসন্ধান। অপরদিকে সর্বসাধারণের আয়ত্তে আনার জন্য বিভিন্ন আধুনিক ভাষায় বাইবেল অনুবাদের প্রচলন বহুগুণ বাড়ল ও সুদৃঢ় হল। (যদিও এ ব্যাপারে মধ্যযুগ ও রেনেসাঁস, বা ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট শিবিরের মধ্যে একটা অবাস্তব বৈপরীত্য টেনে অনেক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হয়)। ১৯ শতকের বাংলায়ও আমরা দেখছি রামমোহন থেকে শুরু করে একদিকে শাস্ত্রের নতুন বিশ্লেষণ, আরেকদিকে তার পাঠশুদ্ধি ও সম্পাদনা, আরও একদিকে তার অনুবাদ ও সবল সার্বজনিক প্রচার। অর্থাৎ ধর্মচর্চারও নতুন ভিত্তিস্থাপন হচ্ছে পাঠ, ভাষা ও ভাষান্তরের উপর।

আমরা যারা এই প্রবন্ধ পড়ছি, সকলেই নিবিড়ভাবে এই ভাষায়িত চেতনা ও

সভ্যতার বাহক। বঙ্গভূমিতে আমাদের হাতে এই সভ্যতার চাবিকাঠি অবশ্যই তুলে দিয়েছে উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণ। এ বিষয়ে ইউরোপের ওই নামধারী যুগের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গি সাদৃশ্য। এই মননক্রিয়া আমাদের পক্ষে এতই স্বাভাবিক যে আমরা খেয়াল করি না, বিশ্বসংস্কৃতির ইতিহাসে এর মেয়াদ পাঁচশ বছরের বেশি নয়। খেয়াল না-করাটা আরও আশ্চর্য কারণ এটা খেয়াল না করে উপায় নেই, আজ আরেক যুগসন্ধিক্ষণে সভ্যতার এই ভাষায়িত রূপ আমূলভাবে পরিবর্তিত এমনকী উৎপাটিত হচ্ছে। তার মূলে অবশ্যই আছে কমপিউটার, কিন্তু সমমাত্রায় আছে অন্যান্য বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যম এবং দৃশ্য ও শ্রুত উপকরণ স্থায়ীভাবে ধরে রাখার আধুনিক প্রযুক্তির সম্ভার। ভাষা মানুষের সবিশেষ লক্ষণ ও উত্তরাধিকার— ভাষার ব্যবহারই মানুষকে মানুষ করে; কিন্তু সার্বিক ও মৌলিকভাবে ভাষায়িত মানবজীবন মোটেই অবশ্যম্ভাবী নয়, ইতিহাসের একটা পর্যায়মাত্র। দেখা যাচ্ছে, কোনো জাতির ইতিহাসে এই পর্যায়ের সূচনাকালকে 'নবজাগরণ' বলার একটা প্রবণতা আছে। কেবল এই ধরনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে বিশেষ করে এই নাম দেওয়া হবে কেন সেটা নিশ্চয় একটা প্রশ্ন; কিন্তু সেজন্য বিপ্লবটা অস্বীকার করা যায় না।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, ওঠেও। অমলেশ ত্রিপাঠী বিশেষভাবে প্রসঙ্গটি তুলেছেন।[২২] ইউরোপীয় রেনেসাঁসে শিল্পকলার একটা বড়ো ভূমিকা ছিল; ১৯ শতকের বাংলায় অনুরূপ কিছু দেখা যায় না। এও ঠিক, ছাপাখানার প্রবর্তনে শুধু ভাষা নয়, ছবি, রেখাচিত্র, নকশা ইত্যাদি দৃশ্য উপকরণের প্রচারপথও খুলে যায়। স্বীকার করতেই হবে, মুদ্রণের মাধ্যমে এই বিস্তারের তাত্ত্বিক সম্ভাবনাগুলি ইউরোপে যতটা রূপায়িত হয়েছিল, ১৯ শতকের বাংলায় হয়নি। আবার বলি, মিলের সন্ধানে আমরা যেন ষোলো আনা আনুষঙ্গিক সাদৃশ্য দাবি না করি। উপরন্তু এক্ষেত্রে ইউরোপীয় রেনেসাঁসে শিল্পকলার যথার্থ ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

এক কথা বলা যায়, ওই যুগে শিল্পের একমাত্র না হলেও একটা বড়ো ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় তত্ত্বের, এমনকী তথ্যের মাধ্যম হিসাবে কাজ করা। উপরে 'পাঠ' সম্বন্ধে যা বলেছিলাম আবার পাঠককে তা স্মরণ করিয়ে দিই। যেকোনো যুগের শিল্পধারাই সেই যুগ বা সমাজের একটা সাংস্কৃতিক পাঠ (text) বলে ধরা যায়; কিন্তু সে পাঠের প্রকাশ মনন বা যুক্তিচালিত নয়, ইন্দ্রিয় ও অনুভূতিচালিত; কথা ও যুক্তির গণ্ডির বাইরে, মূর্ত, আঙ্গিকলব্ধ, ইঙ্গিত-অনুভূতি-রূপ-দৃশ্যের নিবিড় অব্যক্ত উপলব্ধিনির্ভর। চিত্রের মাধ্যমে অবশ্যই গল্প বলা যেতে পারে, নানা প্রতীকী তাৎপর্যের অবতারণা করে চিন্তা-তত্ত্ব-মনন দৃশ্যমাধ্যমে অঙ্গীভূত হতে পারে। ইউরোপীয় মধ্যযুগের চিত্রকলায় এই প্রক্রিয়াগুলি যথেষ্ট দেখা যায়; কিন্তু তা কাজ করছে অপেক্ষাকৃত সহজগ্রাহ্য স্তরে, গূঢ় মৌলিক তত্ত্বগুলি থেকে অনেক দূরে এসে অনেক সরল পর্যায়ে। রেনেসাঁসে এই দৃশ্যে-রূপায়িত সংকেতপদ্ধতি একদিকে যেমন অনেক জটিল ও নিবিড় হল, অন্যদিকে তা নিয়ে আসা

হল গতানুগতিক ভাষা ও ভাষাচালিত বিজ্ঞান-দর্শনের প্রক্রিয়ার কাছাকাছি। ভাষার মাধ্যমে কোনো জটিল অনুভূতিকে ব্যাকরণের কাঠামোয় ফেলে, সেই কাঠামোয় নিহিত যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতিতে একটা নির্দিষ্ট ব্যাখ্যায়িত রূপ দেওয়া হয়। মূর্তশিল্পের প্রকাশক্রিয়াও তেমন একটা সংবদ্ধ ভাষায়িত বোধের বাহক হয়ে ওঠার উপক্রম করল সেযুগে : তার মূর্ত, দৃশ্যমান, আঙ্গিকনিহিত চরিত্র হারিয়ে গেল না অবশ্যই (বরং আরও বেশি উজ্জ্বল ও বাস্তবসিদ্ধ হল), কিন্তু তার সঙ্গে সংবদ্ধ মননের এই নতুন প্রক্রিয়া যুক্ত হল। একদিকে আলো, দৃশ্যকোণ (perspective), শারীরতত্ত্ব প্রভৃতির নিবিড় পর্যবেক্ষণের ফলে মূর্তশিল্পে দৃশ্য জগতের প্রতিফলন একটা বৈজ্ঞানিক, তথ্যধর্মী মাত্রা পেল; আরেকদিকে বিভিন্ন প্রতীকী ও চিন্তাগ্রাহ্য তাৎপর্যে চিত্র-ভাস্কর্যের রূপায়িত মূর্তি হয়ে উঠল বাক্যায়িত মনন ও কথনের আধার।

অর্থাৎ রেনেসাঁসের দৃশ্যশিল্পের বিকাশেও আমরা দেখছি একটা ভাষায়ণ, বাগ্‌বদ্ধ বয়ানের দিকে মূর্ত আঙ্গিকের প্রসার (textualisation of the visual)। *Giotto and the Orators* নামক বইয়ে মাইকেল ব্যাক্সেন্ডল দেখিয়েছেন, মধ্যযুগ ও রেনেসাঁসের সন্ধিক্ষণের চিত্রকর জ্যোত্তো তাঁর চিত্রায়ণের নতুন পদ্ধতি অনেকটা সৃষ্টি করছেন সদ্য পুনরাবিষ্কৃত প্রাচীন আলঙ্কারিকদের তত্ত্ব থেকে।[২৩] বিপরীত প্রক্রিয়াও দেখা যায় : ভাষাবদ্ধ রচনায় প্রবল হয়ে ওঠে প্রতীক-রূপক-চিত্রকল্পের পরাকাষ্ঠা, ভাষার প্রচলিত ক্রিয়ার গণ্ডি ছাপিয়ে কাজ করে চলে এক নিবিড় অতলস্পর্শী সার্বিক বোধ ও প্রকাশের ক্রিয়া, এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়তো স্পেনসরের কবিতায়। কিন্তু এই যৌথ প্রক্রিয়ায় ভাষার পাল্লাই ভারি। ভাষার নিহিত প্রণালীই শৈল্পিক মননের মৌলিক প্রণালী বলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

সামাজিক ও শৈল্পিক এই নতুন চেতনার মূল প্রক্রিয়া অতএব ভাষার সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ রূপদান। প্রাচীন ভাষা ও ধ্রুপদি সাহিত্যের আদলে আধুনিক ভাষাগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে গড়ে তোলা হিউমানিস্টদের একটা বিরাট কর্মসূচি।

এই কার্যক্রমের জন্য প্রথম প্রয়োজন ভাষা সম্বন্ধে সক্রিয় চেতনা। কোনো ভাষার বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে কাব্য রচনা হতে পারে, কিন্তু ভাষা নিয়ে চিন্তা, বিশ্লেষণ বা তাত্ত্বিক আলোচনা হয় না। (এ কথাটা সে যুগের বিখ্যাত শিক্ষাগুরু গুয়ারিনো ভেরোনেসের মুখে বসিয়েছিলেন আঞ্জেলো দেচেমব্রিও, এক কাল্পনিক কথোপকথনে।)[২৪] এই বিশ্লেষক চিন্তার সূত্রপাত হলে যেমন ভাষার সার্বিক প্রসার ঘটে, তেমনি তার নিহিত ধর্ম ব্যক্ত হয় আনুষ্ঠানিক ব্যাকরণের প্রণয়নে। এরাসমুস তো স্পষ্ট বলেছেন, বাইবেলের বাণী হৃদয়ঙ্গম করতে বাইবেলের ভাষার সম্যক জ্ঞান চাই : ধর্মবিদ্যা (theology) চর্চার জন্য ভাষাবিদ্যা অত্যন্ত জরুরি।[২৫]

সারা স্টিভেন গ্র্যাবেল প্রক্রিয়াটা এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

> ... from the discussions of *copia* comes a theory of culture : as language grows through certain stages, so do the intellectual powers

> of civilisation. ...
> Many humanists share an idea of the history of language and culture which is as follows : Languages develop through stages. In the primitive inchoate stage, few words are used to mean many things. The next stage is maturity, in which the use of language becomes selfconscious. There is reflection about language itself, which produces grammars and lexicons.[২৫]

বলা বাহুল্য, কোনো ভাষার এই সার্বিক প্রসারে, বিশেষ করে তার গঠন ও প্রয়োগ নির্ধারণ ও সমীকরণ (standardisation)-এ একটা মৌলিক ভূমিকা ছাপাখানার। মুদ্রণরীতির সঙ্গতি যে ভাষার সঙ্গতিপূর্ণ রীতিনির্ধারণের একটা বড়ো তাগিদ, তা যেমন সাধারণ তেমন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট। মুদ্রণজনিত প্রসারের ফলেই রেনেসাঁসে অনেক ইউরোপীয় ভাষা শুধু সমৃদ্ধই হল না, বলতে গেলে নানা উপভাষা ও আঞ্চলিক অভ্যাসের জট ছাড়িয়ে সৃষ্টি হল— অন্যথায় সেগুলি কখনো স্বীকৃত ভাষার মর্যাদাই পেত না। সেই সঙ্গে আবার অন্য কিছু ভাষা অঙ্কুরে বিনষ্ট হল, তাদের অসৃষ্ট সম্ভাবনা অন্য ভাষার বিবর্তনের ধারায় মিলিয়ে গেল। মুদ্রণের ইতিহাসকার স্টাইনবার্গ লিখেছেন :

> In England, as everywhere else, the printing press has preserved and codified, sometimes even created, the vernacular; with numerically small and economically weak peoples its absence has demonstrably led to its disappearance or, at least, its exclusion from the realm of literature.[২৭]

ইউরোপের ভাষাগত মানচিত্র বলতে গেলে তৈরি করে দিল ছাপাখানা, আর এই প্রক্রিয়ার প্রবল সূচনা ঘটল রেনেসাঁসে। আমাদের দেশে অনুরূপ প্রক্রিয়া আজও চলছে, তার সূচনা নিঃসন্দেহে ১৯ শতকের নতুন ভাষাচেতনার পটভূমি ছাপাখানার অভ্যুদয়ে।

ভাষার এই উত্থান-পতনের ধারা সম্বন্ধে জ্ঞানেন্দ্রমোহন বিলক্ষণ অবগত, যদিও তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে যুগধর্মগত সংকীর্ণতা আমাদের অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বলছেন, 'সুশিক্ষিত সভ্যজাতি'র ভাষা— যেমন 'সভ্য জগতের বর্তমান সংস্কৃতি ও প্রগতির আবহাওয়ায় আন্তর্জাতিক মেলামেশা বা আদান-প্রদানের ফলে, বাঙ্গালা ভাষার ন্যায় অতি প্রাচীন ও জীবন্ত ভাষা'—

> কত যুগযুগান্তরের শিক্ষা ও সংস্কারের মধ্য দিয়া আসিয়া বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে... [এবং] কত অসভ্য ও অর্ধসভ্য জাতি স্বীয় আদিম মাতৃভাষার শব্দ ও শব্দের রূপান্তর বর্তমান ভাষার মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহার শব্দতাত্ত্বিক ইতিবৃত্ত নাই। (পৃ. ৬)

আরও একটা সাদৃশ্য দেখবার মতো। ইউরোপীয় রেনেসাঁসে অন্ধ লাটিনভক্ত, বিশেষত সিসেরোভক্ত, অনেক ছিলেন; তাদের নিয়ে ঠাট্টাতামাশাও হয়েছে প্রচুর। কিন্তু বিচক্ষণ

হিউমানিস্ট পণ্ডিতমাত্রেই বুঝেছিলেন, তাঁদের গ্রিক-লাটিন চর্চার একটা বৃহৎ লক্ষ্য হতেই হবে সমসাময়িক মাতৃভাষাগুলির উন্নতি। যে উন্নতি সে যুগে এত নাটকীয়ভাবে ঘটেছিল, তা বহুলাংশে সাধন করেছিলেন এই হিউমানিস্টরাই, তাঁদের প্রতিপক্ষ কোনো মাতৃভাষা-বান্ধবগোষ্ঠী নয়; এবং সেই উন্নয়নের তাত্ত্বিক ভিত্তি বলতে গেলে পুরোপুরি হিউমানিস্টদের রচনা। এখানে স্মর্তব্য যে ১৯ শতকের গোড়ায় শ্রীরামপুরের মিশনারিরা, বিশেষ করে মার্শম্যান, বাংলার আকাঙ্ক্ষিত উন্মেষের আলোচনায় বারবার ইউরোপীয় রেনেসাঁসের এই দিকটাই তুলে ধরেছেন— অর্থাৎ মাতৃভাষার বিকাশ ও সেই ভাষার জনশিক্ষা ও বিদ্যার প্রসার।

কিছু ইউরোপীয় হিউমানিস্ট, বিশেষত গোড়ার দিকে, ধরে নিচ্ছেন আধুনিক ভাষাগুলির উন্নতি হবে পুরোপুরি লাটিনের পথ ধরে, লাটিনের আদলে। (কখনো বা ভাসাভাসাভাবে গ্রিক-লাটিন উভয়ের কথা বলা হচ্ছে।) কিন্তু তাঁদের ভাষাচেতনা (ও সেই সঙ্গে এই নব্য ভাষাগুলির সাহিত্যিক বিকাশ) ক্রমশ তাঁদের বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ভাষামাত্রেই স্বতন্ত্র, নিজস্ব নিয়মে সংগঠিত; তাদের উন্নতির পথও তাই হতে হবে স্বকীয়, স্বয়ংসিদ্ধ। গ্রিক-লাটিন থেকে কোনো বিশেষ দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে, শব্দসম্ভার তো যথেষ্ট নিতেই হবে; কিন্তু প্রত্যেক ভাষার রূপ ও ধর্ম হবে একান্ত নিজস্ব, শেষ লক্ষ্য হবে গ্রিক লাটিনের সমপর্যায়ে উত্তরণ। এমন উত্তরণ যে সম্ভব, সেটা স্বীকার করাই ইউরোপের আধুনিক ভাষাচেতনায় একটা বিরাট পদক্ষেপ।

প্রথম যুগের হিউমানিস্ট বা তাঁদেরও পূর্বসূরিদের কাছে এতটা উন্নতি দুরাশা বলে মনে হয়েছিল। ১৪ শতকের গোড়ায় 'সাধারণের ভাষা' (volgare)-তে লেখার স্বপক্ষে দান্তে যুক্তি দেখিয়েছিলেন ব্যাপক প্রচার ও সহজবোধ্যতা, ভাষার কোনো নিহিত গুণ নয়। তাঁর পরের শতকে ফ্লাভিও বিওন্দো, গুয়ারিনো গুয়ারিনি, লোরেঞ্জো ভাল্লা, ফ্রানচেস্কো ফিলেলফো প্রভৃতি পণ্ডিত নানা আলোচনায়, ও ইতালীয় ব্যাকরণ রচনার নানা প্রস্তাব-প্রচেষ্টার মাধ্যমে, ক্রমশ এই ধারণাটা চালু করেন যে প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব প্রকৃতি আছে; তা ঐতিহাসিক বিবর্তনে সাধিত এবং সাধারণ প্রচলনের মধ্যে পরিস্ফুট হয়। পণ্ডিতরা সেই প্রকৃতিটা আনুষ্ঠানিক ব্যাকরণে লিপিবদ্ধ করেন মাত্র, সৃষ্টি করেন না। অতএব ভাষার শক্তি তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতিতে, প্রাচীনত্ব বা পণ্ডিতি চর্চায় নয়; এবং যে কোনো ভাষায় যে কোনো তত্ত্বের উপস্থাপন করা যায়। ১৫ শতকের শেষভাগে তরুণ দিকপাল হিউমানিস্ট পিকো দেল্লা মিরান্দোলা এ কথা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে বিখ্যাত আলোচনা পিয়েত্রো বেমবোর। ১৬ শতকে বিজ্ঞানের আলোচনাও ইতালীয় ভাষায় (এমনকী একমাত্র ওই ভাষায়) পরিচালনার জন্য স্পেরোনে স্পেরোনি সওয়াল করেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৫৪০-এ ফ্লোরেন্সে একটি আকাদেমি স্থাপিত হয়। ১৫৪৯-এ ফরাসি ভাষার পক্ষে অনুরূপ সওয়াল করেন ইওয়াকিম দ্যু বেলে : তাঁর মতে ফরাসি ভাষা (অন্য যে কোনো ভাষার মতো) সব কাজের

উপযুক্ত এবং গ্রিক-লাটিনের সমকক্ষ হবার ক্ষমতা রাখে। ইংরেজি সম্বন্ধে ১৫৮২-তে রিচার্ড ম্যালক্যাস্টরকে লিখতে দেখি :

> For our natural tongue being as beneficial unto us for our needful delivery as any other is to the people which use it : and having as pretty and as fair observations in it as any other hath : and being as ready to yield to any rule of art as any other is : why should I not take some pains to find out the right writing of ours, as other countrymen have done to find the like in theirs?[২৮]

ম্যালক্যাস্টরের বক্তব্য দ্যু বেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যায়; এবং উভয়ের যুক্তির একটা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়ায় মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও বিদ্যাচর্চার উপযোগিতা।

বঙ্গীয় নবজাগরণে এমন যুক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন অবশ্যই মেলে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনায়; কিন্তু এই চিন্তার ইতিহাসটা আরেকটু বিস্তারে দেখা যাক। জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাংলা ভাষার প্রসার ও বহুমুখিনতার একটি উত্তেজক চিত্র এঁকেছেন :

> বাঙ্গালা ভাষার গঠন-মূলে সংস্কৃতের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও পণ্ডিতী বাঙ্গালা য়ুরোপীয়-জ্ঞান-বিজ্ঞানে-উচ্চশিক্ষিত, বৈদেশিক-ভাষা-সমূহে-সুপণ্ডিত, বিশ্বনাগরিকতাসুলভ এবং দেশ-কাল-জাতিগত-সংস্কারবর্জিত বা তাহার অতীত মহাকবি, সাহিত্যগুরু ও ভাষাবৈজ্ঞানিকগণের হাতে পড়িয়া পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনাধীন, বহুমার্জিত ও কালোপযোগীভাবে গঠিত হইয়া অচিন্ত্যপূর্ব্ব ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইতেছে। (পৃ. ৯)

এটা ১৯৩৭-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকে। মাতৃভাষার প্রসার নিয়ে সাধারণভাবে গর্ব ও উৎসাহ ছাড়াও বাক্যটির মধ্যে নিহিত আছে সংস্কৃতের বাইরে বাংলার পৃথক সত্তার স্পষ্ট স্বীকৃতি। ১৯১৭-য় প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় একই সুর ছিল :

> শিক্ষার স্রোত এরূপ প্রবল বেগে বহিয়াছে, দেশাত্মবোধ এমন ভাবে জাগিতেছে, উচ্চ শিক্ষিত, বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ও বহুভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মাতৃভাষায় লেখনী সঞ্চালন করায় বিগত শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বঙ্গভাষায় কৃতিত্বলাভ দেশবাসীর যেরূপ বাসনার বস্তু ও সাধনার ধনে পরিণত হইয়াছে—এমনকী, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে এরূপ ব্যাপকভাবে সভ্যজগতের অনুশীলনীয় হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে...(পৃ. ৪৬)

একই বছরে (১৯১৭) রামেন্দ্রসুন্দর লিখলেন প্রত্যেক ভাষার স্বকীয় বিকাশের কথা, অভিন্ন বিষয়ক মত প্রকাশে স্বকীয় প্রণালী অবলম্বনের কথা : 'বিজ্ঞানের পদ্ধতি সর্ব্বত্রই এইরূপ কিন্তু তাই বলিয়া পদার্থবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান নহে; জ্যোতিষও রসায়ন নহে। সেইরূপ নানা ভাষার আলোচনাতে একই আদর্শ গৃহীত হইলেও সেই নানা ভাষা এক হইয়া যায় না।'[২৯] ষোলো বছর আগে এ কথাই লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : 'বস্তুত প্রত্যেক

ভাষার নিজের একটা ছাঁচ আছে। উপকরণ যেখান হইতেই সে সংগ্রহ করুক, নিজের ছাঁচে ঢালিয়া সে তাহাকে আপনার সুবিধামত বানাইয়া লয়। সেই ছাঁচটাই তার প্রকৃতিগত, সেই ছাঁচেই তাহার পরিচয়।'[৩০]

কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ বলছেন বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গে : 'ভাষার সেই প্রকৃতিগত ছাঁচটা বাহির করাই ব্যাকরণকারের কাজ।' বাংলা ব্যাকরণের ভিত্তি সংস্কৃত ব্যাকরণ হবে কিনা তার শব্দসম্ভারের সংস্কৃত, দেশজ ও অন্যান্য উপকরণ কোনটা কত থাকবে, সাধু-চলিত-প্রাকৃতের সংজ্ঞা ও ক্ষেত্রবিচার— এই সব প্রশ্নের তাত্ত্বিক আলোচনা ও ব্যবহারিক সমাধান রবীন্দ্রজীবনের দ্বিতীয়ার্ধের একটা বড়ো ভাবনা ছিল; উপরের উদ্ধৃতি তার প্রথম পর্যায়ের প্রকাশ। রামেন্দ্রসুন্দরের উপরোক্ত লেখাও সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক হিসাবে এই বিতর্কে সালিশীর চেষ্টা।

ভাষার ভিত পোক্ত করার কর্মসূচি শুরু করতে হয় একেবারে মৌলিক স্তরে, বর্ণমালার অক্ষরসংখ্যা দিয়ে। ছাপাখানার আগমনে এ বিষয়ে চিন্তা একটা নতুন ব্যবহারিক গুরুত্ব পেল। প্রাচীন গ্রিকের কটা অক্ষর ছাপায় স্বীকৃত হবে, তা নিয়েও হিউমানিস্টদের বিতণ্ডা করতে হয়েছে। ইংরেজির অক্ষরসংখ্যা নিয়ে মালক্যাস্টর লিখছেন : 'But why may we not use all our four and twenty letters, even to four and twenty uses every of them...'[৩১] অবশ্যই এটা শেষ কথা নয়, ইংরেজি বর্ণমালা four and twenty letters-এ আবদ্ধ থাকেনি। বিদ্যাসাগরকেও 'বর্ণপরিচয়'-এর প্রথম ভাগের ভূমিকায় বাংলা অক্ষরসংখ্যা নির্ধারণের প্রস্তাব তুলতে হয়েছিল। প্রায় একশ বছর বাদে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও তার পরবর্তী অভিধানকারেরা এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছেন, আজও সমাধান মেলেনি। বিদ্যাসাগরের আরেকটি অবদানও এখানে উল্লেখ করতে হয় : বাংলায় বিরামচিহ্নের আধুনিক ব্যবহারের প্রবর্তন।

অক্ষর গোনাটা ব্যাকরণচিন্তার একেবারে প্রাথমিক স্তর। ইউরোপীয় রেনেসাঁসে হিউমানিস্টদের একটা প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল নব্য ভাষাগুলির ব্যাকরণ ছকা, গ্রিক-লাটিনের প্রেক্ষিতে তাদের ব্যবহারিক ভিত পোক্ত করা। গোড়ার দিকের হিউমানিস্টদের স্থির প্রতিপাদ্য ছিল যে গ্রিক-লাটিন এক চিরায়ত ব্যাকরণের আদলে বাঁধা : সমসাময়িক ভাষাগুলির তুলনায় এখানেই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। ক্রমে উপরোক্ত পথে এই বোধটা প্রতিষ্ঠিত হল যে কোনো ভাষাই ধ্রুব বা কালাতীত নয়; এবং প্রত্যেক ভাষার আছে নিজস্ব সত্তা, প্রণালী ও বিবর্তনের ধারা। ব্যাকরণচর্চার দ্বারা সেই ধারাটি নির্দিষ্ট করতে পারলে আধুনিক ভাষাগুলিও ধ্রুপদী ভাষার সমকক্ষ হতে পারবে। দরকার শুধু, মালক্যাস্টরের কথায়, 'certain precept, and rule of art'।[৩২] বহু হিউমানিস্ট মাতৃভাষার স্বপক্ষে এমন সওয়াল করেছেন; সবচেয়ে স্মর্তব্য হয়ত ফরাসি নিয়ে দ্যু বেলের দীর্ঘ আবেদন।[৩৩]

রীতি ও ব্যবহারের সমীকরণ সম্বন্ধে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের মন্তব্য, বিবিধ ও সার্বজনীন প্রচারের ফলে বাংলাভাষার 'একরূপতা' প্রাপ্তিকে তাঁর স্বাগত সম্ভাষণ, আগেই উদ্ধৃত করেছি। প্রথম ও দ্বিতীয়, উভয় সংস্করণের ভূমিকাতেই বাংলা ব্যাকরণের একান্ত

সংস্কৃতনির্ভরতা ছাড়িয়ে তা যথার্থভাবে বাংলাভাষার অনুসারী করার প্রয়োজন তিনি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

এখানে একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে। ২০ শতকের গোড়া পর্যন্ত বাংলায় অধিকাংশ আলোচক শব্দের ব্যুৎপত্তিকেও ব্যাকরণের আওতায় ফেলছেন, এমনকী মূলত তাই-ই বোঝাচ্ছেন। ১৯১৭-তে রামেন্দ্রসুন্দর 'মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়' অর্থাৎ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে সাক্ষী রেখে লিখছেন : 'ইংরেজিতে যাহাকে Etymology বলে, ব্যাকরণ শব্দের প্রকৃত অর্থ তাহাই। কিন্তু আজকাল ব্যাকরণ শব্দ আরও ব্যাপক অর্থে বাঙ্গালায় ব্যবহার হয়; উহা ইংরেজী গ্রামার শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতেছে; তন্মধ্যে Etymology ব্যতীত Syntax বা বাক্য-নির্ম্মাণ-প্রকরণ, ছন্দঃপ্রকরণ, এমন কি, অলঙ্কারপ্রকরণ পর্যন্ত স্থান পাইয়া থাকে। আমরা ব্যাকরণ শব্দ এই ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করিলাম।'[৩৪] বলার মতো যে ১৮৩৩-এই রামমোহন ব্যাকরণের এই সংজ্ঞা প্রস্তাব করেছেন : 'সর্ব্বদেশীয় ভাষাতে এক ২ ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ আছে যদ্দ্বারা তত্তদ্ভাষা লিখনে ও শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা পূর্ব্বক কথনে শৃঙ্খলামতে পারগ হয়েন...'[৩৫]

কিন্তু প্রায় এক শতাব্দী পরেও যে এমন সংজ্ঞা সাধারণভাবে গৃহীত হয়নি, তা রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্যে স্পষ্ট। জ্ঞানেন্দ্রমোহনও প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলছেন 'শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় (etymology), তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণাদি [অর্থাৎ মোটামুটি morphology-র এক্তিয়ার] ব্যাকরণের বিষয়ীভূত।' (পৃ. ৪১) কিন্তু এর মধ্যে দিয়েই ক্রমে ব্যাকরণ শব্দের আধুনিক (নাকি পাশ্চাত্য) অর্থ প্রধান হয়ে উঠছে। এর আগেই রবীন্দ্রনাথের *শব্দতত্ত্বর* প্রবন্ধগুলিতে ব্যাকরণ বলতে মূলত বা একমাত্র ভাষার রীতিনির্ণয় ও প্রকল্প বোঝানো হচ্ছে, আর সেই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সংস্কৃতের প্রভাব থেকে উদ্ধার করে যথার্থ বাংলা ব্যাকরণের উদ্ভাবন। (এই চেষ্টা করার জন্যই বীম্‌স সাহেবের ভুলে-ভরা ব্যাকরণকেও তিনি সম্পূর্ণ বরবাদ করেননি— কোনো বাঙালি তখনও এমন প্রচেষ্টা হাতে নেননি।)[৩৬] শতাব্দীর গোড়া থেকেই এই প্রবণতা লক্ষণীয়। ১৯১৭-তে রামেন্দ্রসুন্দর লিখছেন 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ এখনও গঠিত হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষার নিয়মসকল অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত। এই সকল নিয়ম যখন আবিষ্কৃত হইবে, তখন বাঙ্গালায় শাসিত নিজ প্রতিভাদ্বারা পূর্ব্বাচার্য্যগণের আবিষ্কার-সকলের সমন্বয় করিয়া বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ শাস্ত্র সম্পূর্ণ করিবেন। ...আমাদিগকে তাঁহার আবির্ভাবের জন্য আয়োজন করিতে হইবে।'[৩৭] ১৯৩৭-এ জ্ঞানেন্দ্রমোহন আরেকটু ভরসা রাখতে পারছেন : 'এক্ষণে, ভাষার উপযোগী সংস্কৃত-বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধানের পরিবর্ত্তে খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধানের অভাব-মোচনের সহিত বাঙ্গালীর মাতৃভাষাকে অনন্ত শক্তিসঞ্চারিণী করিয়া তুলিবার যুগ দেখা দিয়াছে।' (২য় সংস্করণের ভূমিকা, পৃ. ৪)

এ দিক থেকে হ্যালহেডের ব্যাকরণের ভূমিকার সঙ্গে রামমোহনের *গৌড়ীয় ব্যাকরণ*-এর ভূমিকার তুলনা করলে একটা তফাত ধরা পড়ে। হ্যালহেড ব্যাকরণ প্রণয়ন ও

পাঠের সপক্ষে যে কারণগুলি তালিকাভুক্ত করেছেন তার সবগুলিই বলতে গেলে ব্যবহারিক। রামমোহনের উদ্দেশ্য কিন্তু ছেলেদের ভাষাশিক্ষায় সহায়তা করা— তাও মুখ্যত নিজের ভাষা নয় (কারণ তা 'অল্প পরিশ্রমে সম্ভবে'), বরং সেই ভিত্তিতে অন্য ভাষা শেখা। অর্থাৎ মূলত ভাষা সম্বন্ধে সচেতনতার সঞ্চারই তাঁর লক্ষ্য। এ বিষয়ে হিউমানিস্টদের বক্তব্য আগেই উদ্ধৃত করেছি। রামমোহনের, এমনকী হ্যালহেডের প্রচেষ্টাকে জ্ঞানেন্দ্রমোহন 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' হিসাবেই দেখেছেন, কিন্তু আপশোস করছেন এই ভেবে যে সংস্কৃতজ্ঞদের প্রভাবে ও সাধারণের ঔদাসীন্যে বঙ্গসমাজে এই প্রচেষ্টার তেমন প্রভাব পড়েনি।

এমন সব উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টার পেছনে অবশ্যই কাজ করছে বাংলা ভাষার স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। পুরো প্রচেষ্টাটির সঙ্গে উপরে বর্ণিত হিউমানিস্ট প্রকল্পের দর্শনীয় মিল। শব্দচয়নে যে ব্যাপকতা ও ঔদার্য একের পর এক বাংলা তাত্ত্বিক ও সমালোচক প্রস্তাব করেছেন, তাও হিউমানিস্টদের আদর্শের অনুরূপ। দ্যু বেলে তা স্পষ্টই বলেছেন, ফরাসিকে গ্রিক-লাটিনের সমকক্ষ করতে হলে পরিকল্পিতভাবে অন্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করতে হবে।

যেমন নির্দিষ্ট ব্যাকরণ, তেমন দরকার পর্যাপ্ত শব্দভাণ্ডার, যাকে সেকালের ইউরোপীয় আলঙ্কারিকরা বলতেন copia। বহু যুগ ধরে চর্চিত হওয়ায়, ও বহু দেশ ও জাতির সঙ্গে নিবিড় আদানপ্রদানের ফলে, গ্রিক-লাটিনের শব্দভাণ্ডার copia-র কালজয়ী নিদর্শন। ক্রমশ ব্যবহার ও উন্নতির ফলে আধুনিক ভাষাগুলিও একইভাবে copia লাভ করতে পারে। ভাষার সমৃদ্ধি হবে একাধারে সেই জাতি বা সভ্যতার সমৃদ্ধি।

আরও কয়েকটি উপসর্গ লক্ষ করার মতো। একটি হল বিচিত্র কাল, পর্যায় ও ক্ষেত্র থেকে ভাষার নমুনা সংগ্রহ, অর্থাৎ শব্দভাণ্ডার ও ব্যবহারের যথাসম্ভব ব্যাপক চিত্র ফুটিয়ে তোলা : কলাসাহিত্য ছাড়িয়ে লোকসাহিত্য, সমকাল ছাড়িয়ে অতীত, শিষ্ট ভাষা ছাড়িয়ে অশিষ্ট, কথ্য, গ্রাম্য প্রয়োগ, উপভাষা ও অপভাষার অরণ্য। গ্রিক-লাটিন সাহিত্যে কতকগুলি বিশেষ প্রয়োগে (যেমন ব্যঙ্গসাহিত্যে, ও pastoral বা রাখালিয়া সাহিত্যে) ভাষার এই বিচিত্র গতির কিছু প্রয়োগ ঘটেছে। সেই আদলে ইউরোপীয় রেনেসাঁসে সমসাময়িক ভাষাগুলিতে আরও নিবিড়ভাবে এমন নিদর্শন দেখা যায়। গ্রাম্য বা ব্যঙ্গাত্মক ব্যবহার মিলবে লেরেঞ্জো দে' মেদিচি প্রমুখ একাধিক ইতালীয় কবিতে; আরও বহুগুণ ব্যাপক ও প্রগাঢ়ভাবে ফরাসিতে প্রাঁসোয়া রাবলের দার্শনিক ফ্যানটাসিতে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধারাটি লুইজি পুলচির *Morgante maggiore* নামক ইতালীয় আখ্যানকাব্যে শুরু হয়ে পরাকাষ্ঠালাভ করে শতাধিক বছর বাদে ভিন্ন ভাষায়, স্পেনসরের *The Faerie Queene*-এ।

১৬ শতকে ইংল্যান্ডে কালসচেতনভাবে অ্যাংলো-স্যাক্সন ও মধ্যযুগীয় ইংরেজির অধ্যয়ন শুরু হয়, লুপ্ত ও আঞ্চলিক শব্দের সঠিক নির্দেশ ও পারস্পরিক সম্বন্ধবিচারের তাগিদ আসে। ইংরেজি ভাষার এই বহুমাত্রিক রূপের পরিপূর্ণ সাহিত্যিক ব্যবহার প্রথম

দেখা যায় স্পেনসরের কাব্যে, ও তার অল্প পরে শেক্‌সপিয়র, বেন জনসন প্রমুখের নাটকে। ১৬০৫-এ উইলিয়ম ক্যামডেন তাঁর *Remains concerning Britain* গ্রন্থে লেখেন যে অষ্টম হেনরির কাল থেকে ইংরেজি ভাষা 'hath been beautified and enriched out of other good tongues, partly by enfranchising and endenizing strange words, partly by refining and mollifying old words, partly by implanting new words with artificial composition... So that our tongue is (and I doubt not but hath been) as copious, pithy, and significative, as any other tongue in Europe...'[৩৮]

একদিকে প্রচলিত সাধারণগ্রাহ্য ভাষা ও তার নেপথ্যে নানা অশিষ্ট, গ্রাম্য ও প্রাচীন প্রয়োগ; অপরদিকে গ্রিক-লাটিন থেকে গৃহীত নতুন অভিজাত অর্থসম্ভার— এই দুই ধারার ঘাত-প্রতিঘাতে রেনেসাঁসে ইংরেজি ভাষা চালিত হচ্ছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের আগে একমাত্র কালজয়ী বাংলা অভিধান *বাঙ্গালা শব্দকোষ*-এ এক অতি-দেশজ অবস্থান নিয়েছিলেন : যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি— যার প্রতিক্রিয়ায় সর্বদেশদর্শী মধ্যপন্থা উচ্চারণ করে জ্ঞানেন্দ্রমোহনই উত্তরসূরি সব বাংলা আভিধানিকের অবশ্যগ্রাহ্য নীতি নির্ধারণ করে দিলেন।

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের বক্তব্যটা দেখা যাক। অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় সাধুভাষা ও কথ্যভাষার 'ভয়াবহ ব্যবধান দূর করার জন্য তিনি সাধুবাদ জানান রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমকে; তারপর : 'কত সাহিত্যরথী বর্ত্তমান কবি-সম্রাট মহামনস্বী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত এবং টেকচাঁদ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ হইতে বঙ্গের 'বীরবল' পর্য্যন্ত উচ্চ সাহিত্যিক ভাষার সহিত 'আলালী' ভাষার অপূর্ব্ব মিশ্রণে বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষা গড়িয়া তুলিয়াছেন। ভাষাসংস্কারকগণের বিশ্ব-নাগরিকতা-সুলভ প্রচেষ্টার ফলে বাঙ্গালা কথ্য-ভাষা হইতে লেখ্য-ভাষায় সেই ভয়াবহ এবং ক্রমবর্দ্ধমান অনপনেয় পার্থক্য জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে লোপ পাইয়া যে একরূপতা প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে, সাধারণের রুচি, আধুনিক সংবাদ পত্রাদির ভাষা ও বর্ত্তমান লোক-সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহার আভাসও পাওয়া যাইতেছে।' (পৃ. ৪)

ভাষার এই সার্বিক বোধ প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বলিষ্ঠ অবদান বঙ্কিমের। তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে আছে এই প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ ও জোরালো আলোচনা, যার নির্যাস পাওয়া যাবে শেষের এই অংশে : 'যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা [লেখকের বক্তব্য] সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবুপ্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইবে তাহাতেও আপত্তি নাই— নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি

পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে— যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে— তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।'[৩৯] অনুবাদ করে, ও প্রসঙ্গের প্রয়োজনীয় রূপান্তর করে, এই বাক্যগুলি অনায়াসে কোনো ইউরোপীয় হিউমানিস্টের নামে চালিয়ে দেওয়া যায়।

সংস্কৃত ও দেশজ— ১৯ শতকের বাংলার এই দুই বিপরীত মেরু মেলানোর সম্ভাবনা দেখা দিল যখন শব্দচয়ন ও ব্যাকরণের বৃহত্তর প্রভেদ ক্রমে এসে ঠেকল সাধু ও চলিতের বাহ্য পার্থক্যে, অর্থাৎ মূলত ক্রিয়ার রূপের ভিন্নতায় ও তৎসম শব্দের কিঞ্চিৎ অনুপাতভেদে। এক সর্বজনগ্রাহ্য 'প্রাকৃত'-এর মিলনভূমিতে এই বিভেদগুলি মেলানোর মুখ্য কৃতিত্ব অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের। ততদিনে তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'পাশ্চাত্য জাতিদের ভাষায় এই সদর-অন্দরের বিচার নেই। তাই সেখানে সাহিত্য পেয়েছে চলনশীল প্রাণ, আর চলতি ভাষা পেয়েছে মননশীলতার ঐশ্বর্য।'[৪০] বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য ভাষাগুলি এই গুণ নিয়ে জন্মায়নি, আয়ত্ত করেছে; যে নীতিতে আয়ত্ত করেছে তার উদ্ভাবন রেনেসাঁসের যুগে। সেই নীতিই রবীন্দ্রনাথ তাঁর যুগে তাঁর ভাষার জন্য প্রস্তাব করছেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষাতেও তিনি অবশ্যম্ভাবী দেখেছেন এই দুই উপাদানের সমন্বয়; 'নতুন বানানো পরিভাষিকে উভয়পক্ষের হবে সমান স্বত্ব।'[৪১]

সংস্কৃতের ভূমিকা এই সমন্বয়ের সীমার মধ্যে : 'কী জ্ঞানের কী ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে। পাশ্চাত্য ভাষাগুলিতেও এমনি করেই গ্রিক-লাটিনের বশ মানতে হয়।'[৪২] এর কারণ কিন্তু ওই প্রাচীন ভাষাগুলির সাবলীলতা, ভেঙেচুরে গড়ার ব্যাপারে আমাদের স্বাধীনতা। আরও আগে রবীন্দ্রনাথই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে বাংলায় সংস্কৃতজ শব্দের ব্যবহারেই আমাদের স্বাধীনতা অনেক বেশি, দেশজ শব্দের বেলায় সীমিত। ইউরোপেও হিউমানিস্টরা প্রাচীন ও ভিনদেশী ভাষার ব্যবহারে খুঁজেছিলেন একই স্বাধীনতা। ১৫৮২-তে ম্যালক্যাস্টর লেখেন : '...Latin and Greek, whose words we enfranchise [অর্থাৎ মুক্তিদান করি, বা মুক্ত বিচরণের অনুমতি দিই] to our own use; ...[তারপর অন্য ভাষা থেকে গৃহীত শব্দের উল্লেখ করে] ... So that ... the very newest words which we use do savour of great antiquity, and the ground of our speech be most ancient.'[৪৩]

ব্যাকরণ রচনার সঙ্গে আরেকটি প্রক্রিয়ার উল্লেখ করতে হয়। সেটি হল ১৯ শতকে বাংলা গদ্যের বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আমরা পুরাতন সাহিত্য পেয়েছি পদ্যে, সেইটেই বনেদি।' গদ্য লিখতে বসে রামমোহনকে 'নিয়ম হেঁকে হেঁকে, কোদাল হাতে, রাস্তা বানাতে হয়েছিল' (নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথ ভাবছিলেন বেদগ্রন্থ-র 'অনুষ্ঠান'-এর কথা), তারপর সে গদ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটল বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের হাতে।[৪৪] 'চারিত্রপূজা'য় বিদ্যাসাগরের আলোচনায় বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের অবদানের বিশদ বিশ্লেষণ আছে।

বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায়, বিশেষত ইতালীয়তে, রেনেসাঁসে অনুরূপ বিকাশ দেখা যায়। অন্য কিছু ভাষায়, যেমন ফরাসি ও ইংরেজিতে, গদ্যের বিকাশ অবশ্য মধ্যযুগেই ঘটেছিল; তবু মোটের উপর নব্য ভাষায় গদ্যরচনার তাগিদ রেনেসাঁসে বহুগুণ বাড়ল, কারণ ওই যুগেই মাতৃভাষায় বা নব্য ভাষায় নানা ধরনের সিরিয়াল লেখার চল হল।

গদ্যের এই বিকাশের সঙ্গে ভাষার সুষ্ঠু প্রকরণভিত্তিক প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, পদ্যে 'স্বাভাবিক কথা বলার নিয়ম খাটে না,'[৪৫] কর্তা-কর্ম-ক্রিয়াপদের ক্রম থেকে শুরু করে অনেক রীতির বিঘ্ন ঘটে। গদ্যের বাঁধুনিই ভাষার স্বাভাবিক কাঠামো সুদৃঢ় করে। বিপরীত প্রক্রিয়ায়, ব্যাকরণ নিয়ে ভাবনাচিন্তা অর্থাৎ পূর্বোক্ত ভাষাসচেতনতা দেখা দিলে গদ্যের বিকাশে উদ্দীপনা ও সৌষ্ঠব আসে। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের শব্দচয়ন আজ অচল; বাংলা গদ্যের প্রজনক হিসাবে তাঁদের গুরুত্ব বাক্যগঠনের সরল প্রণালী ও অন্বয় (syntax) অনুসারে পদের রূপনির্ধারণের পন্থা নির্দেশে। অর্থাৎ বলতে গেলে তাঁরা ব্যাকরণের বই না লিখলেও কার্যকর বা ব্যবহারিক স্তরে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করে গিয়েছেন, ভাষাটাকে সর্বগ্রাহ্য নিত্যব্যবহার্য রূপ দিয়েছেন।

অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাংলা গদ্যের এই বিবর্তনের বিবরণ দিয়েছেন : কীভাবে রামমোহন প্রথম 'পদ্যপ্লাবিত বাঙ্গালার স্রোত ফিরাইয়া গদ্যের প্রবর্ত্তন' করেন, তারপর বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম সেই ধারা পুষ্ট করেন (পৃ. ৪)। উল্লেখ যে এই ভূমিকাটি *বাংলাভাষা-পরিচয়* থেকে উপরে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের আলোচনার আগে প্রকাশিত। এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন বিবরণটি যতদূর টেনে নিয়ে গিয়েছেন তা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সঙ্গত কারণেই সম্ভব হয়নি; 'বর্ত্তমান কবি-সম্রাট মহামনস্বী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত এবং টেকচাঁদ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ হইতে বঙ্গের 'বীরবল' পর্যন্ত উচ্চ সাহিত্যিক ভাষার সহিত 'আলালী' ভাষার অপূর্ব্ব মিশ্রণে বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষা গড়িয়া তুলিয়াছেন।' (পৃ. ৪) ভাষার সমসাময়িক বিবর্তনের এই বোধ, এবং তাতে এই নিবিড় মানসিক নিমজ্জন, ১৬ শতকের ইউরোপ ও ১৯ শতকের বাংলাকে এক সূত্রে যুক্ত করছে।

সংস্কৃতির ইতিহাসে নবজাগরণ-বাচক কোনো কথার একটা মূল ব্যঞ্জনা তাহলে ধরতেই হয়, ভাষা নিয়ে একটা বিশেষ সচেতনতা ও অনুসন্ধিৎসাকে যুগের সামাজিক ও তাত্ত্বিক চেতনাকেন্দ্রে স্থাপন। ভাষাই হয়ে ওঠে যুগচেতনার ভিত্তি ও বাহক। 'A Grammarian's Funeral' কবিতায় ব্রাউনিং রেনেসাঁসের এক কাল্পনিক বৈয়াকরণের আপাতনীরস গবেষণায় যে উত্তেজক সুদূরস্পর্শী মাত্রা খুঁজে পেয়েছেন তাতে অবশ্যই কবির আবেগের ছোঁয়া লেগেছে, তবু সত্যিই ধরা পড়েছে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের তত্ত্বনাড়ির স্পন্দন। তাই জ্ঞানেন্দ্রমোহনের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কাজের বাধাস্বরূপ তাঁর যে বহু ব্যাধি ও দুরবস্থার দীর্ঘ এমনকী অস্বস্তিকর বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে ব্রাউনিং-এর এই কাল্পনিক বিদ্যানায়কের পীড়ার মিল না খুঁজে উপায় থাকে না : Back to his book then : deeper drooped his head : / *Calculus* racked him :/ Leaden

before, his eyes grew dross of lead : / *Tussis* attacked him. ... / So, with the throttling hands of Death at strife, / Ground he at grammar : ...

এই বর্ণনা এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহনের রোগভোগের সঙ্গে তার তুলনা হয়তো আবেগময় কল্পনায় সুড়সুড়ি দেয়। এর পিছনে যে ইঙ্গিতটি আছে তা কিন্তু গভীর ও যুগান্তকারী। ইউরোপীয় রেনেসাঁসে পণ্ডিতের, বিশেষত ভাষাবিদ পাঠকেন্দ্রিক পণ্ডিতের কাজটাকে যে গুরুত্ব দেওয়া হল তা শুধু সামাজিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) দিক দিয়েই অভূতপূর্ব নয়, তাতে একটা নতুন নাটকীয়, নায়কসুলভ মাত্রা যোগ হল— পুঁথিপড়া পণ্ডিত হয়ে উঠলেন যুগের অপ্রত্যাশিত হিরো বা মিথ। তার পরকাষ্ঠা অবশ্যই এরাসমুস। *Erasmus, Man of Letters* বইয়ে লিসা জার্ডিন ঈষৎ তির্যকভাবেই দেখাতে চেয়েছেন, এরাসমুস যেন পরিকল্পিতভাবে নিজের ও নিজের পেশার এই চমৎকার ভাবমূর্তিটি ফুটিয়ে তুলেছেন। নিজের গ্রন্থরচনা ও সম্পাদনার অনেকগুলি বিবরণ এরাসমুস রেখে গেছেন, তার একটি উদ্ধৃত করে জার্ডিন বলেছেন : 'This passage gives us Erasmus constructing himself in letters— on the printed page— as a particular sort of exemplary scholarly figure for the Renaissance : a symbolic origin of, and focus for, a *renovation* in learning in which the scholar himself strives for visibility rather than invisibility, textual presence rather than absence. The detail here is at once vivid and immediate, and yet fictionalised and idealised. Here is *work* par excellence— collaborative labour trouble, struggle, hardship, relived by friendship and community in learning, work in which the scatred corrector and annotater somehow exerts more physical effort than those who opearte the heavy presses. Here is a task carried out not for direct profit or fame (or, perhaps, not for those alone), but out of an urge to *set the record straight*, and for the betterment of a world whose boundaries are not national boundaries.'[৪৬]

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের বিদ্যাচর্চার বিবরণ অবশ্যই তুলনীয়, কিন্তু এরাসমুসের যোগ্য তুলনা হবে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয় বিধানের সন্ধানকালে : 'তিনি দ্বিপ্রহরের সময়ে কেবল একবার বন্ধুবর রাজকৃষ্ণ বাবুর গৃহে আহার করিতে যাইতেন। কালেজের কার্য্য শেষ করিয়া অপরাহ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাগারে পুস্তকরাশির মধ্যে মগ্ন থাকিতেন এবং গ্রন্থ-কীটের ন্যায় পুঁথির পত্রে পত্রে বিচরণ করিতেন। ... এইরূপ বহুদিন কাটিয়াছে।'[৪৭]

এটা অবশ্যই বিদ্যাসাগরের নিজের উক্তি নয়, তবে তাঁর মৃত্যুর অল্প পরেই রচিত, সমসাময়িক মনোভাবের নিদর্শন। একটি অনুরূপ বিবরণ আছে শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখায়।[৪৮] সুমিত সরকার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর জীবনীর আশ্চর্য প্রাচুর্যে।[৪৯] এর একটা কারণ সুমিত দেখিয়েছেন। সেটি নাকচ না করেও যুগমানসের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত কারণটির কথা ভাবা যায়।

এই ধরনের বর্ণনা কেবল আবেগময় চরিত্রপূজার উপাদান বলে ভাবলে ভুল হবে।

এগুলির আসল তাৎপর্য পাঠকেন্দ্রিক জ্ঞানচর্চা, এমনকী সেই জ্ঞানচর্চার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত চরিত্রগঠন ও সামাজিক মূল্যনির্দেশের একটা নতুন চাঞ্চল্যকর আদর্শের উপস্থাপনে। লেখাপড়াকে এত উজ্জ্বল, সক্রিয়, উত্তেজকভাবে সংগ্রাম বা অভিযানের আদলে আগে কখনো ফুটিয়ে তোলা হয়নি। ফলে পুঁথিগত লেখাপড়ার মতো কুনো কাজ বিস্ময়করভাবে হয়ে দাঁড়াল নায়কোচিত ব্যক্তিত্বপ্রকাশের উপায়। এজন্যই ১৬ শতকের ইউরোপীয় বা ১৯ শতকের বাঙালি পণ্ডিতসমাজের একাংশ যেভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারে অগ্রণী হয়ে উঠলেন ও বৃহত্তর সামাজিক স্বীকৃতি পেলেন, ইতিহাসে তার নজির অল্প। The hero as man of letters-এর উপস্থিতি উভয় যুগে স্পষ্ট— আগের কোনো যুগে বলতে গেলে অসম্ভব ছিল। The hero as poet সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। মাইকেল কবিজীবনের জন্য তাঁর তালিমের একটি তুলনীয় বিবরণ রেখে গিয়েছেন : 'My life is more busy than that of a schoolboy. Here is my routine : 6-8 Hebrew; 8-12 school; 12-2 Gerrk; 2-5 Telegu and Sanskrit; 5-7 Latin; 7-10 English. Am I not preparing for the great project of embellishing the tongue of my fathers?'[৫০]

শেষ বাক্যটি থেকে স্পষ্ট, এই শ্রমের উদ্দেশ্য বাংলার মুখ্য কবি— বলা যেতে পারে কাব্যিক মুখপাত্র— হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। এইভাবে নিজেদের গড়েপিটে পাঠকসমাজের সামনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সমাজের চোখে শিল্পনায়কের মূর্তি ধারণ করা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের কবিদের একটা নতুন স্বসৃষ্ট ভূমিকা : রিচার্ড হেলগর্সন, লুই মনটোজ প্রভৃতির গবেষণায় তার প্রচুর প্রমাণ দাখিল হয়েছে। সজ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক, এ ব্যাপারেও মাইকেলের আদর্শ হলেন মিলটন : যৌবনে বার্টন নামক গ্রামে নিজেকে আবদ্ধ করে কঠোর অধ্যয়নের দ্বারা মিলটন কবিভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত হন।

মনে রাখতে হবে, মিলটন বালকদের শিক্ষা নিয়েও একটা রচনা লিখেছিলেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের একটা বিশেষ লক্ষণীয় দিক, সে যুগের বহু দিকপাল পণ্ডিত একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে শিশুদের লেখাপড়ার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন— পাঠ্যপুস্তক লিখে, শিক্ষাপ্রণালী আলোচনা করে, বহুক্ষেত্রে সরাসরি স্কুলে পড়িয়ে স্কুল চালিয়ে। এই তালিকায় এরাসমুস আছেন, আছেন পেত্রুস ভের্গেরিউস, লেওনার্দো ব্রুনি, ভিত্তোরিনো দা ফেলত্রে, গুয়ারিনো গুয়ারিনি, ইয়োহান স্টুর্ম, জন কোলেট, ফিলিপ মেলাংকলন, ইয়াকোপো সাদোলেতো, হুয়ান লুইশ ভিভেস, ইয়োহান আমোস কোমেনিউস— কে নয়? শিক্ষা নিয়ে মার্টিন লুথারের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা আছে। তেমনি ১৯ শতকে বাংলায় ছিলেন রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও অবশ্যই বিদ্যাসাগর। দুটো সমান্তরাল তালিকা তৈরি করা বড়ো কথা নয়, সেটা কাকতালীয় হতে পারে। বলার কথা এই, উভয় যুগই গুরুত্ব

দিয়েছিল ভাবি প্রজন্মের মধ্যে ভাষা সম্বন্ধে একটা মৌলিক বোধ জাগ্রত করায়, এবং সেটাকেই শিক্ষা তথা সমাজগঠনের মূল কর্মসূচি বলে স্বীকার করায়। কার্যটিতে এই গুরুত্ব আরোপের জন্যই উভয় যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা সেটা নিজেদের একটা মুখ্য দায়িত্ব বলে গ্রহণ করেছিলেন।

হিউমানিস্ট শিক্ষার ভিত্তিই ছিল প্রাচীন গ্রিক ও লাটিন ভাষাচর্চা (ক্বচিৎ উঁচু ক্লাসে সেই সঙ্গে হিব্রু)। বলা চলে, ওই দুটি ভাষা, এবং ওই ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যার যেটুকু আরব্ধ হতে পারে, তাতেই পাঠ্যক্রম আবদ্ধ ছিল। সমসাময়িক ভাষার চর্চা ও বিকাশের জন্য অন্যভাবে এই পণ্ডিতদের যে উৎসাহ, এইসব পাঠক্রমে তার অল্পই প্রতিফলন দেখা যায়। মাতৃভাষা শিক্ষার একটা ধারা (vernacular education) সেযুগে ছিল ঠিকই, কিন্তু তার স্থান নিতান্ত গৌণ ও প্রাথমিক পর্যায়ে আবদ্ধ। এই বিদ্যাপ্রণালী যতই পাণ্ডিত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হোক, তা পর্যবসিত হল অতীতে প্রক্ষিপ্ত সমকালীন চেতনা ও প্রাসঙ্গিকতা থেকে শতহস্ত বিচ্ছিন্ন, ভাষায়ণের এক প্রবল এমনকী উৎকট তালিমে। আজ অবধি পাশ্চাত্য জগৎ তথা সারা বিশ্বের মানবিক শিক্ষায় এই ধারা বহুলাংশে অটুট। সার্বজনীন শিক্ষার কোনো আদর্শ সে যুগে ছিল না, কিন্তু তৎকালীন ইউরোপে স্কুলশিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল সন্দেহ নেই। তার প্রধান কারণ, সভ্যতার গতি ও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সর্বাঙ্গীণভাবে ভাষায়িত হবার ফলে, নিছক কায়িক শ্রমের উর্ধ্বে যে কোনো পেশায় কিছুটা ভাষাজ্ঞান অপরিহার্য হয়ে পড়ল। মধ্যযুগে রাজারাজড়াও কেউ কেউ ছিলেন নিরক্ষর; ১৬ শতকে কোনো মিস্ত্রির ছেলেও (মজুরের নয় অবশ্য) ভাবতে শিখল লেখাপড়া জেনে উন্নতি করার কথা— যেমন করেছিলেন মার্লো বা শেক্সপিয়র। ভাষাভিত্তিক শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে ভাষায়িত মনন ও সমাজপ্রক্রিয়ায় চাহিদাটা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত— যেমন যুক্ত ছাপাখানার আবিষ্কার ও অগ্রগতি। এই বর্ধিষ্ণু শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যের রসদ জোগানো সম্ভব হল ছাপাখানার দৌলতে। বিনিময়ে সেই ছাত্রের দল শিক্ষাকালে ও পরবর্তী জীবনে ক্রেতা ও পৃষ্ঠপোষক হয়ে ছাপাখানার সমৃদ্ধি নিশ্চিত করল।

বলার অপেক্ষা রাখে না, বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তক রচনা ও মুদ্রণের কর্মকাণ্ড হুবহু এই ছকের আদলে। আবার হুবহু নয়-ও, কারণ বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি শুধু সংস্কৃত বিদ্যার উপর আবদ্ধ ছিল না। বাংলা শিক্ষার সোপানও তিনি রচনা করেছেন, বা অন্তত পরিপাটি করে বাঁধিয়ে দিয়েছেন; এবং সেই পথ অনুসরণ করেছেন আরও বহু বঙ্গীয় হিউমানিস্ট পণ্ডিত। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের 'শিশুশিক্ষা' ইত্যাদি এই ধারার বাহক।

বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাশিক্ষা নিয়ে এই উৎসাহের নজির ইউরোপীয় রেনেসাঁসে পণ্ডিতমহলে পাওয়া যাবে না। আরও বিশেষভাবে পাওয়া যাবে না শিশুপাঠ্য রসসাহিত্যের চর্চা। নন্তবাবু ও শ্বেতপরির দল রেনেসাঁস নয়, ভিক্টোরীয় যুগের বাসিন্দা; তাদের দেশিকরণ জ্ঞানেন্দ্রমোহনের আগেই শুরু হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের এবং উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারবর্গকে বাদ দিলেও যোগীন্দ্রনাথ সরকার, যোগীন্দ্রনাথ বসু, কিছু পরে দক্ষিণারঞ্জন

মিত্র মজুমদার প্রভৃতি অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে এই শিশুসাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন, যার তুলনা কেবল উৎকর্ষ নয়, পরিমাণের বিচারেই অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় মিলবে না। দীনেশচন্দ্র সেন যে বেশ কয়েকটি শিশুপাঠ্য গল্পের বই লিখে গেছেন, তার খবর আজ কতজন রাখে?

আরও গুরুতর কথা, কতিপয় স্বপ্নদর্শী ছাড়া যেমন ১৬ তেমন ১৯ শতকেও কেউ সার্বজনীন শিক্ষার কথা ভাবেনি। তবে শিক্ষা ব্যাপকতর করা, সমাজের নিম্ন কোটিতে ও মেয়েদের মধ্যে তার বিস্তারের মূল নীতিগুলি ১৯ শতকের বাংলায় কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ব্যাপক কর্মসূচি রূপায়ণে প্রাচীন ভাষার বদলে মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম এবং— ভাষায়িত সামাজিক কর্মসূচির নিরিখে— শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯ শতকের বাংলায় যা ঘটল, এক্ষেত্রে তা নিছক পাশ্চাত্য ধারার প্রতিফলন নয়। ঐতিহাসিকেরা যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণসহ দেখিয়েছেন, শিক্ষা, সমাজসংস্কার ও নারীর বিকাশের যে পথ ১৯ শতকের বাংলায় খুলে গেল, তা একান্ত এই যুগের এই দেশের নিজস্ব। (শীঘ্রই অবশ্য ভারতের অন্য কয়েকটি প্রদেশে অনুরূপ বিকাশ ঘটল, আখেরে হয়তো বাংলার চেয়ে বেশি সফলভাবে— যেমন সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে।)

এর একটা কারণ নিশ্চয় এই, যে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের তুলনায় ১৯ শতকের বাংলাকে যে আগন্তুক সভ্যতার মোকাবিলা করতে হল তা কালের বিচারে আরও নিকট হলেও ভৌগোলিক অর্থে অনেক সুদূর এবং আকার-চরিত্রে মৌলিকভাবে পৃথক, গ্রহীতা সভ্যতার সঙ্গে বলতে গেলে সম্পর্কহীন। (যে সম্পর্কটা স্বীকৃত সেটা বহু প্রাচীন আর্যসভ্যতার ভিত্তিতে, অতএব অন্য অর্থে দুর্গম।) এই দুই সভ্যতার মুখোমুখি হওয়াটা কোনো জ্ঞানলব্ধ মননের মঞ্চে নয়, নয় কোনো লুপ্ত যুগের সঙ্গে বর্তমানের স্বাধীন অন্বয়ে— তার বদলে প্রবলভাবে বিদ্যমান ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে আর্থসামাজিক তাগিদে তা বিচিত্র সক্রিয় রূপ নিয়েছে। এই ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিটা অবশ্যই বাধা হিসাবে কাজ করেছে, এমনকী নবজাগরণের অগ্রগতির রাশ টেনেছে বলেই ঐতিহাসিকদের সাধারণ মত। সুশোভন সরকার যেমন বলেছেন : 'The 'Ranaissance' in Bengal lacked the tremendous sweep and vital energy of the many-sided upsurge in the midst of which was shaped in European stereotype. Our movement had to function within the strait-jacket of a foreign semicolonial regime. ['semi-colonial' কেন?] ... [it] had to lean heavily in its first manifestations on an alien conquering world.'[৫১]

কিন্তু একই সঙ্গে এই প্রতিকূলতা বঙ্গসংস্কৃতিতে একটা একান্ত নতুন মাত্রাদান করেছে, নতুন চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে নতুন সমাধানে উদ্বুদ্ধ করেছে, এটাও হয়তো সমান সত্য।

এই অমিলের মধ্যেও কিন্তু একটা মিল আছে। আগেই বলেছি, রেনেসাঁসের ভাষা-সচেতনতার ফলে, এবং ছাপাখানার ব্যবহারিক তাগিদে, ইউরোপীয় ভাষার সংস্কার ও

বিস্তারের চিত্র অনেকটা বর্তমান রূপ নিল। এই বর্ণনায় আরেকটা মাত্রা জুড়ে দেওয়া যায় : এই পথে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অনুপ্রবেশ ঘটল ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে। ইউরোপীয় মুদ্রণের এক বিখ্যাত ইতিহাসে এলিজাবেথ আইজেনস্টাইন বলেছেন : 'Studies of dynasties consolidation and/or of nationalism might well devote more space to the advent of printing. ... The duplication of vernacular primers and translations contributed in other ways to nationalism. A 'mother's tongue' learned 'naturally' at home would be reinforced by inculcation of a homogenized print-made language mastered while still young when learning to read. ...Particularly after grammar schools gave primary instruction in reading by using vernacular instead of Latin readers, linguistic 'roots and rootedness in one's homeland would be entangled.'[৫২]

বাংলাভাষা-পরিচয়-এর গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ ভাষাকে মূলত উপস্থাপন করছেন জ্ঞান বা বোধের নিয়ন্ত্রক হিসাবে নয়, মানবিক ও সামাজিক চেতনার ভিত্তি হিসাবে : ভাষা প্রথমত মনুষ্যজাতিকে এক করে আর তার ভিতরে এক করে এক-এক জাতি বা গোষ্ঠীকে। জ্যোতিষ্কের যেমন দীপ্তির তারতম্য আছে, মানবলোকেও তাই। কোথাও ভাষার উজ্জ্বলতা আছে, কোথাও নেই। এই প্রকাশবান নানা জাতির মানুষ ইতিহাসের আকাশে আলোক বিকীর্ণ করে আছে। আবার কাদেরও বা আলো নিবে গিয়েছে, আজ তাদের ভাষা লুপ্ত।

জাতিক সত্তার সঙ্গে সঙ্গে এই-যে ভাষা অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে এ এতই আমাদের অন্তরঙ্গ যে, এ আমাদের বিস্মিত করে না...[৫৩]

এটা ১৯৩৮-এ রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের রচনা। কিন্তু ১৯০৫ থেকে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের যে ধারা বাংলায় প্রবল, ১৯ শতকে তার সূত্রপাত আমরা খুঁজতেই পারি।

১৫ বা ১৬ শতকে প্রাচীন গ্রিক-রোমক সভ্যতার কোনো অস্তিত্ব ছিল না; রেনেসাঁসের মানুষ তাকে নিজের মতো করে গড়েপিটে নিয়েছে। বঙ্গীয় নবজাগরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে জাগ্রত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিপক্ষের উপর উপস্থিতির প্রেক্ষাপটে। সেই প্রতিপক্ষের মোকাবিলায়, তাকে আত্মস্থ ও রূপান্তরিত করে নীলকণ্ঠের মতো তার অবদানকে ধারণ করা, সম্ভব হয়েছিল একটা বিশেষ বিদ্যাচর্চা ও মননের ধারার উদ্ভাবনে। এই ধারাটার কতকগুলি খুব গভীর, খুব মৌলিক সাদৃশ্য আছে সেই প্রতিপক্ষের তিনশ বছর আগে এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায়। এভাবে শাসিত ও শাসক সমাজের মধ্যে যে বোধনির্যাসের সাযুজ্য ঘটল— ইংরেজিতে বলতে পারি epistemic affinity— তার সুদূরপ্রসারী ফল শুধু ঔপনিবেশিক যুগে নয়, উত্তরকালের ইতিহাসেও রূপায়িত হয়ে চলেছে।

প্রত্যেক যুগের নিজস্ব বয়ান (discourse) থাকে। যুগে-যুগে তৈরি হয় চিন্তা ও

জ্ঞানচর্চার ভিন্ন-ভিন্ন বয়ান, রূপান্তরিত হয় একটির থেকে আরেকটিতে, বিনিময় ও হস্তান্তর ঘটে তাদের উপকরণে। কিন্তু মিশেল ফুকোর কথায়, বয়ানের এই অশেষ বিবর্তনের পিছনে লক্ষিত হয় বয়ান গঠন (discursive formation)-এর কিছু প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন বয়ানের কিছু সাধারণ মৌলিক রীতি বা ধর্ম নির্দেশ করে। এখানে আবার স্মর্তব্য দেরিদার পূর্বোক্ত 'লেখন'-তত্ত্বের আনুষঙ্গিক সেই 'সার্বিক ও মৌলিক সম্ভাবনা'। এ প্রসঙ্গে ফুকোর বিশ্লেষণ বিস্তারে উল্লেখ করতে হয় :

> [বয়ানের] গঠনপ্রণালী বলতে আমি বোঝাচ্ছি কিছু সংযোগ বা সম্পর্কের একটা জটিল সমষ্টি যা নির্দিষ্ট নিয়মের মতো কাজ করে।... অতএব কোনো গঠনপ্রণালীর বিশেষ সংজ্ঞা নির্ধারণ করার অর্থ হল, কোনো বয়ান (discourse) কিংবা একগুচ্ছ উক্তি বা বিবরণ (statement)-কে একটি নিয়মসিদ্ধ প্রথা হিসাবে অভিহিত করা। কোনো বয়ানপ্রথা (discursive practice)-র নিয়মসমষ্টি এই যে গঠনপ্রণালী, তা কালাতীত নয়। এতে কোনো কালানুক্রমিক উক্তিপরম্পরার সব সম্ভাব্য উপাদানকে এমন কোনো একটি উৎসবিন্দুতে সন্নিহিত করা হয় না যা একাধারে আদি, উৎপত্তি, ভিত্তি ও স্বতঃসিদ্ধ নীতির সমাহার, যা অবলম্বন করে বাস্তব ইতিহাসের ঘটনা অমোঘভাবে উন্মোচিত হতে থাকে মাত্র। এই প্রণালী কেবল একটা বিধি ছকে দেয়, একমাত্র যার প্রক্রিয়াতেই কোনো বস্তুর রূপান্তর ঘটতে পারে; বা কোনো নতুন ভাষ্যবিবরণ উৎপন্ন হতে পারে; বা কোনো বোধ বা চিন্তা গড়ে উঠতে পারে— হয় উপস্থিত ভাবের রূপান্তরণে নয় অন্যত্র থেকে গৃহীত হয়ে। এমন বিধিও এই প্রণালী ছকে দেয়, একমাত্র যার প্রক্রিয়ায় অন্য কোনো বয়ানের পরিবর্তন উপস্থিত কোনো বয়ানে অনুলিখিত করা যায়— যার ফলে গড়ে ওঠে এক নতুন মননবস্তু, উদ্ভাবন হয় মননের এক নতুন কৌশল, পুরোনোর স্থান অধিকার করে কোনো নতুন উচ্চারণ বা নতুন ভাব। সুতরাং একটি বয়ানের গঠিত রূপ এমন কোনো আকৃতির ভূমিকা নেয় না যা সময়ের গতি রুদ্ধ করে দশক বা শতককাল জমাট বেঁধে দেয়। বরং তা নির্দেশ করে যে-কোনো কালাশ্রয়ী প্রক্রিয়ার নিয়মসিদ্ধ পর্যাবৃত্তি; তুলে ধরে কোনো একটি বয়ানপ্রক্রিয়ার ঘটনাক্রমের সঙ্গে অন্য ঘটনা, প্রসঙ্গান্তর, পরিবর্তন বা প্রক্রিয়ার ক্রমের পারস্পরিক সংজ্ঞানির্ধারণের নীতি। বয়ানগঠন কোনো কালাতীত গঠন বা প্রকরণ নয়, কতকগুলি কালাশ্রয়ী পরম্পরার মধ্যে মিলের রূপরেখা।[৫৪]

অর্থাৎ এই বয়ানের রূপায়ণ কোনো অমোঘ অপরিবর্তনীয় গঠন নয়, নয় কোনো বাহ্য আরোপিত শর্ত। মানবসভ্যতার মননের উদ্বর্তনে কিছু ধারা বা প্রক্রিয়া খুব সাধারণভাবে পৌনঃপুনিক প্রকাশ পায়, একটি প্রকাশ অবশ্যই পরবর্তীকে প্রভাবিত করে ও পরবর্তীর দ্বারা ব্যাখ্যায়িত হয়। এভাবেই সভ্যতার বিভিন্ন উন্মেষের মধ্যে সংযোগ

ও বিনিময় ঘটে, একটা সার্বিক সংহতির সম্ভাবনাও হয়তো ফুটে ওঠে। ফুকো এত কথা বলেননি, তাঁর চিন্তার এই নিহিত ইঙ্গিতগুলি হয়তো সর্বদা তাঁর সোচ্চার স্বীকৃত তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে এই ইঙ্গিতগুলি অনুসরণ করলে ইতিহাসের কিছু চিত্র আমাদের চোখে আরও স্পষ্ট হতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে এই আলোচনা।

উল্লেখপঞ্জি

১ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান,* ২য় সং, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৮৬/১৯৯৪, ১ম শিরোনামপত্র। পরবর্তী সব উদ্ধৃতি ১ম খণ্ড থেকে; পৃষ্ঠাসংখ্যা উদ্ধৃতির শেষে উল্লেখিত আছে।

২. Erwin Panofsky. *Renaissance and Renascences in Western Art.* হার্পার অ্যান্ড রো, নিউইয়র্ক, ১৯৬০/১৯৭২ ২য় পরিচ্ছেদ।

৩. Sukanta Chaudhuri. 'The Rebirth of Time' : Sukanta Chaudhuri (স) *Renaissance Essays for Kitty Scoular Datta.* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লি, ১৯৯৫, পৃ. ২৭-২৯।

৪. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, *ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,

৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', *বঙ্কিম রচনাবলী,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২য় খণ্ড, ১৩৬১/১৩৭১, পৃ. ৩৩৯।

৬. 'বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ . অনুষ্ঠানপত্র', রবীন্দ্র গুপ্ত (স), *বঙ্গদর্শন : নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ,* চারুপ্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ১৫৭-১৬৬।

৭. যোগীন্দ্রনাথ বসু, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,* চক্রবর্তী চ্যাটার্জী, কলকাতা, ১৯২৫, পৃ. ১৬১ (পাদটীকা)।

৮. 'Bengali Literature'. *Bankim Rachanavali.* ৩য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৬৯/১৯৯৮, পৃ. ১২৪। প্রবন্ধটি বঙ্কিমের রচনা কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকতে পারে।

৯. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', *রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র,* গ্রন্থমেলা, কলকাতা, ১৩৮২, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৩।

১০. David Kopf. *British Orientalism and the Bengal Renaissance.* ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৬৯।

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা', *বলাকা* ২৯।

১২. *বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ,* পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা, ১৯৭২, ১ম খণ্ড, পরিশিষ্ট পৃ. ৫৯।

১৩. James Bowen. *A History of Western Education.* vol. 2 মেথুয়েন, লন্ডন, ১৯৭৩, পৃ. ২২২।

১৪. গোপালচন্দ্র রায়, 'বাংলা বইয়ের ব্যবসা', চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (স), *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৩৫৬।

১৫. Neil Rhodes & Jonathan Sawday. *The Renaissance Computer,* রাউলেজ, লন্ডন, ২০০০ পৃ. ৯। আলোচিত অংশটির সূত্র The Faerie Queene II. ix. 57.

১৬. William J. Connell (স), *Renaissance Essays II* (ইউনিভার্সিটি অভ রচেস্টার প্রেস, রচেস্টার, ১৯৯৩) সংকলনের দুটি প্রবন্ধ : John Monfasani. 'Was Lorenzo Valla an Ordinaary Language Philosopher?' (পৃ ৮৬-১০০) ও Richard Waswo. 'Motives of Misreading' (পৃ. ১০১-৯)।

১৭. Richard Mulcaster. *The First Part of the Elementarie,* লন্ডন, ১৫৮২ (প্রতিরূপ সংস্করণ, স্কোলার প্রেস মেনস্টন, ১৯৭০), পৃ. ১৬৭-৮ (বানান আধুনিকীকৃত)।

১৮. William Camden. Remains Concerning Britain. ১৬০৫ : দ্র. W. F. Bolton (স) *The English Language* ১ম খণ্ড, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেমব্রিজ, ১৯৬৬, পৃ. ২৩।

১৯. Jacques Derrida, *Of Grammatology.* অনুবাদ Gayatri Chakravorty Spivak জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি প্রেস, বল্টিমোর, ১৯৭৪/১৯৭৬, পৃ. ৮।

২০. ওই পৃ. ১৪-১৯, ৫৫-৬৫।

২১. ওই পৃ. ৯২-৩ (ইংরেজি অনুবাদ থেকে এই প্রবন্ধকারের বাংলা অনুবাদ)। ইংরেজি অনুবাদ নিম্নরূপ :

The fact that access to the written sign assures the sacred power of keeping existence opcretive within the trace and of knowing the general structure of the universe: that all clergies. exercising political power or not. were constituted at the same time as writing and by the disposition of graphic power: that strategy. ballistics. diplomacy. agriculture. fiscality. and penal law are linked in their history and in their structure to the constitution of writing: that the origin assigned to writing had been— according to the chains and mythemes— always analogous in the most diverse cultures and that it communicated in a complex but regulated manner with the distribution of political power as with familial srructure; that the possibility of capitalization and of politico-administrative organization had always passed through the hands of scribes...: that through discrepancies, inequalities of development, the play of permanencies.of delays.of diffusions. etc., the solidarity among ideological. religious. scientific-technical systems. and the systems of writing which were therefore more and other than 'means of communication' or vehicles of the signified. remains indestructible: that the very sense of power and effectiveness in general. which could appear as such. as meaning and mastery (by idealization), only with so-called 'symbolic' power. was always linked with the disposition of writing: that economy. monetary or pre-monetary, and graphic calculation were ??originary. that ther coul be no law without the possibility of trace...., all this refers to a common and radical possibility that no determined science. no abstract discipline. can think as such.

২২. অমলেশ ত্রিপাঠী, *ইতালীর র‍্যানেশাঁস বাঙালীর সংস্কৃতি*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪/১৯৯৬, পৃ. ৮৭, ৫০-৫১, ১১৯।

২৩. Michael Baxandall *Giotto and the Orators*, ক্ল্যারেন্ডন প্রেস, অক্সফোর্ড, ১৯৭১। আর Carroll W. Westfall 'Painting and the Liberal Arts: Alberti's View'. *Renaissance Essays II* (পূর্বনির্দিষ্ট), পৃ. ১৩০-৪৯।

২৪. দ্র. Sarah Stever Gravelle. 'The Latin-Vernacular Question and Humanist Theory of Language and Culture'. *Renaissance Essays II* (পূর্বনির্দিষ্ট), পৃ. ১১৬।

২৫. উদাহরণ 'But if... you promise yourself a true understanding of theology without a knowledge of languages and especially of that language in which the majority of the Divine Writings have been handed down. you have strayed far off the path.' (মার্টিন ডোর্পকে পত্র, অনুবাদ J. W. Bush ও M. Feeney : Desiderius Erasmus. *Christian Humanism and the Reformation*, স John C. Olin হার্পার অ্যান্ড রো, নিউইয়র্ক, ১৯৬৫, পৃ. ৮০-৮১। এরাসমুসের নানা লেখায় অনুরূপ উক্তি আছে।

২৬. Gravelle (পূর্বনির্দিষ্ট), পৃ. ১১৩।

২৭. S. H. Steinberg. *Five Hundred Years of Printing* পেঙ্গুইন বুক্স, হার্মন্ডস্ওয়ার্থ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃ. ১২০।

২৮. Mulcaster (পূর্বনির্দিষ্ট), পৃ. ৫৩।

২৯. 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', *রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র* (পূর্বনির্দিষ্ট), ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৩।

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলা ব্যাকরণ', *শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, বিশ্বভারতী, ১৩৪৬, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৬৯।

৩১. Mulcaster (পূর্বনির্দিষ্ট), পৃ. ৯১।

৩২. ওই, পৃ. ৭৭।

৩৩. Joachim du Bellay, *Defense et illustration de la langue Francaise.* বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ১ম ভাগ, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

৩৪. 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', *রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র* (পূর্বনির্দিষ্ট), ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫।

৩৫. রামমোহন রায়, *গৌড়ীয় ব্যাকরণ*, 'ভূমিকা', : *রামমোহন রচনাবলী*, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ৩৬৭।

৩৬. 'বীম্সের বাংলা ব্যাকরণ', *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (পূর্বনির্দিষ্ট), ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৫১।

৩৭. 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', *রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র* (পূর্বনির্দিষ্ট), ১ম খণ্ড, পৃ. ১২২।

৩৮. Camden (পূর্বনির্দিষ্ট), পৃ. ২৯। বানান আধুনিকীকৃত।

৩৯. 'বাঙ্গালা ভাষা', *বঙ্কিম রচনাবলী* (পূর্বনির্দিষ্ট), পৃ. ৩৭৩।

৪০. *বাংলাভাষা-পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (পূর্বনির্দিষ্ট), ২৬শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৩-৪।

৪১. ওই, পৃ. ৩৯৪।

৪২. ওই।

৪৩. Mulcaster (পূর্বনির্দিষ্ট), পৃ. ৮০।

৪৪. *বাংলাভাষা-পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (পূর্বনির্দিষ্ট), ২৬শ খণ্ড পৃ. ৩৯৭।

৪৫. ওই।

৪৬. Lisa Jardine, *Erasmus, Man of Letters*, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, প্রিন্সটন,

১৯৯৩, পৃ. ৪৩-৪।

৪৭. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিদ্যাসাগর,* ইন্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ১৯১৪, পৃ. ২২৮-৯।

৪৮. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় (পূর্বনির্দিষ্ট), পৃ. ১৬৭।

৪৯. Sumit Sarkar. *Writing Social History,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লি, ১৯৯৭/১৯৯৮, পৃ. ২৩৩।

৫০. যোগীন্দ্রনাথ বসু (পূর্বনির্দিষ্ট), পৃ. ১৬৪ (পাদটীকা)।

৫১. Susobhan Sarkar. 'Conflict within the Bengal Renaissance'. On the Bengal Renaissance, প্যাপিরাস কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ৬৯।

৫২. Elizabeth L. Eisenstein. *The Printing Press as an Agent of Change,* কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেমব্রিজ ১৯৭৯, পৃ. ১১৭-১৮।

৫৩. *বাংলাভাষা-পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (পূর্বনির্দিষ্ট), ২৬শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৫।

৫৪. Michel Foucault, *The Archeology of Knowledge,* অনুবাদ S. M. Sheridan Smith প্যানথেয়ন বুক্স, নিউইয়র্ক ১৯৭২, পৃ. ৭৪। ইংরেজি অনুবাদ থেকে এই প্রবন্ধকারের বাংলা অনুবাদ। ইংরেজি অনুবাদ নিম্নরূপ :

By a system of formation, then, I mean a complex group of relations that function as a rule : define a system of formation in its specific individuality is therefore to characterize a discourse on a group of statements by the regularity of a practice.

As a group of rules for a discursive practice, the system, of formation is not a stranger to time. It does not concentrate everything that may appear through an age-old series of statements into an initial point that is, at the same time, beginning, origin, foundation, system of axioms, and on the basis of which the events of real history have merely to unfold in a quite necessary way. What it outlines is the system of rules that must be put into operation if such and such an object is to be transformed, such and such a new enumeration appear, such and such a concept be developed, whether metamorphosed or imported...; and what it also outlines is the system of rules that has to be put into operation if a change in other discourses... is to be transcribed within a given discourse, thus constituting a new object, giving rise to a new strategy, giving place to new enunciations or new concepts. A discursive formation, then, does not play the role of a figure that arrests time and freezes it for decades and centuries; it determines a regularity proper to temporal processes; it presents the principle of articulation between a series of discursive events and other series of events, translations, mutations, and processes. It is not an atemporal form, but a schema of correspondence between several temporal series.

গ্রন্থ, পাঠ, শিল্পকর্ম : রবীন্দ্রনাথ ও রচনার দৃশ্যপট

স্বপন চক্রবর্তী

বই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কি কখনোই পুরোপুরি স্বস্তিতে ছিলেন? বলা বাহুল্য, এখানে আমরা বইয়ের, বিশেষ করে ছাপা বইয়ের, বস্তুরূপের কথাই ভাবছি। প্রশ্নটি তুললেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষজ্ঞরা টাইপ, মুদ্রণ, অলংকরণ ও বাঁধাই সম্পর্কে তাঁর নিরন্তর মনোযোগের কথা পাড়বেন। ছাপা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ খুবই খুঁতখুঁতে ছিলেন। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের প্রথম প্রকাশনা *পূরবী* বের হয়। সজনীকান্ত দাস বলছেন যে, তাতে ছিল অজস্র ভুল এবং কবি রেগেমেগে সব কপি আগুনে পুড়িয়ে ফেলে নতুন করে ছাপার হুকুম দেন। সজনীকান্তের এই বৃত্তান্ত হয়তো ঈষৎ রং চড়ানো। প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন যে, ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্সে ছাপা সংস্করণটিতে সেরকম বলবার মতো ভুল নেই, তা ছাড়া ১৩৩৮-এর আগে *পূরবী*-র দ্বিতীয় সংস্করণ হয়নি। কিন্তু সজনীকান্ত কবির যে-প্রতিক্রিয়ার গল্প বলেছেন তা তেমন অবিশ্বাস্য নয়। সজনীকান্ত বাড়িয়ে বলেছেন, এরকম আভাস দেবার পরে পরেই রবিজীবনীকার উদ্ধৃত করছেন একটি চিঠি, লেখক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, প্রাপক শান্তা চট্টোপাধ্যায়। ১৩৩৯বঙ্গাব্দের ৮ অগ্রহায়ণে লেখা এই পত্রে প্রশান্তচন্দ্র জানাচ্ছেন কেন সে বছর প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের চিনের বক্তৃতাবলি বিশ্বভারতী প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় :

> বইখানার আর কোনও দোষ নেই— ছাপার ভুলও খুব সামান্য, শুধু margin কম আছে, আর পৃষ্ঠার অঙ্কটায় bracket দিয়েছে— (27) এইরকম— এইজন্য দেখতে একটু খারাপ হয়েছে। কবি তা'তে এত দুঃখিত হলেন যে আমরা সমস্ত editionটা suppress করতে বাধ্য হয়েছি। কবি তারপর আবার অল্পস্বল্প বদ্‌লিয়ে mss পাঠিয়েছেন, এখন সমস্ত বইখানা reprint করাচ্ছি।

শুধু ছাপার ভুল নয়, মার্জিনের মাপ ও পৃষ্ঠাসংখ্যার সংস্থান নিয়েও রবীন্দ্রনাথ খুঁতখুঁত করতেন, এটা প্রশান্তচন্দ্রের চিঠিতেই পরিষ্কার। একইরকম উৎকণ্ঠা ছিল তাঁর অলংকার নিয়েও। ১৩১৬ সনে ১২ আশ্বিন তিনি ছাপা *চয়নিকা* হাতে পেয়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন তাঁর অসন্তোষের কথা :

> চয়নিকা পেয়েছি। ছাপা ভাল, কাগজ ভাল, বাঁধাই ভাল। ...কিন্তু ছবি ভাল হয়নি সে কথা স্বীকার করতেই হবে। ...নন্দলালের পটে যেরকম দেখেছিলুম বইয়েতে তার অনুরূপ রস পেলুম না বরঞ্চ একটু খারাপই লাগল।

বইয়ের আকৃতি, প্রচ্ছদ, হরফ ইত্যাদির দিকেও যে কবির সযত্ন মনোযোগ ছিল সে কথা অনেকেই জানেন। ১৩১৫ সনের আশ্বিন মাসে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেন *শারদোৎসব* নাটক। রেশমে বাঁধানো বইটির মলাটে ছিল বলাকা ও কাশগুচ্ছের ছবি। কার্তিক মাসে *ভারতী* পত্রিকায় বইয়ের 'বাহ্য চাকচিক্য ও মুদ্রণের পরিপাট্য' সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য করা হয়। বইটি 'শোভন রূপে ছেপে প্রকাশ করবার জন্য' চারুচন্দ্রকে শান্তিনিকেতনে ডেকে পাঠান রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। কবির অনুরোধ রাখতে চারুচন্দ্র যে-উদ্যোগ নিলেন তা তাঁর নিজের জবানিতেই শোনা যাক : 'ইহাকে লোচন-রোচন করিবার জন্য ইহার আকার করি একটু নূতন ধরনের— প্রাচীন পুঁথির আকারে এবং আমি নিজে গিয়া অনুরোধ করিয়া প্রসিদ্ধ চিত্রকর যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়া ইহার প্রচ্ছদের ও মুখপাতের জন্য দুইখানি চিত্র অঙ্কিত করাইয়া লই।'

এভাবে অনেক উদাহরণের কথাই ভাবা চলে। জার্মানিতে ফ্যাকসিমিলি ছাপার কৌশল দেখে তাঁর উৎসাহ ও সেই উৎসাহের জেরে *লেখন*-এর পরিকল্পনা, মুদ্রণ সংস্কৃতির সঙ্গে তাল রেখে হরফ ও বানান সংস্কারে তাঁর উদ্যম, বিশ্বভারতীর প্রকাশনায় বাংলায় সর্বপ্রথম হাউস স্টাইল প্রবর্তনের চেষ্টা, ছোটোদের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে তাঁর মৌলিক ভাবনা, ছবিকে ঘিরে বইয়ের টেক্সট নির্মাণ— যেমন তিনি *সে* রচনার সময় করেছিলেন, এবং সর্বোপরি কবিতা ছাপার সময় পৃষ্ঠায় হরফ, ফাঁক, মার্জিন ও ইনডেন্টের অভিনব বিন্যাস— এ সমস্তের মধ্যেই মুদ্রণের প্রযুক্তি ও ছাপা বইয়ের বহিরঙ্গের সৃজনক্ষম সম্ভাবনাগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিরন্তর অনুশীলনের সাক্ষ্য খুব স্পষ্ট। আমাদের সংস্কৃতির আরও অন্য অনেক কিছুর মতো ছাপা বই সম্পর্কে বাঙালির রুচিবোধ ব্যাপক অর্থে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী। দূরস্থিত কৃতসংযম রূপের অন্তরে তিনি চারিয়ে দিতে জানতেন এক ধরনের ইন্দ্রিয়-সংবেদী শ্রী। 'লোচন-রোচন' ছাপা বইয়ের মধ্যে বাঙালি পাঠক আজও সেই মিতা চারের বিলাস খোঁজেন।

এর সঙ্গে অবশ্যই যোগ করতে হবে শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর কর্মকাণ্ডে মুদ্রণকে সাঙ্গীকৃত করার জন্যে তাঁর চেষ্টা। ১৩২৩ সনে নেব্রাসকার ওমাহা শহর সফরের সময় তিনি বার্নহার্ট ব্রাদার্স অ্যান্ড স্পিন্ডলার কোম্পানিকে বরাত দেন টাইপ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি শান্তিনিকেতন পাঠাতে। ৫৪০ ডলার দামের সেই সরঞ্জাম যুদ্ধের কারণে পৌঁছোতে কিছু দেরি হয়েছিল। এর আগে লিংকনে তিনি একটি মুদ্রণযন্ত্র উপহার পান, তার জন্যেই ওই সরঞ্জাম কেনা। ছাপার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করার জন্য ১৩২৫ সনের আষাঢ় মাসে শান্তিনিকেতন আসেন সুকুমার রায়। ওই বছর আশ্বিন মাসেই শান্তিনিকেতন প্রেসের ছাপা প্রথম বই *গীতপঞ্চাশিকা* প্রকাশ পায়। সাঁওতাল বিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে কলকাতা পাঠানো হয় বাঁধাইয়ের কাজ শিখতে। আশ্বিন মাসের শেষ দিকে ২৫০০ টাকা দিয়ে আরও একটি ছাপার মেশিন কেনা হয়েছিল। এসব কাজের উদ্দেশ্য হয়তো ছিল বিদ্যালয়ের খরচ কমানো এবং রোজগার বাড়ানো, কিন্তু

উদ্দেশ্যসাধন না হলেও রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ কমেনি। ১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণ মাসে শান্তিনিকেতন প্রেসে ছাপা তাঁর *দ্য ফিউজিটিভ* বইটির একটি কপি পিয়ারসনকে পাঠান তিনি। সঙ্গের চিঠিটিতে তিনি ঠাট্টা করে লেখেন :

> The book has been printed in that press which we got from Lincoln. It is too small for regular printing business, so, like that gift of a diamond stud to a man whose shirt was of a poor quality, it has necessitated further expenditure, far exceeding its own value...

পরে এ কথাও জুড়ে দেন যে, বইয়ে ছাপার ভুলের সংখ্যা দেখে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয় বইটা নিমাই, বিষ্ণু এবং আরও কয়েকজন আশ্রমের ছাত্র তথা কম্পোজিটরের কীর্তি, শান্তিনিকেতন প্রেসের খাঁটি জিনিস।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষদিকে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত তাঁর যে-কোনো একটি বই হাতে নিলে বাঙালির আধুনিক গ্রন্থরুচির নির্মাণে তাঁর অমোঘ উপস্থিতিটি আজও ধরা পড়ে। অথচ মুদ্রণ ও মুদ্রিত গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলি সংকলিত করলে এই বোধ যেন কিছুটা ফিকে হয়ে আসে। কোনো কোনো সময় মনে হয় বই যেন তাঁর চোখে জড় অভ্যাসের উপলক্ষণ, স্বতঃস্ফূর্ত মনন ও সহজাত আনন্দের শত্রু। সবসময় হয়তো তিনি ছাপা বইয়ের কথা বলছেন না, হয়তো বলছেন হাতে-লেখা পুঁথির কথা। '...এই পাথরের প্রাচীর, এই বন্ধ দরজা, এই সব নানা রেখার গণ্ডি, এই স্তূপাকার পুঁথি, এই অহোরাত্র মন্ত্রপাঠের গুঞ্জনধ্বনি'—প্রতিবন্ধকের এমন লক্ষ্যার্থক সূচিতে ছাপা বইও চলে আসতে পারে। *অচলায়তন* নাটকের কাহিনি এক অনির্দিষ্ট প্রাক্-আধুনিক কালে ফেলা হয়েছে বলেই আচার্যের দুঃস্বপ্নের সন্নিবেশে ছাপা বই নেই।

অচলায়তন বেরিয়েছিল ১৩১৮ সালের আশ্বিন মাসের *প্রবাসী*-তে। ১৩১৪ থেকে ১৩১৬— এই দু-বছর ধরে ওই পত্রিকাতেই ছাপা হয় *গোরা*। সেখানে ললিতা ও বিনয়ের মধ্যে এমন সংলাপ শুনি :

> ললিতা মাঝে মাঝে বলিত, "আপনি যেন বই পড়ে এসে কথা বলছেন, এমন করে বলেন কেন?"
>
> বিনয় উত্তর করিত, "আমি যে এত বয়স পর্যন্ত কেবল বই পড়েই এসেছি, সেই জন্য মনটা ছাপা বইয়ের মতো হয়ে গেছে।"

এই বাক্যালাপে কিছুটা তির্যকতা আছে। বিনয় ঠিক গ্রন্থরতির শিকার নয়, তার স্বীকারোক্তির সঙ্গে পঞ্চকের আক্ষেপ—'রাজ্যের পুঁথি পড়ে পড়ে গলা বুজে গিয়েছে প্রভু'— গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। কিন্তু লক্ষ করার মতো ব্যাপার হল বাঁধা বুলির আকর হিসেবে বিনয় যেটিকে শনাক্ত করে সেটি শুধু বই নয়, 'ছাপা বই'।

অন্যত্র মুদ্রণ ও মুদ্রিত বই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অস্বস্তি জানিয়েছেন আরও
।। ১৩৪১ সালের বৈশাখ মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 'গদ্যছন্দ'

নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন। তাতে তিনি ছাপার প্রযুক্তি, গ্রন্থ উৎপাদন ও পাঠাভ্যাসের সম্পর্ক নিয়ে কিছু কথা বলেন :

> একদিন ছিল যখন ছাপার অক্ষরের সাম্রাজ্যপত্তন হয়নি। যেমন কল-কারখানার আবির্ভাবে পণ্যবস্তুর ভূরি-উৎপাদন সম্ভবপর হল তেমনি লিখিত ও মুদ্রিত অক্ষরের প্রসাদে সাহিত্যে শব্দসংকোচের প্রয়োজন চলে গেছে।... সাবেক সাহিত্যের দুই বাহন, তার উচ্চৈঃশ্রবা আর তার ঐরাবত, তার শ্রুতি ও স্মৃতি; তারা নিয়েছে ছুটি। তাদের জায়গায় যে যান এখন চলল, তার নাম দেওয়া যেতে পারে লিখিতি। সে রেলগাড়ির মতো, তাতে কোনোটা যাত্রীর কামরা, কোনোটা মালের। কোনোটাতে বস্তুর পিণ্ড, সংবাদপুঞ্জ, কোনোটাতে সজীব যাত্রী অর্থাৎ রসসাহিত্য। তার অনেক চাকা, অনেক কক্ষ, একসঙ্গে মস্ত মস্ত চালান। স্থানের এই অসংকোচে গদ্যের ভুরিভোজ।

এর পর রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, ছাপাখানা আসার আগে শব্দের অতিব্যয়িতা বাধা পেত, আপন সাংগীতিক গতিবেগের স্মৃতি সচল রাখত ছন্দ, এবং 'সেদিন বাণীর ছন্দের সঙ্গে ভাবের ছন্দের অদ্বয়-বিবাহ অর্থাৎ মনোগেমি ছিল প্রচলিত।' আজ যে ভাষায় পদ্যছন্দের এক সতিন রয়েছে তার জন্যে রবীন্দ্রনাথ মুদ্রণোত্তর পাঠাভ্যাসকে দায়ী করেন :

> এখন বই-পড়াটা অনেকস্থলেই নিঃস্তব্ধ পড়া, কানের একান্ত শাসন তাই উপেক্ষিত হতে পারে। এই সুযোগেই আজকাল কাব্যশ্রেণীর রচনা অনেক স্থলে পদ্যছন্দের বিশেষ অধিকার এড়িয়ে ভাবচ্ছন্দের মুক্তি দাবি করছে।

কথাগুলির মধ্যে হয়তো বিশেষ অভিনবত্ব নেই, কিন্তু লেখকের অভিপ্রায় এখানেও খুব সরলভাবে ব্যক্ত হয়নি। প্রথমে মনে হচ্ছিল তিনি যেন মুদ্রণের প্রযুক্তিকে অভিযুক্ত করছেন, বাণী ও ভাবের বিচ্ছেদের ফলে ভাষা থেকে যেন অপূরণীয়ভাবে খোয়া গেছে কিছু। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার কানের একান্ত আধিপত্যের অবসানে এক নতুন মুক্তির সম্ভাবনা দেখছেন কবি, যে-মুক্তিকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁর ইংরেজি তরজমায়, *লিপিকা* গ্রন্থের কবিতায়, ১৩৪৬ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত 'গদ্যকাব্য' প্রবন্ধে।

মুদ্রণের প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কোনো নালিশ ছাড়াই রবীন্দ্রনাথ ফের এই ধরনের কথা বলেন কয়েক বছর বাদে, *বাংলাভাষা পরিচয়* (১৯৩৮) বইতে।

> একদা ছিল না ছাপাখানা, অক্ষরের ব্যবহার হয় ছিল না নয় ছিল অল্প। অথচ মানুষ যে-সব কথা সকলকে জানাবার যোগ্য মনে করেছে দলের প্রতি শ্রদ্ধায়, তাকে বেঁধে রাখতে চেয়েছে এবং চালিয়ে দিতে চেয়েছে পরস্পরের কাছে।

সামাজিক উপদেশ থেকে চাষবাসের নির্দেশিকা, লগ্নফল থেকে পৌরাণিক আখ্যান সবকিছুকেই স্থায়িত্বের খাতিরে ছন্দে বাঁধতে হয়েছে :

> ছন্দ তাদের রক্ষা করেছে যেন পেটিকার মধ্যে। সাহিত্যের প্রথম পর্বে ছন্দ মানুষের শুধু খেয়ালের নয়, প্রয়োজনের একটা বড়ো সৃষ্টি; আধুনিক কালে যেমন সৃষ্টি তার ছাপাখানা।

আপাতদৃষ্টিতে এখানে তেমন দ্বিধা নেই। তবু উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলি এবং সন্নিহিত অংশ পড়লে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেন বলতে চাইছেন ছন্দ সংস্কৃতির ধাত্রী হলে কী হবে, ছাপাখানা আসার পরই ছন্দ তার সত্যিকারের কাব্যিক লক্ষ্যে ফিরতে পেরেছে, সংবাদকে ঝুটো গয়না পরাবার দায় থেকে ছন্দ এর পর থেকেই মুক্ত।

তবে কি জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছে মুদ্রণ সম্পর্কে তাঁর সংশয় কাটিয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ? এরকম সরল ছকের কোনো বৃত্তান্ত রচনা বোধ হয় উচিত হবে না। ইংরেজি ১৯৩৯ সালের জুন মাসে তাঁর রচনাবলি প্রকাশ উপলক্ষে একটি ভূমিকা লেখেন তিনি। তাঁর রচনার কতটা বাঁচিয়ে রাখা উচিত, সংস্কৃতির নৌকোয় কোন ফসলটুকু তুলে দেওয়ার যোগ্য, তা বিবেচনা করতে গিয়ে তিনি আবারও তুললেন ছাপাখানার কথা :

> ইতিহাস সবই মনে রাখতে চায় কিন্তু সাহিত্য অনেক ভোলে। ছাপাখানা ঐতিহাসিকের সহায়। সাহিত্যের মধ্যে আছে বাছাই করার ধর্ম, ছাপাখানা তার প্রবল বাধা।

এর পর তিনি কবির সমগ্র সৃষ্টিকর্মের ক্ষেত্রটিকে তুলনা করলেন নীহারিকার সঙ্গে। তাতে সংহত আলোকপুঞ্জগুলি কাব্য, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানী ঝাপসা আলোর ছায়াপথটুকুও চান: 'ঐতিহাসিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী: বাষ্প, নক্ষত্র, ফাঁক কোনোটাকেই সে বাদ দিতে চায় না।' আদর্শ সংকলন যদি ছাপতে হয়, তবে তা সেরা লেখাগুলির তোড়া বেঁধে হবে না। তা হবে এমন যাতে কবির পূর্ণতায় উপনীত হওয়ার ইতিবৃত্ত ধরা থাকবে। এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়ে নিয়ে আসেন রেলগাড়ির উপমা :

> রেলগাড়িতে যেমন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। তাদের রূপের ও ব্যবহারের আদর্শ ঠিক এক নয় কিন্তু চাকায় চাকায় মিল আছে। একটা সাধারণ সমাপ্তির আদর্শ তারা সকলেই রক্ষা করেছে।

'গদ্যছন্দ' নামের প্রবন্ধটির চাইতে এখানে রেলগাড়ির ঐক্যাভাব সম্পর্কে কবির মন যেন একটু নরম, এবার অন্তত 'চাকায় চাকায় মিল আছে' বলে রেলগাড়িকে কিছু রেয়াত করা গেল। তবু সাহিত্যের সংসারের স্বাভাবিক গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে ছাপার কারিগরির একটা বৈরিতার সম্পর্কের আভাস রয়েই গেল। অতএব আশ্চর্য হই না দেখে যে, খানিক পরেই কবি স্মরণ করেন বিপিন পালের লেখা তাঁর গানের বিরূপ সমালোচনা। তাঁর সেই অপরিণত রচনা গীতসাহিত্যসভায় কলকে পাবে না, তবু সেগুলি রচনাবলিতে ছাপা হচ্ছে : 'ইতিহাসের রসদ জোগাবার কাজে ছাপাখানার আড়কাঠির হাতে সাহিত্যমহলে তাদের চালান দেওয়া হয়েছে।'

শেষ উদাহরণটি নিয়ে আমাদের সংশয় থাকতেই পারে। জীবনের শেষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনা-সংগ্রহের ভূমিকা লিখছেন। যে-ইতিহাস যৌথ সাংস্কৃতিক স্মৃতির সগোত্র নয়, সেই ইতিহাসেরই রায় সম্পর্কে তাঁর উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক। ছন্দ একরকম 'স্মৃতির ভাণ্ডারী', ছাপাখানা আরেক ধরনের। সেই ছাপাখানার হাতেই তাঁকে সঁপে দিতে হচ্ছে সৃষ্টির সঞ্চয়—

এইরকম একটা ট্র্যাজিক কৌতুকের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কবির তরফে এক ধরনের সাফাই গাওয়াও হতে পারে।

কিন্তু একে নেহাতই উপলক্ষের উপরোধ মনে করার সমস্যা আছে, কারণ তাঁর কবিতার পাঠকের কাছে প্রসঙ্গটি উটকো আমদানি বলে মনে হবে না। একই কথা তাঁর কোনো কোনো কবিতায় বলা হয়েছে, যেমন ১৯৩৫ সালের জুন মাসে লেখা 'অবর্জিত' কবিতাটিতে।

লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে,
সময় রাখি নি ওজন দেখিতে মেপে।
কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।
ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী,
এ অপরাধের জন্যে যে-জন দায়ী
তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে।
বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা,
বিদ্যানুরাগী বন্ধু হয়েছে নানা —
আবর্জনারে বর্জন করি যদি
চারি দিক হতে গর্জন করি উঠে,
"ঐতিহাসিক সূত্র দিবে কি টুটে,
যা ঘটেছে তারে রাখা চাই নিরবধি।'

ছাপাখানা আছে, ইতিহাসের দোহাই-পাড়া বিদ্যানুরাগী বন্ধুরা রয়েছেন। তবু কবি চেষ্টা করেছিলেন বোঝাতে যে, সৃষ্টির কাজে প্রকাশটাই আসল, 'ইতিহাসটারে গোপন করে সে রাখে'। এবং এই সুযোগে বর্জনের ইতিহাসটারও একটু আঁচ দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি :

বিশ্বকবির লেখা যত হয় ছাপা
প্রুফ্‌শিটে তার দশগুণ পড়ে চাপা,
নব এডিশনে নূতন করিয়া তুলে।
দাগি যাহা, যাঁহে বিকার, যাহাতে ক্ষতি,
মমতামাত্র নাহি তো তাহার প্রতি —
বাঁধা নাহি থাকে ভুলে আর নির্ভুলে।
সৃষ্টির কাজ লুপ্তির সাথে চলে,
ছাপাযন্ত্রের ষড়যন্ত্রের বলে
এ বিধান যদি পদে পদে পায় বাধা —
জীর্ণ ছিন্ন মলিনের সাথে গোঁজা
কৃপণপাড়ার রাশীকৃত নিয়ে বোঝা
সাহিত্য হবে শুধু কি ধোবার গাধা।

মুদ্রণের প্রযুক্তি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মৃদু নালিশ ছিল, হয়তো, কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থের বাহ্যরূপ সম্পর্কে তাঁর সংশয় ছিল আরও গভীর। অন্তত কিছু কিছু লেখা পড়ে সেরকমই মনে হতে পারে পাঠকের। ১২৯২ বঙ্গাব্দে সোলাপুরে থাকার সময় তরুণ কবি 'লাইব্রেরি' নামে একটি ছোটো গদ্যরচনা লেখেন। সেখানে গ্রন্থাগারকে প্রায় জেলখানার সঙ্গে তুলনা করেন : 'এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।' পাঠকের স্পর্শে বই প্রাণ পাবে নিশ্চয়ই, জেগে উঠবে নৈঃশব্দে সমর্পিত মহাকল্লোল, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক অতটা সরল নয়। বই বস্তুটি মানুষের এক আশ্চর্য উদ্‌ভাবনা, কিন্তু তার বন্দনায় লেখক বস্তুটির মৃতকল্প রূপের কথাই বলেন বেশি। প্রবাহ, শব্দ আর আলো একদিকে, অন্যদিকে স্থিরতা, মৌন আর কালো অক্ষর; এক প্রান্তে জীবন, অন্য প্রান্তে বই :

> বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে। কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে। অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

এমন বিড়ম্বিত স্তুতির অনুরণন আমরা শুনব রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের একেবারে শেষ পর্যায় পর্যন্ত। 'লাইব্রেরি' রচনাটি *বালক* পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার এক বছরের মধ্যেই বেরোয় *কড়ি ও কোমল*। সেখানে 'স্বপ্নরুদ্ধ' কবিতাটিতে নিজের নিষ্ফল স্বপ্নবিলাস নিয়ে বিলাপের জেরে পরোক্ষভাবে এসে পড়ে ছাপা বইয়ের প্রসঙ্গ :

> আমি গাঁথি আপনার চারি দিক ঘিরে
> সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
> মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
> দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।
> কেন আমি আপনার অন্তরালে থাকি।
> মুদ্রিত পাতার মাঝে কাঁদে অন্ধ আঁখি।

স্বপ্নরুদ্ধ কবি গ্রন্থরুদ্ধও বটে। 'মুদ্রিত পাতা'-র শ্লেষটির মধ্যে প্রায় অবান্তরভাবে এসে পড়ে ছাপার প্রসঙ্গ। বিশ্বপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্নতার বোধ, অবরোধ, অন্তরাল— এসব সংলগ্ন ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে 'লাইব্রেরি'-র দ্বিধা-বিড়ম্বিত গ্রন্থবন্দনার কথা মনে পড়ে যাবে আমাদের।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমেদাবাদের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা সময় কাটিয়েছিলেন ১২৮৫ বঙ্গাব্দে, তখন তার বয়স আঠারো। সত্যেন্দ্রনাথের শাহিবাগের বাসস্থান রবীন্দ্রচর্চায় বার বার আলোচিত। ওই বাড়ির লাইব্রেরির বর্ণনা আছে *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থে, প্রশান্তকুমার

পাল সংগত কারণেই মনে করেন এই গ্রন্থাগারের সান্নিধ্যই 'লাইব্রেরি' রচনাটির প্রেরণা। *জীবনস্মৃতি*-তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> একটি বড়ো ঘরের দেয়ালের খোপে খোপে মেজদাদার বইগুলি সাজানো ছিল। তাহার মধ্যে, বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা, অনেক ছবিওয়ালা টেনিসনের একখানি কাব্যগ্রন্থ ছিল। সেই গ্রন্থটিও তখন আমার পক্ষে এই রাজপ্রাসাদেরই মতো নীরব ছিল। আমি কেবল তাহার ছবিগুলির মধ্যে বারবার করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

সন্দেহ নেই, ঠিক পাঠকের হাতে পড়লে এই পুঞ্জীভূত নীরবতা ভাঙবে, মুখর হয়ে উঠবে কালো হরফ, প্রাণ ফিরে পাবে কাগজে মোড়া বই। সংবেদী পাঠকের ছোঁয়ায় বইয়ের বেঁচে ওঠার কথা ফিরে আসে অনেক বছর বাদেও, শেষের কবিতা উপন্যাসে লাবণ্যের পড়ার ঘরের বর্ণনায় :

> শেলফে, পড়বার টেবিলে ইংরেজি সাহিত্যের বই দেখলে; সে বইগুলো যেন বেঁচে উঠেছে। সব লাবণ্যের পড়া বই, তার আঙুলে পাতা-ওলটানো, তার দিনরাত্রির ভাবনা-লাগা, তার উৎসুক দৃষ্টির পথ-চলা, তার অন্যমনস্ক দিনে কোলের উপর পড়ে-থাকা বই।

বই যেন শাপমুক্তির অপেক্ষায় থাকা পাষাণ, আর গ্রন্থাগার শাহিবাগের প্রাসাদের মতোই এক নিঃসাড় পাষাণপুরী। পাঠকের স্পর্শ পেয়ে পাষাণ জেগে ওঠে বটে, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে, পাঠক কেবল শ্রোতা, সে কোনো দ্বিপাক্ষিক সংলাপের পূর্ণ অংশীদার নয়। মুদ্রণের সংস্কৃতির প্রারম্ভিক পর্বে শব্দকে মলাটবন্দী জড় লেখনে পর্যবসিত করা নিয়ে বেশ উৎকণ্ঠা ছিল ইয়োরোপে। সরাসরি সংলাপের জীবন্ত সান্নিধ্য থেকে, শব্দের নিরবধি স্রোত থেকে, বয়ানের খোলা বুনোট থেকে বিচ্ছিন্ন করে লেখনকে গ্রন্থের আপাত-সংহতির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলবে ছাপার প্রযুক্তি— এটাই ছিল ভয়। এর বিরুদ্ধে পাঠক্রিয়াকে এক দু-মুখো সংলাপ বলে কল্পনা করা হতে থাকে। এই সংলাপে সুবিধে হল অনির্দিষ্ট কালের অগণিত পাঠক অতীতের লেখকদের মুখোমুখি বসতে পারে, তর্ক চালাতে পারে মৃত কথকদের সঙ্গে। মাকিয়াভেল্লি, মনতেইন, ডান, মিলটন— এঁদের অনেকের গ্রন্থ সম্পর্কিত মন্তব্যে পাঠক্রিয়ার এমন ধারণার সাক্ষ্য মিলবে। পাঠক্রিয়াকে এরকম দ্বিমুখী সংলাপ হিসেবে কল্পনা কদাচিৎ করেন রবীন্দ্রনাথ। 'মেঘ ও রৌদ্র' (১৩০১) গল্পে গিরিবালা বইকে প্রশ্ন করে, বই কোনো উত্তর দেয় না, কারণ সে নিরক্ষর : 'ছাপার কালো কালো ছোটো ছোটো অপরিচিত অক্ষরগুলি কী যেন এক মহারহস্যশালার সিংহদ্বারে দলে দলে সার বাঁধিয়া স্কন্ধের উপরে ইকার ঐকার রেফ উঁচাইয়া পাহারা দিত, গিরিবালার কোনো প্রশ্নের কোনোই উত্তর করিত না।' গিরিবালা পড়তে পারলে বই কথা বলত হয়তো, কিন্তু সে নিজে হয়ে পড়ত মূক শ্রোতা, বিড়বিড় করে পাতা উলটে যাওয়ার ভানটুকুর স্বকীয়তাও তার থাকত না। পাঠ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ইতস্তত মন্তব্য থেকে তাই মনে হয়, তাঁর কাছে শব্দের প্রাণ হচ্ছে তার ধ্বনিতে, লিখিত বা মুদ্রিত অবয়ব বাণীর

সত্যিকারের উপস্থিতির অশ্মীভূত সংকেত কেবল। পাঠক তার পড়ার মধ্যে দিয়ে সেই সংকেতকে ধ্বনিতে তরজমা করে, হলই-বা সেই পাঠ নিঃশব্দ। উপস্থিতি, সজীবতা ও ধ্বনির এই সমীকরণ বা সমান্তর আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রাক্-মুদ্রণ যুগের কিছু সংস্কারকে, এমনকী *ফিড্রাস* নামক সংলাপে বিধৃত ভাষার যাবতীয় লেখ্যরূপ নিয়ে সক্রেতেসের সংশয়কেও। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে বা ভাষাদর্শনে হয়তো এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিচার নেই, কিন্তু ছন্দ ও সংগীত সম্পর্কে তাঁর ভাবনায় শ্রাব্য ধ্বনির মর্যাদা বুঝতে এই প্রাথমিক উপকল্পটি মনে রাখা প্রয়োজন।

সদৃশ কারণেই রবীন্দ্রনাথ বইয়ের বাহ্যরূপের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বেশি বলতে চাইতেন না, পুঁথি-পড়া পণ্ডিতের বস্তুকাম ও গ্রন্থরতির বিপদ নিয়েই বলতেন বেশি। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে 'জুবেয়ার' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখছেন :

> বই জিনিসটা প্রকাশ ও রক্ষার একটা আধারমাত্র। কিন্তু অনেক সময় সে-ই নিজে সর্বেসর্বা হইয়া উঠে। তখন সে-বই পড়িয়া মনে হয় এ কেবল বই পড়িতেছি মাত্র, এগুলা কেবল লেখা। ভালো বই পড়িবার সময় মনে থাকে না বই পড়িতেছি; ভাব এবং তত্ত্বের সহিত মুখামুখি পরিচয় হয়, মধ্যস্থ পদার্থটা চোখেই পড়ে না।

এই মধ্যস্থ পদার্থটি তাঁর চোখে শুধু রসসাহিত্যের শত্রু নয়, সুশিক্ষারও অন্তরায়। অনেক দৃষ্টান্তই মনে করা যায়, তবে *মানসী*-র 'বঙ্গবীর' কবিতাটি বোধ হয় জুতসই হবে

পড়িয়াছি বসে জানালার কাছে
জ্ঞান খুঁজে কারা ধরা ভ্রমিয়াছে
কবে মরে তারা মুখস্থ আছে
        কোন মাসে কী তারিখে।
কর্তব্যের কঠিন শাসন
সাধ ক'রে কারা করে উপাসন,
গ্রহণ করেছে কণ্টকাসন
        খাতায় রেখেছি লিখে।

বড়ো কথা শুনি, বড়ো কথা কই,
জড়ো করে নিয়ে পড়ি বড়ো বই
এমনি করিয়া ক্রমে বড়ো হই—
        কে পারে রাখিতে চেপে!
কেদারায় বসে সারাদিন ধরে
বই প'ড়ে প'ড়ে মুখস্থ ক'রে
কভু মাথা ধরে কভু মাথা ঘোরে

বুঝি বা যাইব ক্ষেপে।

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ লেখেন ইংরেজি ১২৯৫ বঙ্গাব্দে। তাৎক্ষণিক প্রণোদনা যা-ই হোক, রবীন্দ্রনাথ এমন ভাব প্রকাশ করেছেন পরেও নানা গোত্রের লেখায়। ১৩১৩ সনে লেখা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধ 'আবরণ' এর এক ভালো নমুনা। প্রবন্ধটির থেকে কিছু বাক্য উদ্ধার করলে তাঁর উদ্‌বেগের তীব্রতা বুঝতে সুবিধে হবে :

> শরীর সম্বন্ধে কাপড়-জুতো-মোজা যেমন, আমাদের মন সম্বন্ধে বই জিনিসটা ঠিক তেমনি হইয়া উঠিয়াছে। বইপড়াটা যে শিক্ষার একটা সুবিধাজনক সহায়মাত্র, তাহা আর আমাদের মনে হয় না; আমরা বইপড়াটাকেই শিক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ঠিক করিয়া বসিয়া আছি।
>
> ...
>
> এইরূপে বইপড়ার আবরণে মন শিশুকাল আপাদমস্তক আবৃত হওয়াতে আমরা মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করিবার শক্তি হারাইতেছি। ...আমরা বইয়ের লোককে চিনি, পৃথিবীর লোককে চিনি না; বইয়ের লোক আমাদের পক্ষে মনোহর, পৃথিবীর লোক শ্রান্তিকর।
>
> ...
>
> কিন্তু যথাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া নহে— তাহারা গুরুর কাছে যাহা শিখিবে, তাহাদের নিজেকে দিয়া তাহাই রচনা করিয়া লইতে হইবে; এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ। এমন হইলে তাহারা মনেও করিবে না, গ্রন্থগুলি আকাশ হইতে পড়া বেদবাক্য। ... বইয়ের অক্ষরগুলো কাটকুটহীন নির্বিকার; তাহারা শিশুবয়সে আমাদের উপরে সম্মোহন প্রয়োগ করে— তাই আমাদের কাছে আজ এ-সমস্ত কথা একেবারে দৈববাণীর মতো।

পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থার দায় কিছুটা হলেও মুদ্রণের ঘাড়ে চাপালেন রবীন্দ্রনাথ। ছাপা অক্ষরের মধ্যেই আছে এক রকম নির্মম সমদৃশতা, আপতিকের বিলোপ। *পরিশেষ* গ্রন্থের 'লেখা' (১৯৩৩) কবিতায় ধুলা লিখনকেঁ ডাক দিয়ে বলেছিল 'ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবি রে অক্ষয়'। অক্ষরের সেই নবায়নের সম্ভাবনাকেই যেন অগ্রাহ্য করতে চায় মুদ্রিত হরফ। তার ছেদহীন সমরূপী শৃঙ্খলা মনকে সম্মোহিত করে; এক ভাব থেকে আরেক ভাবের, এক শব্দ থেকে আরও শব্দের, এক গ্রন্থ থেকে অন্য গ্রন্থের অজৈব প্রকৃতিবিরুদ্ধ প্রজনন ঘটিয়ে চলে। ছাপা হরফের রেজিমেন্টেড চেহারা রবীন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দেয় বইয়ের দুর্গে সারিবদ্ধ ফৌজের কথা। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে ই-কার ঐ-কার রেফ উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কালো কালো অক্ষরের কথা স্মরণ করুন। গিরিবালা হরফের সংকেত থেকে তার ধ্বনি ও অর্থ নির্ণয় করতে পারে না বলেই তাদের বাহ্যিক চেহারার নির্বিকার তার চোখে ধরা দেয় আগে। অনুরূপ অভিজ্ঞতার বর্ণনা আমরা আবার পাই

জীবনস্মৃতি-তে। সেখানে তিনি ছোটোবেলায় পড়া ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের বর্ণনা দিচ্ছেন :

> এখনকার মতো ছেলেদের বইয়ে তখন পাতায় পাতায় ছবির চলন ছিল না। প্রত্যেক পাঠ্যবিষয়ের দেউড়িতেই থাকে-থাকে-সারবাঁধা-সিলেবল্-ফাঁক-করা বানানগুলো অ্যাক্সেন্ট-চিহ্নের তীক্ষ্ণ সঙ্গিন উঁচাইয়া শিশুপালবধের জন্য কাওয়াজ করিতে থাকিত। ইংরেজি ভাষার এই পাষাণদুর্গে মাথা ঠুকিয়া আমরা কিছু করিয়া উঠিতে পারিতাম না।

কখনো-বা ভাষার অপরিচয়ের ফলে গোটা পাঠকক্ষ কবির কাছে ভয়াল গারদের মতো ঠেকত। *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র*-এ (১২৮৮) তিনি জনৈক সাহেব পণ্ডিতের স্টাডির যে-বর্ণনা করেছেন তা পড়ে গ্যেটের নাটকে ফাউস্টের পড়ার ঘরের কথা মনে পড়ে যায় :

> একে তো সূর্যকিরণ সে ঘরে সহজেই প্রবেশ করতে পারে না, তাতে জানলার উপরে একটা পর্দা ফেলা, চারদিকে পুরোনো ছেঁড়া ধুলোমাখা নানাপ্রকার আকারের ভীষণদর্শন গ্রীক লাটিন বইয়ে দেয়াল ঢাকা, ঘরে প্রবেশ করলে এক রকম বদ্ধ হাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠতে হয়। এই ঘরটা হচ্ছে তাঁর স্টাডি, এইখানে তিনি পড়েন ও পড়ান।

মুদ্রণের রুটিন শৃঙ্খলা থেকে অক্ষরকে মুক্ত করার কোনো সম্ভাবনা দেখলেই চঞ্চল হয়ে উঠতেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩০-১ সালে রাশিয়া সফরকালে তিনি দেখেন যে, সেখানকার কিছু ছাত্র গুরুত্বপূর্ণ খবর বা প্রকল্পের কথা অভিনয় করে দেখাতেন, যাতে যারা পড়তে পারে না বা পড়ে না তারাও সেসবের কথা জানতে পারে। তাঁর মনে পড়ে গেল যে, পতিসরে দেহতত্ত্ব নিয়ে তিনি একবার যাত্রার পালা শুনেছিলেন, 'প্রণালীটা একই, লক্ষ্যটা আলাদা।' দেশে ফিরে স্কুলে এরকম 'সজীব সংবাদপত্র' শুরু করবেন, এমন সংকল্পের কথা তিনি জানিয়েছেন *রাশিয়ার চিঠি*-তে।

আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েন জার্মানিতে হাতের লেখা ছাপাবার কৌশলের সন্ধান পেয়ে। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে কার্তিক মাসের *প্রবাসী*-তে এই খবর দিয়ে লিখেছিলেন : 'বিশেষ কালি দিয়ে লিখতে হয় এ্যালুমিনিয়মের পাতের উপরে, তার থেকে বিশেষ ছাপার যন্ত্রে ছাপিয়ে নিলেই কম্পোজিটারের শরণাপন্ন হবার দরকার হয় না।' কবির অটোগ্রাফ হিসেবে এভাবে লেখন-এর টুকরো পদ্যগুলি ছাপিয়েছিলেন তিনি বিদেশে। অনুমান করা অসংগত হবে না, রবীন্দ্রনাথ এই প্রকৌশলকে মুদ্রণ প্রযুক্তিতে এক নতুন অবদান হিসেবেই কেবল স্বাগত জানাননি। মান্য ফন্টগুলি থেকে হরফকে খালাস করে লেখাকে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত করার সম্ভাবনা তিনি আঁচ করেছিলেন এর মধ্যে, লেখাকে দেশের জ্যামিতি থেকে ছাড়িয়ে কালের আপতিকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ খুঁজেছিলেন পদ্ধতিটিতে। খেয়াল করলে দেখব, 'কাটকুটহীন নির্বিকার' নয় *লেখন*; প্রতিলিপিগুলিতে কাটাকুটি আছে, ইংরেজি-বাংলার সহাবস্থান আছে, পঙ্ক্তির মাপে আচমকা বদল আছে, জাস্টিফিকেশনের তোয়াক্কা করা হয়নি।

১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'পত্র' কবিতাটি, পরের মাসে সেটি *পুনশ্চ* কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের মুদ্রণ সংক্রান্ত চিন্তার যে বিভিন্ন থিমগুলির কথা এ পর্যন্ত উত্থাপন করেছি সেগুলি বলতে গেলে একত্রিত হয়েছে কবিতাটিতে। আর মজা হচ্ছে সেটি এমন এক কবিতা যেটি ছাপার সুবিধের সদ্ব্যবহার করেছে পুরোদমে, যেখানে বাণীর ছন্দ ভাবছন্দের মুক্তি চাইছে।

বিক্রমাদিত্যের সভায়
কবিতা শুনিয়েছেন কবি দিনে দিনে।
ছাপাখানার দৈত্য তখন
কবিতার সময়াকাশকে
দেয়নি লেপে কালী মাখিয়ে।
হাইড্রলিক জাঁতায়-পেষা কাব্যপিণ্ড
তলিয়ে যেত না গলায় এক-এক গ্রাসে,
উপভোগটা পুরো অবসরে উঠত রসিয়ে।;
হায় রে, কানে শোনার কবিতাকে
পরানো হল চোখে দেখার শিকল,
কবিতার নির্বাসন হল লাইব্রেরি-লোকে;
নিত্যকালের আদরের ধন
পাব্লিশরের হাটে হল নাকাল।
উপায় নেই
জটলা-পাকানোর যুগ এটা।
কবিতাকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়
পটলডাঙার অম্নিবাসে চড়ে।
মন বলছে নিশ্বাস ফেলে—
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।
তুমি যদি হতে বিক্রমাদিত্য
আর আমি যদি হতেম—কী হবে ব'লে।
জন্মেছি ছাপার কালিদাস হয়ে।

প্রাপককে পাণ্ডুলিপির খাতা পাঠাচ্ছেন কবি, কবিতাগুলি একই খাঁচায় ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে : 'কাজেই আর সমস্ত পাবে, / কেবল পাবে না তাদের মাঝখানে ফাঁকগুলোকে।' রচনাবলির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ কবির রচনাক্ষেত্রকে নীহারিকার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, সেখানে জ্যোতির বিন্দুগুলিই ছিল সমাপ্ত ও সংহত কাব্য, মাঝখানের ঝাপসা ফাঁকগুলি নিয়ে ঐতিহাসিকের কৌতূহল থাকলেও রসজ্ঞ পাঠকের থাকার কথা নয়। এখানে যেন

তিনি বলছেন যে, ফাঁকটুকুও সহৃদয় পাঠককে জানতে হবে। একজন কবির নানাবিধ সৃষ্টিকে জুড়ে এক করছে মধ্যেকার যে নিরালোক মহাকাশ সেটা ছাপা বইতে তো নয়ই, পাণ্ডুলিপিতেও যেন ধরা যাবে না :

নিশীথ রাত্রের তারাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে
যদি হার গাঁথা যায় ঠেসে,
বিশ্ব-বেনের দোকানে
হয়তো সেটা বিকোয় মোটা দামে;
তবু রসিকেরা বুঝতে পারে, যেন কমতি হল কিসের।
যেটা কম পড়ল সেটা ফাঁকা আকাশ,
তৌল করা যায় না তাকে,
কিন্তু সেটা দরদ দিয়ে ভরা।

ফাঁকগুলি প্রয়োজন, কিন্তু সেগুলি কবিতা নয়, পাঠ্যবস্তু নয়। সমস্ত গোত্রের পাঠ্যবস্তুকেই ঘিরে থাকে নীরবতা আর শূন্যতা, তার গর্ভে জন্ম নেয় শব্দের শরীর, তার অদৃশ্য তন্তু এক কবিতাকে জুড়ে দেয় অন্য কবিতার গায়ে, পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে পাঠ্যবস্তু যোগ করে গড়ে তোলে কবির রচনাপুঞ্জ। এত যে লেখার ঘষামাজা করতেন রবীন্দ্রনাথ, সংক্ষেপ করতেন, যোগ করতেন, কবিতা থেকে গান বাঁধতেন, উপন্যাস থেকে নাটক, কবিতা আর নাটক থেকে গীতিনাট্য, তার সাহিত্যে সংগীতে এত যে গোত্রান্তর, মায় ভাষান্তর— এ সমস্ত কিছুর পেছনে রয়েছে এই দিক্‌চিহ্নহীন ফাঁকগুলি পরিমাপের এক অবিশ্বাস্য জেদ।

যা মনে হয় কবির খেয়াল, নিজের সঙ্গে আনমনা খেলা, কিন্তু যা আসলে একগুঁয়ে শিল্পীর আপন-পণ আত্মপরীক্ষা, তা থেকে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন শিল্পকর্মের এক দুঃসাহসী অভিজ্ঞান। অভিজ্ঞাত বস্তুটি 'ওয়ার্ক' বা শিল্পকর্ম, তার সংহতি 'টেক্সট' বা পাঠ্যবস্তুর সংহতি নয়। ১৯৭১ সালে রোলাঁ বার্ত oeuvre এবং texte-এর মধ্যে যে-পার্থক্য নির্দেশ করেন সেই তফাত এখানে বোধ হয় খাটবে না। বার্তের বিচারে oeuvre একটি অসম্পূর্ণ অংশ, fragment, তার একটা বস্তুচরিত্র রয়েছে, বইয়ের পাতায় বা পাঠাগারের তাকে সে কিছুটা জায়গা দখল করে থাকে। অন্যদিকে texte হল এক বিশেষ পদ্ধতিসমূহের ক্ষেত্র, তা স্বভাবতই বহুবিধ ও অনেকান্ত (pluriel), 'সাহিত্য' বা কোনো বিশেষ সাহিত্যকোটির (genre) সীমানার মধ্যে তাকে বেঁধে রাখা অসম্ভব। এর উলটো কথা বলেছিলেন ডন ম্যাকেনজি, ১৯৮৫ সালে ছাপা তাঁর প্যানিজ্জি বক্তৃতায়। তাঁর ব্যাখ্যায় ওয়ার্ক— তিনি যে-কোনো সাহিত্যকর্মের কথাই বোঝাচ্ছেন— জিনিসটা কোনো জড় 'টেক্সট' বা পাঠ্যবস্তু নয়, এক পাঠ্যবস্তুর ভিন্ন ভিন্ন পাঠরূপের মধ্যে তা কেবল এক নিহিত সম্ভাবনা :

> a form seen immanent in each of the versions but not fully realized in any one of them; it may be conceived of as always potential, like that of a play, where the text is open and generates new meanings

according to new needs in a perpetual deferral of closure.

শিল্পকর্মের যে-আদর্শের কথা বলতে চাইছি, তা অনেকটা এই ওয়ার্কের ধারণার নিকটবর্তী। তাতেও রবীন্দ্রনাথের এক্সপেরিমেন্টের পুরো নাগাল পাওয়া যাবে না। টেক্সট থেকে টেক্সটের ফাঁকগুলি পেরিয়ে শব্দাকাশের শূন্যতা আর নীরবতাকে এক গোপন সুতোয় গেঁথে তিনি যেন গড়ে তোলেন নীহারিকার ভেতরেই আরও বিচিত্র সব নক্ষত্রপুঞ্জ। সেগুলি যেন ছোটো ছোটো টেক্সটের আলোকবিন্দু দিয়ে তৈরি, কিন্তু টেক্সটগুলি হয়তো ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যকোটির, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার, এমনকী একাধিক শিল্পভাষার। লেখন ও মুদ্রণের অচঞ্চল স্থিরতা এ হেন নির্মাণকর্মের অনুকূল নয়। রবীন্দ্রনাথের টেক্সটের আত্ম-রূপান্তরের বাসনা— জার্মানরা যাকে anders-streben বলেন— এমন এক শিল্প-প্রকল্পের নিরিখেই বোঝা সম্ভব।

Anders-streben কথাটা ব্যবহার করেছিলেন ওয়ালটার পেটার, জোর্জিয়োনি সম্পর্কে তাঁর সুবিদিত প্রবন্ধে। পেটার সংগীতকে মনে করতেন শিল্পের রূপান্তর-লিপ্সার অন্তিম গন্তব্য বলে। আমরা রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিকে কাটাকুটির মুনশিয়ানায় ছবি হয়ে উঠতে দেখেছি, কবিতাকে দেখেছি নাটক হয়ে উঠতে, নাটককে গীতিনাট্য বা গদ্যকথা। আর এই পরিবৃত্তির প্রতিটি স্তরে দেখেছি একটি শিল্পভাষার আস্তরণের নীচে অন্য এক শিল্পভাষার স্পষ্ট অবয়ব, ঠিক যেমন তাঁর পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটির জাফরির ফাঁক দিয়ে কবিতার অক্ষর জেগে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মে সবচেয়ে স্মরণীয় পরিবর্তন অবশ্যই কথা থেকে সুরে, কাব্য থেকে সংগীতে। তা হয়তো এই কারণে নয় যে, পেটারের মতো তাঁর বিশ্বাস ছিল সংগীতই সব শিল্পের অভীষ্ট পরিণতি, সব সৃষ্টিপ্রকল্পের পরম। বরং এ কথা বলা যায় সংগীত তাঁর কাছে শব্দের পরিসরসর্বস্ব স্তব্ধতা থেকে নিষ্ক্রমণের উপায়, তার লিখিত ও মুদ্রিত স্থাণুত্ব থেকে পরিত্রাণের পথ।

রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে নানা উদ্ধৃতি দিয়ে এই কথা প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। কিন্তু ধ্বনি হয়ে, গান হয়ে অক্ষরের বেঁচে ওঠার যে-রূপকল্প তিনি প্রায় অভ্যাসবশত ব্যবহার করেন জীবনভর তা বোধ হয় সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষ 'কাব্যে রচে বোবার বাণী', কিন্তু বাঁধনহীন বোধের বেগে

সেই কথাটা খোঁজে ভঙ্গি, খোঁজে ইশারা,
খোঁজে নাচ, খোঁজে সুর,
দেয় আপনার অর্থকে উলটিয়ে,
নিয়মকে দেয় বাঁকা ক'রে।

পঙ্‌ক্তিগুলি *শেষ সপ্তক* (১৩৪২) বইয়ের সতেরো নম্বর কবিতা থেকে নেওয়া, যে-কবিতা তিনি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গান-সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে লিখেছিলেন। ১৩৩৯ সালে ধূর্জটিপ্রসাদকেই একটি চিঠিতে গান ও কবিতার সম্পর্ক নিয়ে লেখেন রবীন্দ্রনাথ। শব্দকে ঘিরে থাকা নৈঃশব্দের কথা নয়, সেখানে উঠেছিল কাব্যের বচনীয়তাকে ঘিরে থাকা সুরের অনির্বচনীয়তার কথা :

সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য। অনির্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চারদিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এ-পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ।

এর সাত বছর আগে এই গাঁঠছড়ার রহস্য নটরাজ বুঝিয়েছিল রাজাকে, *শেষ বর্ষণ* নাটকে : 'মহারাজ, গাঁঠছড়ার বাঁধন কি বাঁধন? সেই বাঁধনেই মিলন। তাতে উভয়েই উভয়কে বাঁধে। কথায় সুরে এক আত্মা।' বচন-অনির্বচনের বন্ধনের মধ্যে শিল্পের মুক্তির এই ছবি রবীন্দ্রনাথ লিখিত বা মুদ্রিত অক্ষরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার রূপকল্প হিসেবেও ব্যবহার করেছেন বার বার, তা 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধে মহাকল্লোলের রুদ্ধ সংগীতকে সমুদ্রশঙ্খ থেকে মুক্ত করার উপমায় হোক বা *অচলায়তন* নাটকে পুঁথির ভিতর বাঁশি বেজে ওঠার কল্পনায় হোক। *ক্ষণিকা* (১৩০৭) গ্রন্থে 'যথাস্থান' কবিতাটিতে 'অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব' আর 'বিশ্ব-বাঁশির ধ্বনির' জন্মশত্রুতার ছবিটাতে কবির প্রবণতার এক ভালো নমুনা মিলবে। 'মেহগিনির মঞ্চ জুড়ি/পঞ্চ হাজার গ্রন্থ' থেকে পালাবার জন্যে সেখানে গানের ছটফটানি যে-কোনো পাঠকেরই মনে থাকবে। রসসাহিত্যের বাইরে অন্য গোত্রের লেখাতেও শব্দ আছে, ধ্বনি আছে, নেই বচন আর নির্বচনের উদ্‌বাহে সৃষ্ট সুর আর তার ফাঁক। 'গানে কথা যেখানে থামে সেখানে সুরে ভরাট।' *জাপানযাত্রী*-তে (১৩২৬) তিনি মন্তব্যটি করেছিলেন গান ও প্রবন্ধের তফাত বোঝাতে। 'গায়কের সার্থকতা কথার ফাঁকে, লেখকের সার্থকতা কথার ঝাঁকে'।

রবীন্দ্রনাথের নিজের দৃষ্টিতে হয়তো তাঁর সৃষ্টিকর্মের সবটাই ছিল একরকম রূপান্তর, 'অব্যক্তের বিরাট প্লাবন'কে, 'কথাহারা' 'ধ্বনিহীন গান'কে ছন্দে, কথায়, ধ্বনিতে ধরার আয়োজন। যে-সম্পাদক বা পাঠতাত্ত্বিক কবির বিশেষ বিশেষ টেক্সটে নিজস্ব সংহতির সূত্র খুঁজছেন তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের রচনার এই পালিয়ে বেড়াবার প্রবণতা এক বড়ো বালাই। যেখানে 'ক্ষণিকের কায়া' ছেড়ে রূপ ফের ধরছে 'মানসী আকৃতি' ('গীতচ্ছবি', *বীথিকা*, ১৩৪২), যেখানে কথিত বাণীর ধারা অসীমের অকথিত বাণীর সমুদ্রে যাচ্ছে হারিয়ে ('১৮', *পত্রপুট*, ১৩৪৩), যেখানে কাব্যরসসিঞ্চিত লেখা এক ধরনের 'বিস্মৃতিবৃষ্টি' ('বর্ষা-যাপন', *সোনার তরী*, ১২৯৯), যেখানে বিশ্বচরাচরে আসলে একটিই কথা ও একটিই লিপি ধরণী পাঠ করছে কত যুগ থেকে (*পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি*, ১৯২৪), সেখানে একটি বিশেষ রচনার ঐক্যের ভিত্তি খোঁজা মুশকিল। এ শুধু কবির ভাববিলাস হলে তাও কথা ছিল, কিন্তু পাঠান্তর-গোত্রান্তর-ভাষান্তর মিলিয়ে এমন লুকোচুরির সাক্ষ্য তো রবীন্দ্রনাথের টেক্সটগুলিতেই পাওয়া যাচ্ছে। আর এ ধরনের পলাতক পাঠ্যবস্তুতে লেখকের অভিপ্রায় ও অধিকারের নির্ণয় হবে কীভাবে?

লেখার ঐক্যসূত্র যে ব্যক্তি-লেখকের অভিপ্রায় ও অধিকার না-ও হতে পারে, এমন আভাস রবীন্দ্রনাথের লেখায় কোথাও কোথাও মিলবে। কিন্তু সেই ঐক্যের ভিত্তি একক

কবি নন, কমিউনিটি, *লোকসাহিত্য* বইতে 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে (১৩০৫) তিনি যাকে 'জনপদের হৃদয়' বলেছেন। 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামের প্রথম প্রবন্ধটিতে (১৩০১) তিনি লিখেছেন: 'বাস্তবিকই এই ছড়াগুলি মানসিক মেঘরাজ্যের লীলা, সেখানে সীমা বা আকার বা অধিকার-নির্ণয় নাই।' ওই নামের দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে তিনি বলছেন যে, ছড়াগুলির কোনো বিশেষ পাঠকে প্রামাণ্য বলা অসংগত: 'কালে কালে মুখে মুখে এই ছড়াগুলি এতই জড়িত মিশ্রিত ও পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মধ্য হইতে কোনো একটি বিশেষ পাঠ নির্বাচিত করিয়া লওয়া সংগত হয় না।' এবং সে কারণেই ছড়াগুলি সজীব, সচল, 'মৃতভাবে রক্ষিত নহে'। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থে নানা প্রক্ষিপ্ত পাঠ ও অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও জাতীয় চিত্তের সংহত প্রতিফলন ঘটেছে, এমন কথাও তিনি বলেছেন ইতস্তত, যেমন ১৩১২ সালের 'ধম্মপদং' নামের প্রবন্ধে: 'এ স্থলে কে কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে তাহা লইয়া তর্ক করা নিরর্থক।'

এ সমস্ত ছড়া বা শাস্ত্রগ্রন্থ তাহলে ম্যাকেনজির বিশেষ অর্থে নানা টেক্সটের পুঞ্জ দিয়ে গড়া এক একটি শিল্পকর্ম, ওয়ার্ক। তাঁর নিজের রচনা অবশ্য একক কবির সৃষ্টি, সেখানে তাঁর অনধিকারের প্রশ্ন তিনি বড়ো একটা তোলেননি। নিজের কীর্তির প্রতি তাঁর অবিশ্বাসের কথা বলেছেন, সৃষ্টির ফসল কালের গোলায় তুলে দিয়ে খালাস হওয়ার কথা লিখেছেন বার বার, কিন্তু স্বরচিত শব্দের ওপর মানস-স্বত্ব ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেননি। অথচ শিল্পভাষার রূপান্তর ঘটিয়ে সেই মুক্তিটুকুর স্বাদও যেন চেয়েছিলেন তিনি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে ১৯৩৪-এ লেখা নিজের ছবি সম্পর্কে তাঁর সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি কটি স্মরণ করা যেতে পারে:

নামটা আমার খুশির উপরে
সর্দারি করতে আসেনি এখনো,
ছবি-আঁকার বুক জুড়ে
আগেভাগে নিজের আসনটা বিছিয়ে বসেনি
ঠেলা দিয়ে দিয়ে বলছে না
'নাম রক্ষা করো।'

...

এখনো সেই নামটা অবজ্ঞা করেই রয়েছে অনুপস্থিত;—
আমার তুলি আছে মুক্ত
যেমন মুক্ত আজ ঋতুরাজের লেখনী।

('১৬', *শেষ সপ্তক*)

নিজের গান সম্পর্কেও কি এরকম মনোভাব ছিল কবির, অন্তত এরকম আত্মবন্ধনমুক্তির ইচ্ছা? *লেখন* সম্পর্কে *প্রবাসী*-তে ছাপা যে প্রবন্ধটির কথা আগে উল্লেখ করেছি, তার একটি অংশ পড়ে তো তাই মনে হয় :

> আমার গানে আমি সুর দিয়ে থাকি। যাকে হাতের কাছে পাই তাকে সেই সদ্যোজাত সুর শিখিয়ে দিই। তখন থেকে সে-গানের সুরগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ছাত্রের। তার পর আমি যদি গাইতে যাই তারা এ-কথা বলতে সংকোচমাত্র করে না যে, আমি ভুল করছি। এ সম্বন্ধে তাদের শাসন আমাকে বারবার স্বীকার করে নিতে হয়।

গানের বেলা এত সহজে যে তিনি রচনাকার ও সম্পাদকের কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে পারেন তার কারণ সম্ভবত এই যে, সুর তিনি কাগজে বা অক্ষরে লেখেন না আদপে, ধ্বনিকে কয়েদ করেন না রেখায়, শব্দের অনাদি স্রোতকে বাঁধেন না ছাপা হরফের শৃঙ্খলে দুই মলাটের বন্দিশালায়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সম্পাদনায় এ যাবৎ যে-সমস্ত ধারণা সক্রিয় সেগুলি আজ অপ্রাসঙ্গিক—এ কথা কেউই বলবেন না। কিন্তু পাঠ্যবস্তুর বাহ্যরূপ এবং লেখকের অধিকার সম্পর্কে এমন সংশয়দীর্ণ রচনাদর্শনের পুরো নাগাল পেতে হলে আমাদের সম্পাদনাতত্ত্বের আরও পরিশীলন ও পরিণতি প্রয়োজন, এটাও বোধ হয় ঠিক কথা।

লেখক পরিচিতি

অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় : কবি ও প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থ *উত্তর ঔপনিবেশিক বাংলা কবিতা*।

অমল বন্দ্যোপাধ্যায় : দার্শনিক। অধ্যাপনা করেছেন দেশবিদেশে। উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ *জাক দেরিদা অথবা দর্শনের আত্মহত্যা*।

অরিন্দম চক্রবর্তী : দর্শনের অধ্যাপক। উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ *দেহ গেহ বন্ধুত্ব*।

অলোক রায় : বাংলা সাহিত্যের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ *উনিশ শতক*।

কল্যাণ সান্যাল : অর্থনীতির অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ *রিথিংকিং ক্যাপিট্যালিস্ট ডেভেলপমেন্ট*।

কল্যাণ সেনগুপ্ত : দর্শনের অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত)। গবেষণা জ্ঞানতত্ত্ব ভাষাদর্শন এবং মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন সম্পর্কিত।

গৌতম ভদ্র : ইতিহাসবিদ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *জাল রাজার কথা : বর্ধমানের প্রতাপচাঁদ*।

চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল : ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ *শিকারের ণত্ব-ষত্ব*।

তপোব্রত ঘোষ : বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *শ্রীবিলাসের ডায়েরি*।

তারাপদ সাঁতরা : গবেষক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *বাংলার দারু ভাস্কর্য*।

দীপেশ চক্রবর্তী : ইতিহাসবিদ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *রিথিংকিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি : বেঙ্গল ১৮৯০-১৯৪০*।

নির্মলচন্দ্র চৌধুরী : লোক-সংস্কৃতি গবেষক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *বঙ্গরমণীর বিস্মৃত বৃত্তান্ত*।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল : কবি ও প্রাবন্ধিক।

প্রথমা বন্দ্যোপাধ্যায় : ইতিহাসের গবেষক, উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *পলিটিক্স অব টাইম : প্রিমিটিভস অ্যান্ড হিস্ট্রি রাইটিং ইন আ কলোনিয়াল সোসাইটি*।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের গবেষক। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *প্রজা ও তন্ত্র*।

প্রদীপ বসু : সমাজতাত্ত্বিক। প্রকাশিত গ্রন্থ *সমীক্ষা ও সন্ধান : ভাষাদর্শন ও সঙ্গীত*।

মনসুর মুসা : সমাজ-ভাষা বিজ্ঞানী।

মানস রায় : সংস্কৃতিবিদ্যার গবেষক, লেখক।

মৈনাক বিশ্বাস : চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ।

রণবীর লাহিড়ী : ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *ক্যাননাইজিং দ্য পপুলার*।

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্যিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *কমলকুমার, কলকাতা : পিছুটানের ইতিহাস*।

রাজ্যেশ্বর মিত্র : দর্শন ও সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *আত্মন*।

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় : অধ্যাপক, লেখক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য*।

শিশির কুমার দাশ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌স্*।

শেফালী মৈত্র : দর্শন ও মানবীবিদ্যার গবেষক।

সিদ্ধার্থ ঘোষ : আসল নাম অমিতাভ ঘোষ। উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ *কলের শহর কলকাতা*।

সুকান্ত চৌধুরী : ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *রেনেসাঁস প্যাস্টোরাল অ্যান্ড ইটস ইংলিশ ডেভেলপমেন্ট*।

স্বপন চক্রবর্তী : ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ *বাঙ্গালির ইংরেজি সাহিত্যচর্চা*।